ভুয়া মর্যাদাবোধ না আসিয়া শ্রমের মর্যাদার সম্মানবোধ সৃষ্টি হইবে। আক্ষরিক ও পুঁথিগত জ্ঞান হইবে জনশিক্ষার পরিপূরক—জনশিক্ষাকে দ্রুতগতিতে আগাইয়া লইয়া যাইবার অন্যতম সহায়ক মাত্র।

স্বাধীন দেশে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্রের মহাপরীক্ষা চলিতেছে। দেশের মালিক আজ আর কোনো বিদেশী শাসক নহে, কোনো প্রভুত অর্থশালী ধনিক বা বণিক নহে, কোনো রাজা বা জমিদার নহে, কোনো সম্প্রদায় নহে, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো রাজনৈতিক দলও নহে: দেশের মালিক দেশের সমাজের জনসাধারণ। ইহাই গণতন্ত্রের প্রথম কথা। কিন্তু এই বোধ আজ কতটুকু? হিন্দু ভাবে—দেশ একমাত্র তাহাদেরই, ধনিক ও বণিক দেশের শাসনব্যবস্থাকে নিজ স্বার্থে হাতের মুঠায় আনিবার জন্য লালায়িত। রাজা-মহারাজা-জমিদারের দল পু... মধ্যযুগীয় স্বপ্ন কায়েম করিবার জন্য এখনো চিন্তা করে। একনায়কত্বকামী রাজনৈতিক দলসমূহ আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে যায়। হতভাগ্য সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া ভাবে—কোথায় স্বাধীনতা; মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ-তরুণী স্বপ্নের ভাবী পৃথিবী রচনার সম্ভাবনা হারাইয়া ফেলে! ইহাই আজিকার দিনের চরম ট্রাজেডি।

পথ তো পড়িয়া আছে। প্রশস্ত রাজপথ—যে পথের আহ্বান ব্যাপকভাবে দিয়া গিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। স্তর অতিক্রম করিয়া, শিক্ষার বৃথা অভিমান ত্যাগ করিয়া, দুর্বল চরিত্র পরিহার করিয়া, আদর্শের দীপ্ত তেজ ধারণ করিয়া দেশের অগণিত জনগণের মাঝে নিজেকে হারাইয়া ফেলো, বিলাইয়া দাও। অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কালো অন্ধকার জনশিক্ষার উজ্জ্বল আলো হস্তে লইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দাও। কাহারও কল্যাণ বহন করিয়া আনিবার শক্তি তোমার নাই; ঘরে ঘরে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালাইবার মত শক্তির অভিমান করিও না। শুধু কাজ করিয়া যাইতে হইবে। শিক্ষার আলোকে যেটুকু পথরেখা দেখিতে পাইয়াছ, তাহাই জনসাধারণকে দেখাইতে হইবে। শিক্ষিতের অভিমান লইয়া নহে, জ্ঞানীর অহঙ্কার লইয়া নহে, সবার একজন হইয়া, মনের পরিপূর্ণ দরদ লইয়া, পূর্বপুরুষদের স্বেচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই তিলে তিলে আত্মদান করিতে হইবে। জাতির সামান্য অংশ শিক্ষা পাইলেই জাতি বড় হয় না; বরং অশিক্ষিত সমাজ মুষ্টিমেয় শিক্ষিতকে পিছনেই টানিয়া রাখে, আগাইতে দেয় না। জনশিক্ষা পিছুটান কাটাইয়া মানুষকে আগাইয়া দিবে। দেশের মালিক অদৃষ্টকে ধিকার না দিয়া আপন শক্তিতে আপন অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে। এই অধিকার সে আনিবে—স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হিসাবে তাহার করণীয় কাজের মধ্য দিয়া, কর্তব্যের পথে, দায়িত্ব-সম্পাদনের দ্বারা।

সরকার এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা সরকারী ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জনশিক্ষার জন্য শিক্ষক সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যদিও এই পরিকল্পনা এখনো শিশু অবস্থায় এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, তবু ইহা আন্তরিক বলিয়া মনে করি। যে গ্রামে স্থায়ীভাবে জনশিক্ষার আগ্রহ আছে, সেখানে কিছু কিছু সরকারী কর্মপ্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার সহিত গ্রামের স্বপ্নদেখা শিক্ষিত কর্মী ও তরুণদের হাত মেলানো প্রয়োজন। প্রচেষ্টা যত ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী হইবে, কাজও তত দ্রুত অগ্রসর হইবে। বিশেষভাবে ছাত্র ও যুব সমাজ এ দিকে দৃষ্টি দিবেন, ইহাই কামনা। দেশের ছাত্র ও যুবকদের কর্মশক্তির উপর আমাদের গভীর আস্থা আছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ দীর্ঘ ছুটির অবকাশে বহু ছাত্র কয়েকটি জেলার সেবাদল ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান যেভাবে চালাইয়া যাইতেছেন, তাহা দৃষ্টান্তযোগ্য। তাঁহাদের এই শুভ প্রচেষ্টায় কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করুক, ইহাই কামনা।

অপরদিকে, গ্রামের শিক্ষাব্রতী ও কর্মীসমাজের দৃষ্টি গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলির পুনরুদ্ধারের কার্যে নিয়োজিত হউক—এই আশা করি। তাহা ছাড়া, জনশিক্ষার সহায়ক হিসাবে সংবাদপত্র ও গ্রন্থাগারের স্থান অতি প্রয়োজনীয়! গ্রামে গ্রামে যে-সব কেন্দ্রে জনশিক্ষার কাজ চলিবে, সেখানে সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের ও শিক্ষার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আর গ্রন্থাগার শিক্ষা ও আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সাহায্য দান করিবে। আশার কথা, কয়েকটি স্থানে জনশিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হইয়াছে এবং দেশের নিজস্ব লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলিতেছে। আজ দেশপ্রেমিকদিগকে সেই শুভ কর্মপ্রবাহে সর্বসময়ে হাত মিলাইয়া গ্রামকে নিজ গৌরবে ফিরাইয়া আনিবার কঠোর সংকল্পের পথে মহাযাত্রার ও জনশিক্ষার আলো কুটীরে কুটীরে পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি লইতে হইবে।

মাটি *

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মাটির উপরে মাটি চলে যায় ঝলকি স্বর্ণ রেখা
মাটিতে মিশায় মাটি পুনরায় না মিলাতে জল-রেখা

মাটির উপরে মাটি চলে গড়ি' প্রাসাদ তোরণ যবে
কানে কানে কয় মাটিরে মাটি "আমাদেরই সব হবে।"

---

* স্কটল্যাণ্ডের মেলরোজ অ্যাবের ধ্বংস-স্তূপের উপর স্মারকলিপির অনুবাদ।

কলিকাতার গৃহ-সমস্যা ও বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর কলিকাতা সহরে যখন বোমা পড়ে, দিন কতকের জন্য সহর যেন একটু খালি হইয়াছিল। কিন্তু সহরে জীবনের লোভ এবং যুদ্ধকালীন কলিকাতায় টাকার ছড়াছড়ি অতি অল্পকালের মধ্যে বোমার আতঙ্ককে জয় করিয়া ফেলিল। অতঃপর অবস্থা হইয়া উঠিল সাংঘাতিক। যাহারা প্রাণের দায়ে কলিকাতা ছাড়িয়াছিল তাহারা তো ফিরিয়া আসিলই, সেই সঙ্গে আরও বহুলোক আসিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইল। রেশন-এলাকায় খাদ্যশস্য অল্প-মূল্য এবং নিশ্চিন্ত-লভ্য হওয়ায় রেশনহীন অঞ্চল হইতে অসংখ্য লোক দুর্ভিক্ষের পরে কলিকাতায় ভিড় করিয়াছে। তারপর যুদ্ধ থামিলেও গ্রামাঞ্চলের জীবিকা সংস্থান অনিশ্চিত থাকিয়া যাওয়ায় ও দীর্ঘ-বসবাসের ফলে সহর-জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠায় এ পর্য্যন্ত খুব কমলোকেই কলিকাতা ছাড়িয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালের এই জনবাহুল্য সমস্যায় শুধু কলিকাতা নয়, ভারতের সব সহরই অল্প বিস্তর বিপন্ন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে উপার্জ্জনের সুবিধা এবং রেশন ও উন্নততর জীবনযাত্রার মোহে যুদ্ধের আগের হিসাবে গ্রাম হইতে অন্ততঃ দু'কোটি লোক আসিয়া সহরগুলিতে বাসা বাঁধিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে সহরবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ, এখন এ সংখ্যা শতকরা ২১ ভাগেরও উপরে উঠিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের গড়পড়তা যে বাৎসরিক ৪৫ লক্ষের মত লোক বাড়িতেছে, তদনুপাতে আনুপাতিকভাবে কলিকাতার লোকসংখ্যাও কিছুটা বাড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় আশ্রয়প্রার্থী সমাগমের চাপও কলিকাতার উপর কম নয়।

কিন্তু লোকসংখ্যার প্রভূত বৃদ্ধি ঘটিলেও কলিকাতায় বাড়ী ঘর বিশেষ বাড়ে নাই। অনেকে অভিযোগ করেন যে মহানগরী কলিকাতার আগেকার শ্রীসমৃদ্ধি নাই। কথাটা সত্য, কিন্তু এ অবস্থা অপ্রত্যাশিত নয়। ইংরেজ যতলোকের আন্দাজ করিয়া কলিকাতা সহর পত্তন করিয়াছিল, সে হিসাবে কলিকাতায় লোক বাড়িয়াছে বিস্ময়করভাবে। লোক এখন এত হইয়াছে যে, এই সহরে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান একরূপ অসম্ভব। ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের হিসাবেদেখা যায় কলিকাতায় এ সময় ১৯ লক্ষের মত লোক বাড়িয়াছে, অথচ এই দশ বৎসরে সহরে নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে মাত্র ৯,১২৫টি। যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে বাড়ী তৈয়ারীর জিনিষপত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। এইজন্য বেসামরিক কাজে গৃহ-নির্ম্মাণের মালমশলা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। যোগান ও চাহিদার অত্যধিক অসামঞ্জস্যের জন্য কালোবাজারে জিনিষপত্রের দরও অসম্ভব বাড়িয়া যায়। কাজেই সহরে বাড়ী-তৈয়ারী লোক বৃদ্ধির অনুপাতে হইয়া উঠে নাই। এখন সারা ভারতে অন্ততঃ দশ লক্ষ লোকের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। এখানে ওখানে শুইয়া তাহারা রাত্রি কাটায়। কলিকাতায় এরূপ লোকের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি হইবে। এছাড়া যাহারা কোনোক্রমে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই সংগ্রহ করিয়াছে, নিতান্ত ভাগ্যবান ছাড়া তাহাদেরও অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। কলিকাতায় স্বল্প আয়ের ভাড়াটিয়া সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তাহাদের বাসস্থান অনেক ক্ষেত্রেই মনুষ্য-বাসের উপযোগী নয়। যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে কলিকাতায় যেসকল বাড়ী ঘর তৈয়ারী হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা হইয়াছে, যুদ্ধের সুযোগে বিত্তশালীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে। যাহারা টাকা পয়সা সঞ্চয় করিয়া বড়লোক হইয়াছেন, সম্মানের দিক হইতে নিজের বড় বাড়ী না হইলে তাহাদের চলে না। এই সব বাড়ীর আয়তন হিসাবে অধিবাসীদের সংখ্যা কিছুই নয়। জমি ও মালমশলার আকাশস্পর্শী দরের জন্য দরিদ্র বা মধ্যবিত্তের পক্ষে কলিকাতায় বাড়ী-তৈয়ারীর আশা নিরর্থক। তবু যদি গত ১০।১২ বৎসরে কলিকাতায় নবনির্ম্মিত বাড়ীগুলির অধিকাংশ ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ী হইত, তাহা হইলেও বর্ত্তমান অসহনীয় জনবাহুল্য হয়তো কিছুটা কমিতে পারিত।

যাহা হউক, যুদ্ধ থামিবার সাত বৎসর পরে এখন অন্ততঃ যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসা দরকার। কলিকাতার উপর জনবাহুল্যের চাপ কমাইবার প্রশ্ন এ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী এবং বেসরকারী পরিকল্পনায় কলিকাতার আশপাশে ছোট বড় কিছু নূতন বসতি স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু যুদ্ধের সময় কলিকাতায় অর্থ এবং অন্ন সংগ্রহের যে সুবিধার মোহে লোকে ভীড় করিয়াছিল, এখনও সেই সুবিধা বর্ত্তমান বলিয়া অন্ততঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রেরা কলিকাতা ছাড়িতেছেন খুবই কম ক্ষেত্রে। কাজেই 'কল্যাণীর' মত কলিকাতার কাছাকাছি উপনগর স্থাপন পরিকল্পনার প্রভূত নিজস্ব মূল্য থাকিলেও কলিকাতার সমস্যা সমাধানে খাস কলিকাতায় কার্য্যকরী হইবার মত কোন ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

আমার মনে হয় কলিকাতার বস্তিগুলির রূপান্তর সাধনের দ্রুত, বলিষ্ঠ ও সক্রিয় কোন কর্ম্ম পন্থা গ্রহণ না করিলে কলিকাতার জনবাহুল্য কমান বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। কলিকাতায় পতিত জমি এখন নাই বলিলেই চলে, যাহা আছে, লক্ষ্মীর সংখ্যাল্প বরপুত্রদের গ্রাস হইতে সেগুলি বাঁচান কঠিন। অথচ আগেই বলিয়াছি কলিকাতার অধিকাংশ বাসিন্দা মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র। এই সব স্বল্পবিত্ত পরিবারের জন্য ছোট ছোট ফ্ল্যাট-ওয়ালা বৃহদাকার বাড়ী তৈয়ারী অত্যাবশ্যক, এই বাড়ীগুলি কম জমিতে নির্ম্মিত হইতে পারে। কলিকাতার বস্তি সম্পর্কে যাহাদের ধারণা আছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এই একতলা টিন, খোলা বা টালির চাল বাড়ীগুলিতে কল্পনাতীত নোংরামির মধ্যে অধিবাসীরা কোনক্রমে [illegible] করিতেছে। ইহাদের বাসস্থান সংস্কারের আবশ্যকতাও সহরের স্বাস্থ্য এবং সাধারণ মানুষের মত বাঁচিবার অধিকারের দিক হইতে কম নয়।

কলিকাতার বর্তমান বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই জায়গায় স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে ছোট ফ্ল্যাটের বৃহদাকার বাড়ী তোলা হইলে এবং বর্তমান বস্তিবাসীদের সেই বাড়ীগুলির একতলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দুই তিন ও চারিতলায় মধ্যবিত্তদের বাজার-ভাড়ার তুলনায় কম ভাড়ায় থাকিবার ব্যবস্থা করিলে কলিকাতার বহু সহস্র পরিবারের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হইবে। বলা বাহুল্য বস্তির লোকদের সাময়িকভাবে সরাইয়া সমান সুবিধা দিয়া তাহাদের ফিরাইয়া আনা, জমি খালি করিবার ব্যবস্থা করা, বাড়ী তোলা এবং সস্তা ভাড়ায় মধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়াদের সেই বাড়ী ভাড়া দেওয়া অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থা। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এরূপ আয়োজন করা স্বভাবতঃ সুকঠিন। ব্যক্তিগত প্রয়াসে মুনাফাবৃত্তির প্রশ্নও বর্তমান। কাজেই এরূপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগতভাবে আইনের সাহায্যেই করিতে হইবে।

উপরিউক্ত উপায়ে কলিকাতার বস্তি উন্নয়নের ভার লইবার উপযুক্ত একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রাথমিক পরিকল্পনার খসড়া নিম্নে উপস্থাপিত হইল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইলে বিস্তারিত বিধানাদি রচনা করিয়া এরূপ একটি বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা অসম্ভব নহে বলিয়া আমি মনে করি। সরকার, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় 'ইনডাসট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন' নামক বৃহদাকার শিল্পীর মূলধন সরবরাহ সংসদ গড়িয়া উঠিয়া ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে অর্থসাহায্য করিয়া আত্মরক্ষার সুযোগ দিতেছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী জনসাধারণ ও সরকারের সহিত মিলিতভাবে বহু-সম্ভাবনাময় 'ইণ্ডিয়া ইষ্টার্ন ওভারসিজ শিপিং কর্পোরেশন লিমিটেড' পত্তন করিয়া ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন, কলিকাতার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনার মত এরূপ বৃহৎ, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াস সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবেতভাবে কার্য্যকরী হইবে না, ইহা ধরিয়া লওয়ার কোন অর্থ হয় না।

প্রতিষ্ঠানটির নাম হইবে 'ক্যালকাটা বস্তি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' বা 'কলিকাতা বস্তি উন্নয়ন সংসদ'।

এই সংসদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইবে ১০ কোটি টাকা এবং এই মূলধন প্রতিখানি ১০০০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত হইবে।

বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিখানি ১০০০ টাকা মূল্যের ৫০,০০০ খানি শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৫ কোটি টাকা কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। শেয়ারগুলি নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে বণ্টিত [illegible]:—

প্রতিষ্ঠান	টাকা	মূলধনের শতকরা অংশ
কলিকাতা কর্পোরেশন	১,০০,০০,০০০	২০
পশ্চিমবঙ্গ সরকার	১,০০,০০,০০০	২০
তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ	৫০,০০,০০০	১০
বীমা কোম্পানীসমূহ (প্রভিডেণ্ট কোম্পানীসহ)	১,৩৭,৫০,০০০	২৭½
জনসাধারণ (বস্তির জমিদারবৃন্দসহ)	১,১২,৫০,০০০	২২½

বস্তিসমূহের বর্তমান জমিদারবৃন্দকে আইনসঙ্গতভাবে এই 'বস্তি উন্নয়ন সংসদে' যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সম্মত হইবেন, সেই সকল জমিদারকে তাঁহাদের জমির ন্যায্য দরের দেড়গুণ মূল্যের শেয়ার দেওয়া হইবে। যদি কোন জমিদার এইভাবে সংসদের শেয়ার গ্রহণে সম্মত না হন, তাঁহাকে নগদ জমির ন্যায্য দাম ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে তদুপরি শতকরা ৫ ভাগ গ্রহণ করিয়া সংসদকে জমির মালিকানা ছাড়িয়া দিতে হইবে। জমির দর স্থিরীকরণে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নীতি অনুসৃত হইবে এবং এ সম্পর্কে বিধান পরিষদ হইতে প্রয়োজনমত আইন পাশ করাইয়া লইতে হইবে।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কলিকাতার বর্তমান গৃহসমস্যার কিছুটা সমাধান এবং বস্তিবাসীদের বাসগৃহের উন্নতি সাধন। বর্তমান বস্তিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা এই পরিকল্পনানুযায়ী সংসদের ভাড়াটিয়া হইতে স্বীকার করিবেন, সংসদ তাহাদের সাময়িকভাবে অন্য কোথাও সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদের পরিত্যক্ত বস্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন বাড়ীর একতলা তৈয়ারী করিয়া লইবেন এবং ইহাদের এই একতলায় পুনঃ সংস্থাপন করিবেন। বস্তিবাসীদের ভাড়া এক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে :—তাহাদের বর্তমানে প্রদত্ত জমির ভাড়া + কোঠাবাড়ীর সুবিধার জন্য বাড়তি ১০% + জমির উপরকার গৃহাদির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে তাহার উপর বার্ষিক ৬%। ভাড়াটিয়াদের দেয় ট্যাক্সও এখনকার মতই তাহাদের দিতে হইবে। জমির উপরকার গৃহাদির দর কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট অনুসৃত নীতি অনুযায়ী স্থিরীকৃত হইবে।

যদি বর্তমান বস্তিবাসীদের কেহ আলোচ্য বস্তি উন্নয়ন সংসদের ভাড়াটিয়া হইতে রাজী না হন, তাহা হইলে তাঁহার অন্যত্র চলিয়া যাইবার কোন বাধা থাকিবে না এবং সেক্ষেত্রে জমির উপরকার গৃহের নির্দ্ধারিত মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হইবে। এছাড়া স্থানান্তরে গমনের খরচ বাবদ তাহাকে উপরোক্ত গৃহের নির্দ্ধারিত মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ প্রদান করা হইবে। যাঁহারা সংসদের ভাড়াটিয়া হইতে রাজী হইবেন তাহাদের স্থানান্তরকরণের খরচও সংসদই বহন করিবেন।

বস্তিজমিতে নবনির্মিত বাড়ীগুলি হইবে সাধারণতঃ চারিতলা প্রথমতলা বর্তমান বস্তিবাসীদের জন্য রাখিয়া বাকী তিনতলা মধ্য-

পরিবারবর্গকে ভাড়া দেওয়া হইবে। এই ভাড়ার হার স্থির করিবার সময় মুনাফাবৃত্তির দিকে দৃষ্টি না দিয়া মোট খরচ, মূল্যাপকর্ষ এবং লগ্নীকৃত মূলধনের উপর ন্যায্য সুদ—এইগুলিই বিবেচিত হইবে। বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত হারে ভাড়া কলিকাতার বর্ত্তমান ভাড়ার হিসাবে যথেষ্ট কম হইবে। বহুলোকের স্থান সংগ্রহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়াও ভাড়ার হার হ্রাসের এই সম্ভাবনার মূল্যও কম নয়।

বস্তি উন্নয়ন সংসদের কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য একজন বেতনভোগী ম্যানেজার থাকিবেন এবং তিনি পদাধিকার বলে সংসদের 'বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্' বা পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদকরূপে কাজ করিবেন। 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সারভিস্ কমিশন' কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও সংসদের ম্যানেজার করা চলিবে না। বস্তি উন্নয়ন সংসদের ম্যানেজার যেমন পদাধিকার বলে সংসদ পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক হইবেন, সেইরূপ কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয় পদাধিকার বলে পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান বা সভাপতি হইবেন।

সভাপতি ও সম্পাদক ব্যতীত পরিচালকমণ্ডলীতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ থাকিবেন এবং তাহাদের কার্য্যকাল হইবে তিন বৎসর।

২ জন পরিচালক হইবেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি।

২ জন পরিচালক হইবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি।

১ জন পরিচালক হইবেন সংসদে যোগদানকারী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের প্রতিনিধি।

৩ জন পরিচালক হইবেন বীমা কোম্পানীগুলির প্রতিনিধি, তবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির শেয়ারের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার বা তদূর্দ্ধে হইলে ইহার মধ্যে একজন পরিচালক অবশ্যই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৩ জন পরিচালক হইবেন জনসাধারণের প্রতিনিধি, তবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় সংসদে যোগদানকারী বস্তি মালিকদের শেয়ারের পরিমাণ ৩৭॥ লক্ষ টাকার বা তদূর্দ্ধে হইলে ইহার মধ্যে একজন পরিচালক অবশ্যই এইরূপ বস্তি জমিদারদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষকেও জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্য প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাহাকেও প্রাণধারণ করিবার জন্য ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল ও রৌদ্র বৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল খুঁজিতে হয়। ইতর প্রাণীরা এই সব দ্রব্য পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মানুষ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা বলিয়া একটা প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়। এই তৃষ্ণা ভৌতিক জলে মিটে না। এ পিপাসা মিটাইবার জন্য মানুষ অহরহ জ্ঞান অন্বেষণে প্রবৃত্ত আছে। তাহার নিজের স্বরূপ কি, সে কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে, ইহলোকের পর পরলোক বলিয়া কিছু আছে কি না, জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট—না জড়-প্রকৃতির পরিণামমাত্র, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি—তাহার কর্তব্যই বা কি—এ সব প্রশ্ন স্বতঃই মানুষের মনে উদিত হয় এবং মানুষ সেগুলি সমাধান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই প্রকার প্রশ্নসমূহের বিচারপূর্বক ও ন্যায়সঙ্গত আলোচনা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় দার্শনিক আলোচনা মানুষের স্বভাবগত, উহা অনাবশ্যক কল্পনাবিলাসমাত্র নহে।

সকল দেশেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি, পরিণতি ও বিচার্য বিষয়বস্তু প্রায় একরূপ। আমাদের দেশে যাহাকে দর্শন বলে ইংরাজীতে তাহাকে 'ফিলসফি' বলে। ফিলসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হইতেছে জ্ঞানানুরাগ। পাশ্চাত্য জগতে দর্শন বলিতে প্রাচীনকালে সকল বিষয়েই জ্ঞানানুরাগ বুঝাইত এবং সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কালে এসব বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান এতটা বিস্তার লাভ করে যে একজন মানুষের পক্ষে সবগুলি আলোচনা করা ও আয়ত্ত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই এক এক ব্যক্তি বা এক এক শ্রেণীর পণ্ডিত এক একটি বিষয়ের বিশেষ আলোচনায় ও তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। এইভাবে দর্শন হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়। শরীর-বিদ্যা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞান মানব-শরীরের গঠন, ক্রিয়া, আধিব্যাধি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করে। মনোবিদ্যায় মানব ও মানবতার মনের স্বভাব, প্রকৃতি ও বিকৃতি বিষয়ক সমস্যাগুলি সমাধান করিবার চেষ্টা করা হয়। এইভাবে দর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিচার্য বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে এখন আর এ সব বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাহায্য লয় এবং বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করে।

এখন পাশ্চাত্য দর্শনের যে সব প্রধান প্রধান শাখা দৃষ্ট হয় সেগুলি এইরূপ (ক) তত্ত্ববিজ্ঞান—ইহাতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি

---

* শ্রীতারকচন্দ্র রায়, বি-এ কৃত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" (১ম খণ্ড, মূল্য ৮৲ টাকা) পুস্তকের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর নিকট প্রাপ্তব্য।

বিচার করা হয়। (খ) প্রমাবিজ্ঞান—ইহাতে জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিস্তৃতি, সীমা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। (গ) তর্ক বিজ্ঞান বা তর্কশাস্ত্র—ইহাতে যুক্তি-তর্কের নিয়মাবলীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। (ঘ) নীতি বিজ্ঞান—ইহাতে মানুষের আদর্শ চরিত্র, নৈতিক বিচারের মানদণ্ড, জীবনের পরম পুরুষার্থ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। (ঙ) সৌন্দর্য-বিজ্ঞান—ইহাতে সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্যবিচার প্রণালী, সৌন্দর্যের স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ের বিচার করা হয়। সম্প্রতি অর্ঘ বিজ্ঞান বা ইষ্ট বিজ্ঞান (theory of values) এবং সমাজ-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য দর্শনের দুইটি নূতন শাখারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। বহুকাল হইতে মনোবিজ্ঞানকে পাশ্চাত্য দর্শনের শাখা বলিয়াই গণনা করা হইত। কিন্তু আজকাল মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বলিয়াই গণ্য করা হইতেছে।

পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারার ধারাবাহিক বিবরণই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস। এই ইতিহাস বহু যুগব্যাপী ; উহা খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইংরাজী, জার্মান প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় এই সুদীর্ঘ ইতিহাস লিখিত হইলেও বাংলা বা অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের কোন সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পূর্বে লিখিত হয় নাই। শ্রীতারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাংলা ভাষায় লিখিত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" বহুকালের এই অভাব দূর করিয়াছে। অবশ্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর শশধর দত্ত মহাশয়ের বাংলা ভাষায় লিখিত একখানি পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে এরূপ বিশদভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের সর্বযুগের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পূর্ণ ইতিহাসকে তিন পর্বে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম পর্বে গ্রীক্ দার্শনিকদের চিন্তা ধারার বিবরণ ও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে খৃষ্টীয় দর্শন বা মধ্যযুগের দর্শনের আলোচনা আছে। তৃতীয় পর্বে তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পরিচয় দিবেন। এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত দর্শনকে তিনি নব্যদর্শন বলিয়াছেন। কিন্তু এই দীর্ঘব্যাপী যুগের দর্শনকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটিকে নব্যদর্শন ও অপরটিকে সমসাময়িক দর্শন বলিলে ভাল হয়। রায় মহাশয়ের বিশাল পুস্তকটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে এবং তাহাই বাঞ্ছনীয়। পুস্তকটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রীক্ দর্শন ও মধ্য যুগের দর্শনের সুবোধ্য, সুখপাঠ্য ও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটলের যে জীবনী সম্বলিত দার্শনিক মতবাদের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হইবে মনে করি।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায় যে উহার অধিকাংশ শাখা বেদ ও উপনিষদের মূলে এবং কয়েকটি শাখা উহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে উদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের উৎপত্তি যে ভাবেই হউক না কেন, ভারতীয় দর্শন শাখাগুলি পরস্পরের সমালোচনামুখে প্রসার ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং তাহার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের পরিপূর্ণতা ও প্রকর্ষতা লাভ হইয়াছে। সেইরূপ জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বহু তর্কজাল বিস্তার করিয়াছে। পক্ষান্তরে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের প্রত্যেকটিতে, দর্শনান্তরের মত ও আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় দার্শনিকগণ নিজ মত স্থাপন করিবার জন্য পরমতগুলি শ্রদ্ধাসহকারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতগণই ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারক ও বাহকরূপে উহার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজি বা অন্য কোন য়ুরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বিধায় পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞান লাভে অসমর্থ। অবশ্য এখন আমাদের দেশে ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। তাহার ফলে এখন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা য়ুরোপীয় দর্শনের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে ভারতীয় দর্শনের ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা য়ুরোপীয় দর্শনের বিরুদ্ধ মত ও সমালোচনার বিষয় অবগত হইলে ভারতীয় দর্শনের মূলতত্ত্বগুলিকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারেন ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের আপত্তিসকল খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। এজন্য ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন অতিশয় প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় বাংলা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

চব্বিশ

আরও প্রায় মাসতিনেক কেটে গেল।

দেখা সাক্ষাৎ সরমার সঙ্গে রোজই হচ্ছে; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ধরে একা পাওয়া দরকার। তার কোনও সুবিধাই হচ্ছে না। কথাটা পাড়া গেল, তার পরেই বাধা পড়ে গেলে তাতে উল্টাই ফলই হতে পারে। নূতন কল নিয়ে খুব ব্যস্তও মৃন্ময়, চেষ্টা করে যে একটু সুযোগ বের ক'রে নেবে তাও হয়ে উঠছে না।

শেষে দেখলে চিঠি লেখা ভিন্ন কোনও উপায় নেই। তারও বিপদ আছে, কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে তাই ঠিক করলে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে বড় বেশি, সেও তো একটা বিপদ।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা। দুপুরের দিকে বেশ খানিকটা ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গিয়ে পড়ন্ত শীতটাকে আবার চাগিয়ে দিয়েছে। পল্লীটা হয়ে গেছে নিশুতি। আহারের পর এক পেগ সুরা পান করে নিয়ে মৃন্ময় লিখতে বসল চিঠিটা।

শক্ত; সাহস বুদ্ধি দুইয়েরই দরকার; অবশ্য তার অভাব নেই, কিন্তু জাগিয়ে তুলতে হবে। তা ভিন্ন একটা রোম্যান্সের গোড়াপত্তন হচ্ছে, বোতলটাও সামনে টেবিলের ওপর বসিয়ে রাখলে।

তিন চার ছত্র লিখেছে, বাইরে রুম্মার ছেলে বুধাই এসে উপস্থিত হোল। সুকুমার 'কল' থেকে এখনও ফেরে নি; সরমা বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে, একবার বীরেন্দ্র সিঙের ওখানে যেতে চায় কোন ব্যবস্থা করতে, মৃন্ময়ের মোটরটা দরকার।

মৃন্ময় বেরিয়ে এসে বাইরের দরজাটা খুলে দাঁড়াল। প্রশ্ন করলে—"তিনি নিজেই যাবেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, তাই তো বললেন।"

বাইরে এক মৃন্ময় কথা কইছে, ভেতরে আর এক মৃন্ময় চিন্তা করছে, খুব দ্রুতগতিতে।

"তিনি নিজেই আসবেন, না, মোটরটা পাঠিয়ে দোব। দাশু, জিগ্যেস ক'রে এসো, আমি ততক্ষণ মোটরটা বার করাচ্ছি। বলবে, বড় গাড়ি, ওদিকে গেলে ঘোরাতে-ফেরাতে দেরি হয়ে যেতে পারে। আরও বলবে যদি আসেন তো তোমাদের কাউকে না হয় সঙ্গে নিয়ে আসবেন।...যা যা বলছি ঠিক মতো বোল'।"

সুরাটা মাথায় চনচনিয়ে উঠছে, সুযোগ তো একেবারে এত সুযোগ!—সোনায় বাঁধানো!

প্ল্যান ওর ভেতরে ভেতরে ঠিক হয়ে গেছে।...তার আর মোটেই সময় নেই কিন্তু।

শোফারটা এখনও ঘুমায় নি, তাকে ডেকে বললে, তখুনি গাড়িটা বের ক'রে সে ঝাঝার রাস্তায় যতটা সম্ভব ছুটিয়ে বেরিয়ে যাবে, ডাক্তারবাবু গেছেন রতনডিহি রুগী দেখতে, প্রায় মাইল দশেকের মাথায় যে-রাস্তাটা বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে। যদি মোটর ব্রেক্-ডাউন্ ক'রে থাকেই—পথেই দেখা হয়, ভালো, তাঁকে নিয়ে চলে আসবে, না হয় আরও এগিয়ে রতনডিহি যাবে চলে। শোফার জানালে—বোধ হয় যাওয়া-সম্ভব হবে না অত দূর, মাঝে একটা জোড় (পাহাড়ী নদী) পড়ে, দুপুরের বৃষ্টিতে জল নেমে থাকাই সম্ভব।

মৃন্ময় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, শোফার বোধ হয় এড়াবার জন্যেই বললে—"নিশ্চয় তাই হয়েছে হুজুর, তিনি উদিকে পড়ে গেছেন।"

"আচ্ছা, তুমি বেরিয়ে যাও, দুমিনিটের মধ্যে, সঙ্গে আরদালি, মোহনসিংকে নিয়ে নাও। হর্ণ দিয়ে লোক জাগাবার দরকার নেই। শুধু ফেরবার সময় বাঁধের কাছ থেকেই গোটাকতক হর্ণ দিও—যদি ঘুমিয়ে পড়ি।"

আরদালিকে নিজেই ডেকে দিলে। দু'মিনিটও লাগল না, মোটর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দরজা দু'টো খুলে রেখে ভেতরে এসে প্রথমেই বোতলটা আলমারিতে সরিয়ে রাখলে। সুরার যেটুকু গন্ধ মুখে

লেগে থাকবার কথা সেটারও ব্যবস্থা করলে, সামান্য একটু যে প্রভাব আছে সেটাকেও দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা ওর আছেই।

এখন সবটা নির্ভর করে সরমা একলা আসে কি কাউকে সঙ্গে নিয়ে। ও ইচ্ছে করেই সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসতে বলে দিলে বুধাইকে, অবিশ্বাসের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে দেবার জন্যেই। এখন দেখা যাক, সরমা কি-ভাবে নেয়।

সরমা একলাই এসে হাজির হোল, মুখের উদ্বেগটা চাপবার চেষ্টা করলেও খুব স্পষ্ট। বললে—"উনি এখনও ফেরেন নি—কোন্ সেই বিকেলবেলা গেছেন।···আপনার মোটরটা···বলেছেন বের করতে ?"

বিবেকে একটু বাধছে, যাই হোক একজন অসহায়া স্ত্রীলোকই তো! কিন্তু সময় তো নেই, মোটর যেমন দু'ঘণ্টাতেও ফিরতে পারে তেমনি পাঁচ মিনিটেও তো ফিরে আসতে পারে কাছ থেকেই। মৃন্ময় সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করে বসল, বললে—"অরুণা দেবী, আপনি স্থির হয়ে বসুন; আরও ভালো ব্যবস্থাই করেছি আমি, সোজা রতনডিহির দিকেই মোটর পাঠিয়ে দিয়েছি।"

ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে সরমা স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে রইল, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে, চৈতন্যও হারিয়ে ফেলতে পারে ভেবে মৃন্ময় চেয়ারটা তার পেছনে সরিয়ে দিয়ে বললে—"বসুন··· দাঁড়িয়ে রইলেন।"

সরমা সামলে নিলে, বসতে বসতে বললে—"বসছি··· কিন্তু আপনি দেখছি আমার চেয়েও চঞ্চল হয়ে পড়েছেন—নামটাই ভুল বললেন আমার, তাই···"

মৃন্ময় একটু হাসলে, বললে—"নামটা রিপিট্ করলে তো আর ভুল বলে মনে হবে না অরুণা দেবী ? আপনি এক কাজ করলে আমাদের কথাবার্তা বেশ সহজ হয়ে যায়, দয়া করে যদি লুকোচুরি পাটটা চুকিয়ে দেন। সেতো আজ এই প্রায় বছর খানেক ধরে চলছে।"

"কি লুকোচুরির কথা বলছেন ?"—মুখটা আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বলেই বললে—"আমার এই অবস্থা—স্বামী আমার কী যে বিপদে পড়েছেন—আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এলাম বিশ্বাস ক'রে—এই দুপুর রাত্রে, একা আমি মেয়েছেলে···"

গলা শুকিয়ে আসবার জন্যেই থেমে গেল। মৃন্ময় বললে—"রাত দুপুর, একা মেয়েছেলে আপনি, তার জন্যে আপনার তিলার্ধ ভয় নেই, আমি কথা দিচ্ছি। আপনার স্বামীর তেমন কিছু বিপদ নিশ্চয় হয় নি, তবুও আপনি যা প্ল্যান করেছিলেন তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থাই করেছি আমি, মোটর এতক্ষণ লখমিনিয়া ছাড়িয়ে গেছে। ওসব দিকে নিশ্চিন্দি হয়েই আপনি আমাদের কথাবার্তাটা শেষ করে নিন।"

"কি কথাবার্তা বলুন, আমি তো কিছুই হদিস পাচ্ছি না, আপনি আমার নাম বলছেন 'অরুণা'!"

"হ্যাঁ, যে-অরুণা দেবী একটা নাম-করা ফিল্মে নায়িকার পার্ট নিয়ে···"

"আমি !···গেরস্তর একজন বৌকে আপনি রাত্ত দুপুরে ছল করে ডেকে নিয়ে এসে বলছেন যে ফিল্মে নায়িকার পার্ট···"

—রাগে দাঁড়িয়ে উঠেছে সরমা।

"বসুন দয়া করে। সামান্য একটু ভুল হয়েছে, ঠিক নায়িকা নয়, উপনায়িকা বলা ঠিক। নাম করি এবার ?"

সম্মতি না পেলেও দুটো নামই করলে মৃন্ময়, সিনেমাটার আর নায়িকার। সরমা যেন হাঁটুর জোর হারিয়ে পা মুড়ে ব'সে পড়ল, মুখের পানে চিত্রার্পিতের মতো চেয়ে আছে; দুবার ঢোঁক গিললে, জিভে ঠোঁট দুটো ভেজাল, তবুও কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। মৃন্ময় খুব অল্প হেসে বললে—"আজ আট দশ মাস ধরে যে প্রমাণ সংগ্রহ করছে তার কাছে এসব চলবে না। কেন মিছিমিছি সময় বাড়াচ্ছেন অরুণা দেবী ?"

সরমা চেয়ারের হাতল দুটো চেপে উঠে পড়ল, বললে—"হ্যাঁ, সময়ের কথাটাও একবার ভাবুন, প্রায় দুপুর রাত ···আমায় ছেড়ে দিন···আপনার কি হয়েছে যেন—স্থির হয়ে ভেবে দেখুন একলা ব'সে, কী অন্যায় কথা সব বলছিলেন।"

মৃন্ময় দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল সরমা।

"একি! আপনি দোর আটকাচ্ছেন ? চেঁচাব আমি!"

"শোফারের সঙ্গে আরদালিকেও পাঠিয়ে দিয়েছি; রয়েছি শুধু আমরা দুজন। অবশ্য তেমন চেঁচিয়ে যদি লোক

জড়ো করেন তো আমি বিপন্ন হব ; কিন্তু···কিন্তু ব্যাপারটা সামলাবার যদি কোনও উপায় থাকে তো তাও নষ্ট হয়ে যাবে আপনার···ভেবে দেখুন।"

সরমা শান্ত হয়ে বসল, বললে—"আমি একজন সিনেমা আর্টিষ্ট ?—কী প্রমাণ আপনার ?"

"দলিল-দস্তাবেজ কিছু নেই—শুধু ভুল ঠিকানা দেন, ফটো-তোলাতে চান না—ছোটখাটো এই রকম সব। তবে একটা প্রশ্ন আমিও করি—ঐ সিনেমাটা এখানে আনাবার ব্যবস্থা করতে পারি, বন্দোবস্ত আমার সবই ঠিক ; আপনি সবার সঙ্গে ব'সে দেখবেন ?"

আতঙ্কে আবার সেই গোড়ার মতোই কাঠ হয়ে বসে রইল সরমা। নিরুপায় হয়ে আসছে, দৃষ্টিতে যে একটা করুণ মিনতির ভাবও ফুটে উঠছে, রাগের ভাব কি মরিয়া হয়ে ওঠার ভাব এনে ফেলে সেটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। শেষে মিনতির ভাবেই বললে—"আপনি দয়া করে একটা কথা ভাবুন, আমার স্বামী এসে পড়তে পারেন যে-কোন মুহূর্তে···"

"সম্ভাবনা খুব কম ; রতনডিহি যেতে একটা বড় জোড় আছে, তাতে দুপুর বেলার বর্ষার জলটা নামাতেই আপনার স্বামী নিশ্চয় ওদিকে আটকে গেছেন। রাত্তিরে আসবেন না; যদি আসেনই, বাঁধের কাছ থেকেই শোফারকে হর্ণ দিতে বলে দিয়েছি, আপনি চলে যেতে যথেষ্ট সময় পাবেন।"

"এও দেখুন, আপনি কী এক কাণ্ড করেছেন! আমি মোটরে যাই নি, অথচ এতক্ষণ এখানে ছিলাম—রুম্মা কী ভাববে—তার ছেলেও রয়েছে!"

একটা কথা মুখে এসেছিল মৃন্ময়ের, কিন্তু উচ্চারণ করলে না, বললে—"সেদিক দিয়েও মোটরটা ফিরে এলেই আপনার যাওয়া ভালো।···কিন্তু কথা অযথাই বেড়ে যাচ্ছে ; আপনি সত্যিটা স্বীকার করে নিন সরমা দেবী।"

সরমা যেন একটা অবলম্বন পেয়ে চকিতে মুখ তুললে, বললে—"আপনি ঐ নামেই ডাকুন, ঐ দেখুন সত্যিটা আপনিই বেরিয়ে এসেছে।"

মৃন্ময় একটু স্পষ্ট করেই হাসলে, বললে—"ঐ কথাই থাক, আমি সরমা বলেই ডাকব, অর্থাৎ তোমার এই গুপ্ত সত্যকে রক্ষা করবার ভার নিলাম আমি আজ থেকে···"

মৃন্ময় অতটা ভেবে বলে নি, মাত্র একটু একটু করে নিজের উদ্দেশ্যের পানে এগুচ্ছিল, কিন্তু এইতেই কাজ হোল। সরমা একেবারে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, চোখদুটো জ্বলছে, ঠোঁটদুটো একটু একটু কাঁপছে, আত্মবিস্মৃত হয়েই একটু চড়া গলাতে বললে—"তার মানে ?—আর, 'আপনার' থেকে একেবারে 'তোমার' —আপনার উদ্দেশ্যটা কি ? কী ভেবে আপনি এই চক্রান্ত রচনা করেছেন আজ রাত্রে ? আমি যদি বলি, বেশ, আমি একজন সিনেমা-অভিনেত্রী—ছিলাম, তারপর এই পথে এসেছি, আমার স্বামী সব জানেন—তিনি আমার স্বামী-ই—ধর্মসাক্ষী করে···"

"বসুন, উত্তেজিত হয়ে ফল নেই—সুকুমারবাবু—আপনার স্বামী কিনা—ধর্মসাক্ষী করে, তা জানিনা ; তবে এটা খুব ভালো রকমেই জানি যে তিনি আপনার পূর্ব জীবনের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না—যার মানে হয়, আপনি তাঁকে প্রবঞ্চনা করেই বিবাহ করেছেন—যদি করেই থাকেন বিবাহ।"

আবার স্নায়বিক দুর্বলতার জন্যেই ব'সে পড়ল সরমা, মুখটা আবার বিবর্ণ হয়ে এসেছে, তবু কড়াচোখেই জিজ্ঞাসা করবার চেষ্টা করলে—"কে বলে একথা ?"

সুকুমারকে তার জার্মানপ্রবাসের বানানো গল্পের কথাটা আর বললে না মৃন্ময়, যাতে অরুণার নামটা পর্যন্ত ক'রেও সুকুমারের মুখে কোন ভাবান্তর আনতে পারে নি। ওদিকেই না গিয়ে প্রশ্ন করলে—"বেশ, কাল সুকুমারবাবুর কাছেই সমস্ত কথাটা পাড়ব, অবশ্য মাত্র যখন আপনি থাকবেন, রাজি আছেন ? কিম্বা তাতেও না রাজি হন, সুকুমারবাবু যখন একা ?"

আবার দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল সরমার, কিন্তু তখনই একটা ভালো যুক্তি মনে পড়ায় সামলে নিলে, বললে—"বাঃ, চমৎকার কথা আপনার! আপনি আমার স্বামীর কাছে আমার নামে একটা মিথ্যা গল্প রচনা করে বলবেন, আমি ব'সে ব'সে সেটা শুনব। মিথ্যা হোলেও তার একটা কুফল নেই বেটাছেলের মনে ? আমার আড়ালে বললে তো আরও চমৎকার!"

"অরুণা দেবী···"

"আপনি সরমাই বলুন।"

"বেশ, সরমাদেবী, আপনি কথাটা অর্ধেক মেনে নিয়েও আবার পেছিয়ে যাচ্ছেন, অথচ ভেবে দেখুন তর্কের জোরে তো হয়-কে নয় ক'রে ফেলতে পারবেন না।···বেশ, বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে সবচেয়ে বড় প্রমাণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করার কথাও বলব···"

"কী প্রমাণ সে?"

—আবার নিজের ওপর সংযম হারিয়ে সোজা হয়ে বসল সরমা।

"বলব—সিনেমার অরুণাদেবী কোথায় গেল তিনি ট্রেস্ করবার চেষ্টা করুন, আমি সাহায্য করব তাঁকে।"

"অরুণা নেই?"

"শুধু একজন ছাড়া পৃথিবীর সবাই জানে—নেই।"

"কে সে একজন?"

"আপনার সামনেই বসে আছে।"

"আপনি জানেন অরুণার কি হোল?"

খেলতে খেলতে মাছ এলিয়ে এসেছে, মৃন্ময় একটা নিষ্ঠুর লুব্ধতার হাসি হাসলে, মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে বললে—"একটা ঘটনা পর্যন্ত সব জানি—জোগাড় হয়েছে—তারপরে একটু ফাঁক প'ড়ে যাচ্ছে—অবশ্য সে ফাঁকটা ভরে নেওয়া যায়—তারপরে আবার এই লগমিনিয়ায়···"

"সে ঘটনাটা কি?"

এই সময়ে মোটর হর্ণের আওয়াজ হোল, বেশ জোরেই আসছে, সরমা একেবারে পাগলের মতো হয়ে দাঁড়ালো, সমস্ত শরীরটা কাঁপছে, হাতদুটো জোড় করে বললে—"আমাকে বাঁচান্—বাঁচান আমাকে মৃন্ময়বাবু···বলুন, একজনের এরকম ক'রে সর্বনাশ করায় আপনার কী স্বার্থ?"

"বাঁচবার স্বার্থ···"

স্থিরভাবে মুখের পানে চেয়ে আছে সরমা—অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করছে যেন, কিন্তু পারছে না।···মোটরের আর একটা হর্ণ, হ্রদটা ছাড়িয়ে এই পাড়ার দিকে বেঁকল।

"আমায় আর পাঁচটা দিন সময় দিন মৃন্ময়বাবু—শুধু পাঁচটা দিন···"

বলতে বলতেই সরমা পাগলের মতো হন্তদন্ত হয়ে দরজার দিকে এগুল। মৃন্ময় তার একটা হাত ধরে ফেললে, বললে—"মস্ত বড় ভুল করেছেন, এ-অবস্থায়, এ-ভাবে কোনমতেই বাসার দিকে যাবেন না।···আমার প্ল্যান ঠিক আছে, আপনি পাশের ঘরে চলে যান। যদি ডাক্তারবাবু থাকেনই—আমি অন্তত আধঘণ্টা বসিয়ে রাখব গল্প করে, চায়ের ব্যবস্থা করে, আপনি সেই সুযোগে ঐদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবেন।

"রুম্মা···তার ছেলে···?"

"তার ছেলে নিশ্চয় ঘুমিয়েছে—জানবে আপনি মোটরেই গেছেন—অত মাথা ঘামাবে না···"

"রুম্মা?···"

"রুম্মার আমাদের দুজনের কথার মধ্যে একটু একটু থাকাই ভালো এবার থেকে···"

মোটর এসে থামল। একটা চাপা বুক ভাঙা—"উঃ!" শব্দ করে সরমা পাশের ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে, শেষ কথা যা তার কানে এল তা—"পাঁচটা দিন।"

অতটা করতে হোল না, শোফার খালি গাড়িই ফিরিয়ে এনেছে। খবর দিলে—সে যা আন্দাজ করেছিল—জোরে প্রচণ্ড জল নেমেছে, ডাক্তারবাবু ওদিকেই আটকে গেছেন। কাছের গ্রামে খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছে—সন্ধ্যার আগে তাঁর মোটর ওপারে এসেছিল, জল দেখে ফিরে গেছে।

একা নয়, আরদালিকে সঙ্গে করে মৃন্ময় সরমাকে পৌঁছে দিয়ে এল—এখানে এতক্ষণ থাকবার কথাটাও দিলে ঢাকা, ওদের দুজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—"মোটরের ডাক শুনে এমন জ্ঞানহারা হয়ে কখনও ছুটে আসতে আছে সরমা দেবী? একটা কিছু হয়ে যেতে কত দেরি? ডাক্তারবাবু নেই···"

রুম্মাকেও দুজনের মধ্যে টেনে আনলে না; গিয়ে নিজেই জানিয়ে দিলে সরমা সত্যি মোটরে গিয়েছিল।

যেভাবে কাটছে, পাঁচটা দিন অপেক্ষা করতে গেলে পাগল হয়ে যাবে সরমা। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় নিজেই একটু সুযোগ করে নিলে মিনিট চার পাঁচের আন্দাজে; বললে—"আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি মৃন্ময়বাবু, ছেড়ে দিচ্ছি আমার এই জীবন, কিন্তু একটা সর্তে।"

"বলুন কী সর্ত।"

"বিবাহ করবেন···আমায়।"

বোধ হয় চেষ্টা সত্ত্বেও মৃন্ময়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললে—"বিবাহ!"

"তবে?"—এবার ব্যঙ্গে সরমার ঠোঁটটা বেশ ভালোভাবেই উঠল কুঁচকে!

"তবে আর কি?…"

তারপর স্পষ্ট ব্যঙ্গেই উত্তরটা দিয়ে বললে—"সিনেমা আর্টিষ্টের বিবাহ—এবেলা-ওবেলার মেয়াদে!…আমি বোধ হয় হব তৃতীয়?"

"না, প্রথম; ওঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি…এখনও। তার আগেও কারুর সঙ্গে নয়।"

মৃন্ময় একটু তির্যক দৃষ্টিতে চাইলে, বললে—"বেশ তো, যেমন ওঁর সঙ্গেই আছেন, সেইভাবেই থাকুন না… আমার সঙ্গেও।"

সরমার সমস্ত শরীরটা যেন অগ্নিশিখার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে, চেষ্টা করেও নিঃশ্বাসটাকে সংযত করতে পারছে না, বললে—"সেরকম থাকতে ডাক্তারবাবুর মতো দেবতাই পারে মৃন্ময়বাবু, আপনার মতো শয়তানে পারে না।…আপনি দেখুন ভেবে, ঐ সর্ত আমার…"

"না রাজি হ'লে?"

"একটা সিনেমা-অভিনেত্রী—আবার সেই জীবনে যাবে ফিরে—এত বুদ্ধি থাকতেও আপনার এটুকু হুঁস হোল না?…না হয় মরবে; মরার স্বাদ একবার সে তো পেয়েছে, আপনি জানেনই।"

মৃন্ময় বুঝতে পারছে পরাজয়টা, মুখের পানে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, সেইখানে দৃষ্টি রেখেই যেন তাকে আপাদ-মস্তক দেখে নিচ্ছে, এতদিনে নানাভাবে দেখা সরমারও একটা হিসাব নিচ্ছে মনে মনে; তারপর বললে—"বেশ, এবার আমি চাইছি পাচটা দিন।"

"দুটো দিন পাবেন, তার এক দণ্ডও বেশি নয়। পরন্তু এই সময়—কথা কইবার সুযোগ হয় ভালো, না হয় একটুকরো কাগজে লিখে আনবেন।"

তাও দিলে না সরমা।

তারপরদিন ঠিক ঐ সময়টিতে তাকে খুঁজলে পাওয়া যেত নদীর ধারে তাদের নির্জন জায়গাটিতে; সে আছে আর সুকুমার। আকাশে একটা ম্লান জ্যোৎস্না, ঝিলের জল নিচে নেমে গেছে, দূরে বুলানী নদীর চর উঠছে জেগে, ওপার থেকে কাপড়ের কলের একটা ক্লান্ত শব্দ আসছে ভেসে। ঝিল, নদী, জ্যোৎস্না—সবসুদ্ধ রাত্রিটি যেন মৃত্যুশয্যায়…

সরমা সুকুমারকে নিজের জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছে।

মোটরটা আছে বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে, ঘুরিয়ে উল্টা দিকেই মুখ ক'রে রাখিয়েছে সরমা।

এইমাত্র দুজনে খুব খানিকটা ঘুরে ফিরে এল, শেষবারের মতো; তার পরেই আরম্ভ করেছে কাহিনীটা। শেষ ক'রে আর এ-বাসায় ফিরে যাবার দাবি থাকবে না তার।

(ক্রমশঃ)

তবু মনে হয়

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

মন্ত্র তোমার হারায়ে ফেলেছি যন্ত্রের কোলাহলে
ছন্দ বীণায় তাই ত জাগে না তোমার করুণ সুর
মৌরী খেতের এক কোণে আজো বাঁকা চাঁদ উঠে দুলে
সেই আমি আজো তবু মনে হয় পড়ে আছি বহু দূর।
হরিণীর চোখে আজো খেলে যায় আষাঢ়ের বিদ্যুৎ
মৌমাছি দল সেই কথা বলে হাসনুহানার কানে।

বসন্ত সে আজো অশোক শাখায় পাঠায় অগ্নি-দূত
তরঙ্গ তার দু বাহু বাড়ায় মহাশূন্যের পানে।
আমি বেঁচে আছি ক্লান্ত পথিক, গতি মোর গেছে থামি
বিস্মরণের ধূসর ধূলায় ধরণী পড়েছে ঢাকা
আমার গানের বাণী খুঁজে মরি কত না দিবসযামি
শুকতারা নেই দুর্যোগ রাতে দূরে জ্বলে মরীচিকা।

তবু মনে হয় পাশে পাশে যেন আজিও চলেছ তুমি
তব হৃদয়ের স্পর্শ জাগিছে রূপে রসে বনভূমি।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পল্লীর উপর তার প্রতিক্রিয়া

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

আজকাল মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে নাটক-নভেল, ধর্মতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাড়া জনকল্যাণকর সুচিন্তিত সন্দর্ভ কদাচিৎ দেখা যায়। এরূপ লেখা যদি বা কালেভদ্রে একটি বেরয়—খুদে হরফের দরুণ তা প'ড়ে দেখবার মত ধৈর্য খুব কম লোকেরই থাকে। তাই মাথা ঘামিয়ে এরূপ কিছু লেখবার প্রবৃত্তি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজের তলায় যারা এতকাল চোখ থাকতেও অন্ধ হ'য়ে ছিল—তাদের চোখ ফুটবে—তাদের মূঢ় মূক ম্লান মুখে ভাষা ফুটবে, তাদের শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক আশায় উচ্ছল হয়ে উঠবে বলেই প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু সহসা সে আশা যেন নিরাশায় পর্যবসিত হতে বসেছে। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল মহাপুরুষই একবাক্যে বলে গেছেন —পল্লীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত প্রাণের উৎস—পল্লীর উন্নতি সাধনেই হবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ।—আর পল্লীবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপরেই যে সেই উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করছে—সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। এতকাল আমাদের দেশবাসীর নিরক্ষরতার জন্য দোষ চাপিয়েছি বিদেশী সরকারের ওপর—তাদের কূটনীতি ও হৃদয়হীনতার কথা প্রচার করেছি আমরা জোর গলায়। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লীর নিরক্ষরতার অন্ধকার যে আরও গভীরতর হ'য়ে উঠছে—সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন কি? কিছুদিন পূর্বে কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় বাংলার শিক্ষা প্রচলনের গোড়ার কথা উপলক্ষে বলেছেন— পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় গ্রামের মাহিষ্য ও সদ্গোপশ্রেণীর লোকেরাই প্রধানতঃ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। বাড়ির কাজকর্ম ক্ষেতখামার দেখাশুনার মধ্যেই তাঁরা নামমাত্র বেতন নিয়ে গ্রামের ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতেন। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ও তখন ছিল অতি অল্প। কবিশেখরের এই উক্তির সঙ্গে আর একটু যোগ ক'রে দিলে পল্লীর বর্তমান উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মূলসূত্রটিও ধরা যায়। পশ্চিমবাংলার পল্লীগ্রামে যে সব উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তথায় শিক্ষকতাকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন ঐ সব শ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরাই অধিক সংখ্যায়। এঁরাও বাড়ির খেয়ে কাজ করার দরুণ অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনেই সন্তুষ্ট থেকে স্ব স্ব গ্রামে শিক্ষাপ্রচারের পবিত্র দায়িত্ব সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে যাঁদের যোগ আছে তাঁরাই একথা জানেন। এখন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কি অবস্থা দাঁড়াবে দেখা যাক। বর্তমানে পরীক্ষায় পাস করা যেরূপ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে—শতেকে গুটিক পাস করছে—তাতে শিক্ষিত ও বিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়ে ভিন্ন অপরের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করা হয়ে পড়ছে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বর্ণজ্ঞানহীন বা সামান্য শিক্ষিত পরিবারের ছেলেরা পরিবেশের প্রতিকূলতাপ্রযুক্ত অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য অসাধারণ মেধাবী বা শিক্ষায় প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন ধনী গৃহস্থের ছেলের কথা ব্যতিক্রমের মধ্যেই ধরতে হবে। এখন গ্রামের মাহিষ্য, সদ্গোপ, গোপ, উগ্রক্ষত্রিয় শ্রেণীর ছেলেরা যদি উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হ'তে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়বে। সরকার বা স্থানীয় স্কুলকর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ যে বেতন দেন তাতে করে দূরদেশের কোনও শিক্ষিত যুবক ঐ সব স্কুলে শিক্ষকতা করতে রাজী হবেন না। কারণ বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে স্বল্পবেতনে, বিশেষ করে যে সব পল্লীতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে গৃহশিক্ষকতা ক'রে দু'পয়সা রোজগার করবারও উপায় নেই—সেরূপ স্থানে দূরাগত কোনও শিক্ষিত যুবক শিক্ষকতা গ্রহণ করবেন—সেরূপ আশা করা যায় না। তারপর গ্রাম্য পরিবেশ এবং অধিকাংশ জায়গার জলহাওয়া যেরূপ দূষিত, তাতে উহা বাইরের শিক্ষিত যুবকের পক্ষে আকর্ষণীয়ও নয়। কাজেই বর্তমান হারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলেরা যদি উত্তীর্ণ হতে থাকে তবে আগামী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই গ্রামের অধিকাংশ বিদ্যালয় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে অচল হয়ে পড়তে বাধ্য এবং তাতে করে গ্রামের শিক্ষাবিস্তার ব্যাহত হবার সম্ভাবনাও পুরা মাত্রায় বিদ্যমান।

শিক্ষাসংকোচে একমাত্র গ্রামের চাষীশ্রেণীই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা নয় —পরন্তু গ্রামে যে সব অসচ্ছল কায়স্থ ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও বাস করছেন তাঁদেরও কম দুর্গতি হবে না। চাষীর ছেলেরা লেখাপড়া না শিখলেও নিজেদের ক্ষেতখামারে গতর খাটিয়ে দুবেলা পেটের ভাতের সংস্থান করতে পারবে—কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত হলে নিতান্তই ভাতে মারা পড়বে। এ ত গেল নিছক গ্রামের ক্ষতির কথা। পরন্তু এই ব্যাপারে সারা দেশের প্রগতিও কিরূপে ব্যাহত হবে তাও চিন্তা করে দেখা দরকার। শহরে যাঁরা দুই তিন পুরুষ যাবৎ উচ্চশিক্ষিত হয়ে বড় চাকুরী করে সচ্ছল ভদ্র জীবন যাপন করছেন—যাঁরা প্রতিটি বিষয়ে এক একজন সুদক্ষ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ক'রে ছেলেমেয়েদের ঠেলে তুলছেন আধুনিক শিক্ষার উত্তুঙ্গ শিখরে—তাঁদের এই সব ছেলে-মেয়েরা স্বাবলম্বন দ্বারা আত্মশক্তি বিকাশের অভাবে পিতৃপিতামহের ন্যায় কর্ম ও ধীশক্তিসম্পন্ন হবে না একথা স্বতঃস্বীকৃত। একটি ভাল কলার ঝাড়ে তিন চার বৎসরের মধ্যেই নতুন উদ্গত চারার তেজ হ্রাস পায় এবং পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই ঝাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের পরিবারেও অল্পাধিক এইরূপ ব্যাপারই যে পরিলক্ষিত হয় তা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা

যায়। তাই বলি, শিক্ষাক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে সমাজে যদি নতুন রক্তের আমদানি না হয় তবে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। গ্রামের সদ্‌গোপশ্রেণীর চাষী পরিবার থেকেই এসেছিলেন বঙ্গ গৌরব স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার। গ্রামের দুঃস্থ কুম্ভকার পরিবার থেকেই এসেছেন স্বনামধন্য ডক্টর রাধাবিনোদ পাল। এইরূপ দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন বাংলার পল্লীঅঞ্চল থেকে। শিক্ষাসংকোচের অজুহাতে সহসা সেই আসার পথ বন্ধ ক'রে দিলে তা সমগ্র দেশের পক্ষেই যে চরম দুর্গতির কারণ হবে—তা ভেবে দেখবার কি আজ কেহই নেই? শিক্ষার মানদণ্ড উন্নত হোক, দেশের লোক শিক্ষার উচ্চতরগ্রামে অধিরোহণ করুক—এ কার না কাম্য? কিন্তু শুধু প্রশ্নপত্রের কঠোরতা সম্পাদনেই কি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে? যদি গোড়া থেকে শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়—যদি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পরিবার প্রতিপালনের মত বেতনও না পান—তবে সেই সব বুভুক্ষু মুমূর্ষু শিক্ষকগণের কাছে জাতি কি আশা করতে পারে? উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকও যেখানে কারখানার নিরক্ষর কুলির চেয়েও অনেকস্থলেই কম বেতনপাচ্ছেন, সেখানে শুধু প্রশ্নপত্রের কঠোরতায় শিক্ষার মানদণ্ড রাতারাতি উন্নত হবে—এ কল্পনা কখনই সুস্থ মস্তিষ্কে স্থান পেতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার বিস্তার এবং সংস্কারের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁদের সবদিক বিবেচনা করে ধীরচিত্তে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিদেশী শাসকেরা যা করে গেছেন আমাদের তার বিপরীতটা করতে হবে—নতুন কিছু করে সস্তায় বাহবা নিতে হবে—এই মনোবৃত্তিই আমাদের অধিকাংশ নেতাকে পেয়ে বসেছে। এতে শ্রেণীস্বার্থ কথঞ্চিৎ সার্থকতাযুক্ত হতে পারে সত্য, তবে তা অনেকক্ষেত্রেই ব্যাপক জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়। রেলের কামরা পরিবর্তনেই এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা অপচয় করে "পুনর্মুষিকো ভবঃ" পন্থা এঁরা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই বলি, কোনও কিছু রদবদল করতে হলে সবিশেষ চিন্তা করে,ছোটবড় সকলের স্বার্থের প্রতি সমান নজর রেখে করা দরকার। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় সামাজিক জীবনের সাফল্যও ত্যাগ, দূরদৃষ্টি এবং কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না।

শিক্ষাক্ষেত্রের আর একটি শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতা হচ্ছে মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলে দেওয়া। এর ফলে পল্লীর দুর্দশা আরও চরমে উঠছে। পূর্বে গ্রামের সচ্ছল গৃহস্থের ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে অল্প কয়েক বৎসরেই শহরের মেডিক্যাল স্কুল থেকে বেরিয়ে গ্রামে গিয়ে বসত। নিজেদের জোতসম্পত্তি দেখাশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে তারা ডাক্তারি করে অজ পল্লীগ্রামে সুচিকিৎসার অভাব অনেকটা মিটাতে পারত। এখন পাশ করা যেরূপ শক্ত হয়ে পড়ছে, তাতে কয়টি পাড়াগাঁয়ের ছেলে ভালভাবে আই-এস-সি পাস করতে পারবে যে তারা ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হবে? ডাক্তারি কলেজে পড়া ডাক্তারি স্কুলে পড়ার চেয়ে অনেক অধিক সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষও বটে। সুতরাং গ্রামের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা আর এই সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হবে না। তারপর সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষকতাকার্যে বাইরের শিক্ষিত যুবক পাওয়া যেরূপ দুষ্কর, ডাক্তারি কলেজে পাসকরা বিদেশী কোনও ভদ্রসন্তান অজানা অজ পল্লীগ্রামে গিয়ে ডাক্তারি ব্যবসা শুরু করবে তা ভাবাও সমভাবে অসম্ভব। সুতরাং পল্লীর চিকিৎসা সংকট আরও সংকটতর হয়েই পড়চে। ডাক্তারি স্কুলে পাস-করা ডাক্তার অল্প পয়সায় কাদাজল বনজঙ্গল ভেঙে দু'পাঁচ ক্রোশ দূরে গিয়েও রোগী দেখতে দ্বিধা করতেন না—ডাক্তারি কলেজে পাস-করা ডাক্তার সেরূপ স্বল্প ফি-তে ঐরূপ কঠোর পরিশ্রম করতে স্বতই পশ্চাৎপদ হবেন—ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। তারপর কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীর রোগ সারানো শুধু কিঞ্চিৎ বেশী পুঁথিগত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে না—মনোযোগ দিয়ে প্রকৃত দরদের সঙ্গে রোগীদেখার এবং স্থানীয় জলহাওয়া ও বংশগত পরিচয় থাকার ওপর চিকিৎসকের সাফল্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। ডাক্তারি স্কুলে পাসকরা অনেক চিকিৎসকই যে কলেজে পাসকরা চিকিৎসকের চাইতে বেশী পসার জমিয়েছেন—বাংলার পল্লী অঞ্চলে এরূপ উদাহরণ নিতান্ত বিরল নয়। এই সব বিষয় তলিয়ে দেখলে বেশ বুঝা যায়—ডাক্তারি স্কুল তুলে দিয়ে সরকার পল্লীস্বাস্থ্যের প্রতি যারপরনাই অবিচারই করেছেন। অগৌণে এই মারাত্মক ভুল সংশোধন করা কর্তব্য। চিকিৎসকের অভাবে গ্রামের কৃষকসম্প্রদায় ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় ও কলেরায় উজাড় হয়ে গেলে অধিক খাদ্য ফলাবে কে?

জাতীয় সরকার সাধারণ শিক্ষার মান বাড়াতে গিয়ে যখন পল্লীর নিরক্ষরতা বেড়ে চলেছে—ডাক্তারি শিক্ষার স্তর উন্নত করতে গিয়ে পল্লীর চিকিৎসা সংকট যখন ঘোরালো হয়ে উঠছে—ঠিক সেই সময় অজস্র অর্থব্যয়ে প্রতিদিন সকালসন্ধ্যা বেতারের বিভিন্ন আসরে পল্লীমঙ্গলের ব্যবস্থা কি নিতান্তই হাস্যকর নয়? তারপর এই ব্যপদেশে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা যে ভাষায় 'মোড়লের পো', 'সামন্ত' প্রভৃতির ভূমিকায় কথোপকথন চালান তা নিতান্ত ন্যাকামি এবং ভাঁড়ামির পরিচায়ক। শালীনতার অভাবও এর মধ্যে পরিস্ফুট। বাংলাদেশের কয়টি পল্লীতে কয়জন চাষী রেডিও শোনেন? মনীষীরা বলেছেন, যাতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক উপকৃত হয়—তা করাই সমীচীন। কিন্তু জাতীয় সরকারের এই ব্যাপারে হাজার হাজার টাকা খরচ একেবারেই ভস্মে ঘি ঢালা নয় কি? মোদ্দা কথা—শ্রেণীস্বার্থই এস্থলে প্রাধান্য পেয়েছে—জনকল্যাণ বা প্রকৃত জনসেবা নয়। পাশ্চাত্যের বেতার বিভাগে এধরণের ব্যবস্থা থাকতে পারে—তবে সে সব দেশের প্রত্যেক চাষীর ঘরেও যে রেডিও আছে; কাজেই তারা এর মাধ্যমে উপকৃত হ'তে পারে। আমাদের স্থান-কালপাত্র বিবেচনা করে নতুন কিছু করা দরকার—অন্যদেশে যা আছে হুবহু তার প্রচলন সবক্ষেত্রে সকল সময় তা সুফলপ্রসূ হয় না।—বরং এই মোটা অঙ্কের যে টাকা বেতার বিভাগের এই খাতে ব্যয়িত হচ্ছে সেটা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিরন্ন শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে বা পানীয় জলের দারুণ অভাবে যে সব গ্রামে কলেরা প্রায়ই মহামারী আকারে দেখা দিচ্ছে সে সব স্থানে নলকূপের ব্যবস্থা করে দিলে তাতে করে দেশের অনেকবেশী সত্যিকারের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হ'ত।

গ্রামাঞ্চলের প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং গ্রামের জনসাধারণের প্রতি প্রকৃত দরদ নিয়ে বাংলার বিধান সভায় যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁরা সর্বদা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রামের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান্ থাকবেন এবং তাঁদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সনিষ্ঠ আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মৃতকল্প বঙ্গপল্লী অচিরে স্বাস্থ্য, শ্রী ও সমৃদ্ধি মণ্ডিত হয়ে উঠবে বলেই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

গতি ও গন্তব্য

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

জগৎ চলমান। অব্যাহত তার গতি। চলার পথে সবাই চল্‌ছে—নিবৃত্তি নেই। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের পরে আবার ঘুরে আস্‌ছে বাল্য। আবার সেই অবুঝ বালকের দাঁড়াবার চেষ্টা—চলার প্রবৃত্তি।

যৌবনোদ্ধত নাতি-নাতনীরা! অতিবৃদ্ধ ঠাকুরদাকে শ্মশানে পুড়িয়ে আস্‌ছে। তারাও ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা হবে। তারাও পুড়বে। যাদের কাঁধে চড়ে তারাও যাবে শ্মশানে, ওই যে সে কচিরা এসেছে। দোল্‌নায় দুল্‌ছে। হাসি-কান্নার দেয়ালা দেখ্‌ছে। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ওই সব কচি-কাঁচারাও একদিন এগিয়ে আস্‌বে। হটিয়ে দেবে সাম্‌নে-ওয়ালাকে – হট্ যাও, হট্ যাও…

জনস্রোতের এই যে অব্যাহত গতি, চিতায় বা কবরে যার সাময়িক বিরাম বা বিশ্রাম ব'লে মনে হয়, তা' নিতান্তই ব্যক্তিগত ঘটনা। সামগ্রিকভাবে শুধু মানুষ কেন, সমস্ত জীবজগৎ কখনই অচল নয়। দলবদ্ধভাবে চঞ্চল জীবনের এই জয়যাত্রা চির বাধাহীন ও বিরামহীন। কিন্তু কোথায় চলেছে তারা?

যে ট্রেণখানা হাওড়া থেকে ছাড়লো, যাবে দিল্লী, মাঝপথে অনেক ষ্টেশনে থেমেছে। অনেক যাত্রীকে নাবিয়ে দিয়েছে। অনেককে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তার গন্তব্য যে দিল্লী, এ খবরটা বর্দ্ধমান-যাত্রী না জানলেও, ড্রাইভার জানে। সে সম্পূর্ণ এক ও অবিভাজ্য। তাই তার গতিও অক্ষুণ্ণ। মাঝপথে চেন্‌টেনে গাড়ী থামাবার চেষ্টা ব্যক্তির প্রয়োজনেই ঘটে। সমষ্টির প্রয়োজনে কখনই নয়।

মানুষের গতি অসম্ভব বেড়ে উঠেছে। কিন্তু তার গন্তব্য কি ঠিক আছে? ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমষ্টির হিসাব? বর্দ্ধমান-যাত্রীর পক্ষে দিল্লী-একস্‌প্রেসের প্রয়োজন বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত। দিল্লী-যাত্রীর কথা সে ভাব্‌তে চায়না। মাঝপথে যারা নাবে, ট্রেনখানা দিল্লী যাবে কি যমালয়ে যাবে, তা' নিয়ে মাথা ঘামায় না। ব্যক্তি যখন নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যায়—তখন সমষ্টির ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক। বর্দ্ধমানের পর একটা কলিশানে ট্রেণখানা ভেঙে চুরমার হলেও, বর্দ্ধমান-যাত্রীর কোনো আপত্তি নেই। ব্যক্তির এই স্বার্থবুদ্ধিই সামগ্রিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। সমষ্টির কল্যাণ-কামনা যতদিন ব্যক্তির চিন্তাধারায় ও কর্ম্মপ্রেরণায় রূপ-পরিগ্রহ না করবে, ততদিন মানব-সভ্যতার কোনো দাবীই প্রতিষ্ঠিত হবে না।

পারাপারের নদীতে যারা খেয়া-নৌকায় চড়ে—তাদের গন্তব্য এক ও নির্দ্দিষ্ট। ওপারের চিরপরিচিত কোনো নির্দ্দিষ্ট ঘাটে সবাই নাবে। তবু ব্যক্তির প্রয়োজনে, খেয়াটা কূলে ভিড়বার আগেই অনেকে লাফিয়ে পড়ে কেন? নোঙর বাঁধবার সবুর সয়না। ফলে, খেয়া যায় ভেসে।

গতি যেখানে উচ্ছৃঙ্খল, গন্তব্য সেখানে দূরবর্ত্তী হ'য়ে পড়ে। সিনেমা-হলে আগুন লাগ্‌লে, দরজাগুলো সব বন্ধ হ'য়ে যায় দর্শকের ভিড়ের চাপে। সবাই এক সঙ্গে বাঁচ্‌তে চেষ্টা করে বলেই এক সঙ্গে পুড়ে মরে। লক্ষ্য বা গন্তব্য এক হ'লেও—সংযম ও শৃঙ্খলা, সর্ব্বোপরি সমষ্টির কল্যাণকামনা, মানবসভ্যতার দিক-নির্দ্দেশক ও গতি-নিয়ামক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাল্‌কী-গাড়ীতে চাকা লাগিয়ে, যেদিন পদচারী বাহকদের মুক্তি-ঘোষণা করা হ'লো সেদিন গাড়ীর গতিও বাড়লো। ঘণ্টার পথ মিনিটের হিসাবে এসে দাঁড়ালো। মানুষের গতিবৃদ্ধি হ'লো অশ্বশক্তির অনুপাতে। ক্রমে যান্ত্রিক-শক্তির আরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। আধুনিক মানুষ চলা-ফেরা করছে বিদ্যুৎ-গতিতে। বাষ্প, পেট্রল ও বিদ্যুৎ সব দিকেই মানুষের গতিবৃদ্ধির সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু, গন্তব্য কি ঠিক আছে? যে ব্যক্তিগত গতি-নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করছে সামগ্রিক গন্তব্যের সাফল্য, তা' কি উপেক্ষিত হচ্ছে না? গন্তব্যের চেয়েও গতির প্রতি মানুষের অনুরাগ ও আকর্ষণ আজ ঢের বেশী। উপায়কেই আজ তারা লক্ষ্য মনে করছে। গতিবৃদ্ধির উন্মাদনায় ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মম্ভরিতা প্রত্যেকটি মানুষকে পেয়ে বসছে।

বিজ্ঞানীরা বল্‌ছে—আণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে, মানব-সভ্যতার গতি নাকি আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে। অসম্ভব নয়। মানুষের গতিবৃদ্ধির জন্যে বিশ্বপ্রকৃতির অকৃপণ দান আজ অতি বিস্ময়কর হ'য়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবী মানুষের ভোগ-লালসা-চরিতার্থের বহু দরজা খুলে গেছে। পিচ্‌ ঢেলে চলার পথকে যতই তৈল-মসৃণ করা হোক্—রবার-টায়ারে গাড়ীর ঝাঁকুনীকে যতই আরামপ্রদ ক'রে তোলা হোক্—গন্তব্য যদি ঠিক না থাকে—সামগ্রিক হিসাবে মানুষের এই গতিবৃদ্ধি ভয়ানক অশুভ লক্ষণ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গন্তব্য অলক্ষ্য ধ্যানের বস্তু। পথে-ঘাটে তাকে পাওয়া যায়না। সে আছে মনের মণি-কোঠায়। তাকে পেতে হবে। যাকে পেয়েছি, সে তো লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি মানুষকে যতই উৎফুল্ল করুক, লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষের পক্ষে তা' হচ্ছে ধ্বংসের সোপান। গতিবৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করা যত সোজা, গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্যরাখা তত সোজা নয়। আহারের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যরক্ষা। আহার-বিলাসীর পক্ষে সে কথা মনে রাখা অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। যে আহার্য্য শুধু রসনাতৃপ্তির জন্যেই সংগৃহীত হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার

খাতিরে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে, তার বিষ-ক্রিয়া অনিবার্য্য। মধুপানে মানুষ মরতে পারে। যেখানে অসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অভাব ঘটে, সেখানে সুখ-সমৃদ্ধি আহরণের চেষ্টার ভিতর দিয়ে আত্মহত্যার অশুভ আকাঙ্ক্ষাই জেগে ওঠে।

নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়েছে দেখ্‌লে কবরেজ ভয় পান। বলেন—দুর্ব্বলের পক্ষে সবলা-নাড়ী নাকি প্রাণঘাতিনী। রোগীর আক্ষেপ বা হস্তপদ-সঞ্চালনের বাহ্য অভিনয় সবলতার পরিচয় নয়। অন্তরের সবলতা কোথায়? অন্তর নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে।

মানুষের সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতার পরিচয়—তার ভয়-বিহ্বলতা। শক্তিমান মানুষ চারিদিকে আজ এত বিভীষিকা দেখ্‌ছে কেন? আণবিক শক্তির অধিকারী হয়েও তো সে সুখে সমাসীন হ'তে পারছে না? বাইরে তার শক্তির মাদকতা যতই প্রকটিত হচ্ছে—ভিতরের সঙ্কোচ, সন্দেহ, বা অবিশ্বাস ততই ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছে। এ বিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ—মানুষ আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট। তার গতি যত বাড়ছে, গন্তব্য ততই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। এ সমস্যার সমাধান কি?

মানব-সভ্যতার কোনো ধারাবাহিকতা নেই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছে। কিন্তু, বর্ত্তমান যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ মানব-সমাজ আজ দেশভেদের গণ্ডী ভেঙে ফেলেছে। পরস্পরকে চিন্‌তে ও বুঝতে চেষ্টা করছে। দূরকে নিকট ও পরকে আপন করবার চেষ্টা চারিদিকেই অনুভূত হচ্ছে। জাগতিক সংস্কৃতির এত বড় একটা মিলন তীর্থ গড়ে-ওঠার সম্ভাবনার কথা অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশ-ভেদের গণ্ডী ডিঙিয়ে আর্য্য সভ্যতার চিন্তাধারা একদিন দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল বটে। যন্ত্র-বিজ্ঞান তো তখন এত উৎকর্ষ-লাভ করেনি? সে সভ্যতার গন্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট থাক্‌লেও গতি ছিল অতি মন্থর। গরুর গাড়ী ও পাল-তোলা জাহাজে দেশে দেশে যে পণ্য-বিনিময় হতো, তার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না। সওদাগরী অর্থ-লালসার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি জনসাধারণকে কঙ্কালসার ক'রে কতিপয়ের ঔদরিক স্ফিতি বাড়িয়ে তুল্‌তো না। বুদ্ধিমানরা দলবদ্ধভাবে নির্বোধকে শাসন ও শোষণের চেষ্টায় মেতে উঠ্‌তেন না। নেহেরুজী সত্যই বলেছেন—'আধুনিক যান্ত্রিক জীবন মনন শক্তির পোষক নহে।' অতীতে আমরা যত চিন্তাশীল অতিমানবের দেখা পেয়েছি, এ যুগে তা' পাইনা কেন? এ যুগের যান্ত্রিক অতি-দানবরা তাঁদের কাছে আয়তনে বিরাটত্ব দাবী করলেও, চারিত্রিক ক্ষুদ্রতায় নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়ছেন।

পশুত্বই মানব-প্রকৃতির মৌলিক উপাদান। তাই মানুষ স্বভাবতই আত্মসুখপরায়ণ। মনন ও অনুশীলনের সাহায্যে দেবত্ব-লাভের চেষ্টাই মানব-ধর্ম্ম। যন্ত্র গতি-বৃদ্ধির সহায়ক হলেও, মন্ত্রের সাহায্যে গন্তব্যকে সুনির্দ্দিষ্ট রাখা মানব-সভ্যতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। নতুবা এ যান্ত্রিকতা ধ্বংস হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ডাক্তারের শাণিত ছুরি মানব-কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। আততায়ীর হাতে পড়লে তার অপব্যবহার ঘটে। ডাক্তার বা আততায়ীর মন্ত্র বা মননের উপরেই নির্ভর করে ছুরি-শানানোর সার্থকতা। আনবিক শক্তি কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা' আজ কেউ বল্‌তে পারছেন না। কেন? তার একমাত্র কারণ—যে ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতার ইমারৎ গড়ে তোলা হচ্ছে তার দৃঢ়তা নেই। চোরা বালির উপর দাঁড়িয়ে আস্ফালন করলে, দুর্দ্দান্ত মহিষও অসহায় হ'য়ে পড়ে। শক্তির মাদকতায় মানুষ আজ যতই ছুটোছুটি করুক—গন্তব্যের দিকে যদি দৃষ্টি না থাকে তাহলে, এ সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য।

সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা ও সঙ্গীতাদি জাতির সংস্কৃতির অন্যতম বাহক। এই সকলের মধ্য দিয়াই এক দেশ অন্য দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করে। অনুবাদের মধ্য দিয়া হইলেও, রুশদেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় আমাদের কতকটা আছে। উহা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমূহের মধ্যে অন্যতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাট্যকলার চর্চ্চায় রুশ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। এ বিষয়ে ইউরোপের সকল জাতিই রুশ-নাট্যশালায় শিক্ষালাভ করাকে পরম কাম্য বলিয়া মনে করে। সম্প্রতি 'রবি-বাসরে'র এক সভায় শান্তিনিকেতনের মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—"আমাদের ইংরাজ জাতির এখন অর্থোপার্জ্জনই সর্ব্বপ্রধান কাম্য। দেশের চারুকলা এবং অভিনয়কলার উন্নতির দিকে গভর্মেন্টের কোন দৃষ্টি নাই। ঐ সকল বিষয়ের জন্য আমাদের এখনও ইটালী ও রুশিয়ার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া রহিয়াছে।"

রুশ দেশের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতির সহিত এদেশবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। সম্প্রতি সোবিয়েৎ সরকার আমাদের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। 'ইণ্ডিয়ান ফাইন আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস সোসাইটি'র উদ্যোগে দিল্লী, বোম্বাই ও কলিকাতায় "সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনী" হইয়া গিয়াছে। গত ২রা এপ্রিল তারিখে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতার লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ ভবনে সোবিয়েৎ চারুকলার এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে সোবিয়েৎ রুশিয়ার খ্যাতনামা শিল্পীদের অঙ্কিত বহু সংখ্যক তৈলচিত্র

ছিল। অনেকগুলি ভাস্কর্য্য নিদর্শন এবং গ্রাফিক্ আর্ট চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সোবিয়েৎ চিত্রশিল্পীগণের প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক জামস্কিন উদ্বোধন দিবসে বলেন—"সোবিয়েৎ শিল্পীরা—প্রতিভাবান চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থপতিরা, ইঁহাদের বিভিন্ন শিল্পগত স্বকীয়তা সত্ত্বেও সৃষ্টি করেন বাস্তবধর্ম্মী কলাকর্ম্ম—যাহা নাগালের বাহিরে নয়, জনগণ যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। জীবনের বাস্তব রূপদান সোবিয়েৎ শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েৎ শিল্পী তাঁহার চরিত্র ও বিষয়বস্তু সোবিয়েৎ ভূমির জনসাধারণের সৃজনাত্মক শ্রমযজ্ঞ হইতেই বাছিয়া লন।" তিনি বলেন যে, "নূতন জীবনের নিরলস কর্ম্মী, শ্রমিক, যৌথচাষী ও বুদ্ধিজীবিগণই হইতেছেন সোবিয়েৎ শিল্পের প্রধান নায়ক।"

'অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ' ভি, এফানফ্

'রণাঙ্গনের চিঠি' এ, লাক্তিওনফ

সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনীর কলিকাতা শাখা কমিটির সভাপতি ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেদিন বলেন—"সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনীতে যে সকল চিত্রকলা স্থান পাইয়াছে তাহাতে সোবিয়েৎ জনগণের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের ছবি রূপায়িত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া সোবিয়েৎ রুশিয়ার বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টার রূপ দর্শকদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে।"

প্রদর্শনীটি ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত খোলা ছিল। প্রতিদিন সহস্র সহস্র শিল্পানুরাগী নরনারী এই অপূর্ব্ব চারুকলা প্রদর্শনী দেখিয়া চমৎকৃত ও প্রশংসায় মুখর হইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। চিত্রগুলির প্রত্যেকটির বিরাটত্ব, নিখুঁত ড্রয়িং, কম্পোজিসন্ এবং ফিনিসিং প্রথমেই চোখে পড়িয়াছে। কি সাবজেক্ট পেণ্টিং, কি ল্যাণ্ডস্কেপ্, উভয় চিত্র সম্বন্ধে একই কথা। ছবির ভিতরের কলার পারস্পেক্টিভ্ ও এরিয়াল পারস্পেক্টিভ্ আমাদের অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছে।

প্রথম হলে সজ্জিত 'লেটার ফ্রম্ দি ফ্রন্ট' (রণাঙ্গনের চিঠি) শিল্পী এ, লাক্তিওনফ্ অঙ্কিত অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই তৈলচিত্রে আলোছায়ার খেলা অনুপম। ডিটেলে, ধূমপায়ী সৈনিকের নিক্ষিপ্ত পায়ের কাছে পোড়া দিয়াশালাই কাঠিটি পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট। ছবির মাপ, ১৪৬'৯ × ১০০ সেন্টিমিটার। হলে মঞ্চের মধ্যস্থলে স্থাপিত শিল্পী ভি, এফানফের "অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ" চিত্রে জনসেবিকাদের সম্মিলনে জে, ভি, স্তালিন ও সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের অন্যান্য নেতৃগণের উপস্থিতি অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে। ছবিখানি যেন জীয়ন্ত বলিয়াই মনে হয়। স্তালিন-পুরস্কার বিজয়ী লোকশিল্পীর এই চিত্রখানি হইতে আমরা অনেকক্ষণ চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই। এই বৃহৎ তৈলচিত্রখানির মাপ ৩০০ × ৪০০ সেন্টিমিটার।

'বিজয়' সুবৃহৎ চিত্রে ধূমাচ্ছন্ন, আংশিক ভাবে বিধ্বস্ত প্রাসাদের সম্মুখে বিজয়ী সৈন্যগণের জয়োল্লাস অতি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করা তাহাদের শ্রম-কৃতিত্বের জন্য খেতাব দিয়াছেন, খবরের কাগজ হইতে ইহা জানিতে পারিয়া যুবক যৌথচাষীর কি উল্লাস !

'খেতাব ঘোষণা' আই, এ, গ্রিম্যুক্

'নূতন ছাত্রীর স্কুলে ভর্ত্তি' এস, এ, গ্রিগরিয়েফ

প্রোশেসন্ ছবিখানি সুবৃহৎ, হাজার হাজার লোকের সমাবেশ থাকিলেও কোনটি অস্পষ্ট নয়। প্রত্যেক বাড়িঘর ও বৃক্ষাদির দূরত্ব সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গতিভঙ্গী এত সুন্দর যে মনে হয়, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যে প্রোশেসন্ দেখিতেছি এখনই উহা মার্চ্চ করিয়া আগাইয়া যাইবে। বক্তৃতারত লেনিনের বৃহৎ চিত্রের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছিল যে, তাঁহার মুখের কথা যেন এখনই আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে। 'নূতন ছাত্রীর স্কুলে ভর্ত্তি' দৃশ্যের ছবিখানি সুন্দর। ছোট মেয়েটির ভঙ্গী, উপস্থিত অন্য সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি, স্কুলের বই ব্যাগ ও হাতের পেন্‌সিলটি পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। 'লেনিন্ সমীপে কৃষক প্রতিনিধিদল' চিত্রখানি শিল্পী ভি সেরফ্ অঙ্কিত একখানি ভাল ছবি। কোনরূপ সাজসজ্জা না থাকিলেও ইহার গ্রুপিং অপূর্ব্ব হইয়াছে। প্রথমে চিত্রের কেন্দ্রের দিকে, বিশেষতঃ লেনিনের মুখেই দৃষ্টি পড়ে। শিল্পী ইউ, তানসিকবায়েফ্ অঙ্কিত 'এক পার্ব্বত্য খামার' চিত্রের পাহাড়ের কোলে শস্যের স্তূপ এবং প্রতিটি ফিগার সুন্দর হইয়াছে। শিল্পী জি, নীস্কি অঙ্কিত 'দালনির সাগর সৈকতে' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। উহার যুদ্ধ জাহাজ সুন্দর হইয়াছে। 'মাও সে তুং ও স্তালিন' চিত্রখানিও উল্লেখযোগ্য। হস্তে প্রস্তরখণ্ড লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। শিল্পী পি, এ, ক্রিফ্‌নোগফ্ এই চিত্রখানি অঙ্কন করিয়াও যে বিজয়ী হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিল্পী আই, এ, গ্রিম্যুক্ অঙ্কিত 'খেতাব ঘোষণা' অতি সুন্দর হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট 'ভূতত্ত্বের ছাত্রী' চিত্রখানি প্রশংসার যোগ্য। এ, জি, ম্যাক্সিমেংকো অঙ্কিত 'এরাই দেশের মালিক' চিত্রে শিল্পী দিগন্তে বিলীন এক যৌথ-খামারের সম্মুখে খামারের চেয়ারম্যান ও তরুণী বিগেড্ নেত্রীকে উপস্থিত

'লেনিন্ সমীপে কৃষক প্রতিনিধিদল' ভি, সেরফ্

'শ্রমের জয়' ভি, এন, সোকলফ

করিয়াছেন। তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন, সগুকর্ষিত কালো মাটির এক ফালি জমির ধারে। ভবিষ্যতের আশায় ভরপুর দুইজনেরই চোখে আরও বেশী ফসলের স্বপ্ন। এই সুন্দর ছবিখানিতে রংএর আতিশয্য মোটে না থাকিলেও, দ্রষ্টার মনকে স্পর্শ করে।

'মাতৃভূমির শিয়রে সূর্য্যোদয়' চিত্রে জে, ভি, স্তালিন একদৃষ্টে পরমপ্রিয় মাতৃভূমির সীমাহীন বিস্তারের দিকে চাহিয়া আছেন। প্রভাতের আলোক তাঁহার মুখে যে অপূর্ব্ব ছায়াপাত করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। স্তালিন-পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী এফ্, সুপিন্ ইহার রচয়িতা। এই তৈলচিত্রখানির মাপ ১৬০ × ২২৫ সেণ্টিমিটার। শিল্পী ইউ, পদ্লিয়াস্কি অঙ্কিত 'চষাক্ষেত' চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। উণ্টানো মাটি হইতে ট্রাক্টরটি পর্য্যন্ত অতুলনীয়। 'পাইন ফরেষ্টের মধ্য দিয়া স্রোতোস্বিনী' চিত্রে জলে গাছের ছায়া অপূর্ব্ব হইয়াছে। 'নদীতে কাঠের ভেলা' চিত্রের আকাশজোড়া বর্ষণোন্মুখ মেঘ ও তাহার একধারে একটু আলো, অতি চমৎকার।

প্রদর্শনীতে প্রাক্‌বিপ্লব যুগের রুশিয়ার বিখ্যাত শিল্পীদের কয়েকখানি চিত্রও ছিল। শিল্পী ভি, মাকভস্কি অঙ্কিত 'নূতন শিক্ষয়িত্রী পড়াবার জন্ম এই প্রথম গ্রামে এসেছেন' চিত্রখানি সুন্দর। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, গ্রামবাসীদের কৌতুহল দৃষ্টি এবং নবাগতা শহুরে তরুণীর বিমর্ষ মুখ অতি দক্ষতার সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে।

শিল্পী ভি, ভেরেস্চাগিন্ অঙ্কিত ভারতবর্ষ সম্পর্কিত কয়েকখানি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অঙ্কিত 'সম্রাট আলতামাসের সমাধি', 'মোগল বাদসাহের মসনদ্ (দেওয়ান-ই-খাস)', 'গিরিনিম্ন রিণী' প্রভৃতি তৈলচিত্রগুলি আমাদের আনন্দদান করিয়াছে। এই স্বর্গত রুশশিল্পী দুই বৎসর (১৮৭৫—১৮৭৭) ভারতে ছিলেন। তিনি ঐ সময় ভারতের সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, নিসর্গদৃশ্য ও সাধারণ মানুষের শতাধিক চিত্র আঁকিয়াছিলেন। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলেও শিল্পী ভেরেস্চাগিন অঙ্কিত বৃহৎ চিত্র আছে।

ছোট বড় কুড়ি বাইশটি ভাস্কর্য্য নিদর্শনও প্রদর্শনীতে ছিল। ভাস্কর ভি, সোকলফ কৃত প্লাশ্‌টারে ঢালাই একজন শ্রমিকের সুবৃহৎ মূর্ত্তি "শ্রম সাফল্য" সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কর্ম্মশেষে শ্রমিকটি নিজের হাত পরিষ্কার করিতেছে। ক্লান্তি নয়, শ্রমের সাফল্যই তাঁহার ঋজু দেহের ভঙ্গীতে ও মুখে অপূর্ব্বভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত, গৃহের দিকেই এখন তাহার মন ধাবিত হইয়াছে। শিল্পী স্তালিন-পুরস্কার বিজয়ী। মূর্ত্তিটির আকার (২১৮ × ৬২ × ৬০)। আজর বৈজানি ভাস্কর এম, রহমানফ্ কৃত ব্রোঞ্জমূর্ত্তি "রাখাল" বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইনিও একজন খ্যাতনামা ভাস্কর ও স্তালিন-পুরস্কারের অধিকারী। ভাস্কর ভি, ইশারেভা কৃত মর্ম্মরমূর্ত্তি "বালক", ভাস্কর এল, কার্দাশোভা নির্ম্মিত রঙীণ

প্লাষ্টারে ঢালাই "প্রথম শ্রেণীর ছাত্র" ও এল, কাবেল কৃত ঐরূপ প্লাষ্টারের "ভবিষ্যতের শ্রমিক" এই তিনটিই সুন্দর হইয়াছে। অন্যান্য সুনির্ব্বাচিত ভাস্কর্য্য নিদর্শনগুলির কোনটিই অপ্রশংসার যোগ্য নহে।

গ্রাফিক আর্টের যে সকল (প্রায় ৬০টি) নিদর্শন প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে কাঠ খোদাই, লিনোগ্রাফ, রঙ্গীণ লিনোগ্রাফ, লিথোগ্রাফ, রঙ্গীণ লিথোগ্রাফ, স্কেচ, পেন্‌সিল ও কাঠকয়লায় অঙ্কিত ছবি, কাগজের উপর জল রং, কার্ডবোর্ডের উপর তৈল রং অঙ্কিত ছবি এবং কয়েকখানি সুন্দর ফটোও ছিল। এগুলিও দর্শকের কম আনন্দ বৰ্দ্ধন করে নাই।

প্রদর্শনীতে মডার্ণ আর্টের কয়েকখানি মাত্র ছবি ছিল। যাঁহারা উহা ভালবাসেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আধুনিক ফরাসী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত কোন ছবি চোখে পড়ে নাই।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে "সোবিয়েৎ চারুকলা প্রদর্শনী" সম্বন্ধে অল্প কথাই বলা হইল। মোট কথা, এই প্রদর্শনী আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। এ শুধু আমার নিজের বা আমার প্রখ্যাত শিল্পী বন্ধুদের মনোভাব নহে। বর্ত্তমানের প্রবীণতম শিল্পাচার্য্য শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনীতে রক্ষিত মন্তব্য-পুস্তকে লিখিয়া আসিয়াছেন—"আমার এই ৭৭ বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে এরূপ চারুকলা প্রদর্শনী আর কখনও দেখি নাই।" তাঁহার মুখেও এই কথাই শুনিয়া আসিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট্-ল

(শ্রীশুক)

অতঃপর ব্রজাঙ্গনা প্রিয়তম কথামৃত
শুনি' তারা আনন্দিত সবে,
সংবাদ শ্রবণে পশি স্মৃতি-পথে জাগরিত
পূর্ব্বকথা, কহিল উদ্ধবে :
হে সৌম্য সৌভাগ্যক্রমে যদুবংশ অরি
দুঃখপ্রদ কংস হত অনুচর সহ,
সর্ব্বার্থ লভিয়া কৃষ্ণ আছেন কুশলে
এ অতি আনন্দবার্ত্তা হে সন্দেশবহ।

কেহ বা কহিল, যে প্রীতি জানাত স্নিগ্ধ হাসিয়া সে শ্যাম রায়,
পুরনারীদের হাসি কটাক্ষে আজো অচ্যুত প্রীতি জানায়?
রতিবিশারদ পুরনারীপ্রিয় তাদের বাক্য ও বিভ্রমে,
অর্চ্চিত হ'য়ে কেন অচ্যুত হবেন না অনুরক্ত ক্রমে!
আমরা গ্রাম্য পুরস্ত্রীদের সভায় কখনও কথান্তরে,
আমাদের কথা উঠিলে কি কভু আমাদের শ্যাম স্মরণ করে?

কেহ বা কহিল মধুরজনীর কথা কি স্মরেন মনের ভুলে,
বৃন্দাবনের রম্যরাসের অপূর্ব্বলীলা স্মৃতির মূলে
আছে কি প্রিয়ের? শুভ্রারজনী কুমুদকুন্দে মোদিত প্রাণ
মঞ্জু নূপুর গুঞ্জন সহ তরুণী কণ্ঠে মধুর গান।

হেথা কবে পুনঃ আসিবেন শ্যাম শোক সন্তাপে সন্তাপিত
তাঁহার শ্রীকর পরশে গাত্রে হইব আবার সঞ্জীবিত?
নব ঘন মেঘে বর্ষণ আনে ইন্দ্র দেবতা আকাশছেয়ে
নব পুলকেতে পুলকিত বন সজল মেঘের পরশ পেয়ে।
কেনই কৃষ্ণ আসিবেন হেথা রাজ্য পেলেন কংসহত,
রাজার কন্যা বিবাহ করিয়া সুহৃদ সঙ্গে রঙ্গে রত।

জানি তাঁর এহেন স্বভাব,
একে কৃষ্ণ ধীর অতি তাহে তিনি শ্রীর পতি
সর্ব্বকাম হইয়াছে লাভ।

আমরা তো বনবাসী, রাজকন্যা সেবাদাসী
সবই আছে, পূর্ণ প্রয়োজন।
অন্য কহে এই মত পরমার্থ কথা যত
সর্ব্বাভীষ্ট হয়েছে পূরণ!

স্বৈরিণী পিঙ্গলা কহে এ হৃদয় কত সহে?
মিথ্যা তার সখা করি আশা;
শ্রীকৃষ্ণ পাবার নয় আশা যে যাবার নয়
তাই যাচি তাঁর ভালবাসা।

উত্তমঃ শ্লোকের সঙ্গে নিভৃত আলাপ রঙ্গে,
ত্যাগ কভু করিতে কি পারি?
অনিচ্ছাসত্বেও হায় অঙ্গ হতে নাহি যায়
শ্রী কখনও কৃষ্ণ-সঙ্গ ছাড়ি।

হেথা নদী গিরিবন বেণুরব গাভীগণ,
সেবিত শ্রীবলরাম সঙ্গে,
হেথা তাঁর পদরেণু হেথায় বাজাত বেণু,
ভুলিতে কি পারি সে ত্রিভঙ্গে?

সে ললিত গতি আর হাস্যলীলা কি উদার,
মধুময় বাক্য দৃষ্টি তাঁর,
চিত্ত সে নিয়েছে হরি কোনমতে প্রাণ ধরি'
আছি শুধু দেখিতে আবার।

হে নাথ হে রমানাথ শতকোটি প্রণিপাত
ব্রজনাথ, হে আর্ত্তিনাশন,
দুঃখময় এ গোকুল তুমি গতি তুমি কূল,
হে গোবিন্দ দাও দরশন।

শক্তিসাধনা ও রামপ্রসাদ

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, সংসারের মাধুর্য্য যেমন সত্য, তার ভীষণতা, তার বিনাশের লীলাও তেমনই সত্য। বৈদিক ঋষিরা যেমন এক দিকে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করে গেছেন, বনস্পতিতে ওষধিতে মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রেছেন, সারা সংসার মধুময় দেখেছেন, তেমনই বিনাশের দেবতা রুদ্রদেবের পূজাও করে গেছেন, সেই রুদ্রদেবের কল্পনায় ভীষণতা ফুটে উঠেচে। বিনাশের দেবতা তিনি, তাঁর জটাজুট অগ্নিশলাকার মত, তাঁর তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্ব বিকম্পিত হয়, গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হ'য়ে ব্যোমপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে থাকে। তাঁর নিশ্বাস জালা-জগতের শ্মশান—তাঁর শূলাগ্রে বিদ্ধ হয়ে দিগ্‌হস্তীরা আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। তাঁর নেত্র শাসনে চিত্ত শ্মশানে কামদেব পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাঁর মুখোচ্চারিত প্রণববাণী প্রলয়ের গান—বিনাশের ঝঞ্ঝা—জগৎকে মুহূর্ত্তে ধূলায় পরিণত ক'রে, তাঁর বিষাণবাদনের তালে তালে মৃত্যুর নৃত্যলীলা হ'তে থাকে।

কালে এই সংহার মূর্ত্তির কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গেল—বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শ, জীবের প্রতি সেই অপার করুণা, সেই বিশ্বের কল্যাণ চিন্তার প্রভাবে রুদ্রদেব আমাদের মনোজ্ঞ শিবসুন্দর হয়ে নূতন ছাঁচে গড়ে উঠলেন। বিশ্বের কষ্ট দূর করবার জন্য ভগবান বুদ্ধ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে ভিক্ষু হয়েছিলেন, রুদ্রদেবের হাতে আমরা ভিক্ষাপাত্র আর কমণ্ডলু দিয়ে তাঁকে দেবভিখারী সাজালেম। তাই বলে জগতের ভীষণতায় কি কিছু হ্রাস হয়েছে? ভীষণতা ত সেই একই ভাবে আমাদের জীবনযাত্রার পথে পথে রয়েচে। এখনও জরামৃত্যু তাদের রক্তলোলুপ লেলিহান জিহ্বা ব্যাদান করে রয়েছে, এখনও ভীষণ মহামারীতে প্রলয়কাণ্ড হয়ে থাকে, এখনও প্রকৃতির ক্রুদ্ধনিশ্বাসে ফুলের বাগান শুকিয়ে যায়। আর শ্মশানের চিতাগ্নি মাতৃহৃদয়ের হাহাকার উপেক্ষা করে পদ্মের কুঁড়ির মত শত শত শিশুকে ধ্বংস করে জলে ওঠে; এখনও কৃষকের কত যত্নের উৎপন্ন সোনার ফসল নির্দ্দয় বন্যার স্রোতে ভেসে যায়, আর আকাশের প্রলয় মেঘের কোল থেকে ভীষণ সর্পের ন্যায় খর বিদ্যুত ছুটে এসে বিশাল রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ভেঙ্গে ফেলে। এখনও অনন্ত নাগের শির কম্পনে দেশব্যাপী ভূমিকম্পে মুহূর্ত্তে শত শত জনপদ, কত মহানগরী বিধ্বস্ত হয়। আর আগ্নেয় পর্ব্বতের লেলিহান অগ্নি আর অগ্নি-প্রবাহে কত সুরম্য হর্ম্মনগরী এক নিঃশেষে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মানবসৃষ্ট ধ্বংসেরও ত আজ সীমা নেই। প্রকৃতির যে তাণ্ডব নৃত্য দেখে বৈদিক ঋষিরা রুদ্র তাণ্ডবের কল্পনা করেছিলেন সেই ভয়ঙ্করী লীলা একই ভাবে আজও আছে, আর চিরকালই থাকবে।

রুদ্রদেবের রুদ্রমূর্ত্তি শিবত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় এখন কাকে সেই আসনে বসাবেন? সর্ব্বত্যাগী দেবভিখারী ভোলানাথের মধ্যে ত আর সে ভীষণতার স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে এই ভীষণতার স্থান পূরণ করেছেন কালীমূর্ত্তি। বৈদিক যুগের কল্পনায় এই মহীয়সী মূর্ত্তির সৃষ্টি হয় নি—কবে কোথা থেকে এই প্রতীকটি আমাদের মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়েচে তা আজ বিচার্য্য নয়, তবে আর্য্য কল্পনা হিন্দুর সাধনা এঁকে এমনই ধ্যানের মূর্ত্তি দিয়েছে যে ইনি একাধারে ভয় ও বরাভয়ের অধিষ্ঠাত্রী রূপে এদেশের সর্ব্বপ্রধান মাতৃদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।

> ঊর্দ্ধ্বে বামে কৃপাণং করকমল তলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
> সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
> জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
> তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য।

হে ত্রিলোকের পাপনাশিনি, হে বিকশিতদশনে মা, যাহারা তোমার চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি এবং দক্ষিণে কালিকে এই নাম জপ করিতে করিতে বামোর্দ্ধ করকমলে কৃপাণ, বাম-নিম্ন করে ছিন্নমুণ্ড, দক্ষিণোর্দ্ধ্ব করে অভয় ও নিম্নকরে বরমুদ্রা ধ্যান করে, তাহাদের নিকট ত্রিলোকের অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

আমাদের এই বাংলাদেশ—বিশেষ ক'রে এই মূর্ত্তির

পূজারী। নিরীহ বাঙ্গালী আমরা আমাদের এ ভীষণতার প্রতি আকর্ষণ কেন? শস্যশ্যামলা বনরাজিনীলা শোভিতা আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যও যত, তার ভীষণতাও তত। আর কোথায় পদ্মা ব্রহ্মপুত্র এমন ভীষণ গর্জ্জনে ধরিত্রী কাঁপিয়ে চলে যায়, কোথায় অজয় দামোদর নির্ম্মমভাবে সারা দেশকে বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে কত নরনারী, কত শিশু, কত ছাগ মহিষকে এক মুহূর্ত্তে ওই করাল বদনা ভীষণা দেবীর কোলে চিরকালের জন্যে ফেলে দিচ্চে; দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রক্তশোষণকারী দারিদ্র্য, নানা রোগ আর কোন দেশের লোককে এত ঘন ঘন পীড়ন করচে? আজ ভীষণ দুর্ভিক্ষ, আবার অপর বৎসর ধরিত্রী সুজলা সুফলা; এক ঋতুতে মেঘের গর্জ্জনে বিদ্যুৎস্ফুরণে কুটীরবাসী শতচ্ছিন্ন কন্থার মধ্যে ভয়ে কাঁপছে, অপর ঋতুতে ফুলের বাগানে মালতী বকুলের আনন্দ ধরে না। একদিকে আমাদের এই বনপ্রকৃতি যেমন খাঁড়া আর নরমুণ্ড নিয়ে আতঙ্কিত করছেন, অপরদিকে তেমনই বিচিত্র আনন্দ ও শোভা সম্পদ নিয়ে যেন আমাদের বর দিচ্ছেন। এক হস্তে উত্তোলিত খড়্গের বিদ্যুতের ঝলক খেলচে, অপর দিকে প্রসারিত করপদ্ম দিয়ে মা আমাদের মাঃ ভৈঃ ইঙ্গিত করছেন।

এই প্রকৃতির লীলা পুরুষই চিনেছেন, তাই এই ধ্বংস তাঁর বুকে স্থান পেয়েছে। তাই অম্লান বদনে এই নৃত্য-লীলায় তিনি অচল অটল স্থির হয়ে আছেন।

প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর গানের সুরে অষ্টাদশ শতাব্দিতে বাংলা দেশের সেই তমসাচ্ছন্ন রজনীতে একমাত্র তিনিই আলোক রশ্মি সম্পাতে পথ নির্দ্দেশ করেছেন। ধন্য তিনি, ধন্য বঙ্গদেশ তাঁকে ক্রোড়ে স্থান দিয়ে, ধন্য বঙ্গবাসী আমরা দুশ বৎসরের সে সুর আজও আমাদের কাণে প্রবেশ ক'রে প্রাণমন মাতিয়ে তুলচে।

সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাবের দ্বিশত বার্ষিকী সম্প্রতি হয়ে গেছে। তাঁর জীবন-কথার বিশেষ কিছু জানা নেই। গঙ্গার উপকূলে হালিসহরে তাঁর বাস ছিল। কলকাতার এক ধনী জমিদার-সেরেস্তায় কাজ করতেন তিনি। জমিদার মহাশয় একদিন হিসাব তদারক করতে মুহুরীর খাতায় দেখেন এই পদটী লেখা রয়েচে—'আমায় দে মা তসীলদারী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী'। জমিদারটি ছিলেন গুণগ্রাহী, রামপ্রসাদকে ৩০৲ টাকা পেন্সন দিয়ে ঘরে গিয়ে শ্যামা সঙ্গীত লিখতে উপদেশ দিলেন। সেই অবধি তিনি সাধন সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সম্ভার বঙ্গবাসীকে বিলিয়ে গেছেন। অনুমান ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন।

জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মরমীয়া গানের সুর যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের রূপে প্রকটিত হয়েছিল, তেমনই সাধক রামপ্রসাদের মাতৃ গানের রেশ একশত বর্ষ পরে মূর্ত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

রামপ্রসাদের গানে, তাঁর মায়ের রূপ বর্ণনায় আমরা যেমন প্রাণের সাড়া পাই, এমনটী আর কোথাও মেলে না। রামপ্রসাদের পর আর বাঙ্গালীর এই মায়ের রূপ এমন করে বাঙ্গালীর চক্ষের সামনে কেহই ধরে দিতে পারে নি।

সেই সাধক শ্রেষ্ঠ 'কালো মেঘ উদয় হ'ল অন্তর অম্বরে' এই বলে গেয়েছেন—

'মা আমার অন্তরে আছ
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা'

বাঙ্গালীর চক্ষে এমনই সহজে তিনি বিশ্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

আমাদের দেশে এই সেদিন নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের জোয়ার যখন একবার দেখা দিয়েছিল তখনকার সেই মাতৃ-চেতনায় রামপ্রসাদের মাতৃমূর্ত্তির আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, ধ্যানস্তিমিতলোচন সাধকের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে বাঙলার প্রাণের স্বরূপ থেকে বাঙ্গালীর মায়ের যে রূপ একদিন দেখা দিয়েছিল—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে
গলিত চিকুর আসব আবেশে
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখ মণ্ডল
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে—

এ কার রূপ? এই তো বাংলার প্রাণের রূপ, এই ত বাঙ্গালীর মায়ের রূপ।

কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নবনীল নীরলতনু রুচিকে,
কে রে,—নব নীল জলধর কায়, হায় হায়—
কে রে নির্জনে বসিয়া নির্মাণ করিল।
পদ, রক্তোৎপল জিনি
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী

বাংলার প্রাণের এই এক রূপ—বাঙ্গালীর গানের এই এক সুর। রামপ্রসাদ বাংলার সাধনায় ও কলায় এই রূপের রূপান্তর ঘটাতে পেরেছিলেন।

বাংলার আর এক সুর, আর এক রূপের সঙ্গে পরিচয় এ দেশে কার না নেই—

থির বিজরী বরণ গৌরী
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।

সেই রূপ সাধনায়, জীবনে আর কাব্যে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন চণ্ডীদাস।

এক বাংলার প্রাণ থেকে এই দুই রসের উৎপত্তি। শাক্ত আর বৈষ্ণব একই প্রাণের রস-বৈচিত্র্যের রূপ-বৈচিত্র্য মাত্র। ইহাদের জন্ম একই প্রাণের স্বরূপে।

ইহারা প্রকৃতই অভেদাত্মক। চণ্ডীদাস বাংলার কান্তভাব নিয়ে তার কাব্যের রূপান্তরে তাকে ভগবত সত্যে উপনীত করেছেন। রামপ্রসাদ বাংলার মাতৃভাব নিয়ে তাকেও কাব্যের সেই শেষ পরিণতিতে পৌছে দিয়েছেন।

প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে,
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।

রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তত্ত্ব করে মনোযন্ত্রে বাদ্য করে যাকে হৃদিপদ্মে নাচিয়ে গেছেন, যে এলোকেশীকে হৃদয়ে ধরে গয়া গঙ্গা কাশী বৃথা মনে করেছেন, ধ্যানাসনে বসে 'মা বিরাজেন সর্বঘটে' 'মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া', এই সব বিশ্বতত্ত্ব তার সুরে রটিয়ে গেছেন; 'সেই তিমিরে তিমিরহরা' ব্রহ্মময়ী মাকে আজ বাংলার অন্ধ আঁখি দেখতে পায় না—তাই না চতুর্দ্দিকে এত হাহাকার, এত আর্ত্তনাদ।

রামপ্রসাদের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলায় সেই তামসরজনীর ভেতরেও স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ কালে দেখতে পাই—প্রসাদের সেই

'চল চল জলদবরণী'

এই 'শোভিত শোণিত ধারা মেঘে সৌদামিনী' বাঙ্গালীর কত দিনের কত যুগের আঁধার অতীতকে আলো করে আছে। বাঙ্গালী একদিন বৌদ্ধ ছিল—কে জানে কত শত বর্ষ ধরে সমগ্র জাতি জগদ্‌গুরু বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘের আশ্রয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে অবস্থান করেছিল। বৌদ্ধধর্মের জীর্ণ খোলস যখন বাংলার দেহচ্যুত হয়ে পড়ে গেল, তার জীবনধারায় তার সাহিত্যের ধারায় যে স্থায়ী প্রভাব না রয়ে গেল তা কে বলতে পারে? তবে বৌদ্ধ সাহিত্য ধারায় বৈষ্ণব শাক্তের মত কোন উজ্জ্বল স্বতন্ত্রধারা আমাদের চোখে পড়ে না। সে শ্রমণ নেই, সে বৌদ্ধ বিহার নেই, সে মঠ নেই—যা কিছু প্রভাব, তা হয়ত মন্দির মসজিদেই আত্মগোপন করে আছে। বর্ণাশ্রমকে সমভূম ক'রে বৌদ্ধ সাম্যমূলক যে সমাজ-বিন্যাস, তার কোন চিহ্নই ত বাংলার কোথাও আজ দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধ সাহিত্যের লুপ্তধারায় 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যগুলি দু' একটী ফেনা মাত্র। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারার শেষ কবি সহদেব চক্রবর্ত্তীর রচনায় বৌদ্ধের 'ধর্মঠাকুর' কেমন করে হিন্দুর দেব দেবীতে রূপান্তরিত করেছেন—তার বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আর সেই রূপান্তরে আমরা বিশেষ ক'রে রামপ্রসাদের মায়ের রূপেরই পূর্বাভাস দেখতে পাই।

'শরণ লইনু, জগতজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর
ভবজলধিতে অনুকূল হইতে, কে আর আছয়ে মোর?
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু, দোষ ক'রে রোষ না করয়ে মায়।
যদি বা রুষিবে পড়িয়া কাঁদিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়।
হরি হর ব্রহ্মা ও পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি,
বিপদ সাগরে—তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি॥

রামপ্রসাদের জীবনকথার বিষয় বেশী কিছু জানা না থাকলেও তাঁর গানে তাঁর সাধন জীবনের সুর সুস্পষ্ট

হ'য়ে ফুটে উঠেছে—বিশ্বের আদি অন্তে সৃষ্টিপ্রবাহে যা কিছু ঘটছে তা সমস্তই বাজীকরের মেয়ে তাঁর শ্যামা মায়ের নাচ। এই বিশ্বনৃত্যই কালী-নৃত্য। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই এই নৃত্যের ছন্দে গ্রথিত। তাঁর কাব্যে ও সাধনায় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী তিনি প্রকাশ পেয়েছেন। প্রতীচ্য প্রভাবের অনেক পূর্বের এই সাধক-কবি বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ঠ রক্ষা ক'রে বিশ্ব সত্য তাঁর কাব্যে গানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার ক'রে গেছেন। সংসার পীড়ায় পীড়িত হয়ে অভিমান করে জগতজননীকে কত ভৎর্সনা করেছেন।

সাধন জীবনের পূর্বার্দ্ধে আমরা দেখতে পাই কালী নামে কত প্রগাঢ় রুচি, কত অনুরাগ তাতে, মায়ের সঙ্গে মান অভিমানের পালায় কি অপরূপ রসের সৃষ্টিই না করেছেন। নাম জপের সঙ্গে ক্রমশঃ সাধক সাধকের ইষ্টরূপের ধ্যানে মগ্ন। এই ধ্যানস্তিমিত নেত্রে কত রূপই দেখছেন—সে রূপের আবার কি অপরূপ প্রকাশ তাঁর কাব্যে গানে ফুটে উঠেচে।

এই সাধন অবস্থায় একটী পদে তিনি মাকে প্রশ্ন করচেন :

এলোকেশী দিগ্‌বসনা
কালী পুরাও মনোবাসনা
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশমাত্র নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া,
বলে দে মা ঠিক ঠিকানা।

কত গভীর তত্ত্ব, অন্তরের সাধনার কত মরমের কথা, সহজ সরল প্রাণস্পর্শী কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন :

১। মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

২। মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখঢাকা বলদের মত।

এ সব পদের তুলনা দুর্লভ, বিশ্বসাহিত্যে খোঁজ কোরলেও মিলবে না।

অদ্বৈতবাদীর যে যুক্তি রামপ্রসাদ তা জানতেন। বেদান্তের তত্ত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একেবারে বিস্মৃত হয় নি।

বল দেখি ভাই কি হয় মলে,
এই বাদানুবাদ ক'রে সকলে ?
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মিলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।

শেষে সাধনার উচ্চতম সীমায় উঠে সাধক গেয়েছেন :

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশেতে রজনী নাই
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কি বা দিবা কি বা সন্ধ্যা
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ; ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি,
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব মনে এই আশা করেছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামা নাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥ *

* এই প্রবন্ধ রচনায় স্বর্গত সাহিত্যরথী দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হইতে বিশেষ ভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

রাজনীতিক শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে তখন কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। সরকারী চাকুরেরা চাকরীর মোহ ত্যাগ করে, উকিল-ব্যারিস্টাররা আদালত ছেড়ে, ছাত্ররা স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে দলে দলে তখন অসহযোগের নীতি অনুসরণ করছে। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

দেশের যখন এমনি অবস্থা, বাঙ্গলার দরদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নিজেকে আর এক মুহূর্ত স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য সেবা ছেড়ে, দেশের মুক্তির জন্য রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বাঙ্গলা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধুর সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রিকায় লেখা দেওয়া নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ইতিপূর্বেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এবার দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেশবন্ধুও শরৎচন্দ্রের ন্যায় একজন খ্যাতনামা প্রতিভাবান সাহিত্যিককে সহকর্মী পেয়ে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। শরৎচন্দ্র এইভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতেই কংগ্রেসে যোগদান ক'রে, কংগ্রেসের সকল-প্রকার গঠনমূলক কাজের মধ্যেই আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করে তাঁর সহকর্মী ও স্নেহভাজন বন্ধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এক জায়গায় বলেছেন—

"মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময় যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—'কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে।' শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—'আমি কিন্তু কিছু দিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি'।"

শরৎচন্দ্র সাহিত্য ছেড়ে যখন রাজনীতিতে যোগদান করলেন সেই সময় তাঁর কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু তাঁকে রাজনীতিতে নামতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁরা তখন বলেছিলেন যে, একাজ তিনি ভাল করেন নি। তিনি একজন সাহিত্যিক, সাহিত্য ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি।

এর উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন তাঁদের বলেছিলেন—"এটা তোমাদের ভুল; রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীরই অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। বিশেষতঃ আমাদের দেশ হলো পরাধীন দেশ, এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন, মুক্তির আন্দোলন! এ আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদেরই ত সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই। তোমাদের নির্দেশমত সাহিত্যিকরা যদি বলেন—'আমি সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না, তাহলে উকিল-ব্যারিষ্টাররাও তো বলতে পারেন—আমরা আইন ব্যবসায়ী, মামলা-মোকর্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে—আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাব না; তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা শুনি'?"

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক ও অপরাপর বন্ধুদের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করেই তখন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য রাজনীতির এই দুঃখ-বরণের পথে পা দিয়েছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সুরু থেকেই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং বহু বৎসর পর্যন্ত এই কংগ্রেসের সহিতই যুক্ত ছিলেন।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন যখন পুরা উদ্যমে চলতে থাকে, ঠিক সেই সময়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতভ্রমণে আসেন। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালাচ্ছিল বলে, দেশবাসীকে সরকারের সঙ্গে যুবরাজ-সম্বর্ধনায় সহযোগিতা করতে নিষেধ করল। কংগ্রেস নির্দেশ দিল—যুবরাজের ভারত আগমনের দিন দেশবাসী যেন বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য দোকানপাট, হাটবাজার, যানবাহন সবকিছু বন্ধ করে হরতাল পালন করে। এ ছাড়া যুবরাজ ভারতের যেখানে যে দিন যাবেন, সেখানেও যেন সেদিন হরতাল পালন করা হয়।

যুবরাজ যেদিন কলকাতায় এলেন, বাঙ্গলা দেশেও সেদিন পূর্ণ হরতাল পালন করা হ'ল। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রও সেদিন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত এই হরতাল দিবস পালন করলেন। সেদিনকার এই হরতাল-পালনের কথা উল্লেখ করে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "স্মৃতিকথা" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

"১৯২১ সাল। মাসটা ঠিক মনে পড়ছে না। আমি তখন বিশেষ কোন কারণে শিবপুরে বাস করছি। প্রিন্স অব ওয়েলসের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে হরতাল হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের আমলের সেই প্রথম হরতাল, তার পূর্বে শান্ত সংযত ভিক্টোরিয়া যুগ নির্বিবাদে অতিবাহিত হয়েছে। পরিপূর্ণ হরতাল—যান-বাহন, হাট-বাজার, দোকান-পশার সমস্ত বন্ধ।

শরৎচন্দ্রের সহিত সে সময়ে প্রতিদিনই মিলিত হতাম। সেই হরতালের দিনে সকাল আটটা সাড়ে আটটা আন্দাজ নগ্নপদে শরৎচন্দ্র আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। বললেন, 'উপীন, শুনছি, হাওড়া স্টেশনে ভারি দুরবস্থা, ট্রেনে ট্রেনে বহুলোক না জেনে এসে পড়েছে। শিশুরা দুধ পাচ্ছে না। যাবে? যদি কোন কাজে লাগতে পারি?'

দ্বিরুক্তি করলাম না। 'চল' ব'লে খালি পায়ে শরতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। শিবপুর থেকে হাওড়া স্টেশন সুদীর্ঘ পথ, দুজনে নানাবিধ গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলাম।" (স্মৃতি কথা—১৩৯ পৃঃ)

শরৎচন্দ্র এই হরতাল পালনকে কতখানি শ্রদ্ধার সহিত যে গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর এই জুতো পর্যন্ত পায়ে না দেওয়া থেকেই সহজে অনুমান করা যেতে পারে।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অপর নাম ছিল সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহ আবার ছিল সম্পূর্ণরূপে এক অহিংস সংগ্রাম। তাই মহাত্মার এই অভিনব সংগ্রাম আরম্ভ হ'লে, এই সংগ্রামের সুরু থেকেই কংগ্রেসের অনেক বড় বড় নেতাও সত্যাগ্রহের দ্বারাই স্বাধীনতা আসবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কংগ্রেসে যোগদান করে প্রথম থেকেই মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস সংগ্রামের মূল সুরটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এই সংগ্রামকে তিনি একদিকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি এই সংগ্রামের মূলতত্ত্ব প্রচারেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই মহাত্মা গান্ধী যখন রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ হলেন, শরৎচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধুর "নারায়ণ" পত্রিকায় "মহাত্মাজী" নামে এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন। মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই। এমন করিয়া চাহিয়াছেন, যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়।...অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া-নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই। তাই তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন।

তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠচিত্তে বলি দিতেই এই ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতাকলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ, কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে।

...তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্র শস্ত্র, বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন, অভিযোগ-অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই এবং সহানুভূতিই যখন জীবনের সকল সুখ দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন।"

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের উপর শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল অসীম। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাঁও কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার পর গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং এরপর থেকে দেশের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে তাঁর শক্তি নিয়োগ করবেন একথা ঘোষণা করেন। এইভাবে গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করলে, শরৎচন্দ্র সেই সময় "মহাত্মার পদত্যাগ" নামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"কিছুদিন যাবৎ এমন একটা সম্ভাবনা বাতাসে ভাসিতেছিল, মহাত্মা রাজনীতির প্রবাহ হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া স্বীয় বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট কর্ম্মশক্তি ও একাগ্রচিত্ত ভারতের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিবেন। তাহাই হইয়াছে। দেখা গেল জাতীয় মহাসমিতির সভামণ্ডপে বহু কর্ম্মী, বহু ভক্ত, বহু বন্ধুজনের আবেদন নিবেদন, অনুনয় বিনয় তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। পারার কথাও নয়। বহুবার বহু বিষয়েই প্রমাণিত হইয়াছে, অশ্রুধারার প্রবলতা দিয়া কোনদিন মহাত্মাজীকে বিচলিত করা যায় না।......

একদিন কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন অভিযোগ-অনুযোগের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিত। বঙ্গ-বিভেদের দিনেও জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গকে তাহার অঙ্গ বলিয়া ভাবিতে জানিত না, বাঙ্গলার প্রশ্ন ছিল শুধু বাঙ্গলারই, বোম্বাই আমেদাবাদ বাঙ্গালীকে এক টাকার কাপড় চার টাকায় বিক্রী করিত, কংগ্রেস নিরূপায় বিস্মিত চক্ষে শুধু চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন, অক্ষম-জাতীয় মহাসমিতিকে নিজের অদম্য, অকপট বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিলেন মহাত্মা, দিলেন শক্তি, সঞ্চারিত করিলেন প্রাণ, তাঁহার এই দানই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিব।"

গান্ধীজীর পরেই নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপরই শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল সব চেয়ে বেশি। একজন বিশ্বস্ত সৈনিকের ন্যায়ই তিনি তাঁর অধীনে থেকে দেশের কাজ করে যেতেন। এমন কি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু জেলে গেলেও জেলের বাইরে তাঁর যে সব সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিশে দেশবন্ধুর আরব্ধ কাজই করে যেতেন।

দেশবন্ধু জেল থেকে মুক্তিলাভ করলে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়, শরৎচন্দ্রও তার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। সেদিন সভায় যে অভিনন্দন পত্রটি পঠিত হয়েছিল, সেটি শরৎচন্দ্রই রচনা করেছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়ায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়, দেশবন্ধু তাতে সভাপতি ছিলেন। এই সময় শরৎচন্দ্রও দেশবন্ধুর সঙ্গে

গিয়ে গয়া কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। এই গয়া কংগ্রেসেই আইন সভায় যোগদানের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার সঙ্গে দেশবন্ধুর মতভেদ হয়। দেশবন্ধু তাঁর সভাপতির অভিভাষণে সেদিন বলেছিলেন—অসহযোগকারীদের আইন সভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। অসহযোগকারীরা আইন সভায় প্রবেশ করলে অসহযোগ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, এ ধারণা ভুল। তাঁরা যদি আইন সভার সদস্য হতে পারেন, তাতে বরং অসহযোগ কাজেরই বেশি সুবিধা হবে। কারণ তাঁরা তখন ভিতরে থেকে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারবেন।

রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে একদল কিন্তু দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন এবং এই দলই সংখ্যায় বেশি থাকায় দেশবন্ধুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তখন দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন এবং পরে তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই "স্বরাজ্যদল" নামে আলাদা একটা দল গঠন করলেন। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু দেশবন্ধুর দলে রইলেন।

কংগ্রেসের বৃহত্তর অংশই দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। মাত্র স্বল্প কয়েকজন তাঁর পক্ষে। এই সময় দেশের সংবাদপত্রগুলোও দিনের পর দিন দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রচার করে যেতে লাগল। দেশবন্ধুর এই সঙ্কটকালে শরৎচন্দ্র তাঁর একান্ত বন্ধুর মতই পাশে পাশে থেকে তাঁর কাজ করতেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র তাঁর "স্মৃতিকথায়" লিখেছেন—

"গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গালা দেশে ইংরাজী বাঙ্গলা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তব-গান সুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি তাহার আর তুলনা নাই।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম—গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে ওঠে ত তবে থাক।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন—এ ঠিক নয়, শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে।...

এ কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।"

দেশবন্ধু অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র দেশ ঘুরে তাঁর স্বরাজ্যদলের আদর্শ অর্থাৎ আইন সভায় প্রবেশের কথা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলে, ক্রমে অনেকেই তাঁকে সমর্থন করতে থাকেন, এমন কি সেদিন গয়া কংগ্রেসে যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেও আইন সভায় প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে পুনরায় চিন্তা করতে থাকেন। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে যখন এইরূপ অবস্থা, তখন এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হল। এই অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতি হলেন। রাজাগোপালাচারীর দল ইতিপূর্বে জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলে, অসহযোগকারীরা প্রয়োজন বুঝলে দেশের মঙ্গলের জন্য আইন সভাতেও প্রবেশ করতে পারেন, গান্ধীজী একথা তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন দিল্লী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে, অহিংস অসহযোগ নীতিতে আস্থাবান থেকেও যে সকল কংগ্রেস কর্মী আইন সভায় প্রবেশ, ধর্ম বা বিবেকবিরুদ্ধ মনে না করেন, কংগ্রেস তাঁদের আইন সভার নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবার ও নির্বাচনে ভোট দেবার স্বাধীনতা মঞ্জুর করছে এবং আইন সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য বন্ধ রাখছে।

কংগ্রেসের এই দিল্লী অধিবেশনেও শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন দিল্লী কংগ্রেসে দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের এই জয় দেখে শরৎচন্দ্র সভার একপ্রান্তে বসে দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে কথা ভেবেছিলেন, তিনি তাঁর "দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী" প্রবন্ধে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন! তিনি লিখেছেন—"এই ভারতবর্ষের এত দেশ এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এত বড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ-করা-জীবন আর কই? অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাঙ্গলা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রায় তুল্য কথা। কথাটি যে কত বড় সত্য, এই সভার একান্তে বসিয়া আমার বহুবারই তাহা মনে পড়িতেছে।"

বরিশালে যেবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয় শরৎচন্দ্র সেবারও দেশবন্ধুর সঙ্গে বরিশালে যান। বরিশালে যাওয়ার পথে সেদিন স্টীমারে গভীর রাত্রিতে শয্যা ছেড়ে তাঁরা অন্ধকারে ডেকের উপর বসে রাজনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা কালে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে যে সব কথা বলেছিলেন, তা থেকে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতামতও অনেক জানা যায়। তাঁদের সেদিনের এই কথোপকথন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর "স্মৃতি কথায়" যা লিখেছেন, নিম্নে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল।—

"......জিজ্ঞাসা করিলেম, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম—আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

কেন করেন না ?

বোধ হয় অনেক দিন চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটী লোকের পাঁচ কোটী লোকও যদি সুতো কাটে, ত ষাট্ কোটী টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম, পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটা বাড়ী তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হতে পারে। হয় আপনি বিশ্বাস করেন ?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি,—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারি ইচ্ছে যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন। বলিলেন, আপনি হিন্দু-মুসলমান ইউনিটী বিশ্বাস করেন !

বলিলাম, না।

দেশবন্ধু কহিলেন, কিন্তু এছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারেন ? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে। আর দশ বছর পরে কি হবে বলুন ত ?

······কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিষ নয়। তা'হলে চার কোটী ইংরাজ দেড়শ কোটী মানুষের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে দশের মধ্যে এদের একটা মর্য্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর, সামাজিক অবিচার চলে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন, ও দিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।······

প্রশ্ন করিলেন—আপনি আমাদের অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত ?

বলিলাম, না। অহিংস, সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।······ইতিমধ্যে যতটুকু শক্তি, আপনার কাজ করে দিই···

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি ?

······এদের অনেককে আমি যথার্থ ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তাছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিষ যাবে না, তখন আরও স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি শরৎবাবু।"

অনেকদিন পরে এই রিভোলিউসনারীদের কথা নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আর একবার যে কথা হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও তিনি "স্মৃতি কথায়" লিখেছেন—

"দেশের মধ্যে রেভোলিউসনারী ও গুপ্ত সমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলিস্বরূপ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল।···এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙ্গলায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেও না পারো ত অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থ চিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি—ইত্যাদি।" কিন্তু আমার "যদি" কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, "যদি"তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে "assuming but not admitting" করে এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, "যদি" বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।

বলা বাহুল্য, আমি রাজি হইতে পারি নাই এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর একজন বড় সমর্থক এবং অন্যতম প্রধান সহকর্মী হলেও তিনি দেশবন্ধুর সকল নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে মানতেন না। তিনি তাঁহার নিজের অভিমত জানাতে কখনো দ্বিধা করতেন না। তাহলেও শরৎচন্দ্র—একজন সৈনিক যেমন সেনাপতির আদেশ মনঃপূত না হলেও মেনে চলে, তেমনি দেশের জন্যই দেশবন্ধুর প্রায় সকল নির্দেশই মেনে চলতেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি তাই বলেছিলেন—"আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া ? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপুত হইত ? হায় রে রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে।"

দেশবন্ধুর ন্যায় শরৎচন্দ্র নিজেও বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন না। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ রক্ষিত রায়কে লিখিত এক পত্রে শরৎচন্দ্র একবার এই বিপ্লববাদের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

"···একথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, বিপ্লব ও বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে ? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে ? বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো ? বিপ্লবেরা

মাঝে আছে Class war, বিপ্লবের মাঝে আছে Civil war :— আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক্‌, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।"

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙ্গলাদেশে যাঁরা দেশবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেই ছিল শরৎচন্দ্রের বেশি ঘনিষ্ঠতা। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন বন্ধু। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর এই স্নেহ ও বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও অটুট ছিল। অপরদিকে সুভাষচন্দ্রও শরৎচন্দ্রকে একজন খাঁটি দেশকর্মী এবং বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হিসাবেও যার পর নাই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি দেশের কাজে, আবার অনেক সময়ে অমনিও শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তখন উভয়ের মধ্যে দেশের বহু সমস্যা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হ'ত।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাঙ্গলাদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে দুটা দলের সৃষ্টি হয়। এই দলের একদিকে থাকেন জে. এম. সেনগুপ্ত, অপরদিকে থাকেন সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক সময় অপমানও সহ্য করতে হয়েছিল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লায় যুবসম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাতে শরৎচন্দ্রও যোগদান করেছিলেন। কুমিল্লা যাওয়ার পথে সুভাষচন্দ্রের বিরোধীদল শরৎচন্দ্রের প্রতি এক জায়গায় অসম্মান প্রদর্শন করেন। শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়কে লিখিত একটি পত্রে এ সম্পর্কে উল্লেখ করে তখন বলেছিলেন—

"মণ্টু,—দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম, শেম, বললে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি-জ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়,— ও মায়া। যাই হোক্‌ রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।... জয় হোক্‌ কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক্‌ বার ঘোড়ার গাড়ীর।" (অনামী)

আর একবার কলকাতা টাউন হলে সুভাষ-দলের প্রাধান্যে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হ'লে, সুভাষচন্দ্রের বিরোধীদল সে সভা পণ্ড করে দেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যে রাজনৈতিক দলাদলিরও উর্দ্ধে এ কথা তাঁরা সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন। যেহেতু শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করেন এবং ঐদিনকার সভায় সুভাষচন্দ্রের দলই নেতৃত্ব করছেন, সেই কারণেই ঐদিন তাঁরা শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা সভা আরম্ভ হবার আগে হিজলী জেলের দুজন শহীদের মৃত্যুবার্ষিকী হিসাবে ঐ টাউনহলেই সভা আরম্ভ করেন। ঐ তারিখেই নাকি তাঁদের মৃত্যুদিন ছিল।

শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা সভা সেদিন আর হয়ে উঠল না ; পরে আর একদিন হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র পরবর্তী-জীবনে কংগ্রেস ছেড়ে দিলেও সুভাষচন্দ্রের উপর থেকে তাঁর স্নেহ কোন দিনই একটুও কমেনি। সুভাষচন্দ্রের দেশের জন্য অকুণ্ঠত্যাগ ও নিষ্ঠাই শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। হয়ত তিনি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তাঁর পরবর্তী-জীবনে রাষ্ট্রপতি ও নেতাজীর সম্ভাবনার অঙ্কুরও লক্ষ্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর এই স্নেহভাজন বন্ধুটিকে নেতাজী ত দূরের কথা, কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবেও দেখে যেতে পারেন নি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই বৎসরই সুভাষচন্দ্র প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন রোগ শয্যায়, সুভাষচন্দ্র তখন স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন। তিনি যখন দেশে ফেরেন ঠিক সেই সময়েই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সুভাষচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—

"করাচীতে অবতরণ করিবামাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোক সংবাদ পাইলাম। জানিতাম কিছুদিন হইতেই তিনি অসুস্থ। কিন্তু এমন কথা ভাবি নাই, তিনি এতশীঘ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন। শেষবার যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন তাঁহাকে অতিশয় প্রফুল্ল ও প্রাণময় দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার অন্তিমকাল এত নিকটে ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।...

কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইয়াই যে আমরা শোকাভিভূত হইয়াছি তাহা নহে, শোকপ্রকাশের অপর কারণ—তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তি স্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাঙ্গলার কংগ্রেসে যোগদান করেন।...তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল, তাহা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না।"

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের বুকের উপর দিয়া সর্পিল বিরাট সড়ক রচনা করিয়াছিলেন শের শাহ—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম লেখা আছে। কিন্তু যাহারা রুধির স্রাবে, কোদাল ঝুড়িতে মাটি কাটিয়া বহিয়াছিল তাহাদের কথা কোথায়ও লেখা নাই। সে কথা কেহ জানে না, ইতিহাস ধরিয়া রাখিয়াছে সম্রাটের খেয়াল-খুশীর ফর্দ্দ ও তালিকা, জনগণের ইতিহাস কেহ লিখে নাই—তাহাদের সুখ-দুঃখ সমাজ-সংসার রহিয়া গিয়াছে অজ্ঞাত—

এই রাস্তা দিয়া চলিত ঘোড়ার ডাক,—পাশে পাশে ছিল গ্রাম, সেই গ্রামের দুঃখ বেদনা, উৎসব আনন্দ ধীরে ধীরে কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে,—কালপ্রবাহের মাঝে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু সৈকতরেখা হয়ত বা বিলীন হয় নাই, ঐতিহাসিকের গবেষণাগারে বন্দী হইয়া রহিয়া গিয়াছে কৌতূহলীর জন্যে, জনস্রোত চলিয়াছে উদাসীন—সে খবর তাহারা রাখে না—

ঐ রাস্তার পাশে একটি গ্রাম, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গয়লা, ধোপা, নাপিত, বাগ্দী, বাউরী মিশ্রিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের পরে বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে শের শাহের কীর্ত্তি, মাঠের মাঝে কদাচিৎ তাল বট অশ্বত্থ গাছ,—উচ্চাবচ বন্ধুর মাঠ—বিশুষ্ক উষর—মাঠের প্রান্তে বন, তাহার পর আবার মাঠ। তাহার পরেও চলিয়াছে সড়ক—

আজ তাহার আশে পাশে কলিয়ারী ও কারখানার গগনচুম্বী চিমনি আকাশকে ধূম-মলিন করিয়া তুলে। বাঁশী বাজে,—পাটকল, তুলার কল, লোহার কারখানা আরও কত কি, মেষপালের মত মানুষ ছুটে যন্ত্রের আহ্বানে, ফিরিয়া আসে,—নির্জ্জন প্রান্তর হইয়াছে জনপদ, জনপদ হইয়াছে ভগ্নস্তূপ,—কালের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে চলিয়াছে পৃথিবীর তেপান্তরে মানুষের নিরুদ্দেশ যাত্রা, উদ্দেশ্যহীন—আদিম মানুষের মত ভোগের উৎসাহে ছুটিয়াছে, সহজ প্রকৃতির উপরে শিক্ষা ও সভ্যতার রঙীণ প্রলেপ দিয়া—

গ্রামের নাম গোপালপুর। গ্রামের প্রান্তে তালবন-ঘেরা বিরাট দিঘীতে সলজ্জ গৃহবধূগণ জল আনিতে যায়, ঘোমটার ফাঁকে চাহিয়া দেখে দূর-বনান্তের কোলে অস্তায়মান সূর্য্যাস্তের রঙীণ সমারোহ। ঘাটে বসিয়া আলোচনা চলে সিপাহীদের কথা, সিপাহীরা ইংরাজদের সহিত লড়িয়াছে, লড়িতেছে,—নীলকুঠিয়াল সাহেব সস্ত্রীক কোথায় পালাইয়াছেন, লাঠিয়াল কালী বাগ্দী ও নীলমণি বাউরীর কঠোর পাহারা তাহাদিগকে আটকাইতে পারে নাই। ঠেঙ্গাড়ে সহদেব কুর্ম্মী কোথায় নাকি গিয়াছে সাহেবের দেশদ্রোহী সরকারকে শেষ করিতে—সভয়ে আলোচনা চলে ঘাটে বধূগণের মাঝে,—মাঠে কৃষকগণের মাঝে,—চণ্ডীমণ্ডপে ঠাকুরদের মাঝে, রাত্রে মহুয়া-মদ্য পানের পরে বাউরী-কুর্ম্মী পাড়ায়—

অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা। ভগবতী চাটুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপের পাশার আড্ডা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। সারদা মল্লিক মহাশয়, মতি ভট্টাচার্য্য গৃহে ফিরিতেছিলেন। ঘরে ঘরে তুলসী তলায় রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলিয়াছে, শাঁখের শব্দ উঠিয়াছে, শিবমন্দিরে আরতি আরম্ভ হয় নাই। গ্রামের মাঝে ছায়াঘন অন্ধকার, মাঠে তখনও গোধূলির দীপ্তি। মতি ঠাকুর মশায় দ্রুত ফিরিতেছিলেন—আহ্নিক করিয়া ঠাকুরকে বৈকালী দিতে হইবে, তাহার পর আছে নিত্যকার ভাগবত না হয় রামায়ণ পাঠ।

পথের পাশেই পাড়ার শেষ প্রান্তে আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ী,—সে একাই থাকে,—অবিবাহিত ভদ্রলোক গান রচনা করে, আপন মনে গায়। স্বহস্তে রাঁধিয়া খায়, সামান্য ভূসম্পত্তি ও ফলমূল বেচিয়া এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া একপেট চলিয়া যায়—অর্থাভাবে কন্যাপণ দিতে না পারায় তাহার বিবাহ হয় নাই—

মতি ভট্টাচার্য্য যাইতে যাইতে একটা হৈ হৈ গোলমাল শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীতে

মশাল জ্বালাইয়া, লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া কাহারা যেন হল্লা করিতেছে। মতি ঠাকুর কৌতূহলী হইয়া আগাইয়া গেলেন—ডাকাতি হইবে আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ী! এমনি সন্ধ্যায়?

উঠানে আসিয়া দেখেন, সদ্গোপ চাষী পাড়ার যুবকগণসহ কয়েকজন বাগ্‌দী কুর্ম্মী যুবক খড়ের মশাল জ্বালাইয়া চীৎকার করিতেছে,—চোর চোর—

ঘর একখানি, ঠাকুর বারান্দায় রাঁধিয়া খায়, ঘরে শোয়। সকলে গৃহের চারিপাশ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, পশ্চাতের দরজা বন্ধ। মশালের আলোয় মতি ঠাকুর দেখিলেন—কুলুপ ঝুলিতেছে। তিনি বলিলেন,—কি হে, কুলুপ ঝুলছে তা চোর কোথায়?

—আজ্ঞে হ ঠাকুর মশায়, ঘরের মাঝে সেঁধিয়ে বসে আছে।

—পাগল আর কি, চোরের কাজ নেই, আদাড়ীর ঘরে ঢুকেছে চুরি করতে—

ঘরের পিছনে আম কাঁঠালের বন, তাহার মাঝে ঝোপঝাড়। মতি ঠাকুর ঘুরিয়া ঘরের পিছনে যাইয়া দেখেন, পিছনের দরজাও বন্ধ। বনের পিছনের প্রান্তরটা শুক্লা সপ্তমীর নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে স্বল্পালোকিত। মতি ঠাকুর বলিলেন,—পাগলের দল, ঘরে কুলুপ দেওয়া, দরজা বন্ধ, চোর কোথা থেকে এল? আর জায়গা না পেয়ে এল আদাড়ীর ঘরে—ছিঃ—

ঘরের পিছনে যাহারা পাহারায় নিযুক্ত ছিল তারা অকস্মাৎ যেন বুঝিল যে ব্যাপারটা একটু হাস্যকরই হইয়াছে এবং সকলে একসঙ্গে উঠানে আসিয়া জটলা করিতে লাগিল। মতি ঠাকুর বলিলেন,—এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কার রে?

ভরত বাগ্‌দী বলিল,—হ্যাঁ, ঠাকুর মশায়, যেতে যেতে শুনৃমু, চুকচুক ক'রতে লাগছে, তাই ডেকে আনমু সকলকে—

জনতার প্রান্ত হইতে কে যেন বলিল,—শেয়াল—শেয়াল—একটা হাসির রোল উঠিল। কে যেন প্রশ্ন করিল,—মশায় কোথায় বটেক?

মশালের আলোকগুলি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, উঠানে আলো ছায়ার মাঝে লোকগুলি আকস্মিক-ভাবে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বিমূঢ়ের মত! কেন সকলে আসিয়াছে, কেনই বা সকলে হঠাৎ নীরব কিছুই বোঝা গেল না,—লোকগুলির ছায়া উঠানে নাচিয়া ফিরিতেছে—

জনতার প্রান্তে রাঘব মণ্ডল দাঁড়াইয়াছিল একান্তই বিষণ্ণ মনে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল ঐ—ঐ—

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সকলে দেখিল, স্বল্পালোকিত প্রান্তরের উপর দিয়া একটী শুভ্রবেশা নারীমূর্ত্তি দ্রুত ওপারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল।

—কি কি?

—মেয়েমানুষ,—ঐ ঐ—

কথা বলিতে না বলিতে ছায়ামূর্ত্তিটি বনের মাঝে অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আর লাভ নাই। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল মাত্র—

মতি ঠাকুর বলিলেন,—তা চোর কোথায়? ও ত যেন মেয়েমানুষ—

লালমোহন চাষী কহিল,—ঘরের মাঝেই ছিল, পালিয়ে গেল—

মতি ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—চল্ ত দেখি পিছনের দরজা। সকলে আসিয়া পিছনের দরজা দেখিল কিন্তু সেটা পূর্ব্ববৎ দেওয়াই রহিয়াছে। মতি ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন,—তবে কি বল? কেন হল্লা কচ্ছিস্ সব—

ভরত মুখখানা কাচুমাচু করিয়া কহিল,—সন্দেহ হ'ল তাই—

—যা যা সব বাড়ী যা, তাড়ি খেয়ে হল্লা করার জায়গা মিল্‌লো না আর? এসেছে ঠাকুর পাড়ায়—

আকস্মিক উত্তেজনার বশে ঠাকুর পাড়ায় আসিয়া হৈ হল্লা করাটা ভাল হয় নাই, একথাটা যেন তাহাদের এতক্ষণে মনে হইল। নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে ভরত কহিল,—ভাবমু চোর—

উপস্থিত জনতা এক পায়ে দুই পায়ে যখন সরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন সামান্য তরকারী হাতে করিয়া আদাড়ী উপস্থিত হইল। সে প্রশ্ন করিল,—কি, কি হ'য়েছে?

ঘটনাটা সংক্ষেপে মতি ঠাকুর মশায় জানাইলেন, আদাড়ী ব্যাপারটা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—

ঠিকই হ'য়েছে ও একটা আছে বটে ঐ মাঠের ধারে শ্যাওড়া গাছে, একদিন মাছ নিয়ে ফিরছি নাঁকি স্বরে বল্লে মাঁছ দেঁ,—আমি গায়ত্রী জপ করে বল্লুম—আয় মাছ নিয়ে যা, তখন বলে পৈতে ফেঁলে দেঁ—দেঁ না—

লালমোহন সভয়ে কহিল,—পেত্নি?

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কথা হ'য়েছে, বিধবা আত্মহত্যা করে মরেছিল—এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে, মাঝে মাঝেই আসে আমার সঙ্গে গল্প করে—ওতে ভয়ের কিছু নেই—

ভরত কহিল,—বল কি ঠাকুর, পেত্নির সঙ্গে গল্প কর?

—তাতে কি? গলায় পৈতে থাক্‌তে আর ইষ্টমন্ত্র যপতে ভয় কি? ডাক্‌লেই আসে—

মতি ঠাকুর অবিশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন,—এই আর কি? তোমার পরিবার কিনা, যে তোমার কাছে আসে গল্প ক'রতে—

—বিশ্বাস ক'রলেন না খুড়ো মশায়—

—না, প্রেতযোনি যারা পায় তারা নরলোকে আসে না।

আদাড়ী বলিল, পায়ের ধুলো দেন খুড়ো, আপনাকে দেখাচ্ছি ও আসে আবার যায়। তোমরা সব দাঁড়াও, মশাল নিভিয়ে দাও,—দেখবে আদাড়ী মিথ্যে বলে না—

সকলে মশাল নিভাইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। আদাড়ী ঘরে গিয়া একটা বাঁশের বাঁশী আনিয়া বাউল স্বরে কি যেন একটা গান বাজাইতে আরম্ভ করিল। একটু বাদে সে কহিল,—মাঠের দিকে নজর রাখবেন খুড়ো, তোমরা দেখো—

আদাড়ী বাঁশী বাজাইতেছে,—দূরের বনান্তের প্রান্তে তাহার স্বর আছাড় খাইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অদূরের মাঠ পাণ্ডুর নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নায় স্বল্পালোকিত, বাঁশীর একটা উদাস করুণ সুর পিছনের বন ও প্রান্তরকে মোহময় করিয়া তুলিয়াছে। অগ্রহায়ণের সন্ধ্যায় স্বল্প কুয়াশা মাঠের উপরে শুভ্র উত্তরীয়ের মত বিছাইয়া রহিয়াছে—

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—একটি ছায়া নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে মাঠে আসিয়া নামিল, ধীর মন্থরপদক্ষেপে এইদিকেই আসিতেছে, তন্বী, চঞ্চল-চরণা একটি বিধবার মতই তাহার বেশ,—ধীরে নিঃশব্দে মাঠ অতিক্রম করিয়া সে আসিল, পিছনের জঙ্গলের নিকটে—

সকলেই দেখিতেছিল,—কেহই এতক্ষণ কথা বলে নাই, আদাড়ী বাঁশী থামাইয়া কহিল,—দেখ্‌ছেন খুড়ো—

—হ্যাঁ—

আদাড়ী পুনরায় আর একটা গানের কলি বাজাইল, সঙ্গে সঙ্গে নারীমূর্ত্তি পিছন ফিরিয়া আবার দ্রুত চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে বনের কোলে মিলিয়া গেল,—

চারিদিক নিস্তব্ধ, উঠানে লোকগুলি ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে, বিস্ময়ে ভয়ে কেহ নড়ে নাই, কথাটি পর্য্যন্ত বলে নাই,—সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আদাড়ী হঠাৎ অট্টহাস্যে হো হো করিয়া উঠিল—সে কহিল,—খুড়ো আরও আছে, পরীসাধন, কালীসাধন, আদাড়ী পাগল নয়। আর লেলো, আমার ঘর তোকে সাম্‌লাতে হবে না,বুঝলি?

লালমোহন কহিল,—আমি ত কিছু জানি না, ঠাকুরদাদা—ভরত ডাক্‌লে তাই এলাম,—

—হ্যাঁরে,—হ্যাঁ আমি সবই জানি, সবই বুঝিরে লেলো, তবে বেশী বাড়াবাড়ি করলে সরষে বাণ ঝেড়ে দেব, দেখবি ঠেলাটা,

—লালমোহন মুখ ফিরাইয়া কহিল,—আমি কিছু জানিনে খুড়ো—

—সময় হ'লে জান্‌বি, আজ তার কি?

এতক্ষণ বাদে মতি ঠাকুর কহিলেন,—সব থাক্‌তে লেলোকে ধরলি কেন আদাড়ী,—ও ত ডাকেনি, ডেকেছে ত ভরত—

আদাড়ী আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—হ্যাঁ খুড়ো হ্যাঁ—

ধীরে ধীরে সকলেই চলিয়া আসিল। মতি ঠাকুর শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন,—কিরে আদাড়ী, এ সব কি?

—একা থাকি, একটু সাধন ভজন করি। তান্ত্রিক মতে একটু ভগবানকে ডাকা। উনুনটা জ্বালতে হবে খুড়ো, যা হয় দুটো—

—হ্যাঁ—রান্না কর—

মতি ঠাকুর চলিয়া আসিলেন—

মতি ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া দেখেন—ভগবতী চাটুয্যের বিধবা ভগিনী, পাড়ার কয়েকজন বধূ ও গৃহিণী সমবেত

হইয়াছেন রামায়ণ শুনিবার জন্যে। তিনি কহিলেন,—বসো সকলে, ব'সো আমি বৈকালীটা দিয়ে আসি। পথে আস্‌তে আবার আদাড়ীর ওখানে এক কীর্ত্তি. তাই দেরী হয়ে গেল।

মতি ঠাকুর ঠাকুর-বৈকালী দিয়া আসিয়া রামায়ণ খুলিয়া বসিলেন। ভগবতী চাটুয্যের বিধবা বোন বিন্দু প্রশ্ন করিল—আদাড়ীর ওখানে কি কাণ্ড হ'ল ঠাকুর মশায়—

মতি ঠাকুর চাটুয্যেদের কুলপুরোহিত, তাহাকে সকলেই প্রায় ঠাকুর মশায় বলিয়া ডাকে। চাটুয্যেরাই জমিদার, তাহাদের পুরোহিত সকলেরই সম্মানার্হ। একটি কিশোরী বধূ ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন—এ কে?

—শশধরের বৌ।—শশধর ভগবতী চাটুয্যের বড় ছেলে।

—বেশ বেশ, ব'সো মা।

আদাড়ীর ওখানকার ঘটনা প্রাথমিক ভাবে আলোচনা হইল। মহিলারা কেহ ভয়ে, কেহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কেবল বিন্দু কহিল,—আদাড়ী এত জানে?

কথাটা মেয়ে মহলে প্রচারিত হইল। তৎপরে কিছু পল্লবিত হইয়া গ্রামেও প্রচারিত হইল এবং এই সামান্য ঘটনাটা আদাড়ীকে অন্ততঃ এই গোপালপুরে বেশ খ্যাতনামা করিয়া দিল।

অতঃপর মতি ঠাকুর রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ তিনি পছন্দ করেন না, তাহার মতে উহা প্রক্ষেপ দুষ্ট।

মতি ঠাকুর মশায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র জানকীকে বনে বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কল্প ক'রেছেন। এই বিপদে কে তার সহায় হবে,—ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ ছাড়া এ দুঃসহ কাজ কে করবে? তিনি লক্ষ্মণকে এই গুরু কর্ত্তব্য ন্যস্ত করলেন।

রথ সজ্জিত হল। জানকী কিছুই জানেন না, দেবর লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি রথে উঠ্‌লেন,—রথ এসে সরযূ তীরে দাঁড়াল! লক্ষ্মণ কেমন করে জানাবেন যে রামচন্দ্র জানকীকে এই গর্ভবতী অবস্থায় বনবাস দিচ্ছেন। লক্ষ্মণ কিছু ব'ল্‌তে না পেরে, মাথা নীচু করে আছেন, তা চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সীতা ব'ললেন—কি লক্ষ্মণ? তোমার মনোবেদনার হেতু কি? লক্ষ্ম বহুকষ্টে ব'ললেন, আমি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বনবা দিতে এসেছি, আমি নরাধম মহাপাতক। রামচন্দ্রে আজ্ঞা আপনাকে বনে বিসর্জ্জন দিতে হবে—

সীতা হঠাৎ নির্ব্বাসন আজ্ঞা পেয়ে একটু যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন, পরক্ষণেই স্মিত হাস্যে তিনি লক্ষ্মণকে বল্‌লেন,—এত দুঃখের নয়, এত পরম আনন্দের বিষ লক্ষ্মণ, স্বামীর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা পূর করতে আমি সক্ষম হ'য়েছি, বনবাসের মাঝে আমি যে তা বাসনাকে পূর্ণ করতে পারবো এ ত আমার পরম আনন্দ, জীবনের তৃপ্তি—তুমি কেঁদো না লক্ষ্মণ, এই ত আমার চরম আনন্দ—

মতি ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন,—এই ত দেবী সীতা, তার পতিভক্তি, তার প্রেম এত গভীর এত সুন্দর যে তাঁর নিজের সত্বা নাই, স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে তা একীভূত হ'য়ে গেছে, আপনার সুখ দুঃখ ব'ল্‌তে আর কিছুই নেই,—এই আত্মসমর্পণই সীতাকে দেবী ক'রে রেখেছে,—মা যেমন সন্তানকে মুখের অন্ন খাইয়ে আনন্দ পান, তেমনি সীতা তার জীবনের শত দুঃখের মাঝে পরিতৃপ্তি পান রামচন্দ্রের ইচ্ছা পূরণে—এই ত হিন্দু বধূর আদর্শ। নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে অন্যকে সুখী করাই ধর্ম্ম—

কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—সীতার এই চরম দুঃখকে আপনার ভাবিয়া। মতি ঠাকুর চাহিয়া দেখিলেন,—শশধরের কিশোরী বধূ—তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন,—পরের জন্যে কাঁদতে শেখাই ধর্ম্ম মা, সব শিক্ষার গোড়ার শিক্ষাই এই।

কিশোরী বধূ বনলতা আপনার মূঢ়তায় যেন একটু লজ্জিত হইয়াছে এমনি ভাবে সলজ্জ হাতে ঘোমটা টানিয়া দিল। মতি ঠাকুর উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন,—এই ত চাই মা। তুমি ভবিষ্যতের জমিদার গৃহিণী, তুমি সকলকে পালন করবে, তোমার চোখে যেন জল ঝরে পরের দুঃখে—তবেই তুমি গিন্নী—মতি ঠাকুর মহাশয় রামায়ণ বন্ধ করিলেন। প্রদীপের আশে পাশে সিধাগুলি ছিল,—বিন্দু

তাই কহিল,—বউঠাকৃরুণ সিধে নিয়ে বাসন ছেড়ে দাও ভাই,—

মতি ঠাকুরের স্ত্রী একটা পাত্রে সিধাগুলি ঢালিলেন, এবং পয়সা কটা আঁচলে বাঁধিলেন। সকলে প্রণাম করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিন্দু কহিল,—কাল চণ্ডীমণ্ডপে ভাগবত পাঠ করবেন ত?

—যেমন তোমাদের ইচ্ছা, ভগবানের একটু নাম, করলেই হল। এস মা বনলতা, বড় খুশী হলুম তোমার প্রাণের মায়া দেখে। মানুষের হৃদয়ের এই বৃত্তির প্রকাশই ত সভ্যতা মা,—এসো বেঁচে থাকো, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করো। সকলে চলিয়া গেল—

(ক্রমশঃ)

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম-এস্ সি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দর্শনপুস্তকাদিতেই আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। ধরা যাউক, কোনও একজন দার্শনিক দর্শনসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সহজেই বুঝা যায় যে, একজন দার্শনিকের পক্ষে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিশেষ করিয়া প্রাণিজগতের তথ্যসমুদয় স্বকীয় জীবনে সংগ্রহ করিয়া উঠা সম্ভব নয়। অথচ তাঁহার সেই দর্শনশাস্ত্রে নানা কথা ও উপমাচ্ছলে তাঁহাকে শুধু প্রাণিবিষয়ক কেন, উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেক বিষয় উল্লেখ করিতে দেখা গেল। এখন আমরা যদি বলি যে, পূর্ব্বে প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল এবং উহা হইতেই বিভিন্ন সংস্কৃত-গ্রন্থকারগণ নানা প্রাণিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশেষ অন্যায় হয় না।

বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একটী পৃথক্ বিদ্যা যে পুরাকালে এদেশে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা নিম্নলিখিত উক্তিটীতে পাইয়া থাকি। শুধু প্রাণিবিজ্ঞান কেন, অন্যান্য বহুবিধ অধুনালুপ্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ ইহার মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। উহাতে নারদ, সনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি কি শাস্ত্র বা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন। অধীত বিষয়গুলির মধ্যে আমরা ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিত্র্য বা পিতৃসম্বন্ধীয়, রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র, দৈব বা আবহাওয়া, নিধি বা ধনবিদ্যা, বাকোবাক্য বা তর্কশাস্ত্র, একায়ন বা নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা বা ভূমিকম্পাদি উৎপাতসম্বন্ধীয় বিদ্যা, ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান, ক্ষত্রবিদ্যা বা যুদ্ধশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজন বা সুগন্ধিবিদ্যার বা শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য-মেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেব-জনবিদ্যাম্ এতদ্‌ভগবোঽধ্যেমি॥"—ছান্দোগ্য, ৭ম, ১খণ্ড, ২।

ভূত অর্থে মনুষ্যেতর প্রাণীদিগকেই বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে মনুষ্যদিগের তিন প্রকার দুঃখের কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ হিংস্রজন্তু আদি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূতবলি অর্থে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ভূত অর্থে যে প্রাণিবর্গই বুঝাইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বভূতে দয়া অর্থে সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া বুঝায়। এই জন্য "ভূতবিদ্যা" অর্থে আমরা প্রাণিবিদ্যাই বুঝিয়াছি। এই ভূতবিদ্যা ছাড়া 'ভূততন্ত্র' বলিয়া অপর একটী বিদ্যার উল্লেখ আমরা কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পাই বটে, কিন্তু আমার মতে উহা একটী পৃথক্ শাস্ত্র। ভূতবিদ্যা বলিতে প্রাণিবিদ্যা ও ভূততন্ত্র বলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসামূলক কোনও গ্রন্থ বুঝাইত বলিয়াই মনে হয়। উপরের অংশে ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান ব্যতীত সর্পবিদ্যারূপ প্রাণিবিজ্ঞানের একটী বিভাগবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে সর্পের সংখ্যাধিক্যবশতঃ সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোধ হয় বিশেষ করিয়া এই সর্পবিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি পাঠে কৃমিকীটাদির ন্যায় সর্পাদি সম্বন্ধেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া প্রাণিবিষয়ক বহু বিজ্ঞানশাস্ত্র যে পূর্ব্বে ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে আমরা পাইয়া থাকি। প্রমাণস্বরূপ শালিহোত্র গ্রন্থের কথা বলা যাইতে পারে। শালিহোত্রই ইহার রচয়িতা ছিলেন। পঞ্চতন্ত্র উপাখ্যানে আমরা ইঁহার উল্লেখ পাই মাত্র। কতিপয় অশ্ব ও বানর পুড়িয়া গেলে, কোনও রাজা এই শালি-হোত্রের সন্ধান লন। পঞ্চতন্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শালিহোত্র এখন একখানি অধুনালুপ্ত গ্রন্থ। ইহার কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া 'আগদ তন্ত্র' নামক এক প্রকার শাস্ত্রের উল্লেখ আমরা আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে পাই। কীটবিদ্যা এই আগদতন্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এই তন্ত্রের একখানি পুস্তকও আমরা পাই নাই। তবে পালকপীয়-

প্রণীত গজায়ুর্ব্বেদ এবং জয়দত্ত ও নকুল-প্রণীত অশ্ব-গবায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কয়েকখানি চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান এখনও পাওয়া যায়। সে যুগে অশ্ব, গজ ও গবাদি রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য হিন্দুগণ ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই ইহাদের কয়েকখানি এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই চিকিৎসামূলক প্রাণি-বিজ্ঞান ছাড়া কয়েকখানি সাধারণ প্রাণিবিজ্ঞানও আমরা পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে শৈনিকশাস্ত্রম্ (Hucking birds) ও মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করেন, দ্বিতীয়খানি স্বর্গীয় ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ বিহার হইতে প্রাপ্ত হন। দুইখানিই প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ। পুস্তক দুইখানি যে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা উহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই বুঝা যায়। ইহা ছাড়া আর একখানি সুলিখিত প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকও পাওয়া যায়; উহার নাম তত্ত্বার্থাধিগম। উমাস্বাতি নামক একজন জৈন কবি উহার রচয়িতা। ইহা ছাড়া দাল্‌ভ্য ও লাদায়নের প্রাণি-সম্বন্ধীয় বিবরণও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারি যে, পুরাকালে হিন্দুস্থানে প্রাণিবিজ্ঞানের বিশেষ প্রচলন ছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ আরও গ্রন্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত কয়খানি প্রাচীন প্রাণিবিজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহাদের একখানিও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হয়ত সব কয়খানিই লুপ্ত হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহাদের নামের একটী তালিকা দেওয়া হইল।

ক। সরীসৃপবিষয়ক।—১। লতাবিস্ফোটক। ২। উজ্জয়িনী-গ্রন্থ। ৩। ভুসরীসৃপ-রাজভাষা। ৪। নাগার্জ্জুনতন্ত্র। ৫। মণি-লতা গ্রন্থ।

খ। পক্ষিবিষয়ক—১। খেচরীমালা। ২। বিহঙ্গমতন্ত্র। ৩। হিমাদ্রিশাখাতন্ত্র। ৪। ভূমালা গ্রন্থ। ৫। ভীম্বরী গ্রন্থ।

গ। স্তন্যপায়িবিষয়ক—১। পুষ্পমালা গ্রন্থ। ২। শকুন্ত লেখ। ৩। নিষাদতন্ত্র। ৪। নিষাদমহাভাষ্য। ৫। জীবধর্ম্ম। ৬। সং-গোপন গ্রন্থ। ৭। শাখামৃগ গ্রন্থ।

ঘ। প্রাপ্ত গ্রন্থাদি—১। মৃগপক্ষিশাস্ত্রম্ ২। তত্ত্বার্থাধিগম। ৩। শৈনিকশাস্ত্রম্। ৪। গজায়ুর্ব্বেদ। ৫। অশ্বায়ুর্ব্বেদ। ৬। দাল্‌ভ্য-বিবরণ। ৭। লাদায়নবিবরণ।

এইবার কি ভাবে আমাদের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা জানি, পূর্ব্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া, তিব্বতের বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতিতে রক্ষিত ছিল। বিদেশীয়দিগের আক্রমণের সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ নেপালে নীত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলি নেপাল দরবার-পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ঐ সকল দেশে শীতের প্রাধান্য হেতু গ্রন্থকীটের উপদ্রব নাই। পুস্তকগুলিও নষ্ট হয় নাই। বিশেষ অনু-সন্ধান করিলে ঐ দুইটি দেশ হইতে হিন্দুর অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু উহা যদি নাও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র-সমুদয়ে বিক্ষিপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় তথ্যসকল একত্র সংগ্রহ করিলে উহাই একটী ধারা-বাহিক প্রাণিবিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইতে পারিবে। লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ঐ তথ্যসমুদয় এত সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত আছে যে, সাধারণের পক্ষে উহার প্রকৃত অর্থ সব সময় বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। কোন কোন শ্লোক আবার রূপকচ্ছলে লিখিত। সেই জন্য তাহার অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিক শ্লোকগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির তাঁহারা প্রায়ই ভুল অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, গত পাঁচ ছয় শতাব্দী যাবৎ চর্চ্চার অভাবে তাঁহারা বিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন। অনেকে জোর করিয়া বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির আবার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; উহাদের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগ দর্শন-সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে কথাচ্ছলে লিখিত হওয়ায় তাঁহারা ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। এই রূপকাত্মক শ্লোক-গুলির বিজ্ঞানসম্মতভাবে যথার্থ অর্থ নির্ণয় দ্বারাই এখন হিন্দুবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই আমি আমাদের দেশের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান হইতেই ঐ শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ প্রণালীতে উহা সম্ভব হইবে, তাহার একটী সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

ধরা যাউক, কোন একজন লোক ছোট ছোট কাঠের টুকরা দিয়া তৈয়ারী একটী খেলনার বাড়ী টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। কয় দিন পরে বাটী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে, সেই খেলনার বাড়ীখানি কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও উহার টুকরাগুলা চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি টুকরাগুলি কোনটী উঠান, কোনটী ছাদ, কোনটী রাস্তা, কোনটী বা রোয়াক হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় গৃহখানি তৈয়ারী করিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু টুকরাগুলি সম্ভবমত স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করার পর দেখা গেল যে, একটী থাম, রোয়াকের কিছু অংশ ও একটী জানালা পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু লোকটী হতাশ হইল না। সে জানালার ফাঁকের উপযুক্ত একটী জানালা গৃহের অপর একটী প্রাপ্ত জানালার অনুরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া লইল। তাহার পর রোয়াকের অপ্রাপ্ত অংশ ও থামটাও ঐরূপ ভাবে তৈয়ারী করিয়া, গৃহখানি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এইরূপভাবে নষ্টপ্রাণিবিজ্ঞান আমরাও উদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে উহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মাত্র কটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা বক্তব্য শেষ করিব। একশফ ও দ্বিশফ বলিয়া দুইটী বৈজ্ঞানিক শব্দ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে আমি উদ্ধার করিলাম। একখুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "একশফ" ও দ্বিখুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম "দ্বিশফ"। কিন্তু হস্তী প্রভৃতি পঞ্চখুরবিশিষ্ট জীবও আমরা দেখিতে পাই। হস্তীর ন্যায় পাঁচ-খুরো জীবের নাম হিন্দুগণ

জানিতেন না, ইহা বলা হাস্যকর। সহজেই বুঝা যায় যে, যাঁহারা দ্বিশফ শব্দ বিভিন্ন গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা পঞ্চশফ শব্দটীও ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তাহা আমরা এখন পাইতেছি না। এ স্থলে আমরা এই একশফ ও দ্বিশফ শব্দের অনুকরণে পঞ্চশফ শব্দটীও বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপে অধুনাপ্রাপ্ত কয়েকখানি প্রাণিবিজ্ঞান-গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত প্রাণিবিষয়ক বিক্ষিপ্ত * শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিয়া যে, একখানি ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা আমি পরে দেখাইব।

শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীবিভাগ প্রাণিবিজ্ঞানমাত্রেরই প্রথম অধ্যায়। য়ুরোপীয় প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জীবদিগের দৈহিক গঠন ও তাহার ক্রমোন্নতির বা devolepment-এর বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবদিগের শ্রেণী-বিভাগ করেন। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠন অনুসারেই তাঁহারা জগতের যাবতীয় প্রাণিগণকে বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবগণকে এককোষ ও বহুকোষ-উর্দ্ধতন জীবগণকে বহুকোষ জীব বলিয়াছেন। বহুকোষ জীবগণের মধ্যে যাহাদের অস্থি আছে, তাহাদিগকে অস্থিক বা দণ্ডী জীব এবং যাহাদের অস্থি নাই, তাহাদিগকে নিরস্থিক জীব বলা হইয়াছে। এই অস্থিক বা দণ্ডী জীবগণও আবার তাহাদের দেহের গঠন অনুসারে চক্রতুণ্ডি, শ্বাসপটী, মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী, এই সাতটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। অপর দিকে নিরস্থিক জীবগণকেও আবার এই একই নিয়ম অনুসারে পর্ব্ববদী, চিপিট জীব, বর্ত্তুল কৃমি প্রভৃতি "দেশে" ভাগ করা হয়। পূর্ব্বকথিত দণ্ডিদেশের ন্যায় এই সকল জীবদেশও বহুবিভাগে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্ব্ববদীদেশের কথা বলা যাইতে পারে। এই পর্ব্ববদীদেশ বা phylum, খোলকী, লৌতেয়, সন্দংশমুখী, দ্বিযুগ্মপদী ও ষট্পদী, এই পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত। এইগুলিকে দৈহিক বিভাগ বলা হইয়া থাকে। প্রাণীদিগের আধুনিক বিভাগগুলি উহাদের দৈহিক। (বাহ্য ও আভ্যন্তরিক) গঠনের উপর নির্ভর করিয়াই করা হইতেছে। আধুনিক শ্রেণী বিভাগের একটী নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

রাজ্য বা Kingdom—জঙ্গম
দেশ বা Phylum—অস্থীক
শ্রেণী বা Class—স্তন্যপায়ী
গণ বা Order—হিংস্র
গোত্র বা Genus—বৈড়াল
বংশ বা Species—বিড়াল
জাতি, পরিবার বা Family—কাবলী বা দেশী

(ক্রমশঃ)

* তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজে রূপক শ্লোক লেখা একটা বাহাদুরীর বিষয় ছিল। যে সকল শ্লোকে সহজ অর্থ দেওয়া হইত, তাহাও আবার অতি সংক্ষেপে লিখিত হইত। গুরুর আশ্রমে শিষ্যগণ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সহজ অর্থ বুঝিয়া লইয়া মাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যের জন্য পঠিত শাস্ত্রগুলির সারস্বরূপ ঐ সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি লিখিয়া লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিত। এইরূপ সংক্ষিপ্ত লিখনপদ্ধতির প্রচলন থাকায় এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগেও আমরা সংক্ষিপ্ত পুরাণ-শ্লোকই পাইয়া থাকি। এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ বুঝাইবার জন্য পরে পণ্ডিতগণ পরস্পরবিরোধী বহু টীকা লিখিতে বাধ্য হন। মধ্য যুগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পীঠগুলির লোপই ইহার কারণ।

দিনান্তে

প্রভাময়ী মিত্র

সব্ হারানো নিঃস্বজনের তরে, ওখানে নয় ওখানে নাই ঠাঁই—
পারের ঘাটে বৃদ্ধবটের ছায়ে, ধরার কোলে বিরাম মাগি তাই।
কর কৌতুক হাস্যমুখর মুখে, কর পরিহাস ঘন করতালি হানি ;
বিদায় পথের সম্বল হবে মম পাথেয় দাও উপছি দুই পানি।
যেথানে দিকচক্রবালের কোলে, আকাশ এসে ধরার বুকে মেশে,
ওপারে ওই প্রান্তসীমার পারে এপারে এই ছায়ালোকের শেষে।
শেষ আলোটী অস্তরবির যথা কাজল জলে রক্তআবীর ঢালে,
রাঙায় রবি সন্ধ্যাবধূর সিঁথি চিহ্ন আঁকে সরম-নত গালে।
মেঘশিশুরা শ্রান্ত গতিহারা ছড়ায়ে পড়ে জড়ায়ে ধরে রয়,
বাতাস কেন খসিয়া উঠে হেন, সুরভিতার শিথিল গতি বয়।
বাজিছে ওই ঘণ্টা কোথায় শুনি, কাজল চোখে সজল ওকে চায়!
বনের কোলে অন্ধকারের তলে কার ও নূপুর মধুর শোনা যায়!
রঙীণ পটে দূর দিগন্তে আঁকা ঘনসবুজ বন তরুর সারি,
শেষ শিখাটী শ্রান্ত রবির জাগে উজ্জ্বল করি ললাট শির তারি—
মশাল শত জ্বালায়ে লয়ে তুলি, বাহক যত দাঁড়ায়ে পথপাশে,
তুলিয়া মাথা উর্দ্ধ গগন তলে নীরব স্থির না জানি কার আশে।
আকাশে শুনি জলতরঙ্গ বাজে বিজন সাঁঝে জাগায়ে কলরোল,
উড়িয়া যায় ছিন্নমালার মত গগন গায়ে কলহাঁসের দল।
নিতল তার স্পন্দন ঘন বুকে দুবাহু পাশে বাঁধিতে চায় রাত্রি,
ভুলায় ব্যথা ব্যাকুল পরশনে এবার ছুটী ঘুমাও ওরে যাত্রী।
নিবিড় বাহু বন্ধনে লয় বেঁধে ললাটে আঁকে চুমার পরে চুমা,
ধরিয়া রাখে হৃদয় পরে টানি, কয় সে কানে পথিক ওরে ঘুমা।
কাটিলো বেলা পথবিপথে যার, ওখানে নয় এখানে তার ঠাঁই—
সকল ভার সঁপিনু তার পায়, নিকট হ'তে সুদূরে যেতে চাই।

নিশীথ রাতের সূর্যোদয়ের পথে

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

দিগন্তবিস্তৃত তুষারশুভ্র পাষাণপুরীর মাঝে ট্রমসো শহর। শহরময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জের ন্যায় তুষারচূর্ণের স্তূপগুলি ছড়িয়ে রয়েছে; আধাগলা তুষারে মাটী ভিজে স্যাঁৎসেঁতে।

আমাদের এই হোটেলটি একটি পাহাড়ের কোলে; পাশেই রয়েছে আকাশ-ছোঁওয়া হিমানী গিরিশৃঙ্গ। শীতের দেশে পথশ্রমে শ্রান্তি আসে না। প্রায় নয় ঘণ্টা ধরে এই দুর্গম গিরিকান্তার পার হয়ে এসেও আমরা ক্লান্ত হই নাই।

নিশীথ রাতের সূর্যদর্শনের মরশুম সবে সুরু হয়েছে, তাই হোটেলে যাত্রীর ভীড় এখনও বেশী হয় নাই। হোটেল ম্যানেজার আমাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—"যাত্রীরা এখানে আসেন মেরু-রজনীর সূর্যোদয় দেখতে। তাই হোটেল গৃহটি সৌর-শোভা দেখার উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী করা। বাড়ীটির সবার উপর-তলায় খোলা বারাণ্ডা হ'তে সূর্যোদয়ের শোভা অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়।" পাঁচতলার সেই খোলা বারাণ্ডায় তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে সামনের গীর্জার ঘড়িটি দেখিয়ে বল্লেন—"রাত বারোটার কাছে কাঁটা ঘুরলে এখান থেকে পুব আকাশে সূর্যোদয় দেখা যাবে। অদূরে ঐ ফিয়র্ডের ধারে গেলে দেখতে পাবেন সূর্যের অস্ত ও উদয়ের গতি দিগ্‌মণ্ডল মাঝে এক অপূর্ব রূপসৃষ্টি করেছে।"

নিশীথ রাতের সূর্যদর্শনাভিলাষে গ্রাণ্ড-হোটেলের ৫ তলার খোলা বারাণ্ডায়—ট্রমসো

সারা শহরে এখন এই ছয়মাস বিজলী বাতি একেবারে নিভানো গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হ'তে ছয়মাস সূর্যকিরণ দিবারাত্র মেরুদেশের আকাশ উজ্জ্বল করে রাখে। আবার শীতের ছয়মাস তেমনি উত্তরখণ্ড হ'তে সূর্য অন্তর্হিত হ'য়ে নিবিড় আঁধারে আকাশকে আচ্ছন্ন করে।

আকাশে এখন অপরাহ্ণের আলো। সূর্য ঈষৎ পশ্চিমে হেলে।

রাতের আহার শেষ হ'লে হোটেলের গরম-করা ঘরে দুগ্ধফেননিভ শয্যার প্রতি খুবই লোভ হচ্ছিল, কিন্তু নিশীথ রাতের সূর্য দর্শনের উত্তেজনা আমার এই তন্দ্রালস বিশ্রামকে উপভোগ করতে দিল না। জয়শ্রী এবং ওঁর ক্যামেরায় ফিল্‌ম্ পোরা, সাইনী ক্যামেরার লেন্স ঠিক করা এবং কখন কোন দিক থেকে সূর্যোদয়ের গতিবিধির ছবি তুলতে হবে—এই সব আলোচনা শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ উঠে দেখি ঘড়িতে ১১টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি আপাদমস্তক গরম কাপড়ে ঢেকে পাঁচতলার খোলা বারাণ্ডায় আমরা উপস্থিত হলাম। বারাণ্ডায় আরো কয়েকজন যাত্রী ও হোটেলের কর্মীবৃন্দও এসেছেন। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝে খোলা বারাণ্ডায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। দস্তানা ও মোজায় হাত পা ঢেকেও আঙ্গুলগুলো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে গিয়ে বসছি গরম-করা বসবার ঘরে।

সূর্যের আলোয় দিক্ উজ্জ্বল। শহর নিঝুমপুরী। জনশূন্য পথ। পথের দু'ধারে বাড়ীগুলির জানলায় গৃহস্থরা পরদা টেনে রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করে ঘুমাচ্ছে।

আমরা সবাই বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সূর্যের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব চিত্তে পুব আকাশ পানে চেয়ে আছি।

গীর্জার ঘড়িতে ১২টা বাজল। অস্ফুট রক্তিমাভা দূর গগনে ফুটে উঠেছে। দিবালোকে পাহাড়ের আড়াল হ'তে সপ্তবর্ণ সৌরকররাজি দিগ্‌বিদিকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠল। সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্তে কাল বিলম্ব না করে আমরা চলে গেলাম ফিয়র্ডের ধারে।

নব রাগে রঞ্জিত সূর্যের লোহিত রথচক্রখানি ফিয়র্ডের জলের ধার দিয়ে অস্তাচলের পথে ধীরে ধীরে গড়িয়ে নেমে এল দিক্‌চক্রবালে, আবার সে গতি ঘুরে অখণ্ড মণ্ডলাকারে ধীরে ধীরে উঠে চলেছে

মহাব্যোমে। প্রশান্ত সলিলবক্ষে বিম্বে বিম্বে প্রতিফলিত হয়ে উঠ্‌ছে সহস্র সূর্য। সংহৃতজ্যোতি কমনীয়কান্তি আদিত্য মহাশূন্যলোকে আমাদের সম্মুখে ভাসমান। রুদ্রমূর্তি বিবস্বান এখানে ধী শ্রী রূপে দেবদ্যুতিতে বিরাজিত। ঈশোপনিষদে বর্ণিত পূষণের কল্যাণতম দিব্যরূপ যে কি, তা জানি না। তবে যোগারূঢ় ঋষি যখন হিরণ্যগর্ভ পূষণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

তখন কি তিনি এই শান্তভাতি সংহৃত রশ্মিই দেখতে চেয়েছিলেন?

বস্তুজগতের সৌরশোভা আমাকে এমনই মুগ্ধ করে তুলেছিল যে ভুলে গিয়েছিলাম মহাযোগীর সাধনালব্ধ এই ধ্যানমূর্তিখানি সাধকের চেতনাময়
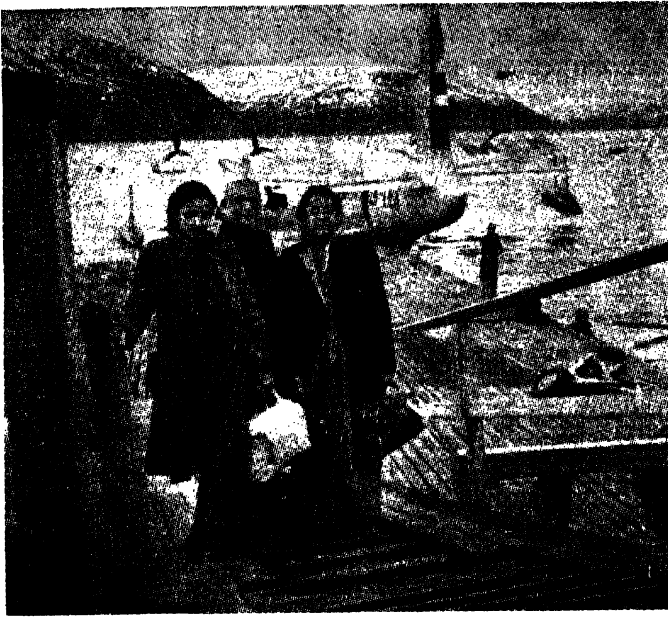
ট্রমসো থেকে 'সি-প্লেনে' অস্‌লো অভিমুখে

অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবার বিষয়, বহির্জগতের কোনো বস্তুর সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

স্নিগ্ধ সৌরকিরণে ঝলমল করছে বিপুল জলরাশি। অদূরে ঐ অগণিত তুষারমৌলি গিরিমালা। দূর দিগন্তে হীরকোজ্জ্বল শ্বেত শৈলরেখা। আকাশে লাল ফাগুয়ার রং গুলে কে যেন ঢেলে দিল দিক্‌মণ্ডলে। সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। আকাশপটে কোন সে শিল্পী এঁকে গেল এক সপ্তরঙ্গা রবি!

নিশীথরাতে দিনের আলোর মাঝে সূর্যোদয়—এ এক অচিন্তনীয় নৈসর্গিক রূপচ্ছবি।

ফিয়র্ডের জলের ধারে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাত পা মুখ যেন ফেটে যাচ্ছে। আমাদের ছবি তোলার পালা শেষ হ'লে ফিরে এসে গরম-করা মোটরের ভিতরে বসে কি আরামই না হল।

তখন প্রায় রাত দু'টো। শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। ফিয়র্ডের ধারে ধারে বহু জর্মান বিমান ও যুদ্ধজাহাজের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। ফিয়র্ডের ওপারে টিরপিড্ (Tirpid) যুদ্ধজাহাজটি বেশ বড়ই দেখলাম। জার্মানরা জলপথে সাগর বেয়ে এসে এই ফিয়র্ডগুলির ভিতর দিয়ে দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে উপত্যকাস্থিত শহরগুলি বেশ কায়েমিভাবে দখল করে বসেছিল। এই সুদূর পারে তুষারময় মেরুদেশ ট্রমসো শহরেও তাদের যুদ্ধজাহাজগুলি এসে পৌঁচেছিল। তারপর একদিন এখানেও এল ইংরাজদের বোমারু বিমান। টিরপিড্ জাহাজটি বোমার ঘায়ে বিধ্বস্ত হল। ছোট ছোট বহু বিমান নরওয়ের পথে ঘাটে এখনও তেমনি ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। এই যুদ্ধে নরওয়ে জার্মান কর্তৃক সাময়িক ভাবে অধিকৃত হওয়াতে জার্মানদের ব্যবহৃত নানা যুদ্ধ সরঞ্জাম আজও শহরময় ছড়ানো রয়েছে।

৪ঠা জুন। ভোর ৬টায় হোটেলের হিসাব চুকিয়ে ফিয়র্ডের জলের ধারে বিমানঘাটায় আমরা উপস্থিত হলাম। ফিয়র্ডে ভরা নরওয়ের এই গিরিসংকুল উত্তরাংশ সমতল-ভূমিবিহীন। তাই বিমানঘাঁটির পথ স্থলপথে হয়নি, হয়েছে জল-পথে। ফিয়র্ডের জল থেকে সি-প্লেন সরাসরি আকাশপথে ওঠা-নামা করছে।

স্থির সাগর-সলিল। মেঘময় ধূমল আকাশ। ধূমায়িত দিক্‌-মণ্ডল। জলের দু'ধারে আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়ের সারি নিবিড় নীলাভ কুয়াশার মাঝে আবছা আবছা ফুটে উঠেছে। আমাদের সম্মুখে দৃষ্টিপথ রোধ করে একখানি ঝাপ্‌সা মেঘের পরদা ফেলা। প্রকৃতির এই ভৈরবী মূর্তি দেখে মনে ভয় হয়,—কেমন করে এই ছায়াময় অস্ফুট গিরিকান্তার অতিক্রম করে বিমান নির্বিঘ্নে আকাশ পথে ছুটবে!

প্রায় ৭টার সময় বিমান শূন্যে ওঠার সঙ্কেত জানাল। পরক্ষণেই জলপথে ছুটল ভীষণ গর্জন করে তুফান তুলে। বিমান শূন্যে উঠে ঋজু পর্বতশ্রেণীর মাঝখানে গভীর খাদের পথ দিয়ে অতি ধীরে এঁকে বেঁকে ফিয়র্ডের জলরেখা অনুসরণ করে উড়ে চলল। আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই ভয়ে আঁতকে উঠেছি—এই বুঝি পাহাড়ের গায়ে বিমানের ডানা দু'টি ধাক্কা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়! বিমানের ডানা দু'টি

পাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁসে যেন গাছের ডগা ছুঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘুরে, রাজপথে মোটর গাড়ী চলার মত, চলেছে। ভয়ে জানলার পরদা টেনে দিলাম। স্টুয়ার্ডেশ তাড়াতাড়ি এল খাবারের ট্রে সঙ্গে নিয়ে, যাত্রীদের মনোরঞ্জন করতে। একটি স্যাণ্ডউইচ ট্রে থেকে তুলে নিয়ে মুখে দিতেই কাঁচা মাছের আঁসটে গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠল। এ যেন সমুদ্রের নোনা কাঁচা মাছ সদ্য তুলে এনে রুটির মধ্যে ভরে দিয়েছে। বিমানের এই বদ্ধ ঘরে কাঁচা মাছের দুর্গন্ধে থাকা দায়! আমার পাশের সহযাত্রীগণ কিন্তু মনের আনন্দে একটার পর একটা স্যাণ্ডউইচ শেষ করে চলেছেন।

আমরা প্রায় আধঘণ্টা এমনি করে ফিয়র্ডের জলচিহ্ন অনুসরণ করে স্টুয়ার্ডেশ আমার কাছে এসে বললে—"বড়ই দুঃখের বিষয়, আকাশ মেঘলা বলে বিমান থেকে ফিয়র্ডের দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আশা করি একটু এগিয়ে আবহাওয়া ভালোই পাব। নরওয়ের ঐশ্বর্য-ই হল এই ফিয়র্ড্। বিমান থেকে ফিয়র্ডের সমগ্র দৃশ্য অতি মনোরম। সারা পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এমন দৃশ্য নেই।"

আমি জানলার ধারে বসে নরওয়ের রূপচ্ছবি দেখছি। আমাদের এই ছোট সি প্লেনটি বেশ নীচে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। নরওয়ের সুদীর্ঘ বিস্তৃত পশ্চিম উপকূল অগণিত দ্বীপপুঞ্জে ঘেরা। দীর্ঘ পার্বত্য তটরেখা আঁকা-বাঁকা ঋজু গিরিখাতে ভরা। কোথাও কোথাও সাগর সলিল গিরিখাতের পথ দিয়ে দেশের মধ্যভাগ অবধি চলে এসেছে। দক্ষিণে অসলো ফিয়র্ড

নরওয়ের সেতু বাঁধা রাজপথ

পৃথিবীর শেষ উত্তর প্রান্তে সূর্যোদয়—নর্থ কেপ
(মিস্টার গালাসে'র সৌজন্যে)
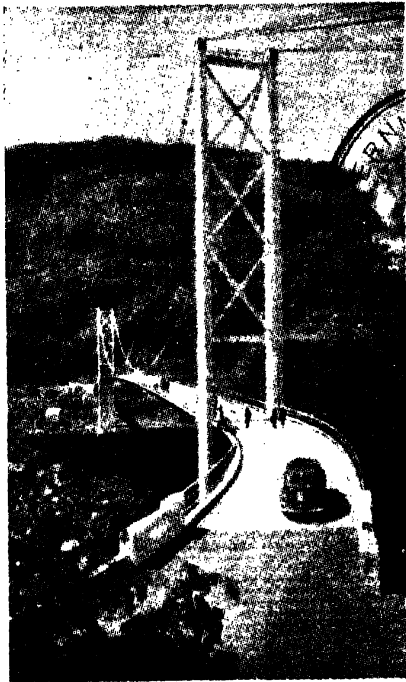
উড়ে চলেছি। হঠাৎ দেখি বিমান ধীরে ধীরে নীচে নেমে জল স্পর্শ করে দাঁড়াল। ষ্টুয়ার্ডেশ এসে জানাল—"আকাশের আবহাওয়া উড়বার পক্ষে অনুকূল না থাকায় বিমান এইখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। আবহাওয়া অফিস থেকে পুনরায় যাত্রার অনুমতি না আসা পর্যন্ত আমাদের এইখানেই অপেক্ষা করতে হবে।"

প্রায় এক ঘণ্টা নৌকার মত বিমান ফিয়র্ডের জলে ভাসছে। আকাশ তেমনি ঘোলাটে।

অল্পক্ষণের মধ্যে বিমান আবার শূন্যে ভাসল; ধীরে ধীরে উঠে এল আকাশের কোলে। নীচে পড়ে রইল বিশাল তরুতরঙ্গ পাষাণ পারাবার।

হ'তে উত্তরের শেষ সীমানায় ফিয়র্ড অবধি সুদীর্ঘ সাগরবেলা এমনি পাথরকাটা ভাঙা খাদে বাঁধা।

বিমান দেশের মধ্যভাগের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। চারিদিকে বিশাল তুষার-প্রবাহ রূপালী রঙে ঝকমক্ করছে। নরওয়ের লোক-বসতি দেখা যায় সাগর উপকূলে, উপত্যকার মাঝে, হ্রদ ও নদীর ধারে ধারে। হিমমেরুর অন্তর্গত এই উত্তরাংশটি অতি শীতপ্রধান।

নরওয়ে এক অতি সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাঙ্গ পার্বত্য প্রদেশ।

পশ্চিম তীর দু'হাজার মাইলেরও অধিক দীর্ঘ। কিন্তু এ-হেন দেশমাতৃকা তাঁর সন্তান পালনে সক্ষম হন নি। দেশটির চারভাগের

তিন ভাগই হল অনুর্বর ও পর্বতাকীর্ণ। চাষের জমি মেলে মাত্র শতকরা চার ভাগ ; চব্বিশ ভাগ বনরাজিসমৃদ্ধ এবং বাকি সমুদয় ভূভাগই হল দীর্ঘোচ্চ পর্বতমরুময়।

বিমান উড়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। নরওয়ের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগ
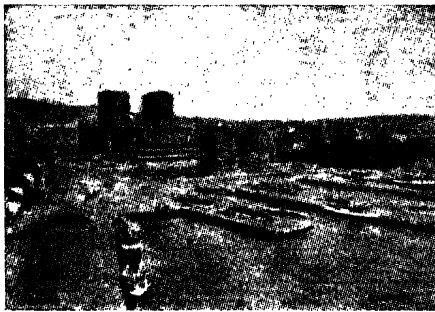
ফিয়ার্ডের ধারে অসলো শহর

ও ট্রণ্ডহাইম ফিয়র্ড ঘিরে ঘনকৃষ্ণ বনচ্ছায়ার শোভা অতি অপূর্ব। পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় সাজানো নগর সৌধাবলী। প্রকৃতির কোলে নিবিড়ভাবে মিলিয়ে আছে গিরিবর্ত্মের আঁকা বাঁকা ক্ষীণ তনুশ্রী। মাঝে মাঝে দেখা যায় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁধা বাঁকা সেতুগুলি। এই সেতু

প্রফেসর সুণ্ডে (Sunde)

ভিন্ন পাহাড়ের এ পারের সাথে ওপারের যোগ রাখা সম্ভব হয় নি। নরওয়ের পর্বতশ্রেণী ও বনানীর ভিতর দিয়ে প্রশস্ত মনোরম রাস্তাগুলি বিদেশীদের মোটর অভিযানের বিশেষ আকর্ষণের স্থান। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মনের নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করে যে পরম আনন্দময় নির্বাধ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে, তারই খোঁজে সে ফিরেছে যুগে যুগে সর্বদেশে সর্বকালে। তাই একদিকে যেমন গড়ে উঠেছে জীবন-সংগ্রামের কঠিন বন্ধন দৃঢ় রূঢ় বাস্তব শহরগুলি, অপর দিকে তেমনি আবার ছুটে চলেছে প্রাকৃতিক রূপমাধুর্যে গড়া পার্থিব শোভা সম্পদের মাঝে নিজেকে একান্ত ভাবে মিলিয়ে দিয়ে উদার অনাবিল মুক্ত প্রাণের আনন্দ উপভোগ।

বিমান অসলো অভিমুখে চলেছে। পাশে ফেলে রেখে এলাম ইউরোপের বৃহত্তম তুষার ক্ষেত্র জসটেডল্ (Jostedals) গ্লেসিয়ার। সন্ (Sogne) ফিয়র্ড ঘিরে প্রায় ৫৮০ বর্গ মাইল ব্যাপী এর পরিধি। গ্রীষ্মকালে সারা ইউরোপবাসীর 'স্কী' খেলার প্রধান কেন্দ্রস্থল হল এই শ্বেত-শৈল তুষার-প্রাঙ্গণটি।

রূপ মহীয়ান নরওয়েতেই ঘটেছে প্রকৃতির সকল রূপের সমাবেশ। তার উপর আবার সারা দেশজোড়া ফিয়র্ডের ভীষণ ভৈরব রূপটি দিয়েছে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের এক অভিনব ঐশ্বর্য।

বিমানে এক সহযাত্রীর সাথে আলাপ হল, নাম মিষ্টার গালার্স (Mr. Gullers)। তিনি সুইডিশ গভর্ণমেণ্টের ষ্টাফ্ ফটোগ্রাফার। তিনিও ট্রমসো শহর ঘুরে ফিরছেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের তরফ হ'তে তিনি ছোট একটি দুই সিটের বিমানে চড়ে ট্রমসোর আরো উত্তরে হেমারফ্যাষ্ট (Hammerfest), স্পিট্‌স্‌বার্গ (Spitzberg) ও নর্থ কেপের (North Cape) উপর দিয়ে তুহিনাবৃত তুন্দ্রা প্রদেশে বেড়িয়ে এসেছেন। এই জুন মাসের প্রথমেও সে সকল দেশে নাকি পথ তুষারে ঢাকা ; কেবল ছোট ছোট নৌকাগুলি জলপথে এই সব দেশে যাতায়াতের সংযোগ রেখেছে। মিঃ গালার্স তাঁর রোলিফ্লেক্স ক্যামেরায় তোলা নর্থ কেপের কয়েকখানি ছবি আমাদের উপহার দিলেন।

বেলা প্রায় ১টায় বিমান অসলো ফিয়র্ডে নামলো। ঘাটের সামনেই দেখা যাচ্ছে অসলোর সুরম্য টাউন-হলের জোড়াবাড়ী। আমরা K. N. A হোটেলে গিয়ে ঘরে বাক্সগুলি রেখে হোটেলের রেস্টুরেণ্টেই লাঞ্চ খেলাম। অখাদ্য খাবার, কিন্তু বিল এল বেশ মোটা রকমের।

সমৃদ্ধ সুইডেনের পাশেই রয়েছে এমন অভাবগ্রস্ত দেশ ; যেন ঐশ্বর্যের পাশে দুর্ভিক্ষ! নরওয়ের যুদ্ধোত্তর অবস্থা যে এতটা শোচনীয় তা আগে ঠিক অনুমান করা যায় নি।

অসলোর সর্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ প্রফেসার সুণ্ডের (Prof Sunde) সাথে পূর্বেই লণ্ডনে আলাপ হয়েছিল। আমাদের পৌঁছনোর সংবাদ পেয়ে তিনি হাসপাতাল ফেরৎ হোটেলে দেখা করতে এলেন।

প্রথমেই ঠিক হল কাল সকালে উনি হাসপাতাল দেখতে যাবেন। তারপর, নানারকম গল্পগুজব ও চা পানের পর ডাক্তার সুণ্ডে তাঁর গাড়ীতে করে আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে বেরোলেন।

অমূলো শহর যেন প্রাণহীন। রাজপথ জনবিরল, পথের ধারে দোকানগুলির শো-কেস পণ্যাভাবে মলিন শ্রীহীন। দারিদ্র্যের ছায়া যেন সারা দেশকে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছে।

ডাক্তার সুণ্ডের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হতে হয়। আমরা পৃথিবীর এতগুলো দেশ দেখেছি শুনে তিনি খুব আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তার দার্শনিকতাপূর্ণ কথাগুলি শুনে আমার খুবই ভালো লাগল। কথায় কথায় তিনি বলে ফেল্লেন—তাঁর একমাত্র সুযোগ্য ডাক্তার-পুত্র শরীরের সামান্য একটি লাল তিল থেকে ক্যানসার হয়ে সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। তিনি নিজেই ছিলেন ডাক্তার। তাই এই দুরারোগ্য ব্যাধির সত্য স্বরূপটি তিনি নিজের দেহেই তিলে তিলে মর্মে মর্মে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুভব করে গেছেন। বিধাতার এ কি পরিহাস! আমরা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে শুনলাম। ডাক্তার শুধু সজল নয়নে একটু হাসলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টাকা-আনা-পাই

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গুস্তাফ ফশ্—বয়সে তরুণ—এ্যাসিষ্টান্ট কাউন্সিলরের চাকরি করে। লুইশার বৃদ্ধ পিতার কাছে সেদিন এসে দাঁড়ালো—লুইশার সে পাণি-প্রার্থী।

বাপ বললেন—হুঁ···কত টাকা রোজগার করছো?

—আজ্ঞে, একশো ক্রোনার···মাসে। কিন্তু লুইশাকে···

—থামো, থামো···বাধা দিয়ে বাপ বললেন—ও আয়ে এখন সংসার চলে না, বাপু!

—কিন্তু আমাদের ভালোবাসা···আমি ভালোবাসি লুইশাকে, লুইশা আমাকে ভালোবাসে···আমাদের সে ভালোবাসায়···

বাধা দিয়ে বাপ বললেন—ভালোবাসায় সংসার চলে না। শোনো আমার কথা—মাসে অন্ততঃপক্ষে···

বাপ হিসাব কষতে লাগলেন।

গুস্তাফ বললে—লিডিংগোয় আমাদের প্রথম আলাপ-পরিচয়···

বাপ বললেন—চাকরির রোজগার ছাড়া আর কোনো দিক থেকে কোনো আয় আছে তোমার?

গুস্তাফ বললে—আজ্ঞে, ও টাকায় আমরা মানিয়ে-বনিয়ে চলতে পারবো। লুইশাও বলেছে···

—হুঁ। কিন্তু আমি লুইশার বাপ যখন বেঁচে আছি··· ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিসাব কষে···মানে, টাকা-পয়সার হিসাব হে, যা না হলে দুনিয়া আজ অচল···।

গুস্তাফ বললে—তা এক্সট্রা কাজ বহুৎ মিলবে, করবো। তা থেকেও···

—কি রকম এক্সট্রা কাজ শুনি? তাতে কত করেই বা মাসে মাসে···

—আজ্ঞে, আমি ফরাশী ভাষা জানি—ছাত্র-ছাত্রীদের ফরাশী ভাষা শেখাবো। তাছাড়া ফরাশী-ভাষার বই তর্জ্জমা ···এবং প্রুফ দেখতে জানি। এ-সব থেকেও···এখন আমি একখানা ফরাশী বইয়ের অনুবাদ করছি···ফর্ম্মা-পিছু পাবলিশার দেবে দশ ক্রোনোর করে'।

—এ বই ক-ফর্ম্মা হবে?

—প্রায় চব্বিশ ফর্ম্মা।

—কতদিনে শেষ হবে অনুবাদ?

—এক মাস।

—তাহলে হিসাবে হয়—চব্বিশ ইনটু দশ···মানে, মাসে দুশো চল্লিশ ক্রোনর···তার পর?···আর কিছু?

—এখন হিসাব করে বলতে পারবো না···নিশ্চিত আয় সম্বন্ধে। মানে, বিয়ের পর দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে···

বাপ বললেন—সংসার কি করে চলবে—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলতে পারো না—অথচ বিয়ে করতে চাও!··· বিয়ে···স্ত্রী···সংসার···এগুলোর সম্বন্ধে তোমার ধারণা দেখছি অদ্ভুত।···জানো বাপু, বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হতে থাকবে···গাদা গাদা···চোখে কানে দেখতে শুনতে দেবে না। তাদের খাওয়ানো-পরানো···রোগে চিকিৎসা, তারপর লেখাপড়া শেখানো···

গুস্তাফ বললে—কিন্তু ছেলেমেয়ে তো বিয়ে করবামাত্র হবে না। যাতে বিলম্বে হয়, হুঁশিয়ার থাকবো। মানে,

আমাদের ভালোবাসা···অর্থাৎ দুজনে এ ভালোবাসায় নন্দন রচনা করে থাকতে চাই।

—ছেলেমেয়ে হওয়াটা···মানুষের ইচ্ছাধীন বলতে চাও, বাপু!···বুঝেচি, দুজনে দুজনকে ভয়ানক ভালোবাসো—শুধু আমার মতের ওয়াস্তা···এই তো! তা, আমার আপত্তি নেই···মেয়ের বিয়ে দেবো এতে আপত্তি থাকতে পারে না। আমার কথা হচ্ছে, সামান্য আয়ে সংসার গড়ে তোলা চলে না—অশান্তি উৎপাত সার হয়। আয় বাড়াও···আয় বাড়াও···তারপর বিবাহ করো। বিবাহের পর শুধু নন্দন রচনা নয়—খেটে আয় বাড়াতে হবে, মনে রেখো।

মত মিলেছে···আঃ! গুস্তাফের মন উল্লাসে প্রমত্ত। লুইশা শুনলে কত খুশী হবে!···দুজনে এনগেজ্‌ড্‌ হবে···বাহুতে বাহু মিলিয়ে দুজনে···

প্রত্যহ সন্ধ্যায় গুস্তাফ আসে লুইশার কাছে—পকেটে একতাড়া করে' প্রুফ···লুইশার বাপকে দেখাবার জন্যও বটে—যে এখন থেকেই এক্সট্রা কাজ করে' আয় বৃদ্ধি—তাঁর উপদেশ-মতো!

বাপ খুশী হলেন দেখে। বললেন—হুঁ···এই তো মানুষের আচরণ।

নিত্য এ-বাড়ীতে এসে প্রুফ দেখা আর লুইশার সঙ্গে হাসি-গল্প···

একদিন বিশ্রামের জন্য লুইশাকে নিয়ে গুস্তাফ চললো থিয়েটারে। বাড়ীর দোরে নিয়ে এলো ভাড়াটে গাড়ী—সেই গাড়ীতে লুইশাকে নিয়ে থিয়েটার। যা-তা শীটে বসানো চলে না—বেশী দাম দিয়ে ভালো শীট কিনলো···গাড়ী ভাড়া আর টিকিটে খরচ হলো দশ ক্রোনর।

তারপর দুদিন ফরাশী-শেখা ছাত্রদের কাছে না গিয়ে লুইশাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। বেরিয়ে সেন্ট সাবান এবং আরো দু-চারটে টুকিটাকি কেনা—এ দুদিনে খরচ কম হলো না।

বিবাহের তারিখ হলো ধার্য্য। তখন গৃহ-রচনার পরামর্শ দুজনে মিলে। সে গৃহের জন্য যে-সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন···আলো বাতাস আসে এমন একখানি ফ্ল্যাট···ভদ্রপল্লী···খাট বিছানা—সোফা কৌচ পর্দা আয়না আলনা···লুইশার পছন্দ নীল রঙের সিল্কের লেপ···মেঝের জন্য ম্যাট্রেস, ফুলদানী—বাতিদান কেনা হলো লাল-সেড দেয়া!···পুরোনো কিউরিয়োর দোকান থেকে পোর্শিলেনের তৈরী ভেনাস-মূর্ত্তি···খানা-টেবিল ছুরি কাঁটা প্লেট ডিশ···

এ-সব কিনতে মোটা টাকার চেক্ কাটতে হলো গুস্তাফকে।

এ সবের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত···গুস্তাফের কামাই গেল একস্ট্রা কাজে। ছাত্র পড়াবে অবসর নেই। প্রুফ কখন বা দেখবে!—একদিকে খরচ, অন্যদিকে উপরি-আয়ের অভাব—গুস্তাফের মনে কাঁটার যাতনা, তবু সান্ত্বনা দিলে মনকে—এ সব পূরণ করে নেবো বিবাহের পর!

দুজনে কথা হয়—খুব হুঁশিয়ার হয়ে খরচ-পত্র করা! যা না হলে নয়! বিলাসিতা একেবারে বর্জ্জন। ফ্ল্যাটে ছোট দেখে কামরা নেওয়া হলো। ভাড়া মাসে পঞ্চাশ ক্রোনর। দুখানি কামরা—একখানি শোবার—আর একখানিতে খাওয়া-দাওয়া এবং বন্ধুবান্ধব এসে বসবে···আরো ছোট দুটি কামরা—তার একটিতে হবে ভাঁড়ার, আর একটিতে রান্নাবান্না।

তারপর নির্দ্দিষ্ট তারিখে বিবাহ···

সেদিন শনিবার—রাত্রে বন্ধু-বান্ধবের আসা। রবিবারে দুজনের ঘুম ভাঙ্গলো বেশ বেলায়···ঘুম ভাঙ্গতেই মনে হলো, সংসার···আজ থেকে এ সংসারের তরী দুজনকে বাইতে হবে—সব দায়িত্ব দুজনের।

নূতন বধূ এসেই রান্না করবে কি! পাচিকা রাখা হয়েছে···লুইশা বলে—দু-মাস থাকুক—আমাকে দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে নিতে হবে। তার পর নিজে রাঁধবো। না হলে অনর্থক বহু পয়সা অপব্যয়।

ঘুম থেকে উঠে লুইশার সাজসজ্জা···গুস্তাফ সাজালো চায়ের টেবিল। পাচিকা রান্নার আয়োজন করছে।

আজ চায়ের আয়োজনে একটু সমারোহ···রান্নাবান্নার ব্যাপারেও তাই। গুস্তাফ বললে—দু-চার-দিন—একটু বৈচিত্র্য···তারপর থেকে হুঁশিয়ার হয়ে চলা!

লুইশা বললে—বুড়োরা অতি-সাবধানী। তাছাড়া এ বয়সে জীবনটাকে যদি না উপভোগ করলুম···

বিকেলে এলো ভাড়া-করা ভালো গাড়ী—জুড়ি জোতা। সেই গাড়ীতে চড়ে দুজনে বেরুলো বেড়াতে···নদীর ধারে

দিয়ে পার্কের পাশ দিয়ে কত পথ ঘুরে এলো। পথে দেখা পরিচিত অনেকের সঙ্গে···তারা জানালো অভিনন্দন। বললে—খাশা রূপসী স্ত্রী পেয়েছো!

স্ত্রীর রূপের গৌরবে গুস্তাফের মনে কী গর্ব্ব!

তার পরের রবিবারে দুটি ভালো ঘোড়া আনা হলো ভাড়া করে। সে ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি দুজনের বিচরণ। মনে হচ্ছিল, গল্পে যেমন পড়েছে—নায়ক নায়িকার ঘোড়ায় চড়ে প্রেম-পরিক্রমা!···

বিবাহের পর একটা মাস—বৈচিত্র্য···খরচ খুব—তা হোক! জীবনকে উপভোগ করা চাই! এর পর সংসারের কঠিন রুক্ষতা আছেই তো। তা বলে এখন থেকেই!

চললো পার্টি ডিনার সাপার থিয়েটার···কোলাহল আর কলরব! তবু এ-সব ছেড়ে ছোট গৃহকোণে দুজনে যখন থাকে, মনে হয়, এমন মধুময় মুহূর্ত্ত জীবনে আর কৈ!

সখ আছে—তাতে খরচ হয়। এ খরচ না করে থাকা যায় না। গুস্তাফ বলে—যাক, কটা দিন! তার পর থেকে—

লুইশা কোনো কথা বলে না, চুপ করে থাকে!

লুইশা মাঝে মাঝে বাজারে যায়—কিনে আনে সৌখীন খাবার—কোনোদিন স্মোক্‌ড্ সামন—কোনোদিন দামী বার্গাণ্ডি···গুস্তাফকে চমকে দেয় সুখবর দিয়ে। দাম শুনে গুস্তাফ শিউরে ওঠে···মুখে কিছু বলতে পারে না। রূপসী কিশোরী স্ত্রী! তার মনে কত রকম সাধ হবার কথা! স্বামী হয়ে সে যদি সে-সাধ না মেটায়, তাহলে সে নরাধম।

দুমাস কাটবার পর লুইশারের হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাধি হ'ল। ঠাণ্ডা লাগলো? না, ফুড-পয়শনিং? বমি করে কেন? ডাক্তার আনা হলো। তিনি বললেন—ভয়ের কারণ নেই। এখন ঠিক বলতে পারছি না! আরো মাসখানেক না গেলে—

গুস্তাফ বললে—ঘরের দেয়ালে নক্সাদার কাগজ আঁটা, তা থেকে কোনো রকম ইনফেকশন?

ডাক্তার হাসলেন···বললেন—না, না, ও সব নয়। বললুম তো আরো একমাস না গেলে নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।

গুস্তাফের অবিশ্বাস হলো ডাক্তারকে···দেয়ালের খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে গেল সে এক কেমিষ্টের কাছে; বললে, পরীক্ষা করে দেখুন তো—কোনো রকম ইনফেকশন···

ফী নিয়ে কেমিষ্ট দিলে রিপোর্ট—না, কাগজে কোনো দোষ নেই।

লুইশা কোনোদিন ভালো থাকে, কোনোদিন বমি করে···তার দেহে কেমন শীর্ণতা···কত ডাক্তার আনবে?

গুস্তাফ ডাক্তারী বই কিনলো দু-চারখানা···শস্তা দামের প্রাথমিক বই। সে বইয়ের পাতা খুলে লুইশার নানা উপসর্গের লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে···পড়ে যা বুঝলো—মাসখানেক পরে সেই ডাক্তার আবার এলেন···এসে বললেন—হুঁ···সন্তান-সম্ভাবনা।

গুস্তাফ চমকে উঠলো। ভেবেছিল—জীবনকে যৌবনকে উপভোগ করবে দুদিন। কিন্তু···

লুইশা খুব খুশী। সে বললে—ছেলে হবে! তোমার কি মনে হয়—ছেলে? না···মেয়ে?

গুস্তাফ জবাব দেয় না। লুইশা বলে—ছেলে হলে সে ছেলের কি নাম রাখবে? তার পোষাক-আসাক? লুইশা তৈরি করে মস্ত ফর্দ্দ···সে ফর্দ্দ পড়ে' শোনায়।

গুস্তাফ শোনে।

সেদিন লুইশা বললে—বিয়ে করে ইস্তক তুমি তো এক্সট্রা কাজ ছেড়ে দেছো দেখছি। কি করে চলবে অল্প আয়ে? ছেলে হবে—খোকা···তার জন্য কত কি দরকার······

গুস্তাফ নিশ্বাস ফেললে, বললে—হুঁ···

পরের দিন সকালে এ্যাসিষ্টাণ্ট কাউন্সিলর তার এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালো···টাকা চাই···ধার হাণ্ডনোটে। বললে, স্ত্রী আসন্নপ্রসবা···অনেক টাকা খরচ হবে। হাতে সঞ্চয় কিছু নেই।

ব্যারিষ্টার বললে—হ্যাঁ বিয়ে করে পুত্র-কন্যা ফশলের চাষ···রাজা-উজীরের পোষায় হে, সখের খরচ!··· আমি যা দেখছি···বিয়ে করার কথা মনে হলে আতঙ্ক হয়!

লজ্জায় ফশের মাথা নুয়ে পড়লো···টাকার কথা আর বলতে পারলো না। খালি হাতে বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফিরে শুনলো, কারা এসেছিল। অনেক লোক···গুস্তাফের কাছে। গুস্তাফ ভাবলো···নিশ্চয় আর্মিতে যখন কাজ করতুম, বন্ধু ছিল লেফটেনাণ্টের দল···তারা!

শুনলো, না! যারা এসেছিল, বয়সে প্রবীণ··· ছেলে-ছোকরা নয়। লেফটেনাণ্ট হতে পারে না তাহলে!

ছেলেবেলার কোনো বন্ধু? আপশালো?··· বোঝা গেল না। রহস্য! যাক—আবার আসবে'খন। এত চিন্তা কিসের।

তার পর বাজার যেতে হলো···দরকারী জিনিষপত্তর সঙ্গে কিনে আনলো এক রাশ ষ্ট্রবেরি···দাঁওয়ে পাওয়া গেছে···ছাড়তে নেই।

লুইশাকে বললে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে—ভাবো একবার লুইশা···এই এতগুলো ফল! বছরের এ সময়ে···দাম নেছে দেড় ক্রোণ মাত্র।

লুইশা খুশী হলো না। বললে—কিন্তু গুস্তাফ···সামনে কত খরচ···এখন একটি পয়সা অপব্যয় করা চলে না।

—হুঁ। ভেবোনা লুইশা···আমি এক্সট্রা-কাজের ব্যবস্থা করেছি!

—কিন্তু অনেক টাকা দেনা জমে রয়েছে।

—দেনা। কুচো কুচো কতকগুলো এখানে-সেখানে—বলতো! হুঁ···সে আমি ব্যবস্থা করেছি।

—কি ব্যবস্থা, শুনি?

—এক জায়গা থেকে মোটা টাকা ধার নিচ্ছি। তাই থেকে কুচো দেনা সব শোধ করে দেবো।

লুইশার দু'চোখ বিস্ফারিত···লুইশা বললে—পাহাড়ের ভার মাথায় নিচ্ছ···এতে আরও কত অসুবিধা!

—উঁহু···কিচ্ছু ভেবোনা লুইশা। এক্সট্রা কাজ অনেক জোগাড় করবো···। তুমি মনকে প্রফুল্ল রাখো। ষ্ট্রবেরি এনেছি···আর এক বোতল শেরি আনাই···না, না, বারণ করোনা। ব্যবস্থা পাকা না করে কি আর আমি···

চাকর আছে বাড়ীতে। তাকে পাঠানো হলো এক বোতল শেরি আনতে।

সন্ধ্যার সময় লুইশা বললে—একটা কথা বলবো···রাগ করবে না?

—না, রাগ কিসের! বলো···কি বলবে। বুকখানা একটু কাঁপলো—লুইশা টাকা চাইবে না তো?

লুইশা বললে—মুদি এসে আজ খুব বকাবকি করে গেছে···টাকার জন্য। মাংসওলা বলে গেছে, পুরোনো টাকা সব না চুকিয়ে দিলে সে আর ধারে মাংস দেবে না। আর···

—থাক, থাক—পাওনাদার তো! বলো, কারো কাণাকড়ি বাকি থাকবে না—সব পাওনা চুকিয়ে দেবো। এখন চলো···জ্যোৎস্না রাত্রি···একখানা গাড়ী আনাই। গাড়ী করে খানিক চক্কর দিয়ে আসি। এ-সময়ে তোমার প্রয়োজন আলো-বাতাসের···পার্কে গিয়ে খানিক বসবে, চলো।

গাড়ী এলো। গাড়ী চড়ে মাঠের ধার ঘুরে পার্ক··· সেখানে খানিক বসে তার পরে আনাহাসভ্রা রেস্তরাঁ। রেস্তরাঁয় বসে পান-ভোজন···মনে আনন্দ ভরপুর।

বিল এলো। মোটা টাকা। নিশ্বাস ফেলে বিল চুকিয়ে দুজনে গাড়ী করে বাড়ী ফিরলো।

এমনি করে দিন চলেছে···মোটা টাকা ধার করে কুচো-দেনা শোধ। তারপর আরো মোটা টাকা ধার করে এ মোটা টাকার ধার শোধ···এক্সট্রা কাজ যা আসে, তাতে কুলোয় না। কিন্তু উপায় কি! জীবনকে উপভোগ করা চাই!···মানুষের অভাব কবে আর মেটে! তা বলে—

গুস্তাফের মন দু-দু করে ওঠে যখনি দেনার কথা মনে জাগে।

অবশেষে সে-দিন এলো। নার্শ চাই···লুইশার প্রসব। মেয়ে। গুস্তাফ শিশুকে নিলে বুকে—বাহিরে সদরে পাওনাদারদের আবির্ভাব।

মিনতিভরা কণ্ঠে গুস্তাফ বললে—দুদিন সবুর করুন—সদ্য মেয়ে জন্মেছে।

তারা চলে গেল—বললে,—দুদিন সবুর করবো। তখন টাকা না পাই, আদালতে যাবো।

পরের দিন সকালে গুস্তাফ ছুটলো শ্বশুরের কাছে—শ্বশুরকে জানালো সংসারের অবস্থা।

শ্বশুরের মুখ গম্ভীর! গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন—বেশ···বিপদে পড়েছো···সাহায্য করছি। কিন্তু এই প্রথম, আর এই শেষ। আমার এই বয়স···খাটবার সামর্থ্য নেই—সঞ্চয় যা আছে, তা খুব সামান্য। নিজের সংসার আছে। সে সংসার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য···

গুস্তাফের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী—তার জন্য চাই ওষুধপত্র, তার জন্য চাই পুষ্টিকর খাদ্য···চিকেন-সুপ এবং সুরা···দামী জিনিষ! তার জন্য আমীরি খরচ!

ভাগ্য সদয় হলো। এক মাসেই লুইশা পেলো দেহে শক্তি সামর্থ্য···

শ্বশুর বললেন জামাইকে—হুঁশিয়ার হয়ে চলো—আর ছেলেমেয়ে যেন না হয়!

গুস্তাফ এবং লুইশার দিন চললো—ভালোবাসা এবং ক্রমবর্দ্ধমান ঋণের উপর ভর রেখে!···কিন্তু একদিন ঘটলো বিপর্য্যয়···ঋণের ভার বেড়ে হ'ল পাহাড়ের মতো এবং তার ফলে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ।

বাড়ীর জিনিষপত্র গেল নিলামে বিক্রী হয়ে···ফ্ল্যাট থেকে বিতাড়িত। দেউলিয়াকে বেশী ভাড়ায় কেউ ফ্ল্যাট ভাড়া দেবে না! কোথায় আশ্রয়।

শ্বশুর এসে লুইশা এবং লুইশার শিশু-কন্যাকে নিয়ে গেলেন নিজের গৃহে; জামাইকে বললেন—কষ্ট করে কোথাও মাথা গুঁজে থাকো···রোজগার করো। আমার মেয়ে আর নাতনির ভার আমি নিচ্ছি। তোমাকে ভাবতে হবে না তাদের জন্য!···যতদিন আমি বাঁচবো, তাদের পুষতে পারবো। কিন্তু তার পর···

জামাই কোনো কথা বললে না, শুধু একটা নিশ্বাস ফেললো।

শ্বশুর বললে—সঞ্চয় করো। না হলে এদের উপায় কি হবে! দুর্গতির সীমা থাকবে না যে। দেউলিয়া হয়ে চাকরিটি ঘুচিয়েছো। ভাখো চেষ্টা-চরিত্র করে, কি কাজ পাও। যে কাজ পাবে, মাথায় করে নেবে—দেউলিয়া মানুষের আবার মান-মর্য্যাদা কি!

লুইশা এলো বাপের কাছে—সাশ্রু লোচন···কত সাধে নিজের সংসার পেতে বসেছিল! হায়রে, ভাগ্য!

গুস্তাফের যেন অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে।···কোনোমতে একটা খবরের কাগজের অফিসে প্রুফ-রীডারের চাকরি জোগাড় করেছে। হাপাসানোতেই থাকে—হোটেলে খায়।···খরচপত্র করে খুব বুঝে···তিন মাসে কিছু সম্বল জমলো—সামান্য। তবু কিছু জমলো।

শ্বশুর খুশী হলেন। বললেন, শনিবার অফিসের পর আমার ওখানে আসবে। শনি রবি···দুদিন সেখানে থাকবে···স্ত্রী-মেয়ের সঙ্গ-সুখ···

গুস্তাফ যেন স্বর্গ পেলো হাতে! রবিবারে লুইশার কাছে বিদায় নেবার সময় তার দুচোখ জলে ভরে ওঠে! লুইশার চোখেও জল···মুখ মলিন—গুস্তাফ বলে—জীবনটা এমনি করেই কাটবে লুইশা! পরের ঘরে তুমি থাকবে পরের অনুগ্রহে! কবে আমার সামর্থ্য হবে তোমাকে নিয়ে, মেয়েকে নিয়ে সংসার পাতবো!

লুইশা কোনো জবাব দেয় না। কি জবাব দেবে? কি না পেয়েছিল দুজনে—কিন্তু রাখতে পারলো না!

দুজনে ভাবে, কি কঠিন এ পৃথিবী! এখানে বাস করতে হলে কতখানি হুঁশিয়ার হতে হয়···চলার পথ যেন গণ্ডী ঘেরা! সে গণ্ডীর বাহিরে পা দিলে কী ভীষণ বিপর্য্যয় না ঘটে!*

(সুইডিশ গল্প : অগষ্ট্রিণ্ডবার্গ)

নূতন মন্ত্রিমণ্ডল—

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পুনরায় ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ সহকারী রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইবার পরে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত রাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডলের নাম ঘোষণা করিয়াছেন :—

পূর্ণ মন্ত্রী—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—পররাষ্ট্র বিভাগ
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা, স্বাভাবিক সম্পদ ও
বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ
গোপালস্বামী আয়েঙ্গার—দেশরক্ষা বিভাগ
রাজকুমারী অমৃত কাউর—স্বাস্থ্য বিভাগ
কৈলাসনাথ কাটজু—স্বরাষ্ট্র ও সামন্ত-রাজ্য বিভাগ
রফি আহম্মদ কিদোয়াই—খাদ্য ও কৃষি বিভাগ
চিন্তামন দেশমুখ—অর্থ বিভাগ
জগজীবন রাম—যানবাহন বিভাগ
গুলজারীলাল নন্দ—পরিকল্পনা ও নদী-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ
টি, কৃষ্ণমাচারী—বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ
চারুচন্দ্র বিশ্বাস—আইন ও সংখ্যালঘিষ্ঠ বিভাগ
লালবাহাদুর শাস্ত্রী—রেলপথ ও পরিবাহন বিভাগ
সর্দ্দার শরণ সিংহ—পূর্ত্ত, বাস ও সরবরাহ বিভাগ
ভি, ভি, গিরী—শ্রম বিভাগ
কে, সি, রেড্ডী—উৎপাদন বিভাগ

"ক্যাবিনেটে" আসনহীন পূর্ণ মন্ত্রী—

অজিতপ্রসাদ জৈন—পুনর্ব্বসতি বিভাগ
সত্যনারায়ণ সিংহ—পার্লামেন্টের ব্যাপার বিভাগ
মহাবীর ত্যাগী—অর্থ বিভাগ
বালকৃষ্ণ কেশকার—সংবাদ ও বেতার বিভাগ

সহকারী মন্ত্রী—

দত্তাত্রেয় পরশুরাম কর্ম্মকার—
সুরেন্দ্রনাথ বুরগোহাইন—

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পরে পুরাতন মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যরা পদত্যাগ করিলে—রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসদলের দলপতি শ্রীজওহরলাল নেহরুকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলেন এবং তিনিই সহকর্ম্মী বাছিয়া এই মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন।

মন্ত্রিমণ্ডলে নবাগত—

(১) ভি, ভি, গিরী—ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন।

(২) সর্দ্দার শরণ সিংহ—শিক্ষকতার পর ইনি ব্যবহারাজীবের কাজ করেন এবং পান্থীক দলের কর্ম্মী ছিলেন।

(৩) লালবাহাদুর শাস্ত্রী—ইনি যুক্তপ্রদেশের লোক। পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের দলপতি হইয়া ইঁহাকে সাধারণ সম্পাদক করিয়াছিলেন।

(৪) কে, সি, রেড্ডী—ইনি মাদ্রাজের লোক এবং মহীশূর কংগ্রেস-দলের দলপতি ছিলেন।

(৫) টি, কৃষ্ণমাচারী—ইনি মাদ্রাজের লোক এবং ভারতের সংবিধান রচনা সমিতির সদস্য ছিলেন।

দেখা যাইতেছে, শ্রীনেহরু যে বলিয়াছিলেন কার্য্য-পরিচালন জন্য নূতন নূতন লোকের আগমন বাঞ্ছনীয়, সে মতানুসারে মন্ত্রি-মণ্ডল গঠিত হয় নাই ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাতনের পুনরাগমন হইয়াছে।

এ বার মন্ত্রিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য, কংগ্রেসীদিগের মধ্যে যে উপদল পণ্ডিত নেহরুর অনুগামী সেই দল হইতেই মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। বল্লভভাই পেটেলের মৃত্যুতে তাঁহার অনুগামীদলকে অবজ্ঞা করা সম্ভব হইয়াছে। তবে, বোধ হয়, একই উপদল হইতে মন্ত্রি-নিয়োগে কার্য্য পরিচালনার সুবিধা হইতে পারে। এ বার বিরোধী দলের আবির্ভাবও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। এই বিরোধীদল পূর্ব্বের তুলনায় প্রবল হইলেও বিভিন্ন দলে গঠিত—সুতরাং দুর্ব্বল। কেবল সে সকল দলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মাদ্রাজে ও পেপসুতে যে অবস্থা লক্ষিত হইতেছে কেন্দ্রেও সেই অবস্থা মধ্যে মধ্যে ঘটিতে পারে। সুতরাং আকস্মিক পরাজয়ের আশঙ্কায় মন্ত্রিমণ্ডলকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। তবে আশা করা যায়, প্রাথমিক সংঘর্ষের পরে সকল দলই কতকগুলি বিষয়ে একযোগে কাজ করিতে পারেন। বিরোধী দলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একত্রিত করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা সাফল্যলাভ করিবে কি না, লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এ বার মন্ত্রীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে ; কিন্তু কাজ বাড়িয়াছে, বলা যায় না।

পূর্ব্বে ৩ শ্রেণীর মন্ত্রী ছিলেন—

(১) ক্যাবিনেট মন্ত্রী

(২) মিনিষ্টার অব ষ্টেট

(৩) ডেপুটী মিনিষ্টার

এবার চতুর্থ শ্রেণীর যোগ হইল—ক্যাবিনেটে স্থানহীন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার। কেহ কেহ ইহা "সোনার পাথরের বাটি" মনে করেন। এই শ্রেণীর মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা ও বেতনাদি ক্যাবিনেট মিনিষ্টারের মতই হইবে কি না, বলা যায় না। ইঁহারা ক্যাবিনেটের অধিবেশনে যোগ দিতে পারিবেন। সে অবস্থায় এই নূতন শ্রেণীর প্রবর্ত্তন কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে, বলা যায় না। উভয় শ্রেণীতে প্রভেদ এত সামান্য ও সূক্ষ্ম যে তাহার বিলোপ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। বৃটেনে অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিচালনভার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মন্ত্রীদিগকে দিয়া তাঁহাদিগকে ক্যাবিনেটে আসনে বঞ্চিত করা হয় বটে, কিন্তু অজিতপ্রসাদ জৈন ও বালকৃষ্ণ কেশকার কেহই তরুণ নহেন এবং পুনর্ব্বসতি এবং সংবাদ ও বেতার বিভাগদ্বয়ের গুরুত্বও অল্প নহে। সুতরাং নূতন শ্রেণীর মন্ত্রী নিয়োগ করিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। নূতন মন্ত্রীদিগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এক জন।

নূতন গভর্ণর—

ভারত সরকারের নিয়মানুসারে সকল প্রাদেশিক গভর্ণরকে পদত্যাগ করিতে হয়। সেই নিয়মে পদত্যাগের পরে, ৪টি প্রদেশে পুরাতন গভর্ণরের স্থানে নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন :—

(১) ভূতপূর্ব্ব কৃষি-মন্ত্রী কানাই মুন্সী যুক্তপ্রদেশের,

(২) ভূতপূর্ব্ব সংবাদ ও বেতার মন্ত্রী আর, আর, দিবাকর বিহারের,

(৩) ভূতপূর্ব্ব বিচারক ফজল আলী উড়িষ্যার,

(৪) গিরিজাশঙ্কর বাজপাই বোম্বাইএর গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

উড়িষ্যায় হিন্দু মন্দিরের বাহুল্য থাকিলেও তথায় পর পর দুই বার মুসলমান গভর্ণর হইলেন। উড়িষ্যার গভর্ণর আসফ আলী অবশ্য বেকার হইলেন না ? তাঁহাকে আবার বিদেশে ভারত সরকারের চাকরীতে বহাল করা হইল।

গিরিজাশঙ্কর বাজপাই ইংরেজের আমলের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা সেই সময়ের। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের এজেন্ট-জেনারলের কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

মুন্সীজী agriculture (অর্থাৎ কৃষি) অপেক্ষা culture (অর্থাৎ সংস্কৃতি) সম্বন্ধেই অধিক কথা বলিয়া আসিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে—তিনি সময় সময় সম্ভব ও অসম্ভব অনেক স্বপ্ন দেখেন—সে সকলের "গোড়া নাই আগা।"

দিবাকর মহাশয় যে পদে ছিলেন, তাহাতে যোগ্যতার বা অযোগ্যতার পরিচয় দেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব—

সংবাদপত্রে সুন্দরবন অঞ্চলের কতকাংশে দারুণ খাদ্যাভাবের বিবরণ (সচিত্র) প্রকাশিত হইবার পরে সচিব ডক্টর আমেদ ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে যাইয়া স্বীকার করিয়াছেন :—

(১) ঐ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে গত ২ বৎসর ধান্যের ফলন অর্দ্ধেকও হয় নাই ; কোন কোন স্থানে ফশলের শত-করা ৭৫ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(২) অভাবের তাড়নায় কতক লোক অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে এবং লোক বাধ্য হইয়া (বহুল পরিমাণে না হইলেও) জমী, গবাদি গৃহ-পালিত পশু ও লাঙ্গল বিক্রয় করিয়াছে। এক মাস পূর্ব্ব হইতে দুর্দ্দশা দারুণ হইয়াছে এবং বহু লোকের খাইবার ও বীজের ধান নাই।

(৩) খাদ্যদ্রব্য ও কাপড় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু লোকের কিনিবার সামর্থ্য নাই।

(৪) বহু লোক খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল হইয়াছে।

এইরূপ স্বীকারোক্তির পরেও কিন্তু সচিব বলিয়াছেন—ঐ অঞ্চলে সরকার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে পারেন না ! কিন্তু তিনি যে সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষ বলাই "ফেমিন কমিশনের" মত।

আবার দেখা যায়, গত এপ্রিল মাসের প্রথমে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থা জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সরকারের এমনই ব্যবস্থা যে, তাঁহার রিপোর্ট বিভাগীয় কমিশনারের মন্তব্যসহ ঐ মাসের শেষ সপ্তাহের পূর্ব্বে দপ্তরখানায় পাওয়া যায় নাই। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক ও বাহুল্য ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য—জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগের কমিশনার কি সচিব ঐ অঞ্চলে যাইবার পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন ? যদি না যাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে ?

আর একটি কথা, এ কথা কি সত্য যে, সুন্দরবনের কর্ম্মী ভোলানাথ ব্রহ্মচারী পূর্ব্বে যে সকল স্থানে বাঁধ সংস্কার করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তাহা করেন নাই, সেই সকল স্থানেই কি বাঁধ ভাঙ্গায় সর্ব্বনাশ হইয়াছে ?

কেবল সুন্দরবনের ঐ অঞ্চলেই নহে, পরন্তু জয়নগর অঞ্চলেও দারুণ খাদ্যাভাবের সংবাদ সংবাদপত্রে পরিবেশিত হইতেছে।

সচিব বলিয়াছেন, কোন অঞ্চলে খাদ্যোপকরণ অপ্রাপ্য না হইলে এবং অনাহারে লোকের মৃত্যু না হইলে সরকার দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে পারেন না। অর্থাৎ অনাহারে লোক না মরিলে যাহারা জীবিত তাহাদিগকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা "ফেমিন কোডের" নিয়মানুসারে দেওয়া যায় না। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাগ্রহে লোকের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন না।

সরকারের পক্ষীয় ও সমর্থকদলের বিবৃতির পর বিবৃতিতে অবস্থার গুরুত্ব গোপন করিবার যে চেষ্টাই কেন হউক না—সত্য গোপন করা

সম্ভব হইতেছে না ও হইবে না। "কাটা কাণ তুলা দিয়ে ঢাকা" নীতি সমর্থনযোগ্য নহে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ইতোমধ্যে কংগ্রেসাতিরিক্ত দলসমূহের সদস্য যে সকল ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন —দপ্তরখানায় (ব্যবস্থা পরিষদ গৃহে নহে) তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া খাদ্যাবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেও এখনও ব্যবস্থা পরিষদে স্থান পান' নাই। সুতরাং ইঁহাদিগকে আহ্বানের সার্থকতা কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইঁহাদিগের কাহারও কোন প্রস্তাব যে গৃহীত হইয়াছে, এমনও মনে হয় না। কেবল প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—

(১) সরকারের ধান্য-গ্রহণ নীতির পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

(২) আগামী বর্ষে নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হইবে—জমীর অনুপাতে কৃষককে ধান্য দিতে বাধ্য করা হইবে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের লোকের অধিক গমজাত খাদ্যোপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

যে নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত করা হইবে—প্রধান-সচিব নির্ব্বাচিত কিন্তু কর্ত্তব্য পালনের সুযোগে বঞ্চিত ব্যক্তিদিগকে তাহার সমর্থনে কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন! ইহার জন্য তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

গমজাতদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য—ভারত রাষ্ট্রে কি প্রভূত পরিমাণ গম উৎপন্ন হইতেছে যে, গম চাউলের স্থান অধিকার করিতে পারে? যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ যদি ভারত সরকার দেশে দেশের লোকের প্রয়োজনানুরূপ ধান্য বা গম কিছুই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে না পারেন—কেবল বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াও লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করিতে না পারেন, তবে লোককে চাউলের পরিবর্ত্তে গম ব্যবহার করিতে বলার সার্থকতা কোথায়? এ দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত গমের দামও বাড়াইয়া লোককে স্মরণ করাইয়াছেন— "বোঝার উপর শাকের আঁটি।"

প্রধান-সচিব কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে লোককে সরকারের সাহায্যদান-কার্য্যে সহযোগ ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন নাই; তাহা সরকারের অধিকারে হস্তক্ষেপ! আর পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার কার্য্যেও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে (এখনও তাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশাধিকার লাভ করেন নাই) সাহায্য করিতে বলা হয় নাই।

যে খাদ্য-সচিব নির্ব্বাচনে পরাভূত হইয়াছেন, তিনিও সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি যে লোকের আস্থা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাই কি নির্ব্বাচনে প্রতিপন্ন হয় নাই?

আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কি করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য—

গত বৎসর ২৭শে জুন (১৯৫১ খৃষ্টাব্দ) খাদ্য-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—গত কয় বৎসরে যে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা মুদ্রামূল্য হ্রাসের জন্যও নহে, ফসল কম হওয়ায়ও নহে—লোকের সঞ্চয়-প্রবৃত্তির জন্য। সেই সঞ্চয়-প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য প্রবল ও উৎকট চেষ্টার ফলে কি তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে? যাহাই কেন হইয়া থাকুক না, মূল্য বৃদ্ধির গতি অনব্যাহতই রহিয়াছে। গত ২৯শে এপ্রিল সরকার যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা গিয়াছে—

২৩শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে চাউলের মূল্য গড়ে ২৮ টাকা ১৩ আনা মণ হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মূল্য ২৬ টাকা ১৩ আনা ছিল। অর্থাৎ এক সপ্তাহে মূল্য-বৃদ্ধি ২ টাকা মণ! সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৫০ টাকা এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্য ১৬ টাকা মণ।

গত বৎসরের ও বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে দেখা যায়—

জিলা	২৩শে এপ্রিল (১৯৫২)	১৬ই এপ্রিল (১৯৫২)	২৫শে এপ্রিল (১৯৫১)
বর্দ্ধমান	২৬ টাকা ১০ আনা	২৪ টাকা ২ আনা	২০ টাকা ৮ আনা
বীরভূম	২০ টাকা ৪ আনা	১৯ টাকা ৮ আনা	১৮ টাকা
বাঁকুড়া	১৭ টাকা	১৬ টাকা ৬ আনা	১৫ টাকা ১৩ আনা
মেদিনীপুর	১৭ টাকা ১৩ আনা	১৬ টাকা ১২ আনা	১৭ টাকা ১৫ আনা
পঃ দিনাজপুর	১৫ টাকা ১৫ আনা	১৪ টাকা ৭ আনা	১৯ টাকা ১২ আনা
মালদহ	৩৫ টাকা ৯ আনা	২৫ টাকা ৮ আনা	৩৫ টাকা ৮ আনা
কুচবিহার	৪২ টাকা	৩৬ টাকা ৬ আনা	৪৬ টাকা ১৪ আনা
নদীয়া	৩৭ টাকা ১০ আনা	৩১ টাকা ৮ আনা	২৮ টাকা ৮ আনা
হুগলী	২৮ টাকা	২৭ টাকা ১৫ আনা	২৪ টাকা
হাওড়া	৩৩ টাকা ১২ আনা	৩০ টাকা ৪ আনা	২৮ টাকা ১২ আনা
২৪ পরগণা	৩৪ টাকা ১ আনা	৩১ টাকা ৬ আনা	২৯ টাকা ২ আনা
মুর্শিদাবাদ	২৮ টাকা ১৪ আনা	২৬ টাকা ১৪ আনা	২৭ টাকা ৭ আনা
জলপাইগুড়ী	২৮ টাকা ১২ আনা	২৯ টাকা ৮ আনা	৩৮ টাকা

সরকার স্বীকার করিয়াছেন, শীঘ্র যে মূল্য হ্রাস পাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই; পরন্তু মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। তবে নদীয়া, জলপাইগুড়ী ও কুচবিহারে এ বার আশুধান্য ভালই হইয়াছে; সে ধান বাজারে আসিলে হয়ত দিন কয়েকের জন্য মূল্য কমিবে।

কিন্তু সরকারের ধান্য-সংগ্রহ তাঁহাদিগের পরিকল্পনানুযায়ীই হইয়াছে ও হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গম গুদামে রাখা সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে হয়। যে সকল গুদামে গম রাখা হয়, সে সকল কি পীচ দিয়া শুষ্ক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে? আবার আমতার মত স্থানে গম মজুদ রাখিয়া—অর্থাৎ মফঃস্বলে না পাঠাইয়া কি অনেক গম নষ্ট করা হয় নাই?

সরকার কি তাঁহাদিগের বিভাগগুলির জন্য বেসরকারী পরামর্শ সমিতি গঠিত করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন না?

চাউলের মূল্য হ্রাস না হইলে যে কিছুতেই প্রদেশের দুর্দ্দশার প্রশমন হইবে না—হইতে পারে না, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অস্বীকার করেন?

কেবল বক্তৃতায় লোকের খাদ্যাভাব ঘুচিবে না।

পশ্চিম বঙ্গের সচিব সঙ্ঘ—

নানা প্রদেশে সচিব-সঙ্ঘ গঠিত হইয়া কাজ আরম্ভ করিলেও পশ্চিম বঙ্গে এখনও সচিব সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে, প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের অভিপ্রায়—১৫ জন সচিব লইয়া তিনি জুন মাসের মধ্যভাগে সচিব সঙ্ঘ গঠিত করিবেন এবং ঐ মাসের শেষভাগে নূতন ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন ব্যবস্থা করিবেন। কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচন শেষ না হওয়াই এই বিলম্বের কারণ, বলা হইতেছে। কিন্তু সে নির্ব্বাচন—ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের পর পক্ষকাল মধ্যেই শেষ হইতে পারিত। সে ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন?

এ দিকে যাঁহারা জনগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেমন অধিকার ব্যবহারে বঞ্চিত করা হইতেছে; যে সকল সচিব নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকদিগের আনাস্থাভাজন প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তেমনই সচিবের অধিকার সম্ভোগ ও ইচ্ছামত তাহার ব্যবহার বা অপব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে। ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন না হওয়ায় লোকের পক্ষে আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করাও অসম্ভব হইতেছে।

এইরূপ ব্যবস্থা যে গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহাতে পশ্চিম বঙ্গে প্রবর্ত্তিত গণতন্ত্রের যে রূপ সপ্রকাশ হইতেছে, তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। যদি বর্ত্তমান সচিব সঙ্ঘকে আরও কিছুদিন কাজের অবসর দিয়া জনমত উপেক্ষা করাই সরকারের ইচ্ছা ছিল, তবে তাঁহারা নির্ব্বাচন আরও পিছাইয়া দিতে পারিতেন না কি? বর্ত্তমান ব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারের পর্য্যায়ভুক্তই হয় না কি? ব্যক্তিবিশেষের বা দল বিশেষের সুবিধার জন্য সচিবসঙ্ঘ গঠনে ও ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যারম্ভে বিলম্ব কি কোন প্রকৃত গণতন্ত্র-শাসিত দেশে সম্ভব হইতে পারে?

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ—

পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পার্লামেন্টে যথারীতি অভিভাষণ দিয়াছেন। অভিভাষণে অনেক কথাই আছে—দেশের ও বিদেশের অনেক বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে। হইবারই কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার ও সিংহলের সরকার যে ভারতীয়দিগের প্রতি অবিচার ও কুব্যবহার করিতেছেন, তাহা অকুণ্ঠভাবেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার যে প্রতীকারের অভিপ্রায়ে প্রতিশোধ লইবেন, এমন কথা বলা হয় নাই। কেন না অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে পার্লামেন্টে যে আইন পেশ হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে এবং সংবাদপত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান-ব্যবস্থার সম্ভাবনাও উক্ত হইয়াছে!

কিন্তু কথায় বলে—"প্রদীপের নিম্নেই অন্ধকার।" তেমনই অভিভাষণে আমরা ভারতীয়দিগের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দ্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না—

(১) পাকিস্তানের সহিত ভারত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ।

(২) উদ্বাস্তু-সমস্যা।

অথচ পাকিস্তান দিল্লী-চুক্তির অপহ্নব ঘটাইয়া ভারত রাষ্ট্রে গতায়াতের জন্য ছাড় লওয়ার ব্যবস্থা করিতেছে এবং কোন কোন স্থানে পাকিস্তানীরা ভারত রাষ্ট্র আক্রমণ করিতেছে। আর উদ্বাস্তু-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আজও হইল না—কবে হইবে এবং কখন হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। পাকিস্তান যে দিল্লী-চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে না, তাহা ভারত সরকারের সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার প্রতীকার করেন নাই। অর্থাৎ ভারত সরকার সে ব্যবহার অনায়াসে সহ্য করিতেছেন।

উদ্বাস্তু-সমস্যা যে পশ্চিমবঙ্গে অধিক ক্লেশদায়ক তাহা বলা বাহুল্য।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী—

ভারত রাষ্ট্রের নানা স্থানে এবং বিদেশেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কবির এই সম্মানে বাঙ্গালী সকলেই আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিবেন। আমরা কেবল আশা করি, এই অনুষ্ঠান নিয়মানুগ fetish মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে না।

কলিকাতায় নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি সমিতির অনুষ্ঠান এ বারও অসম্পূর্ণ "মহাজাতি সদনে" বাঁশ বাঁধিয়া আবরণ দিয়া সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এই ভবনের পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের; ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন—রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন করিয়া ইহার ভার গ্রহণ করিয়া ইহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াছেন। ইহা সুভাষচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবহেতু, এমনও কেহ কেহ মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বার বাজেটে ঐ গৃহের জন্য ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন স্থলে বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহা হইবে না ত? এই প্রসঙ্গে জানিতে কৌতূহল হয়, গান্ধীঘাট নির্ম্মাণ জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া—কত দিনের মধ্যে তাহা নির্ম্মিত করিয়াছিলেন? আর—বজবজে কোমাগতমারু জাহাজের ঘটনায় মৃতদিগের স্মৃতি-স্তম্ভ সংস্থাপনে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং কতদিনে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে? অথচ ঘাটে ও স্মৃতিস্তম্ভে লোক কোনরূপে উপকৃত হয় নাই; কিন্তু "মহাজাতি সদনের" উপযোগিতা রহিয়াছে। কি কারণে সুভাষচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত এই ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য আজও শেষ করা হয় নাই, তাহা কি দেশের লোক জানিবার আশা করিতে পারে?

দুর্ভিক্ষ ও গোজাতি—

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, হিসারের প্রায় ৫ শত গ্রামে দুর্ভিক্ষের ফলে হরিয়াণা গোজাতি নামে পরিচিত উৎকৃষ্ট গোজাতি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। ইতোমধ্যেই নাকি শতকরা ৭০টি গরু নষ্ট হইয়া গিয়াছে! ভারত বিভাগের ফলে সিন্ধী, থারপারকার ও শানিয়াল এই সকল উৎকৃষ্ট জাতীয় গরুর আবাস পাকিস্তানে পড়ায় ভারত রাষ্ট্রে যে কয় প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু আছে—হরিয়াণা সে সকলের অন্যতম। একে এ দেশে দুধের অভাব, তাহাতে আবার গত যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈনিক প্রভৃতির খাদ্যের জন্য ২ লক্ষ ৭৬ হাজার গবাদি পশু হত্যা করা হইয়াছিল। এই

অবস্থায় যাহাতে উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু রক্ষিত ও তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তাহাই করিতে হইবে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে গুজাটের গরু নিঃশেষ হইবার উপক্রম হয়। সেই সময় লর্ড নর্থকোর্ট বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর। তিনি বোম্বাই সরকারের কৃষি-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া হারোদী নামক স্থানে গোশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গো-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থায় প্রায় ৩ শত গরু সংগ্রহ করিয়া তথায় রক্ষা করা হইয়াছিল।

"কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে"—

ভারত সরকারের মন্ত্রী হইয়া মুন্সীজী কেবলই "স্বপন" বপন করিয়া এখন গভর্ণর হইয়াছে—কাজ কিছুই করিতে পারেন নাই—হয়ত অকাজ অনেক করিয়াছেন। গভর্ণর হইয়া যাইবার সময় তিনি পুণা ইনষ্টিটিউটে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যদি খলিফা হইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন তবে করিতেন—

(১) বন্য ৭ (তাঁহার বুদ্ধিতে) অকেজো জীবগুলির কয়টি করিয়া নমুনা রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে হত্যা করিতেন। কারণ, তাহারা যে খাবার খায়, তাহা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন।

(২) সব অনাবশ্যক ও ব্যাধিগ্রস্ত গৃহ-পালিত পশু প্রজননাক্ষম করিয়া বনে পাঠাইয়া তাহাদিগের চর্ম্ম ও অস্থি বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেন।

(৩) প্রত্যেক সুস্থ ও সকল মানুষকে ভূমি উন্নয়ন কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেন। ভূমি সেবায় কাজ না করিলে কেহ যাহাতে উপাধি বা চাকরী না পায় সেই ব্যবস্থা করিতেন। যে পুরুষ সে কাজ না করিয়াছে, কোন নারী যাহাতে তাহাকে বিবাহ না করে সেই ব্যবস্থা করিতেন।

(৪) অসুস্থ দুর্ব্বল লোক যাহাতে সন্তানের জনক জননী হইতে না পারে, সে ব্যবস্থা করিতেন।

যিনি এইরূপ বুদ্ধির ও মনোভাবের পরিচয় দিতে কুণ্ঠানুভব করেন না, তিনিও এতদিন ভারত সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং এখন একটি প্রদেশের গভর্ণর হইলেন। ভারতের কি দুর্ভাগ্য।

বিদেশে শিক্ষা—

প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখা যায়, ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে শিক্ষালাভার্থ গমন করিতেছে। সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা সমিতি যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—বর্ত্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন এক হাজার এক শত ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। এশিয়ার আর কোন দেশ হইতে এত ছাত্রছাত্রী আমেরিকায় শিক্ষালাভার্থ গমন করে নাই। ইরাণ অর্থাৎ পারস্য হইতে ৮৭৬ জন ও ইসরেল হইতে ৭৮৬ জন গিয়াছে।

কিন্তু আমরা এমন কথা শুনিতে পাই না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ হইতে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভার্থ ভারতে আসিতেছেন। আমেরিকায় যেমন ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতেও তেমনই বহু ভারতীয় শিক্ষালাভার্থ গমন করিতেছে। বিদেশে এই ব্যয় যে উল্লেখযোগ্য, তাহা বলা বাহুল্য। ইংরেজের শাসনকালে কোন ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা ইচ্ছা করিয়া এই যে ব্যয় করে, তাহা Home change বলা যায়।

ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা সকল বিষয়ে স্বদেশে আবশ্যক শিক্ষালাভ করে, ইহাই বাঞ্ছিত হওয়া প্রয়োজন। কেন তাহা হয় না, তাহা বিবেচ্য। দেশ যত দিন শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে না পারে, তত দিন দেশের উন্নতি দ্রুত হইতে পারে না। বিদেশে শিক্ষালাভের মোহ আর কত দিন ভারতীয়দিগকে অভিভূত করিবে?

"নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল হিন্দী ভাষাভাষী করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে মুরলীমনোহরপ্রসাদ পর্য্যন্ত বিহারীরা যে উদগ্র চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা যদি হীন প্রাদেশিক মনোভাবের পরিচায়ক না হয়, তবে তাহা কি বলা যায়? গত ২০শে মে বিহারের প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে রাষ্ট্রপালের অভিভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে বাবু মুরলীমনোহরপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"বিহারীরা বাঙ্গালা ভাষা দমিত করিতে চাহেন না; কিন্তু বঙ্গভাষার সমর্থকরা যদি বিহার প্রদেশের কোন অংশ বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গকে দিবার কথা বলেন, তবে, বিহারীরা তাহাতে আপত্তি করিবেন।"

বাঙ্গালা ভাষা দমিত বা দলিত করিবার ক্ষমতা বিহারীদিগের নাই। আর বঙ্গভাষাভাষী যে সকল স্থান (মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি) বঙ্গভাষাভাষী যে সকল স্থান পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার আগ্রহ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ঐ সকল স্থান ঐতিহাসিক, ভাষাগত অথবা সামাজিক হিসাবে বিহারের হইতে পারে না। কংগ্রেস, ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ঐ সকল স্থান বাঙ্গালাভুক্ত করিবার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া এখন যে ক্ষমতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছেন—তাহা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভ্রমদ্যোতক বা কংগ্রেসীদিগের পক্ষে সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক বলা যায় না। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতি যে আজ পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহাতে সুফল ফলিবে—এমন মনে করা যায় না।

বিহার যদি অন্যায় দাবী করে, তবে যে সরকার সে দাবী সমর্থন করিবেন, সে সরকার লোকের অনাস্থাভাজন হইয়াও যে ক্ষমতাভ্রষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কাশ্মীর-সমস্যা—

কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান এখনও সুদূরপরাহত। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, কাশ্মীর যে সর্ব্বতোভাবে ভারতরাষ্ট্রভুক্ত হয়, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। ভারতের শাসন-পদ্ধতি অনুসারে যে কোন রাষ্ট্র আংশিকভাবে ভারতভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যদি আজ পশ্চিমবঙ্গ দাবী করে যে, দেশরক্ষা, যানবাহন ও বাণিজ্য

বিষয়ে সে ভারতভুক্ত থাকিবে—তাহার আয়কর সে ভারত সরকারকে দিবে না, তবে কি ভারত সরকার তাহাতে সম্মত হইবেন? সামন্ত রাজ্যগুলিকে ক্রমে ভারতভুক্ত করিবার জন্যই আংশিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; সে ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নাই।

লাডকের ধর্ম্মগুরু ভারতের প্রধান মন্ত্রিকে লিখিয়াছেন, কাশ্মীর সর্ব্বতোভাবে ভারতভুক্ত হইবে বলিয়াই লাডক কাশ্মীর ত্যাগ করে নাই। এখন কাশ্মীর যদি সর্ব্বতোভাবে ভারতভুক্ত না হয়, তবে লাডক তিব্বতের সহিত যোগ দিবে—অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হইবে।

লাডক যদি তিব্বতের সহিত যোগ দেয়, তবে কি আমেরিকার ও বৃটেনের রাশিয়া সম্বন্ধে অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবে না? তখন তাঁহারা কি করিবেন?

কাশ্মীর যদি সর্ব্বতোভাবে ভারতভুক্ত না হয়, তবে কাশ্মীরের উন্নতি-সাধন জন্য সরকার যে অবাধে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? পণ্ডিত জওহরলাল সে বিষয়ে কি বলেন?

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বৈরাচার—

দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্ধত শ্বেতাঙ্গগণ বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিতে সরকারের কার্য্য পরিচালনায় বদ্ধপরিকর হইয়া শেষে আপনাদিগের সৃষ্ট বিচারালয়েরও ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্বেতাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের অধিকার-সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আইনসঙ্গত নহে, বিচারালয়ের এইরূপ মত প্রকাশে সরকার বিচারালয়ের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

যে স্থানে ন্যায়ের মর্য্যাদা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়, তথায় যে পতন অনিবার্য্য, সে বিষয়ে কি কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে?

ভারতীয়দিগের প্রতি আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদিগের কুব্যবহার যে অন্যায় ও অত্যাচার পর্য্যায়ভুক্ত তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যতদিন ভারত পরাধীন ছিল, ততদিন তাহার সে অন্যায়ের প্রতীকার করা সম্ভব ছিল না। আজ কিন্তু আর সে ব্যবস্থা নাই। এখনও কি ভারত সরকার সে দেশে ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে অনাচারের ও অন্যায়ের নিবারণোপায় করিতে অক্ষম বা অসম্মত? ভারত সরকার জাতিসঙ্ঘের অনুরাগী ও তাহার নিরপেক্ষতায় ও ন্যায়নিষ্ঠায় আস্থাবান। কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত সরকার সেই অবস্থারই পরিচয় দিয়াছেন। ভারত সরকার কি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের ব্যবহার সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের নিকট ন্যায় বিচার চাহিবেন?

যদি অসঙ্গত ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকারও পাওয়া না যায়, তবে "কমনওয়েল্‌থ" অর্থাৎ সম্মিলিত রাষ্ট্রমধ্যে থাকিবার সার্থকতা কোথায়?

এ প্রশ্নের কি উত্তর ভারত সরকার দিবেন?

সিংহলে ভারতীয়—

সিংহল সরকার নাগরিক অধিকার প্রদান সম্পর্কে ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে তথায় ভারতীয় অধিবাসীরা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন এবং কারাবরণ করিতেছেন। ভারত সরকার সিংহল সরকারের নিকট যে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, তাহার যে উত্তর সিংহল সরকার দিয়াছেন, তাহাতে মীমাংসার মনোভাব দেখা যায় না। সিংহল সরকার আপনাদিগের কার্য্যের সমর্থন জন্য ইচ্ছামত সত্য বিকৃত করিয়া বলিয়াছেন, সিংহলের ভারতীয় কংগ্রেসই নাগরিকের অধিকার-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া দোষ করিয়াছেন। অথচ—সরকারই ভোট-দাতাদিগের তালিকা হইতে ভারতীয় নাম বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সিংহলের নাগরিকের অধিকার লাভের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের পক্ষে সে অধিকার অর্জ্জন করা অসম্ভব হইয়াছিল। সেই জন্যই সিংহলের ভারতীয় কংগ্রেস বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভারত-সরকার যদি সিংহল-সরকারকে ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে ব্যবহারে ন্যায়পর করিতে না পারেন, তবে তথায় যে ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশা শোচনীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত-সরকার অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে কোন দেশে ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে অবিচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানে নিরপেক্ষতা যে "গুণ হৈয়া দোষ" হয়, তাহা বলা বাহুল্য। যদি সিংহল-সরকার ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা না করেন, তবে কি হইবে? মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্র বলিয়াছেন—

"India will have to consider' other self-respecting ways, including, if necessary, repatriation of these eight lakhs."

মলয়ে ভারতীয়—

মলয়ে—বিশেষ মলয় সুলতানদিগের শাসনাধীন অংশে ভারতীয়দিগের পক্ষে নাগরিকের অধিকার লাভের পথ নূতন বিঘ্নকণ্টকিত হইয়াছে। তাহারা যে ভারতীয় নাগরিকের অধিকার বর্জ্জন না করিলে মলয়ে নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না, তাহাই নহে, পরন্তু তথায় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইতে হইলে তাহাদিগকে যে সকল সর্ত্তে তাহা করিতে হইবে, সে সকল বিবেচনা করিলেই তথায় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়।

গত যুদ্ধের শেষে বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, মলয়ে গণতন্ত্রানুমোদিত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তাহাতে সে দেশে ভারতীয় ও চীনারাও তুল্যাধিকার লাভ করিবে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মলয়ে ফেডারেশন গঠিত হয় এবং সে সময় ভারতীয় ও চীনা অধিবাসী-দিগের আপত্তি অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। কারণ, সুলতানরা যে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আবার সেই ক্ষমতাই প্রদান করা হয়! তখন একদল চীনা কম্যুনিষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করায় যে "সঙ্কট" ঘোষণা করা হইয়াছিল—দীর্ঘ চারি বৎসরের যুদ্ধের পরেও তাহা বহাল রহিয়াছে। আর নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় ও চীনাদিগের পক্ষে সে দেশে নাগরিকের অধিকার অর্জ্জন করা দুঃসাধ্য।

এ বিষয়ে কি ভারত সরকার চীন সরকারের সহিত একযোগে কাজ করিতে অগ্রসর হইবেন?

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

১১
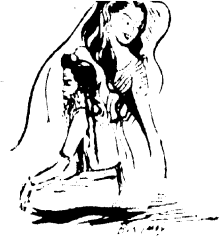
পিতামহের কল্পলোকের মহাশূন্যে বর্ত্তমান সহসা ভবিষ্যতে পরিণত হইল। সেই সহসা-সৃষ্ট ভবিষ্যযুগের রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে যে লীলা-নাটক তাঁহার মানস-লোকে মূর্ত্ত হইল তাহার অসম্ভব অবাস্তবতায় তিনি নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সত্যই যদি এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিতেন—কি অদ্ভুত কাণ্ডই না হইত! কিন্তু তিনি জানেন সৃষ্টিকর্ত্তাও স্বাধীন নহেন, তিনিও নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। সুদক্ষ যাদুকরের মতো স্বৈরচর সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে বিস্মিত করিতে পারেন, বীণাপাণিকে আনন্দিত করিতে পারেন, নিজের কল্পনা-বিলাসে বিভোর হইয়া অসম্ভব-সৃষ্টি-সম্ভাবনায় মগ্ন থাকিতে পারেন, কামনাতুর চার্ব্বাক-কালকূটদের ভোজ-বাজি দেখাইয়া বিভ্রান্ত করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুলোকে সত্যই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন না। করিতে পারেন না বলিয়া কিন্তু পিতামহের দুঃখ হইতেছিল না। বরং তাঁহার মনে হইতেছিল বাস্তব-অবাস্তবের প্রভেদ তো অনুভূতির তারতম্য মাত্র। চক্ষুহীনের চেতনায় আলোক অবাস্তব, বর্ণসমারোহ অর্থহীন। তাঁহার মানসলোকেই যদি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন, সত্যই যদি অমূর্ত্ত মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, বস্তুলোকের মানদণ্ডে তাহার মহিমা না-ই বা ধরা পড়িল। তিনি নিজে আনন্দিত হইতেছেন ইহাই তো যথেষ্ট।

···নাটক সুতরাং জমিয়া উঠিয়াছিল। পিতামহ সত্যই পিতামহ সাজিয়া বসিয়াছিলেন। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, আস্কন্ধ-বিলম্বিত পক্ব কেশদাম, শুভ্র উত্তরীয়, নিষ্কলুষ কাষায় বস্ত্র তাঁহাকে সনাতন পিতামহের মহিমা দান করিয়াছিল। তাঁহার বামপার্শ্বে ছিল রত্নখচিত অহিফেনের কৌটা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল স্বর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ একটি গড়গড়া। দুগ্ধধবল বিরাট তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পিতামহ নিমীলিত-নয়নে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। গলা খাঁকারির শব্দ পাইয়া তিনি চক্ষু খুলিলেন। দেখিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন।

বিষ্ণু। পিতামহ, অতিশয় বিপন্ন হয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমার বাহন গরুড় সহসা মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' তার জননীর কাছে ফিরে গেছে। হর্ম-নীড় নামক গ্রামে বাস করছে তারা। আপনি হয় আমাকে আর একটি বাহন সৃষ্টি করে' দিন, না হয় গরুড়কে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে আদেশ করুন। আপনার কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

পিতামহ। আমি কিছু করব না। আমি চটেছি। বহুকাল থেকে তুমি তোমার কাজে ফাঁকি দিচ্ছ। গরুড়ের পিঠে চড়ে' কমলিকে বাঁ পাশে নিয়ে তুমি আকাশে আকাশে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ কেবল। কাজকর্ম্ম কিছুই করছ না

বিষ্ণু। আপনার মুখে একথা শুনব প্রত্যাশা করি নি। নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় অহোরাত্র আমি ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্ত আমার বিশ্রাম নেই

* পিতামহ। [অধীর ভাবে] ওসব একদম বাজে কথা। তোমার অক্ষমতা ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়ছে বিষ্ণু। কথা ছিল আমি সৃষ্টি করব, তুমি রক্ষা করবে। তা কি তুমি করছ?

বিষ্ণু। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পিতামহ

পিতামহ। এর নাম চেষ্টা করা? আদিম যুগে আমি যে সব বিশাল সমুদ্র, বিরাট পর্ব্বত, দিগন্তপ্রসারী তুষার-প্রান্তর সৃষ্টি করেছিলাম তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আছে আর?

বিষ্ণু। আপনি একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন পিতামহ। আপনি নিজেই যে নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে দিলেন হঠাৎ একদিন। সব উলটে পালটে গেল, মহেশ্বর তাই সুবিধে পেলেন

পিতামহ। কিন্তু তুমি কি করছিলে? মহেশ্বরকে রুখলে না কেন তুমি? তোমার পালন করবার কথা না?

বিষ্ণু। ন্যায্য কারণ ঘটলে মহেশ্বরকে রোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই যে পিতামহ। আপনি নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে না দিলে—

পিতামহ। (ধমক দিয়া) আরে, কি বিপদ! বড় শিল্পী মাত্রেই নিজের রচনার একটু আধটু অদল-বদল করে' থাকে, তাই বলে' সব উড়িয়ে দিতে হবে! গোড়ার যুগে আমি যে সব অপূর্ব্ব উদ্ভিদ, অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলাম সব উপে গেল ওই জন্যে? ওসব কিছু শুনতে চাই না। হিসেব দাখিল কর তুমি।

---

* এই অংশটুকু পূর্ব্বে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিষ্ণু। কোন যুগের হিসেব চাইছেন আপনি? প্রোটারোজোয়িক, না আর্লি প্যালিয়োজোয়িক?

পিতামহ। কি বললে?

বিষ্ণু। প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক। মানে—

পিতামহ। ওসব আবার কি কথা!

বিষ্ণু। মানুষেরা আপনার বিভিন্ন যুগের সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ করেছে কি না!

পিতামহ। মানুষেরা! তাই না কি। কি রকম, কি কি নাম শুনি

বিষ্ণু। অ্যাজোয়িক, প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়ো জোয়িক, লেটার প্যালিয়োজোয়িক, ক্যাইনো জোয়িক—

[বিষ্ণু দ্বারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উর্ব্বশী আসিয়া প্রবেশ করিল]

উর্ব্বশী। [মধুর হাসিয়া] অর্দ্ধ-স্ফুট পারিজাতের নব পরাগে প্রতি প্রভাতে যে ললিত সুষমা জাগে, তাকেই আজ মূর্ত্ত করেছি একটি রাগিণীতে। শুনবেন পিতামহ?

পিতামহ। কাজের কথা হচ্ছে, ভ্যান ভ্যান কোরো না এখন, যাও

[উর্ব্বশী বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপসৃতা হইল]

পিতামহ। মানুষ কোন যুগে আছে?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক যুগে। মানুষ আবার নিজের যুগকে নূতন নানা নামে ভাগ করেছে। আর্লি প্যালিয়ো-লিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

পিতামহ। দৈত্যেরা কোন যুগে আছে?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক

পিতামহ। দেবতারা?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িকই বলতে হয়

পিতামহ। রাম রাবণ চার্ব্বাক প্রহ্লাদ সব্বাইকে এক গোয়ালে পুরেছে। ধাষ্টামো যত।

বিষ্ণু। স্তন্যপায়ী জীবমাত্রকেই ওরা এক যুগে ধরেছে। কিন্তু সভ্যতার প্রগতি হিসাবে ওই যে বললাম, আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

পিতামহ। ধাষ্টামো, ধাষ্টামো, সব ধাষ্টামো। তুমি এই সব বাজে খবর সংগ্রহ করে' সময় নষ্ট করেছ খালি। তোমার আসল কর্ত্তব্য ছিল সৃষ্টি রক্ষা করা, সেইটিই কর নি কেবল

বিষ্ণু। যথাসাধ্য করেছি বই কি পিতামহ

পিতামহ। কিচ্ছু কর নি

বিষ্ণু। এ কথা বলছেন কেন পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো এখনও আছে—

পিতামহ। আমি যে সব মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলাম, কোথায় সে সব? বহু যোজনব্যাপী বিশাল দেহ সরীসৃপ, দ্বীপাকৃতি কূর্ম্ম, দিগন্তবিস্তৃত-পক্ষধারী বিহঙ্গম, পর্ব্বতপ্রমাণ রোমশকায় হস্তী, কোথায় তারা? গোটাকতক ছুঁচো, ফড়িং আর চামচিকে বাদে সব তো লোপাট হ'য়ে গেছে

বিষ্ণু। তার জন্যে আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। আমি চেষ্টার কসুর করেছি কি? কিন্তু কিছুতেই রাখা গেল না, কি করব বলুন। আপনার মহাকাব্যগুলি যে বড় বেশী রকম অমিত ছিল পিতামহ। বিরাট পাখী, বিরাট তার ঠোঁট, ঠোঁটের ভিতরও আবার বড় বড় দাঁত—

পিতামহ। আমি কি তোমার ফরমাশ অনুযায়ী সৃষ্টি করব না কি!

বিষ্ণু। আজ্ঞে না, আমি তা বলছি না

পিতামহ। তবে ও কথা বলবার মানে?

বিষ্ণু। মানে, আমি বলছি কিছুতেই রাখা গেল না ওদের। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে' গেল কিছু, কিছু গেল প্রাকৃতিক প্রভাবে—

পিতামহ। কিন্তু তুমি করছিলে কি! তোমার কর্ত্তব্য ছিল তাদের রক্ষা করা

বিষ্ণু। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। প্রত্যেকবার অবতার হয়ে তাদের মধ্যে জন্মেছি আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে। কূর্ম্ম মৎস্য বরাহ রূপ ধারণ করে' অসীম কষ্ট সহ্য করেছি কাদায়, জলে, বনে-বাদাড়ে। সে যে কি অসহ্য কষ্ট—

পিতামহ। মজাও কম লোট নি। কৃষ্ণলীলার অজুহাতে বৃন্দাবনে তুমি যে রকম স্ফূর্ত্তি উড়িয়েছ (সহসা) অথচ যদুবংশটাকে রাখতে পারলে না। একটা মুষল জুটিয়ে—আঃ। একটু তুরন্ত দামাল কিছু হলেই অমনি মহেশটাকে ডেকে ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস! ওই এক শিখেছ [চীৎকার করিয়া] ওই গুণ্ডাটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' আমার সমস্ত সৃষ্টি তছনছ করেছ তুমি—

[বিষ্ণু কাতরভাবে পুনরায় দ্বারের দিকে চাহিলেন। যে সিনেমা-তারকাটি মর্ত্ত্যলোক অন্ধকার করিয়া সম্প্রতি দেবলোকে উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রবেশ করিলেন। ভাত-খেকো ভুঁড়িদার চেহারা। বিষ্ণুর বিশ্বাস ছিল আধুনিকা বলিয়া ইঁহার সম্বন্ধে পিতামহের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে। বিশ্বাস কিন্তু ভূলুণ্ঠিত হইল]

পিতামহ। [রুক্ষকণ্ঠে] তুমি এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?

সিনেমা-তারকা। [সসঙ্কোচে] আপনার আপিঙের কৌটতে আপিঙ আছে কি না দেখতে এসেছি। ভাবলুম, সন্ধ্যে হয়ে গেছে

পিতামহ। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও এখান থেকে। ফক্কড় কোথাকার—

[সিনেমা-তারকা মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন]

বিষ্ণু। আপনার অহিফেন-সেবনের সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছে পিতামহ

পিতামহ। ওসব চালাকি রেখে দাও। হিসেব চাই আমি

বিষ্ণু। হিসেব কি করে' দোব তা তো বুঝতে পারছি না

পিতামহ। তা বুঝতে পারবে কেন! [সগর্জ্জনে] আমি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু সৃষ্টি করেছি, তার পাই-পয়সা নিখুঁত হিসেব চাই

বিষ্ণু। এ যে অসম্ভব কথা বলছেন পিতামহ। আপনার সৃষ্টি অনন্ত—

পিতামহ। শুধু অনন্ত নয়, অপরূপ, বিচিত্র, বিস্ময়কর। তুমি আর ময়শা মিলে গোল্লায় দিয়েছ সব। আবার না কি যুদ্ধ বাধবে শুনছি। ময়শা আবার না কি লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। হিসেব দাও। তোমার উপর রক্ষা করবার ভার দিয়েছিলাম, পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দাও আমাকে

বিষ্ণু। কি মুশকিল। হিসেব কি করে' দোব বলুন। নানা বিসর্জ্জনে—

পিতামহ। হিসেব দিতে তুমি বাধ্য

[বিষ্ণু কি যে বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না]

পিতামহ। কথার জবাব দিচ্ছ না যে

বিষ্ণু। সেদিন একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁকেই না হয় ডেকে আনি, তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক খবর বলতে পারবেন।

[পিতামহকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন এবং হেকেলকে লইয়া প্রবেশ করিলেন]

পিতামহ। এ কে

বিষ্ণু। ইনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক; [হেকেলকে] বলুন—

হেকেল। [সবিনয়ে] আমি অবশ্য খুব বেশী জানি না। ফসিলে মিসিং লিংকসের যে সব প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম তার থেকে আমি মানুষ আর অ্যানথ্রো-পয়েডস্‌দের একটা যোগসাধন করবার চেষ্টা করেছিলাম

পিতামহ। [বিষ্ণুকে] বাজে ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ

বিষ্ণু। আজ্ঞে ধাপ্পা নয়, ফসিলেই আপনার সৃষ্টির ইতিহাস নিহিত আছে

পিতামহ। ফসিল? সে আবার কি!

হেকেল। ভূস্তরে মৃত প্রাণীদের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম ফসিল। কোথাও হয়তো একটা দাঁত পাওয়া গেছে, কোথাও বা মাথার খুলির খানিকটা, কোথাও হয়তো পায়ের এক টুকরো হাড়, কোথাও—

পিতামহ। [যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] অ্যাঁ, আমার সৃষ্টির এই দুর্দ্দশা হয়েছে না কি! কোথাও একটা দাঁত, কোথাও একটা মাথার খুলি, আর তাই শোনাচ্ছ আমাকে এসে

হেকেল। এই সব থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে—

পিতামহ। [সহসা ফাটিয়া পড়িলেন] বেরোও এখান থেকে, বেরোও, বেরিয়ে যাও

[হেকেল দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন]

বিষ্ণু। পিতামহ, ধৈর্য্য রক্ষা করুন। শুনুন—

[পিতামহ এতক্ষণ একমুখ ছিলেন, সহসা চতুর্ম্মুখ হইয়া গেলেন]

পিতামহ। [চতুর্ম্মুখে একসঙ্গে] মূর্খ, ভণ্ড, ক্রুর, শঠ

বিষ্ণু। শুনুন

পিতামহ। অস্পৃশ্য, নারকী, দুরাত্মা, দুর্ম্মতি

বিষ্ণু। পিতামহ, পিতামহ

পিতামহ। দুঃশীল, পাপাশয়, নীচমনা, বিভীষণ

বিষ্ণু। [অতিশয় শশব্যস্ত] শুনুন, শুনুন পিতামহ—

[অতঃপর পিতামহ প্রাকৃত ভাষা শুরু করিলেন]

পিতামহ। জালিয়াত, ধড়িবাজ, লম্পট, স্বার্থপর—

[পিতামহের অষ্ট নয়নে ক্রোধবহ্নি ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপায় বিষ্ণু শেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও পিতামহের দুই পত্নী দেবসেনা, দৈত্যসেনাকে ডাকিয়া আনিলেন]

দৈত্যসেনা। ভীমরতি হয়েছে মুখপোড়ার—

দেবসেনা। [বিষ্ণুকে] আমরা পেরে উঠব না। ডাক্তার ডাক। দু'জন বিলেত-ফেরত ডাক্তার স্বর্গে এসেছেন সম্প্রতি, তাঁদেরই ডেকে আন। বেশ ছেলে দুটি—

পিতামহ। [সগর্জ্জনে] দূর হও' ধুমসি, মুটকি, ধ্যাদ্ধেড়ে, ধুকড়ি—

[দেবসেনা দৈত্যসেনা চলিয়া গেলেন। বিষ্ণু ত্বরিত-গতিতে গিয়া ডাক্তার দুইজনকে ডাকিয়া আনিলেন]

প্রথম ডাক্তার। এখানে টেরামাইসিন পাওয়া যাবে কি

দ্বিতীয় ডাক্তার। সালফানিলামাইড ট্রাই করলেও মন্দ হয় না

পিতামহ। [ক্ষিপ্ত হইয়া] গুণ্ডা গাড়োল উল্লুক গাধা

প্রথম ডাক্তার। এ বাঁচির কেস মশাই। টেরা-মাইসিন দিলে—

দ্বিতীয় ডাক্তার। আমি কিন্তু একটা এনকেফালটিসে সালফানিলামাইড দিয়ে বেশ উপকার পেয়েছিলাম। ও মশাই, খড়ম তোলে যে চলুন চলুন—

[সন্ত্রস্ত হইয়া ডাক্তার দুইজন সরিয়া পড়িলেন। গালা-গালি দিতে দিতে পিতামহের চতুর্ম্মুখ ফেনময় হইয়া গেল। নিরুপায় বিষ্ণু তখন যাহাকে পাইলেন তাহাকেই ডাকিয়া আনিলেন। সকলেই আসিলেন, কিন্তু কেহই কাছে যাইতে সাহস করিলেন না। সকলেই অবশ্য পিতামহকে প্রশমিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ দূরে সারিবদ্ধ হইয়া কেহ মধুর হাস্য, কেহ বা কটাক্ষ দ্বারা মনো-

রঞ্জনের প্রয়াস পাইলেন। কিন্নরদল গান গাহিতে লাগিলেন। স্বয়ং পবন আসিয়া চামর হস্তে লইলেন, বরুণ শীকর-স্নিগ্ধতা সৃজন করিলেন। বীণাপাণিও আসিয়াছিলেন, তিনিও বীণায় ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি অতিশয় মধুর একটি রাগিণী আলাপ করিতে করিতে পিতামহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পিতামহের চতুর্মুখ হইতে সমবেগে চারচারটি করিয়া গালি একসঙ্গে ছুটিতে লাগিল]

বিষ্ণু। [সকাতরে] শুনুন পিতামহ—

পিতামহ। দমবাজ, বদমাস, বেইমান, জোচ্চর

[সহসা বিষ্ণু করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন এবং অন্য সকলকে তাহাই করিতে ইঙ্গিত করিলেন]

পিতামহ। জঘন্য, অন্ত্যজ, পাপী, পাজি

সকলে। [সমস্বরে] হে ব্রহ্মা,হে পিতামহ, হে কমল-যোনি চতুরানন, তুমি সর্ব্বাতোমুখ বাগীশ্বর, সকলের বিধাতা তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি

পিতামহ। ফক্কর, ফাজিল, ডেঁপো—

সকলে। হে কবি, হে সৃষ্টিকর্ত্তা, সূর্য্য যেমন প্রসন্ন কিরণজাল বিস্তার করত কুজ্ঝটিকাকুল পদ্মবনকে পুলকিত করে, তুমিও তেমনি আলোকশুভ্র প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া দিশাহারা আমাদের চিত্তকে উদ্ভাসিত কর—

পিতামহ। নির্লজ্জ, নচ্ছার

সকলে। [দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্বরে] হে আদিকারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। হে অজ, সলিলগর্ভে একদা যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে, হে ব্রহ্মরূপী, হে গুণাকর, হে অনন্ত সৃষ্টিনিধান, হে পিতামহ—

পিতামহ। যতো সব—

সকলে। [সমস্বরে] হে জগৎপতি; তুমি ঋষি, তুমি সুখ, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি যুবাশ্রেষ্ঠ, তুমি অমিতবল, তুমি অমৃত, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমিই সর্ব্বোত্তম, তুমিই পরিত্রাণস্থান, সর্ব্বপ্রকার কল্পনার আকর, হে আদীশ্বর তোমা ভিন্ন কাহারও গতি নাই, হে দেবোত্তম, হে মূলাধার—

এই ভাবে সকলে তারস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ প্রার্থনা চলিবার পর দেখা গেল পিতামহের চতুরাননে হাসি ফুটিয়াছে এবং তিনি আফিঙের কৌটা খুলিতেছেন।

বিষ্ণু। [করযোড়ে] পিতামহ, গরুড়কে ফিরিয়ে দিন

পিতামহ। এদের সবাইকে চলে যেতে বল, তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করবার আছে—

[বিষ্ণুর ইঙ্গিতে সমাগত দেবদেবীরা অন্তর্দ্ধান করিলেন]

বিষ্ণু। কি বলুন

পিতামহ। আমরা কোথায় আছি জান ?

বিষ্ণু। স্বর্গলোকে

পিতামহ। কবিদের কল্পনায়। কবিরাই আমাদের স্রষ্টা। সম্প্রতি একদল যুক্তিবাদী ঋষি পদে পদে সেই কবিদের অপদস্থ করছে। কবিরা যদি লোপ পায়, তাহলে আমরাও লোপ পাব। সুতরাং কবিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বৈদিক ঋষিরা একদা ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সৃষ্টি করেছিলেন ; অগ্নির জলন্ত শিখায় পবিত্র হবিঃ দান করে দেবতাদের মূর্ত্ত করেছিলেন। সেই বৈদিক ঋষিরা আজকাল বিপন্ন হয়েছেন চার্ব্বাক নামক এক অর্ব্বাচীন যুবকের যুক্তিজালে। বীণাপাণি চেষ্টা করেছিলেন তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে। কিন্তু সফল হয় নি। অলৌকিক নানারকম দৃশ্য দেখে চার্ব্বাক বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তিভ্রষ্ট হয় নি। আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে তার যুক্তি আঁকড়ে বসে আছে। শক্তিশালী গরুড়কে তাই লাগিয়েছি এবার। চার্ব্বাককে কাবু করতেই হবে। তা না করতে পারলে আমরা গেলাম। তুমিও লেগে পড়, মহেশকেও ডাক

বিষ্ণু। আমাদের কি করতে হবে

পিতামহ। চার্ব্বাকের কাছে আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। হর্ষনীড় গ্রামে গরুড়কে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি। তোমরাও যাও

বিষ্ণু। আর আপনি ?

পিতামহ। আমি তো যাবই। কিন্তু আমি আড়ালে থাকব

বিষ্ণু। দেবী বীণাপাণি চার্ব্বাককে কি ভাবে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন ?

পিতামহ। দেবী বীণাপাণির আজকাল নূতন একটা বাই চেগেছে। তিনি মানুষের অবচেতনলোকে ঢুকে কি সব যেন করেছেন। চার্ব্বাকের অবচেতনলোকেও তিনি নানারকম কারিকুরি করেছিলেন, কিন্তু কিছু হয় নি, তার নাস্তিক্যবুদ্ধি বেশ টনটনে আছে। ওসব সূক্ষ্ম কারিকুরির মর্ম্ম চার্ব্বাক বুঝবে না। ওর কাছে স্থূল ব্যাপারের অবতারণা করতে হবে। অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলে' কোনদিনই মানবে না, সে শক্তিই ওর নেই। ধরবা ছোঁবার মতো একটা বাস্তবিক কিছু হাজির করতে হবে ওর কাছে। সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্ত্তকীকে ভোলাবার জন্যে মনে মনে ব্যগ্র হয়ে আছে। সেই রন্ধ্রপথে ঢুকে দেখ যদি কিছু করতে পার—

বিষ্ণু। বেশ, সেই চেষ্টাই করি তাহলে

পিতামহ। হ্যাঁ, যাও

রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-পাত হইল।

ক্ষণপরেই দেখা গেল মর্ত্ত্যের এক গহন কান্তারে বিশাল এক ময়ূর পেখম বিস্তার করিয়া একটি তন্বী ময়ূরীকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। (ক্রমশঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আফগানিস্তানের পথ-প্রান্তরের সঙ্গে পাকিস্তানের পার্ব্বত্য-সীমান্ত অঞ্চলের পার্থক্য অনেকখানি। পেশোয়ার ছাড়িয়ে উত্তুঙ্গ-বন্ধুর খাইবার গিরিবর্ত্মের পর যে দুর্গম পথ পার হয়েছি, তার চেয়েও এ-পথ আরো রুক্ষ-মরুময়, আরো অনুর্ব্বর-দুরতিক্রম্য। লাণ্ডিখানার সরকারী দপ্তরের আশে-পাশে যেটুকু সবুজ-সজীব তৃণ-পল্লব শ্যামলিমার আভাস পেয়েছিলুম, পাকিস্তানের কাঁটা-তারের সীমানা-ফটক পার হয়ে আফগানিস্তানের পথে তা হলো একান্ত দুর্লভ। এ-পথ জনবিরল, ধূ-ধূ সীমাহীন! তাছাড়া, দুরারোহ চড়াই-উৎরাইয়ের ঢেউ-তোলা পাকিস্তানের পথ পাকদণ্ডী-পাহাড়ী হলেও, তার আগাগোড়া ছিল পীচ্-কংক্রীট আর পাথরে-বাঁধানো পাকা-সড়ক—কিন্তু আফগান্ সীমানায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁধানো সড়কের চিহ্ন নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। এমন দুর্লঙ্ঘ্য, দুস্তর, উপলাকীর্ণ, ধূলি-ধূসর এ-পথ যে, মোটর বা মানুষ চলাচল দূরের কথা—নিতান্ত কষ্টসহিষ্ণু উট বা পাহাড়ী জানোয়ারদের পক্ষেও চলতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে! অর্থাৎ পথের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের দেশে অজ-পাড়াগাঁয়ের একান্তে—গরুর গাড়ীর চাকা আর পথ-চলতি মানুষের পায়ের চাপে ধূ-ধূ মাঠের মধ্য দিয়ে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো বিচিত্র যে অপরূপ দুরতিক্রম্য সড়কের সৃষ্টি হয় এ-পথের চহারা অনেকটা তেমনি। মাঝে মাঝে নুড়ি-পাথরে বোঝাই বালুময় বিশুষ্ক পাহাড়ী নদী এবং তাদের বঙ্কিম শাখা-প্রশাখাও পার হয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলুম। এ-সব নদীর কোথাও জলের চিহ্ন নেই—গ্রীষ্মের প্রখর তাপে শুকিয়ে আছে…নদীর বুক আগাগোড়া উপলাকীর্ণ বালি বালির রাশিতে ভরা। আমাদের দেশের মত বর্ষার ধারা-বর্ষণ নেই এ অঞ্চলে—শীতান্তে যখন আশ-পাশের পাহাড়ের উপরকার জমা বরফ গলে জল হয়ে ঢল্ নামে, আফগানিস্তানের এই সব পাহাড়ী নদী তখন কূলে কূলে ভরে ওঠে…সে সময় এ পথে যান-বাহন বা লোক-চলাচল দারুণ দুঃসাধ্য!

পথের দু'পাশে শস্য এবং তরুলেশহীন উপলাকীর্ণ জনবিরল ধূ-ধূ রুক্ষ-প্রান্তর…তারই মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তৃণলতাশূন্য বিরাট গিরিশ্রেণী…আমাদের পথ এঁকে-বেঁকে সুদূর কাবুলের দিকে এগিয়ে গেছে তারই ফাঁকে ফাঁকে! গ্রাম বা মানুষের বসতি চোখে পড়ে না কোনো দিকে…মাঝে মাঝে কচিৎ চোখে পড়ে আশে-পাশে বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়োয় আফগানিস্তানের সীমান্ত-রক্ষী প্রহরীদের ছোটখাট ঘাঁটি-দুর্গ! গিরিগাত্রে ছড়ানো এ-সব দুর্গের আকৃতি সেকেলে ছাঁদের হলেও শক্তিতে দুর্জয়।

জনহীন নিস্তব্ধ প্রান্তরের মৌনতা ঘুচিয়ে আকণ্ঠ মাল এবং যাত্রী ঠাশাই জীর্ণশ্রী ধূলি-মলিন দু'চারখানা পথ-চলতি আফগান্ মোটর-বাস আর লরীর সাক্ষাৎ মিলছিল।

বেলা পড়ে আসছিল…সূর্য্যের প্রখর তেজ ক্রমে মন্দীভূত হচ্ছে—এমন সময় আমাদের পথের পাশে মরুময় প্রান্তরের প্রান্তে নজরে পড়লো রুক্ষ পাথুরে মাটির বুকে সবুজ শ্যামলিমার প্রথম আভাস। বুঝলুম, কাছেই মনুষ্য-বসতির প্রাণ-হিল্লোল বইছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল, পড়ন্ত বেলায় ও-দেশী জলকুম্ভ মাথায় নিয়ে আফগানী পল্লীবালার দল জল আনতে বেরিয়েছেন…কারো মাথায় কাঠের বোঝা। পোষাক-পরিচ্ছদ সকলের একই ধরণের! প্রত্যেকের পরণে টুক্‌টুকে লাল রঙের শালোয়ার পায়জামা, অঙ্গে—কালো রঙের ঝোলা বোর্থা…পরদেশী-মানুষ দেখলে সেই কালো বোর্থায় বা কাঁধে-ফেলা ওড়নার আবরণে মুখপদ্ম ঢাকেন! এই টক্‌টকে লাল-রঙের পোষাক—পাহাড়ীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় হয় নিরাপদ আবরণ—কারণ ওদেশে নারী অবধ্যা…সর্ব্বসময়েই। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় শান্তির শ্বেত-পতাকা যেমন নিরাপদ, লাল রঙের পায়জামাও তেমনি এখানে নিরাপদ। এদেশের পুরুষরা কিন্তু শুনলুম আত্মরক্ষার জন্য লাল রঙের পায়জামার আবরণকে শিখণ্ডী খাড়া করে না কদাচ—কারণ সেটা অত্যন্ত কাপুরুষতার কথা—তার গ্লানি এঁদের কাছে মরণের চেয়েও মর্ম্মান্তিক! মনে প্রাণে এঁরা হচ্ছেন মরদের জাত!

জল-আহরণীদের ভিড় ছাড়া পথের ধারে দর্শন মিলছিল ওদেশী রাখাল বালকদের…দিনের শেষে গরু ভেড়া ছাগলের পাল তাড়িয়ে যে যার ঘরে ফিরে চলেছে। পথ-প্রান্তের এমনি নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলার পর এক সময়ে নজরে পড়লো—দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শস্য-শ্যামল বালুময় তটভূমির দু-কূল প্লাবিত করে এঁকে-বেঁকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আফগানিস্তানের অন্যতম প্রধান সলিলদাত্রী স্রোতস্বিনী কাবুল নদী! খ্যাতিমতী হলেও কাবুল নদীটি আমাদের কলকাতার গঙ্গার চেয়েও আকারে-আয়তনে ছোট। এতক্ষণ একটানা

রুক্ষ-মরুময় প্রান্তর-পথে চলবার পর এই গৈরিক-পাহাড়ের কোলে সবুজ শস্য-পল্লবে ভূষিত সুদূর বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রের কিনারে সোনালি বালির চড়া বেয়ে গাঢ় নীল জলের স্রোত—চমৎকার লাগলো…দুর্গম পথ চলার ক্লান্তি যেন জুড়িয়ে গেল এই নীল সলিল-স্রোতের স্পর্শে !

কাবুল নদীকে বাঁয়ে রেখে আরো খানিক এগুতেই পথের বাঁকে নজরে পড়লো গিরিমাটি দিয়ে গড়া সুউচ্চ প্রাচীরের আড়ালে সুসংরক্ষিত আফগান্ সীমান্তের প্রথম জনপদ ডাক্কা শহরের 'পোলিটিক্যাল্ অফিস'। দপ্তরখানাটি প্রশস্ত…একতলা বাংলো, সামনে সুবিশাল অঙ্গন এবং পিছনে সুবিন্যস্ত ফুলে গাছে সাজানো প্রাঙ্গণ কাবুল নদীর তীর ঘেঁষে ! পেশোয়ার থেকে আফগান্-রাজ্যে যে সব যাত্রী আসে—তাদের প্রত্যেকের পরিচয়, পেশা এবং জিনিষপত্রের তথ্য-তল্লাসীর উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে রচিত এ-দেশী রাজনৈতিক-বিভাগের এই দপ্তরখানা ! কাজেই পাঁচিলের ফটক পার হয়ে বিভিন্ন পথযাত্রী যানবাহন এবং লোকজনের ভিড়ে ভরা ডাক্কা-দপ্তরের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে এসে আমাদের মোটর-ভ্যান্ দু'খানি যখন থামলো—তখন মন বিগড়ে গেল…আবার সেই খানা-তল্লাসীর ঝঞ্চাট পোয়াতে হবে !

কিন্তু, বিদেশীদের প্রতি এখানকার এ রাজনৈতিক দপ্তরখানার কর্ম্মীদের আচরণ ও ব্যবহার দেখলুম সম্পূর্ণ বিপরীত। ডাক্কার ভারপ্রাপ্ত আফগান্ পোলিটিক্যাল অফিসার শ্রীযুত মহম্মদ নিসার বয়সে তরুণ, সদা-হাস্যময়, প্রাণ-স্ফূর্ত্তিতে সজীব, অমায়িক, সজ্জন…উর্দ্দু এবং ইংরাজী দু'ভাষাতেই দেখলুম তাঁর রীতিমত দখল আছে। চিরাচরিত প্রথায় গাড়ী থেকে আমাদের মাল-পত্র নামিয়ে, বাক্স-প্যাঁটরা ঘেঁটে তছনছ করে তল্লাশী বা প্রত্যেকের কুলুজী-ঘাঁটা দূরের কথা…পথপ্রদর্শক প্যাভেল ও আভাকভের মারফৎ পরিচয় পাবামাত্র নিসার সাহেব পরম-সমাদরে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন দপ্তরখানার সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে ! কী আপ্যায়নের ঘটা…পলিটিক্সের প্যাঁচ ভুলে মহম্মদ নিসার এবং তাঁর আফগান্ সহকর্ম্মীরা মহা-উৎসাহে মেতে উঠলেন অতিথি-সেবায়। অতিথি-পরায়ণতা হলো আফগানিস্তানের বাসিন্দাদের বিশেষ গুণ…'মেহমান'কে এঁরা খাতির করেন দেবতার অধিক !

চড়া রোদ মাথায় নিয়ে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে আমরা বেশ ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছিলুম…দপ্তরখানার প্রাঙ্গণে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখি সেখানকার লোকজন সামনে ধরে দিলেন সদ্য-কাটা তরমুজ-জাতীয় আফগান-দেশের অপরূপ সুস্বাদু 'আরবুজ্' ফলের ফালিতে ভরপুর বিচিত্র আহার্য্য-ডালি এবং সুশীতল সরবতের গ্লাশ। পরম তৃপ্তিতে সে-সবের সদ্ব্যবহার সেরে আমরা গেলুম দপ্তরখানার সজ্জিত প্রশস্ত বাগিচায় বেড়াতে। বাগানের ঠিক নীচে বালু-বেলার বুক চিরে বহে চলেছে কাবুল নদী…অপরূপ সুষমা-শ্রীতে ভরে আছে চারিদিক…দিগন্তবিস্তৃত সেই শান্ত-সৌন্দর্য্যের মাঝে মন ভরে ওঠে ! দূরে রিক্তগাত্র-পাহাড়ের অন্তরালে অস্তে চলেছে দিনের সূর্য্য…আসন্ন-সন্ধ্যার আভা ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে সামনের সুবিশাল উপত্যকার উপর।

মহম্মদ নিসারের উৎসাহ কিন্তু অসীম…সেই ম্লানায়মান আলোতেই হঠাৎ এক ফাঁকে তাঁর ক্যামেরাটি এনে আমাদের অজস্র ফটো তুলে নিলেন—এ্যালবামের পাতায় ক্ষণিকের ভারতীয় অতিথি-বন্ধুদের স্মৃতি সঞ্চিত রাখবেন ! ছবি-তোলার পর তিনি অনুরোধ জানালেন যে, সামনেই দুর্গম পাহাড়ী পথ…সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-পথে পাড়ি দেওয়া বিপদজ্জনক…কাজেই সে-রাতটা আমরা যেন ডাক্কাতেই তাঁর অতিথি হিসাবে থেকে আফগানী খানা-পিনা, ফির্নী-কাবাব-মেওয়া এবং ও-দেশী নৃত্য-গীতের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি ! কিন্তু, উপায় নেই—এখানে থাকা এ-যাত্রায় অসম্ভব বলে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেই বন্ধু নিসার সাহেবের অনুরোধ এড়িয়ে দপ্তরখানার সাদর-আতিথ্যের মায়া কাটিয়ে আবার আমরা আমাদের মোটর-ভ্যান্ দুখানিতে চড়ে বসলুম—এবার জালালাবাদের পথে পাড়ি ! দপ্তরখানার ফটকে দাঁড়িয়ে মহম্মদ নিসার এবং ডাক্কার আফগান্-বন্ধুরা আমাদের বিদায় জানালেন…তাঁদের ছেড়ে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চললো অজানা নতুন পথে !

ডাক্কা ছাড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ী-পথ মাড়িয়ে বেশ কিছু দূর যাবার পর ম্লানায়মান দিনের স্তিমিত-আলোর রেখা মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে। মোটরের সুতীব্র হেড্-লাইটের আলো জ্বেলে, সেই গভীর অন্ধকারের বুক চিরে সশঙ্ক-চিত্তে আমরা চললুম গহন-বিজন গাঢ়-তমসাচ্ছন্ন পাহাড়ী-পথে।

পথে জন-প্রাণী নেই…দূর-দূরান্তে মানুষের বসতির কোনো চিহ্নও মেলে না ! দীপ-শিখার ক্ষীণতম রশ্মি দূরে থাক্, আশে-পাশে জোনাকির চকিত-চমকও দুর্লভ ! এমন অবিচ্ছিন্ন মসীময় অন্ধকার চারিদিকে যে অসতর্ক-মুহূর্ত্তে কখন কোথা থেকে অজানা বিপদ এসে পড়ে, সেই ভয়ে সকলে সজাগ হয়ে বসে আছি।

এমনি উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর নজরে পড়লো—দূরে টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে জালালাবাদ সহরের গৃহ-দীপরাজি ! আরো কাছাকাছি এগিয়ে এসে দেখি—চলবার পথ উপলাকীর্ণ ধূলিময় হলেও, বেশ সমতল…পাকা-বাঁধানো ! সে-পথ অতিক্রম করে সহরের এলাকায় যখন পৌঁছুলুম—তখন রাত হয়েছে…ঘড়িতে প্রায় সওয়া আটটা !…

কেরসিন আর পেট্রোম্যাক্সের আধো-আলো আধো-অন্ধকার স্তিমিত আভায় অপরূপ এক রহস্যময় রূপ ধারণ করে রয়েছে আফগানিস্থানের সুপ্রসিদ্ধ সহর জালালাবাদের পথ-ঘাট, দোকান-পাট আর ঘর-বাড়ী, কাফি-সরাইখানার কুঠুরী-অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ ! পথের ধারে বিজলী-বাতির সারের কথা দূরে থাক—তেলের আলোরও দর্শন মেলে না কোথাও…যদিও আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ তেলের আলোর ল্যাম্প-পোষ্টের নমুনা দাঁড়িয়ে রয়েছে সহরের সড়কের আশে-পাশে ! সারা জালালাবাদ সহর অন্ধকারের আবরণে যেন অঙ্গ আবৃত করে রেখেছে—বোর্খার-অবগুণ্ঠনে-ঢাকা এ-দেশের পর্দ্দানশীন রূপসীদের মত !

সন্ধ্যা-সমাগমে ও-দেশী কেতা-মাফিক সহরের রাজপথের মোড়ে-

মোড়ে দিনের কর্ম্মশ্রান্ত মানুষদের ছোট-বড় খণ্ড-খণ্ড বহু 'মজ্‌লিস্‌' জমে উঠেছে এধারে-ওধারে।

সেকালের সেই বোগ্‌দাদের খালিফ্‌ হারুণ-অল্‌রসিদের কথা মনে পড়লো! মনে হলো যেন আরব্য-উপন্যাসের কোন্‌ আজব সহরে এসেছি—সিন্দবাদ-নাবিকের মত ঘুরতে ঘুরতে!

দেখতে দেখতে চোখের সামনে জেগে উঠলো দু'ধারে উঁচু ঝাউ, চেনার, পপ্‌লার প্রভৃতি গাছের সার দিয়ে সাজানো সহরের ধূলি-ধূসর বাঁধানো পথ! পথে লোকের ভীড় নেই তেমন…সে পথ মাড়িয়ে 'হোটেল ত জালালাবাদ' (Hotel de Jalalabad)-এর প্রশস্ত আঙিনায় এসে আমরা পৌঁছুলুম রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ!…সে-রাতের মত এই হোটেলেই বিশ্রামের ব্যবস্থা!

জালালাবাদ সহরটির অবস্থিতি হলো ডাক্কা আর কাবুলের উত্তুঙ্গ-বন্ধুর দুই গিরি শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী শস্যশ্যামল বিস্তীর্ণ উপত্যকার উপরে, সুজলা কাবুল-নদীর সলিল-স্রোত-প্রান্তে! এতক্ষণ যে অনুর্ব্বর জনহীন পাহাড়ী-পথে পাড়ি দিয়ে এসেছি, নদী-মাতৃক বলেই এ-অঞ্চলের চেহারা ঠিক সে-ধরণের রুক্ষ-নীরস এবং ভয়ঙ্কর নয়…সুফলা-জমীর-বাসিন্দা-মানুষের স্নিগ্ধ-শ্যামলিমার শোভায় ভরে আছে চারিধার। পাহাড়ের ভিড়ে-ভরা গোটা আফগানিস্তান-রাজ্যে বড় সহর বলতে আছে মাত্র পাঁচটি—কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, গজ্‌নী এবং জালালাবাদ! এর মধ্যে রাজধানী কাবুলের পরেই ঐতিহ্য এবং পদ-গৌরবের দিক থেকে বিশিষ্ট স্থান হলো এই জালালাবাদ সহরের। কারণ, জালালাবাদ হলো আফগানিস্তানের শীতকালের রাজধানী। শীতের সময় প্রচণ্ড পাহাড়ী-ঠাণ্ডায় কাবুলের পথ-ঘাট সব যখন বরফে ঢেকে সাদা হয়ে যায়, তখন আফগান্‌-রাজ, রাজ-দরবার এবং সেখানকার প্রজা পরিষদ, সরকারী দপ্তরাদি সবই হাজির হয় নীচে উপত্যকা-শহর জালালাবাদের আরাম-নীড়ের আশ্রয়ে। আফগানিস্তানের আদি-যুগ থেকে এই রীতি চলে আসছে বলেই জালালাবাদ সহরের এতখানি বনেদীয়ানা আর বোল্‌বোলাও, এদেশী এবং বিদেশী মহলে। তাই রাজ-আবাস, রাজ-দরবার, রাজ-দপ্তর, আদালত-কাছারী, কারাগার এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী ভবনাদি ছাড়াও জালালাবাদ সহরে ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে দেশী-বিদেশী জন-সাধারণের জন্য সুবৃহৎ পান্থশালা, হোটেল এবং ছোট-বড় দোকান-পাঠ-পশরার বিচিত্র সম্ভার। তবে আফগান-রাজ্যের অন্যতম প্রধান জনপদ এবং শীতের রাজধানী হলেও পথ-ঘাট বা ঘর-বাড়ীর অনাড়ম্বর অতি-সাধারণ চেহারা দেখলে মনেও হয় না যে জালালাবাদ সহর আভিজাত্যে এ-দেশের দ্বিতীয় নগর…মনে হয়, যেন পাঞ্জাব, পেশোয়ার কিম্বা পারস্যের কোন্‌ মধ্য-যুগের মুসলমানী ছোট দেহাতী সহরের অনুন্নত মহল্লায় এসেছি। সরকারী এবং অভিজাত নবীদের সুদৃশ্য এবং সমৃদ্ধিশালী আবাস-ভবনগুলি ছাড়া সহরের আর যে-সব সাধারণ বাসিন্দাদের ঘর-বাড়ী-বসতি চোখে পড়ে, তার চেহারা বেশীর ভাগেই দীন-হীন-জীর্ণ গোছের, মাটির দেয়াল-গাঁথা, পোড়া, নোংরা গ্রাম্য-ছাঁদে গড়া! অথচ ঐতিহ্যের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এ-সহরের বৈশিষ্ট্য অপরিসীম। প্রাচীন কৃষ্টি-সভ্যতার অপরূপ গরিমায় সুসমৃদ্ধ! আফগানিস্তানের অতীত ইতিহাসের পাতায় এবং জালালাবাদ সহরের আশে-পাশে, আনাচে-কানাচে গ্রামাঞ্চলে এ-দেশের সেই সব গৌরবোজ্জ্বল অভিনব কীর্ত্তি—পুরোনো আমলের বহু বিচিত্র সৌধ-ইমারৎ ও ধ্বংস-স্তূপ… আজো এ-পথের যাত্রীদের চোখে পড়ে! আধুনিক জালালাবাদ সহরের দক্ষিণে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই হাদ্দা গ্রামে প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাক-ভারতীয় আমলের ভাস্কর্য্য মূর্ত্তির এমন বহু বিচিত্র নিদর্শন রয়েছে, যা থেকে সহজেই প্রমাণ পাই ভারতের সঙ্গে এ-রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে এ সব অঞ্চলে কৃষ্টি-কলা-সভ্যতার মান একদিন কত উঁচু ছিল! তাছাড়া এ অঞ্চলের জ্ঞানী-বুদ্ধ, ধ্যানী-বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ, কৃচ্ছ সাধনরত-বুদ্ধ প্রভৃতি নানা সব মূর্ত্তির নমুনা এবং গান্ধার শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কী পরিমাণে বিস্তারলাভ করেছিল পার্ব্বত্য অঞ্চলে! শুধু জালালাবাদের আশে-পাশেই নয়…আফগানিস্তানের আরও নানা জায়গায়—গজ্‌নী, কাবুল প্রভৃতি সহরের সীমান্তে, বামিয়ান উপত্যকায়, হিন্দুকুশ পর্ব্বতপাদমূলে, হাইবাক্‌, বল্‌খ, এবং কাপিকা অঞ্চলে প্রাচীন গ্রাক ও বৌদ্ধ-ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্ব্বতগাত্রে খোদাই করা সে আমলের বিরাট বিচিত্র বহু মূর্ত্তি-ভাস্কর্য্য এবং ধর্ম্মবিহার, মঠ, জনপদ প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্প-স্মৃতির ধ্বংসাবশেষের মাধ্যমে। যাঁরা প্রত্নতাত্ত্বিক—তাঁদের কাছে এ দেশ হলো স্বর্গ।…কারণ তাঁদের ঐতিহাসিক গবেষণার বহু বিচিত্র উপাদান এবং মাল-মশলা ছড়ানো রয়েছে আফগানিস্তানের সর্ব্বত্র। আফগানিস্তান গরীব দেশ হলেও—ঐতিহ্যের গরিমায় গরীয়ান!

কিন্তু থাক্‌…ইতিহাসের প্রসঙ্গ ছেড়ে আমাদের যাত্রার কাহিনী বলি! জালালাবাদের হোটেলটি সুদৃশ্য এবং সুবৃহৎ…নিরালা বাগিচার মাঝে বাংলো ধরণের পাকা একতলা বাড়ী ওদেশী ছাঁদে গড়া তবে বিলাতী কায়দায় সাজানো! বন্দোবস্ত ভালো…বিজলী বাতির ব্যবস্থা আছে—তবে, আমাদের বরাত খারাপ, তাই সে আলোর উজ্জ্বল রোশ্‌নির বদলে সনাতন কেরোসিন তেলের ল্যাম্পের আলোতেই খুশী থাকতে হলো সে যাত্রা। শুনলুম,—পাকিস্তান-রাজ্যের এলাকা পার হয়ে পারসিক তেল আমদানী করা হয় এ দেশে! সম্প্রতি ব্যবস্থায় কি সব গোলযোগ ঘটায় আফগানিস্তানে এই তেলের অভাব ও বৈদ্যুতিক-শক্তি সঙ্কট! সুতরাং বৈদ্যুতিক-শক্তির বিপর্য্যয়ে হোটেলের আলো পাখা বন্ধ থাকার দরুণ অসুবিধা কিঞ্চিৎ ঘটলেও, ওখানকার অনুচরদের আপ্যায়ন আর অতিথি সেবার ঘটায় সে সবই ভুলে গেলুম আমরা!

সহরের ধূলিধূসর বড় রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে সুদীর্ঘ পপ্‌লার ঝাউ, চেনার, নার্গিশ প্রভৃতি তরু-বীথিকায় সাজানো পাকা শড়ক বেয়ে হোটেলের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে সেদিনের মত আমাদের যাত্রাভঙ্গ করা গেল। মালপত্র সব সোভিয়েট মোটর-ভ্যান দুখানিতে মজুত রেখে,

ধু নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রসাধন-সরঞ্জাম এবং পরিবর্ত্তনের উপযোগী ামান্য কিছু পোষাক পরিচ্ছদ সঙ্গে নিয়ে হোটেলের উন্মুক্ত বারান্দায় াছানো কেদারায় পরিশ্রান্ত দেহ-ভার এলিয়ে বসে গেলুম। দিকে সোভিয়েট সঙ্গী আভাকভ আর প্যাভেল কিন্তু বিশ্রাম-সুখ লে হোটেলের অনুচরদের নিয়ে সোৎসাহে মেতে গেলেন আমাদের রাম-বিরাম এবং আহারাদির তদ্বির-ব্যবস্থায়। পূর্ব্বেকার মত এখানেও ামাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থা ছিল বাথরুমসমেত একখানি 'রে সুসজ্জিত কামরা।

বিশ্রামান্তে স্নানাদি ও বেশ-পরিবর্ত্তন সেরে হোটেলের বারান্দায় ারিয়ে এসে দেখি সামনে চন্দ্রালোকিত উদ্যানে ইতিমধ্যেই খানা-'বিল পেতে বিচিত্র ভোজ্যসম্ভার জিয়ে সেখানকার অনুচরবৃন্দ ও াভিয়েট বন্ধুদ্বয় সাড়ম্বরে আমাদের ।শ-ভোজনের বন্দোবস্ত করে ঃখেছেন। পরিতৃপ্তিসহকারে গজন-পর্ব্ব সমাধা হলো। শোবার বস্থা হয়েছিল হোটেলের খোলা রান্দায় খাট-বিছানা পাতিয়ে—ন না বৈদ্যুতিক পাখাগুলি অচল কার দরুণ গুমট গরমে ঘরের ভতরে তিষ্ঠানো দায়! সারাদিনের রিশ্রমের পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি -হুঁশ নেই!

মাঝ-রাতে হঠাৎ বাসন-পত্রের ঠাং আর মানুষের চলা-ফেরার ব্দ ঘুম গেল ভেঙ্গে! চোখ লে চেয়ে দেখি, কেরাসিন-াম্পের স্তিমিত-নিষ্প্রভ-আবছা ালোয় আলোকিত বারান্দায় ঃ উদ্যানস্থ খানা-টেবিলের আশে-পাশে ছায়ামূর্ত্তির মত কারা সব ারাঘুরি করে বেড়াচ্ছে সন্ত্রস্ত-সচকিতভাবে!…একে নিরালা নতুন দেশী জায়গা…নিশুতি রাত…আশে-পাশে অকস্মাৎ এই সব নিশাচর-গন্তুকদের আবির্ভাবে বুকের ভিতরটা অজানা আতঙ্কে ছাঁৎ করে লো!…চোর-বাটপাড়?…রাহাজানী?…

পাশে তাকিয়ে দেখি, সঙ্গীদেরও চোখের ঘুম গেছে ছুটে…আতঙ্ক-ব্ল দৃষ্টিতে তাঁরা সবাই উৎকণ্ঠিতভাবে লক্ষ্য করছেন এই আগন্তুকদের তিবিধি! আর্ত্তত্রাতা আভাকভকে ডেকে তুললুম! ঘুম থেকে উঠেই ক ব্যাপার কি জানাবার আগেই আগন্তুকদের একজন এগিয়ে এসে বালো,—সব তৈয়ার!…তার মানে?…আসল ব্যাপার যা শুনলুম তাতে সর বক্তা বন্ধ হয়ে গেল! অর্থাৎ চোর-বাটপাড় বলে এতক্ষণ যাদের আমরা ই দারুণ সন্দেহের চোখে দেখছিলুম—তারা আসলে ঐ হোটেলেরই অনুগত অনুচরবৃন্দ…পরদিন প্রত্যুষেই জালালাবাদ ছেড়ে কাবুলের পথে পাড়ি জমাবো বলে রাত্রে শোবার সময় ওদের বলে রাখা হয়েছিল যে যাত্রার পূর্ব্বেই আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা যেন প্রস্তুত থাকে! সেই আদেশ-মত ওরাও যথারীতি ব্যবস্থাদি করছিল—রাত থাকতেই! তবে গলদটি ঘটেছিল হোটেলের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' দেওয়াল-ঘড়ীটি বিকল হয়ে যাওয়ার দরুণ! হোটেলে পদার্পণ করার সময়েই আমরা লক্ষ্য করেছিলুম ওখানকার দেয়াল ঘড়ীতে সাড়ে তিনটে বেজে আছে। সর্ব্বক্ষণ এ নিয়ে হাসি ঠাট্টাও করেছি তখন—অথচ হোটেলের লোকজনদের কারো খেয়াল নেই সে বিষয়ে! তাই ঘড়ীতে রাত দেড়টাকে, সাড়ে তিনটে দেখে ওরা অতিথি-সৎকারে তৎপর হয়ে গরম-গরম চা, টোষ্ট,

প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ মন্দির—'থারেস্তা টোপ'এর ধ্বংসাবশেষ

কফি, ডিম, ফল প্রভৃতি সাজিয়ে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে এই মধ্যরাত্রেই! আভাকভ তেড়ে যেতেই অনুচরবৃন্দ খানা-টেবিলের ওপরকার সদ্য প্রস্তুত গরমাগরম ভোজ্য-সম্ভারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে সবিনয়ে জানালো,—ব্রেকফাষ্ট তৈরী…বিলম্বে সব কিছু জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে! কথাটা শুনে আমরা হাসবো কি কাঁদবো ঠিক করতে পারলুম না! কি আর করি, অগত্যা যে যার বিছানা ছেড়ে উঠে মাঝরাতেই স্নানাদি সেরে প্রাতরাশপর্ব্ব শেষ করলুম—অতি কষ্টে ভরা-পেট আরো একদফা ভোজ্য-সম্ভারে ভরিয়ে তুলে!

আফগানী অতিথি-আপ্যায়নের আজব-পালা চুকিয়ে হোটেলের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে আবার যখন কাবুলের পথে পাড়ি দিলুম—রাত তখন তিনটে …সারা জালালাবাদ সহর গাঢ় ঘুমে অচেতন…চারিদিক নিশুতি… জনপ্রাণীহীন…আবছা অন্ধকারে ঢাকা! মৃদুতীব্র হেড-লাইটের আলোয়

পথ আলো করে আমাদের বুকে নিয়ে সোভিয়েট ভ্যান দুখানি পুনরায় যাত্রা শুরু করলো অজানা কাবুলের পানে!

সহর ছাড়িয়ে খানিক এগুতেই পথের অবস্থা দেখলুম খুবই খারাপ— যেন লাঙল-চষা-ক্ষেতের এবড়ো-খেবড়ো দুর্গম আল-মাটি-ঢিবি ভেঙ্গে চলেছি আমরা! মাঝে মাঝে ভাঙ্গা-চোরা জীর্ণ পুলেরও দর্শন মেলে গ্রীষ্মের খরতাপে বিশুষ্ক পাহাড়ী-নদীর বুকে…তবে সে-সব পুলের উপর দিয়ে গাড়ী চলাচল নিষিদ্ধ—এমন শোচনীয় তাদের অবস্থা! তাই পুলের পথ ছেড়ে এদেশী যান-বাহনাদি নিশ্চিন্তে চলাফেরা করে শুকনো নদীর বালুময় বুকের উপর দিয়েই খেয়াল-খুশী মাফিক রাস্তা ধরে! আমরাও সেই রীতি মাফিক এগিয়ে চললুম!

জালালাবাদ থেকে কিছুদূর এগুলে কাবুল যাবার পথের পাশেই পড়ে নিমলা উপত্যকা-প্রান্তরে যাবার রাস্তা! রাতের অন্ধকারে সে-পথে যাওয়া সমীচীন নয়, তাই সোজা এগিয়ে চললুম কাবুলের পাহাড়ী পথের চড়াই অতিক্রম করে। শুনলুম, এই নিমলায় অপরূপ এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিনার-নার্গিস তরু-বীথিতে সাজানো উদ্যান আছে…সেটি নাকি সম্রাট সাজাহানের সৃষ্টি! এ-উদ্যানটি নাকি তাজমহলের সমবয়সী। এখানে একদা ছিল এক প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম উদ্যান-বাটিকা, কিন্তু কালের প্রকোপে আজ তার চিহ্নমাত্র নেই!

নিমলা পার হয়েই পথ খাড়াই উঠে গেছে পাহাড়ের সুউচ্চ-গাত্র বেয়ে…এই সাত-আট হাজার ফুট দুস্তর দুরারোহ গিরি-শৃঙ্গের চড়াই টপকে গেলে তবেই পৌছানো যায় রাজধানী কাবুলের উপত্যকা সহরে। রীতিমত দুর্গম, সঙ্কীর্ণ, উপলাকীর্ণ বন্ধুর এ-পথ…একপাশে আকাশচুম্বী খাড়া পাহাড়—অপর পাশে অতলস্পর্শী গভীর খাদ নেমে গেছে প্রস্তর-সঙ্কুল গিরি-প্রবাহিনী কাবুল নদীর দুরন্ত-ধারার বুকে পথ চলতে একটু অসাবধান হলেই পা-হড়কে নীচের অতল-গহ্বরে পা অপমৃত্যু। তবু এমন অপরূপ বিচিত্র একমহিমায় ভরে আছে এ অঞ্চল ভয়াল-ভয়ঙ্কর দৃশ্য-শোভা—যে নিতান্ত অরসিকের মনেও রোমাঞ্চ-পুলকে শিহরণ জাগিয়ে তোলে! সেই নিশুতি রাতে অস্তগামী চাঁদের স্তিমি আভায় জনহীন অজানা পথের চারিপাশে পার্ব্বত্য প্রকৃতির অপূ রূপসম্ভার আমাদের পথচারী-মনকেও এমন অপূর্ব্ব অনুভূতিতে না দিয়েছিল যে বর্ণনায় তা বোঝানো সম্ভব নয়!

ক্রমে রাতের অন্ধকার মিলিয়ে বিশাল রুক্ষগাত্র পর্ব্বত-শ্রেণীর পিছ অনন্ত আকাশের বুকে দেখা দিলে উষার আলোক-আভাস! নির্জ পাহাড়ী-পথেও ধীরে ধীরে জাগলো প্রাণের হিল্লোল…নিশি-ভো ও-দেশের পাহাড়ী মেয়ে-পুরু দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে পাহাড় বুকে, গরু, ভেড়া, মেষপাল চরা ফসলের ক্ষেতে চাষ-বাসের ক করতে, কিম্বা বিদেশের হাটে প বেশাতীর উদ্দেশ্যে! তাদের পিছ ফেলে আমরা আরো এগি চললুম পাহাড়ের আরো দুরারোহ চড়াই অতিক্রম ক কাবুলের অভিমুখে। গা অবিরাম ঝাঁকুনী খেতে খে এমনিভাবে পাহাড়ী-চড়াই হয়ে এসে ভোর ছ'টা নাগাদ এ পৌঁছুলুম আমরা আফগান-রাজ আধুনিক-আমলের নবনির্ম্মি সুসভ্য জনপদ সারোবী সহ সুদৃশ্য-সুবিশাল পান্থশালায়! প

কাবুলের সন্নিকটে গিরিগাত্রে খোদিত প্রাচীন বৌদ্ধ-ভারতীয় মূর্ত্তি-ভাস্কর্য

পাহাড়ের গা কেটে রচিত হয়েছে এই শহর—অনুন্নত আফগানিস্ত অঞ্চলে তড়িৎ-শক্তির প্রসার-প্রগতিকল্পে এ-দেশী রাজ-সরকারের আনুকূ জগৎ-বিখ্যাত জার্ম্মান Seimens প্রতিষ্ঠান এখানে দুরন্ত-পাহাড়ী-ন কোলে প্রতিষ্ঠা করেছেন অভিনব শক্তিশালী বিরাট এক হাইড্রো-ইলেক্ট্রি কারখানা! সেই সূত্রেই ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে এই সুন্দর সু সারোবী সহর! এখানে বিদ্যুৎ-বিশারদ বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞ বাসা-বেঁধেছেন হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানার নানা কর্ম্মোপলক্ষে তাঁদের সুদৃশ্য বাংলোগুলি ছবির মত সাজানো পান্থশালার আ পাশে দু'ধারে! তা ছাড়া সারোবীর চারিধারে পার্ব্বত্য-প্রকৃ শোভাও অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভরা…অনন্ত আকাশের কোলে বি প্রসারিত নগ্নকায় উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী…তারই পাদমূলে উপত্য গিরি-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে দুর্নিবার-খরস্রোতে…মাঝে-মা সবুজ তৃণ-শস্যের রেখায় শ্যামল শ্রীমণ্ডিত হয়ে আছে বিস্তীর্ণ প্রা

তটভূমি! সকালের সোনালি আলোয় ঝলমল করছে সারা সারোবীর সীমানা!

পান্থশালার সুসজ্জিত আঙ্গিনায় স্বল্প বিশ্রাম এবং সকালের জলযোগাদি সেরে আবার রওনা সারোবী সহর ছেড়ে! সারোবী থেকে কাবুলের দূরত্ব চল্লিশ মাইল! পথ বেশ ভালো···এঁকে-বেঁকে সর্পিল ভঙ্গীতে চড়াই উৎরাইয়ের ঢেউ তুলে এগিয়ে গেছে কাবুলের পানে! সতর্ক গতিতে গাড়ী চালিয়ে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর পথের পাশেই পাহাড়ের রুক্ষ উপলময় উত্তুঙ্গ চূড়োর উপরে নজরে পড়লো অতীত আমলের জীর্ণ বিরাট ধ্বংসাবশেষ। শুনলুম—সেটি হলো বৌদ্ধ-যুগে এ-দেশে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম সভ্যতা কৃষ্টির যে বিকাশ হয়েছিল তারই গৌরব-গরিমাময় কীর্ত্তির অন্যতম একটি নিদর্শন! এদেশের বাসিন্দারা এই ভগ্ন-স্তূপের আধুনিক নামকরণ করেছে—'খায়েস্তা টোপ' অর্থাৎ—শ্রেষ্ঠ চূড়া'···এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকদের মতে এটি নাকি একদা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধ-স্তূপ-মন্দির ছিল···সে আমলে দেশ-দেশান্তরের বহু ধর্ম্মপ্রাণ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর আসা-যাওয়ার ভীড়ে সর্ব্বদা রীতিমত সরগরম থাকতো এই বিরাট শৈল পীঠস্থানটি··· কিন্তু কালের প্রকোপে সে সব আজ লুপ্ত···শুধু এই বিরাট স্তূপের ভগ্ন স্মৃতিটুকু!

জীর্ণ খায়েস্তা টোপের-ধ্বংসস্তূপ পিছনে ফেলে সুদীর্ঘ দুরারোহ দুর্গম চড়াই আর উৎরাই পথ পার হয়ে এগিয়ে অবশেষে চোখে পড়লো—পাহাড়ের নীচেকার রুক্ষ শ্যামল উপত্যকাভূমি···স্বচ্ছ-সলিলা খরস্রোতা কাবুল নদী বয়ে চলেছে তারই বুক চিরে! বেলা বেড়ে চলেছে···রোদের ঝাঁজ বেশ কড়া। ক্রমে উঁচু পাহাড়ের বুক থেকে পথ ঢালু হয়ে নেমে এলো সমতল প্রান্তরে। দু' পাশে চাষের জমী, ফলের বাগিচা আর উন্মুক্ত ধূ-ধূ প্রান্তর···সনাতন প্রাচীন অনুন্নত প্রথামতই কৃষিকার্য্য, সমাজ ব্যবস্থা সবই চলে আসছে এ দেশে···তবে উন্নততর বৈজ্ঞানিক ধারায় নানা দিকে আমূল সংস্কার কার্য্যের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে আফগানিস্তানের সর্ব্বত্র প্রজাদের মঙ্গলের জন্য! কৃষি এবং যান্ত্রিক শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞের আমদানী করা হয়েছে—তাঁদের নির্দ্দেশানুযায়ী দেশের দারিদ্র্য এবং প্রকৃতির অকৃপা ঘোচানোর মহৎ সাধনায় সমস্ত শক্তি সঁপে দিয়ে এ দেশের বাসিন্দারা শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের স্বাধীন জন্মভূমিকে! তবে আধুনিক বিদেশী সভ্যতার অনুসরণ করেও এ-দেশের চেহারা এখনও পুরোপুরি পাশ্চাত্য ছাঁদের হয়ে ওঠে—আফগানিস্তানের নিজস্ব রূপ-বৈশিষ্ট্যটুকু আজও বজায় রয়েছে!

সমতল উপত্যকায় ধূলি-ধূসর শড়ক মাড়িয়ে অবশেষে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ হাজির হলুম রাজধানী কাবুলের উপকণ্ঠে! চলতি পথে গাছপালা বাগিচায় ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছিল দূরান্তের ছোট বড় বিচিত্র সব বাড়ী-ঘর, মসজিদ মিনারে ভরা সহরের চেহারা!

কাবুলের প্রবেশ-পথেই গাড়ী থামিয়ে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন—আফগানিস্তানের সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সহকর্মীরা! আমাদের পৌঁছানোর বিলম্ব দেখে তাঁরা দূতাবাস ছেড়ে মোটরে বেরিয়ে পড়েছিলেন খোঁজখবর নেবার জন্য! মধুর আপ্যায়নে পরম সমাদরে তাঁরা আমাদের আহ্বান করে নিয়ে গেলেন রাজধানীর প্রধান যাত্রী শালা-হোটেল কাবুলের আরামপ্রদ ভবনে! সেখানে বিশ্রামকালে ওখানকার সোভিয়েট দূতাবাসের নবলব্ধ বন্ধু বললেন যে সেদিন দুপুরেই সোভিয়েট বিমান রওনা হচ্ছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র উজবেকীস্তানের রাজধানী তাশকান্দ অভিমুখে! যদি কাবুলে কালাতিপাতের বাসনা না থাকে তো আমরা সদলে সেই প্লেনেই সোভিয়েট দেশে যাত্রা করতে পারি সেদিন দুপুরেই!···কাবুল থেকে তাশকান্দ পৌঁছুতে সোভিয়েট প্লেনে সময় লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা! সুতরাং আমাদের যথা অভিরুচি সেই রূপই ওঁরা ব্যবস্থা করবেন! সপ্তাহে তিন বার যাত্রীবাহী সোভিয়েট বিমানগুলি যাতায়াত করে কাবুল আর মস্কোর আকাশের মাঝে! কাজেই সেদিন দুপুরে যদি যাত্রা না করি তো কদিন থাকতে হবে এই কাবুল সহরের হোটেলে। পথশ্রমে ক্লান্ত হলেও মন আমাদের ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সোভিয়েট-ভূমি সন্দর্শনের উদগ্র-বাসনায়—তাই কাবুল-বাসের ইচ্ছা ফিরতি-পথে মেটাবো ভেবে দুপুরের প্লেনেই তাশ্‌কান্দ সহরে রওনা হবার অভিলাষ জানালুম সোভিয়েট বন্ধুদের কাছে! তখনি তাঁদের লোক ছুটলো আমাদের তাশ্‌কান্দ-যাত্রার বন্দোবস্ত পাকা করতে!

আমাদের আগমন-বার্ত্তা পেয়ে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসের অন্যতম কর্ম্মী বন্ধুরা এলেন হোটেলে দেখা-সাক্ষাৎ করতে! শুনলুম, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কর্ণেল কাপুর আমাদের সনির্ব্বন্ধ-আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য! কাবুলে থাকার মেয়াদ আমাদের খুবই অল্প···বেলাও এগিয়ে চলেছে—কাজেই হোটেলের বিশ্রাম-সুখ ভুলে সোভিয়েট এবং স্বদেশী বন্ধুদের সঙ্গে সোজা গেলুম ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসে! পথে চোখে পড়লো প্রাচীর বেষ্টিত আফগানিস্তানের রাজার প্রাসাদ, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতি দূতাবাসগুলি এবং কাবুলের জনাকীর্ণ চক্, বাজার, বাড়ী-ঘর, ফটক এবং নানা সরকারী ও বেসরকারী ভবন! পদমর্য্যাদায় রাজধানী হলেও—কাবুল সহরের চেহারা কিন্তু পুরোনো অনুন্নত পশ্চিমা দেহাতী-সহরের মত···অপরিচ্ছন্ন, ধূলিধূসর, এলোমেলো অগোছালো গোছের!

ভারতীয় দূতাবাসে কর্ণেল কাপুরের সঙ্গে আলাপ আমাদের বেশ জমে উঠেছে এমন সময় ডাক পড়লো বিমান-বন্দরে যাবার···প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে! বিদায় নিয়ে রওনা হলুম কাবুলের বিমান-বন্দরে! ভারতীয় এবং সোভিয়েট দূতাবাসের বন্ধুরাও সদলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন শুভেচ্ছা এবং বিদায়-অভিনন্দন জানাতে!

কাবুলে বিমান-বন্দর দুটি—একটি ও-দেশী বিমান-বাহিনীর জঙ্গী-বিমানের ঘাঁটি এবং অপরটি যাত্রীবাহী আকাশ-যানের জন্য! আমাদের অপেক্ষায় সুবিশাল সোভিয়েট-প্লেনখানি দাঁড়িয়ে ছিল এই শেষোক্ত বিমান-বন্দরে! এরোড্রামটির ব্যবস্থা ভালো···অবস্থিতি কাবুলের দক্ষিণে সুউচ্চ হিন্দুকুশ শৈল-শ্রেণীর পাদমূলে বিস্তীর্ণ উপত্যকা-প্রান্তরের বুকে! চারিপাশের দৃশ্য অতি মনোরম!

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল সুদৃশ্য সোভিয়েট বিমান-পোত! আমরা

সদলে হাজির হতেই গাঢ় কালো নীল বর্ণের পোষাক পরিহিত প্লেনের পাইলট ও কর্ম্মীরা সাদর-সমাদরে সোভিয়েট-অতিথি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সমাগত বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা একে একে গিয়ে উঠলুম আকাশ-যানের আরাম-প্রদ আসনে। মাল-পত্তর আমাদের আগেই উঠে গিয়েছিল প্লেনের কন্দরে বন্ধুবর আভাকভ, প্যাভেল আর প্লেনের সোভিয়েট-কর্ম্মীদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায়। আমাদের সহযাত্রী ছিলেন ভারত-আফগানিস্তানের সোভিয়েট দূতাবাসের জনকয়েক পুরুষ ও নারী কর্ম্মী এবং তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা! সবাই ওঠবার পর যথাসময়ে বিশাল সোভিয়েট প্লেনের বিরাট তিনখানি প্রোপেলার সজোরে গর্জ্জে উঠলো! একটু পরেই বিনা-আড়ম্বরে সহজ-সাবলীল গতি-ছন্দে আমাদের বিমান আফগানিস্তানের জমি ছেড়ে পাখা মেলে সীমাহীন অনন্ত নীল আকাশের বুকে উড়ে চললো—সোভিয়েট-সীমান্তের অভিমুখে। উড়ন্ত-প্লেনের গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলুম—নীচে শ্যামল ধরণীর বুকে দাঁড়িয়ে আভাকভ, প্যাভেল এবং আফগানিস্তানের অন্য সব বন্ধুরা হাত নেড়ে, রুমাল নেড়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অবিরাম! ক্রমে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল তাঁদের চেহারা···আমাদের প্লেন ভেসে চললো মেঘের উপর দিয়ে এগিয়ে তাশ্‌কান্দের উদ্দেশে!

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নভাঙ্গার গান

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তোরা স্বপ্নলোকের গান-পরীদের থামতে বল্।
ওরে ভাঙ্‌রে আজি সান্ধ্য সুখের
ভোগবিলাসের প্রেমগজল॥

শোন্ সর্ব্বহারার আর্ত্তনাদ
ঐ চাচ্ছে হেঁকে ভাতকাপড়,
ওই লক্ষ শিখায় আস্‌ছে আগুন
সঙ্গে তাহার উঠলো ঝড়,
আজ স্বপ্ন ভেঙ্গে বাস্তবেরি
তপ্ত পথে চল্‌বি চল্।

ওর অত্যাচারের রক্ত পথে
বাজ্‌ছে শোন্ ঐ কারবিগ্‌ল।
ওরে গাইতে হবে দুর্নীতিনাশ
দুঃখজয়ের অগ্নি গান,
তোর বীণার তারে জল্‌বে আগুন
নাচ্‌বে সুরে পরিত্রাণ,
তার ছন্দ হবে রুদ্রমাতাল
কাঁপ্‌বে বিমান সপ্ততল।
ওই ভুখ্‌মিছিলের রুদ্র ডাক্ আজ
করছে সবার প্রাণবিকল্॥

তোরা স্বপ্নভাঙ্গার গান গারে সব
বন্ধ রাখ্ আজ ফুলবাগান,
যত অন্ধকারের বন্দীদের আজ
করতে হবে মুক্তিদান।
চল দুঃখদাহন লক্ষবুকের
করতে হবে প্রাণ শীতল্।
শোন্ অঙ্গনাদের চিৎকারে আজ
কাঁপ্‌ছে সারা জলস্থল॥

যত অগ্নিময়ী ভগ্নীদের আজ
রক্তে বেণী বাঁধার দিন,
যারা আত্মদানের পুণ্য শহীদ্
শুধ্‌তে হবে তাদের ঋণ,
যত দুঃখীদের আজ চুক্তি ভাঙার
মুক্তিগানের গাও গজল্।
আজ স্বপ্নভাঙ্গার লগ্ন ফল
ডাক্‌ছে মা ঐ চল্‌বি চল্॥

(পূর্বপ্রকাশিতেরপর)

ন্যায়রত্ন তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

লোকে বলিল—দেহত্যাগ করিলেন। প্রায় অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া তাহারা এ কথা যেন ঘোষণা করিয়া বলিতে চাহিল। বলিল—দেখ না, ভাল করে বুঝে দেখ না। বিচার ক'রে দেখ না! অজয় ফিরে এল, তবে চোখ বুজছেন।

কেহ বলিল—তিনদিন আগেই হ'ত। তিনদিন আগেই শেষ রাত্রে ক্ষণ এসেছিল, ঘরের সীমানার মধ্যে অরুণা দিদিমণি পায়ের শব্দ শুনেছিল। ঠাকুর তাকে বলেছিলেন —জন্তু জানোয়ার। কিন্তু আসলে তিনি। ঠাকুর মশায় তাঁকে বলেছিলেন—সবুর কর বাপু। তিনদিন পরে এস। অজয় আসুক। তার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা শেষ হোক, তারপর এস।

কথাটার মূলে রামভল্লা। সেই নিজের বুদ্ধি ও বিশ্বাসমত একথা প্রচার করিয়াছে। প্রথম দিন রাত্রে অরুণা তাহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া ডাক্তার ডাকিতে বলিয়াছিল; রাম তাহার কথা যাচাই করিতে সোজাসুজি ন্যায়রত্নকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দেবতা, মা বলছে বদ্যি ডাকতে। বলছে—আপনি নাকি বলেছ যে এইবারে নাকি দেহ রাখবেন!

ন্যায়রত্ন হাসিয়াছিলেন।

এত বড় কথাটার উৎপত্তি এই কয়েকটি কথাকে আশ্রয় করিয়া। ন্যায়রত্ন নূতন কালকে স্মরণ করিয়া বৈদ্য ডাকিতে বাধা দেন নাই। সকালেই প্রাচীন কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন আসিয়াছিলেন। অজয়ও আসিয়া পৌছিয়াছিল।

দ্বারিক সেন নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—এতদিন কাশীবাস ক'রে—। বাকীটা আর বলিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া সমাগত ব্যক্তিদের কাছে বলিয়াছিলেন—আর সময় নাই। এ অবস্থায় ট্রেণে কাশী নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বহুজনের মধ্যে কথাটা গুঞ্জিত হইয়া প্রায় কলরবে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং কথাটা অরুণা এবং অজয়ের কানে গিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। পরস্পরের মুখের দিকে তাহারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন চোখ বন্ধ করিয়া প্রশান্ত মুখে শুইয়াছিলেন। বাসনাকে তিনি বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন সমস্ত জীবন ধরিয়া, প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছেন—বাসনা তো আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি ভাই। তবুও যদি বাসনা তাঁহার এই পার্থিব দেহময় জীবনে অতি গোপনে—প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে কায়ার ছায়ার মত পায়ের তলার মাটিটুকু আশ্রয় করিয়া থাকার মত থাকিয়াই থাকে—তবে সে বাসনা ছিল—অজয়কে দেখিবার বাসনা, অজয় ও অরুণার মধ্যে সকল বিদ্বেষ-বিরোধ অবসান দেখিবার বাসনা। সে বাসনাও তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে সুতরাং তাঁহার মুখের প্রসন্নতা পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের মত সম্যকরূপে পূর্ণ।

হঠাৎ একসময় তিনি চোখ মেলিলেন—দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি? তোমরা বিষণ্ণ কেন?

অজয় কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—আপনার কি কষ্ট হচ্ছে ঠাকুর?

—কষ্ট? ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। কষ্ট তো নাই! বলিতে বলিতেই তাঁহার প্রসন্ন মুখ—ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল—বলিলেন—শাস্ত্রে জেনেছিলাম—যিনি জলে থাকেন —তিনিই আছেন অগ্নিতে। যাঁর ছায়া অমৃত—তাঁরই ছায়া মৃত্যু। মৃত্যু এবং অমৃতর মধ্যে তাঁরই স্পর্শ। আজ তা' অনুভব করছি, মনে নয়—বুদ্ধিতে নয়, দেহ দিয়ে সর্ব্ব চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করছি। মৃত্যুকে অমৃত বলেই মনে হচ্ছে ভাই; একটি প্রগাঢ় প্রশান্তি শান্ত সমুদ্রের মত ক্রমশ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ন্যায়রত্নের জীবন ঠিক নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের শিখার মত ক্রমশ স্তিমিত হইয়া একসময় নিভিয়া গেল। ইহারই মধ্যে—ধীরে ধীরে কখনও কথা বলিয়াছেন—কখনও স্তব্ধ হইয়া বিশ্রাম করিয়াছেন—বা নিজের এই অবস্থাকে আস্বাদন করিয়াছেন।

মানুষেরা অবাক হইয়া ওই আস্বাদন গ্রহণের দৃশ্য দেখিল। মৃত্যুকেই মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়।

এই কথার মধ্যে ন্যায়-রত্ন বলিয়াছিলেন—ঋণ আমার নাই অরুণা। কারও কাছে কোন ঋণ রেখেই আমি যাচ্ছি না। ঋণ রইল মাটির কাছে। শোধের জন্য দিয়ে যাব দেহ। সে যা দিয়ে আমাকে ভরণ ক'রেছে, পোষণ করেছে—তারই ফলে আমার এই দেহ—সে দেহ তার জন্য রইল। আর পরম আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি। ভাগবত মহাভারত অনুশীলন করেছি সত্যকে উপলব্ধির জন্য। যে সত্যকে মহাভারতের মধ্যে জেনেছিলাম—তাকে মিথ্যা বলে অলীক বলে জগদ্ব্যাপী কোলাহল উঠেছিল আমার জীবন কালে; এই দেশেও সে কোলাহলের প্রচণ্ডতার শেষ ছিল না। এখনও সে কোলাহল থামে নি—হয় তো বা প্রচণ্ডতরতা ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু তারও মধ্যে আমার উপলব্ধ সত্য ধ্রুবতারার মত অনির্ব্বাণ স্থির দীপ্তিতে জ্বলছে। আমার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য পলক ফেলে নি।

আমি দেখেছি জীবনলীলা এই পুণ্যভূমে চলেছে মৃত্যুর অনুসরণকারিণী সাবিত্রীর মত।

মহাভারত যখন প্রথম পড়েছিলাম, তখন মনে মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার ও তাঁর পরিণতি সামান্য মানুষের মত? ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি—তিনি এই পুণ্যভূমের গুরু স্বরূপ—মন্ত্রদাতা। ভারতভূমের জীবন লীলাকে পরম পরিণতিতে উপনীত করবার জন্য—বারবার আবির্ভূত হয়েছেন। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তাকে উপনীত করে দিয়েছেন। মহাভারতে—দ্বাপরে—কুরুক্ষেত্রে এদেশের মানুষকে হিংসা থেকে অহিংসায়—প্রেমে—উপনীত করে দিয়েছেন। নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন হিংসার পরিণাম। রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যিনি প্রকট হলেন বিশ্বরূপে, কুরুক্ষেত্রে যিনি তৃতীয় পাণ্ডবকে বিশ্বরূপ দেখালেন, বললেন, কালে কালে লোকক্ষয়ের জন্য আমি আবির্ভূত হই, সৃষ্টির মধ্যে অধর্ম্মের উচ্ছেদ করে—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হই, তাঁর পরিণাম দেখ। গান্ধারী সামান্যা মানবী, তার অভিসম্পাত তাঁকে মাথা পেতে নিতে হল। তিনি দেখলেন—ওই মাতৃহৃদয়ের মধ্যে হিংসার বিষক্রিয়া। জর্জ্জর বিকল মাতৃহৃদয়ের শোচনীয় হিংসাতুর রূপ। ফলে খণ্ডিত ভারতকে কুরুক্ষেত্র ও অশ্বমেধের উপলক্ষে—রক্তাক্ত করে, শক্তির বলে অখণ্ড করে গড়ে তুললেন, কিন্তু দ্বারকায় তাঁর বংশে বাধল গৃহযুদ্ধ, খণ্ড খণ্ড হয়ে যদু বংশ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে একদিনে শেষ হয়ে গেল। নিজে অস্ত্রহত হলেন না, দেহত্যাগ করলেন না, ব্যাধের শরাঘাতে আহত হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে দেহত্যাগ করলেন। যদুকুলের বধূরা কন্যারা আরণ্য জাতিদের দ্বারা অপহৃতা হল। ধন্য ব্যাসদেব! ধন্য স্রষ্টা। বিধাতার বিধাতা। বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি বিধাতার ভ্রান্তির জন্য—শাস্তি বিধানে। ওদিকে চেয়ে দেখ—মহাপ্রস্থানের পথে ভারতের সাধক-পুরুষ চলেছেন—তাঁর লক্ষ্যের পথে। পিছনে চাইলেন না। চললেন। উপনীতও হলেন। মহাভারতের শেষ এইখানে। কিন্তু তারপর চেয়ে দেখ—ভারতের জ্ঞান-পুরুষের পুনরাবির্ভাবের দিকে। তিনি এবার আবির্ভূত হলেন—মুণ্ডিত মস্তক অমিতাভ রূপে। এসে বললেন, হে ভারত, কুরুক্ষেত্রে তোমার হিংসার পথে চলার পর্ব্ব শেষ হয়েছে। আরম্ভ কর নূতন মন্ত্রে তোমার সাধনা। অহিংসা মন্ত্রে। ভাই আমাদের বাংলা দেশে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুসারী ভক্তদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন—রাধা-ঋণ পরিশোধের জন্য ব্রজধামের শ্যামকিশোর—গৌরাঙ্গ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস কি জান—কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী—প্রাণনাশক সাধনার পথ থেকে অগ্রসর করে দিতে মহাভারতের পার্থসারথী আবির্ভূত হয়েছেন—অমিতাভ রূপে। এই পথ। হিংসা থেকে অহিংসায়, বিদ্বেষ—অপ্রেম থেকে প্রেমে,আসক্তি থেকে নিরাসক্তিতে। সেই পথেই চলেছে ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ কতগুলি? মুষ্টিমেয়। তাদের মধ্যেই একটা অংশ আজও অহিংসায় অবিশ্বাস করে, শক্তিতে হিংসায় আজও তাদের বিশ্বাস শুষ্ক বুদ্ধির অহঙ্কারে মৃতপ্রায়

শিশংপা বৃক্ষের মত বেঁচে রয়েছে কিন্তু ভারতের বাকী অংশ সব বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসক। পারছে না তারা জীবনে তাদের মন্ত্রকে সফল করতে, তবু তারা বৈষ্ণব—এইটেই বড় পরিচয়—এইটেই সেই সত্যকে প্রমাণ করে। আজ জীবনের শেষ দিনে দেখলাম—সেই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে একটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছে—যেন আকাশের অক্ষয়-জ্যোতি নক্ষত্র মাটিতে নেমে এসেছে। এই এমন একটা বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষ গান্ধীজীর সাধনার মধ্যে তার সাধনাকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে দেখে গেলাম। এই তো দেখে যাচ্ছি—বুঝে যাচ্ছি—ভ্রান্তিকে অবলম্বন ক'রে জীবন কাটে নি। পৃথিবীতে এসে জেনে গেলাম সত্যকে—দেখে গেলাম সুন্দরকে, ধ্যান ক'রে গেলাম মঙ্গলের। যারা এ দেশের মানুষ হয়ে আদর্শকে ফলবতী করতে হিংসাকে প্রশ্রয় দেয়, কৌশলের নামে মিথ্যাচারকে আশ্রয় ক'রে—তাদেরও ভালবেসে গেলাম। মনে মনে তাদের ভ্রান্তি-নিরসনের কামনা ক'রে গেলাম। ঋণ আমার নাই।

* * * *

ন্যায়রত্নের কঠিন অসুখের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেই জংসন শহরে একটা অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দাঙ্গাটা থামিয়া গেল একঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে। চারিদিক হইতে লোক—হিন্দু-মুসলমান সব ভিড় করিয়া ছুটিয়া আসিল। ইরসাদও আসিল। দেবু আসিল, স্বর্ণ আসিল। কিন্তু তাহারা ভিতরে গেল না। যাইবার চেষ্টাও করিল না। কেমন যেন নিজেরাই দূরে সরিয়া থাকিল।

প্রায় দুইটা দিন। সে এক বিচিত্র উৎকণ্ঠা।

—কি হ'ল?

—হয়ে—? অর্থাৎ 'হয়ে গেল নাকি?' কিন্তু প্রশ্নটা উচ্চারণ করিতে সঙ্কোচ হইল।

—এখন কি রকম?

—কত দেরী?

এমনি হাজার প্রশ্ন—হাজার জনের। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সংবাদ উচ্চারিত হইবামাত্র—লোকে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

আনন্দে স্বস্তিতে তাহারা যেন বাঁচিল।

আনন্দ বোধকরি—এমন ভাবে মৃত্যুবরণের মধ্যে জীবনের জয় ঘোষিত হইল সেইজন্য। স্বস্তি নিশ্চিতরূপে, উৎকণ্ঠা হইতে পরিত্রাণের জন্য।

মিছিল করিয়া সকলে ময়ূরাক্ষীর ঘাটে তাঁহার সৎকার করিল। সেইখানেই শান্তি সমিতি গঠিত হইল। প্রতিজ্ঞা করিল—যেখানেই যাহা ঘটুক না কেন—এই অঞ্চলে—কখনই তাহারা পরস্পরের হিংসা করিবে না। স্নান করিয়া পবিত্র অন্তরে হাসিমুখে তাহারা বাড়ী ফিরিল। সকলের চেয়ে বেশী বিগলিত হইল রামভল্লা।

আশ্চর্য্যের কথা। ঠিক আঠারো দিন পর আবার—দাঙ্গা বাধিল। একদা নিশীথ রাত্রে প্রচণ্ড উন্মত্ত কোলাহলে জংসন সহর ভয়াল হইয়া উঠিল।

অজয় অরুণাকে বলিল—কাশী যাবে চল মা। টিকিট ক'রে এনেছি আমি।

অরুণা তাহার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল—না। এখান ছেড়ে এক পাও আমি যাব না বাবা। দাদু কাল রাত্রে দেখা দিয়েছিলেন। অন্ধকার ঘরে ঢুকে তিনি বললেন—প্রদীপ জ্বালো ভাই। প্রদীপ নিভিয়ো না। নিভাতে নাই।

শেষ

নববর্ষ—

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' এই ১৩৫৯ সালের আষাঢ় মাসে চত্বারিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজ 'ভারতবর্ষে'র নববর্ষে আমরা শ্রদ্ধানত চিত্তে স্মরণ করি সেই মহাকবিকে—প্রণাম জানাই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে। স্বর্গত রায় জলধর সেন বাহাদুরকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল অসাধারণ নিষ্ঠার সহিত 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনায় যে মহান আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। এই সুযোগে যে সকল বিদ্বজ্জনের অবদানে ও সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' এই দীর্ঘকাল তাহার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। স্মরণ করি ভারতবর্ষের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও তাহার সুধী পাঠকগোষ্ঠীকে—যাঁহাদের সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' বিগত ৩৯ বর্ষকাল তাহার যাত্রাপথে সাফল্যের গৌরব অর্জন করিয়াছে; কামনা করি তাঁহাদের অটুট প্রীতি ও সহযোগিতা। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও যেন আমরা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হই একান্ত মনে ঈশ্বরের কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষ—

পশ্চিমবাংলার বহু স্থানে চাউলের মণ ৫০ টাকার অধিক হওয়ায় সে সকল স্থানের লোকজনের পক্ষে চাউল ক্রয় করা অসম্ভব হইয়াছে—তাহার ফলে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা যাইতেছে। ২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিমদিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় অন্নকষ্ট খুব বেশী হইয়াছে। ২৪ পরগণার সুন্দরবন, ডায়মণ্ডহারবার, জয়নগর, মগরাহাট প্রভৃতি অঞ্চলে খাদ্যাভাব খুব বেশী। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বহু লোক কয়েকটি দ্বীপে বাস করে—তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা চরম হইয়াছে। পর পর গত কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি, লোনা জলের প্লাবন, ফসলে পোকা লাগা প্রভৃতির জন্য ঐ অঞ্চলে ধান খুব কমই উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে গম প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে, চাকী, বেলুন, ও চাটু বিতরণ করিয়া লোকজন যাহাতে বেশী রুটী খায়, সে জন্য উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। এই দারুণ গরমে ঐ অঞ্চলের ভাত-খাওয়ায়-অভ্যস্ত লোকজন আটা খাইতে চাহে না—যাহারা খাইতেছে, তাহারাও আটা হজম করিতে পারে না। ২৪ পরগণার ঐ অঞ্চলের প্রায় আড়াইলক্ষ লোক জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। নানা ভাবে কাজ দিয়া সরকার তাহাদের অর্থদানের চেষ্টাও আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র চাউলের অভাব—সম্প্রতি চীন দেশ হইতে ২৬ লক্ষ মণ চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে—সে চাউল জুলাই মাসে ভারতে আসিয়া পৌছিবে বলিয়া মনে হয়। ২৪ পরগণা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে শুধু খাদ্যাভাব নহে, দারুণ পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা তৎপরতার সহিত সম্পাদিত না হইলে বহু লোক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে।

বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক পদ—

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন করিয়াছিলেন। ফলে কলিকাতার বঙ্গীয় বণিক সভা (বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স) ইংরাজির অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভাও (বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স) বাঙ্গালা সাহিত্য বা অর্থনীতি বিষয়ে একটি অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন। ঐ সকল সাহায্যের উপর আয়কর লাগিবে না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাবে ক্রমে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক—সকলেই ইহা প্রার্থনা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—

সম্প্রতি কলিকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য উহার কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি—

শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। সহ-সভাপতি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবি-এন-কেশবম্‌, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক—শ্রীপ্রমীল-চন্দ্র বসু। সহযোগী-সম্পাদক—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রমোদর-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট গত ২ বৎসর গ্রন্থাগারসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন। এ সময়ে গ্রন্থাগার পরিষদ সে বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করিলে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবেন। বাংলার গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালকগণকে আমরা এ বিষয়ে গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করি।

নৃত্যশিল্পী শ্রীমণি বর্ধন—

সম্প্রতি জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের আমন্ত্রণে খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীমণি বর্ধন ও তাঁহার সম্প্রদায় কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির—সাংস্কৃতিক সম্মেলনে

নৃত্যশিল্পী শ্রীমণি বর্ধন

বাঙলার—"লোকনৃত্য" এবং "চণ্ডাশোকের রূপান্তর" নামে এক নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। জারী নৃত্য, বাইচ খেলা, বেহুলা ভাসান, গাজীর পট, সুখসারী, গাজন, চাঁদ পেটান প্রভৃতি লোকনৃত্যের মাধ্যমে শ্রীযুক্ত বর্ধন এক বিশেষ রস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "চণ্ডাশোকের রূপান্তর" নৃত্যনাট্যে তিনি ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য শান্তি ও অহিংসার আদর্শ প্রদর্শন করেন। কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবেও শ্রীযুক্ত বর্ধন সদলবলে "মহালগ্ন" নামে একটি নৃত্যনাট্য দেখান। "মহালগ্ন" নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্র-সংগীতকে আশ্রয় করিয়া কবিগুরুর জীবনী প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা শ্রীযুক্ত বর্ধনের আরও উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

গত ২৩শে মার্চ্চ রবিবার কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ব্যবহারাজীব শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্তের গৃহে রবিবাসরের এক সভায় সুপ্রসিদ্ধ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কথা-শিল্পী শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৭০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং অসুস্থ শরীর লইয়াও সর্বাধ্যক্ষ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভায় যোগদান করেন। রবিবাসরের সদস্যগণ ব্যতীতও বহু খ্যাতনামা সুধী ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং

উৎসবে উপেন্দ্রবাবুকে এক চমৎকার মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রখানি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নিজে স্বর্ণাক্ষরে কারুকার্য্য সমন্বয়ে রচনা করিয়াছিলেন। আমরা এই উপলক্ষে উপেন্দ্রবাবুর সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

কৃষ্ণনগর বাণী পরিষদের সম্মেলন

বিপ্লবী-সম্বর্দ্ধনা—

গত ২০শে এপ্রিল রবিবার বরাহনগর (২৪ পরগণা) মিউনিসিপালিটীর প্রাঙ্গণে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বরাহনগরবাসীদিগের উদ্যোগে এক বিশেষভাবে নির্ম্মিত মণ্ডপে বাঙ্গালার বিপ্লবী নেতাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রবর্ত্তক সংঘের শ্রীমতিলাল রায় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী, শ্রীউল্লাসকর গুপ্ত, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ৪০ জন খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলকে সভায় মাল্যভূষিত করা হয় এবং অভিনন্দন পত্র দান করা হয়। স্বাধীন ভারতে এই ধরণের অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। আমরা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে ধন্যবাদ জানাই।

বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা—

ভারত সরকার ও ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের মধ্যে একটি চুক্তির ফলে ফোর্ড ফাউণ্ডেসন ৫টি সম্প্রসারিত শিক্ষাকেন্দ্র, ১৫টি উন্নয়ন কেন্দ্র ও ২৫টি অতিরিক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে অর্থ সাহায্য করিবে। বোম্বায়ের আনন্দে, মহীশূরের মতিয়ায়, উত্তর প্রদেশের বকশী কা কালায়, হায়দ্রাবাদের কুকাত পল্লীতে ও পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমানে—৫টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে। আসাম ও পেপসুতে অতিরিক্ত দুইটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে—উভয় কেন্দ্রে প্রায় ৩৫০জন কর্ম্মীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। একশত করিয়া গ্রাম লইয়া এক একটি কেন্দ্রে উন্নয়ন কার্য্য করা হইবে। শিক্ষিত কর্ম্মীরা তথায় উন্নয়ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে।

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন—

উড়িষ্যার সূর্য্য মন্দির কোনারকের চতুস্পার্শে ৮লক্ষ বর্গ ফিট ব্যাপী এক বালুস্তরে একটি মৃত নগরী আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ জানিতে পারিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে ঐখানে খনন কার্য্য দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়াছে। ৬লক্ষ টাকা ব্যয়ে সূর্য্য মন্দিরের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কোনারক ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার এক বিরাট নিদর্শন। সম্প্রতি জাতীয় সরকার তাহা সংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পরলোকে প্রমোদকুমার সেন—

অমৃতবাজার পত্রিকার এলাহাবাদ অফিসের বার্তা সম্পাদক প্রমোদকুমার সেন গত ২৪শে এপ্রিল ৫৩ বৎসর বয়সে এলাহাবাদে পরলোক গমন করিয়াছেন। এক মাস পূর্বে তাঁহার পিতা যোগেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রমোদবাবু গত ৩০ বৎসর কাল সাংবাদিকের কাজ করিয়াছেন···তিনি সার্ভাণ্ট, ফরোয়ার্ড প্রভৃতিতে কাজ করার পর অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা—জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রণব কুমার সেন আই-পি-এস বীরভূমের সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সাংবাদিকগণের মধ্যে প্রমোদবাবুর মত জনপ্রিয় ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর সংখ্যা অধিক নহে।

বর্দ্ধমানে গ্রাম-নগরী—

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম-নগরী পরিকল্পনার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় দুইটি নগরী পত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে। দামোদরে

বন্যাবিধ্বস্ত শক্তিগড় অঞ্চলের বালুস্তূপ পরিষ্কার করিয়া একটি ও লুপ লাইনের গুষ্করা অঞ্চলে একটি গ্রাম-নগরী হইবে। শক্তিগড়ে বহু পতিত জমী উদ্ধার হইবে ও গুষ্করায় ভুলুর বিলের পতিত জমীর উন্নতি হইবে। ঐ স্থান দুইটির উন্নতি সাধিত হইলে বর্দ্ধমানে পূর্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে।

মিস্ কলিকাতা—

কলিকাতা প্রিন্সেস হোটেলে গত ২৬শে মার্চ এক সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় বেগম ইন্দ্রাণী রহমন সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া 'মিস কলিকাতা' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রাণীর পিতা মহারাষ্ট্রীয় ও মাতা আমেরিকান। ইন্দ্রাণীর মাতা রাগিণী দেবী নামে খ্যাতনামা নর্তকী ছিলেন। ইন্দ্রাণীর বয়স ২১ বৎসর—তাঁহার স্বামী জনাব এচ-রহমন পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের এঞ্জিনিয়ার, ইন্দ্রাণীর ৫ বৎসরের একটি কন্যা আছে। সম্প্রতি তিনি ভারতীয় প্রতিযোগিতায়ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া 'মিস ইণ্ডিয়া' আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক শিশু-শিল্প প্রদর্শনী—

দিল্লীর প্রখ্যাত কার্টুন পত্রিকা শঙ্করস্ উইকলীর উদ্যোগে কয়েক মাস পূর্বে আন্তর্জাতিক শিশু ও বালকদের অঙ্কিত এক চিত্র-শিল্প প্রদর্শনী হয়। উ... পৃথিবীর পনেরটি রাষ্ট্র হইতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ... আসে এবং ঐ সকল চিত্রের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের পুরস্কৃত করা হয়।

কলিকাতার আর্টিষ্ট্রি হাউসে শঙ্করস্ উইকলীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশু-চিত্র প্রদর্শনী—প্রদর্শনীতে পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি

কুমারী কবিতা চক্রবর্তী

উদ্যোক্তারা স্থির করিয়াছেন যে ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এই প্রদর্শনী দেখানো হইবে এবং যেখানের যে শিল্পী শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়াছে তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। বহির্ভারতের রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন—যে যে শিল্পী পুরস্কার পাইয়াছেন সেই সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-দূতের হাতে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে। ভারতবর্ষের কয়েকটি শহরে ইতিমধ্যেই উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি কলিকাতায়ও হইয়া গিয়াছে। বাংলার খ্যাতনামা কার্টুনশিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তীর ৬ বৎসরের কন্যা কুমারী কবিতা ঐ প্রতিযোগিতায় ৫।৬ বৎসরের গ্রুপে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এই শিশু-শিল্পীর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মাল্য ভূষিত করেন

শঙ্করস্ উইকলীর এই উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয় এবং এইরূপ প্রদর্শনী ভারতে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল।

নদীয়া জেলা সাংবাদিক সম্মিলন—

সম্প্রতি নদীয়া জেলার পলাসী গ্রামে নদীয়া জেলা সাংবাদিক সমিতির বার্ষিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও যুগান্তরের অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সম্মিলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ প্রমুখ সাংবাদিকগণ জেলায় এইভাবে সম্মিলনের অধিবেশন করায় সাংবাদিকগণের কাজ ও সম্মান বৃদ্ধির সাহায্য হইবে।

নদীয়া জেলা সংবাদপত্র সেবী সম্মেলন ফটো—সনৎ চৌধুরী

কবি অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়—

কবি অমিয়রতন সম্বর্দ্ধনা

গত ১লা বৈশাখ কলিকাতার দক্ষিণে বড়িষা গ্রামে স্থানীয় সাধনা মন্দিরের উদ্যোগে কবি শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়কে এক উৎসবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীবিভাষচন্দ্র রায় চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন ও খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র মতিলাল 'অভিনন্দন' পত্র পাঠ করেন। সভায় অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, সভাপতি ও প্রধান অতিথিপ্রমুখ অনেকে কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে কবি অমিয়রঞ্জন সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘ—

গত ১৬ই মার্চ নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের সদস্যগণ কলিকাতার নিকট দমদমে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীফণিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের বাগানবাটীতে এক উদ্যান সম্মিলনে সংঘের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সম্মিলনে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি যোগদান করিয়াছিলেন।

সাময়িক পত্র সংঘের সমাগত সদস্যবৃন্দ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫২ সালের বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ফাইনালে মোহনবাগান ২-১ গোলে গত বছরের কাপ বিজয়ী বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌টকে পরাজিত করায় মোহনবাগান একই বছরে হকি লীগ এবং বাইটন কাপ জয়লাভের সম্মান লাভ করেছে। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় দলই এ সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। প্রথম বিভাগের হকি লীগ এবং বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে যথাক্রমে ১৯০৫ ও ১৮৯৫ সালে। এ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ বছরের প্রতিযোগিতায় মাত্র পাঁচটি ক্লাব—শিবপুর বি ই কলেজ, কাস্টমস, রেঞ্জার্স, পোর্টকমিশনার্স এবং মোহনবাগান একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ এবং বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছে। সর্ব্বপ্রথম এ সম্মান লাভ করে শিবপুর বি ই কলেজ ১৯০৫ সালে। কাষ্টমস ক্লাব ৮ বার 'একই বছরে লীগ ও কাপ' পেয়ে যে রেকর্ড করেছে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এ ছাড়া কাস্টমসের উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৩০-৩২) একই বছরে লীগ এবং কাপ জয়লাভের রেকর্ড আজও কোন দল ভাঙ্গতে পারে নি।

একই বছরে লীগ এবং কাপ বিজয়ী দল

১৯০৫—শিবপুর বি ই কলেজ	১৯৩০—কাস্টমস
১৯০৯—কাস্টমস	১৯৩১—কাস্টমস
১৯১০—কাস্টমস	১৯৩২—কাস্টমস
১৯১২—কাস্টমস	১৯৩৩—রেঞ্জার্স
১৯১৫—রেঞ্জার্স	১৯৩৮—কাস্টমস
১৯১৭—রেঞ্জার্স	১৯৪৬—পোর্টকমিশনার্স
১৯২৬—কাস্টমস	১৯৪৮—পোর্টকমিশনার্স
	১৯৫২—মোহনবাগান

অধিকবার বাইটন কাপ জয়লাভের রেকর্ড ও কাস্টমসের কাস্টমস ১১ বার কাপ বিজয়ী হয়েছে (১৯০৮, ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৫-২৬, ১৯৩০-৩২, ১৯৩৫ ও ১৯৩৮) তারপরই রেঞ্জার্স, ৯ বার। উপর্যুপরি বাইটন কাপ জয়

সি এস গুরুং (মোহনবাগান)
১৯৫২ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগে সর্ব্বোচ্চ গোলদাতা
ফটো: বিমল ঘোষ

লাভের রেকর্ড—কাস্টমস (১৯০৮-১০ এবং ১৯৩০-৩২) এবং বি এন আর (১৯৪৩-৪৫)।

বাংলা দেশের হকি খেলার ইতিহাসে কাস্টমস দলের

শৈলেন মান্না
অধিনায়ক—ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দল ফটো—ডি নীলু

এই বিরাট সাফল্য নিকট ভবিষ্যতে অপর কোন দলের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ হয়। আলোচ্য বছরের হকি মরসুমে মোহনবাগান ক্লাব শেষ পর্যন্ত অপরাজেয় থেকে যায়। গত বছর বাইটন কাপের সেমি-ফাইনাল খেলার শেষ সময়ে গোল রক্ষকের মারাত্মক ভুলে মোহনবাগান দল অপ্রত্যাশিতভাবে হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌টের কাছে ০-১ গোলে হেরে যায়। আলোচ্য বছরের ফাইনালে তারা হিন্দুস্থান দলকে হারিয়ে পূর্ব্ব বছরের পরাজয়ের শোধ নিয়েছে। সট কর্ণার থেকে খেলার প্রথম দিকেই হিন্দুস্থান এক গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। এই গোল হওয়ার পরই আকস্মিক দুর্ঘটনায় হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌ট দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ন এবং দলের পক্ষে দুর্ভাগ্য যে, তাদের শেষ পর্য্যন্ত দশজনে খেলতে হয়। কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়ান অপরাজেয় মোহনবাগান দলের সঙ্গে তারা পাল্লা দিয়ে খেলতে না পারলেও তাদের খেলায় দৃঢ়তার অভাব ছিল না, তাদের পরাজয় সে দিক থেকে কোন মতেই অগৌরবের হয়নি। উপর্যুপরি তিন বছরের আগা খাঁ হকি কাপ বিজয়ী বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস দলের সঙ্গে মোহনবাগান দলকে সেমি-ফাইনালে তিন দিন খেলে জয়লাভ করতে হয়েছিল। প্রথম দিনে ২-২ গোলে খেলা ড্র যায়। মোহনবাগান প্রথমেই দু'গোল খেয়ে যায়, শেষে গোল শোধ দিয়ে খেলা ড্র করে। দ্বিতীয় দিন অতিরিক্ত সময় খেলেও কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি। তৃতীয় দিনে মোহনবাগান ১-০ গোলে জয়লাভ করে। মোহনবাগান ফাইনালে ওঠে—ডালহৌসীকে ২-০ গোলে, বিহার মিলিটারী পুলিশকে ৫-১ গোলে, টাটা স্পোর্টসকে (বোম্বাই) ২-২, ০-০, ১-০, গোলে, ক্যালকাটা পুলিশকে ১-০ ও ২-০ গোলে হারিয়ে।

হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌ট ফাইনালে ওঠে—আর্মড পুলিশকে ৬-০ গোলে, কাষ্টমসকে ১-০ গোলে, এবং পাঞ্জাব স্পোর্টসকে ২-১ গোলে হারিয়ে।

টমাস কাপ ঃ

১৯৪৮-৪৯ সালের বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় টমাস কাপ বিজয়ী মালয় দেশ আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ৭-২ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার টমাস কাপ জয়ী হয়েছে। লন্‌ টেনিসে যেমন ডেভিস কাপের আন্তর্জাতিক খ্যাতি তেমনি বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় টমাস কাপের। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ-বৎসরে মালয় দেশ প্রথম টমাস কাপ পাওয়ার গৌরব লাভ করে। ওয়াং পেং সুন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অল্‌-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় গত তিন বছর উপর্যুপরি পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী হয়েছেন এবং মালয়ের খেলোয়াড়রাই ডবলসে জয়ী হয়েছেন পর পর দু'বার। সুতরাং ব্যাডমিণ্টন খেলায় মালয় দেশকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলা যায়। প্রথম বারের থেকে আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডেই ক্যানাডা ৭-২ খেলায় ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। এবার ভারতবর্ষ প্যাসিফিক্‌ জোনের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়াকে ৯-০ খেলায়,

ইউরোপীয় জোন বিজয়ী ডেনমার্ককে ৫-৩ খেলায় হারিয়ে আমেরিকা জোন বিজয়ী আমেরিকার কাছে অল্পের জন্যে হেরে যায়।

মালয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা টমাস কাপের ইণ্টার জোন খেলায় ভারতবর্ষ ৫-১ খেলাতে ডেনমার্ককে পরাজিত ক'রে আমেরিকান জোন বিজয়ী আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়।

আমেরিকা ৫-৪ খেলাতে ভারতবর্ষকে হারিয়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে বিজয়ীদেশ মালয়ের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলায় প্রথম দিনে আমেরিকা ৩-১ খেলাতে অগ্রগামী থাকে। প্রথম দিনের প্রথম খেলায় দেবীন্দর মোহন (ভারতবর্ষ) ১২-১৫, ১৭-১৬, ১৫-১, পয়েণ্টে ডিক্ মিচেলকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। মার্টিন মেণ্ডিজ (আমেরিকা) ১৫-১১, ১৫-১, পয়েণ্টে টি এন শেঠকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করে খেলা ১-১ করেন।

ওয়ান রোগার্স এবং জো আলষ্টোন ১৫-১২, ১৫-৮ পয়েণ্টে মোহন এবং ফেরীরাকে হারিয়ে দিলে আমেরিকা ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়।

কার্ল লাভডে এবং বব উইলিয়ামস ১৫-১১, ১৫-৯ পয়েণ্টে শেঠ এবং মনোজ গুহকে হারিয়ে দিলে আমেরিকা প্রথম দিনে ৩-১ খেলাতে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম খেলায় মার্টিন মেণ্ডেজ ৫-১৫, ১৫-৮, ১৫-৩ পয়েণ্টে দেবীন্দর মোহনকে হারিয়ে দিলে আমেরিকা ৪-১ খেলায় এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় খেলাতে শেঠ ১৫-৮, ৫-১৫, ১৫-১ পয়েণ্টে মিচেলকে হারিয়ে দিলে আমেরিকার পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ৪-২।

তৃতীয় খেলাতে দেওয়ান ১২-১৫,১৭-১৫,১৫-১ পয়েণ্টে আলষ্টনকে হারালে খেলা দাঁড়ায় ৪-৩। চতুর্থ খেলাতে মোহন এবং ফেরীরা ১৫-১০, ৩-১৫, ১৮-১৭ পয়েণ্টে লাভডে এবং উইলিয়মসকে হারিয়ে খেলার ফলাফল সমান ৪-৪ করেন। ফাইনাল খেলায় রোগার্স এবং আলষ্টোন ৬-১৫, ১৫-১০, ১৫-৭ পয়েণ্টে মনোজ গুহ এবং শেঠকে হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকাকে ৫-৪ খেলায় জিতিয়ে দেন।
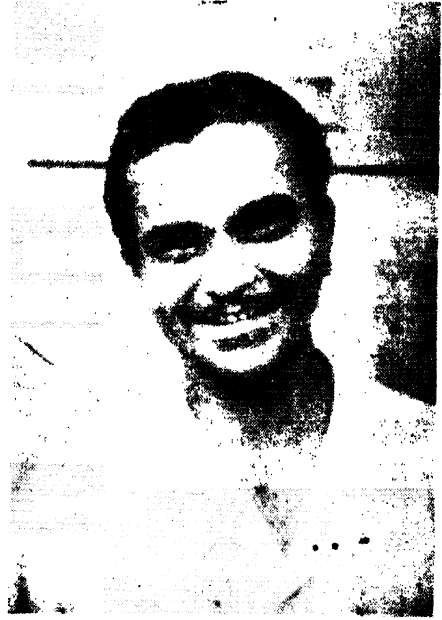
কে ডি সিং (বাবু)
অধিনায়ক—ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল ফটো: বিমল ঘোষ

এফ এ কাপ ঃ

ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ ফাইনালে নিউ ক্যাশ্‌ল ইউনাইটেড ১-০ গোলে আর্সেনল দলকে হারিয়েছে। খেলা শেষের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে গোলটি হয়। আর্সেনল দলকে প্রথম থেকেই দশজনে খেলতে হয়েছিল। টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৩৯,৩০০ পাউণ্ড।

ইংলণ্ড-সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেটদল

৩রা জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটদল ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান সফর ক'রে ৯টি ম্যাচ খেলেছে। একমাত্র জয়লাভ করেছে অক্সফোর্ডের কাছে, ৯ উইকেটে। খেলা ড্র গেছে ৭টি, তার মধ্যে ৩টি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। হার হয়েছে সারে দলের কাছে ১৪১ রানে।

ভারতীয়দলের পক্ষে সেঞ্চুরী ৩টি: কেম্ব্রিজের বিপক্ষে রামচাঁদ ১৩৪, অক্সফোর্ডের বিপক্ষে উমরীগড় ২২৯ নট আউট এবং বিজয় হাজারে ১৬১ নট আউট।

ভারতীয়দলের বিপক্ষে সেঞ্চুরী ৪টি: ১০১—সিম্পসন

(এম সি সি), ১৫৮—গ্রেভ্নী (এম সি সি) ১১৬—ইন্সোল (এসেক্স), ১০৩ নট আউট—লরেন্স (সামারসেট)।

ফুটবল লীগ ঃ

ক'লকাতায় ফুটবল লীগের খেলা অত্যন্ত নীচু পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। এমন কি নাম-করা দলের প্রখ্যাতনামা খেলোয়াড়রা গড়পড়তায় খারাপ খেলছেন। দলের খেলোয়াড়দের ফাঁকা অবস্থায় পেয়েও তাদের বল পাশ না ক'রে খেলোয়াড়দের অহেতুক বল ড্রিবল ক'রে বিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়দের পরাভূত করাই ফুটবল খেলার অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরণের খেলায় এক শ্রেণীর দর্শকদের সমর্থনও আছে। ফুটবল খেলায় ড্রিবলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু খেলার সময় সকলেই ভুলে যায়, অহেতুক বল ড্রিবল করলে বিপক্ষ দল আত্মরক্ষায় সময় পায় এবং নিজ দলের খেলোয়াড়রা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। দলগত স্বার্থের কথা বাদ দিয়ে সস্তাদরের হাততালিতে খেলোয়াড়রা আজ এমনই স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। গোলের একেবারে মুখে বল পেয়েও সট করতে দেরী করা, ঠিকমত সট না করার অক্ষমতা অথবা নিজের দিক থেকে গোল করার অসুবিধা দেখেও দলের খেলোয়াড়কে বল পাশ না করা—এ সমস্ত ঘটনা যেন ফুটবল খেলায় স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ফুটবল খেলা আনন্দদায়ক না হয়ে সত্যিকারের দর্শকসমাজের কাছে আজ পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের জয় হ'লেই যাঁরা খুসী তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

গত শনিবার ৭ই জুনের খেলা ধরে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় শীর্ষস্থানীয় দুটি দলের খেলার ফলাফল নিম্নরূপ দাঁড়িয়েছে।

	খেঃ	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	৮	৬	২	০	১২	•	১৪
মোহনবাগান	১০	৫	৪	১	১৬	৫	১৪

ইস্টবেঙ্গল দল ২টো ম্যাচ কম খেলেও মোহনবাগান দলের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট করেছে। এ পর্য্যন্ত কোন খেলায় হারেনি এবং কোন গোল খায়নি। ৭।৬।৫২

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত উপন্যাস "মনের অগোচরে"—২৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাগিণী"—৪৲
শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা "কবিগুরু"—৩৸৹
শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "হালখাতা"—১৷৹
শ্রীশিশিরকুমার দত্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "পারের খেয়া"—৷৵৹
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "ছেলেদের বিবেকানন্দ" (৫ম সং)—১৷৹
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহন-তপন"—২৲, "মোহন বনাম স্বপন"—২৲, "জাদুকর মোহন"—২৲
শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" (১ম খণ্ড)—৮৲
শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু প্রণীত "আরব্য উপন্যাস"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস 'টাইগার-ম্যান"—১৷৹
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত শিশু-উপন্যাস "লক্ষ টাকার হীরা"—১৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত উপন্যাস "অলিভার টুইষ্ট"—১৷৹
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "দেহ ও দেহাতীত" (২য় সং)—৪৲
অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-পদ্য "আলোর কুঁড়ি"—৩৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিষকন্যা" (৩য় সং)—২৷৹
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালা নাটক"—৫৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "স্বামী" (২৫শ সং)—১৷৹, "পরিণীতা" (৩৫শ সং)—১৷৹, "শুভদা" (৬ষ্ঠ সং)—২৷৹, "শ্রীকান্ত" (১ম—১৭শ সং)—৩৲, "নিষ্কৃতি" (১৭শ সং)—১৷৹, "দেনা-পাওনা" (১০ম সং)—৪৲, "পল্লী-সমাজ" (২৬শ সং)—২৷৹
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "প্রিয় বান্ধবী" (১২শ সং)—৩৲
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কর্ণার্জ্জুন" (২২শ সং)—২৷৹
দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "অনুপমার প্রেম" (২য় সং)—১৷৹
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মানুষ না জানোয়ার"—১৲
শ্রীসুনীল জানা প্রণীত উপন্যাস "মহানগরী"—৩৲
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "শব্দব্রহ্ম ও ব্রহ্মানুভূতি"—২৷৹
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "রবীন্দ্রনাথের গান"—১৷৹
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ষ্টেট্ প্রকাশিত "প্রজাশাসিত রাষ্ট্র"—৷৹
রজনীকান্ত সেন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "কল্যাণী" (২৬শ সং)—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-কৃষ্টির ধারা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষে মানুষে ঝগড়া কোন দেশের বা কোন সভ্যতার (পূর্ব্বী বা পশ্চিমী নামধারী) মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়। প্রত্যেক দেশেই বিষদুষ্ট মানুষ আছে এবং সৎ ও উদার মানুষও আছে। তবে এও সত্য যে কোন সময় সমাজের শীর্ষে বা রাষ্ট্রশাসনে ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক মানুষের একাত্মবোধকে চূর্ণ করিয়া দেয়। জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীরা একমত যে—এই জগতে কোনও নির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক সীমা নাই—যাহার কুক্ষীগত লোকসমাজের অন্তরেই কেবলমাত্র বিশেষ গুণ বা দোষ বিকাশ লাভ করে—অনুশীলনের দ্বারা অবস্থা ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভব। কোন ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, আবার কোন ব্যাপারে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। যুগে যুগে চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে—কি উপায় অবলম্বনে জগতের সমগ্র লোক এক পর্য্যায়ে আসিতে পারে। এককালে কোন কোন দেশে ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্থির হইয়াছিল। চীন ও ভারত কিন্তু শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাইয়াছিল। চীন-ভারতের লোক বিদ্যা-বুদ্ধি ও শৌর্য্যে-বীর্য্যে অগ্রগামী হইয়া কি কারণে ইউরোপীয় জাতিদের নিকট আজ নির্ভরশীল তাহা ভাবিবার বিষয়। বোধ হয় একা লোকের পক্ষে বৃহৎ জনসমাজকে অনুপ্রাণিত বা কোন আদর্শে শিক্ষিত করা অসম্ভব। মহাপুরুষগণ মৃত্যুর পর যে সম্মান লাভ করেন তাহা তাহাদের জীবদ্দশায় প্রকাশ পাইলে তাঁহাদের আদর্শের সাফল্য আরও ব্যাপক হইত। রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে সেই সুফল প্রসারলাভ করিত।

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর দেশে দেশে এই চেতনা জাগিয়াছিল যে সমগ্র জগতকে একসূত্রে না বাঁধিতে পারিলে জগতের বীণার তার আবার ছিঁড়িয়া যাইবে। এক একটি দেশ যেন এক একটি তার। লিগ অফ

নেশনস্ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর সব আশার স্তূপ বাঁধিয়াছিল। সঙ্গে ছোট ছোট কমিটি ছিল—জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পণ্ডিতের মিলন সাধন করিতেছিল International Committee for Intellectual Co-operation। শিল্প ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে ছিল International Labour office এবং জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিধি-নিষেধের খসড়া তৈয়ার করিতেও অনেক ছোট ছোট সভার অধিবেশন হইত। এই সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচয়ে বিশিষ্ট লোকেরা নিজের বিচার বুদ্ধিতে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতেন, বিভিন্ন দেশের শাসনরত ব্যক্তিরা ইহাদের খোঁজ খবর রাখিবার অবকাশ পাইতেন না। দেশের গুণী ব্যক্তিদের মনোনয়ন করিতেন তাঁহারা, কিন্তু উহাদের জ্ঞান ও তৎসহ আর পাঁচজন জ্ঞানী গুণীর মত তাহাদের শাসন ব্যবস্থা আয়ত্তে আনিবার কোন প্রেরণা ছিল না। এই সব বিষয়ে মনোযোগের অভাবে দেশে দেশে ২০ বছরের মধ্যেই যুদ্ধের বিষ ছড়াইয়া দিয়াছিল।

গত ১৯৩৯-৪৫এর যুদ্ধের ফলে দেশে দেশে ভাঙ্গন ও সামাজিক বিপর্যয় অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল। লড়াইয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না এবং স্কুল-মিউজিয়াম, ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার কিছুই বাদ যায় নাই। বোমাতে এই সব ধ্বংস হইয়াছে, আর না হয় শত্রু-মিত্রের সৈন্যদলের যত্রতত্র অবস্থান ও অদ্ভুত জীবনযাত্রার ফলে শান্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা তচনচ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালে এবারে তাই পুনর্গঠনের সমস্যা সমগ্র জগতকে আলোড়িত করিয়াছে। সুস্থ-দেহ ও স্বচ্ছন্দ-খাদ্য যেমন দরকার, তেমনি মানুষের মনের ও মাথার পরিচর্য্যার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। আমাদের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে আমাদের শান্তি—যদি উগ্রচণ্ডী রাষ্ট্র-কর্ণধারদের আস্ফালন আমাদের হৃদয়ে কোন আলোড়ন না জাগায় তবে বোমারুবিমান ও কামান চালাইবার লোক কোথা হইতে আসিবে? অবশ্য শরীরের পরিচর্য্যায়—স্বাস্থ্যে ও খাদ্যে—মানুষে মানুষে ভেদ অতি সামান্য। কিন্তু বিদ্যার প্রসার, জ্ঞানের বিকীরণ, বিজ্ঞানের প্রয়োগ—এই সব ব্যাপারে দেশ-দেশান্তরে অত্যন্ত অসাম্য। কেবল সমভাব-করণ-ই কর্ত্তব্যের শেষ নয়। প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতির একটা রূপ আছে। সেই রূপকে ধুইয়া মুছিয়া নবকলেবর ধারণ করান বাঞ্ছিত হইলেও অতি কষ্টসাধ্য কাজ—যাহার ফল কিন্তু বাঞ্ছানুযায়ী হয় না। আবার এ ধারণাও ভ্রমাত্মক যে পুরাতন রীতিনীতি আঁকড়াইয়া থাকা বা পুরাতন অনাড়ম্বর জীবনের উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ধাবন করা সুস্থায়ী সভ্যতার লক্ষণ। ক্ষুদ্র গ্রামের গণ্ডী হইতে ছড়াইয়া পড়িয়া আজ সবাই বিরাট জগতের খবর পাইতেছি, ভিন্নরুচি ও প্রকৃতির লোক দেখিতেছি এবং শস্য-বস্ত্র ও অন্য সামগ্রী দিতেছি ও আনিতেছি। এই আদান-প্রদানের মুখে দেওয়াল তুলিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহার জন্য মূল্য দিতে হইবে বর্ত্তমান জীবনের অভ্যস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিসর্জ্জন। পূর্ণ স্বাবলম্বন-ধর্ম্মে স্বাধিকারে বাধা আসিবে না। তবে যোগাযোগে যে জীবনের স্ফুরণ তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। যদি জীবনের সম্ভার-উপচার চাই—তাহা হইলে পশ্চাৎ-দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে কতটা অন্যের সহিত মিলিতে পারি তাহাই ভাবিতে হইবে। মিলন অর্থে অযথা অনুকরণ নহে। সংস্কৃতির এই মেলায় (যাহাকে সভ্যতা নাম দিতে পারি) যেমন মিলনের পথ সুগম, তেমনি সংঘর্ষের বীজও উপ্ত আছে। আমাদের ইতিহাসে আমরা অনেক কিছু বাহিরের জিনিষকে নিজেদের মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছি, বোধ হয় ইহা কিছুটা নির্ব্বিরোধ ও নির্ব্বিচার মনের নিদর্শন। বাহিরের ঢেউয়ে মাথা সর্ব্বদা নীচু করিয়া জলস্রোতকে সমুদ্র-স্নানের রীতিতে সর্ব্বদেহে বহাইয়া দিয়াছি। কিন্তু মাথা মাঝে মাঝে উঁচু করিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া নূতন এক ঢেউয়ের ঘায়ের জন্য প্রস্তুত হই নাই। বরাবরই মাথাটা জলের নীচে রাখিয়াছি। বর্ত্তমানে ডাঙ্গায় উঠিয়া হাঁসের মত জল ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই।

যুদ্ধের তাণ্ডব লীলার পরে বিদ্বজ্জনের অনেকের প্রথম চিন্তা হইয়াছিল—কি করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির বদ্ধ এবং মুহ্যমান বহুমুখী স্রোতকে চলময়ী করা যায়। গোড়াতে ইউরোপের দেশগুলির সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছিল এবং আলাপ-আলোচনা যুদ্ধ-বিরতির ২।৩ বছর আগে হইতে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রকর্ণধারদের মধ্যে সুরু হইয়াছিল। পরে চেতনা বৃদ্ধি পাইল—যে সমস্যা কোন এক দেশের নয় ইহা সমগ্র জগতের সমস্যা। ইউরোপে আশু প্রয়োজন—

বিদ্যায়তন ও বিজ্ঞানশালার পুনর্নির্মাণ ও উদ্ধার। কিন্তু যেহেতু মানুষের মনেই বিষের দানা বাঁধে সেইখানেই বিষের প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে। জ্ঞানের প্রসারের দ্বারা জ্ঞানলভ্য বোধের বিকাশ ও প্রসার করিতে হইবে এবং এই বোধের উপরে একটা সামগ্রিক বিশ্বচেতনা গড়িয়া উঠিবে। সাধারণ লোকের দৃষ্টি সজাগ হইলে মুষ্টিমেয় লোকের বিচার-বুদ্ধির উপর তাহারা নিজেদের জীবন বলিদান দিয়া রাখিবে না। এই আদর্শ-নিষ্ঠা চরাচরে ব্যাপ্ত হওয়া চাই। ইহা প্রতিটি মানুষের মতির উপর নির্ভরশীল।

প্রতি দেশের এক রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে এবং সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সহযোগিতা ব্যতিরেকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন সুদূর-প্রসারী হয় না, আবার রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মন্থর গতিতে (একমাত্র রণদামামার আক্রোশ এই শম্বুক-তুল্য জাতিকে বিদ্যুৎসমা করিতে পারে) আদর্শমূলক কাজের প্রত্যক্ষ ফল সময়সাপেক্ষ। এই কারণে ইউনেস্কোর (United Nations Educational, Scientific and cultural Organisation—UNESCo) কার্য-কলাপ সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের ধারণা ও জ্ঞান অতি অল্প।

এই প্রতিষ্ঠানের নামে সভ্যতার তিন অঙ্গকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই তিন ক্ষেত্রে কাজের অনুশাসন দেওয়া হইয়াছে,—জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই সময় ৪৩টি রাষ্ট্র এর সদস্য হইয়াছিল। প্যারিসে এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দপ্তর, বর্তমানে ৬৪টি রাষ্ট্র এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। গতকালের শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্র ইউ,এন,ওর সদস্যভুক্তির পূর্ব্বেই ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত হইয়াছে, আবার মিত্রপক্ষীয় রাশিয়া আজ পর্য্যন্তও যোগ দেয় নাই। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া কার্য্য-ক্রম সাব্যস্ত করেন এবং প্রতি রাষ্ট্র তাহার নিজের দেশের জন্য বা অপরের জন্য ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করিতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের অর্থকোষ সদস্য-রাষ্ট্রের বার্ষিক সাহায্যের উপর নির্ভর করেন। লোকসংখ্যার অনুপাতে ও জাতীয় আয় অনুসারে দেশের দেয় অর্থের হিসাব হয়, মোট ভাণ্ডারের পরিমাণ বার্ষিক চারি কোটি টাকা। ভারতবর্ষের পক্ষে দেয় কিঞ্চিদধিক ১৪ লক্ষ টাকা। মুখ্যতঃ রাষ্ট্রনৈতিক-ভিত্তিতে গঠিত ইউ, এন, ও (U N O)। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী লিগ অফ নেশনস্-এর চেয়ে ইউ, এন,-ওর কার্য্যব্যবস্থা ব্যাপক। জগতের অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন দেশের সামাজিক বৈষম্য লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাহাদের অধীনে Economic and Social council (সংক্ষেপে Ecosoc) গঠিত করিয়াছে। এই সভা ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগরক্ষা করে ও বার্ষিক বিবরণী সমালোচনা করে।

খবরের কাগজে কেবল মানুষের বিভেদের কথাটাই বড় করিয়া ছাপা হয়; সিকিউরিটি কাউন্সিলের ঝগড়াটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু যখন দেশবিদেশের লোক একসঙ্গে বসিয়া শিক্ষার প্রসারের উপায় চিন্তা করে সেই খবর ছাপাইবার জন্য কাগজে স্থানাভাব হয়। ১৯৪৯ সালে সারা এশিয়ার সেরা শিক্ষা-নেতারা মহীশূরে মাসাধিক কাল ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে ও ভারত সরকারের আতিথ্যে লোক-শিক্ষার বিষয়, উপায় ও মান আলোচনা করিয়াছিলেন সে খবর অনেকেই জানে নাই। এই শতাধিক জ্ঞানীদের উপদেশ যে কেবল বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ হইয়া আছে তাহার জন্য দায়ী বিভিন্ন দেশের কর্ণধারগণ। যদি স্থিরীকৃত উপায়সকল আকাশচুম্বী এই ধারণা হইয়া থাকে, তবে দেশের প্রতিনিধিদের অধিবেশনের সময় সে বিষয় সজাগ থাকা উচিত ছিল; আবার যদি সিদ্ধান্তগুলি অতি সরল-জ্ঞানে অবান্তর মনে হয় তবে দেশের যে প্রতিনিধিরা আলোচনায় গিয়াছিলেন তাঁহারা সিদ্ধান্তের কার্য্যকরী রূপ না দেওয়ার জন্য আমরা কি তাহাদের মানসিক ক্লীবতার অপবাদ দিতে পারি না? বর্ত্তমান জগতের অনেক গণ্ড-গোলের মূলে আছে আমাদের দ্বিমুখী ভাব—প্রথম ভাব, সত্য কথা কহিয়া লাভ একমাত্র অপ্রিয় হওয়া এবং দ্বিতীয় ভাব হইতেছে—সব ভাল মন্দ ব্যাপারে মুখ না খুলিয়া জড়িত থাকিয়া 'ভাল-মানুষ' এই প্রশংসা লাভ। আমাদের দেশ-কয়েকজন বিশিষ্ট গুণী ইউনেস্কোর সাহায্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য যাঁহারা আজীবন সেই সমস্যায় ও বিষয়ে জড়িত ও কর্ম্মরত, তাহাদের বাদ দিয়া সরকারী দপ্তরের কলমপেশা সবজান্তাদের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ফল অর্থব্যয় এবং কাংস্য ও মৃৎপাত্রের একত্র নদী-ভ্রমণের দশা। যখন নানা কর্ম্মের প্রেরণা দেশময় জাগিয়াছে, তখন প্রেরণার আধার সৃষ্টি না করিয়া স্রোত বহাইলে কেবল

শক্তির অপব্যয় হইবে। এ যেন উচ্ছল নদীর জলোচ্ছ্বাস বাঁধিবার জন্য নদীর বুকে বাঁধ বাঁধিয়া তীরে নালা কাটিয়া জল আনা; জল ঢুকিল বটে, কিন্তু স্রোতের সঙ্গেই আবার সবটাই নামিয়া যাইবে।

সারা পৃথিবীময় বিদ্যা-বুদ্ধির পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ইউনেস্কো এক সঙ্গমস্থল। ইউনেস্কো কেন অর্থ সাহায্য দিয়ে দেশের উপকার করে না? উপদেশে ত পেট ভরে না। কথাটি খুবই সত্য, কিন্তু ইউনেস্কোর নিকট কোন গচ্ছিত অর্থ নাই যাহা প্রয়োজন-বোধে পরিবেশন করিতে পারে এবং সে গচ্ছিত অর্থ ত দেশগুলিই দিবে। যে টাকা দিবে সে নিজেই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে চাহিবে—যেমন এখন আমেরিকার রাষ্ট্রধন ও ফোর্ড ফাউনডেশন ব্যয় করিতেছে আমাদের গ্রামোন্নয়নের জন্য। যেটুকু ভিক্ষালব্ধ অর্থ জাতি-পুঞ্জের (U. N. O.) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার উপর ভিক্ষাপ্রার্থীদেশের কাছ হইতেও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া টেকনিক্যাল এসিস্‌টেন্স (Technical Assistance) নামধারী এক কার্য্যসূচী আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যসূচী অনুযায়ী যে দেশ যে বিষয়ে গুণী লোক (Expert) চাহিতেছে, তাহার জন্য ইউনেস্কো বন্দোবস্ত করিতেছে। এই রকম স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বা কৃষি সম্বন্ধে ঐ বিষয়ের অন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা (Who ও Fao) প্রভৃতি দেশে গুণী লোক এক দেশ হইতে আরেক দেশে পাঠাইতেছে। আমাদের দেশ হইতে ইউনেস্কোর কাছে আমন্ত্রণ গিয়াছে গুণী লোকের সন্ধানে—যাহারা বিশেষ বিষয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতা করিতে পারিবেন। ভাবিয়া দেখিলে দেশে দেশে প্রয়োজনের তালিকা এত সুবৃহৎ হইবে যে—আর্থিক সাহায্যের কোন সীমা পাওয়া যাইবে না। আবার ভারতবর্ষ হইতেও অন্য দেশে গুণীরা গিয়াছেন—প্রয়োজন দেশের উন্নতির বিভিন্ন সোপান নির্ণয় করা। সেই সোপানশ্রেণীর জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও কার্য্য-ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে—কত অর্থ, কত লোকবল, কত সামগ্রী ও কত জ্ঞান-বুদ্ধি নিজেদের আছে, আর কতটা চাই। ভিন্ন দেশে কোন এক সমস্যার সমাধান নানা পরীক্ষার পর সম্ভব হইয়াছে, সেই সমাধান নিজের দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা তাহা ভাবিবার বিষয় এবং এই রকম ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর মত প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে। একটা সাধারণ উপমা দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বাড়ী সাজাইতে হইলে যেমন শো-রুমে গিয়া জিনিষ পছন্দ করিতে হয়, সেই রকম দেশের উন্নতির জন্য ইউনেস্কো জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-শিল্পীদের আসরের ব্যবস্থা করিয়াছে। সকল দেশের প্রতিনিধিরা নিজ প্রয়োজনবোধে গুণীদের পরামর্শ লইয়া কাজে অগ্রসর হইবে। ইউনেস্কো জ্ঞান-প্রসারের তীর্থ। পুণ্যাতুরের কামনাই তীর্থের মহিমা বৃদ্ধি করিবে।

দিল্লীতে ইউনেস্কোর বৈজ্ঞানিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এক ছোট দপ্তর আজ চার বৎসর কাজ করিতেছে। ইহা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্য্যে সাহায্যের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সংবাদ আদান-প্রদান, গবেষণার সামগ্রী সংগ্রহ ও গবেষণা-মূলক সভার আয়োজন—এই তিন কাজ এই দপ্তর করিতেছে।

যুগস্রষ্টা-গান্ধী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পাষাণের মরুভূমি উত্তপ্ত জিহ্বায়
লিহন করিছে যত শ্যামল পল্লীরে,
আকাশ কালিমালিপ্ত কলের ধোঁয়ায়,
জীবন শুকায়ে যায় চাষীর কুটীরে।
কোথায় সে সুখস্রষ্টা বেণুধ্বনি যাঁর
সভ্যতার যমুনারে বহাবে উজান?
নিয়ে যাবে মানুষেরে যেথা মৃত্তিকার
গন্ধ আর বনে বনে পাখীদের গান?
তুমি গান্ধী সে মহান্ বিরাট বিপ্লবী
ডাক দিলে আমাদেরে যেথা সমীরণ
অমৃত বিলায় আর মাঠে মাঠে রবি
সোনার কিরণধারা করে বিকীরণ।
মুক্ত প্রকৃতির কোলে চেয়েছিলে তুমি
আনন্দে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ নব মাতৃভূমি।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

দ্বিপ্রহরে চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডা বসে—ভগবতী নিজে বিশেষ বসেন না। পাশাড়ুর মধ্যে সারদা মল্লিক না আসিলে খেলা জমে না। ভগবতী চাল বলিয়া দেন—অন্য সকলে খেলে। তাহার মধ্যে সারদা ও পাঁচু মুখুজ্জে প্রধান, তাহারা সত্যিকারের খেলোয়াড়, অন্য যাহারা তাহারা দাঁড়ি মাত্র। সারদার বৈশিষ্ট্য তাহার কথায় সকলে হাসে, পাশার আড়ি মারিলে তিনি উত্তেজিত হইয়া মাঝে মাঝে নাচিয়াও থাকেন।

পাশার আড্ডা জমিয়াছে, তাহাদের পাশে প্রিয়নাথ ও হরিপদ দাবা লইয়া বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে হাস্য পরিহাস চলিতেছে।

সারদা হুঁকা টানিতে টানিতে উঠিয়া বসিয়া হাঁকিলেন—কচে বারো—

ওদিকে হরিপদ হাঁকিলেন—কিস্তি খুড়ো—সামলাও—দাবা গেল, দাবা গেল—

হাস্য পরিহাস ও খেলার উত্তেজনায় আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। মতি ঠাকুর বলিলেন,—হুঁকো ছাড়ো সারদা, কল্‌কে পুড়ে গন্ধ বেরিয়ে গেছে—

ভগবতী তাহার চাকরের উদ্দেশ্যে কহিলেন—ওরে আর এক কলকে তামাক দে—

বাড়ীর ভিতরে ভগবতীর ভগিনী বিন্দুবাসিনী কাঁথার ধামা লইয়া বসিয়াছেন, রকের কোণে। কাঁথার কোণে একটা কলকা তুলিতেছিলেন, বনলতা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল। বিন্দু বনলতাকে কহিলেন—দাঁড়াও বৌমা, তোমাকে একটা কাঁথা পেড়ে দেব। ভাল ক'রে সেলাই কর, তোমার শ্বশুর কাঁথা গায় দিতে বড্ড ভালবাসে—

বনলতা কহিল—আপনি কলকা এঁকে দেবেন, তা হ'লে হয়ত পারবো চেষ্টা ক'রলে। ভগবতীর স্ত্রী টাকুতে পৈতার সূতা কাটিতেছিলেন, তিনি কহিলেন—বৌমা কি আর এখনই কাঁথা সেলাই করতে পারে—আগে সেলাই করা শিখুক। বৈশাখ মাসে ত তিনকুড়ি পৈতে লাগ্‌বে,—তুমি টেকো কাটা আরম্ভ কর বৌমা।

বিন্দু কহিলেন—চেষ্টা করলে কি না পারবে?

আদুরী ধান ভানিতেছিল সে কহিল—চাল মেপে নেন গো, গিন্নিমা—

বিন্দুবাসিনী বৌএর দিকে চাহিলেন। শশধরের মা কহিলেন—আমি কেন? বৌমা চাল মেপে নাও, হিসেব কিতেব শিখ্‌তে হবে ত?

বনলতা ঘর হইতে সের আনিয়া মাপিতে লাগিল—কুড়ি সের পুরিলে আদুরী হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল—বেশ ক'রলে বৌঠান্। আমার চাল কোথা? দেবেক নাই—

বিন্দু কহিলেন,—কুড়ি সেরে ও একসের পাবে, কুড়ি সের তোলো—একসের ওদিকে দাও—

বনলতা সেইভাবেই চাল মাপিতে লাগিল—কিন্তু পরে মাত্র সাতসের চাল বেশী হইল,—সাত সেরে কি পরিমাণ চাউল আদুরী পাইবে তাহা হিসাব করিতে না পারিয়া বনলতা একটু বিপন্ন ভাবে বিন্দুর মুখের পানে চাহিল, বিন্দু কহিল—আন্দাজ ক'রে দাও—

বনলতা আধসের মত চাউল আদুরীকে দিলে, আদুরী একটা ব্রীড়া ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া কহিল—তবেই হয়েছে বৌঠান—তোমার সংসারে যখন খাটবো তখন ত উপোস ক'রতে হবে—আর একমুঠি দাও—

বনলতা একটু লজ্জা পাইয়া আর একমুষ্টি চাউল দিয়া দিল। শাশুড়ী কহিলেন—এমনি করে যদি দাও তবে ত গোলায় কুলোবে না, সাত সের চাউলে ত একসেরই দিলে বৌমা—

বনলতা চুপ করিয়া রহিল—এমনি পরিস্থিতিতে কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী হাসিয়া কহিলেন—যাক্‌ গে—দু' মুঠো না দিলে তোমার দোরে ধান ভানতে আসবে কেন?

বিন্দু অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং বনলতার মুখের দিকে চাহিয়া যেন অনুমান করিতে লাগিলেন, ভবিষ্যতে এই কিশোরী গৃহিনীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে কিনা। আদুরী কহিল—একটা পান দিন না মা—কতকাল যেন পান খাই না—

বনলতা ঘরে পান আনিতে গেল—হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপে সারদা চীৎকার করিয়া উঠিল—চক্ চক্,—দো দুয়ো চক্ পাশার বাজি শেষ হইয়া আসিয়াছে, এই চকের আড়ির উপরে খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। সেই সময়ে সারদা হাঁকিলেন—চক্ চক্—দো দুয়ো—

সঙ্গে সঙ্গে পাশায় চক্ পড়িল এবং বিপক্ষের ঘুটি মারা পড়িয়া সারদা মল্লিকের জয় নিশ্চিত হইয়া গেল। সারদা মুহূর্ত্তে কাপড় খুলিয়া মাথায় বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—চক্ চক্, চক্ চকাচক্ চক, হেরে গেলে—মতি পণ্ডিত হেরে গেল দুয়ো দুয়ো—

নৃত্য করিতে করিতে বাইজির ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একপাক দিয়া মতি ঠাকুরের সম্মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দোলাইয়া কহিলেন—চক্—চকাচক্ চক্

চণ্ডীমণ্ডপে একটা হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল, বিরাট হৈ হৈ—ভগবতী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—থামো সারদা থামো—

সারদা সুরে কহিলেন—থাম্‌বো না গো—নাচবো—চক্ চকাচক্—নাচবো—

মতিঠাকুর কহিলেন—দোহাই তোমার কাপড়খানা পরে নাচো—

সারদা পুনরায় কহিলেন—পরবো না গো—নাচবো—

চণ্ডীমণ্ডপ হাসি ও চীৎকারে ফাটিয়া পড়িতেছিল কিন্তু বিন্দু ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য জানালা খুলিয়া দৃশ্যটা দেখিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন এবং আপন মনেই হাসিতে লাগিলেন—

শশধরের মা বড়বৌ প্রশ্ন করিলেন,—কি ঠাকুর-ঝি ? কি ?

বিন্দু কহিলেন—কি আবার ? বুড়ো মিন্‌সে ন্যাংটো হ'য়ে নাচতে লেগেছে—

—কে ? কে ?

—সারদা মল্লিক, তা ছাড়া আবার কে ?

—নারায়ণ নারায়ণ, বুড়োকালেও ওর স্বভাব গেল না।

চণ্ডীমণ্ডপের হাস্য-কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিলে বড়বৌ উঁকি দিয়া দেখিলেন—সারদা মল্লিক বসিয়া আছে এবং অন্য সকলে কি যেন বলিয়া খুব হাসিতেছে।

আদুরী পান হাতে লইয়া চলিয়া যাইতেছিল,—বিন্দু কহিলেন—আদুরী তোদের পাড়ায় সব নাকি কাল আদাড়ীর ওখানে পেত্নী দেখেছে—শুন্‌লি সব—

—হাগো পিসিমা—আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীর পিছনে ওই মাঠে আমিও দেখেছি—বিধবা একটা কামিন ঘুরে বেড়ায়, কাঁদে—

বড়বৌ নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—তুই দেখেছিস্ ?

—হ্যাঁ।

—ও মাঠে তুই কি করে দেখলি ?

—হ্যাঁ, ওই আদাড়ী ঠাকুরের বাঁশী বাজানো আমাদের দাওয়া থেকে শোনা যায়। শুন্‌তে শুন্‌তে তাকালেই দেখা যায়—

—ভয় করে না ?

—ভয় করে বৈকি পিসিমা—

বিন্দু কহিলেন—আদাড়ীর একটা গান শোনা না আদুরী—তুই ত সব জানিস্—

—শোনাবো পিসিমা—কাল, আজ বেলা পড়ে এল, জলকে যাবেক্—আদুরী আঁচলে চাল বাঁধিয়া চলিয়া গেল।

তখন অপরাহ্ন। উঠানের পশ্চিমের গাছগুলির ছায়া দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণের রৌদ্র নিস্তেজ, তাল বৃক্ষের মাথায় শঙ্খচিল তাহার বাসায় ফিরিয়াছে—আশে-পাশে কাকেরা কলরব করিয়া কি যেন কতকগুলি পতঙ্গ ধরিতেছে।

বিন্দু কহিলেন—যামিনী, কোথারে, ফেন জল গুলো গোয়ালে নিয়ে যা—এক্ষুণি গরু এসে পড়বে—

যামিনী আসিয়া তাহার কাজে লাগিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের পাশার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সারদা নিবিষ্ট মনে হুকা খাইতেছেন এবং অন্য সকলে মৃদুস্বরে কি যেন বলিয়া মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আদাড়ী

আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী কহিলেন—এস আদাড়ী, শুন্‌লাম পেত্নীর সঙ্গে ঘরকন্না করছো হে—ব্যাপারটা কি।

আদাড়ী একগাল হাসিয়া কহিল—ঘরকন্নাই বটে, তবে ওসব সাধন-ভজনের কথা, কি আর ব'লবো—

সাধনাটা কিসের? ভূতের, না পেত্নীর, না কি?

আদাড়ী আবার হাসিয়া কহিল—পেত্নী কেন? পরী-সাধন।

—পরী আস্‌ছে?

—আসে যায়—এ ত সাধারণ কথা নয়—একটা জিনিষ পেলে পরী নিয়েই ঘরকন্না করতুম—

সারদা কহিল,—কি জিনিষ হে! যা পেলেনা—

—কঠিন মামা, কঠিন—পাওয়া যায় না—স্বাতীনক্ষত্র মঙ্গলবার যদি এঁয়োতি স্ত্রীলোক মারা যায়, তবে তার সঙ্গে যে সিন্দুর কৌটো আর ধান থাকে তা চাই, চন্দ্রগ্রহণের সময় তোলা শ্বেত-অপরাজিতার শেকড় চাই—এমনি সব জিনিষ।

—আমাদের একটু দেখাও না, একদিন—

—দেখাবো বৈ কি? তবে ওদের সঙ্গে রোজ রোজ কারবার করাটা ভাল নয়, যখন রেগে গিয়ে ক্ষতি করে—

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—তা কতদূর এগোলে হে—

আদাড়ী ধীরে ধীরে পরিসাধনের প্রক্রিয়া ও তাহার সাফল্য সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল—মাঠের কোলে তখন সূর্য্য আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ঘাটের পথে বধূগণ পূর্ণকুম্ভ কক্ষে ফিরিতেছে।

আদুরী বাড়ী আসিয়া দেখে তাহার মায়ের জ্বর আসিয়াছে, নটবর গরু লইয়া ফিরে নাই। ভাই শীতল ও ভগিনী সোহাগী দুইজনে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—

মা জ্বরে কোঁকাইতে কোঁকাইতে কহিল—আদুরী, কাঠ নেই যে ঘরে, রাতে উনুন জ্বল্‌বে না—

আদুরী কহিল—চাল আড়াই পাই হল মা, মনিব বাড়ীতে। দেখি কাঠ কুড়িয়ে আনি।

ঘর হইতে একটা ঝাঁকা আনিয়া কহিল—শীতল সোহাগী—যা ঘুঁটে কুড়িয়ে লিয়ে আয়—

ভাই ও ভগিনী ঘুঁটে কুড়াইতে অদূরের ডাঙ্গায় চলিয়া গেল। আদুরী আর একটা ঝাঁকা ও দা লইয়া বাড়ীর পিছনে আদাড়ী ঠাকুরের ঘরের পিছনে মাঠের পাশের জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতে গেল—একাকীই। এরূপ তাহারা যাইয়া থাকে, দূরে ডাঙ্গায় শালবনে যাইতে হইলে কেবল দল লইয়া যায়। সেখানে মাঝে মাঝে ভালুক আসে মহুয়া খাইতে এবং শীতে কখনও কখনও বাঘও আসে, কিন্তু এটা ত গাঁয়েরই জঙ্গল।

সন্ধ্যা হইতে বেশী দেরী নাই, শীতে অপরাহ্নের রৌদ্র নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, দূরে ডাঙ্গায় জঙ্গলের উপরে গ্রাম হইতে উত্থিত শাদা ধূমের কুণ্ডলী ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তাহার আড়ালে সূর্য্য নিস্তেজ। আদুরী বনের মাঝে ঢুকিয়া কয়েকখানা শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া কাটিয়া ফেলিল—একটা শালের কোড়া মরিয়া রহিয়াছে সেটাকেও কাটিল—অদূরে ৺কালীর থান, প্রতি বৎসর পৌষ মাসের অমাবস্যায় তাহাদের পাড়ার গাওলা ৺কালী পূজা হয়।

ভরত গরু লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে লক্ষ্য করিয়াছিল, আদুরী জঙ্গলে কাঠ আনিতে গিয়াছে, সে গরুগুলি তাড়াতাড়ি রাখিয়া, একখানা কাটারী হাতে জঙ্গলে উপস্থিত হইল এবং কাঠ সংগ্রহের ছুতায় ধীরে ধীরে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল—তু কে হোথা?

—আদুরী—

—আদুরী তু একলাটি?

—হাঁ, তু কোথা?

ভরত একখানা কাঠ কাটিতে কাটিতে আদুরীর পানে চাহিয়াছিল—সুডৌল সুন্দর তাহার দেহ, ক্ষীণ কটিতটে আঁচলের প্রান্ত জড়ানো, বিপুল নিতম্ব ঘেরিয়া লাল টুকটুকে পাছা পাড়—উন্নত উরস। শ্রমে কপালে ঘর্ম্ম-বিন্দু মুক্তার মত ঝুলিতেছে, কোন পাতার ফাঁকে যেন একটু আলো আসিয়া মুখখানিকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার অন্তরে কত কথা বেগবান হইয়া উঠিল—কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিল না, কেবলমাত্র কহিল—তু সাঙ্গা করবেক না রে আদুরী—

—ক'রবেক নাই কেনে, গাঁয়ে করবেক নাই—

কেনে? তুই ত জানিস্—তোর তরে মোর প্রাণ কত কাঁদা করলেক, তু শুন্‌বি না—

—তোকে সাঙ্গা করবেক নাই।

—আদাড়ী ঠাকুর তোর কে, তু ধান ভান্‌ছিস্, দাওয়া লেপছিস্—

আদুরী হিহি করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া কহিল—মু ঠাকুরকে সাঙ্গা করবেক, বামুন হবেক !

ভরত কেবলমাত্র ব্যথিত হইল, হৃদয়ের কথা সে ব্যক্ত করিতে পারিল না। সাশ্রু-নেত্রে সে চাহিয়া রহিল আহত শ্বাপদের মত, আর দেহ হইতে স্ফুরিত হইতে লাগিল যেন কামনার বিষ বাষ্প—চারিদিকে নির্জ্জন জঙ্গল—একাকী কেবল সে আর তাহার এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত আদুরী। সে এক পায়ে দুই পায়ে নিকটবর্ত্তী হইয়া আর একবার সস্নেহে ডাকিল—আদুরী, তু শুন্‌বেক নাই, মোর ঘরে যাবি নাই ?

আদুরী যেন একটু দয়ার্দ্র চিত্তে কহিল—মোর আশা ছাড়্ মু ত কারও ঘরকে যাবেক নাই—

ভরত স্তব্ধ হইয়া একটু দাঁড়াইল, আদাড়ী ঠাকুরের প্রতি একটা অকারণ ঈর্ষাবশতঃ কহিল,—ঠাকুর তোর কে ?

—মোর মনিষ। আদুরী হিহি করিয়া হাসিয়া কাঠের বোঝা একটা ঝাঁকিতে মাথায় তুলিয়া রওনা দিল। ভরত ফিরিয়া গেল আপন বোঝা বাঁধিতে, জঙ্গল হইতে একটা লতা কাটিয়া বিমনাভাবে বোঝাটা বাঁধিয়া তাহার উপর বসিল। মাঠের সর্পিল আলের পথ ধরিয়া আদুরী চলিয়া যাইতেছে—তাহার দেহ সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন কামনা-রাজ্যের ছায়া মূর্ত্তির মত ক্রমশঃই মিলাইয়া যাইতেছে। ভরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেখানেই বসিয়া রহিল—সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, ধূম ও ধূলা-মলিন আকাশের প্রান্তে নিষ্প্রভ রংএর প্রলেপ,—ভরত জানে না সে কি ভাবিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে মরা চাঁদ উঠিয়াছে, সাম্‌নের প্রান্তর অস্বচ্ছ আলোকে কুয়াসাবৃত বলিয়া মনে হয়—ভরত সুদূর বনরেখার পানে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভগবতী ঠাকুরের শিবমন্দিরে আরতি আরম্ভ হইয়াছে। ভরত চমকাইয়া উঠিল, চারি দিকে অন্ধকার। সে বোঝা মাথায় করিয়া রওনা।

মতিঠাকুর মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন—টোলের ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্রগণ বেশী নয়—জনপাঁচেক মাত্র। পাশের দেয়ালে একটা বাঁশের চোঙ্গায় রেড়ির তেল ছিল। ঠাকুর সেটার খানিক প্রদীপে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন—তোমরা পাঠ তৈরী কর, আমি চণ্ডীমণ্ডপে ভাগবত পাঠ করতে যাবো—পাঁচুর স্ত্রীর কাল চোঙ্গাই-কুলাই ব্রত আছে—জ্ঞান, তুমি সকাল সকাল পূজোটা করে দিয়ে এসো—গরুগুলোর জাব দিয়েছ ত ?

মতিঠাকুর ভাগবত বগলে করিয়া বাহির হইলেন। সারদা মল্লিকের বাড়ীতে বৈঠকী গানের আসর বসিয়াছে। ডুগি-তবলা ও তানপুরা সহযোগে শ্যামা সঙ্গীত চলিতেছে। তিলি-পাড়ায় কীর্ত্তন হইতেছে তাহার খোলের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। বাগ্‌দী-পাড়ায় কে যেন বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে। মতিঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন—সতরঞ্চিতে নারী পুরুষ বসিয়া আছে, মাঝে জলচৌকিতে ঠাকুরের বসিবার আসন,—দুই পাশে বৃহৎ দুইটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে—মতিঠাকুর ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—

আদাড়ী ঘরে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল, বাঁশী ফেলিয়া একতারা বাহির করিল এবং বাউল সুরে গান গাহিতে আরম্ভ করিল—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সঙ্গীত। ভরত দাওয়ায় শুইয়া নেশার ঘোরে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে—

ভগবতীর পুত্র শশধর বাড়ীর মাঝে একাকী ঘুরিয়া আসিল—কোথায়ও কেহ নাই—কেবল চাকর রাম ও বাসিনী বসিয়া গল্প করিতেছে। মা পিশিমা ভাগবত শুনিতে গিয়াছেন, বনলতা কোথায়ও নাই—সেও হয়ত ভাগবতের ওখানে গিয়াছে। বনলতার সহিত তাহার দেখা হয় না, কিন্তু দেখিবার একটা অদম্য প্রলোভন তাহার রহিয়া গিয়াছে। সে বনলতাকে খুঁজিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সারদা মল্লিকের বাড়ীতে উপস্থিত হইল—গ্রামের অনেকেই গান শুনিতেছে—

মতিঠাকুরের বাড়ীতে শিষ্যগণ ও খুড়তুতো ভাই গোপাল খাইতে বসিয়াছিল। গোপাল প্রশ্ন করিল—দাদা কোথায় বৌঠান ?

—ভাগবত পাঠ ক'রছেন, চাটুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে—

—ও, আমি যেয়ে এগিয়ে নিয়ে আসি ?

—তুমি আবার যাবে কেন ?

—বেশ, বেশ—সিদেগুলো তিনি কি আন্‌তে পারেন? আমি যাই—একটা বড় গামছা দেবেন ত?

—তা হ'লে জ্ঞানও যাও, দু'জনে নিয়ে আস্‌বে।

আহারান্তে তাহারা যাইবে স্থির হইল। সিধের ঐ চাউলই চতুষ্পাঠীর উপার্জ্জন, তাহাতেই মতিঠাকুরের সংসার চলে, শিষ্যগণ গুরুর খাইয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে। গোপাল ও জ্ঞান যখন চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল তখন ভাগবতের এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। নিষ্প্রভ প্রদীপের আলোয় নরনারী ভক্তিগদগদচিত্তে উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে বাস্তব জীবন অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে এবং পরকাল যেন প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহজন্মের পাপপুণ্য যেন তাহাদের পরবর্ত্তী জীবনকে সুনিশ্চিত একটা ফল দিয়াছে—সহসা তাই মনে হয় রেড়ির তেলের প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া আছে কতকগুলি অশরীরী মৃত আত্মা—

আদাড়ী সকালে উঠিয়া রান্নার জোগাড় করিতেছিল, উঠানের কোণে কতকগুলি শুক্‌না ডাল জড়ো করা ছিল; সে কাটারী দিয়া সেগুলি কাটিতেছিল—রান্নার এটা প্রাথমিক জোগাড়—তাহার মনটা বিষণ্ন, কেন বোঝা যায় না। পরীসাধনে হয়ত কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছে—

অকস্মাৎ আদুরী আসিয়া কোঁচড় হইতে দুইটি বেগুন বাহির করিয়া কহিল—মোর গাছের বেগুন—

আদাড়ী মুখ তুলিয়া চাহিল, কোন কথা কহিল না। কি করবেক বল—

আদাড়ী কহিল—দাওয়াটা নিকিয়ে দাও, আর কি করবে?

আদুরী পুকুর হইতে জল আনিয়া দাওয়া লেপিতে আরম্ভ করিল। আদাড়ী কাঠ কাটিতেছিল—আদুরী সহসা ফিরিয়া কহিল—এত রাত বাঁশী বাজালে কেন? মা'র জ্বর হ'ল—

আদাড়ী কহিল—তোর মার জ্বর?

—হ্যাঁ, ক'বরেজ বাড়ী যাবেক—

—তু যা—

আদুরী তাড়াতাড়ি ঘর নিকাইয়া শেষ করিল। তাহার পর হাত ধুইয়া আদাড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল—এত রাত ক বাঁশী বাজাস্‌ না—কেনে ঘুম নাই—

আদাড়ী কহিল—তোর তাতে কি, ঘুম আমার থাক্‌, আর নাই থাক্‌—

—তবে আমি আর তোর কাজ করবেক না—

আদাড়ী কাঠের বোঝাটা বারান্দায় উনানের পাড়ে ফেলিয়া দিয়া ঘরে গেল, কোন উত্তর করিল না। আদুরী চলিয়া গেল—কবিরাজ বাড়ীতে যাইতে হইবে। নটবর ধান কাটিতে গিয়াছে, সেই প্রভাতে গাড়ী লইয়া।

গ্রামে দুই ঘর বৈদ্য—বটুক কবিরাজই তাহার মধ্যে ভাল। আদুরী তাহার ঘরেই উপস্থিত হইল। কবিরাজ সমস্ত শুনিয়া দুইটী লালবড়ি দিয়া কহিলেন—যা শিউলি পাতার রস দিয়ে মেড়ে খাওয়াবি। আর দুইটি বড়ি পুনর্ণবার পাতা দিয়ে খাওয়াবি—

—তু একবারটি যাবেক নাই—

বটুক বলিলেন—যাবো ঐ বেলা, এ বেলা ভিনগাঁয়ে যেতে হবে। আদুরী ঔষধ লইয়া ফিরিল—সোহাগী গোবর ও ঘুঁটে কুড়াইতে গিয়াছে—এই সময়ে সার সংগ্রহ না করিলে চলিবে না—এটা তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। আদুরীর মা কহিল—রাঁধলি না? আদুরী 'যাই' বলিয়া মেটে কলসীটা কাঁকে তুলিয়া লইল। তাহার মায়ের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে—আজ মুড়ি খাইয়াই থাকিবে—

আদুরী জল লইয়া ফিরিলে তাহার মা কহিল—আদুরী ভরতকে সাঙ্গা করিস্‌ না কেনে? গাঁয়ে থাক্‌বি—

—তু কিছু বল্‌বি না, ভরতকে সাঙ্গা করবেক কেনে?

মায়ের মন আদুরীর জন্যে কেন যেন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার চালচলন কাজ-কর্ম্মের মাঝে কোথায় যেন একটী শঙ্কাজনক কিছু হইয়াছে, মা তাই ব্যাকুলভাবে সাঙ্গা করিতে বলেন। নারী পুরুষের আশ্রয়ে না থাকিলেই যেন কেমন বে-মানান হয়। আদুরী রাঁধিবার জোগাড় করিয়া লইল—

ভগবতী সকালে গ্রাম পরিক্রমা করিয়া ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ একটা বাড়ীতে গোলমাল শুনিয়া রাস্তার উপর থামিয়া গেলেন। যুগল মুদী তাহার স্ত্রীর সঙ্গে চীৎকার করিয়া ঝগড়া করিতেছে। বাহিরে অপেক্ষমান গরুর গাড়ী—তাহাতে মাল বোঝাই হইতেছিল, আজ পলাসডাঙ্গায় হাট, সে হাটে সমস্ত কিছু বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যাইতে হয়। গাড়ীসহ যুগল যায়—সারাদিন হাটে

বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যায় ফিরে। ভ্রাতা ছিদাম মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে যায়।

ভগবতী দাঁড়াইয়া ঝগড়ার বিষয় বস্তু কি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যুগলের পত্নীর কথা হইতেছে; কনিষ্ঠ ছিদামের স্ত্রী কোন কাজ করে না, একলা তার পক্ষে সংসারের এই অগণ্য কাজ করা সম্ভব নয়। যুগল কিছুই বলে না কেন?

যুগল কহিতেছে—ওরা স্বামী স্ত্রী যখন ছোট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন সংসারের খাইয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে বৈ কি? বড় যে হয় তাহাকে সহিতেই হইবে। যুগল কহিল—আমার অস্তে আবার ওকেই জোঁয়াল বইতে হবে—

যুগল একটা সরিষার তৈলের মেটে হাঁড়ি মাথায় করিয়া বাহিরে আসিল, এবং ভগবতীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া হাঁড়িটা তাড়াতাড়ি পাড়ীর খড়ের উপর বসাইয়া দিয়া করযোড়ে প্রণাম করিল। ভগবতী কহিলেন—সকালে চেঁচামেচি ক'রছ কেন যুগল?

—ওই মেয়ে মানুষের সঙ্গে হুজুর। বোঝে না ত, যারা বড় হয় তাদের ত সইতেই হয়। ওরা কি তা বোঝে? কাজ-কর্ম্ম করে সংসারের সকলকে বুকে করে পালন করাই ত মানুষের কাজ—তাই ত ধর্ম্ম?

ভগবতী থামিয়া কহিলেন—ধর্ম্মের কথা ক'জন বোঝে?

—হাঁা, হুজুর রামচন্দ্র কত সহ্য ক'রেছেন, সীতা মা কত সহ্য ক'রলেন, সংসারে আর সুখ কি? দশজনকে খাওয়ানো পরানই ত সুখ—আপনি যেমন কর্ত্তা, পূজার সময় যখন খলাট বোঝাই লোকে খেতে বসে, বলুন ত তখন কেমন লাগে—পুণ্যি ত কিছু করিনি যে দশজন লোক খাওয়াবো—ভাই ভাগ্‌নে, বৌ ছেলে-পুলে খাওয়াবো তারই কত বাধা—

যুগল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—জীবনে কেবল খাটিয়াই সে গেল—মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। দু' দশজন লোককে যে খাওয়াইবে তাহাও তাহার হইল না।

ভগবতী হাসিয়া কহিলেন—সেবাই ত ধর্ম্ম—সবই ত সেবাকর্ম্ম—

ভগবতী আগাইয়া চলিলেন—তাঁতিপাড়ায় মিস্ত্রী বসিয়া চরকা ও তাঁতের জিনিস তৈয়ারী করিতেছে, পাড়ার ছেলেরা জড় হইয়া তাহা দেখিতেছে। রাস্তার ধারে বাহির-পুকুরে ধোপানী কাপড় কাচিতেছে, তিলি-পাড়ায় ঘর ঘর করিয়া ঘানি চলিতেছে—

নবতাঁতি প্রণাম করিয়া কহিল—হুজুর বৌঠানের কাপড়ের তানা দিয়েছি, একটা লাল ও একটা নীল ডুরি হবে, আর চওড়া পাছাপাড় রাখবো ত?

—রাখবে বৈ কি? তার ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকে নি? তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—নবও হাসিল।

(ক্রমশঃ)

সত্তাবাদ

(Existentialism)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্তা-বাদের ক্রমবিকাশ

কিয়ার্কেগার্ডের দর্শন ছিল ধর্ম্ম-মূলক। তাহার প্রধান কথা ছিল ব্যক্তির মূল্য এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা। মানুষ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণে কষ্ট হইবার কথা নহে। ঈশ্বর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ও মঙ্গলময়; মানুষের ইচ্ছা ও তাহার কর্ম্ম তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল হওয়াই তাহা হইলে বাঞ্ছনীয় হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে Existentialist নামে পরিচিত কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন এবং এই অস্বীকৃতিদ্বারা মানুষের ইচ্ছার ব্যবহারও সন্দেহ-সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

হেগেলের পরে ধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। নিৎসে উচ্চরবে ঈশ্বরের মৃত্যুই ঘোষণা করেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস যখন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন কি ভাবে জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য, তাহা জানিবার

জন্য যুবকেরা দর্শনের দিকে চাহিয়াছিল। জার্মান দার্শনিকগণ কর্তব্য-নির্দ্ধারণে যুক্তিকেই অবলম্বনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের উপর লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে থাকে। বিজ্ঞানের উপর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, দর্শনকে বিজ্ঞানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে, তখন এক প্রকার চেষ্টার উদ্ভব হয়। কিন্তু ইহা হইতে জীবন-পরিচালনের নীতি-সম্বন্ধে কোনও আলোক পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ফলে যুবকেরা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের কারবার কেবল তথ্যের সঙ্গে; মূল্যের (Value) সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই। জ্ঞানের মূল্য স্বীকার করিলেও, আলোচ্য তথ্যের মধ্যে কোনও মূল্য বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষেরও বিশেষ মূল্য নাই; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে মানুষ একটি বিষয়মাত্র, বিশ্বের বহু পদার্থের মধ্যে একটি পদার্থমাত্র। সুতরাং জীবন-নীতি সম্বন্ধে ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান কোনটি হইতেই কোনও আলোক পাওয়া অনেক যুবকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। জগৎ যদি ঈশ্বরবিহীন হয়, জগতের পরিচালক কোনও জ্ঞানময় মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না থাকে, জীবনের মধ্যে ভালো মন্দ বলিয়া যদি কিছু না থাকে, সকল বস্তুর মূল্যই যদি সমান হয়, তাহা হইলে সেই জগতে মানুষের অস্তিত্বের মূলে যে কোনও উদ্দেশ্য থাকিবে, মানব-জীবনের কোনও অর্থ থাকিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্ন হইতেই নিরীশ্বর Existenlialism উদ্ভূত হইয়াছে।

সাধারণ সত্তা-বাদ

বস্তুর সার (essence) এবং অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। সারের দেশ ও কালে প্রকাশই অস্তিত্ব। দেশ ও কালে প্রকাশিত হয় বিশেষ। দেশ ও কালে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার প্রকাশই existentialismএর আলোচ্য বিষয়। সার্বিকের (universal) আলোচনা ইহাতে নাই, কেন না, সার্বিক দেশ ও কালের অতীত। বিশেষই ইহার আলোচ্য। ইহা বাস্তবের দর্শন—স্থূলের দর্শন (Philosophy of the concrete)। যাহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে, প্রত্যয়জগৎ হইতে—সম্ভাবনার রাজ্য হইতে—নামিয়া আসিয়া দেশ ও কালে রূপায়িত হইয়াছে, তাহারই দর্শন।

Existentialistগণ কি বাহ্য বস্তু, কি মানসিক ভাব, সকলেরই বিশিষ্ট স্বকীয় রূপের সাক্ষাৎ-লাভের চেষ্টা করেন। এই বিশিষ্টতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন বলিয়াই কেহ কেহ উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চরিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি চরিত্র এমনভাবে অঙ্কিত হয়, যে তাহা আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। Existenlialist উপন্যাসে এতাদৃশ চরিত্র-সৃষ্টির—type সৃষ্টির—প্রয়াস নাই। তাহাতে প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব, যাহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই ফুটাইয়া তোলা হয়। ইহার ফলে চরিত্র অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সকল চরিত্রের বিশ্লেষণ পড়িয়া ইহাও মনে হয়, যে কোনও সময়ে যেন আলোচিত মানসিক অবস্থা নিজেই অনুভব করিয়াছি। বিশেষের প্রতি, ব্যক্তিত্বের প্রতি, এই আকর্ষণই Existentialismএর বিশেষত্ব। সত্তার সম্প্রত্যয়ের (concept) সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। "আমি চিন্তা করি", ইহা হইতে দে-কার্ত্ত "আমি"র অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'অস্তিত্ব' একটি সম্প্রত্যয় মাত্র—অস্তিত্ববান্ বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব মাত্র। কিয়ার্কেগার্দ বলিয়াছিলেন—"মনন হইতে অস্তিত্বের অনুমানের প্রচেষ্টা স্ব-বিরোধী। কেন না মনন বস্তু হইতে অস্তিত্বকে পৃথক করে এবং তাহার বস্তুত্বের বিনাশ করিয়া, অস্তিত্বের চিন্তা করে।" অস্তিত্ব ও অস্তিত্ববান্ বস্তুর যে একত্ব, তাহাই Existentialism-এর আলোচনার বিষয়। অস্তিত্ব অস্তিত্ববান্ বস্তুর গুণ নহে। বস্তু হইতে তাহার অস্তিত্বকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের সহিত—জ্ঞাতার সহিত—সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের স্বকীয় অস্তিত্বের জ্ঞানের সহিত জগতের অস্তিত্বের জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য। কোনও বস্তুর অস্তিত্ব আছে মনে করার অর্থ আমি তাহার জ্ঞাতৃরূপে বর্ত্তমান আছি। বস্তুর স্ব-গত সত্তার জ্ঞানলাভের জন্য আমরা আমাদের স্বকীয় সত্তা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব না থাকিলে জগতের অস্তিত্বও থাকিত না। এই মত কিন্তু প্রত্যয়বাদ (Idealism) নহে। Existenlialistগণ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। পরন্তু বাহ্য জগতের মধ্যে আমরা অনিচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহাই তাহাদের মত। তাহাদের মতে যে জগতের জ্ঞান আমাদের হয়, তাহা আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ। আমাদের অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে জগৎ আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহা থাকিত না।

কিন্তু বাহ্য জগৎ যেমন সত্য, মানুষের স্বাধীনতাও তেমনি সত্য। মানুষের বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাদ্বারা অর্থবৎ হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অর্থ তাহার প্রতি মানুষের মনোভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক গঠনের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব না থাকিতে পারে, সে সুন্দর অথবা কুৎসিত হইতে পারে, সে সম্ভ্রান্ত অথবা সামাজিক মর্য্যাদাহীন পিতা-মাতার সন্তান হইতে পারে, ইহাতে তাহার হাত নাই। তাহার শারীরিক গঠন অথবা পিতা-মাতাকে সে বাছিয়া লয় নাই। যে দেশে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাও সে নির্দ্ধারণ করে নাই। এই সমস্ত ব্যাপার পরিবর্ত্তিত করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এই সকল বিষয়-সম্বন্ধে তাহার মনোভাব (attitude) কি হইবে, তাহা তাহার ইচ্ছাধীন। দারিদ্র্যকে সে সাদরে বরণ করিয়া তাহার জন্য গর্ব্ব বোধ করিতে পারে, অথবা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করিতে পারে, তাহার জন্য লজ্জিত হইতে পারে। বাহ্য অবস্থা সে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, অথবা তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। তাহার অতীত জীবন-সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অতীত তাহার আলস্যে অতিবাহিত হইয়া থাকিতে পারে;

অতীতে সে বহু অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকিতে পারে। অতীতকে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। কিন্তু তাহার প্রতি তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। অতীতকে ঘৃণা করিয়া, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, সে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু এই অতীত যদি সে স্বীকার করিয়া লইত, তাহা হইলে সেই অতীত এবং যাহার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়াছে, সেই অতীতকে অভিন্ন বলা যাইত না। পাপের জন্য অনুতাপের মূল্য এইখানেই। অনুশোচিত হইয়া পাপ রূপান্তর গ্রহণ করে।

দে-কার্ত্তের "আমি চিন্তা করি", সম্পূর্ণ তথ্য নহে। চিন্তার সহিত সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জড়িত থাকে। বিষয়-বর্জ্জিত কোনও চিন্তা হইতে পারে না। বিষয় অতীত, ভাবী অথবা বর্ত্তমান হইতে পারে, বাস্তব অথবা সম্ভাব্য, অব্যবহিত অথবা পরবর্ত্তী, বাঞ্ছনীয় অথবা বর্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু কোনও না কোনও বিষয় সর্ব্বদাই সংবিদের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। বিষয় সংবিদের বাহিরে অবস্থিত। তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে। বিষয় সংবিদ হইতে ভিন্ন। সংবিদের কোনও আধেয়ই নাই, তাহার মধ্যে কিছুই নাই, তাহা শূন্যগর্ভ। বিষয়ের অভিমুখে গতিতেই সংবিদের বাস্তবতা; বিষয়ের দিকে উন্মুখ হওয়া এবং তাহার জ্ঞানলাভেই তাহার বস্তুত্ব-প্রাপ্তি। স্বাধীনতার ব্যবহার করিয়া যখন আমরা কিছু বাছিয়া লই, তখন যাহা বাছিয়া লই, তাহার সম্বন্ধে একটা বিশেষ মনোভাব অবলম্বন করি—বিবিধ মনোভাবের মধ্যে একটি গ্রহণ করি। ইহার দ্বারাই সংবিদ বিশিষ্ট ভাব প্রাপ্ত হয়—সংবিদ তাহার নিজের সারের সৃষ্টি করে।

জগৎকে অস্বীকার করিতে না পারিলেও তাহার সম্বন্ধে আমরা কি ধারণা পোষণ করিব, তাহা আমাদের ইচ্ছাধীন। যে ধারণা আমরা পোষণ করি, তাহা আমাদেরই সৃষ্টি। সেই ধারণায় জগতের যে রূপ ধরা পড়ে, তাহাই আমাদের বাস্তব জগৎ। এই অর্থে কোনও কোনও Existentialist দার্শনিক বলিয়াছেন, যে আমরা নিজেই জগতের সৃষ্টি করি; এবং জগৎ-সৃষ্টির সঙ্গে আমাদিগকেও সৃষ্টি করি। অনেকে জগৎকে মায়া বলিয়া গণ্য করিয়া সাংসারিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করেন। জগতের প্রতি এই মনোভাবের ফলে জগৎ তাহাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই তাহাদের নিকট তাহার সত্যরূপ। সুতরাং এই জগৎ তাহাদের সৃষ্টি বলা যায়। আবার জগৎকে এইভাবে দেখিয়া, তাহারা আপনাদের বিশিষ্টতারও সৃষ্টি করেন। এই অর্থে তাহারা আপনাদিগকে সৃষ্টি করেন।

আমরা যাহা, তাহাই আমাদের সার বা স্বরূপ। স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া আমরা কি হইব, তাহা আমরা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করি। সুতরাং আমাদের সার—ব্যক্তিগত সার—আমাদের অস্তিত্বের পরবর্ত্তী। কেননা সার যদি বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে যে বাছিয়া লইবে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই থাকা আবশ্যক। কিন্তু ইহা কেবল মানুষের পক্ষেই সত্য। অন্য সকল বস্তুর স্বরূপ পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট (predetermined) হইয়া আছে।

Existentialistগণ কয়েকটি শব্দের বিশিষ্ট অর্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের মতবাদ বুঝিতে হইলে এই শব্দগুলির অর্থবোধ আবশ্যক। Engagement ও Anguish বা Dread এই শব্দগুলির অন্তর্গত।

জগৎ কি, তাহার স্বরূপ কি, আমাদের স্বরূপই বা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যুক্তি দ্বারা যাহা বোধগম্য হয় না, যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে যাহার অস্তিত্ব অপরিহার্য্য প্রমাণিত হয় না, তাহা আমরা বুঝি বলা যায় না। কোনও সারের উপাদানদিগের মধ্যে যখন পূর্ণ সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা বুঝি বলা যায়। তাহার অস্তিত্ব বাস্তব জগতে না থাকিলেও, তাহার শক্য অস্তিত্ব আছে। বাস্তব জগতে রূপায়িত হইলে তাহার প্রকৃতি কি হইবে, তাহা বলিতে পারা যায়। কিন্তু বাস্তবজগতে বর্ত্তমান কোনও বস্তু-সম্বন্ধে এতাদৃশ জ্ঞান অসম্ভব। তাহা আছে, এইমাত্র জানি। কেন আছে, কোন্ যুক্তিবলে তাহার অস্তিত্ব আবশ্যক (necessary) তাহা বোধগম্য হয় না। এই জন্য জগতের অস্তিত্বের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। জগৎ আছে জানি। কিন্তু কেন আছে? জানি না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন? কেন সৃষ্টি করিয়াছেন? উত্তর নাই। Existentialistগণ এই জন্য জগৎকে যুক্তিহীন বলেন (Irrational, Absurd) এবং জগতের এই যুক্তিহীনতা তীব্রভাবে অনুভব করেন। কর্ম্মের ক্ষেত্রে জীবন-পরিচালনের জন্য যে প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহার অভাবের অনুভূতি তাহাদের তীব্রতর। কোন্ কর্ম্ম ভালো, কোন্ কর্ম্ম মন্দ, তাহা আমরা জানি না। যাহাকে সাধারণতঃ ভালো বলা হয়, তাহা কেন ভালো, যাহাকে মন্দ বলা হয়, তাহা কেন মন্দ, তাহার সন্তোষজনক উত্তর নাই। নৈতিককর্ম্মের কোনও আদর্শ Existentialistগণ স্বীকার করেন না। প্রাক্‌দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর অজ্ঞেয়বাদিগণ পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকই মানবত্বের আদর্শে বিশ্বাস করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মেও এই আদর্শ স্বীকৃত। কিন্তু এতাদৃশ কোনও আদর্শ আছে বলিয়া Existentialistগণ স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মানুষকে কি হইতে হইবে, কি ভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহা কোথাও লিখিত নাই। প্রত্যেক মানুষকে নিজে তাহা স্থির করিতে হইবে। জীবনের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথে চলিবার সময় মানুষ অন্য কাহারও অনুসরণ করিতে পারে, সত্য। কিন্তু কাহার অনুসরণ করিবে? তাহা স্থির করিতে হইলে প্রথমে জীবন-সম্বন্ধেই একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে হয়। তাহা সহজ নহে। ফলে মানুষকে একাকী আপনার উপর নির্ভর করিয়া পথ চলিতে হয়। অন্ধকার রজনীতে বিপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে দিক্‌-হারা পথিকের মতো তাহাকে পথ অতিবাহন করিতে হয়। পথ-ভুল ও পদ-স্খলন হইলে নিম্নে অতল গহ্বরে পতিত হইবার সম্ভাবনা। জগতের মধ্যে স্থাপিত হইবার ফলই এই অবস্থা। ইহা হইতে মুক্তি নাই। এই অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া আমাদের করিতে হয়। এই ব্যবস্থাকরণই Engagement। কোনও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগই Engagement। উপরোক্ত অবস্থার মধ্যে আমরা নিক্ষেপ্ত থাকিতে

পারি না। কিছু করি অথবা না করি—কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীনতা উভয়ই—আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ফল। উভয়ই Engagement। যদি কিছু করি, তাহা হইলে তাহার ফলে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যেও আবার কি করিব, তাহা স্থির করিতে হয়। কৃত কর্ম্ম আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে, বুঝিতে পারি না। কর্ম্মের ভাবীফল চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়া যায়। ইহা দ্বারা Engagementএর গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

কিন্তু এই Engagement না করিলে কি চলে না? না, না করিয়া উপায় নাই। কেননা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমাদের মতের অপেক্ষা না করিয়া, আমাদিগকে এই পৃথিবীতে Engage করা হইয়াছে—বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনপথে স্থাপিত করা হইয়াছে। একটা পথ বাছিয়া লইতেই হইবে। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াও সক্রেটিস্ Engage করিয়াছিলেন। জীবাত্মার অমরতার প্রমাণ তাঁহার ছিল না, তবুও তিনি মৃত্যুই বাছিয়া লইয়াছিলেন—আত্যন্তিক বিনাশের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

কিরূপে এই যুক্তিহীন জগতে আমরা নিক্ষিপ্ত হইলাম, তাহা আমরা জানি না। নিক্ষিপ্ত হইয়া দেখিলাম, আমরা এই অপরিজ্ঞাত জগতের মধ্যে বর্ত্তমান। প্রতিপদে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। এক পদক্ষেপে যেখানে পৌঁছিলাম, সেখানে দাঁড়াইয়া আবার কোন্ দিকে পদক্ষেপ করিব, স্থির করিতে হয়। সারা জীবনই এইভাবে Engage করিতে হয়। ইহা একপ্রকার জুয়াখেলা। প্রতিপদে বিপদের আশঙ্কা, কিন্তু তবুও পথ চলিতে হইবে। এই বিপদ-বরণেই আমাদের গৌরব।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোনও আদর্শ নাই। কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ নাই। আপনাদের মত অনুযায়ী জীবন-যাপনেচ্ছু Existentialistদিগের পক্ষে এই আদর্শের অভাব বিশেষ পীড়াদায়ক। কর্ম্মের আদর্শ যাহাদের আছে, তাহাদের এই সঙ্কট নাই। আদর্শ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট, কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না, সে সম্বন্ধে কোনও অনিশ্চয়তা তাহাদের নাই। Existentialistদিগের কর্ত্তব্য-নির্ণয় ভীতিজনক ব্যাপার—বিপদসঙ্কুল পথে অন্ধকারে পদক্ষেপের মতো। এই মানসিক অবস্থাকে তাঁহারা Anguish অথবা Dread (ভয়) নাম দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় ভেষজ-শিল্পের বর্তমান অবস্থা

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম, এস-সি

বিগত ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত ভেষজ সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনে ভারতীয় ভেষজ-শিল্পের বিষয় সমালোচিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এই সভার উদ্বোধন করেন। তিনি সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে দেশীয় গাছগাছড়া, রাসায়নিক প্রভৃতির সম্যক ব্যবহার করে ভেষজ তৈরী করতে উপদেশ দেন। ইহাতে দেশ অনেকাংশে স্বাবলম্বী হতে পারবে। ডাঃ রায় বিশেষ করে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে বলেন। দেশীয় ভেষজ-শিল্পের উপর যাতে আস্থা আসে সে জন্য জনশিক্ষার দরকার। তাঁর মতে ভেষজ-বিজ্ঞানের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং জীববিদ্যা-সবই প্রয়োজন। একজন ভেষজবিদের (Phamacist) ঔষধ-প্রস্তুত ও ব্যবহার উভয় শিক্ষা করতে হবে। উক্ত সভার সভাপতি ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাষণে দেশীয় ভেষজসমূহ যাতে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে তৎপ্রতি সর্বাগ্রে মনোযোগ দিতে বলেন। তাঁর মতে কেবল অভিযোগ করলেই হবে না যে—এ দেশের চিকিৎসকগণ অনেকক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করতে রাজী হন না। এ বিষয়ে ভালরূপ তদন্ত করা আবশ্যক। ডক্টর ঘোষ বলেন যদি ড্রাগকন্ট্রোল আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় এবং ঔষধে ভেজাল কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে দেশীয় ঔষধের উপর জনসাধারণের আস্থা অচিরে ফিরে আসবে এবং প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতবর্ষ সগৌরবে দাঁড়াতে পারবে।

তিনি বলেন, ঔষধ শিল্পে স্বাবলম্বিতা আনতে হলে আলকাতরাজাত (Coaltar) এবং ঔষধে ব্যবহার্য্য রাসায়নিক সমূহ (Fine chemicals) তৈরী করতে প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। কারণ দেশীয় ঔষধ তৈরীর জন্য উক্ত রাসায়নিকসমূহ বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। তিনি ভারতীয় শিল্পসমূহে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এখানে গবেষণার বিরুদ্ধপন্থী দলের কথা উল্লেখ করেন—যাঁরা ঔষধ শিল্পে গবেষণার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। এই বামপন্থী দলের মতে দেশের কাঁচামাল, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির প্রাচুর্য্য, যানবাহনের সুযোগসুবিধা প্রভৃতি আগে দেখে পরে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা উচিত। এঁদের মতে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সরঞ্জাম আমদানী করে আগে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পরে যখন ঐ শিল্পটি ভালরূপ চালু হবে তখন দেশীয় কারিগর প্রভৃতি দ্বারা ঐ শিল্প রক্ষা করতে হবে। ইহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠা হলেও বৈদেশিক সংযোগ অত্যধিক এসে পড়বে। জার্মানী এবং ইংলণ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়লে এই ভ্রান্তধারণা দূরীভূত হবে। বিলাতের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রীর গবেষণা বিভাগ বহু লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাসায়নিক শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে বহু মূল্যবান গবেষণার বিস্তারলাভ ঘটেছে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গবেষণার বিষয় সম্যক আলোচনা করতে গেলে দেখা

ায় পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ঔষধের গবেষণা কার্য্য এখানেই সম্পন্ন য়েছে এবং এই গবেষণা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনষ্টিটিউট ল্যাবরেটরির াবেষণা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। আই, সি, আই এর প্যালুড্রিন এবং ্যামাক্সেন, গাইগির ডি, ডি, টি, মে এণ্ড বেকার ও সিবার সালফনামাইড এবং পার্কডেভিসের ক্লোরোমাইসেটিনের কার্য্যকারিতার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভেষজশিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে বিভিন্ন ঔষধ তৈরী হয়েছে এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ও জীবজানোয়ার এবং রোগীদের দেহের উপর বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে ঐ সমস্ত ঔষধের যথাযথ মান নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশীয় উপাদান হতে বিভিন্ন ভেষজদ্রব্য প্রস্তুত হয়েছে। নারিকেলের মালা, বাদামের খোসা, বাঁশ প্রভৃতি থেকে এক্টিভেটেড কার্বন তৈরী হয়েছে। দেশীয় কেওলিন থেকে রোগীর ব্যবহার্য্য বিশুদ্ধ কওলিন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রজাত গাছড়া থেকে এগার-এগার প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। ভিটামিন ও হরমোন সম্বন্ধীয় গবেষণায় অনেক উন্নতি দেখা গেছে। কডলিভার তেলের ঘাটতি পড়ায় হাঙ্গর-লিভার তেলের ব্যবহার বেড়ে গেছে। শেষোক্ত তেলের ভিটামিন 'এ'র পরিমাণও অনেক বেশী। ভিটামিন 'এ'র সংশোধন এবং ভিটামিন বি, ভিটামিন সি প্রস্তুতকরণ এবং উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক কাজ হয়েছে।

ভারতবর্ষে এড্রিন্যালিন, পিটুইট্রিন প্রভৃতি হরমোনও প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়েছে। এদেশে প্রস্তুত লিভার একষ্ট্রাক্ট-এর পরিমাণ ও মান উভয়েরই উন্নতি সাধিত হয়েছে।

জৈবরাসায়নিক ভেষজ (Organic pharmaceuticals) সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগের ঔষধ তৈরী হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলাতী ঔষধের সঙ্গে উহারা সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে। আবার সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কারও দেশকে গর্বান্বিত করেছে—যেমন ব্রহ্মচারীর ইউরিয়াষ্টিবামাইন কালাজ্বরের মহৌষধ।

এণ্টিবায়োটিক্সের যুগে ভারতবর্ষ একেবারে উদাসীন নেই। ভারতবর্ষে বিভিন্ন গাছড়া, ছত্রাক (Fungus) এবং মৃত্তিকাজ ব্যাকটিরিয়া নিয়ে গবেষণা করে উহাদের এণ্টিবায়োটিক্ শক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। জাতীয় সরকার সম্প্রতি সালফাড্রাগস্, এণ্টিম্যালেরিয়ালস্ পেনিসিলিন প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যক ঔষধের কারখানা নির্মাণে মনোযোগী হয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্য আরও নানারূপ কার্য্যকরী পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করেছেন। আপাততঃ দেখা যায় যে ভেষজ সম্বন্ধীয় গবেষণা নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করেছে বটে, তবে খুব সীমাবদ্ধক্ষেত্রে ঐ সব গবেষণার শিল্প সম্ভাবনা দেখা গেছে। শিল্পই জাতির সম্পদ, সুতরাং গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হবে শিল্পের উন্নতি সাধন।

সেণ্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডক্টর বি মুখার্জি মেদিনীপুরে ইণ্টার ডিষ্ট্রিক্ট ফারমাসিউটিক্যাল কনফারেন্সের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে ফারমাসীর মান নির্ধারণেরও অযোগ্য কর্মীদের হাত থেকে তাহার উদ্ধার-সাধনের আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। কেবল ভেষজশিল্পের বিস্তার সাধন করলেই চলবে না। দেখতে হবে কি করে এবং কত অল্প সময়ের মধ্যে দেশীয় ঔষধের উপর দেশবাসীর আস্থা ফিরে আসে। ডক্টর মুখার্জি বলেন, "ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যাঁরা ভেষজবিদ (Pharmacist) বলে পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং ভেজাল কারবারে বেশ অভ্যস্ত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজদের চিকিৎসক বলে পরিচয় দেন, পকেটে ষ্টেথিস্কোপ বহন করেন এবং মাঝে মাঝে ইণ্ট্রাভেনাস ইনজেকসনও দেন।" ডক্টর মুখার্জি প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞের চেষ্টায় আজ ড্রাগ এক্ট কার্য্যকরী হয়েছে এবং ফারমাসীর আজ নির্দিষ্টমান ঠিক করা হয়েছে। বেনারস, অন্ধ্র, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আগ্রা, আমেদাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ফার্মাসী নির্দিষ্টমানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কম্পাউণ্ডার-শ্রেণীর লোকদেরও নির্দিষ্টমানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মোট কথা আজ দেশের চিকিৎসকগণের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে সক্ষম এরূপ ফারমাসিষ্ট তৈরী হয়েছে এবং শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে আরও বিশ্বস্ত কর্মী সৃষ্ট হবে আশা করা যায়। চিকিৎসকদের দেশীয় ঔষধের দোষারোপের পূর্বে ফারমাসিষ্টদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার এবং ফারমাসী শিক্ষার মান যথাযথ ঠিক হলে তখন দেশী ও বিলাতী ঔষধের তুলনামূলক ব্যবহার করা সমীচীন হবে। দেশীয় ভেষজশিল্পে তখন যুগান্তর আসবে।

১৯৫১ সালে জয়পুরে ইণ্ডিয়ান ফারমাসিউটিক্যাল কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি শ্রী এস, পি, সেন স্বাধীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ফার্মাসীর মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ণনা করেন। ফরমাসিষ্টের ভেষজ প্রস্তুতের বিশুদ্ধতার উপরে চিকিৎসকের সুনাম বহুলাংশে নির্ভর করে এবং একের অপরাধে অন্যের কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী। তিনি ভেষজসমূহের মাননির্ণয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, মাননির্ণয় কার্য্যে দক্ষতা অর্জন করতে হলে ভালরূপ বিজ্ঞান-শিক্ষা করা প্রয়োজন। রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই এই মাননির্ণয় কার্য্য উন্নতস্তরে উঠতে পেরেছে। তিনি গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত ড্রাগস এক্টের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন এবং ভেষজশিল্পের উন্নতিকল্পে বিবিধ সরকারী পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন—গভর্ণমেণ্টের এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

ঔষধের মান নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ফারমাকোপিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি ফারমাকোপিয়ায় নির্দিষ্টসংখ্যক ঔষধের গুণাবলী ও মান লিখিত হয়েছে। ইহাদের মধ্যে আই, পি, এল ; বি, পি ; ইউ, এস, এস ; বি, পি, সি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি ফারমাকোপিয়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং নিজস্ব কয়েকটি ঔষধের বিশেষ পরিচয় তথায় লিখিত আছে। সময়ের সঙ্গে এবং গবেষণায় উন্নতির সঙ্গে ঔষধের মান ক্রমশঃ উন্নত হয়ে চলেছে এবং এজন্য বিভিন্ন ফারমাকোপিয়ার

পুনর্লিখনের প্রয়োজন দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় একই ঔষধের বর্ণনা প্রত্যেক ফারমাকোপিয়াতে কিছু পৃথকভাবে লিখিত হয়েছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেকটি ফারমাকোপিয়ার মান সমান নয়। সম্প্রতি ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেশন (W H O) এ বিষয় দৃষ্টিপাত করেছেন এবং পৃথিবীস্থ ফারমাকোপিয়াসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের ভেষজসমূহের একটা সাধারণ মান নির্ধারণ সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্য ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেশনএর নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কে একটি জরুরী সভা আহুত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল—সকল ফারমাকোপিয়ার একত্রীকরণ ও একটি আন্তর্জাতিক ফারমাকোপিয়া সংগঠন। ইতিপূর্বে একদেশের ভেষজের পরিমাপ অন্য দেশের সহিত অনেক ক্ষেত্রে মিলিত না এবং একই নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ঔষধ ফারমাকোপিয়াভুক্ত ছিল। ইহাতে দেশ ছেড়ে দেশান্তরে যাবার সময় অনেকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ভুলের মধ্যেও জড়িত হত। ভেষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তার ইহাতে ব্যাহত হত এবং ভেষজ-বিজ্ঞান চর্চায় ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হত। ব্যবসা ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হত। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থে পৃথিবীস্থ আটষট্টি জাতির উক্ত সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান (W H O) আন্তর্জাতিক ফারমাকোপিয়া প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন। সম্প্রতি এই আন্তর্জাতিক ফারমাকোপিয়ার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আপাততঃ অত্যাবশ্যক ভেষজসমূহের আন্তর্জাতিক মাননির্ণয়ের একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ইহার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক মানের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না এবং যে সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব, সেখানে এক সমান মান বজায় রাখাই সমীচীন। ইহাতে বিভিন্ন দেশের শিল্পসমূহের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতার ভাব নিয়ে আসবে এবং কোন দেশের ষ্টাণ্ডার্ড বা মান যদি আর এক দেশের মানের থেকে কিছু নিম্নশ্রেণীর হয় তাহাও সংশোধনযোগ্য। ইহাতে কোন দেশের স্বাধীন মনোবৃত্তির অন্তরায় সৃষ্ট হবে বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে যত রকম শিল্প আছে তার মধ্যে ভেষজশিল্পে মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা যত বেশী এত আর কারও নেই। সুতরাং সকল দেশের পক্ষেই এই ভেষজশিল্পের উন্নতিসাধনের সঙ্গে উহার মানোন্নয়নের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ এই মানোন্নয়নের পথে অনেক অগ্রসর হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর ভেষজ সম্মেলনে তাহার আসন কারও থেকে নীচে হবে না আশা করা যেতে পারে।

রাতের গভীরে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের একটা অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো মলয়ার। হ্যাঁ, একটা কচি ছেলের কান্নাই বটে। ডাক্তার মানুষের ঘুমটা সজাগ হলেও সারাদিন চরকীর মত ঘুরে রাতের নিদ্রাটি হতো নিবিড় ও উপভোগের জিনিষ, সামান্য স্বপ্নের খাদও থাকতো না মেশানো, জড়িয়ে যেতোনা কল্পনার জালে ভাঙা ধ্যানের অল্প একটু আধটু টুকরো। বিবাহ করেনি, প্রিয়-বিরহিত সে, আত্মীয়দেরও বেশী আমল দিত না। তার উপর ছিল অফুরন্ত দেহের শক্তি, সুনিয়ন্ত্রিত কাজের শৃঙ্খলা, প্রশংসনীয় মনের স্থৈর্য্য। কিছুতেই সে বিচলিত হতো না, কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারতো না। কলকাতা ছেড়ে বহু দূরে ধূম্র সধূম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নতুন তৈরী শিল্প সহরের একটা মাতৃসদনের সর্ব্বাধিনায়িকা সে। দিনান্তে মহুয়া মাতাল রক্তপলাশের দল তাকে সাঁঝের বেলায় মাদলের বোলের সঙ্গে ডাকে, অস্তসূর্য্যের সঙ্গে তাল রেখে দীর্ঘ গৈরিক পথ হাতছানি দেয়, কিন্তু ঠাসা কাজের বুননে সে আপনাকে ঘিরে রাখে—তার চল্লিশ বছরের মন্থিত মন আপনি মন্ত্রশান্ত সাপের মত নুইয়ে পড়ে। কবছর হলো এই কাজটাই বেছে নিয়েছে সে স্বেচ্ছায়, বিলাত ফেরত এফ আর সি এস্, ডি জি ও—হলেও। অর্থ ও আভিজাত্যের মোহ, দিনে রাতে পশারের স্বপ্ন, অতিকায় সহরের মায়াজাল, মোটা ব্যাঙ্কব্যালেন্স তাকে ধরি ধরি করেও শেষ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল। চলে এসেছিল এইখানে, নিখুঁত ব্যবস্থায় গড়ে তুলেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি গোড়া থেকে। অনেকে বলতো রুক্ষ তার প্রকৃতি, কর্কশ তার ব্যবহার, লালিত্যহীন তার ভঙ্গী, তারাই আবার প্রশংসা করতো তার নিরলস নিষ্ঠার, অক্লান্ত সেবার, অদ্ভুত নিপুণতার। কত মৃত্যুপথযাত্রিনীকে সে টেনে নিয়ে এসেছে বৈতরণীর ওপার হতে, কত শিশু দ্বিজত্ব লাভ করেছে তার হাতে, কত মায়ের গোপন আশীর্ব্বাদ ঝরেছে

চোখের জলের সঙ্গে। কিন্তু নিন্দাস্তুতি তুল্যমৌনী হয়ে যন্ত্রের মত কাজ করে গেছে সে নিঃশব্দে, ঘড়ির কাঁটার মত প্রহরে প্রহরে।

অষ্টাদশী নার্স অমিতার গোপন অভিসার যেদিন হাতে-নাতে ধরা পড়লো, সেই মুহূর্তে তাকে বিদায় দিতে তার একটুও বাধেনি, যদিও সে ছিল তার অত্যন্ত প্রিয় এবং রক্তসম্পর্কের দূর আত্মীয়া। সে কেঁদে বলেছিল—দিদি, আমার কোথাও যাবার স্থান নেই, পরে একটু গুছিয়ে বসলে ও বলেছে বিয়ে করবে—শুষ্ক হাসি হেসে নিরাসক্ত কণ্ঠে মলয়া বলেছিল—আচ্ছা, সেদিন নিমন্ত্রণ পত্রটী পাঠিয়ো, এখন যাও, একঘণ্টার মধ্যে নার্স-কোয়ার্টার ছেড়ে যাবে, নইলে দরোয়ান্—

আবার যেদিন কম্পাউণ্ডার শ্রীচরণের নামে নালিশ হলো মিকশ্চারের বদলে টিউবওয়েলের খাঁটি জল সরবরাহ হয়েছে ফ্রিওয়ার্ডে, সেদিন পুলিশের আসতে আধঘণ্টাও দেরী হলো না। বাসায় এসে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল শ্রীচরণের সাতাশ বছরের স্ত্রী, সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বলেছিল—মা, সাতসাতটি কচিকাঁচার মুখ চেয়ে এবারকার মত মাফ করুন, মুখের অন্ন কেড়ে নেবেন না, ভগবানের দোহাই······

স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ধমক দিয়েছিল মলয়া—সাতাশ বছরে সাতটি শিশুর জন্য দায়ী কি একলা ভগবানই? যান, যখন তখন তাঁর নাম নিয়ে তাঁকে অপমান করবেন না, বেরিয়ে যান্—

হ্যাঁ, কচি ছেলের কান্নাই বটে। এই সব ঝামেলা থেকে রাত্রের বিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন করবার জন্যই হাসপাতাল থেকে দূরে তার বাড়ী পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। কাছে নার্সদের আস্তানা, কিন্তু সেখানে শিশু আসবে কোথা থেকে—অন্ততঃ সেটা যে নীতি ও রীতিবিরুদ্ধ এটা ত সকলেরই জানা কথা। বিছানায় উঠে বসল সে, খোলা জানালার দিকে এগিয়ে গেল—দেখতে পেলে দূরে দোতালার বারান্দায় একটি ছোট ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুরছে একটি নার্স এবং মাঝে মাঝে লুকিয়ে যেন চুমুও খাচ্চে তার টুকটুকে লাল গাল দুটিতে। ভেবেছে গভীর রাত্রে সুপারিনটেনডেন্টের শ্যেন চক্ষু এই ডিসিপ্লিন-ভঙ্গ দেখতে পাবে না। না, এ চলবে না, এ ত শুধু নিয়মভঙ্গ নয়, স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতা, ভাবালুতার প্রশ্রয়, হয়ত বা নীতির পথ থেকেও স্খলন। মলয়া ভাবতে চেষ্টা করে, কার কার ডিউটি আজ, কে হতে পারে—মনে হচ্চে সেই নবনিযুক্তা মাদ্রাজী নার্স মেরীঅম্মল, গণ্টুর জেলায় বাড়ী, বালবিধবা, একটি ছেলে ছিল, তাও সম্প্রতি মারা গেছে, আত্মীয়-স্বজনরা দিয়েছে তাড়িয়ে, পেটের দায়ে নার্সিং শিখে এখানে এসেছে।

তখনি কি একটা হেস্তনেস্ত করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মলয়া, চোখে পড়লো সামনের বিস্তৃত দিগন্তটা—নিঝুম নিথর পাহাড়ের গভীর কালো কোলে ডুবে রাত্রির তামসী তপস্যার রূপের ছটা। মহাকাল যেন মহাকালীকে কোলে নিয়ে ধ্যানের নৈঃশব্দে ডুবে গেছেন। কালোর মধ্যেও কোথায় যেন একটা মালিন্যহীন আলোর অভিসার। কবিত্ব করার মত বাতিক কোনদিনই তার ছিল না, বয়সও নেই, তবু সে চেয়ে চেয়ে দেখে, কেন এতদিন চোখে পড়েনি সে কথাও ভাবে। নীল আকাশ জুড়ে হাজার হাজার তারার দীপ্তি, আর পাহাড়ের পর পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য জোনাকির ফুটকি—কালো রাত্রিকে যেন চুমকী বসানো নীলাম্বরী পরিয়ে চিন্ময়ী করে তুলেছিলো। ওদিকে মৃন্ময়ী মায়ের বুকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে একটা অস্পষ্ট ছায়ার রেখা। নগ্নিকার নিরাবরণ বুকে যেন নিরাভরণ বাঁধন পড়ছে কার নিরাবিল পরশে। সারাদিনের কলরবে ক্লান্ত তপ্ত মেদিনী রাতের গভীরে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছে এই রসস্পর্শের কাছে।

বুকটা কেমন করে উঠলো মলয়ার, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেইদিকে চেয়ে, ভাবলে—নাঃ থাক্ আজ, কাল সকালেই যা হয় করা যাবে—

বিছানায় ফিরে এসে নিজেকে এলিয়ে দেয় সে—কিন্তু তার এতদিনের সাধা ঘুমে বাধ সাধলো কে—এ কী হলো তার, হজমের বৈলক্ষণ্য, না রক্তের চাপবৃদ্ধি, না বয়সের দোষ। বয়সের কথায় মৃদু হাসি আসে তার। চল্লিশটি বসন্ত পিককুহরিত হয়ে তার বুকের উপর দিয়ে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ করে চলে গেছে, বলে গেছে—শুনিতে পাও কি? সময় কোথা শোনবার? কেনই বা শুনবে সে, সে ত কবি নয়, কবিপ্রিয়া নয়, ভাববিলাসিনী নয় যে ফাগুন দিনের আগুন-রাঙা রাতের কল্পনায়, নববর্ষার উতল ধারায়,

রেবার ধারে বেতস তরুতলে তার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবে, একটু ঔৎসুক্য উৎকণ্ঠা প্রতীক্ষাজড়িত বুকের দ্রুততালে হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠবে, দুটি কচি কচি হাতের নরমস্পর্শে জাগিয়ে তুলবে শিরায় শিরায় রক্তে তন্ত্রীতে মত্ত এণ্ডোক্রাইনের তাণ্ডব।

মলয়ার বাল্য-কৈশোরের সবটা ও সদ্য-আগত যৌবনের কিছুটা কেটেছে মফঃস্বলের এক মহকুমা মহলে অর্থাৎ এমন একটা জায়গায় যেখানে না আছে সহরের সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য, না আছে গ্রামের শান্ত অবসর বা আবরু। তাদের ছিল সেকালের নিয়মে বিরাট্ পরিবার, খুড়োজেঠা ভাই ভাগনে পিসতুতো মাসতুতো নিয়ে বড় যৌথ সংসার। বাপ রামসদয়বাবু একেলে 'ল্' পাশ হলে কি হয়—জবরদস্ত মোক্তারের জামাই, যাঁরা শুধু কথার তুবড়ীতে, কলা-কৌশলের প্যাঁচে, টাকার জোরে আর লাঠির দাপটে দিনকে রাত, সাদাকে কালো করতে পারতেন্। এ হেন শক্তিধর শ্বশুরের মত যদিও বেপরোয়া বক্তৃতাবাহাসজেরা, আইনের মনগড়া ভাষ্য করতে পারতেন না রামসদয়বাবু,—যেন চক্ষুলজ্জায় বাধতো—কিন্তু ছেঁড়া গাউনের মধ্য থেকে হাত বের করে সুড়ুক্ করে কয়েকটা টাকা কি রকম ভাবে হস্তগত করতে হয় সে সন্ধানটা জেনে ফেলেছিলেন। কি রকম করে হাকিম দারোগা অফিসারদের সন্তুষ্ট করে কাজ হাসিল করতে হয় সেটাও শ্বশুরের সুশিক্ষায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলেও কিছুটা রপ্ত হয়ে উঠেছিলো। তাইতেই সস্তা-গণ্ডার দিনে হেসে খেলে চলে যেতো ভালভাবেই পাঁচজনকে খাইয়ে পরিয়ে ক্রিয়া-কর্ম্ম করেও। হুঁকো হাতে শ্বশুর-মহাশয় পই পই করে বলতেন্—বাবাজী শুধু পেনাল কোড আর ফৌজদারী কার্য্যবিধি মুখস্থ করে 'ল' পাশ করলেই পশার জমে না,—সেবার হ্যামিলটন্ সাহেব কি গুঁতোটাই দিলে, আমাকেই চালান্ দেয় আর কি—ঐ যে চড়কহাটার বাবুদের চরের মামলাটায়—এই শর্ম্মাই শেষ পর্য্যন্ত লড়ে উদ্ধার করে নিয়ে এলো মেজবাবুকে, তিনমাস কলকাতায় বসে জ্যাকসন্ সাহবেকে তালিম দিই—তোমার বিয়ের খরচটাত ওতেই জোগাড় হলো, তোমার বাপের কি ধনুক ভাঙা পণ—নগদ হাজার টাকা আর ষাট ভরি সোনা চাই বেহাইমশাই, আমার চারটে পাশ-করা ছেলে—ঝাড়ু মারি পাশের মাথায়—হুঁ বা বলছিলাম বাবাজী, হাজার হোক্ বেয়াইমশাই প্রাতঃস্মরণীয় লোক……

বাড়ীতে কিন্তু মোক্তারকন্যা মলয়ার মারই ডিক্রী চলতো দাপটের সহিত। মহাতান্ত্রিক মোক্তার মহাশয় আসনে বসে কারণ করে একমাত্র মেয়ের নামকরণ করে-ছিলেন 'প্রাণমঞ্জরী'। তান্ত্রিক সাধনার ফলেই হোক্, আর নামের গুণেই হোক্—তাঁর মধ্য দিয়ে আরো নয়টি প্রাণ মুঞ্জরিত হয়ে সংসারকে বেশ গুঞ্জরিত করেছিল। নবরত্নের জননী হেঁসেল ও আঁতুড়ের মাঝেও সংসারের হাল শক্ত করে ধরে নৌকো বাণচাল্ হতে দেন নি। মলয়া ছিল নিত্য স্মরণের পঞ্চকন্যার তৃতীয়া। ছেলেবেলা থেকেই সে ছিল বাপের ঘেঁষা। মাও তাকে কেন যেন বেশী আমল দিতেন না, কোথায় যেন একটু যুক্তি ছিল অবচেতনে। তাঁর নিরুপদ্রব জননী-জীবনে সন্তান জন্মকালে একবারই উপদ্রব ঘটিয়েছিল মলয়া, হয়েছিল যমে মানুষে টানাটানি। তা ছাড়া পর পর দুইটি কন্যা উপহার দিয়ে মলয়ার মা লোক গঞ্জনার ভয়ে সেবারে তীব্রভাবে পুত্র কামনাই করেছিলেন, কিন্তু পুত্রের সমস্ত বৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মশক্তি নিয়ে যে সন্তানের আবির্ভাব হলো তাকে প্রসন্নমনে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি।

বেশ ঘটা করেই পর পর দুটি মেয়েকে তেরোয় চোদ্দয় পার করে কিছুটা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন রামসদয়বাবু। কয়েকটা বছর একটু হাঁফ ছাড়ার জন্যও দরকার, এই ভেবে একটু বেশী বয়সেই মলয়াকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন তিনি। অপর দুই মেয়ে পড়েছিল বিশুদ্ধ সনাতন মতে মহাকালী পাঠশালায়। তাদেরই সঙ্গে সে মানে না বুঝে উচ্চারণ করতো উদাত্ত সুরে "অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়াপ্রতিগ্রাহিত গন্ধমাল্যম্।" জায়ার মানেও সে বুঝতো না তখন, রাজ্ঞী সুদক্ষিণার ব্রতের কথাও পড়ে নি, কেন তিনি উপোষিত নয়ন নিয়ে চেয়ে থাকতেন পথের দিকে।

তাকে এতদিন ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি না করার বিরুদ্ধে মায়েরই আপত্তিটা ছিল প্রবল। তখন কিন্তু সহরে সহরে সয়োজনলিনী সমিতির প্রচার চলেছে খুব। বিশেষ করে হাকিমদের উৎসাহেরও অন্ত ছিল না স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে। বাপের আধুনিক মনেরও সাড়া ছিল এদিকে বেশ।

মোক্তার-কন্যাকে বুঝিয়ে দিতে দেরী হলো না যে হাকিমদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখার অর্থকরী একটা দিকও আছে। মলয়া গড় গড়িয়ে পেরিয়ে গেলো ম্যাট্রিকুলেশনের সিংহ দরজাটা সসম্মানে, জলপানী পেয়ে। বিশেষরূপে তাকে বহন করবার লোকের তখনও অভাব, আর তার জন্য অর্থেরও, তাই কলেজের দরজাটাও খুলে গেলো বিনা আয়াসেই।

সবাই বল্লে, আই-এসসি নিলি যে? মলয়া জবাব দিয়েছিল—বা, ডাক্তারী পড়বো না। আঁতুড় ঘর থেকে মা মন্তব্য করেছিলেন—আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না।

ডাক্তারী পড়ার প্রেরণাটা সে এইখানেই পেয়েছিল। ছেলেবয়স থেকে দেখে এসেছে সে নিজের ও অন্য পরিবারের কত প্রসূতির বিপদ আপদ, কত জ্বালা যন্ত্রণা, কত মায়েরা চলে গেছে শিশুদের ফেলে, কত শিশু করেছে অকাল-প্রয়াণ। বিশেষ করে তার মনে দাগা দিয়েছিল তার মেজদির কথা। ভারী ভাব ছিল দুজনের, প্রায় পিঠোপিঠী বল্লেই হয়। ষোড়শী মলয়া যখন ম্যাট্রিক্ দিয়ে বাড়ীতে বসে, তখন ন'মাসের একটি রুগ্ন ছেলেকে যম দেবতার হাতে নৈবেদ্য নিবেদন করে তার মেজদি এলো পুনরায় পুত্র-সম্ভবা হয়ে। শ্বশুরের আলয়ে সংসারের সেবাতেই কেটেছে সাধ্বীর দিন ও রাত। সময় ও স্বাস্থ্য উপছে ওঠবার আগেই ঝরে গেছে রূপ ও যৌবন। মরণাপন্ন অবস্থায় যখন সে পৌছল পিত্রালয়ে, তখন ভিতরে ভিতরে নানা অত্যাচার অনাচারের জড়িত ইতিহাসে ও রক্তাল্পতায় তার মাত্র আঠারো বছরের দেহযন্ত্রটা বেশ বিকল, শিকল ছেঁড়বার উপক্রম্। মন্ত্র তন্ত্র তাগা তাবিজ কিছুটা ওষুধপত্র তাকে কয়েকদিন ধরে রাখলেও শেষ পর্য্যন্ত হার মান্‌লে। তখনো বেরোয়নি ফলিক্ এসিড, রক্ত সঞ্চালনের প্রাণদায়িনী ধারা, পেনিসিলিন্, অরোমাইসিন্। বেরুলেই বা কি হতো।

মরবার একদিন আগে মলয়াকে কানে কানে বলেছিল তার মেজদি—

"জানলি, মলি, বাঁচতে যদি চাস্ বিয়ে করিস নি, অন্ততঃ এখন নয়, মেয়ে হওয়ার বড় জ্বালা, বল দিকিন্ আঠারো বছর বয়সে মরতে ইচ্ছে করে কারো, আচ্ছা সত্যি আমার খোকনকে সেখানে দেখতে পাবো?"

সেই দিনই মলয়া স্থির করেছিল, বিয়ে নয়, ছেলেপুলে নয়, সংসার নয়।

মনের এই অদ্ভুত রোমন্থনে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল সাদাসিদে চেহারার আর একটি মানুষ। পাঁচজন বাঙালীর মতই অম্লান্। তেইশ বছর আগেকার এই শান্ত প্রাক্‌প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চেহারার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য মনে পড়ে না, শুধু রগ ঘেঁষে টাক ছাড়া আর যেন কোন গভীরে ডুবে যাওয়া চোখ দুটো। সেকেণ্ডইয়ারে ছুটীর পর কলেজে গিয়ে দেখে তাদের বাংলা ক্লাস নিচ্চেন্ বিরাজ চক্রবর্ত্তী। তাঁর বলবান ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য, আবেগ জড়িত নিষ্ঠা প্রথম দিনেই তাঁকে ছাত্রছাত্রীমহলে প্রিয় করে তুলেছিল, কালে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগে সেটা প্রিয়তর হয়ে উঠেছিল। প্রিয়তমও যে হতো সে ইঙ্গিতও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু বিরাজ চক্রবর্ত্তী যেমন হঠাৎ এসেছিলেন একদিন, তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন কারুকে কিছু না বলে। পোষ্টম্যান নিয়ে এলো শুধু পদত্যাগপত্র। একদিন মলয়া বলেছিল—আপনার লেখা নিজে পড়ে যত না আনন্দ পাই, তার চেয়ে বেশী পাই আপনি পড়লে, সমস্ত বক্তব্যটা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে—দরাজ গলায় হো হো করে হেসে তিনি বলেছিলেন—ধরে ফেলেছো, ভালো "এ্যাক্টো" করতে পারি, তুমি মোর পেয়ে গেলে পরিচয়—

তাঁর চলে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েছিল মলয়া, কিন্তু কয়েকমাস তার জন্মদিন স্মরণে যেদিন এলো রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা আর কয়েক লাইন আশীর্ব্বাদ, সেদিন তার সব ব্যথা যেন জুড়িয়ে গেল। চিঠিতে লেখা ছিল "আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে কিন্তু পথের শেষ কোথায়? তবু রেখে গেলাম পায়ের চিহ্ন ধূলোর পরে—সেই ধূলোই আমার সাথী। কবি বলেছিলেন না, 'মোর স্মৃতি যদি মনে রাখো কভু এই বলে রেখো মনে, ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও বা ধরে নাই এ জীবনে'—ফুল ফুটে যদি ফল না ধরে তার যে কী ব্যথা আজ তুমি বুঝবে না। তোমার চেয়ে অনেকদিনের অগ্রজ আমি, দুটো যুগের ব্যবধান, তাই তোমাদের হয়ত ঠিক বুঝতে পারি না, তবু জানি যে যুগেই জন্মাও, যুগধারা নিয়ে যাবে একটা কিছু বড়র আশ্রয়ে ধর্ম্মের নিষ্ঠায়, জ্ঞানের মুক্তিতে, মানুষে মানুষে মিলিয়ে যে মহাদেবতা তাঁরই পাদপীঠে। আশীর্ব্বাদ করি

কল্যাণ হোক্, সে কল্যাণ কিসে নিজেই বোঝো—পায়ের তলায় পথ আপনি জাগুক্”—

এই উদাসীন গতব্যথ লোকটির প্রাণশক্তি কোথায় প্রচ্ছন্ন—ধরতে পারতো না মলয়া অথচ তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। বুঝি বুঝি করে বুঝতে পারতো না মলয়ার বুদ্ধিজীবী মন।

ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার পর নতুন করে জোর তাগিদ উঠলো মলয়ার বিয়ের। সংসারের আয়ের খাতে যে বড় চিড় ধরেছে সেটা বুঝতে মলয়ার বাকী ছিল না, তার মায়েরও না। যেদিন সে শুনলে যে মায়ের বিশেষ ইচ্ছায় মেজদির শূন্য আসনটা পূর্ণ করবার জন্য চেষ্টা চলছে, সেইদিনই সে কারুকে কিছু না বলে সোজা চলে এলো কলকাতায় দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। যে দুএকটা সোণার টুকরো গায়েছিল তাই বেচে ও স্কলার-শিপের উপর নির্ভর করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকলো সে। যখন তার অন্তর্ধানের কথা জানা গেলো তখন সারা বাড়ীতে সে কী জিহ্বার আলোড়ন, সর্পিল কলরব—

মুখপুড়ী, হতচ্ছাড়ী, এত বড় বংশের নাম ডোবালে গা, মেয়ে না ধিঙ্গী, কার না কার সঙ্গে সরলো, মদ্দা মেয়েমানুষ, লেখাপড়া শিখলেই এই হয়, পাপপুণ্যি জ্ঞান নেই, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিশেষণে বিকষিত হয়ে শব্দবাণগুলো লক্ষ্যবেদ করতে পারলে না, শুধু ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। মায়ের জরুরী চিঠি গেলো আত্মীয়ের বাড়ী—তখনই কলঙ্কবতীকে দূর করে দিতে। তাদের মুখের পাণ্ডুর ছায়া দেখেই মলয়া কোন কথা না বলেই চলে গিছলো এক মেয়েদের মেসে, অনেক কষ্টে জোগাড় করেছিল দুটো টিউশানী।

বাপই শুধু কোন কথা বলেন নি। শুধু বেনামীতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতেন—আর এক লাইন “ভাল আছিস্ ত. মা”। মায়ের দাপটে তার বেশী তাঁর কিছু করবার ছিল না বুঝতো মলয়া এবং বাপের আয়ের দিকটা যে দ্রুত নামছে সে কথাও। মা স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন—মেয়ের নাম করো না আমার কাছে—সে মরে গেছে—

বিরাজবাবুকে বিয়ের কথা লিখেছিলো মলয়া, তিনি জবাব দিয়েছিলেন—বিয়ে করা উচিত কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, আমি ত করিনি, কিন্তু যে কাজ, যে বৃত্তিই নেওয়া যাক্ তাকে যদি সহজ সরল ও সত্যভাবে গ্রহণ করা যায় তাহলেই তার সার্থকতা। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক এতো জীব-ধর্ম্মের অতি আদিমতম প্রশ্ন, আমরা সবাই যে অর্দ্ধনারীশ্বর দুইয়ে মিলিয়ে এক্। সাহানা রাগিণীতে সানাই বাজলো, চন্দনচর্চ্চিত হয়ে টোপর মাথায় বর এলো ফুলের মালা গলায়, সিঁথিমৌর মাথায় দেওয়া কন্যা বসলো পিঁড়িতে—সেইটেই যেমন বিয়ের প্রথম কথা নয়—তেমনি সংসারের রথ কি ভাবে চললো মৃত্যুতীর্থের দিকে, কটা ছেলেমেয়ে হলো, কত ধকলধাক্কা খেতে হলো—সেইটেই দাম্পত্যজীবনের শেষ কথা নয়। শুধু এই কথা বলবো যে সকলেই যে প্রকৃতির দৈব কার্য্যে সহায়তা করবে তাও নিয়ম নয়। কিন্তু মধুরের সাধনা সবাইকেই করতে হবে, হয়ত রূপ বদলাবে অধিকারী-ভেদে, পাত্রগোত্র মিত্র বদলাবে, রস বদলাবে, এ বাঁধন থেকে মুক্তি নেই স্বয়ং ভগবানেরও। এ জিনিষকে বুঝতে গেলে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের দরকার, মনকে ফাটকে আটক্ রাখলে চলেনা, তাকে আগে খালাস করতে হয়,—সহজ হতে হয়, সত্তাকে বিস্তৃত করতে হয়—সব সমস্যার সমাধান সেইখানে”

তবু কোথায় যেন খটকা থেকে যায় মলয়ার। জীবন-ধর্ম্মের তাগিদে সে দ্রুত এগিয়ে চলে সাফল্য থেকে সাফল্যে। টকটক্ করে পাশ করে বিলেত ঘুরে এসে সে পশার জমিয়ে বসে, গরীব দেশে মোটা ফিওয়ালা বড় ডাক্তার। তবু কখনও কখনও বিরাজবাবুর কথাগুলো মনের অবচেতনে ঘুর পাক খায়। মাঝে মাঝে ভাবে, মায়ের অভিশাপ কি বর হয়েই ফলেছে, নবজন্ম কি তার হয়েছে।

শেষ বয়সে বুড়ো বাপ এসে তাকেই আশ্রয় করেছিলেন। মায়ের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও অন্য ভাই-বোনদের মানুষ করা থেকে সমস্ত ভারই সে নিজের স্কন্ধে সানন্দে স্বেচ্ছায় নিয়েছিলো। কিন্তু তবু মনের দ্বন্দ্ব মেটে নি। মৃত্যুকালেও মা তাকে ডাকেন নি, সেও যায় নি। দেশেও যায়নি শুধু একটিবার ছাড়া। তাও যেতো না, শুধু বুড়ো বাপকে এসে ধরে পড়েছিল একটি জানা-শোনা ভদ্রলোক এবং তিনি কথা দিয়ে ফেলেছিলেন।

ময়লা রাগ করে বলেছিলো—"এসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না বাবা।" মেয়ের কথা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আর কোনদিন দেশের কোন লোককে চিকিৎসার জন্য তিনি অনুরোধ করেন নি। রোগিণী মেয়েটির সব ইতিহাস শুনে তার স্বামীকে মুখের উপর বলেছিল—এবারে না হয় চেষ্টা চরিত্র করে বাঁচিয়ে দিলাম—ভবিষ্যতে বাঁচাবে কে, সেটা ভেবেছেন কি? যদি সম্মতি দেন যে একে শল্য চিকিৎসায় সন্তান ধারণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবেন, তবে এই অষ্ট সন্তানের জননীর চিকিৎসার ভার নিতে পারি। তার পর বাপের দিকে চেয়ে বলেছিল—এই পোড়া-দেশে যে কটা না জন্মায় সে কটাই বাঁচলো। বাপ মুখ নীচু করে শুনে গিয়েছিলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন এক কথায় প্রকাণ্ড প্র্যাকটিস্, অজস্র অর্থোপার্জ্জন, মান যশ সব ফেলে রেখে সে চলে এলো এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী হয়ে। সবাই হায় হায় করে উঠলো—দশ হাজার টাকার প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়ে গেলো, বিয়ে না করলে মেয়েদের দায়িত্ব-জ্ঞান হয় না। সেই সময়ই বিরাজবাবুর শেষ চিঠি সে পেয়েছিল—"আজ আমি হিমালয়ের পথে যাত্রী, ঐ তুষার কিরীটি উত্তুঙ্গ গিরিশিখর আমায় ডাকছে—দেবতাত্মা নগাধিরাজ, বুঝতে পারি কেন আমাদের শাস্ত্রকাররা পাহাড়ের পারে সমুদ্রের ধারে নির্জ্জন নদীতীরে তপস্যায় বসতেন। সেই বিরাটকে স্বরাটকে প্রকৃতি নিজে ধরিয়ে দেন এইখানে, সেই মহান্ত পুরুষকে। কিন্তু আবার ভাবি—সংসারের কোলাহলের হলাহলের মধ্যেও তাঁর নিত্য আসন ত পাতা আছে। সহর থেকে আকাশের দিকে তেমন করে চাইলে কি চোখে পড়ে না, মহাকর্মের মহাজালে বাঁধা এই মহা-তান-পুরায় সাধা বহুকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সুরটি। কেবলই কি লাটিমের মত ঘুর পাক খাবো। তুমি ভাবছো গতানুগতিক ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে, ডুবিয়ে দেবে নিজেকে কর্ম্মের বন্যায়, আমি ভাবছি সারাজীবনের বৈরাগী মনকে আবার যদি খাঁচায় পুরতে পারতাম, একটা লোককেও যদি একান্তভাবে আপনার করে নিতে পারতাম। যে রং আমার চোখে লেগেছে সে রং যদি পাকা রং হতো—"

হঠাৎ তার মনে পড়ে, কোথায় সেই সৌম্য ভদ্রলোক—তিনি কি এখনও পাহাড়ে জঙ্গলে পরশপাথরের খোঁজে বেড়াচ্ছেন। মনে মনে অনেক প্রণাম জানায় সে। তার পর শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠেই স্মরণ হয় কাল রাতের সেই ছোট্ট ব্যাপারটা। দিনের আলোয় নিজের মনস্তাত্ত্বিক রোমন্থনে সে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

মাদ্রাজী নার্স ও ছোট ছেলেটিকে হাজির করা হয় মায়িজীর দরবারে। রোগা কালো মেয়েটি ভয়ে সিঁটকে গেছে। কিন্তু তিন দিনের গোত্রহীন জারজ দেবতাটি নিঃশঙ্ক ও বেপরোয়া। হাত-পা নাড়ছে নিশ্চিন্ত হয়ে, কুতকুত করে চাইছে।

কর্ত্রীর শাসনের সে অপেক্ষা রাখে না। অজ্ঞাত-ভুবনভ্রূণ থেকে কামনার টানে ছিটকে-পড়া একটি সদ্যস্ফুট স্ফুলিঙ্গ, এক ফুঁয়ে নিভে যাবে না আহিতাগ্নি হয়ে জ্বলবে?

হঠাৎ মনে হয় বিরাজবাবুই প্রশ্ন করছেন।

মলয়া জিজ্ঞাসা করে—ছেলেটি কার, কবে হাঁসপাতালে এসেছে? মা কোথায়—

খবর পেলে, কয়েকদিন পূর্ব্বে মাকে রাস্তা থেকে তুলে এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে এসেছিল। তিনদিন পূর্ব্বে প্রসব হয়, কাল রাত্রে মারা গেছে—মরবার আগে মেরীঅম্মলকে হাত ধরে কি যেন বলতে চেয়েছিল, বলতে পারেনি। মেরিঅম্মলই লুকিয়ে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছিল শিশুকে।

সব শুনে হাকিমের কড়া হুকুম হোল শুধু তার পদচ্যুতির নয়—ছেলেটিকে শিশুসদনে পাঠাবার। কেঁদে ফেললে মেরীঅম্মল, ছেলেটাকে বুকে টিপে ধরে বললে—না, না—

কিন্তু তার পর মলয়াই একটা কাণ্ড করে বসলো, বল্লে—ঐ ছেলেটাকে নিয়ে আমার বাড়ীতেই থাকবে। মেরী অম্মল, হাঁসপাতালের কাজ নয়, আমার নিজেরই কাজ করবে।

মলয়ার চোখে একটু জলের আভাস। তার দৃষ্টি চলে গেছে পাহাড় পেরিয়ে—সে যেন দেখতে পাচ্ছে বিরাজবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন দূরে, অতিদূরে, হিমালয়ের তুষার উষ্ণীষ তার মাথায় কপালে শ্বেত চন্দনের ছাপ, গলায় বেলফুলের মালা। শুভ্রতার ভেতর মহলে গিয়ে সাদায় তিনি ডুবে যাচ্ছেন।

ঋষি বঙ্কিম-ভবন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রভুত্ব, তাদের অত্যাচারে, উৎপীড়নে, লুণ্ঠনে, পাশবিকতায় সমগ্র ভারতবাসীর জীবন বিপর্য্যস্ত। ভারতে ভারতবাসীর বাকরুদ্ধ, স্বাধীন চিন্তাধারা অবদমিত —মনুষ্যত্বের দাবী করা অন্যায়, এমনি দুর্দ্দিনে শস্যশ্যামলা বাঙ্গলার অগৌরবময় পল্লীর এক নিভৃত কোণ হ'তে ঋষি কবির প্রাণ কেঁদে উঠল—অপরাজেয় পরিণামদর্শী লেখনীর মুখে উদাত্তকণ্ঠে নির্ঘোষিত হল—'বন্দেমাতরম্'। পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করবার জন্য ভারতবাসীর হাতে দিলেন সংগ্রামের হাতিয়ার—'বন্দেমাতরম্'। সমগ্র বাঙ্গলা—তথা ভারতবাসী নব শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল। জাতির দীক্ষাগুরুরূপে পরিগণিত হ'লেন বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। 'দ্বাত্রিংশকোটি' ভারতবাসী এই অমোঘ মন্ত্রে প্রণোদিত হয়ে স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিল।

শুধু তাই নয়—বাঙ্গলা ভাষা যখন অপাংক্তেয়, সংস্কৃত সমাসবহুল দুরূহ শব্দভারে জর্জ্জরিত, মাধুর্য্যহীন; তখন ঋষিকবি সর্ব্বপ্রথম সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গলায় প্রথম মৌলিক উপন্যাস রচনা করে বাঙ্গলা সাহিত্যে নব জাগরণের সূচনা ক'রলেন। তিনি একাধারে কবি, ঋষি, ঔপন্যাসিক—নব জাগরণের পুরোহিত। তাঁর জন্মস্থান নৈহাটী—কাঁঠালপাড়া আজ সমগ্র ভারতের তীর্থক্ষেত্র। গত ৬ই জুন এই তীর্থক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার সম্মুখস্থ ময়দানে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহশালা'র উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রাক্তন পূর্ত্তসচিব কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। সভাপতি সভার প্রারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকারকে দান করেন বলে ঘোষণা করেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকারের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন এবং এই বৈঠকখানাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহশালা নামে অভিহিত করেন।

বহু ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত এই সংগ্রহশালা। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রেলকোম্পানী yard বাড়াবার পরিকল্পনা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাটির সমগ্রাংশ গ্রাস করতে চাইল। বাঙ্গালীর সরস হৃদয়ে কুঠারাঘাত হ'ল। জাতির দীক্ষাগুরুর স্মৃতি অবলুপ্ত হ'বে—এটা বাঙ্গালীর প্রাণকে ব্যথিত ক'রে তুলল। নৈহাটী-কাঁঠালপাড়াবাসী প্রতিবাদ জানাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি স্বর্গীয় হীরেন দত্ত জনমত গঠন করে কোম্পানীর কায়েমী স্বার্থকে বানচাল ক'রে দিলেন। খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক বালগঙ্গাধর তিলকের সুযোগ্যতম শিষ্য শ্রীএন, সি, কেলকার গভর্ণমেণ্টের এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। চারিদিক হ'তে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠল। কোম্পানীর এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হ'ল। বঙ্কিমের স্মৃতি কালের গর্ভে যাতে বিলীন না হয়, সেজন্য বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী বৈঠকখানাটি ক্রয় ক'রবার জন্য উদগ্রীব হ'ল। বঙ্কিমের চারজন দৌহিত্রদের মধ্যে তিন জন এর বার আনা অংশ বিক্রয় করলেন বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীকে এবং অপর এক দৌহিত্র এর একচতুর্থাংশ দান ক'রলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে। কিছুকাল পরে সাহিত্য পরিষদ, অপর ক্রীত অংশগুলো দান হিসেবে গ্রহণ ক'রলেন উক্ত সাহিত্য সম্মিলনীর নিকট হ'তে। বলা বাহুল্য এই দানপত্র দু'খানা রেজেষ্ট্রী করা হয় যথাক্রমে ৬-৭-১৯৩৮ ও ২২-৭-৩৮ সালে। অতঃপর সাহিত্য পরিষদের নৈহাটী শাখার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এ ভবন গড়ে উঠল শাখা-পরিষদের কার্য্যালয়রূপে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে বঙ্কিম-ভবনের জীর্ণতা দেখা দিল—পরিষদের অর্থানুকূল্য না থাকায় আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নৈহাটী শাখার পক্ষ থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলাম ও তাঁর পূত স্মৃতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন জানালাম। পরিষদ ও সরকারের মধ্যে বহুদিন যাবৎ পত্রবিনিময় হ'ল। পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি, ভূতপূর্ব মন্ত্রী কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও আমার মধ্যে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎকার হ'ল—সেই সাক্ষাৎকালে আলোচনা চলল বঙ্কিম সংগ্রহশালা স্থাপন নিয়ে। একদিন রাজ্য-সরকারের দপ্তরখানায় সাক্ষাৎকালে উক্ত মন্ত্রী মহোদয় আমাকে জানালেন, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অধিবেশনে এরূপ স্থির হয় যে, রাজ্য-সরকার বঙ্কিম-ভবন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে রক্ষা করবেন এবং প্রস্তাবিত সংগ্রহশালারূপে ব্যবহার কল্পে উক্ত ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি, তাঁর ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সেখানে সংরক্ষণ করবেন। রাজ্যসরকার শীঘ্রই সাহিত্য পরিষদের নিকট হ'তে উক্ত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রবেন। যথারীতি Ancient Monument Preservation Act অনুযায়ী ১৭ই এপ্রিল '৫২ বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষিত স্থান হিসাবে গেজেটে ঘোষণা করা হ'ল। তারপর তোড়জোড় চলল রেজেষ্ট্রীকরণের ও আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের দিন নির্ণয় নিয়ে।

শনিবার ৩১শে মে সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় বৈঠকখানার রেজেষ্ট্রি করার ভার আমার ওপর অর্পণ ক'রলেন—বোধ করি আমার প্রতি তাঁদের অপার স্নেহহেতু এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দেশের লোক বলে। বৃহস্পতিবার ৫ই জুন রেজেষ্ট্রী করার দিন ধার্য্য হ'ল। যথাসময়ে আলিপুরে আমাদের রেজেষ্ট্রীর কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'ল। সেদিন হ'তে বঙ্কিম-ভবন জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হ'ল—এই চিন্তায় আনন্দিত হ'ল আমার মন-প্রাণ।

৬ই জুন, ১৯৫২ সাল—বহু আকাঙ্ক্ষিত বঙ্কিম সংগ্রহশালার উদ্বোধনের দিন! জাতির স্মরণীয় ও শুভ দিন। শান্তিপুর, চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হ'তে সভা আরম্ভ হবার বহু পূর্ব্বে বঙ্কিম-অনুরাগীর দল বঙ্কিম-তীর্থে এলেন অবগাহন ক'রতে। জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নরৌদ্রের উত্তাপকে তাঁরা ভ্রুক্ষেপ ক'রলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান (অধুনা জঙ্গলাকীর্ণ), তাঁর অট্টালিকা, তাঁর শয়নকক্ষ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত রথ, তাঁর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দির, তাঁর শিব-মন্দির এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা অবলোকন করছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে অনুসন্ধিৎসুদের কৌতূহলী মন আরও কৌতূহলী হ'য়ে উঠল। সামাজিক জীবনেও তাঁর বিরাটত্ব উপলব্ধি ক'রে সেই অমর আত্মার প্রতি তাঁরা সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন ক'রলেন।

যথাসময়ে সুসজ্জিত সভামণ্ডপ মুখর হ'য়ে উঠল বঙ্কিমের পূজারীদলের সমাগমে। তাদের উপস্থিতি যেন জানিয়ে দিল বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গলা আজও বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্মৃত হয় নি। সভায় রক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ প্রতিকৃতিটি অবলোকন করার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্পন্দন দেখা দিল প্রত্যেকের দেহ মনে। তারপর স্নিগ্ধ গ্রাম্য গোধূলিবেলায় সংগ্রহশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল।

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, সাহিত্যিক, জাতীয় জাগরণের ঋত্বিক এই পরিচয়ই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র পরিচয় নয়। পাশ্চাত্যের মোহে আত্মবিস্মৃত জাতিকে তিনি আত্মমর্য্যাদায় উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি যা এখন বহুস্থানে ছড়িয়ে আছে, তা উক্ত সংগ্রহশালায় উপহার দিতে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, রাজ্যসরকার এই সংগ্রহশালার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ ক'রে নিজেদের ধন্য মনে ক'রছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এককালে ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত ক'রেছিলেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার প্রতিদান এবং ঋণ পরিশোধ স্বরূপ এটি করা হচ্ছে মনে ক'রলে তাঁর পূত স্মৃতির প্রতি অপমান করা হ'বে। মা কি ছিলেন, মা কি হয়েছেন এবং মা কি হবেন—বঙ্কিমের ধ্যান-নয়নে এই যে মূর্ত্তিধরা পড়েছিল, তিনি জাতির সামনে সেই মূর্ত্তি তুলে ধরেছিলেন।

আজ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহশালা জাতির নিকট তীর্থ-মন্দির, এই অল্পপরিসর তীর্থ-মন্দিরে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়—তাই পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের নিকট আবেদন জানাই, বঙ্কিমের পৈতৃক বসতবাটি অধিকার ক'রে গবেষণাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা হোক। গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারলে বঙ্কিমের সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙ্গলা সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'বে। সরকার কত পরিকল্পনায় কত কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে থাকেন, যদি এ বিষয়ে তার কথঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলা তথা ভারতের একটা স্থায়ী কল্যাণ-সাধন হ'তে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাঙ্গলার নন, সমগ্র ভারতের গৌরব। তাঁর সাহিত্যের সম্যক আলোচনা ক'রলে আমাদের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার ক'রতে পারব—বন্দেমাতরম্।

দিলীপকুমার ও বাংলা গান

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

প্রথিতযশা পিতার প্রতিভাবান পুত্রের দৃষ্টান্ত দুর্লভ, দিলীপকুমারই তাহার অন্যতম। নাট্যসাহিত্য এবং সাঙ্গীতিক প্রগতির প্রকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দান অতুলনীয়; রবীন্দ্রনাথের মতন অতটা না হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল দেশে যে সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুরের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অসাধারণ, জাতীয় সঙ্গীতের বলিষ্ঠ সুরযোজনায়, সুমার্জিত হাসির গান রচনায়, শিক্ষিত সমাজের অভিনয় উপযোগী নাটক রচনার সঙ্গে রসিক সমাজের বৈঠকের উপযোগী উচ্চাঙ্গ সুরমণ্ডিত গান রচনায় তাঁহার দানের প্রাচুর্য্য আজো বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘজীবী হ'ন নাই, তাঁহার নিকট হইতে দেশবাসীর যতটা পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা তাহারা পায় নাই। ইহার কারণ কেবল তাঁহার অকালবিয়োগই নয়, সহৃদয় প্রচার-গোষ্ঠীর অভাবও কতকটা দায়ী। যদিও তিনি ছিলেন অভিজাতশ্রেণীর রাজপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের মুকুটমণি, তাহা সত্ত্বেও কোন একটি শক্তিশালী রসগোষ্ঠী তাঁহার চারিপাশে গড়িয়া উঠে নাই। ইহার কারণ তাঁহার সুরপ্রতিভার অভাব নিশ্চয়ই নয়, যথাযোগ্য পরিবেশন ও প্রচারেরই অভাব। তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ গুণগ্রাহী দেশবাসী তাঁহার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারে নাই। সৌভাগ্য-বশতঃ কবির অসাধারণ প্রতিভাবান পুত্রের অকুণ্ঠ পিতৃভক্তি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সুরসাধনার একনিষ্ঠ শিষ্যরূপে কৃতজ্ঞতাময় শ্রদ্ধা তাঁহার সুরসাধনাকে আবার যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দিলীপকুমার তাঁহার নিজের সারাজীবনের সাধনার দ্বারা কবির গানের মহিমা প্রচার করিতেছেন; তিনি বলিয়াছেন—"দেখাবার চেষ্টা করেছি কেন—তাঁকে আমি দ্বিজেন্দ্র-অতুল-রবীন্দ্রনাথের যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সুরকার মনে করি। কাজী নজরুলের অভ্যুদয়-এর পরে, তাই ত্রয়ীর সঙ্গে তাঁর নাম জুড়্‌লাম না, কিন্তু বাংলা সুরকারদের মধ্যে তাঁকেও একজন যথার্থ সুরকার বলে গণ্য করতে হবে।"

দিলীপকুমার যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—কৃষ্ণনগরের জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহক সেই রায় পরিবার চিরকালই সঙ্গীতরসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতামহ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় গীতিরসিক ছিলেন, হিন্দুস্থানী খেয়ালে তাঁহার মতো সুকণ্ঠ গায়ক সেকালে এদেশে খুব কমই ছিল। দিলীপকুমারের জ্যেষ্ঠতাত হরেন্দ্রলাল রায়ও ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক, সঙ্গীত বিষয়ের নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। হরেন্দ্রলালের পুত্রত্রয় মেঘেন্দ্রলাল, হেমেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রলাল, কন্যাদ্বয় নীলিমা এবং প্রতিমা সকলেই অল্পবিস্তর কলা-কুশল সুরশিল্পী। হেমেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রলাল উভয়ই বর্তমানে যশস্বী সঙ্গীতাধ্যাপক। তাঁহাদের মাতুল ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছেই দিলীপকুমারের উচ্চাঙ্গ সুরের শিক্ষা ; তাঁহার নিকট দ্বিজেন্দ্রলালেরও ঋণ অল্প নয়। "কিন্তু এই সব ওস্তাদ গাওয়াইয়ার চেয়ে আমাদের কাছে ঢের বেশি আদরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর খেয়াল ছিল এমন অদ্বিতীয় সৃষ্টি যে শুনলে চমকে যেতে হত। বাংলা গানকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন লীলায়িত করে। কবি তাঁর কাছে এই নূতন পথের দিশা পেয়েছিলেন ; কবির শ্রেষ্ঠ বাংলা গানে সুর ও কাব্যের যে শুভ পরিণয় হয় তার সমৃদ্ধির জন্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছেই ছিলেন বিশেষ ভাবে ঋণী।" (উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল)

দ্বিজেন্দ্রলাল তো সব সময়েই সুরে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একটা অলৌকিক সাঙ্গীতিক পরিবেশের মধ্যে দিলীপকুমারও মানুষ হইয়া উঠেন। শৈশবে কবি নিজেই পুত্রকে এবং কন্যা মায়াকে গীতচর্চায় উৎসাহিত করিতেন। কবিপুত্র নিজের শৈশবের গীতিস্মৃতির প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"আমার যতদূর মনে পড়ে চার কি পাঁচ বৎসর বয়সেই আমি গাইতে শিখি। আমার মার এক সই ছিলেন, তাঁকে আমি গোলাপ মা ব'লে ডাকতাম। তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে যখন আমার বয়স দু বৎসর তখন আমি গানে তাল দিতে পারতাম নির্ভুল।"

সে বয়সে তৎকালীন সুপরিচিত গায়ক লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতির গ্রামোফোন রেকর্ড তাঁহার গলা তৈরীর সহায়তা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই তাঁহাকে সঙ্গীতসরস্বতীর শ্রীচরণে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন। তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন, "পাগ্‌লামি কোরো না দিলীপ। গান করতে চাও খুব ভালো কথা—কিন্তু একমাত্র গানকেই বরণ করো না কেন? অন্ন সংস্থান যখন আছে তখন সমস্ত শক্তি গানে দাও।" তাঁহারই প্রেরণায় দিলীপকুমার অনন্যকর্মা হইয়া সঙ্গীতসরস্বতীর সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সারাজীবন ধরিয়া তিনি ভ্রাম্যমানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন প্রধানতঃ দেশ-বিদেশের গান শিখিবার জন্য। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি স্থানের যশোমখ্যাতা সব বাইজীদিগের কাছে পর্য্যন্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সারা ভারতের প্রায় সকল ওস্তাদ গায়ক-গায়িকারই তিনি সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন কেবলমাত্র গান শুনিবার এবং সুরসম্পদ অধিকার করিবার জন্য। অচ্ছন বাঈ, কেশর বাঈ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সুর-শিক্ষয়িত্রী।

দিলীপকুমার সারা জীবনই গুণিজনের সংস্পর্শে রহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের তিনি পুত্র এবং তাঁহার গানের স্বরলিপিকার এবং প্রধানতম প্রচারক। তিনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়পাত্র, অথচ তাঁহার গানের তীব্র সমালোচক ! অতুলপ্রসাদের তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁহার গানের রসবেত্তা। কবি নজরুল ইস্‌লামের তিনি প্রধানতম উৎসাহদাতা সুহৃদ এবং দরদী শ্রোতা। আধুনিক যুগের বাংলার সঙ্গীত-জগতের সব কয়জন সুরস্রষ্টার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দিলীপকুমারের সমালোচনা এবং রসজ্ঞতা তাঁহাদের প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিলীপকুমারের সুরসৃষ্টিতে তাঁহাদের কাহারও বিন্দুমাত্র প্রভাব নাই। তিনি যে সুরধারা রচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বখাতপথে প্রবাহিত।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দিলীপকুমার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কবিগুরুর পরম স্নেহের পাত্র ; বয়সের পার্থক্য তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতার বাধা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার জীবিত অবস্থায় বহু বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে, তিনি তাহাতে ব্যথা কম পান নাই ; কিন্তু যথার্থ নিরপেক্ষ সমালোচনায় তিনি শিল্পিজনোচিত তৃপ্তি অনুভব করিতেন। দিলীপকুমার ছিলেন তাঁহার গানের তীব্র সমালোচক, কবির গানের মূল্য স্বীকার করিলেও তাঁহার গানের ত্রুটিবিচ্যুতি সর্বপ্রথম তিনিই স্পষ্টাস্পষ্টি বলিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন নাই। কেবলমাত্র এই সমালোচনার জন্য বাংলার অগণ্য রবীন্দ্রভক্ত দিলীপকুমারের প্রতি খড়্গহস্ত। দিলীপকুমার বলিয়াছেন—

"আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান নিয়ে বহু আলোচনা ক'রেও নানা বিষয়ে অনেক কিছু লাভ ক'রেও শেষটায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি (সে ধারণা সুর রচনা করতে গিয়ে আরো দৃঢ় হয়েছে) যে, তিনি আমাদের বাংলা গানকে যে পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সে পথ তার পক্ষে বিপথ। * * * আমার বহু পরীক্ষা ও উপলব্ধিপ্রসূত প্রত্যয়টি এই যে—ভারতীয় গানের একটি গভীর স্বকীয় ধারা আছে সে-ধারা থেকে চ্যুত হওয়ার ফলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত পথভ্রষ্ট হয়েছে। একথা আমি বলছি না তাঁর গানের মধ্যে কোনো কলাকারুই নেই। তাঁর গান থেকে অনেক কিছুই শেখবার আছে। * * * বাংলা গানে প্রথম শিক্ষার্থীরা তাঁর গান গেয়ে লাভবান হবেন এও সত্য। তা ছাড়া বাংলা গানকে তিনি তার আত্মগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন এজন্যেও তাঁর প্রতি বাঙ্গালী চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু তবু একথাও আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে বাধ্য যে রবীন্দ্রনাথ যে-পথে বাংলা গানকে নিয়ে চলতে চেয়েছেন সে-পথে চললে তার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যাবেই যাবে—আজ না হোক্ দু-দিন পরে।" (সুরবিহার)

দিলীপকুমার বলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে বাণীবাহুল্যের দ্বারা

সুরের কৌলীন্য ও আভিজাত্য নষ্ট করিয়াছেন। একথা কবি নিজেও নানা স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে সঙ্গীতের স্বতস্ফূর্ত্ত রসাবেশকে কাব্যালঙ্কার ঢাকিয়া দেয়। গায়ক যদি কণ্ঠের স্বাধীনতা পায়, কথাকে ইচ্ছামত খেলাইতে পারে তবে গানের প্রাণস্পন্দন আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে এই স্বাধীনতা দানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—"আজকের আলোচনার কথাটা এই যে, আমি যে সব গান রচনা করি তাতে সুরের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য নেই ব'লে তোমার ভালো লাগে না। তুমি তার ওপরে নিজের ইচ্ছামতো প্রাচুর্য্য আরোপ ক'রে গাইতে চাও। তুমি বলবে—আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই, গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়।"

দিলীপকুমার বাংলা গানকে ওস্তাদী হিন্দুস্থানী গানের ন্যায় লীলায়িত করিয়া গাহিতে চা'ন, এক কথায়, আমি চাই বাংলা গানে তান বিস্তারেরও অবসর। রবীন্দ্রনাথ বল্‌তেন বাংলা গানে তানাদি মানায় না। আমি বলি : গানের সুর নানা তানের মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন করে পায়—অবশ্য তানাদি সুপ্রযুক্ত ও রসাল হ'লে। অনেক সময় নাও হ'তে পারে এবং হ'লে তাঁতে হবে রসভঙ্গ, বটেই তো। বাংলা গানেও গায়ক হবেন সুরস্রষ্টা, যদিও হিন্দুস্থানী গায়কের মতো নিরঙ্কুশ হয়ে নয়—ভাবসঙ্গতি রক্ষা ক'রে।" (সুরবিহার)

রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া বাংলায় অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন প্রভৃতি অন্য কাহারও গানের বিশেষ আদর প্রচারের অভাবেই দুর্ভাগ্যক্রমে হয় নাই। দিলীপকুমার এ বিষয়ে অগ্রণী, তিনি তাঁহাদের সুরকে রবীন্দ্র সুরের সঙ্গে সমান আসন দিতে চা'ন। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রগীতিকে তিনি রবীন্দ্রগীতি অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিবার পক্ষপাতী, তাহার সুরসৌষ্ঠবের আভিজাত্য তিনি রবীন্দ্রসুরের চেয়ে অনেক উন্নত বলিয়া বিবেচনা করেন।

দিলীপকুমার পিতার কৃতী পুত্র, তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্যক্ ও যথার্থ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই! সেই সঙ্গে তিনি অপর কবিদের সুরকেও লোকসমক্ষে তাহার যথার্থ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্র সুরের কূলভাঙ্গা বন্যাস্রোতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সুরের প্রচার প্রচেষ্টায় তাঁহাকে আপাত দৃষ্টিতে রবীন্দ্রবিরোধী বলিয়া মনে হয়। অনেকের ইচ্ছা যেন রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা গানের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। ইতিহাসের মতো আর্টের গতি চিরবহমান, তাহাকে রুদ্ধ করা যায় না। দিলীপকুমার বাংলা সুরকে নূতন পথে প্রবাহিত করিয়া আবার নূতন ভাবের জোয়ার আনিয়াছেন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের নিশিকান্ত দিলীপকুমারের আদর্শেই গড়িয়া উঠিতেছেন। তিনি তাঁহার গান রচনার ভার ইদানীং নিশিকান্তের হাতে অর্পণ করিয়াছেন।

দিলীপকুমার তাঁহার সঙ্গীতজীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মচরিত-জাতীয় রচনা পড়িলে অনেক সময় তাঁহার স্বীকারোক্তি ও স্পষ্টভাষণে আমরা বিচলিত হইয়া পড়ি, তাঁহার লেখার অকুণ্ঠ আন্তরিকতা যেন অনেক সময় নির্লজ্জতা বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে নানা কটূক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, তবে অসংসারী উদাসী দিলীপকুমার লৌকিক স্তরের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কাজেই সে প্রসঙ্গ থাক্।

ইটালী দেশের অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি; সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, রাজনীতি, জ্যোতিষ সমস্ত বিষয়েই ছিল তাঁহার সমান ব্যুৎপত্তি। তবু একমাত্র চিত্রকলাই তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দিলীপকুমারের প্রতিভাও তাঁহার সমতুল্য। কাব্য, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, সঙ্গীত, ছন্দোবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পবোধ সব বিষয়েই তিনি সুপণ্ডিত; কিন্তু একমাত্র সঙ্গীতই তাঁহাকে সর্বজনপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে।

সঙ্গীতের রস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচনার সূত্রপাত দিলীপকুমারই প্রথম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, রোমাঁরোলা, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ও বিতর্ক সঙ্গীত সাহিত্যে অপূর্ব দান।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুবার আলোচনার মধ্য দিয়া দিলীপকুমার বহু ভাবে কবির সুররচনার ইতিহাস এবং অধিকারটির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় সঙ্গীত এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের গানের মূলসূত্র সম্বন্ধে অভিমতগুলি কবিগুরু তাঁহার সহিত আলোচনা প্রসঙ্গেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচার ও অনুশীলনে তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীকৃষ্ণরতন জনকারের কাছে বাংলা গানের সত্য রূপটি দিলীপকুমারই উপস্থাপিত করেন। এ বিষয়ে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন।

অনেক সময় যুগপ্রবর্ত্তক মনীষীরা ছাত্রশিষ্যের মধ্য দিয়া নিজদের শক্তিকে অভিব্যক্ত করেন এবং বহমান রাখেন। দিলীপকুমার তাঁহার বহু প্রতিভাবতী ছাত্রীদের কণ্ঠে তাঁহার গানকে অমর করিয়াছেন। উমা দেবীর নাম সর্বপ্রথম মনে পড়ে, অকালে নীরব হইয়া না গেলে তাঁহার মধুর কণ্ঠ আজো সারা ভারতে ধ্বনিত হইত। দিলীপকুমার যে কেবল সুরে বঙ্গবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছেন তাই নয়, মদ্রদেশীয়া শুভলক্ষ্মী, মহারাষ্ট্রী ইন্দিরা মালহোত্র, পার্শী রাহানাতায়েবজী প্রভৃতি অবাঙ্গালা সুগায়িকাকে অনুবর্ত্তিনী করিয়া তুলিয়াছেন। গানের ভাষা ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সুরের ভাষা জগতের সবার অন্তরেই প্রবেশ করে, তাই ইউরোপের সর্বত্রই যেখানেই দিলীপকুমারের কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রোতারা সুরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছে।

কুমারী উমা বসু ভবানীপুরের ধরণীধর বসুর কন্যা, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অকালে মৃত্যু হয়। দিলীপকুমারের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তাঁহার গানে বেশ নাম হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তিনি ছাত্রী ছিলেন, তাঁহারই মারফতে

দিলীপকুমারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। প্রথম দিনেই উমা দেবী তাঁহার কণ্ঠের দ্বারা গুরুকে জয় করিয়া ল'ন। তিনি উমা বসুর কণ্ঠে বীণাপাণির আসনখানি আবিষ্কার করেন, তাঁহার অধিকাংশ স্বরচিত গান উমার কণ্ঠেই উদ্গীত হয়। দিলীপকুমার বলিয়াছেন—"আমার যা শ্রেষ্ঠ দেয়, তা আমার পরম স্নেহের পাত্রী স্নেহভরে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করছে—আর গ্রহণ করার উদ্দীপনায় আমার শক্তিকে, সৃজনী প্রতিভাকেও উস্‌কে দিচ্ছে—এ ধরণের অনুভব অবশ্য আগেও হয়েছে, কিন্তু এমন গভীরভাবে, সমগ্রভাবে না। কেন না এর আগে যাদের শিখিয়েছি তাদের কেউই যে-ধরণের বাংলা গান আমার আদর্শ—তাকে এমন সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নি, বরণ করে নি এমন শিশু-সরল আনন্দের অকুণ্ঠ অভিনন্দনে।"

দিলীপকুমারের রচিত ও সুরযোজিত নিম্নের শ্রেষ্ঠ গানগুলি উমার কণ্ঠে বাঙ্‌ময় রূপ লাভ করিয়াছে—নিঝরধারা, পূজা আমার সাঙ্গ, শ্রীচরণে নিবেদন, বুল্‌বুল্ মন! ফুল সুরে ভেসে, তব চিরচরণে, যখন গাহে নীল পরী, অকূলে সদাই চলো ভাই, রূপে বর্ণে ছন্দে, আজি তোমারি কাছে প্রভৃতি। আর একটি গান উমা বসুর কণ্ঠে অপূর্বতা লাভ করিয়াছে ৺হিমাংশু দত্ত সুরযোজিত 'চাঁদ কহে চামেলি গো, হে নিরুপমা'। বাঙ্গালী শ্রোতা দিলীপকুমারের গানের সঙ্গে আরো যে একজনের কণ্ঠ শোনার জন্য আকুল হইয়া উঠে, সেই উমা বসুর স্মৃতিসুধা তাঁহার অগণ্য সঙ্গীতরসপিপাসুর অন্তরে চিরদিনই বিরাজ করিবে।

উমা বসু ছাড়া দিলীপকুমারের আরো কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধা গীতিসঙ্গিনী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রেণুকা সেনগুপ্তা এবং শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তার নাম উল্লেখযোগ্য।

দিলীপকুমারের গান মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রথমতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গীতিগুলিতে তিনি দ্বিজেন্দ্র সুরকে নানা ভাবে খেলাইয়াছেন এবং তাহাকে অভিনব রূপ দিয়াছেন ও নিজস্ব ভঙ্গীতে লীলায়িত করিয়াছেন। ইচ্ছামতো সুরবিহার করার ক্ষমতাকে তিনি এখানেও লইয়াছেন। "সজীব রাখার একটি পদ্ধতি হচ্ছে নব নব প্রেরণা যাতে তার মধ্যে মূর্ত হতে পারে তার অবকাশ রাখা। যে গান চিরদিন একই ভাবে গাওয়া হয় সে-গান গাইবার প্রেরণা সুগায়কেরা পান না। সে-গান যাকে বলে পুরানো archaic হয়ে যায়।"

এই স্তরে দিলীপকুমারের সুর-সাধনা ভক্তিরসের। তাঁহার মতে "দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ঋণ স্বীকার করা আমার কর্তব্য—অর্থাৎ এইটুকু জানিয়ে রাখা যে, বাংলা গানে আমি দ্বিজেন্দ্রলালেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি অর্থাৎ তাঁরই মত চেয়েছি বাংলা গানে সুর সমৃদ্ধি, পৌরুষ—সর্বোপরি ভক্তি। কিন্তু তাঁকে আমি অনুসরণ করলেও অনুকরণ করিনি তা ব'লে। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল সুরকার হিসাবে আমার নমস্য হলেও আমি তাঁর সৃষ্টি বা ঢঙের পুনরাবৃত্তি করেই তাঁর ঋণ শোধ করিনি।"

(২) যে গানগুলিতে সাধারণ অছন্দোবদ্ধ কথাকে সুরের আভিজাত্য দিয়াছেন, সেগুলি পড়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে। কথাকে গতিশীল করা, তাহাকে সজীবতা দান—গানের ক্ষেত্রে তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য। গানের কথাকে সুরের আবহাওয়ায় নানাভাবে লীলায়িত করিয়া গাওয়া তাঁহার গানের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কীর্ত্তনের আঁখর ভঙ্গীকে তিনি অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—"কাব্য সঙ্গীতের আদর্শ যে ভাব ও সুরে যুগল-মিলন—এ কথাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু এ মিলনকে গতিশীল তথা সাবলীল করে তুলতে হলে ভাব ও সুর উভয়কেই খানিকটা স্বাধীনতা দেয়া দরকার; ভাবকে আঁখরের সাহায্যে—সুরকে তানাদির সাহায্যে। এ-আঁখরে বাঙ্গালীর তেমনি স্বভাবপটুতা, যেমন হিন্দুস্থানী ওস্তাদের তানকর্তনে।"

রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের এই নব সৃষ্টির অনুমোদন করিয়া আঁখরের নামকরণ করেন 'কথার তান'। গায়কপ্রবর তাঁহার গানে এই আঁখরের পক্ষবিস্তারে সুরাকাশে বহু দূর দূর ভ্রমণ করিতে পারেন।

(৩) যে গানগুলিতে তিনি সুরে নাট্যরীতির অবতারণা করিয়াছেন এইগুলি পড়ে তৃতীয় পর্য্যায়ে। গত শতাব্দীতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরণের গানের অভাবের কথা প্রথম উল্লেখ করেন—"আমাদের দেশে নাট্য সঙ্গীত বা Dramatic Music নাই। যেমন কাব্যের চরমোৎকর্ষ নাটক, তেমনি সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ নাট্য-সঙ্গীত। মানবমনের সমুদয় আবেগ ও বাহ্যজগতের যে সকল শব্দময়ী ঘটনার সহিত মানবীয় কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে তৎসমুদয় সুরে প্রকাশপূর্বক শ্রোতার মনে ভ্রান্তি উৎপাদন করা নাট্যসঙ্গীতের কার্য্য।" দিলীপকুমার বাংলা গানে নাট্যরীতির প্রবর্ত্তনা করিয়া সে অভাব দূর করেন। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্, বৃন্দাবন-লীলা, কর্মনাশা' প্রভৃতি গান এই ধারার অন্তর্গত।

(৪) চতুর্থ পর্য্যায়ে পড়ে সংস্কৃত ছন্দে সুরযোজনার গানগুলি। সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত এবং তাঁহার পিতৃদেবের বাংলা গানের ভাষান্তরিত অনেকগুলি গানে তিনি সুর যোজনা করিয়াছেন। যেমন সূর্য্যোদয় (আগত আলোহিত উষাপতিরবিনাশী সার্থকনামা), মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার, নবজীবন জাগরণম্, ভারতমাতস্ত্বমেব জননী ধাত্রী (বঙ্গ আমার জননী আমার), রত্নধান্যপুষ্পিতা বসুন্ধরা সুখান্বিতা (ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা) প্রভৃতি। সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দকে বাংলা গানে ব্যবহার করিয়া তিনি নতুন পথের দ্বার খুলিয়াছেন—"বাংলায় লঘুগুরু ছন্দভঙ্গিম গান যে ভাবের রূপায়ণে রসোত্তীর্ণ হতে পারে একথা এ সব গান প্রমাণ করেছে। সুতরাং এ সিদ্ধান্তকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ ছন্দে আরো সার্থক গান রচিত হওয়া সম্ভব তথা কাম্য।"

(৫) পঞ্চম পর্য্যায়ে পড়ে ইউরোপীয় সুর, ছন্দ ও রীতিতে রচিত গানগুলি। বিদেশী রীতিকে গানে ব্যবহার করিবার শক্তি তাঁহার অদ্ভুত! জার্মান সুরকার Schubertয়ের গানের সুর অনুকরণে তাঁহার সৃষ্টি, 'বন্ধন নাশো মন্ত্রবরে'; Curschmannয়ের গানের রূপে তাঁহার সৃষ্টি 'ঘুমপাড়ানিয়া গান', ইটালীয়ান O solomio গানের ঢঙে রচিত 'তোমারি পানে অকূল টানে' গান। তাঁহার অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ গান, যথা 'রূপে বর্ণে ছন্দে, পাপিয়া, বুলবুল, অকূলে সদাই চলো ভাই

(Zipsy Song), রাধা (Church Music) প্রভৃতির গীতিরীতি বা style সম্পূর্ণ বিদেশী ভঙ্গীর। বিদেশীয় সুরকে স্বদেশীয় পরিবেশে নব কলেবর ও নবজীবন দান তাঁহার কৃতিত্ব। ইংরাজী গানের Improvisation বা গানে গায়কের স্বাধীনতার সঞ্চরণের তিনি বাংলা নামকরণ করিয়াছেন 'সুরবিহার'। এই প্রথা দিলীপকুমার বাংলা গানে প্রচলন করিতেছেন।

ইদানীং তিনি 'শ্রুতাঞ্জলি' নামে একখানি গানের বই প্রকাশ করিয়াছেন। মীরার ভাবে আবিষ্টা ইন্দিরা দেবী হিন্দীতে কতকগুলি অপূর্ব ভক্তিরসের পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তিনি সেগুলিতে কেব সুর যোজনাই করেন নাই, এইগুলির বাংলায় ছন্দোরূপ দিয়াছেন। ফলে গানগুলি বিংশ শতাব্দীর পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে। একটি গানে ধরতা—"রাহী মথুরা কিতনী দূর? মথুরা কিতনী দূর রই রা মথুরা কিতনী দূর?" তাহার ছন্দো রূপ—"সখী, মথুরা সে কত দূর মথুরা সে কত দূর বল সখী, মথুরা সে কত দূর?" এই পদাব আন্তরিকতা ও অকপট ভক্তিরসে ভরপুর। এই গানগুলি দিলীপকুমারে কণ্ঠে প্রচারিত হইলে সঙ্গীত ক্ষেত্রে নবধারা প্রবাহিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল

(শ্রীশুক)

'কৃষ্ণবার্ত্তা শুনি সবে ভুলিল বিরহব্যথা,
উদ্ধবে পূজিল তারা শুনিয়া দয়িত কথা।
যিনি আত্মা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুত হরি,
কয় মাস রহে তথা নিত্য তাঁর লীলা স্মরি!

উদ্ধব গোকুলে রহে চিত্ত সদা কৃষ্ণময়,
কতিপয় মাস যেন ক্ষণতুল্য মনে হয়।
নদীবন গিরিদ্রোণী কুসুমিত উপবন,
ব্রজবাসীদের নিত্য কৃষ্ণ-কথা আলাপন।
কৃষ্ণগত চিত্ত সদা ব্রজ গোপিকারা সবে
হরিদাস প্রীতিভরে নমস্কার করে স্তবে:

ধন্য ভুবনে গোপবধূগণ সফল তাদের তনুধারণ,
নিখিলের যিনি আত্মা তাহাতে তনুমনপ্রাণ সমর্পণ।
সামান্য নয় গোবিন্দপদে ইহাদের প্রেম এ চরাচরে,
মুনিগণও সদা মুক্তি লভিয়া এ হেন প্রেমই কামনা করে।

কৃষ্ণকথায় যারা অনুরাগী ব্রহ্মজনমে কি কাজ হবে?
কৃষ্ণপ্রেমের মধুর সাধিকা সার্থক গোপবধূরা ভবে।
গোপের কামিনী সদাবনচারী ব্যভিচার দোষে দুষ্ট তারা,
সুদৃঢ় প্রেমের নিগূঢ় বাঁধনে বেঁধেছে কৃষ্ণে আপনাহারা।
অজ্ঞ যদি ও ঈশ্বরে ভজে কল্যাণ তার হবেই হবে,
না জানিয়া যদি অমৃতভুঞ্জে মঙ্গল সেতো ধ্রুবই লভে।

শ্রীহরির যিনি বক্ষে বিলীন লক্ষ্মী পান নি প্রসাদকণা
তারা ও পাননি পদ্মকান্তি নলিনীগন্ধ স্বঃ অঙ্গনা।,
সে প্রসাদ পেল ব্রজরমণীরা রাসোৎসবেতে আলিঙ্গনে,
কণ্ঠে তাদের ভুজদণ্ডের আশিস মালিকা মিলনখনে।

শ্রুতিতে যাঁহার চিরান্বেষণ, মুকুন্দপদ ভজিল তারা,
স্বজন আর্য্যপন্থা তাজিয়া বৃন্দাবনের নূতন ধারা।
হেথাকার লতাগুল্ম ওষধি সেবিছে তাদের চরণধূলি
আমি যেন হই একটি তাদের, সে ধূলিরে লই মাথায় তুলি।'

লক্ষ্মী যেপদে সেবিছে নিত্য আপ্তকামীরা সেবিছে মনে,
ব্রজরমণীরা ন্যস্ত করিল সে পাদপদ্ম আপন স্তনে।
রাসগোষ্ঠীতে হৃদয়ের তাপ জুড়াল জড়ায়ে চরণ বুকে,
নন্দপুরের ব্রজাঙ্গনার বন্দনা গাই নিয়ত সুখে।
বন্দনা করি নন্দপুরের ব্রজবধূদের চরণ রেণু,
হরিকথাগানে ভরিল ভুবন, হেথা বেজেছিল শ্যামের বেণু।

(শ্রীশুক)

অতঃপর মথুরায় উদ্ধব ফিরিয়া যায়,
গোপীদের করি' নিমন্ত্রণ,
নন্দ যশোদারে বলি' রথমুখে যায় চলি'
সকলেরে করি' সম্ভাষণ!

উদ্ধব নির্গমকালে ভারে ভারে থালে থালে
নানা উপহার আনে সবে,
নন্দ আদি গোপগণে অনুরাগাপ্লুত মনে,
সাশ্রুজলে কহিল উদ্ধবে:

মনে ও বৃত্তিতে হরি পদাঙ্ক আশ্রয় করি
বাক্যে কার্য্যে জানাই প্রণাম,
কর্ম্মবশে যথা ফিরি ঘুরি' যেন তাঁরে ঘিরি'
জিহ্বা যেন লয় কৃষ্ণনাম।

তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয় বাক্য কার্য্য মনোময়,
সদা যেন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
মঙ্গল আচারে দানে তাঁহারে স্মরণে আনে
কৃষ্ণে রতি রহে সর্ব্ব কাজে।

এই মত কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত অনুরাগে,
পূজিত হইয়া গেল ফিরি' মথুরায়,
প্রণমি' উদ্ধব কৃষ্ণ-বলরাম পদে,
নন্দপুর প্রীতিকথা সকলই জানায়।

শেষ

সমাজ-চেতনা ও সংস্কৃতির আদিকথা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গের কতগুলি বিশিষ্ট গুণের প্রতি মানুষের দৃষ্টি বহুকাল ধরে আকৃষ্ট হয়েছে। পশুর মধ্যে দেখা যায় যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তি (herd instinct), পক্ষীর নীড় ও মৌমাছির মধুচক্র নির্মাণের অপূর্ব কৌশল এবং পিপীলিকার যৌথ চেষ্টায় খাদ্য-দ্রব্যের সংগ্রহ ও সংস্থান মানুষের মনে চিরদিন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। মানুষ চিরকাল এদের গুণগুলি থেকে শিক্ষালাভের চেষ্টা করেছে। গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রাইটাস লিখে গেছেন—"মাকড়শার কাছ থেকে বয়ন-শিল্প, চড়ুইর কাছ থেকে কৃষি, নাইটিংগেলের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা কর।" কীট পতঙ্গের মধ্যে সমাজ-সংস্থার যে সব ব্যবস্থা আছে, মানব-সমাজের সঙ্গে সেগুলির মিল আছে। কীট-সমাজে দেখা যায়, পিতৃপুরুষের বিষয়, বাসা, চারণ ও শিকার-ভূমি তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। এমনও দেখা যায়, কোন কোন কীট ঠিক মানুষের মতই ভিন্নজাতীয় জীবদের গৃহ-পালিত করেছে, দাসত্বে বেঁধেছে।

কিন্তু পিপীলিকা মৌমাছি মাকড়সা প্রভৃতির জীবনতত্ত্বগত (biological) জীবন, সাংস্কৃতির নয়। প্রকৃতি তাদের দেহের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সৃষ্টি করেছে—যেমন মৌমাছির শোষণ-যন্ত্র মাকড়শার বয়ন-যন্ত্র। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তারা একটি জৈব (organic) সম্বন্ধে বদ্ধ—যার যে কাজ সে কেবল তাই করে, স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে ইচ্ছামত কাজ করবার শক্তি নেই। মাকড়শার বয়ন-যন্ত্র এক নমুনার জাল বুনে যায়। বয়ন-যন্ত্র তারই অঙ্গ বিশেষ, রদ-বদল চলে না বলে' জালের নমুনাকে পরিবর্তন করা মাকড়শার সাধ্যাতীত। পিপীলিকা ও মৌমাছির সমাজ-সংস্থার প্রত্যেকটি জীবের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে জীবকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই। তাদের প্রত্যেকটি অভ্যাসই সংস্কারগত (instinctive)—বংশজ উত্তরাধিকার, যার কখনও পরিবর্তন হয় না। এই সব প্রাণীর নিজ নিজ কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে যে বিশেষজ্ঞ-সুলভ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা একটি প্রকৃতি-দত্ত গুণ, সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত। বিশেষজ্ঞের গুণ-ধর্ম (specialisation) নিপুণ কর্ম-কৌশলকে সুপরিস্ফুট করে বটে, কিন্তু সে-দক্ষতা শিল্পী বা কারিগরের দক্ষতা নয়, যন্ত্রের দক্ষতা। কারিগর তার কাজের মধ্যে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে কল্পনার সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করে—তার শিল্পের মধ্যে প্রকাশ পায় সৃজন-শক্তি। আর, যন্ত্র তার ঢালাই ছাঁচে বাঁধা-ধরা নিয়মে বস্তু উৎপাদন করে।

সামাজিক জীব হলেও মানুষের অভ্যাসগুলি শিক্ষা-লব্ধ—সংস্কারগত বা বংশজ নয়। ইংরেজ দার্শনিক জন লক বলেছেন, জন্মকালে শিশুর মন থাকে পরিষ্কার একখানা শ্লেটের মত (tabula rasa), যার উপর কোন খড়ির আঁচড় পড়ে নি। পরে ইন্দ্রিয়-সংযোগে বস্তু-জ্ঞান জন্মে। কথাটা অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা ঠিক যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা, মাতৃ-স্তন্য পান, ক্রোধ, হাসি কান্না প্রভৃতি কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তি (instinct) ছাড়া, সব রকম অভ্যাসই মানুষ পরিবেশ বা শিক্ষা থেকে লাভ করে। সেগুলি স্বোপার্জিত—সংস্কারগত বা বংশজ নয় বলে' সময় ও অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তনশীল। মানুষের বিশেষত্ব এই যে, সমাজের মধ্যে বসবাস করেও সমাজ থেকে স্বতন্ত্র আপনাতে-আপনি প্রতিষ্ঠিত স্বীয় ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে সে, যার জন্য পিঁপড়ে মৌমাছির মত সে একটি সামাজিক যন্ত্রে পরিণত হয় নি। আত্ম-প্রকাশের পথ তার সম্পূর্ণ মুক্ত। নিজের বা সমাজের প্রয়োজনে সে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, মৌমাছির মধু-শোষণ যন্ত্র বা মাকড়শার বয়ন-যন্ত্রের মত সেগুলি প্রকৃতি-দত্ত নয়। নানা-রূপ প্রাকৃতিক দ্রব্য সম্ভার থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে সেই বুদ্ধি খাটিয়ে এবং কল্পনার সাহায্যে যন্ত্রগুলি স্বহস্তে নির্মাণ করে। প্রকৃতি মানুষকে দৈহিক বলে বলীয়ান করে সৃষ্টি করেন নি—নখ-দন্ত প্রভৃতি স্বভাব-দত্ত প্রহরণগুলি এমনই ভঙ্গুর যে, শুধু এ সব অস্ত্র যদি তার জীবন-যাত্রার একমাত্র সম্বল হত, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে তার অস্তিত্ব লোপ পেত বহুকাল পূর্বে। সৌভাগ্যক্রমে জীবন-সংগ্রামে প্রয়োজনীয় দেহ-শক্তির অভাব প্রকৃতি পূরণ করেছেন তাকে একটি বৃহৎ মস্তক এবং তদনুরূপ অধিক পরিমাণ মস্তিষ্ক দান করে।' বুদ্ধির আধার মস্তিষ্ক—মানুষের বৃহৎ মস্তিষ্কের অতুলনীয় বুদ্ধি-বৃত্তি শুধু তাকে খাদ্য-সংগ্রহ আত্ম-রক্ষা প্রভৃতি জীবন-ধারণের উপায় উদ্ভাবনের শক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। তাকে দিয়েছে ভাষা, যা পরস্পরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করে আদান-প্রদান দ্বারা সমাজ-গঠনকে সম্ভব করে তুলেছে, আর দিয়েছে তাকে ব্যক্তিত্ব, সৃজন শক্তি, আত্মপ্রকাশের উপায়। বুদ্ধি-বলে সে প্রাকৃতিক আবেষ্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, কৌশল খাটিয়ে বাহ্য-বস্তুকে রূপান্তরিত করে' ইতদৃষ্ট মত ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে। গুহা-বাসী মানব যে-দিন থেকে প্রস্তরাস্ত্র নির্মাণ করে' শিকার করতে সুরু করেছে—ব্যক্তিত্বকে, অন্তরের অনুভূতিকে রূপায়িত করে' তুলেছে গুহা-গাত্রে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কন করে' পৃথিবীর যাবতীয় জীব জন্তু থেকে মানব-জাতিকে পৃথক করেছে সে সেই দিন থেকে। তার technique কর্ম-কৌশল, শিল্প-চাতুর্য—সবই বুদ্ধি-প্রসূত। কীট পতঙ্গের মত সে যদি ও-গুলি বংশক্রম থেকে লাভ করতো, তাহলে স্বাধীন চিন্তা, সৃজন শক্তি, অনুভূতির রূপায়ণ, কোন গুণ ধর্মেরই বিকাশ সম্ভব হত না। ফলে, সমাজের বাঁধা-ধরা মরণাবর্তের মধ্যে সে আবহমান কাল ধরে ঘুরপাক খেত, সমাজকে নিজ প্রয়োজনে গড়ে তুলবার বা প্রকৃতির উপর আধিপত্য করবার কোন সুযোগ ঘটতো না।

মানব-সমাজ ব্যক্তিসমূহের পরস্পর সম্বন্ধের ফল, সকলের মিলিত

কর্মক্ষেত্র। মানুষ শুধু ব্যক্তি নয়, সে সামাজিক জীব—এই অর্থে যে, সমাজের মধ্যে ভিন্ন তার বেঁচে থাকা অসম্ভব। সকলের সঙ্গে তাকে এক মঞ্চে দাঁড়াতে হয়, জীবন ধারণের উপায় স্থির করবার জন্য। সকলের জন্য প্রত্যেকে এবং প্রত্যেকের জন্য সকলে—এমনি একটি সচেতন বা অচেতন অনুভূতি মানুষকে পরস্পর হিতসাধন, ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণও আত্মরক্ষার পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। সমবেত কর্মের এই মঞ্চই সমাজ। ব্যক্তির উপর সমাজের প্রভাব জীবন্ত, সমাজকেও তেমনই ব্যক্তির স্বাধীন বুদ্ধি-বৃত্তি শ্রেয়ের পথ দেখায়, পরিণতির আদর্শ লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয় সমাজ পরিবর্তনশীল—অগ্রগতিই তার জীবন। সমাজের এই গতিপথে আমরা পাই সংস্কৃতির সাক্ষাৎ। সংস্কৃতি সমাজ-স্মৃতির ধারক ও বাহক। যুগ-যুগান্তের সামাজিক অভিজ্ঞতার যে-স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, সেই স্মৃতিকে পরিস্ফুট করে সংস্কৃতি, মানব-সমাজের নূতন আবেষ্টনের মধ্যে। কালচক্রের আবর্তনে নূতন হয় পুরাতনে পরিণত, অনাগত নূতনরূপে এসে দেখা দেয়। বিবর্তনের চিরন্তন বিধির মত নূতনের সঙ্গে পুরানোর গাঁট-ছড়া বেঁধে দেয় সংস্কৃতি—পুরাতনকে করে নূতন, নূতনকে পুরাতন।

পূর্বপুরুষদের বৃক্ষবাস ছেড়ে আদি-মানব যখন ভূতলে অবস্থান করতে সুরু করলে, জীবন-তাত্ত্বিক (biological) প্রয়োজনে, family বা পরিবারকে বৃহত্তর করে সমাজে রূপান্তরিত করবার দরকার হল তখন। আদি-মানবের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপ্রচুর—পৃথিবীর নানা স্থানের অসভ্য আদিম জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এদের সমাজের তুলনা সমীচীন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খনন-কার্য দ্বারা যে সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের জিনিসপত্র উদ্ধার করেছেন, সেগুলি দেখে মনে হয় আদি-মানব ও আদিম জাতির সংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে। অনেক আদিম জাতি সে-দিন পর্যন্তও প্রস্তর যুগে অবস্থান করছিল। তারা প্রাগৈতিহাসিক আদি-মানবের বংশধর নয়, যেহেতু আদি-মানবের আকৃতি বিবেচনা করলে তাকে মনুষ্য-জাতি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এই মানব-সদৃশ মানুষের গুণধর্মবিশিষ্ট জাতির অনুপম শিল্প-শৈলে রূপ-সৌন্দর্যের অনুভূতি, যা তাদের অঙ্কিত গুহাগাত্রের চিত্রগুলি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করছে, তার তুলনা অনেক আদিম জাতির শিল্পের মধ্যে পাওয়া যায় না।

পুরাতন প্রস্তর যুগের পূর্বে মানুষ ছিল "স্বভাবের অবস্থায়" (state of nature)—অর্থাৎ উলঙ্গ, অগ্নিশূন্য, গৃহশূন্য, অস্ত্রশূন্য, নখ-দন্তযুক্ত জন্তু বিশেষ। বুদ্ধিবলে সে যখন পাথর ভেঙে ঘসে মসৃণ করে প্রস্তরাস্ত্র তৈরি করলে, তখন থেকে সুরু হল প্রস্তর-যুগের সংস্কৃতি। প্রস্তর-যুগ বলতে কেউ যেন না মনে করেন যে, সর্ব দেশে একই কালে এ যুগের প্রবর্তন হয়েছিল। প্রস্তর-যুগ কেন, ধাতু যুগও এক সময়ে সব জায়গায় দেখা দেয় নি। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানে সকল মহাদেশে সমান ভাবে চলেনি, অধিক ভাগ ইউরোপেই সীমাবদ্ধ। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে প্রস্তর-যুগের সূত্রপাত প্রথমে ইউরোপেই হয়েছিল, ভারতে যে-সব প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গেছে সেগুলি অনেক পরবর্তী কালের। প্রথমে নির্মাণ করা হয় পাথরের মুশল—বাদাম-জাতীয় বনফল ও অস্থি চূর্ণ করবার জন্য। পরে, ক্ষেপণাস্ত্র-স্বরূপ বর্শার ফলক, বিঁধবার ছড়ি, কাঠ কাটার কুঠার। অভ্যাসের ফলে প্রস্তরাস্ত্রের প্রকার ও রূপের ক্রমে উন্নতি ঘটতে লাগলো, কার্যকারিতাও তেমনই বৃদ্ধি পেল—এবং শিল্প তখন আর পাথরের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। অতিকায় হস্তির (mamoth), অতিকায় মৃগের (reindeer) ও অন্যান্য জন্তুর অস্থি দিয়ে করাত, বাঁটুল, ড্রিল, জুঁতি (harpoon) প্রভৃতি তৈরি করে' নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার চলতে লাগল।

প্রস্তর-যুগীয় সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় গুহা-চিত্র ও সমাধির নিদর্শনগুলি থেকে। নানা বর্ণে অঙ্কিত বাইসন, ভল্লুক, বন্য ঘোড়া, পশম-যুক্ত গণ্ডার প্রভৃতি জীবজন্তুর উজ্জ্বল ছবিগুলিতে অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য দেখা যায়। মনুষ্য মূর্তিও কিছু কিছু অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রগুলি জীবন্ত, চাতুর্য কৌশল সৌন্দর্য বোধ এবং সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ শক্তির অতিমাত্র তীক্ষ্ণতা বিলক্ষণ পরিস্ফুট। ভাস্কর্যের নিদর্শনও কিছু পাওয়া গেছে। ফ্রান্সের কয়েকটি স্থানে নিয়াণ্ডারথ্যাল মানবের কয়েকটি সমাধি পাওয়া গেছে, যা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তিকে বেশ অনুষ্ঠান সহকারে কবর দেওয়া হত। প্রস্তরাস্ত্র ভোজ্য-বস্তু ও অলঙ্কার মৃতের সঙ্গে সমাহিত হত। এ-সব স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দেহাতিরিক্ত কোন সত্তায় এবং পরলোকে তাদের বিশ্বাস ছিল। তারা মাছ ও জন্তু শিকার করত, ফলমূল ভক্ষণ করত, পাথর ঠুকে আগুন জ্বালত, পাথরেরও অস্থির উপর কারুকার্য করে অলঙ্কার প্রস্তুত করত। তাদের সমাজ-সংস্থা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু সমাজ-চেতনা কোন-না-কোন আকারে প্রকাশ পেয়ে সমগ্র জনসমষ্টির জীবিকার উপায় করে দিয়েছে, সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, এরূপ প্রমাণের অভাব নেই। সলুটর (solutre) নামে ফ্রান্সের একটি স্থানে ১০০ গজ লম্বা ও ১০ ফিট উচ্চ একটি আবর্জনা-স্তূপ পাওয়া গেছে, সেটি স্তূপাকার অশ্বের অস্থি। এই সব ঘোড়া শিকার করে ভক্ষণ করেছে তারা, অশ্ব পালনের শিক্ষা তখনো তাদের হয় নি। বড় বড় জন্তু—অতিকায় হস্তী, পশম-যুক্ত গণ্ডারও শিকার করত তারা, সম্ভবত গর্ত খুঁড়ে ফাঁদ পেতে—যা কখনও সমবেত চেষ্টা ছাড়া হয় না। সমাধি-প্রথাও একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে সমাজ-চেতনা সুপরিস্ফুট।

চতুর্থ বরফ যুগের শেষে নূতন প্রস্তর-যুগে (Neolithic age)—যখন নব-মানব Homo sapiensএর আবির্ভাব হল, গুহা-মানবের অস্তিত্ব তখন লোপ পেয়েছে। বরফ উত্তর দিকে সরে' যাবার সময় তারা উত্তরাভিমুখে মেরু অঞ্চলে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল—না, নব-মানবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলা কঠিন।

তীর ধনুর ব্যবহার এবং অস্ত্রকে শাণিত করবার জন্য যাঁতা-কল নির্মাণের সঙ্গে নূতন প্রস্তর-যুগের আবির্ভাব। পুরাতন প্রস্তর-যুগের নির্মাণ-শৈল উন্নত ধরণের না থাকার দরুণ অস্ত্র-শস্ত্রগুলি বিসদৃশ এবং কার্যকারিতারও ত্রুটি ছিল। নূতন পদ্ধতি অস্ত্রগুলিকে সুদৃশ্য, সুতীক্ষ্ণ এবং অধিকতর ব্যবহারোপযোগী করে তুললে।

ইউরোপে নব-প্রস্তর যুগের আরম্ভ হয়েছে মাত্র আট হাজার বছর

পূর্বে। তখন প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। তুহীনাবৃত বিস্তৃত ভূখণ্ড নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়েছে। ম্যামথ, গোচমুক্ত গণ্ডার, গুহা-ভল্লুক—তারা আর তখন নেই। বলটিক্ সমুদ্রের উপকূল, সুইজারল্যাণ্ড, ইউরোপের নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পাথরের অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, হাড়, কাঠের টুকরা, মৃণ্ময় পাত্র প্রভৃতি প্রচুর জিনিস পেয়েছেন নানা স্তূপের মধ্যে। এই সব জিনিস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে-যুগের লোক ঘর বাড়ি তৈরি করে তার মধ্যে বসবাস করত। এমন কি, বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য, সুইজারল্যাণ্ডে হ্রদের মধ্যে কাঠের গৃহ নির্মাণ করে বাস করবার প্রমাণ রয়েছে। এদের সংস্কৃতির পরিচয় আরও অনেক জিনিস থেকে পাওয়া যায় এবং অনেক পাথরের স্মৃতি-স্তম্ভ (monument) তৈরি করেছে, তার অনেকগুলি মৃতের সমাধির উপর। ইংলণ্ডে Stonehenge নামে প্রস্তরনির্মিত যে-সব স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেগুলি নব প্রস্তর যুগীয় মানবের সমাধি বলেই স্বীকৃত হয়েছে। এই যুগের প্রহরণগুলি পাথরের, হাড়ের ও কাঠের হলেও যথেষ্ট উন্নত ধরণের। তীরের ফলকগুলি সুন্দর পালিশ-করা, শান-পাথরে ধার দেওয়া কুঠার। রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি, মৃণ্ময় পাত্র তৈরি সুরু হয়েছে। তখন কৃষি-কার্য শিখেছে মানুষ, বীজ ছড়িয়ে নানা রকম শস্য—যব গম বাজরা, উৎপাদন করে। কুকুর পোষে, পশু-পালন করে, বয়ন-শিল্প, ঝুড়ি বোনা, চামড়ার কাজ—এমন কি, নৌ-নির্মাণ ও বক্র-যানের ব্যবহারও শিখেছে তখন তারা, শিকারীর ভ্রমণ-বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে। যতদূর জানা যায়, এই যুগের মানুষের বাসভূমি ছিল, ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, মিশর, উত্তর-আফ্রিকা এবং ভূমধ্য সাগরের কতিপয় দ্বীপ। পরবর্তী কালে এই মানবের বংশধরেরা মিশর, ব্যাবিলন ও ক্রীট দ্বীপে বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছেন।

মানব-জাতির শৈশব-কালে সংস্কৃতি অত্যন্ত মন্থর পদে অগ্রসর হয়ে নূতন প্রস্তর-যুগের পর্যায়ে এসে পৌঁচেছিল। সেই হিসাবে ধরতে গেলে নূতন প্রস্তরযুগ ক্ষণস্থায়ী। প্রস্তরাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করতে এ-যুগের মানুষের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি। প্রথমে ব্রঞ্জ-যুগ (Bronze Age)—সোনারূপা তাম্র প্রভৃতি ধাতুর আবিষ্কার, এবং তাম্র ও শিষার মিশ্রণে ব্রঞ্জ প্রস্তুত। ঢালাই কাজে মানুষ তখন সুপটু—ধাতু মিশ্রিত পাথর গালিয়ে (smelting) লোহা বের করল যখন, তখন এল লৌহ-যুগ (Iron Age)। এখন তাড়াতাড়ি একটির পর একটি যুগের আবির্ভাব সম্ভব হল কিরূপে, এ-কথা সহজে বুঝতে পারি আমরা যখন চিন্তা করে দেখি, অত্যন্ত অল্পকাল মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-যুগের বিবিধ স্তর—বাষ্প-শক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি, তৈল-শক্তি পরিশেষে আণবিক-শক্তি কেমন পর পর এসে দেখা দিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট মানুষকে নানা-রূপে বিভ্রান্ত করে'। সংস্কৃতির তড়িদ্গতি সম্বন্ধে জনৈক মনীষী বলেছেন,—যুগে যুগে সংস্কৃতি যেমন ভাবে দ্রুতগতি পরিবর্তিত ও পরি-বর্ধিত হয়েছে, তা দেখে মনে হয় ব্যাপারটা যেন কেৎলির জল জাল দেওয়ার মত। যা সময় লাগে জল তেতে উঠতে, তারপর তাপ যায় ঝাঁ ঝাঁ করে' চড়ে, আর জলও টগবগিয়ে ফুটতে থাকে।

ভূ-তত্ত্বের স্তর বিভাগের অনুসরণ করে' নৃতত্ত্ববিদ মর্গ্যান মানব-জাতির উপরোক্ত অবস্থান্তরগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন,—অসভ্য বর্বর ও সভ্য অবস্থা। প্রথমে শিকারীর ভ্রাম্যমান জীবন নিয়ে অতি দীর্ঘকাল মানুষ অসভ্যের পর্যায়ে পড়ে ছিল। Hobbs এর ভাষায় তখন মানুষ ছিল,—Poor, nasty, brutish and short. আদি-মানব সম্বন্ধে আমাদের অধুনালব্ধ জ্ঞান Hobbsএর বর্ণনাকে তেমন সমর্থন করে না, অতিশয়োক্তি বলেই রায় দেবে। নূতন প্রস্তর যুগের মানব যখন কৃষি, পশুপালন, মৃণ্ময় পাত্র নির্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য আরম্ভ করল, তখন তার সংস্কৃতি বর্বরের পর্যায়ে উঠল। পরিশেষে, ধাতুর ব্যবহার, নগর-নির্মাণ, রাষ্ট্রগঠন করে' এবং লিখন-প্রণালী আবিষ্কার করে' মানুষ সভ্য অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল।

বিবিধ পর্যায়ের এই স্বরগ্রামকে অভ্যাস করতে মানুষের যে সময় লেগেছিল, সে-সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে অনেকেই চমকে উঠবেন এই দেখে যে—গোটা মনুষ্য-জীবনের পঞ্চাশ ভাগের উনপঞ্চাশ ভাগ কালই মানুষ অসভ্য পর্যায় ভুক্ত বলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবিনসন একটি কৌতূহলোদ্দীপক কল্পনা করে বলেছেন,—"ধরে নেওয়া যাক আদি মানবের প্রস্তর যুগ সুরু হয়েছিল মাত্র ৫০ বছর আগে। তা হলে দেখা যায় ৪৯ বছর লেগেছে তার ভ্রাম্যমান শিকারী-জীবনকে পরিহার করে' স্থিতিবান রূপে ভূমি কর্ষণ করতে, পশু-পালন ও বয়ন-শিল্প শিক্ষা করতে। পঞ্চাশৎ বৎসরের প্রথমার্ধে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোন কোন জাতি লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কার করে' বিস্ময়কর নব উপায়ে সভ্যতাকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করলে এবং তার ব্যাপ্তির সাহায্য করলে। তিন মাস পরে অন্য কোন জাতি-সমষ্টি সাহিত্য শিল্প-কলা ও দর্শনকে সৌন্দর্য লোকে সূক্ষ্ম চিন্তার রাজ্যে নিয়ে গেল। খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা মাত্র দুই মাস। এক পক্ষ আগে ছাপাখানা, সপ্তাহ খানেক পূর্বে বাষ্প-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মাত্র দু তিন দিন থেকে রেল-ষ্টিমার ছুটো-ছুটি করছে। বৈদ্যুতিক শক্তি পেয়েছি আমরা গত কাল। আর সমুদ্রগর্ভের ও আকাশ পথের যানগুলির আবির্ভাব মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হয়েছে।"

পৃথিবীর জন্মকাল ও পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব—এই বৃহত্তর পটভূমিকায় স্যর জেমস্ জিনস্ মানুষের জন্ম ও সংস্কৃতির যে কাল-নির্ধারণ করেছেন তা এইরূপ :

পৃথিবীর জন্মকাল—২০০ কোটি বছর পূর্বে
পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব—৩০ কোটি বছর পূর্বে
মানুষের জন্ম—৩ লক্ষ বছর পূর্বে
জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম—৩০০০ বছর পূর্বে
টেলেস্‌কোপ আবিষ্কার
(আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত)—৩০০ বছর পূর্বে

ঘূর্ণ্যমান সূর্য থেকে ছটকে পড়ে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল ২০০ কোটি বছর পূর্বে। জিনস বলেন, পৃথিবী জমে হিম হয়ে যাবার পূর্বে মানুষের বেঁচে থাকার মত অবস্থা হয় ত আরও ২০০ কোটি বছর থাকবে। মানব জাতি জন্মেছে যেমন একদিন, তার অদৃষ্টে মৃত্যুও আছে তেমনই, কিন্তু সেই অতি সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তা একান্ত অনাবশ্যক। ২০০ কোটি বছরকে ব্যক্তি-জীবনের আয়ুষ্কাল সত্তর বছর মাত্র মনে করে গণনা করলে, মানব-জাতির শৈশবকাল এখনও গত হয় নি। অত্যন্ত অল্প-কাল মধ্যে এই দেব-শিশুটি যেমন করে' পুতনা-বধ পালা সাঙ্গ করে' গোবর্দ্ধন ধারণ করেছে, তাতে এই আশা পোষণ করা স্বাভাবিক—তার বিপুল বৈজ্ঞানিক শক্তি ও পরাক্রম বিপথে চালিত হয়ে মানব-জাতিকে এবং তার সভ্যতাকে ধ্বংস যদি না করে, তাহলে সে হয়ত একদিন মহামানবের সুউচ্চ আদর্শের লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

১৪

শ্রেষ্ঠী মহাশকুন্তের হস্তে নীলোৎপলার লিপি এবং আলেখ্য সমর্পণ করিয়া চার্ব্বাক প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। শ্রেষ্ঠী যে নীলোৎপলার আমন্ত্রণে পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মুখভাব দেখিয়াই চার্ব্বাক অনুমান করিতে পারিয়াছিল। নবীনা গ্রামে দুই চারিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া চার্ব্বাক ইহাও শুনিয়াছিল যে মহাশকুন্তের প্রথমা পত্নী বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর মহাশকুন্ত আরও চারবার বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। দুইটি পত্নী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, একটি পত্নী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে, চতুর্থী পিতৃগৃহে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং মহাশকুন্ত আর্থিক জগতে সমৃদ্ধিশালী হইলেও মানসিক জগতে অতি দরিদ্র। কোনও রমণী যদি তাহার এই আন্তরিক বুভুক্ষাকে শান্ত করিতে পারে তাহা হইলে মহাশকুন্ত যে তাহার নিকট ক্রীতদাসবৎ থাকিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুরাপ্রভাবে নীলোৎপলা সত্যই যদি এই অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেইই মহাশকুন্তের এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। নীলোৎপলার বাক্যগুলি পুনরায় চার্ব্বাকের মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে তাহার মনস্কাম যদি পূর্ণ হয় তাহা হইলে চার্ব্বাকের জীবনের অর্থ সমস্যাও সে সমাধান করিয়া দিবে। চার্ব্বাককে আর কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে না। চার্ব্বাক চিন্তা করিতেছিল—কি করা উচিত? নীলোৎপলার নিকট ফিরিয়া যাওয়াই কি সঙ্গত হইবে? স্বার্থের দিক দিয়া ভাবিলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু চার্ব্বাকের ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় যে বর্ণ সমারোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা যেন বর্ণের অবর্ণনীয় ভাষায় তাহাকে বলিতেছিল, তোমার নিকট তো দশটি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে, তবে আবার কেন ওই কুৎসিৎ উপযাবিকার নিকট যাইতে চাহিতেছ, তোমার মানসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর, মধ্যপ্রদেশ কত দূর?

চার্ব্বক সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণচূড়ার শিখরে শিখরে কামনার লেলিহান শিখা জলিতেছে, স্বর্ণকান্তি চম্পকের উগ্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, বকুল তরুর নিম্নে সহস্র সহস্র বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, ধাপে ধাপে স্বর চড়াইয়া পাপিয়া সারা আকাশকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এক অনির্ব্বচনীয় রসে চার্ব্বাকের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল তাহার জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি যদি সুরঙ্গমার হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে তাহা হইলে সে যুক্তির মূল্য কি? সুরঙ্গমাকে কাছে পাইলে··· সহসা সে দেখিতে পাইল চক্রবালরেখালগ্ন পথ বাহিয়া শকটশ্রেণী চলিয়াছে তাহার মনে হইল ওই শকটচালকগণ নিশ্চয়ই দেশে পথঘাটের সহিত পরিচিত, কোন পথে গেলে মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায় এ খবর উহারাই হয়তো দিতে পারিবে আর কালবিলম্ব না করিয়া চার্ব্বাক শকটশ্রেণীর উদ্দেশে পদচালনা করিল। সম্মুখে বিরাট প্রান্তর। নির্মে আকাশে প্রখর সূর্য্য জলিতেছে। উপল-বহুল প্রান্ত অমসৃণ ও বন্ধুর। চার্ব্বাকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল, তাহার সমগ্র সত্তা একাগ্র হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে বকুল চম্পকের গন্ধে, কৃষ্ণচূড়ার বর্ণ-মহিমায়, নীলাকাশে প্রতিফলিত স্বচ্ছ স্বর্ণকিরণ জালে, পাপিয়ার আকুল সঙ্গীত ধারায় যাহা সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার জীবনেও আনন্দময় রূপ পরিগ্রহ করিবে—যদি সে সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিতে পারে এবং কিছুদিন যদি সে সুরঙ্গমা

।কটে থাকিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহার অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিশ্চয়ই- সে আলোকপাত করিতে ।রিবে এবং আলোকপাত করিলেই……।

শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া চার্ব্বাক ছুটিতে লাগিল।

চার্ব্বাকের মাথার উপরে দুইটি চিল চক্রাকারে ড়িতেছিল। প্রথম চিল দ্বিতীয় চিলকে সম্বোধন করিয়া লিল, "পিতামহ, ছুটন্ত চার্ব্বাককে দেখে কি বুঝতে রেছেন যে এর পর ও কি করবে ?"

"না, ঠিক পারছি না। ভৃগু হয়তো পারতো। যে কম ছুটছে ভয় হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে' না যায়—বা! বেশ াগছে কিন্তু দেখতে—"

"আমি তো বলেছিলাম আপনার যে কোনও সৃষ্টির াতি মুহূর্ত্তের বিকাশ যদি লক্ষ্য করতে পারেন, তা কাব্যের তো মনোরম হবে—"

"দেখ, দেখ, বেশ বড় একটা গর্ত্ত ও একলাফে পার য়ে গেল। বাহাদুর আছে ছোকরা"

"লক্ষ্য করে' দেখলে আপনার প্রত্যেক সৃষ্টিই নানা সের আধার"

"কিন্তু নিজের সৃষ্টির পিছনে দৌড়োদৌড়ি করতে বশীক্ষণ ভাল লাগবে কি! বিশেষ করে' এই চড়চড়ে রোদে—"

"চলুন, ওই বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নওয়া যাক—পাতার আড়ালে বসে বসে' লক্ষ্য করা যাক কি করে ও—"

শাখাপত্র-নিবিড় এক বিশাল মহীরুহের উচ্চ-শিখরে উপবেশন করিয়া পিতামহ বলিলেন, "এখন মন্দ লাগছে ।। ছোকরা এখনও ছুটে চলেছে দেখছি—"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পিতামহ পুনরায় বলিলেন, কিন্তু তুমি যাই বল বাণী, ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে' ানিকটা সময় কাটানো যেতে পারে বটে, কিন্তু আসল আনন্দ কল্পনায়—"

"বেশ তো কল্পনা করুন না আপনি"

"বেশ আমি কল্পনা করছি তুমি তাতে ভাষা দাও। রকম একঘেয়ে বসে' থাকতে ভাল লাগবে না বেশীক্ষণ"

"বেশ। কল্পনা করুন, আমি তাতে ভাষা জোগাই—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিতামহ বলিলেন, "দেখ, কয়েকদিন আগে আমি কল্পনা করেছিলাম তুমি যেন আমাকে ভবিষ্যৎ যুগের চার্ব্বাকের গল্প শোনাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। ওই কল্পনাটাই রং দিয়ে ফলাও করা যাক, কি বল"

"করুন"

"ভবিষ্যৎ যুগের চার্ব্বাকরা কি রকম হবে বল দেখি—"

"বৈজ্ঞানিক হবে। যন্ত্র আবিষ্কার করবে নানারকম—"

"কি করে' বুঝলে—?"

"ওই যে চার্ব্বাক এখন মাঠ ভেঙে ছুটছে আমিই যে তার মনের ভাষা। ও চাইছে ওর শক্তি শতসহস্র গুণ বর্দ্ধিত হোক। যে সীমা ওর চলচ্ছক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তিকে আবদ্ধ করে' রেখেছে সেই সীমাকে ও লঙ্ঘন করতে চায়। সুরঙ্গমাকে দেখবার জন্যে যে কামনা ওকে উতলা করেছে সেই কামনাসিদ্ধির যত রকম বাধা আছে বুদ্ধিবলে তা ও নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায়—"

"ও বাবা!"

"আশ্চর্য্য হচ্চেন কেন এতে। আপনি যে সীমা সৃষ্টি করেছেন সে সীমা লঙ্ঘন করবার বুদ্ধি এবং শক্তিও যে আপনি সৃষ্টি করেছেন"

"তাতো করেছি। কিন্তু সব রকম সীমা লঙ্ঘন করে' ওরা গিয়ে থামবে কোথায় শেষটা"

"ওরাও থামবে না, আপনার কল্পনাও থামবে না।…"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পিতামহ বলিলেন, "আমি একটু আগে কালকূট নামে এক পাতালনিবাসী নাগবংশীয় রাজপুত্রকে কল্পনা করেছিলাম—সে তার প্রেয়সীকে পায়নি, কেবল দূর থেকে তার আভাস পেয়েছিল। তাকেও ভবিষ্যযুগের কল্পনায় আনব কি ?"

"ক্ষতি কি। ভবিষ্যযুগেও ওরকম লোক থাকবে—"

"বেশ। আরম্ভ করা যাক তাহলে—"

"করুন"

শকট শ্রেণীর সমীপবর্ত্তী হইয়া চার্ব্বাক দেখিল যে প্রত্যেক শকটে বৃহদাকৃতি কলস সজ্জিত রহিয়াছে। একজন শকট চালককে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "ভাই,

আমি বড়ই কান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের শকটে একটু স্থান পেতে পারি কি"

"পিছনের কোন শকটেই স্থান নেই। প্রথম শকটে আমাদের নায়ক আছেন, সেখানে স্থানও আছে। তিনি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁর কাছে যান, তিনি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবেন"

"এ সব কলসে কি আছে—"

"ঘৃত"

"এত ঘৃত কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ?"

"কুমার সুন্দরানন্দ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, তাতেই এই সব ঘৃত লাগবে—"

"কোথায় যজ্ঞ হবে ?"

"তা আমি ঠিক জানি না। আমরা শ্রৌণী গ্রামে এই কলসগুলি পৌঁছে দেব। সেখান থেকে আর এক দল শকট এগুলিকে বহন করবে, কোথায় নিয়ে যাবে, আমি জানি না, আমাদের নায়ক হয়তো জানেন"

চার্ব্বাকের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমাদের নায়কের নাম কি ?"

"গুণপতি"

আর বাক্যালাপ না করিয়া চার্ব্বাক প্রথম শকটের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চার্ব্বাককে দেখিবামাত্র গুণপতি হাস্যমুখে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, "আসুন, আসুন, মহর্ষি চার্ব্বাক, আপনাকে এখানে দেখব প্রত্যাশা করি নি। কোথায় চলেছেন"

"শ্রৌণী গ্রামে যাব"

"আমরাও তো সেখানে চলেছি। সুন্দরানন্দের মহাযজ্ঞে আপনিও একজন ঋত্বিক না কি—"

"আপনার শকটে একটু স্থান হবে কি"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসুন—"

চার্ব্বাক শকটে আরোহণ করিল। পূর্ব্বপরিচিত গুণপতিকে দেখিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও তাহার মুখমণ্ডলে সে ভাব প্রকটিত হইল না।

গুণপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি যজ্ঞে যোগদান করতে যাচ্ছেন"

চার্ব্বাক মৃদুহাস্য করিয়া কহিল, "যজ্ঞে যোগদান করাই তো প্রচলিত রীতি"

"নিশ্চয়। এ যজ্ঞটিও একটু নূতন ধরণের হচ্ছে শুনছি বিদেশ থেকে এক ম্লেচ্ছ রাজা এসেছেন। মধ্য-প্রদেশের অরণ্যে সুন্দরানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, বন্ধুত্বও হয়েছে। তিনিই নাকি সুন্দরানন্দকে এই যজ্ঞ করতে উৎসাহিত করেছেন"

"এ যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক কে ?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি যে মহর্ষি পর্ব্বত ও তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ অশ্ববাহিত রথে কয়েকদিন পূর্ব্বে যাত্রা করেছেন। আপনিও নিশ্চয় নিমন্ত্রিত হয়েই যাচ্ছেন ?"

চার্ব্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল গুণপতি ব্যঙ্গ করিতেছেন কি না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছুই দেখা গেল না যাহা সন্দেহজনক।

"না, আমি নিমন্ত্রণ পাই নি। আমি তো ছিলাম না"

"কোথায় গিয়েছিলেন আপনি"

"দেশভ্রমণ করে' বেড়াচ্ছি"

"ও"

এইবার কিন্তু গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন হাসির আভা ধরা পড়িল। চার্ব্বাক বুঝিতে পারিল যে গুণপতি সমস্ত খবরই জানেন। চার্ব্বাক নীরব হইয়া রহিল।

গুণপতি বলিলেন, "তাই আপনার বাড়ি গিয়ে আপনার দেখা পাই নি"

চার্ব্বাক নীরব হইয়াই রহিল। কারণ—ঠিক ইহার পরই যে প্রসঙ্গ অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা হইতেছিল তাহা প্রীতিকর তো নহেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অসুবিধাজনকও।

গুণপতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "অবশ্য এটা আমি জানি যে আমার টাকা মারা পড়বে না। যেদিনই আপনার সঙ্গে দেখা হবে সেইদিনই আপনি ঘিয়ের দামটা দিয়ে দেবেন।"

চার্ব্বাক বুঝিল—বিস্মৃতির দোহাই না পাড়িলে মানরক্ষা হইবে না।

"আপনি ঘিয়ের দাম পাবেন না কি আমার কাছে! আমার মনেই নেই"

"তাতে কি হয়েছে। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তো আপনাদের মনে থাকবার কথাও নয়। কত বড় বড় দার্শনিক ব্যাপার নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন আপনারা।"—

গুণপতির অতিবিনীত ভাষণে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহাতে চার্ব্বাক বিশেষ বিব্রত বোধ করিল না। এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গ ও রূঢ়তর ব্যবহারে সে অভ্যস্ত ছিল। মনে মনে সে চিন্তা করিতে লাগিল গুণপতির সহিত কিরূপ আচরণ এখন সঙ্গত অর্থাৎ সুবিধাজনক হইবে। বৎসরাধিককাল গুণপতি তাহাকে ধারে উৎকৃষ্ট ঘৃত সরবরাহ করিয়াছে। সমস্ত মূল্য যদি এখনই শোধ করিতে হয় অন্তত দুইটি স্বর্ণমুদ্রা খরচ হইয়া যাইবে। খরচ করিতে চার্ব্বাকের আপত্তি ছিল না, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করিয়াই সে শঙ্কিত হইতেছিল। মাত্র দশটি স্বর্ণমুদ্রাই তাহার সম্বল, তাহার পঞ্চমাংশ যদি ঋণ-শোধ করিতেই চলিয়া যায় তাহা হইলে—। সহসা চার্ব্বাক ভীত হইয়া পড়িল। সুন্দরানন্দের রাজত্বে কেবল গুণপতির নিকটেই যে সে ঋণী তাহা নয়, অনেকেই তাহার নিকট টাকা পাইবে। সুরা-বিক্রেতা সুসেনও কি সুন্দরানন্দের যজ্ঞ দেখিতে যাইতেছে না কি! তাহার নিকট যে অনেক ধার! ব্যাধ গম্ভীরের নিকটও অনেক মৃগমাংস ও বন্যকুক্কুটের মূল্য বাকী আছে। ইহাদের সকলের সহিত যদি সাক্ষাৎ হইয়া যায় তাহা হইলে তো সে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে! কিন্তু—। সহসা সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। সুরঙ্গমার নিকট যখন যাইতেই হইবে তখন গুণপতিকে খুশী না করিয়া উপায় নাই।

"কত পাবেন আপনি ?"

"বেশী নয়। মাত্র পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রা—"

"আমার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আছে"

"বেশ, আমি ভাঙিয়ে দেব"

চার্ব্বাক স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিতে লাগিল।··(ক্রমশঃ)

কাশ্মীরে শ্রীঅমরনাথ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

ছয়

মার্ত্তণ্ড ও বৈষ্ণো দেবী

পূজাদি সাঙ্গ করে বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ আমরা গুহামন্দির থেকে ফেরার পথে বেরিয়ে পড়লুম। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয় নি, তার ওপোর প্রচণ্ড পথশ্রম, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে দৈহিক কষ্ট বলে কিছুই অনুভব করি নি। কাপড়-চোপড় যা কিছু সবই ভিজে গিয়েছিল, এতক্ষণে সেগুলি সমস্তই ·গায়ে প্রায় শুকিয়ে গেছে, আবার পথে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পিছল, সেই বৃষ্টি, সেই জীবনাশঙ্কা। পথও সেই চার মাইল। ধীরে ধীরে বরফের বিস্তৃতি পার হয়ে বেলা একটা নাগাদ আবার পঞ্চতরণীর তাঁবুতে ফিরে আসা গেল। রান্না খাওয়া করতে করতেই বিকাল হয়ে এলো এবং এই সময় এক অপূর্ব্ব জিনিষ দেখ্‌লুম।

বেলা তখন বোধ হয় চারটা হবে, হঠাৎ সুরু হোল মেঘগর্জ্জন। কিন্তু মেঘের ডাকের মতো একবার দুবার নয়, সেই মেঘগর্জ্জন একটানা ভাবে চল্‌তে লাগলো। পুলিস ও মিলিটারীরা বাইনোকিউলার নিয়ে দেখতে সুরু করলে, আমরাও দেখ্‌তে লাগলুম। আমাদের তাঁবুর পাশের পাহাড়টার ওপোর দিয়ে ওপারের পাহাড়ের ওপোর যেন মেঘ গড়িয়ে আসছে, শুন্‌লুম, ঐটাই ল্যাণ্ডস্লিপ। পাঁচ ছয় মাইল পরিমিত লম্বা একখানা পাহাড়ের প্রকাণ্ড ধ্বস ভেঙ্গে পড়ছে। অভিজ্ঞরা বল্লে যে, যদি ঐ ধ্বসটা আমাদের পাশের পাহাড় থেকে ভাঙ্গতো, তাহলে আমরা সবশুদ্ধ ভেঙ্গেচুরে গুঁড়ো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতুম, কিন্তু সে ভয় নেই, ওটা দু'খানা পাহাড়ের পেছনে নামছে। দ্বিতীয় ভয় এই যে, যদি ঐ পাহাড় ভেঙ্গে এসে কোন নদীর জলধারাকে বুজিয়ে দেয়, তাহলে সেই জলস্রোত অন্য পথ না পেয়ে এদিকে এলেও আমরা সবশুদ্ধ ভেসে যেতে পারি, অতএব—

কিছুক্ষণ পরে ওয়াকিবহাল লোকেরা এসে খবর দিলে যে সে আশঙ্কা নেই, কিন্তু পুলিস থেকে জানিয়ে দিলে যে আগামী কাল ১৮ই আগষ্ট শনিবার একেবারে চন্দনবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতে হবে, কারণ যে রকম বৃষ্টি চল্‌ছে, এতে তুষারপাত হতে পারে এবং তাহলে মানুষ অনেক মরবে, আর ঘোড়া একটাও বাঁচবে না। অতএব বুঝলুম পরের দিন সেই ১৪ হাজার ফিট উঁচু পাহাড় পার হয়ে বরফ, বৃষ্টি ও পিছলের মধ্য দিয়ে একটানা ১৬ মাইল পথ হাঁটতে হবে, অন্য উপায় নেই।

শুক্রবার রাত্রে ঘি-মাখানো হাতে-গড়া রুটী চিনি সহযোগে গলাধঃকরণ করে ভিজে তাঁবুতেই ঘুমানো গেল, পরের দিন ভোরবেলা শক্ত শুকনা বাসি রুটী গোলা-দুধের সঙ্গে খেয়ে মালপত্র বেঁধে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লুম। পঞ্চতরণী থেকে বায়ুজানের ৮ মাইল খালি চড়াই, বহু কষ্টে এই রাস্তাটা পার হওয়া গেল। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে মোট চারজন যাত্রীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। শীতে ও বৃষ্টিতে জমে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মৃতদেহগুলির তত্ত্বাবধান করবার জন্য ধারে কাছে কাউকেই দেখলাম না। এইভাবে ৮ মাইল এসে বায়ুজানে আমার দলের লোকদের সঙ্গে একত্র হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হতে পারি নি এবং সেই দ্বিধাজড়িত মুহূর্ত্তে কি ভাবে যে অজ্ঞাতকুলশীলা শরণকুমারী এসে আমায় সাহায্য করেছিল তা পূর্ব্বেই বলেছি। যাই হোক, শরণকুমারীর নির্দ্দেশমত বায়ুযান থেকে রওনা দিয়ে পরবর্ত্তী আট মাইল পথ অপেক্ষাকৃত আরামেই আসা গেল, কারণ ঐ পথটা উৎরাই-এর পথ। পথে বহুবার বসতে হয়েছে, জানা-অজানা বহু লোকের সঙ্গে বহু রকম কথা ও গল্প হয়েছে। সুখদুঃখের কথা, আধ্যাত্মিক কথা, ভ্রমণের গল্প—কখনও ইংরাজীতে কখনও হিন্দীতে কখনও বা আধা হিন্দী আধা উর্দ্দুতে। এই সব কথার মধ্যে কাশ্মীরের রাজনীতির যা একটু আভাস পেলুম, তা যদি সত্য হয়, তাহলে শঙ্কিত হওয়ার ব্যাপারই বটে। কিন্তু ভয় হয়, সে কথা বল্‌তে গেলে আমাদের অতি-বিচক্ষণ ধুরন্ধররা হয়ত সাম্প্রদায়িকতা বলে অন্যরূপ উৎপাতের সৃষ্টি করে বসবেন। কাহিনীটী যার কাছে শুনলুম, তিনি নিজের পরিচয় দিলেন সরকারী ডাক্তার বলে, তাঁকে আমি চিনতামও বটে, অর্থাৎ এই ক'দিন তাঁকে রোগীদের চিকিৎসা করতেও দেখেছি।

ডাক্তারটি কাশ্মিরী হিন্দু, বিরাট দেহ, সত্যকার সুপুরুষ চেহারা। দশ বারো মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করে চন্দনবাড়ী থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হাঁটছিলেন। আমি তখন একটা পাথরের ওপর খানিকক্ষণের জন্য বসে আমার ক্লান্ত পা' দুটোকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি। আমাকে দেখেই তিনি ইংরাজীতে বল্লেন, যাত্রা কেমন হোল'?

বল্লুম, ভালোই এবং তারপর উঠে তাঁরই সঙ্গে একসঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌লুম।

একথা সেকথার পর রাজনীতি এসে পড়লো। আমি প্রশ্ন করলাম। ডক্টর সাব, রাজা আর শেখ আব্দুল্লা এই দু'জনের মধ্যে কার রাজত্বকাল ভালো বলে মনে হয়?

তিনি কোন উত্তর না দিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌লেন। ক্ষমা চেয়ে বল্লুম, অবশ্য আমি তীর্থযাত্রী, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বোধ হয় আমার অন্যায় হয়েছে, মাপ করবেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ বল্লেন, না অন্যায় কিসের। Politics is our life blood, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা অন্যায় কিসের?

তারপর বল্লেন, দেখুন, আপনাদের বাংলা দেশের সারওয়ার্দ্দী সাহেব এবং কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, তবে পথ ভিন্ন। এবার বুঝ্‌লেন।

বল্লুম, ঠিক না, ব্যাপারটা কি?

তিনি বল্লেন, ব্যাপার এই যে, দুজনেই সমান সাম্প্রদায়িক, তবে শেখ আবদুল্লার হিন্দুদের সঙ্গে মৌখিক ব্যবহার খুব ভালো। হিন্দু ও মুসলমান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে হিন্দুর সঙ্গে আগে দেখা করেন, অনেকক্ষণ কথা বলেন, সমস্ত শোনেন এবং যতরকমে সম্ভব আশ্বাস দিয়ে থাকেন। আর কোথাও কোন রকম সাম্প্রদায়িক দ্বন্দের আভাসটুকু পেলেই তিনি মুসলমানদের খুব কঠোর হস্তে দমন করেন, কিন্তু—বলে থেমে গেলেন।

কিন্তু কি?

একটু থেমে বল্লেন, কিন্তু হিন্দুর কোন সুবিধাই আর খাস কাশ্মীরে নেই। হিন্দুর যত জমী জায়গা ছিল সমস্তই বিনা খেসারতে কেড়ে নিয়ে প্রজা সাধারণের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমানের মধ্যে বিলি করা হয়ে গিয়েছে। যত জমীদারী কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র দুজন ছিল মুসলমান ছোট জমীদার, বাকী সমস্তই হিন্দু। এঁরা কেউ কোন খেসারত পান নি? তবে মুসলমান জমীদার দুজন কাশ্মীরে নতুন যে সরকারী যানবাহন বিভাগ হয়েছে, সেই বিভাগে যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছেন। এত সুবিধা পেয়েছেন যে, জমীদারী যাওয়ার তুলনায় তাদের লাভই হয়েছে বেশী, কিন্তু কোন হিন্দুই এই যানবাহন বিভাগে স্থান পায় নি। এ ছাড়া সরকারী চাকুরেদের মধ্যে হিন্দুদের চাকুরী প্রায় সমস্তই একে একে শেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ নতুন কোন হিন্দুই আর চাকুরী পাচ্ছে না। সংবাদ জান্‌তে চাইলে সরকার বলেন যে আমরা অসাম্প্রদায়িক বলে হিন্দু মুসলমান হিসাবে কোন সংখ্যাতত্ত্বের বিচার করি না। যেমন ক'জন লম্বা লোক চাকরী পেলে এর কোন হিসাব রাখা হয় না, তেমনি চাকুরিয়াদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুসলমান সে সংবাদ আমরা রাখি না, ইত্যাদি।

একটু থেমে বল্লেন, খাতায় কলমে এ হিসাব আছে কি না জানি না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভেতরে ভেতরে এ হিসাব আছে এবং হিন্দুদের চাকুরী ধীরে ধীরে খতম হয়ে যাচ্ছে। কিরকম করে জানেন? এই ধরুন, আমি ডাক্তার, আমার বিলাতী ডি পি এইচ্‌ ডিগ্রি আছে। এই রকম ডিগ্রিধারী কোন কাশ্মীরী মুসলমান ডাক্তার নেই, তাই আমার চাকরী এখনও আছে। সম্প্রতি একজন মুসলমানকে সরকারী খরচে বিলাতে পাঠানো হয়েছে। এই মুসলমানটি সেখান থেকে পাশ করে এলেই তাকে আমার অধীনে কাজ করতে দেওয়া হবে। সেও খুব মন দিয়ে বিনীতভাবে আমার অধীনে ছ'মাস কাজ করে ভালো ভাবে সবটুকু শিখে নেবে। তারপর তাকে আমার পদে বহাল করে, সরকার থেকে আমাকে চাকুরীতে প্রোমোশন দিয়ে খুব বেশী বেতনে একটা নতুন পদ তৈরী করে সেখানে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, হয়ত এই যে একটা নতুন পদ তৈরী হবে, এই নিয়ে গোটা একটা ডিপার্টমেন্টই গড়ে উঠ্‌বে, তাতে বেছে বেছে যত হিন্দু বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী করছে, তাদের অনেককেই প্রোমোশন দিয়ে বেশী মাইনেয় এই নতুন বিভাগের বিভিন্ন পদে এনে বসানো হবে, অথচ এদের বিশেষ কোন কাজই থাকবে না। কয়েকমাস এই ভাবে যাওয়ার পর সরকার বলবে মিতব্যয়িতার জন্য সরকারী বিভাগে ছাঁটাই করা দরকার এবং এদিক ওদিকে দু' একটা পদ ছাঁটাই করে

এই নতুন-তৈরী বিভাগটা সম্পূর্ণই ছাঁটাই হয়ে যাবে। অর্থাৎ এইভাবে অনেকগুলি হিন্দুর কাজ একসঙ্গে খতম হয়ে যাবে এবং স্থায়ী চাকুরিয়া বলে এরা কোন স্থবিধাই পাবে না। সংখ্যালঘু হিন্দু দিয়েই বিভাগটা তৈরী, খাস কাশ্মীরে এদের কথা শুনবে কে, কাজেই এর তেমন কোন প্রতিবাদই হবে না। মনে রাখবেন, কাশ্মীরের শতকরা ৯৫ জন অধিবাসীই মুসলমান, অতএব আমাদের নীরবে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বর্ত্তমানে কাশ্মীরী হিন্দুদের অবস্থা এতই শোচনীয়, এমনই অসহায়।

তারপর আরও অনেক কথাই তিনি বল্লেন। বল্লেন—রাজা হরিসিং-এর আমোলে কাশ্মীর ও ভারতের বহু হিন্দু জমীদার ও হিন্দু রাজা মহারাজার চাঁদা নিয়ে বহু টাকা তুলে এখানে একটি সঙ্ঘ তৈরী হয়েছিল তীর্থযাত্রীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। আবদুল্লা সাহেব সেই টাকা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে নিয়োগ করার জন্য উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। ফলে হিন্দু দাতারা সর্ব্বমত অধিকাংশ টাকাই উঠিয়ে নিয়েছেন। ফলে সেই সঙ্ঘ নামেই আছে, কাজ কিছুই করতে পারে না।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে কইতে অন্য একজন পথিকের কথা মনে পড়্‌লো। তিনিও কাশ্মীরী। তিনি বলেছিলেন যে, আজ যে কাশ্মীরে এত যুদ্ধের আয়োজন চল্‌ছে, এ সমস্তই আপনাদের ভারত সরকারের অব্যবস্থিতচিত্ততার বিষময় পরিণাম। প্রথম যখন কাশ্মীরে পাকীস্থানী ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল, তখন যদি অসময়ে হঠাৎ যুদ্ধবিরতির নির্দ্দেশ আপনাদের ভারত সরকার থেকে না আস্‌তো, তাহ'লে আর এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কাশ্মীর থেকে পাকীস্থানী সৈন্যদের সমূলে উৎখাত করে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হোল না। হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতির হুকুম দিয়ে স্বেচ্ছায় দয়া করে দেশের মধ্যে শত্রুকে জিইয়ে রাখা হোল, কাজেই আজ তিন বৎসর ধরে কিছুতেই এর মীমাংসা হচ্ছে না। তিনি আরও বলেছিলেন যে, কাশ্মীরে গণপরিষদ গঠনের কি প্রয়োজন হোল, তা আমরা বুঝি না। হায়দ্রাবাদে গণপরিষদ্ গঠন করার দরকার হোল না, যে পাতিয়ালা আলাদা শিখিস্থান চাই বলে দাবী করেছিল, সেখানে আলাদা গণপরিষদ হোল না, রাজস্থানে হোল না, হঠাৎ কাশ্মীরে এরকম আলাদা ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন কি হোল কেউ বলতে পারেন কি? এ সব আর কিছুই না, এর অর্থ হচ্ছে কাশ্মীরে হিন্দু রাজার প্রভাব কমিয়ে দিয়ে অন্যায়ভাবে মুসলমানকে তোষণ করার অপচেষ্টা। তিনি বল্লেন, কাশ্মীরে যুদ্ধের আবহাওয়া জাগিয়ে রাখলে ভারতের অপব্যয়, আর কাশ্মীরের লাভ। কারণ কাশ্মীরের রক্ষণাবেক্ষণ, যোগাযোগ রক্ষা এবং বৈদেশিক সম্বন্ধ রক্ষার ভার আছে ভারতের ওপোর। কাশ্মীর সরকার যুদ্ধের অজুহাতে বহু মাইল মোটর যাওয়ার উপযুক্ত রাস্তা তৈরী করছে, স্থানে স্থানে স্থায়ী সেনানিবাস, টেলিগ্রাফের লাইন এবং আরও অনেক কিছু করাচ্ছে। এ সমস্তই হচ্ছে ভারত সরকারের খরচে, কারণ দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের হাতে। আমাদের সন্দেহ হয় যে, ভারতের খরচে এই সব করিয়ে নিয়ে শেষে কাশ্মীর সরকার বল্‌বেন, স্বাধীন কাশ্মীর আর না হয় ত কোনরকম গোলমাল করে পাকীস্থানের সঙ্গে এমন একটা স্বতন্ত্র চুক্তি এই কাশ্মীরী গণপরিষদ তৈরী করে বস্‌বে যে, যাতে করে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আর একবার বিস্ময় প্রকাশ করবেন এবং শেষে ৯০ মিনিট বা ১০০ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতা দিয়ে অথবা ১৮,০০০ শব্দ সম্বলিত এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে সমস্ত গলদ ও হিমালয় সদৃশ ভুলটিকে ধামা চাপা দিয়ে দেবেন এবং আপনারা "মলিন তাস সজোরে ভেঁজে" আর একবার নেহেরুজীকি জয় বলে চিৎকার করে উঠ্‌বেন।

তীর্থযাত্রীর এত সব রাজনীতিতে কোন দরকার নেই, অতএব আর বাহুল্যে প্রয়োজন কি। তবে এইটুকু বলে রাখি যে, কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানের মুসলমান ইতর ভদ্র, পানওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা থেকে সুরু করে এম বি, বি এস্ মুসলমান ডাক্তার, বড় দোকানের মালিক, বাস্ কোম্পানীর পদস্থ অফিসার যাকেই কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই প্রকারান্তরে এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছে যে, ভারতের হিন্দু-কংগ্রেসের অধীনে থেকে চিরদিন গোলামী করার চাইতে "খুদ্ আপ্‌না রাজ" ভোগ করা অনেক ভালো। ওরা সকলেই স্বাধীন কাশ্মীর চায়, অপরপক্ষে মনে মনে ওরা পাকীস্থানের এতই পক্ষপাতী যে, এতদিনে দেশটা হয়ত পাকীস্থানেই চলে যেত, কিন্তু সেই যে প্রথম পাকীস্থান থেকে আততায়ীর দল কাশ্মীরে ঢুকেছিল—তারা চিনতে না পেরে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের ওপোর এমনই অত্যাচার চালিয়েছিল যে, তাইতে মুসলমানরা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, নইলে কাশ্মীরকে হিন্দুস্থানে এতদিন রাখা হয়ত সম্ভবই হোত না। কাজেই এই সঙ্গে এটা অনুমান করা যায় যে, গণভোট হলে হিন্দুস্থানের তেমন কোন আশা নেই। অবশ্য বাইরে থেকে হিন্দুর প্রতি মুসলমানদের ব্যবহার অতি ভদ্র ও অত্যন্ত অমায়িকতাপূর্ণ। হিন্দুর সঙ্গে বাহ্যতঃ কোন বিসদৃশ ব্যবহার একজনের কাছ থেকেও একবারের জন্যও পাই নি, কিন্তু ভাবগতিক যা দেখ্‌লুম এবং লোকমুখে যা শুনলুম, তা আশাপ্রদ বলে মনে হয় না।

শনিবার '১৮ই আগষ্ট বিকালের দিকে ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা চন্দনবাড়ীতে এসে তাঁবু ফেলে বসে গেলুম। খাওয়া শেষ করতে রাত্রি হয়ে গেল এবং পর দিন সকালে আহারাদি শেষ করে পুনরায় ৮ মাইল হেঁটে দুপুরে পহেলগাঁও এসে পৌঁছুলাম।

রবিবার ১৯-এ আগষ্ট দুপুরে পহেলগাঁও পৌঁছে তাঁবুওয়ালার তাঁবু ফিরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বাস্ পাওয়া গেলো ও সেই বাসে শ্রীনগরে ফেরার পথে মার্ত্তণ্ড নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলুম।

মার্ত্তণ্ড বা চলতি ভাষায় মাটন একটি ছোট পুরাতন কাশ্মীরী গ্রাম। এখানে অমরনাথের বহু পাণ্ডা বাস করে, আমাদের পাণ্ডারও এইখানেই বাস। তার বাড়ীতে দু'দিন থাকা গেল। কাশ্মীরের মধ্যে এই মার্ত্তণ্ড একটি অত্যন্ত বিখ্যাত জায়গা। এখানে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন এক মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্যের মন্দির আছে। মন্দিরের ছাত ভেঙ্গে পড়েছে, খালি নিচের অংশটা ঠিক আছে। বিগ্রহ কিছু নেই, কে যে কবে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তাও জানি না। উঁচু টিলার ওপোর এই মন্দির প্রাচীন ভাস্কর্য্যের নিদর্শনরূপে বিরাজমান, ইতিহাস আলোচনা করলে এইটুকু জানা যায় যে, এই মন্দিরটি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা

রামাদিত্য ও তাঁহার পত্নী অমৃতপ্রভার চেষ্টায় নির্ম্মিত এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা ললিতাদিত্যের চেষ্টায় সংস্কৃত হয়েছিল। এর ভিতটি ২২৫ ফিট লম্বা ও ১৫০ ফিট চওড়া এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার যে পাদপীঠ রয়েছে সেটির আয়তন ২১ বর্গগজ। ৮৪টি বড় বড় একখানি পাথরের তৈরী থামের ওপোর মন্দিরের প্রস্তরময় ছাদটি অবস্থিত ছিল, কিন্তু সেই ছাদ আর এখন নেই। এখন এই মন্দিরটি ইতিহাসের স্মৃতি-চিহ্নরূপে অনেকটা কোনারকের সূর্য্যমন্দিরের অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের পাণ্ডার কাছে শুনলাম যে, এতদিন পর্য্যন্ত এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারী খরচে একজন হিন্দু কিউরেটর ও দু'জন হিন্দু মালী ও একজন দরোয়ান ছিল, কিন্তু গত একবছরের মধ্যে সেই সব হিন্দুরা সরে গিয়ে সব ক'জনই মুসলমান হয়ে গেছে। ডাক্তারের কথা-গুলো স্মরণ করতে করতে সেই প্রাচীন বিগ্রহহীন মন্দির দেখে টিলা থেকে নেমে এলুম।

মার্ত্তণ্ডে বাস্ গাড়ী যেখানে দাঁড়ায়, সেই বড় রাস্তার ধারে এখনকার তৈরী নতুন মন্দির দেখলুম। চত্বরের মধ্যে বিভিন্ন মন্দিরের একটিতে রামসীতা ও অন্যটিতে শিব আছেন। মন্দিরের উঠানে কতগুলি বাঁধানো জলাশয় আছে, সেখানে মাছের কি ভিড়। এর প্রধান পুষ্করিণীর নাম মৎস্যকুণ্ড। এদেশে মাছ ধরা হয় না, বরং মাছদের রুটী, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়ান হয়। যাত্রীরা এইখানে পূর্ব্বপুরুষের নামে পিণ্ডদান করে। এ ছাড়া মার্ত্তণ্ডের মধ্যে এক অতি সংকীর্ণ ও বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত গুহা আছে। গুহাটির নাম 'বুমজু' গুফা'। রাস্তা থেকে আন্দাজ ২০ ফিট উঠে এই গুহার মুখ। হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে আমরা পাণ্ডাদের ছেলেদের সঙ্গে সেই গুহায় প্রবেশ করলুম। প্রায় একশ ফুট গুঁড়ি মেরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে দেখ্‌লুম। লিঙ্গমূর্ত্তির অনতিদূরে সেই গুহার মধ্যেই এক সমাধি আছে। শুনলাম, এক সাধু ঐ খানেই শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর ভক্তরা ঐখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করেছেন। এই সমাধির পিছনেও টর্চ দিয়ে দেখলুম, অনেকদূর পর্য্যন্ত এই গুহা চলে গিয়েছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই গুহার এক মুখ চীন দেশে, অপর মুখ তিব্বতের মানস সরোবর পর্য্যন্ত চলে গেছে। সত্যমিথ্যা জানি না, গুহাধিষ্ঠাতা মহাদেব ও তাঁহার সমাধিস্থ ভক্তকে প্রণাম করে গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরের আলো বাতাসে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

মার্ত্তণ্ডে এই গুহার কাছে পাহাড়ের কোলে আর একটি রামসীতার মন্দির আছে এবং অনেক ওপোরে পাহাড়ের চূড়ায় ছোট একটি চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে। চণ্ডীদেবীর মন্দিরটি যে পাহাড়ে অবস্থিত, সে পাহাড়টি পাথরের নয়, শক্ত নিরেট এঁটেল মাটীর পাহাড়। এই পাহাড়ে কোন-রূপ জলের ধারা বিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমানের নির্ব্বাসিত রাজা হরিসিং এই সব পাহাড়ে নদীর একটি জলধারাকে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ে এসে পাহাড়গুলিকে উর্ব্বরা করে তুলেছেন। পহেলগাঁও-এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,২০০ ফিট, এই পাহাড়ের উচ্চতা ছয় হাজার ফিটের কিছু কম। তিনি সুদক্ষ স্থপতিদের দ্বারা পহেলগাঁও-এর লম্বোদরী নদীর একটি শাখাকে পাহাড়ের ওপোর দিয়ে টেনে এনে নানা-রকম লক্‌গেটের সাহায্যে এই বিস্তৃত পাহাড়গুলির সর্ব্বস্থানে ছোট ছোট জলধারা প্রবাহিত করিয়ে জায়গাটাকে কৃষির উপযোগী করে তুলেছেন। তদবধি এখানকার এই সব ক্ষেত্রে কৃষকরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করবার সুযোগ পেয়েছে। হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে এখানকার সকল অধিবাসীই এই সূত্রে মহারাজ হরিসিংহের নামকে প্রাতঃস্মরণীয় করে রেখেছে, কিন্তু রাজনীতির ভৈরবীচক্রে এই রাজা এখন নির্ব্বাসিত। বর্ত্তমানের রাজনৈতিকরা এই রাজাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই অভিহিত করেন।

মার্ত্তণ্ড থেকে টাঙ্গায় চড়ে ৫ মাইল দূরে একজায়গায় যাওয়া হোল। জায়গাটীর নাম আচ্ছাবল। অনন্তনাগ থেকে আচ্ছাবলে যাওয়ার একটি ভালো মোটরের রাস্তা আছে। আচ্ছাবল জায়গাটি একটি ছোট কাশ্মীরী গ্রাম, একপাশে একটি চূনা-পাথরের পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে চূণ মিশ্রিত অনেকগুলি ঝরণা নিচে নেমে একত্রিত হয়ে 'অরপত' নামক এক নদীর সৃষ্টি করেছে। চূনাপাথরের পাহাড়, ঝরণা নদী, অসংখ্য প্রাচীন ও বৃহৎ চানার গাছ এই সমস্ত মিলে আচ্ছাবলকে একটা প্রকৃতিনির্ম্মিত মনোরম উদ্যানপল্লীতে পরিণত করেছে। এখানেও তাঁবু ফেলে বাস করার মত বেশ সমতল দুর্ব্বামণ্ডিত ক্ষেত্র আছে। শুনলাম সৌখীন শিকারীরা এখানে শরৎকালে নানাজাতীয় পাখী শিকারের লোভে দল বেঁধে প্রতি বৎসর শুভাগমন করে থাকেন।

মার্ত্তণ্ডে দু'রাত্রি' কাটিয়ে আমরা ২১-এ আগষ্ট মঙ্গলবার দুপুরে এক ট্যাক্সি বা মিলিটারী ধরণের ষ্টেশন-ওয়াগনে চড়ে বিকালে এসে পৌঁছুলাম শ্রীনগরে। এবার ওঠা গেল কাশ্মীর গেষ্ট হাউস নামক মীরা কদলের উপরিস্থ পাকা-বাড়ীর হোটেলের তিনতোলায়। পরদিন সকালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল এয়ার ওয়েজের অফিসে ঘোরাঘুরি করে শ্রীনগর থেকে অমৃতসর পর্য্যন্ত যাওয়ার উপযোগী সাড়ে তিনখানা প্লেনের টিকিট সংগ্রহ করে মাল-পত্র নিয়ে I. N. A.এর অফিসে এসে পৌঁছে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর শুনলুম যে, বানিহাল পর্ব্বতের ওপর নিদারুণ কুয়াশার জন্য কোন প্লেনই সেদিন যাবে না। অতএব হতাশ হয়ে বিকালে I.N.A. অফিসের সংলগ্ন গ্র্যাণ্ড হোটেলে আশ্রয় লওয়া গেল। পরের দিন, অর্থাৎ ২৩-এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে প্লেনযোগে শ্রীনগর পরিত্যাগ করে বিকাল ৪টার সময় অমৃতসর বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বেলা ৫টা নাগাদ অমৃতসর ষ্টেশনে আসি এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতাগামী পাঞ্জাব মেলে বহুকষ্টে স্থান সংগ্রহ করে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ২৫শে শনিবার বেলা সাড়ে দশটায় হাওড়ায় পৌঁছাই।

শ্রীনগর থেকে সোজা কলকাতায় ফেরার মধ্যে একটা বাসনা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। আমাদের ইচ্ছে ছিল, শ্রীনগর থেকে প্লেনে জম্মু এসে জম্মু থেকে প্রায় অজ্ঞাত বৈষ্ণো দেবীর গুহামন্দির দর্শন করে তবে ফিরবো, কিন্তু কলেজের ছুটী প্রায় ফুরিয়ে আস্‌ছিল বলে এই বাসনা মুলতুবী রাখতে হয়েছিল। তবে নিজেরা যেতে না পারলেও প্রসঙ্গতঃ জম্মু ষ্টেটের অন্তর্গত বৈষ্ণো দেবীর উল্লেখ করে যাই, কারণ এ সম্বন্ধে কোন গাইড

বুকে কোন উল্লেখই বড় পাওয়া যায় না। নিম্নের তথ্যগুলি visitors' Bureau থেকে সংগ্রহ করেছিলুম এবং ভাবী ভবঘুরে পাঠকদের লক্ষ্য করে এই বিবরণটি পরিবেশন করলুম। হয়ত তাদের প্রয়োজনে লাগ্‌তে পারে।

বৈষ্ণো দেবীর মন্দির জম্মু থেকে ৪২ মাইল দূরে সমুদ্রস্তর থেকে ৬,০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই মন্দিরে তিনটি প্রাচীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, গায়ত্রী, সরস্বতী ও মহালক্ষ্মী। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এই মন্দিরে মেলা হয় অর্থাৎ পুজাবকাশে যে সব যাত্রী কাশ্মীরে যান তাঁরা স্বচ্ছন্দে এই মেলা দেখে আস্‌তে পারেন। অবশ্য অন্য সময়েও চেষ্টা করে নিজেদের ওপোর সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে যাওয়া যায়।

জম্মু থেকে বৈষ্ণো মন্দিরের দিকে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত কাট্‌রা নামক গ্রাম পর্য্যন্ত মোটর-বাস্ যায়। কাট্‌রা থেকে বাকী ৯ মাইল মাত্র পাহাড়ীয়া পথ পদব্রজে কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে যেতে হয়। এই কাট্‌রা গ্রীষ্মকালে সাধারণের স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত হয় এবং অক্টোবরে এই কাট্‌রা তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থল। মেলার সময় এখানে লোকসমাগম হয় বলে কয়েকটি অস্থায়ী দোকান ও হোটেল গড়ে ওঠে।

কাট্‌রা থেকে বৈষ্ণো মন্দিরের পথে এক মাইল দূরে 'চারণ গাদিকা'র মন্দির। এই মন্দিরটি বেষ্টন করে প্রবাহিত হয়েছে একটি পার্ব্বত্য ঝরণা। এখান থেকে পাহাড়ের চড়াই সুরু হয় এবং এই দেবী মন্দিরে যাত্রীরা পর্ব্বতারোহণের শক্তি প্রার্থনা করে। হয়ত এই দেবীই শরণকুমারীর মূর্ত্তি ধরে বিপন্ন তীর্থযাত্রীকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য করে থাকেন।

চারণ গাদিকার মন্দির থেকে তিন মাইল দূরে 'আদ্ কানোয়ারী' বা আদি কুমারীর মন্দির। এখানে একটি বড় পান্থশালা এবং সেই সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে। এখান থেকে আরও তিন মাইল দূরে পর্ব্বতের চূড়ায় 'দৈত্য ভৈরবে'র মন্দির। আদি কুমারী থেকে দৈত্য ভৈরবের পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং কষ্টসাপেক্ষ। ভৈরব মন্দির থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরও দু মাইল এগিয়ে বৈষ্ণো দেবীর মন্দির। যাত্রীরা 'মাতাজীকি জয়', 'বৈষ্ণো দেবীকি জয়' ধ্বনিতে এই অরণ্য পথ মুখরিত করে তাদের যাত্রা সমাপ্ত করে।

বৈষ্ণো দেবীর মন্দির দশ ফুট দীর্ঘ এক সঙ্কীর্ণ গুহার মধ্যে অবস্থিত। গুহার দ্বারদেশে দুই পার্শ্বে দুইটি ব্রোঞ্জের সিংহ মূর্ত্তি আছে। তীর্থযাত্রীরা হামাগুড়ী দিয়ে এই গুহার দশ ফিট অতিক্রম করে গুহামধ্যে প্রবেশ করে। এখানে গায়ত্রী, সরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর তিনটি প্রাচীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গুহার অভ্যন্তরে এক তীব্র ঠাণ্ডা জলের ঝরণাও আছে। অখণ্ড নীরবতার রাজ্যে এই দেবীত্রয় বহু শতাব্দী ধরে প্রায় অজ্ঞাতভাবেই অবস্থান করছেন।

কাশ্মীরের visitors' Bureau প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে মেলার সময় এই পথের তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। জম্মু থেকে নিয়মিত বাস্-সার্ভিস এবং পথিমধ্যে প্রত্যেক বিশ্রামস্থলে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে রেশন দোকান, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কুলী এবং ঘোড়া ভাড়ার সরকারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমস্তই করা হয়। বিবরণ শুনে তীর্থটি বড়ই লোভনীয় বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রথমতঃ ছিল সময়াভাব এবং দ্বিতীয়তঃ মেলার সময় নয় বলে এ যাত্রায় বৈষ্ণো দেবীত্রয়কে উদ্দেশ্যে প্রণাম করেই কাশ্মীর রাজ্য থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলুম।

পাহাড়, ঝরণা, হ্রদ এবং নদীর দেশ কাশ্মীর—টিম্বার, মধু, জাফ্রান ও ফলের দেশ এই কাশ্মীর—ভারতখণ্ডে আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশের দেশ এই কাশ্মীর—হিন্দুধর্ম্মের ধারক ও বাহকের দেশ এই কাশ্মীর—হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থ-ক্ষেত্র এই কাশ্মীর—মোগলের দ্বিশতবর্ষব্যাপী অত্যাচারের ফলে ধর্ম্মান্তরিত এই কাশ্মীর—বিভক্ত ভারতের নেতৃহস্তগঠিত সমস্যায় বিপন্ন এই কাশ্মীর—ভূস্বর্গ নামে পরিচিত এই কাশ্মীর—এখানে আমাদের অবস্থান মাত্র অর্দ্ধ মাস ব্যাপী হলেও এর স্মৃতি আমাদের মানস পটে অবিস্মরণীয়। অমরনাথের গুহা মন্দির এখন বরফে সমাচ্ছন্ন, কিন্তু অমরনাথের যে মূর্ত্তি দেখেছি, সেই মূর্ত্তির আভাসমাত্রও যদি পাঠকের অন্তর্নেত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হই, তাহলে আমার এই লেখনীধারণ সার্থক বলেই অন্তরে অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি। ভবিষ্যতে আর কখনও অমরনাথের যাত্রীদলের সঙ্গী হতে পারবো কিনা জানি না, বৈষ্ণোদেবী কখনও অধমকে স্মরণ করবেন কি না জানি না, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত মনে পড়ে, পাহাড়ের গা-ঘেঁসে যাত্রীদল সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে, ঘোড়ার পিঠে চলেছে মানুষ, মালপত্র, তাঁবু, ডাণ্ডী ও পিঠটুতে চলেছে অশক্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং মুখে সকলেই বল্‌ছে—"অমরনাথ জীকি জয়"।

সমাপ্ত

সান্ত্বনা

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

উষর ধূ ধূ মরুর বুকে ফুল ফোটাতে কেন রে চাস্ ?
বৃথাই ঘুরিস্ মিটবে বলে মনের গোপন সঞ্চিত আশ ?
যে নদীতে নাই কলতান, নাইকো কোনো স্রোতের ধারা,
তার তীরে গান বৃথাই গাওয়া হ'য়ে অমন আপনহারা !
স্নিগ্ধ শীতল জলের তরে কেন বৃথাই চেয়ে থাকা,
শূন্য সুনীল আকাশ যখন কাজল মেঘে রয় না ঢাকা !

কেন বৃথাই কেঁদে কেঁদে ললাট রাখা পাষাণ-তলে,
সোনার ছোঁওয়ায় সুপ্ত বেদীর তন্দ্রা বিভোর ভাঙবে বলে ?
বারে বারে আঘাত কেন বৃথাই হানিস্ বীণার তারে,
মূক কভু কি মুখর হবে ?—বাড়বে বোঝা দুখের ভারে।
শান্তি যদি চাস্ রে প্রাণে কাটারে দিন পরের কাজে,
সেবার মাঝে সান্ত্বনা খোঁজ, সান্ত্বনা খোঁজ সবার মাঝে ॥

সাধারণ নির্ব্বাচন

শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার

স্বাধীন ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রীমণ্ডলীও গঠিত হয়েছে। বিশ্বের মধ্যে এত অধিকসংখ্যক লোকের এ ভাবে প্রত্যক্ষভাবে শাসক-নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করার আর কোন নিদর্শন নেই। সমগ্র জগত উৎসুকভাবে এই বিরাট প্রয়োগের দিকে তাকিয়েছিল। কারও কারও মনে আশঙ্কাও ছিল। তাঁদের ভয় হচ্ছিল যে এই গুরুভার বোধ হয় ভারত বহন করতে পারবে না। হয়ত ব্যাপকভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং হিংসার তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সৌভাগ্যবশতঃ এরকম বিপত্তি হয়নি, নির্ব্বাচন সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণও নির্ব্বাচনকালে শান্তিপূর্ণ আচরণ করে। এতে ভারতের অন্তরাত্মার সুস্থ ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। বাপুজী সর্ব্বদা বলতেন যে ভারতের আত্মা শান্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এইজন্য ভারতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান শান্তিময় উপায়েই হওয়া সম্ভব। গণতান্ত্রিক রীতির সাথে অপরিচিত ভারতে প্রথম নির্ব্বাচনের ফলাফল বাপুর পূর্ব্বোক্ত উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

তবে নির্ব্বাচনের এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য খুশী হবার সাথে সাথে নির্ব্বাচনের ফলে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেল, সে সম্বন্ধে আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর দেশের শাসন কার্য্য চালাতে হলে দেশকে পরিচালনা করার দায়িত্ব কোন না কোন দলের উপর পড়বে।

কংগ্রেস এই নির্ব্বাচনে সর্ব্বাধিক সাফল্যলাভ করেছে। কংগ্রেসের এরকম মর্য্যাদা পাওয়া অতি স্বাভাবিক। কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের কথা পর্য্যালোচনা করলে মনে হয় যে এরকম সাফল্য কংগ্রেসের না হলে তা আশ্চর্য্যজনক মনে হত। তবে কংগ্রেসও নিশ্চয় নির্ব্বাচনের ফলাফল অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করছে। বিগত ৬৫ বৎসর যাবত কংগ্রেসই ছিল দেশের একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল এবং কংগ্রেসের নির্দ্দেশে সকল শ্রেণীর দেশভক্ত দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে এসেছে। কংগ্রেসেরই নাম মুখে নিয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সহস্র সহস্র যুবক একদা নিজেদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে দেশের পরাধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে। তাই কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের কথা চিন্তা করলে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রথম নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যে হারে ভোট পেয়েছে, তাকে কোন মতেই স্বাভাবিক বলা যায় না, কংগ্রেসের তো শতকরা একশতটী ভোট পাওয়া উচিত ছিল! এরকম হওয়া তো দূরের কথা, সর্ব্ব সাকুল্যে কংগ্রেসের স্বপক্ষে অধিকাংশ ভোট পড়েনি। তাই তাঁদের ভেবে দেখতে হবে যে এতদিনের জমান সমাজ-সেবার "ব্যাঙ্ক ব্যালান্স" সত্বেও কেন তাঁরা এত কম ভোট পেলেন? এই অত্যল্প কালের মধ্যেই, কি কংগ্রেসের যাট বছরের "ব্যালান্স" ফুরিয়ে গেছে, না অন্য কোন ব্যাপার ঘটেছে? আবার পাঁচ বছরের জন্য যে এই দলের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে, একে তাঁরা যেন কঠিন পরীক্ষা বলে মনে করেন। আত্ম-বিশ্লেষণ করে তাঁদের নিজ দুর্ব্বলতা দূর করতে হবে, সাথে সাথে তাঁদের এ কথাও চিন্তা করতে হবে যে বর্ত্তমান যুগের সমস্যাবলীর সমাধানের আদর্শ পথ নির্দ্দেশ করার জন্য মহাত্মা গান্ধী নামক যে যুগপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পন্থায় তাঁরা স্বাধীনতার গৌরবমণ্ডিত স্বর্ণরাজ্যে উপনীত হয়েছেন, দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সেই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক বর্ণিত উপায়ের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যপদ্ধতি গ্রহণ করে কি তাঁরা দেশকে বাঁচাতে পারবেন? এই সব কথা বিবেচনা করে তাঁদের আগামী পাঁচ বৎসরের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করতে হবে।

কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিকে ভেবে দেখতে হবে যে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁদের অবস্থা আশাজনক মনে হলেও তাঁরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেন নি।

সাম্প্রদায়িক ধুয়োর উপর যে সব দল প্রতিষ্ঠিত, তাদের এ কথাটা বুঝবার দিন এসেছে যে জনসাধারণ তাদের সাথে নেই। তাঁরা যেন জেনে রাখেন যে গান্ধীজীর আত্মদানের সাথে সাথে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়েছে। আজ সাম্প্রদায়িকতার যেটুকু নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় তা যে অগ্নিলীলার ধ্বংসাবশেষ ভস্মরাশি ছাড়া আর কিছু নয়। সে বহ্নি আর প্রজ্বলিত হবে না।

অন্যান্য বিরোধী দলকে একটি কথা ভেবে দেখতে হবে যে কোন তপস্বী তপস্যার ফলস্বরূপ ইন্দ্রাসন পাবার পর যত খুশী বিলাস ব্যসনের স্রোতে গা ঢালুক না কেন, তাঁর আসন কিন্তু নড়ে না। তার চেয়ে অধিক তপস্যার বলযুক্ত কোন ব্যক্তি না আসা পর্য্যন্ত তার ইন্দ্রত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং তাঁদের নিজেদের অবদান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের সামনে যে বিষম সমস্যা—তার সমাধানের জন্য কঠিন ত্যাগ ও কঠোর তপস্যা করতে হবে। এর জন্য নিজ নিজ জীবনের আহুতি দিতে হবে। শুধু অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে তাঁদের ভবিষ্যত রচিত হবে না।

সুতরাং বিগত নির্ব্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলের যে গভীর বিবেচনা করা প্রয়োজন এতে সন্দেহ নেই। আশা করা যায় যে সংশ্লিষ্ট সকলে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে একার্য করবেন, নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের বাস্তব অবস্থা অবশ্য বোঝা গেল ; এখন দেখতে হবে যে জনসাধারণের অবস্থা কেমন এবং তাদের উপর নির্ব্বাচনের কি প্রভাব পড়ল? বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্ব্বাচনের যে সব অদ্ভুত খবর পাওয়া গেছে, তাতে জন সাধারণের সর্ব্বাত্মক অজ্ঞতার কথাই প্রমাণিত হয়।

এর ফলে গঠনমূলক কর্ম্মীদের কর্ম্মক্ষেত্রেও বিশেষ জন-জাগৃতি দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সাথে গঠনমূলক কর্ম্মীদেরও ভেবে দেখতে হবে যে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকারের ফলে স্পষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা। জনসাধারণের মধ্যে নাগরিকতার অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রসারের ভার তাঁদের নিতে হবে এবং তার জন্য নিশ্চিত কার্য্যক্রম ভেবে ঠিক করতে হবে। প্রত্যেক গঠনমূলক কর্ম্মীকে এই ভাবে কাজ করতে হবে—যাতে তার কেন্দ্র-সংলগ্ন অঞ্চলের প্রতিটী ব্যক্তি সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বিকেন্দ্রিত ও স্বাবলম্বী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে গ্রামরাজ্য স্থাপন করা যদি কাতাই মণ্ডলের সদস্যদের লক্ষ্য হয় তবে একাজের সর্ব্বাধিক দায়িত্ব তাঁদেরই উপর পড়েছে। সুতরাং তাদের বয়স্ক-শিক্ষার এই গুরুত্ব পূর্ণ কার্য্যক্রম নিজ হাতে নিতে হবে এবং গ্রামের যুবকদের শিবির, পাঠচক্র এবং সাধারণ সভা আদি সংগঠন করতে হবে। তাঁদের সাপ্তাহিক বৈঠকে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় সাধারণ গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ করে এ কাজের পরিধি বাড়াতে হবে। বৈপ্লবিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য কাতাই মণ্ডলের জন্ম, তারই পরিপূর্ত্তির জন্য এই ধরণের কার্য্যক্রমের যথেষ্ট মহত্ব আছে।

নির্ব্বাচনের ফলে জনসাধারণের মনে ভাল ও মন্দ দু-ধরণের প্রভাবই পড়েছে। নির্ব্বাচন কালে বিভিন্ন দল ও প্রার্থী অজ্ঞ জনসাধারণকে স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করায় তাদের পারিবারিক আলোচনা ও বিতর্ক জনসাধারণের চোখ খোলার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে নিজে নিজেই যথেষ্ট রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছে ও তারা শিক্ষা-লাভ করেছে। এত দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এটা নির্ব্বাচনের একটি শুভ পরিণাম।

বিভিন্ন প্রার্থী ও দলের বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারের ফলে যে ভয়ংকর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে তাতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, বেনিয়া কায়স্থ, ভূমিহার কুর্মী, অহির আদিমুখ্য—জাতিগত পার্থক্য নিয়েই শুধু জল ঘোলা করা হয়নি। গৌড় কান্যকুব্জ আদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণী ও উপশ্রেণীগত বিদ্বেষের বাজারও যথেষ্ট গরম ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিকতার হলাহলও তীব্রভাবে ছড়িয়েছে। এই সব মনোবৃত্তি যে দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে সে সম্বন্ধে ক্ষণমাত্র চিন্তা করতেও আতঙ্ক হয়। গান্ধীজীর আত্মদানের পর সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হলেও প্রাদেশিকতা ও সঙ্কীর্ণজাতীয় বিদ্বেষের হুতাশন যেভাবে লোল-শিখা বিস্তার করেছে, স্বভাবতই তা অতীব ভয়াবহ। নির্ব্বাচনকালে এই অগ্নিতে যে ভাবে ঘৃতাহুতি পড়েছে সে সম্বন্ধেও প্রত্যেক দল ও গঠনমূলক কর্মীদের গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করাই ভারতের ঐতিহ্য। অথচ নির্ব্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সমালোচনার ক্ষেত্রকে বিরোধী কার্য্যক্রম নীতির মধ্যে নিবদ্ধ রাখার বদলে যে ভাষায় বিরোধীপক্ষের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন ও কুৎসা রটনা করেছেন, তাতে সতত শ্রদ্ধাশীল জনসাধারণের মনেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধার অপহার ঘটেছে। আজ হাটে মাঠে ঘাটে দেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে যে রকম দায়িত্বহীন ও লঘুচিত্ততার সাথে আলোচনা চলছে তা কোন দেশের নেতার মর্য্যাদার পক্ষেই শোভনীয় নয়। এমতাবস্থায়, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উৎশৃঙ্খলতার পরিচয় পেলে তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই।

কাতাই মণ্ডলের সদস্য এবং গঠনমূলক কর্ম্মীদের এ দিকেও নজর দিতে হবে, জীবন পণ করে তাঁদের প্রাদেশিকতা এবং সঙ্কীর্ণ জাতি ও শ্রেণী বিদ্বেষের মূলোৎপাটন করতে হবে এবং দলগত ঝগড়ার বাইরে থেকে নিজ ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা দেশে জনসাধারণের আস্থাভাজন নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে হবে।

ওখানে-এখানে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভরা ভাদরের বাদরের বেলা মেঘলা মলিন ঘোর,
ঢিমে তালে বুঝি কাটাও কেবল খুসীর খেয়ালে আজ;
হয়তো এখন পড়ো 'মেঘদূত' ফেলে রেখে শত কাজ,
অথবা পিয়ানো অরগ্যান সখি, বাজাও বাঁ-ধারে ও-র।
মিনতি-মুখর দু'টি চারু চোখ মেঘের মায়ায় ভোর,
পরেছে সুনীল সেমিজ-শাড়িতে খাসা সাগরিকা সাজ;

যুঁই-চাঁপা কানে, বেলির খোপাও গুঁজেছ খোঁপার মাঝ,
অবসর বুঝে মাঝে-মাঝে বঁধু জানায় মধু-আদর।
এখানে আমার আতুর আঁখির আকাশে আঁধার ভাসে,
নিরাশায় ব'সে বরষার দিন একেলা কাটানো ভার,
মেদুর গগনে মেঘদল হেরি' চোখ দু'টি পড়ে মনে;
কেয়া-কদমের পরিমল রেণু ঘরে যতো উড়ে আসে,

ভেবে মরি মিছে সুবাসে তোমার শিথিল এলো-খোঁপার,
খামখাই শুধু পাগল পরাণ কাঁদে ভিজা সমীরণে॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই কথার উত্তর একদিন সরমা দিলে, মাস তিনেক পরে।

এর মধ্যে অনেক কিছু হয়ে গেছে। সেই অনেক কিছুর ভেতর সোনাদি'র বাড়িতে যাওয়া আসাও একটা। আর এইটেই মুখ্য, কেন না বাকি যা-সব তা এরই মধ্যে দিয়ে।

এই তিন মাসে অন্তত বার দশেক এসেছে সরমা। প্রথম মাসে কম। দ্বিতীয় মাসে একটু বেশী, তৃতীয় মাসে আরও বেশি—ক্রমেই বেড়ে গেছে।

সোনাদি'র বাসায় শুধু মলয়া, খগেন আর ছানুই আসে না, আসে আরও অনেকে। তার মধ্যে—খগেনের তো শুধু হলিউডে যাবার স্বপ্ন দেখাই—কয়েকজন নাম-করা সিনেমা-তারকারই দেখা পেয়ে গেছে সরমা, মেয়ে পুরুষ দু'রকমই। শিউরে ওঠেনি ভয়ে, বা গুটিয়ে যায় নি সঙ্কোচে। সোনাদি'র সদাবন্ধ ঘরের হাওয়াটা এমন যে সহজভাবে—বরং খানিকটা বীরপূজার মনোভাব নিয়েই দেখেছে-শুনেছে; প্রথমটা খানিকটা তফাৎ থেকেই, তারপর কাছে ঘেঁষে।...প্রাসাদোপম প্রেক্ষাগৃহে, রূপালী পর্দায় ছায়ারূপে এরাই হাজার হাজার বিস্মিত নয়নের অর্ঘ্যলোটে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!...বয়েছে তারই সঙ্গে এক ঘরে ব'সে—কোন্ অভিনয়ে কী তপস্যায় হয়েছে উত্তীর্ণ তার কাহিনী বলছে।

আসে ওরা কম—একেবারে অত বড় যারা; বেশির ভাগই স্বল্পবাক—জানে তাদের কথা দামী, বেশি ছড়ানো চলে না। মেয়েই হোক, পুরুষই হোক, তাদের নিজের নিজের যে স্টাইল আছে—বসার, মুখ তোলার, ফিরে চাইবার। তার মধ্যে দিয়ে অল্প যা বলবার বলে, অভিমত দেয়, রাজনীতি, দর্শন, সমাজনীতি—কোন একটা ধ'রে, বা যখন যেটা সুবিধা হয়; সব চেয়ে অল্প, সিনেমা নিয়েই। সাধারণত এই, ও-জগতের আভিজাত্য। মুখর তারকাও আছে।

সোনাদি আগে থাকতেই জানিয়ে দেয়, সরমা, আসছে সোমবার সুচিত্রা দেবীকে নেমন্তন্ন করেছি, বিকেলে; পার তো এসো। অবিশ্যি একটা চান্স নেওয়া, আসতে যে পারবেনই এমন কথা দেন নি।

জোতিষ্ক এ আকাশ থেকে নেমে গেলে একটু থমথমে ভাব লেগে থাকে খানিকক্ষণ; তার পর আলোচনা আরম্ভ হয়।—

"রংমশালে ওঁর সে আত্মজীবনী একটু বেরিয়েছে, দেখেছেন আপনারা? ঠিক সে-ধরণের আত্মজীবনী নয়, ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন একটা, তাইতে প্রশ্ন ক'রে ক'রে বের করা—একটা প্রশ্ন—'কবে থেকে আপনার সিনেমার দিকে আসবার অ্যাম্বিশন'টা মনে জাগে?'...উত্তর—'মনে হয় মনটাই যবে থেকে জেগেছে, কেননা কবে যে ছিল না, পড়ছে না মনে।'

—কী রকম ক্লেভার উত্তর! just like her! (যেমনটি ওঁর মুখে মানায়)। আর জানেন?—ওঁর প্রতিভা দেখে ওঁর বাবাই এদিকে বরাবর সুযোগ করে দিয়ে গেছেন! কী রকম লিবারেল মাইণ্ড!...আর ওঁর স্বামী কিনা..."

"আজকাল অনেক স্বামীও এ বিষয়ে লিবারেল। কেন, এই তো সেদিন কাগজে বেরিয়েছিল পাঞ্জাবে একজন জজ—তিনি তাঁর স্ত্রীকে পারমিশনই দিয়েছেন কনট্রাক্ট করতে—অবশ্য আই-সি-এস্ জজ। বাংলা একটু ঘোমটা-টানার দেশই, যাই বলুন।"

সোনাদির বাসায় আরও অনেকে আসে, প্রফেসার, উদীয়মান ব্যারিস্টার, সাহিত্যিক। যেই আসুক—ঘরের সেই একটি আবহাওয়াই হয় পুষ্ট—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, উদার শিক্ষা, বন্ধন থেকে মুক্তি—এগিয়ে চলো, নিজের প্রতিভাকে বুঝে নিয়ে আত্মোপলব্ধির পথে।...সবই খুই উঁচু দরের কথা, কিন্তু...কোথায় যেন ঐ একটা 'কিন্তু' থেকে যায়ই।

প্রথম প্রথম হোস্টেলে ফিরে এসে ভাবত সরমা,

নূতনত্বের মাদকতায় মাথাটা যে ঝিমঝিম করত, তারই মধ্যে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করত। সোনাদির বাসাটা যেন রহস্যময় বলে মনে হোত। কী করে ওরা, কী ক'রে এত দহরম-মহরম এত-সবের সঙ্গে? কী ক'রে এত প্রতিপত্তি? একটা অস্বস্তি থাকতই লেগে। কয়েকবার গেল না, নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও। কিন্তু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সরমা অবশ্য ভাবে এ ওর সবলতাই; ক্রমেই বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে—সোনাদির ঘরের মুক্ত হাওয়া ওর জীবনে পড়েছে ছড়িয়ে।

"অনেক কিছুর"ই আরও একটা দিক আছে, হোস্টেল আর সরমার পিতাকে নিয়ে।

যখন বাইরে যাওয়াটাই গড়াল, দু'একদিন ফিরতে বিলম্বও হোল, একজন আত্মীয়ের অবতারণা করতেই হোল সরমাকে। সোনাদি একদিন মেয়েকে সঙ্গে করে এলও হোস্টেলে মোটরে করে, চেহারা দেখিয়ে সরমার কথার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়ে গেল, মাঝে মাঝে যাতে যেতে পায় তার জন্য একটা ঢালোয়া অনুমতিও নিয়ে গেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে। একে বোলচালের ক্ষমতা আছেই, তার সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো কৃষ্টির একটা পালিশ, তার ওপর সরমার কাছ থেকে বাড়ির সবার এবং সব কিছুর কথা জেনে নিয়ে সেই জ্ঞানটাকেই বেশ কাজে লাগালে—সরমার বাবা হোল ওর কাকা—উকিল থেকে মুন্সেফ, মুন্সেফ থেকে এখন সবজজ—কী ঘোরাঘুরির চাকরি বাবা!—কাকা তো দুঃখ করেন, তার চেয়ে সম্মানিত চাকরির মোহে না পড়ে যদি ওকালতিতে কামড়ে পড়ে থাকতাম তো এতদিন একটা মানুষ হয়ে যেতাম—এ টোটো কোম্পানীর মতন ঘুরে বেড়ানো, না করতে পারলাম নিজের একটা মাথা গোঁজবার সংস্থান, না কিছু।...এইবার রিটায়ার করে বোধ হয় কলকাতায়ই উঠবেন।...

টালিগঞ্জে একটা বাড়ি নেবার কথা হচ্ছে না সরমা?"

সরমা সায় দেয়—"হ্যাঁ, দর নিয়ে একটু আটকাচ্ছে।"

—অর্থাৎ এই ভাঁওতায় সরমাও সরিক হয়ে পড়ে; তারা দুজনে মিলেই ঠকাচ্ছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে।

তার কাছে সব জেনে নিয়ে খানিকটা বাড়িয়ে-সাড়িয়ে এই রকম চতুরতার সঙ্গে কাজে লাগালো, তারপর বাবে ফেলে তারও এইভাবে সায় নেওয়া—সরমার মনে যে এর প্রভাবটা কী হতে পারে সেদিকেও সতর্ক থাকে সোনাদি; বাইরে এসে একান্তে পেলে বলে—"সরমা কি মনে করছে জানি না—সোনাদি এত বড় একটা হোক্‌স্ চালিয়ে দিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘাড় দিয়ে; কিন্তু এরা বড্ড কন্‌জার-ভেটিভ—একটু সাজিয়ে না বললে তোমায় কিছুতেই বেরুতে দিত না। এ সব লোকের কাছে মাঝে মাঝে একটু আধটু ইনোসেণ্ট মিথ্যা না বললে কাজ হয় না।"

এই ক'রে চলে এসেছিল এতদিন। এখন সরমার গানে সোনাদির বাড়ি প্রায়ই মুখরিত, নাচও হয়েছে দু'দিন।...সরমা ধীরে ধীরে নামছে, অবশ্য এখনও "উঠছি" এই মনে ক'রেই।...হোস্টেলের আবহাওয়ার মধ্যে যদিবা কখনও জাগে দ্বিধা মনে, আটাশ নম্বর রঞ্জন পার্কে গেলেই কেটে যায়। এয়ার-কণ্ডিশনড্ ঘর, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উষ্ণ বাতাস দিয়ে।

এই ক'রে চ'লে আসছিল, কিন্তু আর চলবে না। সরমা হঠাৎ এক অদ্ভুত চিঠি পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। তিনি খবর পেয়েছেন—সরমা নাকি এক আত্মীয়ার বাড়িতে যাতায়াত করে, এই ধরণের বয়স, চেহারা—সুবর্ণময়ী নাম। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না; কেননা এরকম আত্মীয়া তাঁদের কেউ আছেন বলে মনে পড়ছে না। অবশ্য থাকতেও পারেন, শাখাপ্রশাখা ধ'রে সব তো জানা নেই তাঁর, তবে সরমা যেন আরও একটু বিশদভাবে পরিচয় দিয়ে জানায় তাঁকে। আর তাঁর চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত যেন বন্ধই রাখে যাওয়া। কলকাতায় তাঁর একটু কাজ পড়ে গেছে। তিনিও আসছেন শীগ্‌গির।

চিঠি পেয়ে অবধি একটা ঝড় বইছে সরমার মনে—একটানা নয়, কতকগুলা বিরুদ্ধ হাওয়ার সংঘর্ষ—ভয় আছেই খানিকটা, তার সঙ্গে একটা আক্রোশ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিভাদি'র ওপর, এই হীন চুগলি-খাওয়া; তার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠছে বিদ্রোহ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—এইটেই হয়ে উঠছে প্রবলতর।

সকালের ডাকে চিঠি পেয়েছে, সমস্ত দুপুরটা ভেবেছে, তার পর বিকেল হতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গিয়ে বললে—"আমায় একবার সুবর্ণদিদির বাসায় যেতে হবে, খবর পেলাম তিনি অসুস্থ।"

—এও একটা রচনা সরমার—স্থবর্ণদিদি; আসল নামটা কী ভেবে তখন দেয় নি পরিচয়-প্রসঙ্গে।

মুখটা বেশ ভার, একটু রাঙাও; কী যেন একটা সঙ্কল্পের ভাব। বিভাদি' মানুষটি দুর্বল-প্রকৃতির (নয় তো যখনই সন্দেহ হোল, আগে কড়াকড়ি করে তারপর ওর বাবাকে লিখতেন)। কলেজে প্রগতির হাওয়া, তার ওপর সরমা অনেকটা এখন নেত্রীত্বই নিয়ে রয়েছে মেয়েদের, বললেন—"যাও, কিন্তু শীগ্‌গির চলে এসো।"

"তেমন অসুস্থ হোলে একটু দেরি হবে না অন্যদিনের চেয়ে?···এক যদি একেবারে না যেতে দেন তো যাই-ই না।"

বিভাদি বললেন—"যাও···আশা করি নয় ততটা অসুস্থ।"

সেই এসেছে সরমা। সোনাদি কি বলে জানতে চায়। কতখানি সে নেমেছে এখনও যদি বুঝত—তো শিউরে উঠত; হয়তো ফিরেও আসত, এখনও সে-সুযোগ ছিল।

ঘরে এসে যখন ঢুকল তখন বাতাস একেবারে গমগম করছে।

খগেনের একটা বড় ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে নূতন বইয়ে একটা মাঝামাঝি গোছের ভূমিকা পাওয়ার কথা চলছিল। কয়েকদিন আগেকার খবর এটা। নূতনতম সংবাদ খগেন সেটা পেয়েছে, অর্থাৎ ওঁরা রাজি হয়েছেন, কিন্তু ওর বাবা একেবারেই বিমুখ, কোন মতেই কনট্রাক্ট করতে দেবেন না। এখান থেকে নাম কাটিয়ে হার্ভার্ডে পাঠিয়ে দেবার কথাই হচ্ছে, সেইখানেই এম. এ. দিয়ে, তারপর সেইখানেই ডক্টরেটের জন্য চেষ্টা করা।

খগেন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

এসেছে অনেকে আজ। সবাই যে ইন্ধনই জোগাচ্ছে এমন নয়, দু'একজন কতকটা ওর পিতার পক্ষ নিয়ে বোঝাতেও চেষ্টা করছে, আর সেই জন্যই একটা তর্কের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। বোঝাবার মধ্যে আছে সোনাদি'ও, সুতরাং স্বামী মৃগাঙ্ক খগেনের দিকে।

সরমা চুপ করে একপাশে রইল বসে। ঠিক এই ধরণের একটা অবস্থা আজ তারও; যতই তর্কটা এগুচ্ছে, সে যেন আরও গম্ভীর হ'য়ে যাচ্ছে, মুখটা আরও থমথমে হ'য়ে পড়ছে।

এক সময় সোনাদি বললে—"সরমা, তুমি একেবারেই চুপ করে আছ। একটু বোঝালে পারতে খগেনকে; তোমার মতের ওপর ওর খানিকটা শ্রদ্ধা আছে।···আমিও তো গাজুরি কিছু বলছি না। হার্ভার্ডে পাঠালেও যখন হলিউডে গিয়েই বসবে, তখন ও যাকই না যত শীগ্‌গির হয়, ঐ তো পথ হলিউডের। এখানকার কনট্রাক্টটা না হয় ছেড়েই দিলে—যদি তাইতে গুরুজনের মর্যাদাটা বাঁচে আপাতত না হয় একটা স্যাক্রিফাইস্ হিসেবেই করলে এটা।"

সরমা চোখ দুটো তুলে বললে—"আমায় মতটা দিতেই বলছেন সোনাদি?···কিন্তু অফেন্স্ নেবেন না, কেননা আপনিও গুরুজনের মধ্যেই। আমার মত হচ্ছে, জীবনে একটা সময় আসে যখন আমরা গুরুজনদের কাছে গুরুভার হয়ে উঠি; সে-সময়টা আমাদেরও উচিত নয় কি সেটা উপলব্ধি ক'রে তাঁদের হালকা করে দেওয়া? খগেনবাবু হলিউডেই যদি যাবেন তবে তার পাথেয় যখন নিজের চেষ্টায় জোগাড় হচ্ছে তখন সে সুযোগটাই বা ছাড়বেন কেন?···আর এইতেই তো গুরুজনের মর্যাদা বেশি রক্ষা হবে, হার্ভার্ডের নাম করে হলিউডে যাওয়া—এ প্রবঞ্চনাই বা কেন?"

যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না—এইভাবে সবাই ওর মুখের পানে চেয়ে ছিল, শেষ হ'তে দৃষ্টি নত করলে।

চরমটা যখন এল তখন হুড়মুড় করেই এসে পড়ল; একটা যেন আঁধি, দেখতে-শুনতে ভাবতে-সামলাতে দিলে না।

পরদিন সকালে বাবার টেলিগ্রাম এল, তিনি আসছেন। ···কত বড় প্রবঞ্চনা যে এতদিন ধ'রে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, আজ প্রথম সেটা ভালো ক'রে টের পেলে সরমা। সাহস পেলে না বাবার সামনে দাঁড়াতে। কাল খগেনের ব্যাপারে যখন অভিমত দিলে, তখন গুরু নিয়ে হয়তো একটু ব্যঙ্গের ভাবও ছিল, তার কারণ এও হতে পারে যে গুরু কী বস্তু ঠিক মতো জানা ছিল না সরমার। মাতৃহীনা মেয়ে, পিতা তাকে বন্ধুরূপেই প্রতিপালিত করে এসেছেন। এখন নিজের বিপুল অপরাধের বোঝা যখন তাঁর গুরুর রূপটাই স্পষ্ট করে তুললে, তখন আর তাঁর সামনে যেতে

তুলে দাঁড়াবার শক্তিও রইল না সরমার। হয়তো এর মধ্যে অভিমানও ছিল, তার সঙ্গে নিশ্চয় খানিকটা সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা, কিন্তু আশঙ্কাটাই হয়ে রইল সবচেয়ে প্রবল।

বিভাদি'কে গিয়ে বললে—স্বর্ণদি'র অসুখটা বেশিই দেখেছিল কাল, আজ দুপুরেই যাবে একবার। আজ একটু অন্যভাব; পাছে বিভাদি' নিজের অধিকার প্রয়োগ করেন সেই ভয়ে বললে আজ ফিরবে শীঘ্রই—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

একবার পা বাড়াবার পর সে ঘণ্টাখানেক আর তার শেষ হয়নি, চিরতরেই চলে এল সরমা, বা আসতে হোল চলে।

সোনাদি' তার সহায় হোল এ বিপদে। আশ্রয় দিলে, অর্থাৎ লুকুলে। নিজের বাসায় লুকুলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা এই ঠিকানা কারুরই জানা নেই, তবুও অন্যত্রই ব্যবস্থা করলে, আর সে ভদ্র ব্যবস্থাই।

দু'টো দিন কী অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যে কাটল সরমার, কল্পনায়ও কখনও আনতে পারত না—তীব্র অনুশোচনা, নিরাশা, বাবার মুখ—সমস্ত কলকাতায় খোঁজাখুঁজি করছেন পাগলের মতো—ছোট ভাই দু'টি, ছোট বোন—আবার ফিরে যাবার সময় কে কি ফরমাস করেছিল নিয়ে যেতে, তার দু'একটা কেনাও আছে বাক্সের মধ্যে···কী হ'তে কী হ'য়ে গেল, কেমন করে হোল ?···

কিন্তু মাত্র দুটো দিন। তারপরেই আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন তারকারই জন্ম-কথা, তখন এও বলা যায় যে একটা উজ্জ্বলতর আকাশে এসে উদয় হোল সরমা।

—খুব ভালো একটা কনট্রাক্ট পেলে, একটা বড় কোম্পানীতে; একেবারে নায়িকার ভূমিকায় নয়, তবে বড় ভূমিকায়, উপনায়িকার বলা যেতে পারে। চুক্তির মূল্য চার হাজার টাকা।

এ সাহায্যও করলে সোনাদি। তার যেন ঠিক করাই ছিল আগে থাকতে।

তবে চার হাজারের এক হাজার গেল সোনাদির হাতে, ওদিক থেকেও কিছু পেয়েছে কিনা তা অবশ্য জানতে পারলে না সরমা।···রহস্যময়ী সোনাদি, দুর্বোধ্য মৃগাঙ্কদা'—এতদিনে তাদের প্রকৃত পরিচয় পেলে সরমা। কিন্তু পেলে, যখন তারাই একমাত্র অবলম্বন।

আরম্ভ হোল সিনেমা জীবন—এর উল্লাস, এর উন্মাদনা, এত অভিনবত্ব—এও একটা কল্পনাতীত নূতন জগৎ। বোঝে, সিনেমা জগতে একটা চাঞ্চল্য এনে ফেলেছে, এরই মধ্যে, সুটিং মাত্র এই সবে গোটাকতক শেষ হয়েছে, চিত্র মুক্তি পেতে এখনও কত দেরি। একটা চাঞ্চল্য—সিনেমা জগতে একটা নূতন আবিষ্কার, একটা নামের অন্তরাল রেখে দিলে সরমা। ও এখন অরুণা দেবী, ঐটুকু রইল দুদিক'কার জগতের মাঝখানে একটা পর্দা। নামকরণটা করলে মৃগাঙ্ক, বললে—"ও নতুন আলো ছড়িয়ে জড়তার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে, ওর নাম দিলাম তাই অরুণা।"

আরও একদিন এই কথাটাই বলেছিল মৃগাঙ্ক, প্রায় বছরখানেক পরে। চার জায়গায় চারটে ভূমিকা, দুটো তার মধ্যে মুখ্য। একেবারে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে বাসায়—এখন তার নিজেরই আলাদা বাসা। সোনাদি আর মৃগাঙ্ক এসেছে। টেবিলে বসে তিনজনে; চায়ের রাজসিক আয়োজন। ওর আদেশে বেয়ারা একটি রঙিণ তরল পদার্থের বোতল এনে রেখে দিলে, অর্ধশূন্য, হালকা বিলাতী মদিরা একটা, স্ত্রী-কণ্ঠের উপযোগী।···দুটি পানপাত্র, সোনাদি খায় না।

কথাপ্রসঙ্গে কি করে সেই প্রথমদিনের থিয়েটারে জড়তার কথা উঠল, মৃগাঙ্কই তুললে। সরমা পাত্র দুটি পূর্ণ করে দিতে মৃগাঙ্ক একটা তুলে নিলে, নিজেরটাও তুলে নিয়ে পাত্রে পাত্রে ঠুকে নিয়ে সরমা হেসে বললে—"তখন বন্ধুদের মহলে আমার নাম কি ছিল জানেন মৃগাঙ্কদা ?—'বৌমা' !"

খিল খিল করে হেসে উঠল। সে-হাসির এখন আরও ধার হয়েছে, একটা নিতান্তই নিজস্ব ভঙ্গি হয়েছে। রাজপথের দুধারের দেয়ালে বোর্ডে, কিওস্কোতে, নানা বর্ণের রঙিন চিত্রে সে-হাসি পথিকের গতি করেছে শ্লথ, দৃষ্টি করেছে বিভ্রান্ত···আসিতেছে !—আসিতেছে !—মুক্তি প্রতীক্ষায় !—ভূমিকায় চিত্রজগতের নূতন জ্যোতিষ্ক অরুণা দেবী।

দিন গড়িয়ে চলল। চিত্র পেল মুক্তি। মাত্র সুটিঙের

ওপর পরিচিত মহলে যে-যশের গুঞ্জন উঠেছিল, এই একটি চিত্রেই সে-যশ দিকে দিকে পড়ল ছড়িয়ে। ঠিক এখানেও হোল সেই প্রথমদিনের পুনরাবর্তন—সেদিন কলেজের সেরা মেয়ে অনুরাধা পড়ে গিয়েছিল চাপা, নায়িকার ভূমিকা নিয়ে; আজও সেই ভূমিকাতেই ছায়াচিত্রের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী নিষ্প্রভ হয়ে গেল এই নবাগতার সামনে।···ছবিতে প্রবন্ধে সিনেমার কাগজগুলা হয়ে উঠল মুখর। The starry world তার প্রবন্ধের শিরোনামা দিলে—The coming figure on the Indian screen.

পত্রিকার মলাটেও বেরুল ছবি; নামজাদা একটা বিলাতী স্নো—চিত্রাকাশের নূতন তারকা অরুণা দেবী বলেন—কর্মের অবসাদের মধ্যেও মুখশ্রীকে সজীব রাখতে আমি যতগুলি স্নো'র পরীক্ষা করেছি তার মধ্যে—ইত্যাদি।

একদিন খগেন বললে—"তুমি যেন একটা রেডিওর গান হয়ে পড়েছ অরুণা। পথে চলতে চলতে গানটা একবার শুরু হলে আর মিস্ করতে হয় না—একটা বাড়ি ছেড়ে গেলাম তো আর একটা বাড়িতে চলছে—তার সুর মিলিয়ে আসতে না আসতে আর একটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমায়ও দেখি পথের ধারে ছবিতে—কারুর বাড়িতে গিয়ে বসলাম—একটা না একটা সিনেমার কাগজ পড়েই হাতে—ইংরিজী, বাংলা যাই হোক; তুমি আছ। নেহাৎ অন্য ধরণের কাগজ হলে মলাটও ওলটাতে হয় না, মুখের দিকে মিষ্টি হাসি নিয়ে তুমি আছ চেয়ে।"

ওদিকেও একটা কাহিনী উঠছিল গড়ে। একদিন সোনাদি বলেছিল—"তোমার মতের ওপর ওর খানিকটা শ্রদ্ধা আছে সরমা।"

কথাটার একটা নিগূঢ়ার্থও ছিল। এই পরস্পরের মতের ওপর শ্রদ্ধা, তার ওপর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা মেনে নিলেও মেয়েরা লতার জাতিই, আশ্রয় খুঁজবেই, দুইয়ে মিলিয়ে খগেন অরুণার মধ্যে আগে থেকেই একটা সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল যেন। তারপর এদিকে এসে যে নিতান্তই একটা নিঃসঙ্গভাব ফুটে উঠল সরমার মনে, সব কিছু হওয়া সত্বেও সে একটা অসহায়তা—নিতান্ত মেয়ে বলেই—তাইতে আরও স্পষ্ট করেই তার মনের তন্তুগুলি এগিয়ে খগেনকে করলে আশ্রয়।

হার্ভার্ডের পাট উঠে গেছে খগেনের, তার সঙ্গে আপাতত হলিউডেরও। ওরও নাম হয়েছে মন্দ নয়—তারকামণ্ডলীতেই একদিন স্থান পাবে বলে ওর আশা, ও বন্ধুবান্ধবদেরও। কিন্তু মেয়ে তারকায় পুরুষ তারকায় তফাৎ আছে। সরমা থাকে নিজের সুসজ্জিত আলয়ে, খগেন থাকে একটা মেসে; ভালোই কিন্তু মেসই।

তবু ওদের মিল আছে মনে মনে, প্রকৃত সখ্য; দুজনে মিলে একটা জীবনের স্বপ্ন দেখে, প্ল্যান করে। তার মধ্যে হলিউডও আছে। বিবাহ?···সেটার বিষয় ওরা এখনও নিজেরাই ভালো করে নিজেদের মন জানে না। কিন্তু তার জন্য আটকায় না। মন্ত্রপূত বিবাহ—সে-জগৎ থেকে ওরা বেরিয়েই এসেছে, শ্রদ্ধাও বোধ হয় নেই তাতে। ওদের হবে Companionate marriage—দুজনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে ওরা যাবে পাশাপাশি এগিয়ে।

নূতন জীবন, নূতন সাফল্য কতরকমের স্বপ্ন দেখে ওরা একটা বৎসরের এই ইতিহাস। এর ভেতর দুটো ছবি বেরিয়ে গেল সরমার। তার সঙ্গে আছে আরও গোটা পাঁচেকের চুক্তি, এবার বেশির ভাগই নায়িকার ভূমিকায়।

দ্বিতীয় বৎসরের গোড়ার দিকেই একটা ধাক্কা খেয়ে সরমা, তাইতে আর যা হবার হোলই, একটু দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দেখবার অবসর পেলে।

সেটা হোল যেদিন খগেনের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ট্রাজেডিটা এইখানে যে, ছাড়াছাড়িটা হোল যেদিন ওরা একেবারেই খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

খগেনের আয় বেড়েছে। সরমা অনেকদিন থেকে ওকে বলছিল তার বাসাতে চলে আসতে, মেসে ওর নিজের কাজকর্মেরও খুব অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ওর আত্মসম্মান। ও যেদিন এল—সেদিন সরমা ঠাট্টা করে বললেও—"আমি কি বুঝিনা?—তুমি এলে ঠিক যখন একেবারে মোটরের খরচটি পর্যন্ত কড়াক্রান্তিতে আধা-আধি বুঝিয়ে দিতে পারবে। মেয়েরা তো চা

একেবারে উজোড় করে দিতে, কিন্তু নিচ্ছে কে?—ওদিকে তো হিসেবের কড়াক্কড়ি। বুঝিনি যেন আমি।"

খগেন বললে—"তুমি একেবারে বোঝনি অরুণা; আমার ইচ্ছে ছিল তখনই আসি যখন কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত সমস্ত খরচেরই ভার নিতে পারি আমি।"

"তাই করলে না কেন? কী দরকার ছিল এত তাড়াতাড়ি আসবার?" অভিমান ভরে সরমা বললে।

"দেখলাম সে রকম সব একেবারে উজোড় ক'রে দেবেই না কখনও। সে-নেওয়ার যে কী আনন্দ এক পুরুষেরাই জানে।...কিন্তু সে আশায়-আশায় কতদিন থাকি? তাই অর্ধেকের লোভেই চলে এলাম।"

ক'টা দিন নিবিড় আনন্দে কাটল। কাগজে ওদের দুজনকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। ভবিষ্যৎ-বাণীও। এই সময়ে সুটিঙের প্রয়োজনে সরমার দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হোল; ধানবাদের ওদিকে একটি জায়গা বাছা হয়েছে, যাচ্ছে একটা বেশ বড় পার্টি।

ঠিক এই সময়টিতে খগেনেরও জোর প্রোগ্রাম হাতে, যার জন্য স্টেশনে পর্যন্ত গিয়ে তুলে দিয়ে আসতে পারলে না। তবে সেও যাবে, ধানবাদেই। ঠিক হয়েছে সুটিং শেষ হোলে সরমা ওখানেই থেকে যাবে, তারপর দিন দশেকের মধ্যে খগেন গিয়ে উপস্থিত হবে। ওরা একবার স্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে ওদের স্বপ্ন ফলিয়ে তুলতে চায়—ধানবাদকে কেন্দ্র করে নদী, পাহাড়, অরণ্য...খগেন মোটরটাই নিয়ে যাবে এখান থেকে।

যাওয়া কিন্তু সে রাত্রে হোল না সরমার। প্রায় শেষ মুহূর্তে একজন খবর আনলে টেলিগ্রাম এসেছে যে-বাড়িটা ঠিক করা হয়েছিল সেটা নিয়ে হঠাৎ কি গোলমাল হয়েছে। সমস্ত দলটাই স্টেশন থেকে ফিরে এল।

গাড়িটা ছিল সাড়ে আটটায়। মনটা একটু দমে গেছে। খগেনের বাইরে প্রোগ্রাম, বাড়ি এখন খালি, সরমা একটা ট্যাক্সি করে সোনাদির বাসায় চলে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়ে ওরই মোটরে যখন বাসায় ফিরল, রাত্রি প্রায় এগারটা; কিছু পূর্বেই ফিরে আসবার কথা খগেনের।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু বাগান, তার ভেতর মোটর প্রবেশ করতেই খগেনের গলা শোনা গেল। বৈঠকখানায় কার সঙ্গে কথা কইছিল, মোটরের আওয়াজ শুনে বলতে বলতে বেরিয়ে আসছে—"বাঃ, মৃগাঙ্কদা! আর আমরা কখন্ থেকে এসে..."

তারপরেই দেখলে সরমা মোটর থেকে নামছে, বললে—"আরে! তুমি? আমি মনে করি...হঠাৎ ফিরে এলে যে?"

"মৃগাঙ্কদার আসবার কথা ছিল নাকি? কৈ, বললেন না তো, আমি তো তাঁদেরই মোটরে এলাম ওখান থেকেই।...না, যাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল; টেলিগ্রাম এসেছে..."

শোফার জিগ্যেস করলে—"আমি যাই তা'হলে?"

বৈঠকখানা থেকে গটগট করে বেরিয়ে এল মলয়া, বললে—"না, দাঁড়াও; আমি তা'হলে এই গাড়িতেই চলে যাই...কী টেলিগ্রাম এল ওদের সরমা?"

সরমা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, কিন্তু অভিনয় ক'রে ক'রে এই রকম সব নাটকীয় পরিস্থিতি কি করে সামাল দিতে হয় জানে—এর পর যা হবার তা হবে। বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে—"টেলিগ্রাম এল—বাড়িটা নিয়ে হঠাৎ কি গোলমাল হ'য়েছে।...তা, এখুনি চললে তুমি?"

মলয়াও জানে, বেশ সহজভাবেই বললে—"হ্যাঁ যাই, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

—নামতে নামতেই ঘুরে একটু হেসে ঠাট্টাও করলে—"এখন তোমাদের দুজনের মাঝে অন্তরায় হ'য়ে থাকা বৈত নয়।"

সরমাও হেসেই যা উত্তর দিলে, তাতে খগেনকে পর্যন্ত নিলে টেনে, বললে—"যে-মানুষ দুজনেরই অন্তরে সে কখনও অন্তরায় হতে পারে?...কি বলো না"—বলে খগেনকেও সাক্ষী মানলে।

খগেনই শুধু বেশ সহজ ভাবটা আনতে পারলে না, একটু স্খলিত কণ্ঠেই বললে—"অন্তত আমার অন্তরের খবর তো এত সহজে দিতে পারি না আমি।"

রাত্রিটুকুও সবুর করতে পারলে না সরমা। তার একটা কারণ হয়তো এই যে মনটা বড় খিঁচড়ে রয়েছে ধানবাদ যাওয়াটা পণ্ড হওয়ার জন্য। মলয়া চলে যেতেই বললে—"একটু বসবে কি?"

দুজনেই গোল টেবিলটার দুদিকে মুখোমুখি হয়ে বসল।

"মলয়া যে এসেছিল রাত্রে এ ভাবে ?"

"কি ভাবে ?"—প্রশ্নটা ক'রে সোজা মুখের পানে চেয়ে রইল খগেন, সে তোয়ের ক'রে নিয়েছে নিজেকে।

"তাও ব'লে দিতে হবে ?"

"তুমি একটা অদ্ভুত এ্যাটিচ্যুড্ নিয়ে কথা কইছ দেখছি অরুণা, তখন তোমার ঠাট্টাতেও তা প্রকাশ পেয়েছে।···মলয়া এমনি এসেছিল, কথা ছিল মৃগাঙ্কদা আর সোনাদিও আসবে।"

কি ভেবে সোনাদির নামটাও জুড়ে দিলে খগেন, কিন্তু এতে আর একবার কণ্ঠ স্খলিত হোল।

সরমা ঘাড়টা একটু তুললে, বললে—"আমি ও-কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছি না বলেই জিগ্যেস করছি। দেখলেই তো আমি ওঁদের ওখান থেকেই আসছি, ঘণ্টা দেড়েকের ওপর ছিলাম—লুকুবার কথা নয়, বিশেষ ক'রে যখন সোনাদিরও আসবার কথা ছিল বলছ।"

"সোনাদিকে আনবার কথা মৃগাঙ্কদাই আমায় বলেছিলেন, সোনাদিকে জানিয়েছিলেন কিনা আমি বলতে পারি না।"

সামলে নেবার চেষ্টা করলে খগেন।

কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল ক'রে ফেলছে দেখে উত্যক্ত হয়ে তর্কের রাস্তাই ছেড়ে দিয়ে সেও ঘাড়টা সোজা করে নিয়ে বললে—"কিন্তু এত প্রশ্নের কি দরকারটা বলো দিকিন ?"

"তোমার কাছে উত্তরটা পেলে আর ওদের জিগ্যেস করতে হোত না।"

এবার খগেন দাঁড়িয়ে উঠল—"জিগ্যেস করবে ?—ভজাতে হবে ?—এত অবিশ্বাস ?···তা বেশ জিগ্যেস কোর' মৃগাঙ্কদাকে।"

"কেন ? সোনাদিকেও জিগ্যেস করতে দোষটা কি ?···এ শুধু তোমার আর মৃগাঙ্কদা'র ভেতরকার কথা, না ?···বুঝেছি ; তাহলে তাঁকেও বলে দিও এ-ধরণের ব্যাপার আমার বাসায় চলবে না।"

"তোমার বাসা!···ঠিক, এ কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম অরুণা,মাফ কোর'।···আর, দেব—দেবমন্দিরও তো!···যাও, মিছে কথা বাড়িয়ে ফল কি ?—শুয়ে পড়োগে।"

(ক্রমশঃ)

প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক এবং গল্প-লেখক হ'লেও একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকারও ছিলেন। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন। নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে তিনি কয়েকজনের কয়েকটি লেখার সমালোচনাও করেছেন।

সাহিত্য সৃষ্টি বা সাহিত্যের মাত্রা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর সমাজ-সংক্রান্ত লেখা গুলির মধ্যে আমাদের প্রচলিত সমাজে যে সব অনাচার, স্বৈরাচার, ফাঁকি ও গোঁজামিল রয়েছে, দেশের লোকের চোখে আঙুল দিয়ে সে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহে একদিকে যেমন সাধারণভাবে সার্বজনীন দেশাত্মবোধ প্রচারের চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে তেমনি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদও প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ক এই সকল প্রবন্ধ শুধু চিন্তাশীলতা, যুক্তি ও ভাবসম্পদেই অনবদ্য নয়, তাঁর রচনা মাধুর্য এবং সহজ ও সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর গুণেও এগুলি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তাঁর সুগভীর চিন্তা ও মননশীলতায় পুষ্ট এই সব রচনা বাঙ্গলা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ।

শরৎচন্দ্র তাঁর ব্রহ্মপ্রবাসকালে সেখান থেকে যখন "যমুনা" পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করেন, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব বলা যেতে পারে। এই সময় তিনি প্রধানতঃ গল্প উপন্যাস লিখলেও প্রবন্ধ লেখার দিকেই কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। শরৎচন্দ্র যাঁর অনুরোধে যমুনায় লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর সেই মাতুল ও বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে তখন তিনি বহুবার বহুপত্রে এই প্রবন্ধ রচনার কথা সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন। ১০।১।১৩ তারিখের এক পত্রে রেঙ্গুন থেকে তখন তিনি উপেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

"আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই! সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোট গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা আর পাঁচজনেই কর। প্রবন্ধ লিখব এবং পাঠাবও।"

১০।৫।১৩ তারিখের আর এক পত্রে তিনি উপেন্দ্রনাথকে লেখেন—"আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ করি গল্পের মত সরস এবং সুপাঠ্য করেই।"

এ সম্বন্ধে তিনি যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকেও ৩।৫।১৩ তারিখের একটি পত্রে লিখেছিলেন—"…সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন, তাহলে তো ভালই হয়; কিন্তু আমার বোধ হয় নিরূপমাও অনেকটা ভার নিতে, পারে। সুরেন, গিরীণ, উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কিনা জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়—কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্প-টল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তা হ'লে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগে না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর করে লেখা। জোর জবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না।"

ফণীন্দ্রনাথকে আর একটি পত্রে তিনি পরে লিখেছিলেন—"আমি যে কটা দিন বেঁচে আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়। তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখতেও প্রবৃত্তি হয় না। ও যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হোক লিখব, অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এরমধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়। অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশী কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করব না।"

গল্প লেখার এই অ-প্রবৃত্তির কথা ছাড়াও, তখন তিনি পড়াশুনায় কিরূপ মগ্ন ছিলেন, এই পত্রখানি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। শরৎচন্দ্র দূর প্রবাসে গিয়ে গ্রন্থকেই তাঁর প্রিয় সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। অফিসের সময়টুকু বাদে অধিকাংশ সময়টাই তিনি প্রধানতঃ পড়াশুনা করেই কাটাতেন। সেই সময় তিনি কি ব্যাপক ও গভীর ভাবে পড়াশুনা করতেন, বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত শরৎচন্দ্রের এক পত্র থেকে সে সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার জানা যায়। শরৎচন্দ্র কি ভাবে দিন কাটান প্রমথনাথ জানতে চাইলে, তিনি তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে এই পড়াশুনার কথা উল্লেখ করে একজায়গায় বলেছেন—"পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।"

এছাড়া শরৎচন্দ্র Philosophy, Sociology প্রভৃতিও ভালভাবেই পড়েছিলেন। H. Spencer-এর Synthetic Philosophy বইখানার একবার সমালোচনা লিখবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত একটি পত্রের একজায়গায় তিনি এ সম্পর্কে একবার বলেছিলেন—"…আর একটা কথা আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছা করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo: একটা বাঙ্গলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয় আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencerএর শত্রু মিত্র, তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত?"

Sociology নিয়ে যে শরৎচন্দ্র অনেকদিন কাটিয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই আর একজায়গায় বলেছেন—"আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে।" (স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ১৩)

শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও ২২।২।১৬ তারিখের এক পত্রে এ কথার উল্লেখ করে লিখেছিলেন…"বাস্তবিক, ভায়া, এই Sociology লইয়াই বহুদিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান্ করে।"

ব্রহ্ম-প্রবাসের এই দীর্ঘ কয় বৎসর শরৎচন্দ্র পড়াশুনার মধ্যেই ডুবে ছিলেন। বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তাকে নিজের চিন্তা ও যুক্তির সঙ্গে কোথাও যাচাই করে, কোথাও বা খাপ খাইয়ে, প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করবার জন্য তিনি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন। এই চিন্তাসমূহকে প্রবন্ধাকারে রূপ দেবার জন্যই তাই তাঁর মন তখন আন্‌চান্ করত।

সেই জন্য শরৎচন্দ্র যখন "যমুনা"তে লিখতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল ও তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথকে একথা বারে বারেই জানিয়েছেন যে, তিনি গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে বরং প্রবন্ধই পাঠাবেন। এদিকে অথচ শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস না হ'লেও আবার যমুনার চলে না। তাই শরৎচন্দ্র তখন ঠিক করেন যে, তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সমস্তই লিখবেন। তবে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন বিষয় লিখবেন। একটি মাত্র লেখাতে তাঁর নিজের নাম থাকবে, আর অপর লেখাগুলিতে থাকবে তাঁর ছদ্মনাম। এ সম্বন্ধে তিনি ফণীন্দ্রনাথ পালকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

"আমার তিনটে নাম।
সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।
ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টো।
বড় গল্প—অনুপমা

সমস্তই একনামে হলে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।"

এই ছদ্মনামের কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র ফণীন্দ্রনাথকে আর একবার লিখেছিলেন—"আমার নাম যে অনিলা দেবী, কেউ যেন না জানে।

প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ করে D. L. Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।"

শরৎচন্দ্রের দিদির নাম অনিলা দেবী। তিনি তাঁর দিদির নাম দিয়েই তখন সমালোচনা ও প্রবন্ধগুলি লিখতেন। অনিলা দেবী এই ছদ্মনামেই তাঁর "নারীর লেখা" "নারীর মূল্য" "কানকাটা" "গুরুশিষ্য-সংবাদ" লেখাগুলি যমুনায় (১৩১৯-২০) বেরোয়। পরে এই নামেই "সমাজধর্ম্মের মূল্য" নামেও একটি প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ" পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

"নারীর লেখা" একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। এতে আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর লেখার সমালোচনা করা হয়েছে। আমোদিনী ঘোষজায়ার "ভারতী"তে প্রকাশিত "মনুষ্যত্বের সাধনা" ও "প্রাচীন ভারতের পূজায়" প্রবন্ধ দুটির এবং প্রসঙ্গত "বিকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতারও সমালোচনা রয়েছে। শরৎচন্দ্র আমোদিনী ঘোষজায়ার লেখা সমালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁর লেখা কি ভাবে বিকৃত হয়েছে। তাছাড়া লেখার দুর্বোধ্যতা এবং উপমার অসঙ্গতিগুলিও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্র" গ্রন্থখানির আর নিরুপমা দেবীর লেখার সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে তাঁর "অন্নপূর্ণার মন্দিরের" সমালোচনাও এই প্রবন্ধে রয়েছে।

"কানকাটা" লেখাটিও একটি সমালোচনা। ১৩১৯ সালের "সাহিত্য" পত্রিকায় ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লেখেন এটি তারই সমালোচনা। এই প্রবন্ধটি লেখবার সময় শরৎচন্দ্র যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখেছিলেন—"...আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে) ফাল্গুনের—"সাহিত্যে" তিনি উড়িষ্যার খোন্দজাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য) এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য।"

প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাসেও শরৎচন্দ্রের যে কিরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, এই "কানকাটা" প্রবন্ধটি পাঠ করলেই তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। শুধু পাণ্ডিত্যের কথাই নয়, লেখাটি সমালোচনা হিসাবেও উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

শরৎচন্দ্র সহজ ভাষায় সরস করে সমালোচনা লিখতেন, আর সমালোচক হিসাবেও তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। অহেতুক তিনি কারও প্রশংসা বা নিন্দা করতেন না। লেখার মধ্যে কারও প্রশংসার কিছু থাকলে, অকপটে তিনি তা স্বীকার করতেন এবং ত্রুটি কিছু থাকলে, সেই ত্রুটি দেখিয়ে দিতেও তিনি আদৌ ইতস্তত করতেন না। এই সমালোচনার ক্ষেত্রে অকারণে তিনি কোথাও কারও প্রতি দ্বেষ বা আক্রোশ অথবা নিজের বাহাদুরী দেখানোর চেষ্টা করেন নি।

"নারীর মূল্য" শরৎচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ পুস্তক। "নারীর মূল্য" প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যমুনা পত্রিকায়। এই পুস্তকে শরৎচন্দ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজে নারীজাতির সম্মান ও স্থান অতীতে কিরূপ ছিল এবং বর্তমানেই বা কিরূপ আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এজন্য তিনি যে কি ব্যাপকভাবে দেশ বিদেশের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করেছিলেন, তা এই "নারীর মূল্য" গ্রন্থখানি পাঠ করলেই বেশ বোঝা যায়। "নারীর মূল্য" যমুনায় প্রথম প্রকাশিত হলে, তখন চারিদিক থেকেই লেখাটির সুখ্যাতি হয়েছিল। এই প্রশংসার কথা উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তখন লিখেছিলেন—"প্রমথ লিখিতেছে...দিদির "নারীর মূল্য" নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবিবাবুরও বোধ করি নাই। (এমন) প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।"

শরৎচন্দ্র এই সময় ঠিক করেছিলেন, "নারীর মূল্যে"র ন্যায় আরও কয়েকটি বিষয়ের মূল্য নির্ধারণ করে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তখন তিনি যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন—"নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, ১৪টি মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবার হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তারপর ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব।"

শরৎচন্দ্র পরে আবার এই ১৪টি মূল্যের বদলে ১২টি মূল্য সম্বন্ধে লিখবেন ঠিক করেছিলেন এবং স্থির করেছিলেন যে, ঐ ১২টি মূল্য নিয়ে "দ্বাদশ মূল্য" নাম দিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করবেন।

"নারীর মূল্য" পুস্তকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন লেখাটি প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রেরই লেখা। সেখানে তিনি লিখেছেন—"কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু, তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সে তিনিই জানেন; তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এমনি আরও কয়েকটি মূল্য লিখিয়া "দ্বাদশ মূল্য" নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন।"

এই চতুর্দ্দশ বা দ্বাদশ মূল্য শরৎচন্দ্রের পক্ষে আর লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তবে তিনি পরে আর একটি মূল্য লিখেছিলেন। সেটি হ'ল "সমাজ ধর্মের মূল্য"। এই মূল্যটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এতে অন্যান্য দেশের সামাজিক নিয়মকানুনের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় "নারীর ইতিহাস" নামে একটি প্রায় পাঁচ শ পাতার বই লিখেছিলেন। এতে বহু নারীর করুণ কাহিনীর ইতিহাস লেখা ছিল। এই সময় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ীতে আগুন লাগায়, এই 'নারীর ইতিহাস' লেখাটি পুড়ে শেষ হয়ে যায়। "নারীর ইতিহাস" পুনরায় লেখা শরৎচন্দ্রের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।

শরৎচন্দ্র প্রথম কিছুদিন অনিলা দেবী নাম দিয়েই প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখলেও পরে তিনি যখন যমুনা পত্রিকায় লেখা বন্ধ করে দেন, তখন থেকে কিন্তু তিনি নিজের নামেই প্রবন্ধ লিখতে থাকেন।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে "নারীর মূল্য", "তরুণের বিদ্রোহ" এবং "স্বদেশ ও সাহিত্য" নামে তিনটি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র সময়ে সময়ে ছাত্রদের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে গিয়ে ও ছাত্রদের সভায় তাদের সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলিকে একত্রিত করে শ্রীহর্ষ কার্যালয় থেকে "শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ" নামে আর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী" নামে একটি বই বার করেছেন। বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের বিবিধ-বিষয়ক যে সকল লেখা গ্রন্থবদ্ধ না হয়ে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে একত্রিত করে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে শরৎচন্দ্রের বহু অভিভাষণ এবং প্রবন্ধও সংগ্রহ করা হয়েছে।

"তরুণের স্বপ্ন" গ্রন্থে "তরুণের বিদ্রোহ" এবং "সত্য ও মিথ্যা" নামে ২টি প্রবন্ধ রয়েছে। "তরুণের বিদ্রোহ" প্রবন্ধটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টারের ছুটীতে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে, রংপুরে যে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনী হয়, তারই সভাপতির অভিভাষণ।

"স্বদেশ ও সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথমাংশ "স্বদেশ" অধ্যায়ে "আমার কথা" "স্বরাজ সাধনায় নারী" "স্মৃতিকথা" প্রভৃতি কয়েকটি "স্বদেশী" বা রাজনৈতিক প্রবন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধ ক'টিতে শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে রাজনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নিজের রাজনৈতিক মতবাদও জানিয়েছেন। গ্রন্থের এই "স্বদেশ" অংশে সন্নিবিষ্ট "শিক্ষার বিরোধ" নামক লেখাটি একটি প্রতিবাদ প্রবন্ধ। এর মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরাজের ভারত শোষণ, ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের আদর্শ প্রভৃতির কথা থাকলেও আসলে এটি রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধের প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ থেকে ফিরে এসে পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন অর্থাৎ শিক্ষা বিষয়ে আমাদের স্বদেশের সহিত ইউরোপের মিলন সম্বন্ধে কলকাতায় উপর্যুপরি যে কয়টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তৃতার প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" লেখাটি যেমনি উচ্চস্তরের, শরৎচন্দ্রের এই "শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধটিও তেমনি তুল্যমূল্য।

"স্বদেশ ও সাহিত্য" পুস্তকের শেষাংশ "সাহিত্য" বিভাগে "সাহিত্য ও নীতি", "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি," "আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রভৃতি কয়েকটি মূলতঃ সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ রয়েছে। এই সকল প্রবন্ধে তিনি সাধারণভাবে সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনা সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

"শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী" গ্রন্থটিতে তাঁর বিভিন্ন-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থের "দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী," "নূতন প্রোগ্রাম" শিরোনামায় হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধগুলির উপরে হাস্যরসের প্রলেপ দিয়ে শরৎচন্দ্র সমাজ ও দেশের তৎকালীন রাজনীতির কথা আলোচনা করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের বহু বর্ষ পর্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং এই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই তিনি সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তাই প্রতিষ্ঠা ও অর্থ উপার্জন করার পরও তিনি আমাদের দেশের দুঃস্থ সাহিত্যিকদের কথা ভোলেন নি। "ভাগ্য বিড়ম্বিত লেখক সম্প্রদায়" ও "বাংলা বইয়ের দুঃখ" নামক দু'টি প্রবন্ধে তিনি আমাদের দেশের সাহিত্যসেবীদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। এদের জন্য দেশের ধনীদের কাছে তাঁর আবেদনটিও প্রাণস্পর্শী হয়েছে।

এ ছাড়া এই গ্রন্থে 'মহাত্মাজী" "মহাত্মার পদত্যাগ" "বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা" "বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ" "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা", নামক অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধও রয়েছে। এই সকল প্রবন্ধে তিনি সাধারণভাবে রাজনীতির আলোচনা করলেও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদের কথাও জানিয়েছেন।

"শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী" গ্রন্থটিতে শরৎচন্দ্রের বহু অভিভাষণ এবং প্রতিভাষণও সংগৃহীত হয়েছে। এই সব অভিভাষণ প্রভৃতিতেও শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মীয়, বন্ধু এবং শিষ্য-শিষ্যাস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট যে সব পত্র লিখেছিলেন, সেই পত্রসমূহ সংগ্রহ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী" নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, সেটিকেও শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে ধরা যেতে পারে। কারণ গ্রন্থটি মূলতঃ পত্রসংকলন হলেও, শরৎচন্দ্রের বহু পত্রে আত্মকথা বা ব্যক্তিগত কথা ছাড়াও সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েরও অনেক আলোচনা রয়েছে এবং এই সব আলোচনা চিঠির মধ্য দিয়ে হলেও এগুলি অনেক ক্ষেত্র প্রবন্ধেরও রূপ নিয়েছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের গল্প লেখার চেয়ে প্রবন্ধ লেখার দিকেই বেশি ঝোঁক থাকলেও, ঘটনাচক্রে তিনি কিন্তু গল্প-উপন্যাসই বেশি রচনা করেন এবং সে তুলনায় প্রবন্ধ খুব কমই লেখেন। কম লিখলেও তাঁর এই সকল প্রবন্ধ এমনি উচ্চাঙ্গের যে, উপন্যাস রচনার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তিনি যেমন একটি উঁচু আসন পেয়েছেন, তেমনি তাঁর এই চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের জন্যও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর "সাহিত্য ও নীতি" "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রভৃতি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ বলা যেতে পারে।

বন্ ও কলোন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

রাইনের উভয়-পার্শ্বে বহু প্রাসাদ ও দুর্গ। কিন্তু আজ তাদের কোনো জাঁকজমক নাই। প্রাগ্রার সহরের মধ্যে বন্ এবং কলোনের খ্যাতি যথেষ্ট। পূর্বে ছিল ডুসালডর্ফ শিল্পাগারের জন্য বিখ্যাত।

চঞ্চলা লক্ষ্মী যেমন রাজাকে ভিখারী করেন তেমনি অচিরে অট্টালিকা ও নগর ধ্বংস করেন। একথা বার বার মনে পড়ে—জার্মানীর সহরগুলি দেখলে। মানুষ দল বেঁধে চিরদিন অন্য দলের সাথে যুদ্ধ করে। সমরের অবসানে বোঝে সে যুদ্ধ-পিশাচের ধ্বংস-লীলা। অশোক একথা বুঝে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রের সাধক হয়েছিলেন। তারপর সবাই মুখে

ছয় শত বৎসরে নির্মিত একটি সৌধ

বলেছে—শান্তি শান্তি শান্তি। অথচ দরিদ্রের মুখে অন্নদান অপেক্ষা অস্ত্রাগার সজ্জাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছে শক্তিশালী দেশনায়ক মাত্রেই। এই হল শঙ্করের তাণ্ডব-লীলার এক বিকাশ।

আজ ভারতের দশা জার্মানীর খণ্ডিত সাম্রাজ্যের। প্রাচ্য ও পশ্চিম জার্মানীর জনগণের মধ্যে ভাব, ভাষা, কৃষ্টি বা সৃষ্টি-কল্পনার পার্থক্য নাই। ভাব-সৃষ্টি এবং শ্রম-শিল্পের শৃঙ্খলা ও বিধি-ব্যবস্থার অভিনব পরিকল্পনায় জার্মান জাতি জগতে যে স্থান অধিকার করেছিল, সভ্য য়ুরোপ জার্মান জাতিকে উন্নতির সে উচ্চ-শিখরে দেখতে চাহিল না—ঈর্ষা, হিংসা এবং স্বার্থের প্ররোচনায়। প্রথম মহাযুদ্ধের মূলে কায়জারের লোভ-দৃষ্টি ছিল বিশ্ব-আধিপত্যের প্রতি, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। হিট্লার কিন্তু আপনার জাতিকে গড়বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তার পরিণামে ইংরাজ-মার্কিনীর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্ভ্রমের অকল্যাণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে পরিণাম এড়াতে গিয়ে ব্রিটেনের বিশ্বের দরবারে স্থানচ্যুতি ঘটলো। মার্কিন হল প্রধান বিশ্ব-শক্তি। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রসার লাভ করলে রুশের কম্যুনিষ্ট মত-বাদ।

এই দুই জাতির প্রতিযোগিতা আজ বিশ্বের অশান্তি এবং দুর্ভোগের প্রধান কারণ। এরা পরোক্ষে জগতের সকল জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করেছে। এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যক্ষ ফল—জার্মানীর দুর্যোগ। রোমক জাতির-ভাগ-করে-শাসন-কর-নীতি গ্রহণ করেছে সকল সাম্রাজ্যবাদী। গণবাদ যাদের নিজের দেশের সাধনা, ঐক্য ও সাম্য যাদের রাষ্ট্র-জীবনের মূল-নীতি, পরের রাষ্ট্রে অনৈক্য উৎপাদনে তাদের উৎসাহের বিরাম নাই।

এই দুর্নীতি জার্মানীর ভাগ্য-বিপাকের হেতু। গত সংখ্যা ভারতবর্ষে আমার জার্মান ভ্রমণের প্রবন্ধ পাঠাবার পর জার্মানীর বিভক্ত রাষ্ট্রের একটির গঠন-কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। আমি মাত্র বাহিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে, যে কথা বুঝেছিলাম, ঠিক সেই মর্মে জার্মানীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ঘটেছে।

গত বৎসর বন্ (Bonn) ছিল রাজধানী—ইংরাজ-মার্কিনী-ফরাসীর অধীনে স্বায়ত্তশাসনের! আজ একমাস পূর্বে সে হয়েছে স্বাধীন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। এ স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণের এ স্থান নয়। ইংরাজ এবং মার্কিনের রাজনীতি-মহল বলে—বহুবার রদ-বদল হয়েছে প্রাশার সীমানা-রেখার। রাইন নদী সভ্যতার আদিকাল হতে বহু বিপ্লব দেখেছে। পোলাণ্ডের সীমানা ছিল একদিন জার্মানীর অভ্যন্তর অবধি। তার বিভাগে বার বার তিনবার প্রাশার নিজের সীমানা বেড়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর যে স্থূলদেহ ছিল, তার মধ্যে এমন কি সুইডেনেরও একটা অংশ সন্নিবেশিত ছিল। মিত্রশক্তির কোনো অপরাধ ছিলনা তার দেহকে স্থূল করার প্রচেষ্টায়। আর আজকের খণ্ডনের জন্য অপরাধী রুষিয়া। সোভিয়েটের উপদ্রব জগতের প্রলয়ঙ্করী শক্তি। সুতরাং তাদের প্রতিরোধ করতে হবে ইঙ্গ-মার্কিনী পরিকল্পনার ফলে—স্বাধীন নবীন জার্মানীর মারফত।

বন্ এই নবীনতাকে রূপ দেবে।

পর্য্যটনের পক্ষে বন্ বেশ সুদৃশ্য ছোট শহর। নদীর জল তর তর প্রবাহে দুকুলের গাছের ছায়াকে কাঁপিয়ে চলেছে। তার বুকের ওপর চলছে ছোট বড় বহু তরণী। কলোন হতে বন্ বারো মাইল—বেশ

কলিকাতা হতে ব্যারাকপুর। উভয় সহরই রাইনের পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এদের মধ্যে ষ্টীমার চলাচল করে। কিন্তু আমি একদিনও কলোন হতে সে জাহাজে আসতে পারিনি। ঠিক সময়ে তাকে ধরতে পারিনি। বহু বাসের চলাচল হয় এই সহরে।

বনের গৌরব দুটি কারণে—এর সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং সঙ্গীত-সুধাকর বীট্‌হোভেনের জন্মস্থান হিসাবে। বীট্‌হোভেনস্ট্রাসে তাঁর গৃহ সুরক্ষিত—একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। খুব গর্বের সাথে লোকে সে স্থল দেখায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যশ প্রচুর। কলোনে প্রকাণ্ড জমির মাঝে বিশ্ব-বিদ্যালয়। বন্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয় একটা পাড়া জুড়ে। একদিকে হাসপাতাল। বন্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়া চিকিৎসকদের বিদ্যাবুদ্ধির যশ, যুদ্ধের পূর্বে তো যথেষ্ট ছিল। আজ সেখানে কোনো ভারতীয় ছাত্র নাই।

বীট হোভেনের জন্ম ১৭৭০ খৃঃ অব্দে। তাঁর নামের জার্মান উচ্চারণ বাতোহ্‌ভেন। সিম্ফনী সঙ্গীতে তাঁর কীর্ত্তি অদ্ভুত। তাঁর কর্ম জীবন ভিয়েনা এবং তার সংলগ্ন স্থানে অতিবাহিত হয়েছিল। ১৭৯৭ সালে বাতোহ্‌ভেন বধির হ'ন। ১৮০০ সাল থেকে ১৮১৮ অবধি তাঁর প্রসিদ্ধ আটটি সিম্ফনী রচিত হয়েছিল। তারপর তাঁর প্রসিদ্ধ মুনলাইট এবং ক্রুজার সোণাটা ও নবম সিম্ফনী রচিত হয়। ১৮২৭ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

প্রশ্ন ওঠে এই বধির মানুষ কেমন করে যৌথ-সঙ্গীতের সুর রচনা করেছিলেন—যে সঙ্গীতের মাধুরী আজও পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। আমি মূক-বধিরের শিক্ষা কিছু দেখেছি। এদের প্রাণের মধ্যে ছন্দ অপরিসীম। শিক্ষকের বুকে হাত দিয়ে দেহের ছন্দ ধরে আজ তারা সেই ছন্দের লয়ে কথা কয়। মূক-বধির বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীঅতল চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যক্ষ ডাঃ শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা অনেক কিছু বোঝান। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি না। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা প্রত্যক্ষ করি। বাতো-হভেন জন্ম বধির ছিলেন না। হয়তো সুরের লহর সংস্কার রূপে স্মৃতি-রূপে চিত্তের কোথায় লুকানো থাকতো। কল্পনা ক'রে সুর-সংযোগ করতেন। মোট কথা নিজের রচা সুর-হিল্লোল বাতাসের তরঙ্গ-হিল্লোল রূপে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করত না। ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্রের নিশ্চয় তৃপ্তি-সাধন করত। বনে ভাঙ্গা বাড়ি দেখলাম না। যুদ্ধের প্রকোপের কুৎসিত অভিনয় হ'য়েছিল এ-প্রদেশে কলোন ও ডুসেল দর্ফে।

বন্‌ থেকে কলোন যাবার অটোষ্ট্রাস বা মোটর পথ আছে। সে পথে যাওয়া যায় কলোন ব্যতীত জুলিক (Julich) ও নয়েস (Nuis)। রাস্তা বোধ হয় হিট্‌লারের আমলের—সুন্দর সিমেন্ট কনক্রিটের দ্বৈত পথ—যাওয়া আসার ভিন্ন অংশ। এক একবার রাইন দেখা যায়, দুদিকে ঘন গাছের ছায়া।

একদিন কলোন ছিল এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সহর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ হতে ১৯২৫ সাল অবধি বিজয়ী মিত্রশক্তির কবলে ছিল কলোন। কিন্তু গত বৎসর আগষ্ট মাসে—যেদিন আমরা কলোনে প্রবেশ করলাম—মনে হল এক প্রকাণ্ড সমাধি ভূমিতে এসে পড়েছি। ভাঙ্গা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গা। একখানা অট্টালিকা দেখলাম না যার দেহে আঘাতের চিহ্ন নাই। আমাদের স্থান ছিল ডোম হোটেলে। সেটি শ্রেষ্ঠ পান্থশালাদের অন্যতম।

কিন্তু ব্যবসার রীতি সর্বত্র সমান। ষ্টেশনে নামলেই হোটেলের দালাল জোটে। আমাদের গাড়ী মোটর-পথ ছেড়ে যেমনি শহরে প্রবেশ করল—এক ব্যক্তি ভালো ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলে—হোটেল চাই? ভালো হোটেল। সকল সুবিধা। গরম জলের চলতি কল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের হোটেল ঠিক্‌ করা আছে জেনে ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। বল্লেন—অত দাম দিয়ে কেন যাবেন। অমনি সুবিধায় হোটেল—দর আধা।

অনেকগুলা হোটেলের নাম করলে। শেষে সম্মত হল আমাদের হোটেল ডোম দেখিয়ে দিতে।
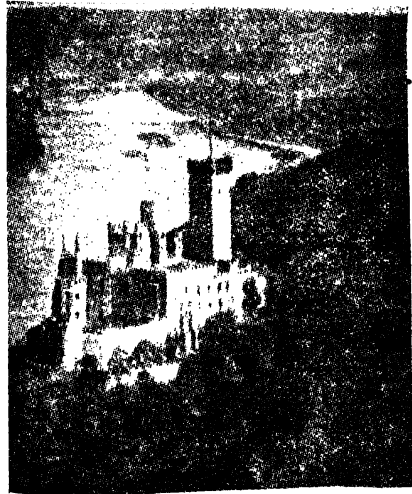
রাইন নদীর উপকূলে সূর্যকরোজ্জ্বল উপত্যকা (সান্‌লিট ভ্যালী)

ডোম হোটেল ঠিক কলোন ক্যাথিড্রলের প্রধান ফটকের সম্মুখে। বাহির হতে ক্যাথিড্রল দেখে আনন্দ হল, অন্ততঃ একটা দৃশ্য স্থান বোমার আঘাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। কিন্তু পরে দেখলাম সে ধারণা ভ্রান্ত, কারণ তারও পিছনের অংশ চুর্ণ কোরেছিল সুসভ্য মিত্রপক্ষের অব্যর্থ সন্ধানে আকাশ সেনা।

গথিক রীতিতে নির্মিত কলোন ক্যাথিড্রল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। এর সামনে এক শ্রেণী সোপান আছে তারপরে গির্জ্জার প্রকাণ্ড তিনটি প্রবেশ দ্বার—যেমন সব ক্যাথিড্রলের। এ লম্বায় মোট ৩৪৪ ফুট। সামনে দুটি চূড়া আছে তারা ৫১২ ফুট উঁচু। ১৪৪৮ সালে এই গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর বহু সৌধ নির্ম্মাতার ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সালে এর বর্ত্তমান রূপ দান করা হয়।

গির্জ্জাটী ক্রুসের আকারে অর্থাৎ মাঝের ভাগ চওড়ায় বেশী। এমন আকারের গির্জ্জা ইউরোপে বহু। এর ইংরাজি নাম "ক্রুসিকর্ম"। কলোন গির্জ্জার আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা অপূর্ব্ব। দেওয়ালে বহু প্রসিদ্ধ জার্মান শিল্পীদের আঁকা চিত্র। প্রভু যিশু, মাতা মেরী এবং সন্তদের বহু প্রস্তর মূর্ত্তি। চারটী বেদীর তিনটী এখনও বিদ্যমান।

আমি একদিন সকালে গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ কোরেছিলাম। সেদিন রবিবার, প্রার্থনার সময়। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছিলাম। একটী পাদরী আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। দশ মিনিটের মধ্যে গির্জ্জার কার্য্য শেষ হল, শোভাযাত্রা করে বিশপ ও পাদরীরা গির্জ্জা ত্যাগ করে গেলেন। তখন সেই পাদরী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গির্জ্জা সম্বন্ধে আলাপ করলেন। তিনিই দেখিয়ে দিলেন গির্জ্জার ভাঙ্গা বেদী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে "এখনও মেরামত কার্য্য হাতে নেওয়া হয়নি কেন?" তিনি ম্লান হাসি হেসে বললেন—"বুঝতেই ত পারছেন বহু অর্থের প্রয়োজন। আজ সে জার্মানী নাই। রুটীতে মাখন দেবার অর্থ নাই, জার্মানের এক্ষেত্রে গির্জ্জা নির্মাণ আকাশে দুর্গ গড়ার মত অলীক স্বপ্ন।"

নদী-তীরবর্ত্তী মিডিভ্যাল হাসপাতাল

ভদ্রলোকের গলার স্বর কেঁপে গেল। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করলাম।

আমরা ডোম হোটেলে যে দুটী ঘরে স্থান পেলাম—বুঝলাম তার পাশে আর এক সারি ঘর ছিল! সেগুলি বোমার আঘাতে চূর্ণ হয়েছে। আমাদের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো রাইন নদীর দুদিকে দুটী খুব বড় পোল। একটী সেতু রেল পথের। অন্যটি যাত্রী ও গাড়ীর জন্য। রাইনের ওপর আরও কয়েকটি পোল আছে তবে লণ্ডনের টেমস্‌এর উপর যতগুলি সেতু আছে, অত সেতু বোধ হয় ইউরোপে কোনও শহরে নেই।

যেমন গঙ্গার দুধারে কলিকাতা ও হাওড়া—তেমনি রাইনের দুপারে কলোন ও ডুজ্ (Deutz)। কিন্তু হাওড়া কলিকাতা হতে পৃথক, ডুজ্ কলোনেরই একটা অংশ।

আজিও কলোনে অনেক কারখানা বিদ্যমান। অবশ্য তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত এবং তারা পূর্ব সমৃদ্ধি হারা। ওডি কলোন এখনও তৈয়ার হয়, কিন্তু ঐ গন্ধ দ্রব্যটির কেন ফরাসী নাম তা আমি বলতে পারি না। কারণ ও বিষয়ে বিশেষ সমাচার কেহ রাখে না।

কলোনের সংগ্রহশালা ইংরাজ বা ফরাসী সংগ্রহশালার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তার জন্য দায়ী বোধ হয় গত মহাযুদ্ধ।

জার্মান ও বিদেশী দেখলেই পার্থক্য বোঝা যায়। বাহিরের লোকেরা হাস্যমুখ ও সুন্দর পোষাকে সজ্জিত। জার্মানের মুখে অন্তরের নিরাশা প্রতিফলিত, অথচ গর্বের ছাপ।

রাইন উপত্যকার শোভা অপরিমেয়। মেন্‌জের নিকট একটি সুন্দর দুর্গের চিত্র দিলাম। ১৮৮৫ সালে সম্রাট ফ্রেডরিকের জন্য নির্মিত। স্থানটির নাম স্টোলজেনফেলস।

বহু মার্কিনের লোক ছিল কলোনে। আমাদের হোটেলে ইংরাজ ও মার্কিনী ছিল অনেক। আমরা ছাড়া আরও এক দল ভারতীয় ছিল। তারা ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টায় এসেছিল পশ্চিম জার্মানী। মাল রপ্তানীর এত বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করেছিল নতুন মিত্র-শক্তি সরকার যে বাণিজ্যের কোনো আশা ছিল না ওদেশের সঙ্গে। আজকের স্বাধীনতার কি ফল হয় সেকথা পরে বোঝা যাবে।

কলোন ইংরাজি Cologne—জার্মান Koln—রোমান প্রতিষ্ঠিত শহর। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাশার এই অঞ্চল একের পর এক বহু শাসকের অধীনতা স্বীকার করেছে। সুতরাং জাতি মিশ্র। হয়তো আর্য্য বেশী। কিন্তু জার্মাণ-ভাষা-ভাষী হলেও আর্য্য-জাতির বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে প্রাশার জন দেহ হিট্‌লারের আর্য্য-গরিমার পরিণামে নিশ্চয় য়িহুদী নাই। কিন্তু কে জানে?

কলোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রশস্ত ভূমিতে ঘুরলাম, কলেজ দেখলাম—কিন্তু ভিড় নাই। অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সবাই সৌজন্য প্রকাশ করলেন। টেগোরের উল্লেখ করলেন। যে দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, ভারতবাসীকে প্রীত করবার জন্য সবাই গান্ধী ও টেগোরের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু ঠাকুরের কথায় কেহ ভারতের স্বরূপ প্রকাশ করে না। বলে না—সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুঃখের রক্ত শিখা। আর গান্ধিজীর অহিংসা? বড় ব্যাপারে কোরিয়ার যুদ্ধে অহিংসা-বুলি কপচায় ভারতীয়। কিন্তু পাশের বাড়ির লোকের গাড়ি কেনা হ'লে, বহুলোক জোড়া ছাগল মানত করে মা কালীর কাছে—কবে ঐ গাড়ির চাকা মালিকের ডান পায়ের উরু ভাঙ্গবে। বিশ্বের সর্বত্রই বোধ হয় মানুষের গোপন মনের এই ভাব। তবে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের মতিগতি একটু দ্রুত গতিতে অহিংসার বিপরীত পথে চলছে। এটা ভাববার কথা। ইংরাজিতে লেখা যায় না, কিন্তু নিজেদের দৃষ্টি নিজেদের মনোভাবের অনুসন্ধান করলে কল্যাণ হবে।

এক অধ্যাপকের নিকট প্রাচীন জার্মাণ-জাতির দৈব-বিশ্বাস সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প শুনলাম। একটি কোল্‌ন্ কাথিড্রলের সৌধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে। ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ হতে ১৮৮০ সাল লেগেছিল গির্জ্জা নির্মাণে। সে কি আকৃতির বদলের জন্য?

তিনি বল্লেন—না না। এর আকার পরিকল্পিত হয়েছিল প্রারম্ভেই। অংশগুলি নির্মিত হ'য়েছিল, মেরামত হয়েছিল, পালিস হয়েছিল ধীরে ধীরে, কিন্তু এর প্ল্যান করেছিলেন একই পরিকল্পক।

—কে তিনি ?

প্রফেসার বল্লেন—তার নাম কেহ জানে না। জানবার উপায় নাই। কারণ কিম্বদন্তী—অবশ্য এ যুগে কেহ তা বিশ্বাস করে না কিন্তু সবাই বলে।

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হলেন। কান্ট, হেগেল, আয়েনস্টাইনের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনশ্রুতি শেখান হিন্দুর নিকট—বিবৃত করছেন—ব্যাপারটা অসমীচীন।

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—গল্প। উক্ত আছে এ গির্জার আরকিটেক্ট মনে এর পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে প্রেরণা পেয়েছিলেন। মোট কথা স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্নের নকসা আঁকতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর স্মৃতি-বিভ্রম হয়েছে, বুদ্ধি-নাশ হয়েছে। একটা রেখাও বার হলনা কলমে। কি সর্বনাশ। ঠিক সেই সময় তিনি দেখলেন একজন সুপুরুষ রাইন নদীর বেলায় বসে একটা নক্সা আকছে। কী অদ্ভুৎ ব্যাপার। এযে তারই স্বপ্নে দেখা কেথিড্রলের চিত্র। সৌধ-নির্মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আঁকছেন।

অপরিচিত বল্লে—গির্জার নক্সা। এখনি ছিঁড়ে ফেলব।

সৌধ-নির্মাতা বল্লেন—কী সর্বনাশ। ছিঁড়ে ফেলবেন, না না আমায় দিন। আমি এ ধর্ম-ভবন স্বপ্নে দেখেছি। দেশের প্রধানদের বলেছি। তাঁরা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কেথিড্রল গড়তে সম্মত হয়েছেন। এতে বহু বিশ্বাসীর স্বর্গ লাভ হবে।

স্বর্গের নাম শুনে অপরিচিত বিকট হাস্যে চমকে দিল যুবক সৌধ-নির্মাতাকে। কে এ লোক। সে নিরীক্ষণ করলে। শয়তানের লাঙ্গুল প্রসিদ্ধ। এ লোকটিরও লাঙ্গুল রয়েছে—অতি ছোট।

সে বল্লে—খ্রীষ্টের নামে ভজনালয় হবে। এতে আপনার লাভ কি? প্ল্যানটি আমায় দিন, আমার জাতির মঙ্গল হবে।

ছদ্মবেশী শয়তান জিজ্ঞাসা করলে—তুমি যদি শপথ কর যে স্বর্গে যাবে না, তা হ'লে এ গৃহ-চিত্র তোমাকে দিতে পারি।

চিরদিন নরকবাস—যেথায় আগুন জ্বলে, পাথর ফাটে। যুবক ভয় পেলে। অপর পক্ষে নিজের নরকবাসে বহু লোকের পরিত্রাণ। দোটানা চিন্তা-স্রোতে আবার তার স্মৃতি ভ্রংশ হ'ল। সে সময় নিলে।

কলোনের সেদিনের পাদ্রী সব কথা শুনলেন। তাঁর প্রেরণা এলো। শঠে শাঠ্যং, শয়তানের পরাজয়ে বিশ্বের পরিত্রাণ। তিনি বল্লেন—তুমি সম্মত হও দুষ্টের প্রস্তাবে। গৃহ-চিত্র হস্তগত হলে সে যখন চুক্তি-পত্রে সহি করতে বলবে, তাকে দেখিও এই ক্রুশের টুকরা। সে ছুঁতে পারে না তাকে—যার কাছে ক্রুশ থাকে।

ক্রুশের টুকরা নিয়ে যুবক গেল রাইন তীরে শয়তান সন্দর্শনে। শয়তানের মহা-আনন্দ। একজন খৃষ্টীয় যুবাকে নিজের আয়ত্তে পেয়েছে। সে মহাযত্নে তাকে চিত্রগুলি দিল। কোথায় কি বর্ণ হবে, কোন প্রাচীরের কি পরিমাপ—এ সব বিষয় স্পষ্ট বিবৃত নক্সায়।

যুবক নক্সা নিল। তার পর নরকবাসের একরারনামা সহি করবার সময় ক্রুশের টুকরা বার করে শয়তানের মুখের কাছে ধরল। দুষ্ট দূরে সরে গেল। তার নাক মুখ হতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। কিন্তু ক্রুশের কাছে সে পারে না আসতে। বিকট চিৎকার ক'রে সে অভি-সম্পাত দিলে সৌধ-নির্মাতাকে। গির্জা হবে, কিন্তু জগতে কেহ জানবে না তোর নাম।

বেচারা পাথরে কুঁদে নাম রেখেছিল গির্জায়। সেটি শয়তান সরিয়ে নিয়েছে।

তাই মাইকেল এঞ্জেলো, বারনিনি রেন প্রভৃতি গির্জা-রচয়িতাদের মতো বিখ্যাত কলোন-ক্যাথিড্রল-নির্মাতার নাম ভুবনে প্রখ্যাত নয়।

কাঁচি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দাম্পত্য-জীবনের আলোচনা।

ফাদার বল্টার বললেন—স্বামী-স্ত্রী—দুজনে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—যেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত—মানে, কাঁচির সঙ্গে তুলনা করা যায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে ?

আমাদের মধ্যে কে একজন হেসে উঠলো, বললে—বলেন কি ফাদার! ফুল গেল, আকাশের নক্ষত্র গেল, চাঁদ গেল, কপোত-কপোতী গেল···স্বামী-স্ত্রীকে আপনি বলচেন, কাঁচি!

আমি বললুম—মৌলিক উপমা—বিকট ওরিজিনাল!

ফাদার বললেন—ওরিজিনালের উপর এক-কাটি। কিন্তু বাজে কথা নয়, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি: আলাদা আলাদা দুটো পার্ট নিয়ে ছোট্ট একটু পিন বা খিল দিয়ে সে দুটো পার্ট জুড়ে কাঁচি তৈরী হয়—দুটি পার্ট একই জাতের মেটালে তৈরী—সমান-সমান মাপ—ঐ পিনের বাঁধন না থাকলেই অচল! পিনে-আঁটা থাকলে কাঁচি কাঁচি···কাঁচির দাম। তেমনি স্বামী-স্ত্রী—এক মন—এক প্রাণ—ভালোবাসার পিনে দুজনের বাঁধন যতক্ষণ আঁটসাঁট—দুজনে কত আনন্দে থাকে—কত কাজ করবার শক্তি-

সামর্থ্য থাকে। কাঁচির পিন গেলে কাঁচি যেমন অচল—স্বামী-স্ত্রীর মনে-মনে যে খিল বা পিনের বাঁধন, তা ভেঙ্গে গেলে দুজনের জীবন স্রেফ মিথ্যা!

আমি বললুম—হুঁ। আপনার উপমা লাগ-সই বটে! কিন্তু কাঁচির দু-পার্টে পিনের যে জোড়—এমন অটুট জোড় স্বামী-স্ত্রীর মনে-মনে কেউ কখনো দেখেছে?

…কৈ! উঁহু! দেখিনি তো। আপনারা দেখেছেন?

এ প্রশ্নের জবাব মিললো না। ফাদার সকলের পানে তাকালেন। তাঁর চোখে কৌতুকের দৃষ্টি! তিনি বললেন—কাঁচির দুটো অংশ যে পিনে আঁটা হয়—সেই পিনের উপরই শুধু কাঁচির জীবন নির্ভর করে না! দুটো অংশ একই ধাতের না হলে শুধু পিনে কাঁচি স্বচ্ছন্দ-সচল হয় না। দোকানে যান কাঁচি কিনতে—দোকানী বিশ পঁচিশখানা কাঁচি ফেলে দেবে আপনাদের সামনে…তার সবগুলো সমান পাবেন না—কোনোখানা হবে টাইট্—কোনোখানা আলগা! সে-কাঁচি অচল, না হয় দু-দশদিন পরে তাতে কাজ চলবে না! বিশ-পঁচিশখানার মধ্যে দু-চারখানা কাঁচি পাবেন, যাতে কাজ ভালো চলে! কাঁচি হলো দর্জীদের কাজে সবচেয়ে বড় সহায়। দর্জীদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা বলবে, একই মেকের দশখানা কাঁচি …সমান চলে না মশায়! তাদের মধ্যে দু-একখানার কাজ চলে বেশ সড়গড় স্বচ্ছন্দ ভাবে…তেমন কাঁচির পরমায়ু হয় দীর্ঘ—এবং তাতে কাজও চলবে চমৎকার রকম।…সমাজের ঘরে-ঘরে স্বামী-স্ত্রীর বাস—কত স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের নিত্য-পরিচয়—কিন্তু স্বচ্ছন্দ-সচল কাঁচির মতো ক'জন স্বামী-স্ত্রীর মনে মনে মিল দেখতে পাই?…জীবনে আমি দেখেছি একটি জোড়া স্বামী-স্ত্রী…অপূর্ব্ব তাঁদের মিলন। তাঁদের কথা মনে করেই কাঁচির উপমা আমার মনে জাগলো। তাঁদের কথা বলি, শোনো।

ফাদারকে আমরা ঘিরে বসলুম—চুপচাপ—চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি তাঁর মুখে নিবদ্ধ করে'।

ফাদার সুরু করলেন তাঁর কাহিনী:

—আমি তখন এস-এর মঠে আছি রোগের পর স্বাস্থ্য-লাভের জন্য। সেখানে এক পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। স্বামীর নাম ডন আঁদ্রে, স্ত্রীর নাম ডনা কঁশেলো। দুজনের পরিপূর্ণ সুখে কাঁটার যাতনার মতো বিঁধে ছিল তাদের ছেলে বারাবাস। ছেলেবেলা থেকেই মা-বাপকে ও-ছেলে নিমেষের জন্য শান্তি-স্বস্তি দেয়নি। সকলের সঙ্গে বিবাদ…দুর্মুখ-হিংসুকে-উড়নচণ্ডী। যৌবনে হলো মাতাল এবং দুশ্চরিত্র। মাকে প্রহার—বাপকে ভর্ৎসনা—এমন দিন যেতো না, যেদিন উৎপাত-উপদ্রব বন্ধ থাকবে। মা-বাপ অজস্র মিনতি জানিয়েছে—ভালো হও—তোমাকে এখনি দেবো, যা আমাদের আছে। তবু সে ভালো হবে না! সমানে বাঁদরামি করবে, বখামি করে মা-বাপের মাথা হেঁট করে চলবে।…আমার কাছে তাঁরা এ দুঃখ জানাতেন। অনেক ভেবে আমি পরামর্শ দিলুম—ওকে বিদেশে কোথাও পাঠান—এখানকার বদ্ সঙ্গী-গুলোকে পাবে না—পয়সা-কড়ি দেবেন—যেটুকু তার প্রয়োজন! তার বেশী এক পয়সা নয়। বিদেশে ধার করতে পারবে না! এমনি করে দেখুন, যদি স্বভাব বদলে ভালো হতে পারে।

বাপ বললেন—চমৎকার পরামর্শ। কঁশেলো স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চেয়েছিলেন…স্বামী তাঁকে বললেন—কি বলো কঁশেলো?

একটা নিশ্বাস ফেলে কঁশেলো বললেন—হুঁ…ভালো কথা বলেছেন ফাদার।

মা-বাপ তখন ছেলেকে পাঠালেন মানিলায়…নির্ব্বাসনের মতো!

ছেলে মানিলায় যাবার পর ছমাস আমি খবর পেতুম। তাঁরা আমাকে বলতেন—ছেলে ভালো আছে…স্বভাব অনেকটা শুধরেছে। সেখানে কাজকর্ম্ম করছে মানুষের মতো। শুনে আমি আনন্দ প্রকাশ করতুম। মা-বাপ বলতেন—একটি মাত্র ছেলে…সে যদি ভালো না হয়—মনে হয়, কি সুখে বাঁচা। পৃথিবী শূন্য মনে হয়!

দিন যায়। ভালোভাবেই যায়। হঠাৎ একদিন মানিলায় যে ভদ্রলোকের কেয়ারে বারাবাস থাকতো, তিনি চিঠি লিখে ভীষণ খবর জানালেন। ছেলে সেখানকার এক গণিকালয়ে মদ খেয়ে কবে কার সঙ্গে ঝগড়া মারামারি এবং ছুরির ঘা খেয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে!

চিঠিখানা আমার নামে এসেছিল এবং আমার উপর অনুরোধ ছিল—বারাবাসের বাপকে যেন আমি এ খবর

জানাই। জানানো কত কঠিন, আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলুম। কিন্তু নিরুপায়!

আঁদ্রেকে ডেকে পাঠালুম—আঁদ্রে এলে তাঁকে সে চিঠি দেখালুম।

চিঠি পড়ে আঁদ্রে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর নিশ্বাস ফেলে বললেন—এমন ঘটবে, আমার মনে সে আশঙ্কা ছিল খুবই, ফাদার।

আঁদ্রের চোখে এক ফোঁটা জল দেখলুম না। সে কাঁদলো না। গুম্ হয়ে বসে রইলো। তার সে মূর্ত্তি···মনে হলো, ফাঁসির আসামী যেন—গারদ থেকে বার-করা হয়েছে ফাঁশিকাঠে চড়াতে নিয়ে যাবে বলে'। ফাঁশির কজন আসামীকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছিলুম—আঁদ্রের তখনকার মূর্ত্তি হুবহু সেই ফাঁশির আসামীর মতোই আমার মনে হয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে আঁদ্রে তাকালো আমার পানে—ডাকলো—ফাদার···

আমি তাকালুম আঁদ্রের পানে···সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

আঁদ্রে বললে—আমার একটি মিনতি···আমার স্ত্রী যেন এ খবরের বিন্দুমাত্র না জানতে পারেন! হোক কুপুত্র···তবু সন্তান!···এ খবর শুনলে উনি মারা যাবেন।··· জানেন, আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কত ভালো ছিল···আর চেহারা ছিল—কী গড়ন···গালে গোলাপের রঙ···মন স্বচ্ছসলিলা নদীর মতো আনন্দে উচ্ছল—ছেলের ঐ স্বভাবের জন্য ভেবে ভেবে ওঁর কি দশা না হয়েছে! আমাকে জানতে দেন না—বুঝতে দেন না! কিন্তু আমি বুঝি, ওঁর মনের ভিতরটা দিনে দিনে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে!···জানেন, ছেলে মানিলা যাওয়া ইস্তক ওঁর খুকখুকে কাসি সুরু হয়েছে। এ উপসর্গ কেন, জানেন? ওঁর হয়েছে ক্ষয়-কাস···বারাবাসকে যে খুন করেছে তাকে আমি সাজা দেয়াতে চাই না—মামলা-মকর্দ্দমা করতে গেলে পাঁচজনে জানবে···আমার স্ত্রীর কানে যাবে এ খবর! তিনি সহ্য করতে পারবেন না এ আঘাত! তাঁর প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি এ খবর গোপন রাখতে চাই, ফাদার।

কী আবেগ তাঁর কণ্ঠে!···এ মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়া··· চকিতে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রের বুকের ভিতরটা দেখতে পেলুম···বেশ স্পষ্ট—রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে তাঁর বুকে!

আঁদ্রে নিশ্বাস ফেললো। নিশ্বাস ফেলে বললে—আরো মিনতি আছে···শুধু না-বলা নয়—উনি যদি ছেলের সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন, দয়া করে বলবেন, সে ভালো আছে—স্বভাব ভালো হয়েছে···সেখানে কাজকর্ম্ম করছে···মানুষের প্রাণের দাম···সত্যের চেয়ে বেশী বলে ভগবান মনে করবেন না?

এ কথার উত্তরেও আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না। আমার মনে যেন ঝড়ের সূচনা!

আঁদ্রে বললে—শুধু এই নয়···মাসে-মাসে আমার স্ত্রীর সামনে আপনার হাতে আমি টাকা দেবো···সে টাকা যেন আপনি আগেকার মতোই পাঠাচ্ছেন বারাবাসের জন্য!···ছলনা—কাপট্য, মানি···কিন্তু আমার স্ত্রীর মন নাহলে ভেঙ্গে যাবে—বেঁচে থাকলেও উনি পাগল হয়ে যাবেন!···দয়া করে বলুন···আপনার দয়া···

আমার হাত দু'খানা আঁদ্রে চেপে ধরলো গভীর আবেগে। তার চোখে কী কাতর মিনতি!

আমার বুক দুলে উঠলো। নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—তাই হবে, আঁদ্রে। উনা এ খবর জানবেন না।

আঁদ্রে আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

তার পর থেকে অভিনয় চললো। এ ভূমিকার অভিনয়ে আমার কোনো ক্রটি রইলো না।

তবু কঁশেলোর স্বাস্থ্যে কোনো পরিবর্ত্তন নেই!···দিনে দিনে চারুলতা শুকিয়ে মলিন, ম্লান, নির্জীব হচ্ছে···কথা কন অল্প। হাসেন···সে হাসি দেখলে বুক কেঁপে ওঠে! মনে হলো, জীবনের দীপ নিবছে—তিনি তা বুঝেছেন যেন! আমার বুক কাঁপে! ভাবি, যদি বলেন—ফাদার, বারাবাসকে একটিবার আসবার জন্য লিখুন—আমি শেষ দেখা দেখবো···?

কিন্তু এ কথা কোনোদিন তাঁর কণ্ঠে ফুটলো না!

আঁদ্রে সব সময় কাঁটা হয়ে আছে! তিনজনে বসে কত কথা হয়—বারাবাসের কথা ওঠে···তার সম্বন্ধে মায়ের কণ্ঠে আশার উচ্ছ্বাস—ছেলের ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকেন তিনি···আমি সাড়া দিই, সায় দিই! আর

আঁদ্রে···? ভয়ে আকুল! ভাবে, অতর্কিতে যদি আমার মুখ থেকে সত্য খবর বেরিয়ে পড়ে!

টাকা পাঠানো···বারাবাসের চিঠিপত্র লেখা—অভিনয়ের কোনো অঙ্গ বাদ থাকতো না। মাঝে মাঝে বারাবাসের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে ডনাকে শোনাতে হতো। শুনতে শুনতে ডনার দু'চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠতো—স্বামীর পানে চেয়ে তিনি বলতেন—শুনছো···বারাবাস কত ভালো হয়েছে···এখন তার সম্বন্ধে তোমার মনের ভয় কেটেছে তো ?

আঁদ্রে এ কথার জবাব দিতেন না। ডনার পানে চেয়ে শুধু একটু হাসতেন—মলিন মৃদু হাসি।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় আমার ডাক পড়লো—আঁদ্রের গৃহে। গেলুম। যাবামাত্র আঁদ্রের সঙ্গে দেখা। আঁদ্রে বললে—বাষ্পভরা কণ্ঠে—তার স্ত্রীর অন্তিম-ক্ষণ উপস্থিত। ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করবেন আপনাকে—এতদিন যদি মিথ্যা কথা বলে তাঁর মনটাকে রক্ষা করে এসেছেন এখন এই শেষ মুহূর্ত্তে···তিনি যেন ছেলের সম্বন্ধে আশা নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজতে পারেন ফাদার—দয়া, আর একটু দয়া···

কোনো জবাব না দিয়ে আমি গেলুম ডনার ঘরে তাঁর বিছানার পাশে। ডনার ঠোঁট নড়ছে—দুখানি হাত বুকের উপরে রাখা—কৃতাঞ্জলি-পুট···ভগবানকে ডাকছেন!

আমি চুপ করে বসে রইলুম। পাঁচ মিনিট পরে তিনি চোখ মেলে চাইলেন···আমাকে দেখলেন—মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন—ফাদার—

আমি বললুম—কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ।

তিনি চারিদিকে তাকালেন—তার পর বললেন—ফাদার···অসীম আপনার করুণা! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন এ করুণার জন্য।

আমি চমকে উঠলুম—বললুম, করুণা!

—নয়? ডনার অধরে মলিন হাসি—ডনা বললেন—আমার স্বামীর মুখ চেয়ে তাঁর মঙ্গল ভেবে এতদিন আপনি যে ছলনা করেছেন···এ মিথ্যা কখনো ভেঙ্গে দেবেন না!

—এ কথার মানে? আমি প্রশ্ন করলুম। ডনা বললেন—আপনি যদি ঠিক রকম অভিনয় না করতেন, এ ছলনা না করতেন, তা হলে স্বামী জানতে পারতেন, বারাবাস নেই—লক্ষ্মীছাড়া সংসর্গে ঝগড়া-বিবাদে খুন হয়ে মারা গেছে···এ খবর উনি যেন কখনো না শোনেন!

আমি চমকে উঠলুম! বললুম, তিনি কি আপনাকে এ কথা বলেছেন? না—না—বারাবাস ভালো আছে—কাজকর্ম্ম করছে···আমি খবর দি—বারাবাস আসুক—আপনি তাকে দেখতে পাবেন।

ডনা বললেন—দেখা হবে···তবে এখানে নয়···পরলোকে তাকে দেখতে পাবো।···আমার মন বলেছে···এ খবর আমি তখনি পেয়েছি—আমার মন আমাকে এ খবর বলেছে। কিন্তু আমার স্বামী? উনি এ খবর জানতে পারলে মরে যাবেন···পাগল হয়ে যাবেন! শুধু ওঁর মুখ চেয়ে এ দুর্জ্জয় শোক, এ জ্বালা কি করে আমি সয়েছি···ভগবান জানেন!

ফাদার···উনি না জানতে পারেন, না বোঝেন···তাই ছেলে বেঁচে আছে,···এমনি অভিনয় করে এসেছি···এতে পাপ হয়ে থাকে যদি, ভগবান সে পাপ ক্ষমা করবেন না··· ফাদার?

আমি জবাব দিলুম না।

ডনা বললেন—ওঁকে না বলে ওঁর কাছে গোপন রাখা—জানেন ফাদার, জীবনে কোনোদিন ওঁর কাছ থেকে আমি ছোট-বড় কোনো কথা···কোনো সুখ, দুঃখ কোনোদিন গোপন রাখিনি!! শুধু এইটুকু···

আমি—শুনে আমি যেন পাথর! দুজনেই তাহলে এ খবর জানতেন···কিন্তু পরস্পরে কতখানি মমতা, কত দরদ···দুজনেই দুজনের সঙ্গে ছলনা করে আসছেন···পাছে পুত্রশোকের ব্যথা অপরে সহ্য করতে না পারেন!···মনে মনে এই যে উপলব্ধি···এই যে মিল—এ ভালোবাসা··· এমন মমতাভরা প্রাণ কল্পনা করতে পারো কেউ? *

(স্পানিশ গল্প : এমিলিয়া পার্দো পজ্জান)

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিয়া আসিয়াছেন, তাহা পালিত হইবে না—বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার বলিয়া দিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সেই নীতিতে আপত্তি না করিলেও ভারত সরকার সাধারণভাবে সে নীতি গ্রহণ করিবেন না। এই প্রসঙ্গে গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের উক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। তিনি বলেন :—

বলা হইয়াছে বটে, কংগ্রেসীরা প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা হইবে, কিন্তু কাউন্সিল অব ষ্টেটের কংগ্রেসী সদস্যরা সে মত পোষণ করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ নীতি গ্রহণ করিলেও মনে করেন—বর্ত্তমান ঐ নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সময় নহে; কারণ, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইবে, এমন কি ভারতের ঐক্যও নষ্ট হইতে পারে। আবার কেহ কেহ ঐ নীতিরও বিরোধী।

অবশ্য আজ যাঁহারা কংগ্রেসপন্থী, তাঁহারা পূর্ব্বে হয়ত কংগ্রেসপন্থী ছিলেন না এবং তাঁহারা হয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করার প্রয়োজনও অনুভব করেন না।

বিহার ও উড়িষ্যাকে বাঙ্গালা হইতে যখন বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখনই কংগ্রেস মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল তখন বিহারভুক্ত করা হয়, তাহা যেন বাঙ্গালাকে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই অঞ্চল বাঙ্গালা বিভাগের পরেও বাঙ্গালাকে অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গকে দিতে বিহারের আপত্তির অন্ত নাই। ঐ অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী প্রতিপন্ন করিতে বিহারের চেষ্টা যে সরলপথে অগ্রসর হয় নাই, তাহাও যেমন সত্য, সেই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গভুক্তির জন্য আন্দোলন দলিত করিতে বিহারের চেষ্টা যে অসঙ্গতভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাও তেমনই সত্য।

দেশ বিভাগের পরে যে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ঐ অঞ্চল প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীদিগকে যে বিহারে নানা অধিকারে বঞ্চিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়রূপে বাস করিতে হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। যিনি আজ ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তিনিও যে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল হিন্দীভাষাভাষী করিবার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন এবং বিহার সরকার যে ঐ অঞ্চলে বঙ্গভুক্তির জন্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিসের শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণাভাব নাই।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার সম্প্রতি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়া ঐ অঞ্চল দৃঢ়তা সহকারে দাবী করিয়াছেন; রেলের একটি কেন্দ্র যে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান-সচিবের সম্মতি ছিল—এ কথা ভারত সরকার বলিয়াছেন। তাহার পরে ঔষধের কারখানাও স্থানান্তরিত হইল। নানারূপেই পশ্চিমবঙ্গের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগকে সুদূর মাদ্রাজ রাষ্ট্রে পুনর্ব্বসতির জন্য পাঠাইতে উদ্যোগী হওয়ার সহিত বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হইবে দৃঢ়তা সহকারে এই দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করা প্রদেশ বিভাগও নহে; তাহা কেবল দুইটি প্রদেশের সীমা-পরিবর্ত্তন। কিন্তু ভারত সরকার এ ক্ষেত্রে তাহাতেও সম্মতি দিতে অসম্মত! পশ্চিমবঙ্গের লোকমত কি এই ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইবে?

উদ্বাস্তু সমাগম—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদিগের আগমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে কেহ শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনের অবস্থা দেখিলেই আতঙ্কিত হইবেন। পার্লামেন্টে প্রধান-মন্ত্রী ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গের তিনটি জিলার আর্থিক অবস্থার অবনতি হইয়াছে এবং সেই কয়টি জিলা হইতেই অধিকাংশ লোক আসিতেছে। কিন্তু আর্থিক অবস্থার অবনতি যে পশ্চিমবঙ্গেও অল্প নহে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? প্রধান মন্ত্রী যতই "শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার" চেষ্টা করুন না, আর্থিক অবস্থাই ইহার একমাত্র—হয়ত প্রধান কারণ নহে। পাকিস্তান যে গমনাগমনের জন্য ছাড়-ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাও ইহার অন্যতম কারণ। আর এখনও যে পূর্ব্ববঙ্গে বলপূর্ব্বক

হিন্দু তরুণী হরণ ও হিন্দুকন্যা বিবাহ চলিতেছে—হিন্দুর সম্পত্তি অধিকার করা হইতেছে—হিন্দু যেন পাকিস্তানে মুসলমানের অনুগ্রহেই বাস করিতে পারে এমন বিশ্বাসের কারণ ঘটিতেছে—পণ্ডিত জওহরলাল তাহা গোপন করিতে পারিবেন না। যে কথা মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাসও স্বীকার করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী তাহাও স্বীকার করিতে চাহেন না কেন?

কত হিন্দু ও কত মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, তাহার যে হিসাব দেওয়া হয়, তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। চারুবাবু বলিয়াছেন, যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া হিসাব করা হয়। সে অবস্থায় কোন পক্ষের যদি যাহাকে "ইন্‌ফিলট্রেশন" বলে তাহা করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে তাহার পক্ষে সত্য গোপন করা অসম্ভব নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আগন্তুকদিগের সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, তাহা ষ্টেশনে উদ্বাস্তু-সমাগমে যেমন—কাশীপুর পাট-গুদামে তাহাদিগকে স্থান দানেও তেমনই বুঝিতে পারা যায়।

সরকারের হিসাবে গত ১লা এপ্রিল হইতে এ পর্য্যন্ত আশ্রয়-প্রার্থি-শিবিরে ৯৩ হাজার একশত ৫৯ জন প্রেরিত হইয়াছে; আর ১১ হাজার ৩শত ৭২ জনকে সরাসরি পুনর্ব্বাসন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী বলিয়াছেন, কেবল এক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব্ব-বঙ্গাগত হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যত্র যাইতে সম্মত করিতে পারিয়াছেন। তিনি, বোধ হয়, আন্দামানের কথাই বলিয়াছেন। আর যাহাদিগকে বিহারে ও উড়িষ্যায় পাঠান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও যে অনেকে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। মন্ত্রী বলিয়াছেন—আগন্তুকরা বাঙ্গালার (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের) বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক এবং যতদিন তাহারা ইচ্ছুক না হয়, ততদিন তাহাদিগের জন্য অন্যান্য প্রদেশে নগর নির্ম্মাণ করিতে ভারত সরকার প্রস্তুত নহেন।

বিহার ও উড়িষ্যা হইতে যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছে, সে সকলের প্রতীকার করিলে, বোধ হয়, তাহারা ফিরিয়া আসিত না। আজ যে বিহারে ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত, তাহাও বলিতে হয়। সে অবস্থায় বাঙ্গালীর সেই প্রদেশদ্বয়ে বাসে অসুবিধা অনিবার্য্য।

দেশ বিভাগের প্রস্তাব-প্রসঙ্গে মিষ্টার জিন্না যখন ধর্ম্মানুসারে অধিবাসিবিনিময়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন গান্ধীজী দেশবিভাগ পাপ বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা মিষ্টার জিন্নার প্রস্তাব সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সকল বিবেচনা করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে হালিসহর হইতে রাজপুর প্রভৃতি পর্য্যন্ত অনেক পুরাতন সমৃদ্ধ গ্রাম নানা কারণে জনবিরল হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সে সকলের সংস্কার করিতেন, তবে বহু লোকের বাস-ব্যবস্থা হইতে পারিত। তাঁহারা তাহা করেন নাই—বহুব্যয়সাধ্য সহর রচনার পরিকল্পনা লইয়া কাজ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সে সকল কাজে বহু ঠিকাদার, ফাটকাবাজ প্রভৃতির লাভ হয় বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থও অধিক নহে—ভারত সরকারের সাহায্যও যে ফুরাইবে না—এমন নহে। আর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুর আগমন যে সহজে শেষ হইবে পাকিস্তানের মনোভাবে তাহা মনে করা যায় না।

উদ্বাস্তুরা সকলেই যে পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্থায়ী হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, এমনও বলা যায় না; অর্থাৎ তাহাদিগের কেহ কেহ যে divided allegiance অনুশীলন করে না, "গাছেরও পাড়ে—তলারও কুড়ায়" না, এমনও যে বলা যায় না, তাহা দুঃখের বিষয়। সে বিষয়ে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সতর্কদৃষ্টি আছে, তাহাও মনে হয় না। আর সেই জন্য দুর্নীতি যেমন প্রশ্রয় পাইতে পারে—সরকারের অর্থের তেমনই অপব্যয় হইতে পারে। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যে সরকারের কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

লোককে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পাঠাইবার চেষ্টা যে অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার না হইলেও অনাচার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালীর যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা স্বাভাবিক।

খাদ্য-সমস্যা—

যে সময় খাদ্যাভাবের জন্য কলিকাতায় বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং সেই বিক্ষোভ মফঃস্বলেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে—অসময় হইলেও—পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশনে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ঘোষণা করেন—চাউলের মূল্য মণকরা ৩টাকা ১২ আনা বাড়ান হইল! অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য-সচিব তাঁহার এই কার্য্যের সমর্থক যুক্তির অভাব অনুভব করেন নাই। সরকার প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, লোক যাহাই কেন করুক না, তাঁহারা ক্ষমতাধিকারহেতু যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। ৩রা শ্রাবণ এই ঘোষণায় কিন্তু কংগ্রেসীরা প্রমাদ গণিয়া তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। ফলে ৫ই শ্রাবণ প্রধান-সচিব বলেন—মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে কিছু বলা হয় নাই বটে, কিন্তু বলার প্রয়োজনও নাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে পরিষদে কংগ্রেসী দলের মতানুসারে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি স্থগিত করা হয়! অর্থাৎ শনিবারের সিদ্ধান্ত সোমবারে বাতিল করা হয়। যদি তাহাই সম্ভব হইয়াছিল, তবে শনিবারের ঘোষণা কি সঙ্গত বা শোভন বলা যায়?

এ ক্ষেত্রে প্রধান-সচিব খাদ্য-সচিবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কতকগুলি অঙ্ক উপস্থাপিত করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু সে সকলে যে লোক সরকারের কৃত কর্ম্মের সমর্থন করিতে পারে, এমন নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া আপনারা নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী

সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিবৃতি দেন, কেন্দ্রী সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে খাদ্যশস্য দিবেন—প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ খাদ্যশস্য তাঁহারা প্রেরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সে বিষয়ে উক্তি বে-বনিয়াদ, যুক্তি অসার। কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া ও সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবদিগের সহিত আলোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, কেন্দ্রী সরকার কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত শিল্পাঞ্চলের জন্য খাদ্যশস্য দিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন তাহাতে "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরে অভিযোগ করিয়াছিলেন কেন্দ্রী সরকার, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। কিন্তু কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই দোষী করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিক খাদ্যোৎপাদনের আন্দোলনে যে অর্থ-ব্যয় হইয়াছে শস্যোৎপাদন যে তাহার অনুরূপ হয় নাই, তাহা দেখা গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে চাষের উপযুক্ত জমী "পতিত" আছে, তাহা "উঠিত" করাও হয় নাই; পরিপূরক খাদ্যের উৎপাদনেও আবশ্যক উৎসাহ ও সাহায্য দান করা হয় নাই। সমুদ্রে মৎস্য আহরণের পরীক্ষায় যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা যদি পুষ্করিণী প্রভৃতি সংস্কারে ও সে সকলে মৎস্যের চাষে প্রযুক্ত হইত, তবে অনেক উপকার হইত, ইহাই কোন কোন বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত মত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব ও উপসচিবরা যদি অন্যান্য দেশের ব্যবহার বিবরণ অধ্যয়ন করেন, তবে ভাল হয়।

কংগ্রেস ও সংবাদপত্র—

গত ৩রা শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটী তাঁহাদিগের এক সাধারণ সভায় এক প্রস্তাবে বলিয়াছেন—'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পত্রদ্বয় কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন এবং ৩রা শ্রাবণ—পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে একখানি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন ইহা অশোভন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কোন বা কোন কোন কর্ম্মকর্ত্তা বা তাঁহাদিগের স্বজনগণ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব। তাঁহাকে যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর আশ্রয়ে বাস করিতে হয়, তবে তাহা প্রধান-সচিবের পক্ষে সম্ভ্রমজনক নহে। ব্যঙ্গ চিত্রের বিষয় এক জন মহিলা ভূতলে পতিত, আর এক ব্যক্তি তাঁহাকে লাঠি মারিতেছে। মহিলাটির বস্ত্রে ও প্রহারকারীর জামায় যথাক্রমে লিখিত—"বাঙ্গালা" ও "রায়"। অদূরে দাঁড়াইয়া দুই জন মহিলা বলিতেছেন—"উনি ত ইচ্ছা করিয়াই ঐ ব্যক্তিকে বরণ করিয়াছেন।" ঐ মহিলাদ্বয়ের শাড়ীতে লিখিত "বিহার" আর "আসাম"।

ইংরেজের অধীনে ভারতে দেশবাসীর প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতার সমর্থন ও সেই স্বাধীনতা সঙ্কোচের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন—কারণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণ গণতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন। আজ স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত রাষ্ট্রে কংগ্রেস যে সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া লোককে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারত রাষ্ট্রের দুইখানি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র পাঠ করিতে নিষেধ করিতেছেন, ইহাতে পত্র-দ্বয়ের কোন ক্ষতি (অবশ্য সরকারী বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত) হইবে কি না, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে যে কংগ্রেস কমিটী হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

মতপ্রকাশ-স্বাধীনতাসম্পন্ন সংবাদপত্রই রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণজনক এবং তাহাই রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ ও ভণ্ডামীমুক্ত করিতে পারে। সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের কাম্য।

খাদ্য-সঙ্কট ও সরকার—

গত ৩১শে আষাঢ় হইতে কয়দিন কলিকাতায় জনগণের এক সম্প্রদায়ের সহিত সরকারের খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। "দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ সমিতি" পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল বামপন্থীদলের সম্মিলন। কেবল কম্যুনিষ্ট দল তাঁহাদিগের সহিত যোগ দেন নাই। সমিতির আহ্বানে প্রায় ২ হাজার নরনারী অভিযোগ জানাইবার অভিপ্রায়ে রাজভবন ও পরিষদ ভবনের ১৪৪ ধারার বেড়া অতিক্রম করিয়া ৩১শে আষাঢ় ব্যবস্থা পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিস ১৪৪ ধারার মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি ব্যবহার করে। ফলে শতাধিক লোক আহত হয় এবং শ্রীমতী লীলা রায়, ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদের সদস্য হেমন্ত কুমার বসু প্রভৃতি ৩২ জন গ্রেপ্তার হ'ন। আহতদিগের মধ্যে ৮ জনের আঘাত গুরু। ঐ ব্যাপারে ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দল আপত্তি জানাইয়া পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় পরিষদের কার্য্য স্থগিত রাখিতে ও প্রধান-সচিব বিধানচন্দ্র রায় বিরোধী দলের কথা শুনিতে অস্বীকার করেন।

পরদিনও জনতা ঐরূপ চেষ্টা করিলে পুলিস লাঠি চালায় ও প্রভূত পরিমাণ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। এই দিন পুলিস গুলীও ছুড়িয়াছিল! এই দিন ২৭ জন আহত হয় এবং পুলিস ১২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। ব্যবস্থাপরিষদে সভাপতি এই সম্পর্কে উপস্থাপিত ৮টি মুলতুবি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া আন্দোলন দমিত করিবার চেষ্টা করেন।

পরদিন অর্থাৎ ১লা শ্রাবণ পুলিসের ব্যবহারের প্রতিবাদে হরতাল হয় এবং ৫০ জন লোক আহত ও ৩ শত লোক গ্রেপ্তার হয়।

হরতাল সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহা বিভাগের অসাধারণ যোগ্যতার পরিচায়ক। বিবৃতিতে বলা হয়—

হরতাল ঘোষিত এবং নানারূপ ভীতিপ্রদর্শক কার্য্য সত্ত্বেও কলিকাতার সাধারণ জীবন ও কার্য্য প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাহার পরের উক্তি :—

নানা ট্রামডিপোয় ও রাস্তার মোড়ে বাধাদান চলিয়াছিল। ট্রামে অগ্নিযোগ করা এবং পটকা ও বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সরকারী বাস ও পুলিস আক্রান্ত হয়—রাস্তা বন্ধ করা হয়—ইত্যাদি।

বোধ হয়, সরকারের প্রচার বিভাগের মতে ইহাই কলিকাতার স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থা!

২রা শ্রাবণ হাজরা পার্কে সভা হইবার কথা ছিল। পুলিস তাহাতে বাধা দেয় এবং ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। যাঁহার সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, তাঁহাকে তাঁহার গৃহেই গ্রেপ্তার করা হয়।

১লা শ্রাবণ বিধানচন্দ্র রায় বলেন—যাহা হইয়াছে, সে জন্য তিনি দুঃখিত নহেন।

২রা শ্রাবণ সরকার রেশনের চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি ঘোষণায় অবস্থা আরও জটিল হয়।

৪ঠা শ্রাবণ পুলিস হেদুয়ায় সভাধিবেশন-চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য কি ভাবে লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে, তাহার বিবরণ আমরা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। এই সংবাদপত্র হইতে বিবরণ উদ্ধৃত করিবার বিশেষ কারণ এই যে, ইহার সম্পাদক ও প্রধান অধিকারীর একমাত্র পুত্র তরুণকান্তি ঘোষ একজন উপ-সচিব এবং তরুণকান্তি উপ-সচিবত্ব লাভের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত 'পত্রিকা'-পরিচালনে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে রত ছিলেন।—

"Many pedestrians became victims of vigorous police action. From among the crowd the police made arrests and as they were led to the police vans they were given severe beating. The charge was a mild affiair compared to the rough handling to which arrested persons were subjected."

বলা হইয়াছে, পুলিস লাঠি ছাড়িয়া বাঁশ দিয়াও ভূপতিত লোককে প্রহার করিয়াছিল। নিরপরাধ ব্যক্তিরাও লাঞ্ছিত হয়—এক জন বালকও প্রহৃত হয়।

৫ই শ্রাবণও খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার চলে।

৬ই শ্রাবণ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভাকারী ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে ৩ জন মহিলা ছিলেন।

ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি বন্ধ করেন এবং কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী বলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে।

৭ই শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্দীদিগকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেন এবং যে বিধানচন্দ্র রায় ৬ই শ্রাবণও সহরে ১৪৪ ধারা জারি দৃঢ়তাসহকারে সমর্থন করিয়াছিলেন, তিনিই ৮ই তারিখে উহা বাতিল করেন।

নিবারক আটক আইন—

যে আইন সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর পিতা পরলোকগত মতিলাল নেহরু বলিয়াছিলেন—তাহাতে সরকারের আবদার—"যে ক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্তের অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহে, সে ক্ষেত্রে আমাদিগকে দণ্ড দানের অধিকার দাও"—ভারত সরকার সেই আইন, ইংরেজের আমলের অপেক্ষাও কঠোর ভাবে, প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদিও তাঁহারা আইনে কতকগুলি নূতন ধারা যোগ করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা আরও নিরঙ্কুশ করিতে চাহিতেছেন তথাপি তাহা জনমতের জন্য প্রচার করিতেও অসম্মত ছিলেন। যেন, তাঁহাদিগের আর বিলম্ব সহ্য হয় না; যাঁহাদিগকে তাঁহারা সন্দেহজনক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আটক করা প্রয়োজন। কারণ, ভারত সরকারের বর্ত্তমান পরিচালকদিগের মতবিরোধীরা রাষ্ট্রের নির্ব্বিঘ্নতার পক্ষে বিপজ্জনক।

কয়দিন পার্লামেণ্টে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। সরকারপক্ষে ছিল উক্তি—বিরোধী দলের ছিল যুক্তি। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু কিছুতেই প্রস্তাবিত আইন লোকমত জানিবার জন্য প্রচার করিতে সম্মত হ'ন নাই। কিন্তু, বিস্ময়ের বিষয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উক্তি ব্যর্থ করিয়া প্রধান মন্ত্রী শেষ মুহূর্ত্তে বিরোধী দলের প্রস্তাবিত আইন বিচারের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল। তাঁহার এই মত-পরিবর্ত্তন যত বিস্ময়করই কেন হউক না—তাহা যে গণমতের ও যুক্তির নিকট নতি স্বীকার, সুতরাং প্রশংসনীয়, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। যদি প্রধান মন্ত্রী প্রথমেই ইহা করিতেন, তবে যেমন অনর্থক পার্লামেণ্টের সময় নষ্ট হইত না, তেমনই সরকারও, জিদ বজায় রাখিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতেন না।

দেখা যাইতেছে, বিদেশী শাসনে ভারতীয় নেতারা যে সকল আইনের নিন্দা করিতেন, শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়া তাঁহারাই সে সকলের অনেকগুলি সাগ্রহে ব্যবহার করিতেছেন! সন্দেহক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। যে ব্যক্তি আইনবিরোধী ও সমাজদ্রোহী কাজ করে, সে নিশ্চয়ই দণ্ডার্হ। কিন্তু যতক্ষণ তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ তাহার দণ্ডদান কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। অপরাধীর বিচার জন্য বিচারালয় আছে এবং সেই বিচারালয়ই সে অপরাধী কি না, তাহা স্থির করিবে ও সে অপরাধী স্থির করিলে তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবে। সন্দেহমাত্র কখনই অপরাধের প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইংরেজের শাসনকালে বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তও সন্দেহক্রমে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত রাষ্ট্রে ইংরেজের অর্থাৎ বিদেশী শাসকের যে সকল বে-আইনী সে সকল বাতিল করা হইবে, তাঁহারা যে এই নূতন আইন প্রবর্ত্তনে সরকারের আগ্রহে ব্যথিত হইবেন, তাহা সঙ্গত।

পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাবিত আইনের আলোচনাকালে যে সরকারী মনোভাবের পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তাহা দুঃখের বিষয়। শেষকালে যে ভারত সরকার প্রস্তাবিত আইন-কমিটীর আলোচনায় সম্মত হইয়াছিলেন তাহা সুখের বিষয়।

ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা—

পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভায় এ বার আলোচনা য স্তরে আসিয়াছে, তাহা সমগ্র প্রদেশের পক্ষে সম্ভ্রমজনক বলিয়া মনে রা যায় কি না, সন্দেহ। এই আলোচনায় এক পক্ষ অপর পক্ষের ম্বন্ধে যেরূপ ভাষা প্রযুক্ত করিয়াছেন এবং যে সকল তথ্য প্রচার রিয়াছেন, তাহাতে প্রতিনিধি সভার গাম্ভীর্য্য ও শিষ্টাচার রক্ষা করা, নেক ক্ষেত্রে, সভাপতির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এমন কি মহিলার খেও যেরূপ উক্তি শুনা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, আমাদিগের শষ্টাচারের আবরণ "খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত।" কেহ কেহ হার কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টায় বলিয়াছেন—

(১) ইহার কারণ এক দিকে যাহাকে brute majority বলে হার দর্প দম্ভ, আর এক দিকে অসাফল্যের অসন্তোষ।

(২) যে পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই পক্ষ অপরপক্ষ সম্বন্ধে যে নোভাব পোষণ করেন, তাহা অপরপক্ষের পক্ষে অপমানজনক লিয়া বিবেচিত।

(৩) কোন কোন স্থলে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচনে শোচনীয়ভাবে রাভূত ব্যক্তিদিগকে—কংগ্রেসের প্রথম বিবৃত নীতি পদদলিত করায়, ার এক ক্ষেত্রে অনির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে সচিব নিযুক্ত করায় বিরোধী দল ংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ও সেই দলের মনোনীত সচিবদিগের প্রতি াস্থাহীন হইয়াছেন।

বিরোধী দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সচিবদিগের কাহারও কাহারও ম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকল লজ্জার বষয়। দুর্নীতি, আত্মীয়পোষণ, একদেশদর্শিতা, মিথ্যাচরণ—এই সকল অভিযোগ অবাধে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কোন কোন সচিবের সম্বন্ধে ীন অপরাধের অভিযোগও উপস্থাপিত করা হইয়াছে। সে সকল অভিযোগ মাত্র। সে সকল প্রমাণ-সাপেক্ষ না হইলে সরকার পক্ষে সেগুলির প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

অবশ্য যে পার্লামেন্টের অন্ধ অনুকরণ আমাদিগের দেশে করা হয়, সেই ্রটিশ পার্লামেন্টে যে সময় সময় সাধারণ শিষ্টাচারের নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহা অবাঞ্ছনীয়।

কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যগণ সরকারকে সমর্থন করিবার জন্য যে অকারণ আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহাও অশোভন। কংগ্রেসের পক্ষীয় কোন কোন ্যক্তির ব্যবহার আলোচনার বিষয় হইয়াছে এবং সে ব্যবহারের সমর্থন করিতে সরকার পক্ষকে বিশেষ বিব্রত হইতেও হইয়াছে। সচিবের অজ্ঞতা—আইনের অজ্ঞতারই মত সমর্থন করা যায় না।

বাজেটের আলোচনাকালে শতাধিক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতে পায় নাই। ইহাতে বিরোধীদলের অসন্তোষের কারণ যে নাই, এমন বলা যায় না।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—

আসামের ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে নদীর বন্যায় অনেক স্থান প্লাবিত হইয়াছে এবং তাহাতে ক্ষতির পরিমাণও অল্প নহে। উভয় প্রদেশেই যে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সাহায্যদান-ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব ঘটে নাই, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু প্রথমিক সাহায্যদান করিলেই সরকারের ও সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্য ও কর্ত্তব্য শেষ হয় না। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগজনিত ক্ষতির প্রতীকার করা প্রয়োজন হয়। সে কাজ প্রথমিক সাহায্যদান অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি অঞ্চলে বন্যার আবির্ভাবে বৎসরের পর বৎসর বহু গ্রাম বিপন্ন হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতীকার-ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে সমগ্র প্রদেশের সমৃদ্ধি বিপন্ন হইবে। দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ নিবারণ করা অসম্ভব হইলেও তাহার কুফল-নিবারণ অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলের বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন; এই অঞ্চল বাঁধের দ্বারা রক্ষা করিতে হয়। বাঁধ রক্ষার কর্ত্তব্য এখনও কোথাও জমীদারদিগের, কোথাও সরকারের। যত দিন জমীদারী প্রথা বিলুপ্ত না হইতেছে, ততদিন সরকারের পক্ষে জমীদাররা যাহাতে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন করেন সে দিকে দৃষ্টি রাখা যেমন প্রয়োজন, সরকারী কর্ত্তব্য যাহাতে পালিত হয় সে বিষয়ে অবহিত হওয়াও তেমনই প্রয়োজন। সুন্দরবনে উভয় পক্ষেরই কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালিত হয় নাই। এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই? সেই জন্যই এ কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে।

কাশ্মীর-সমস্যা—

কাশ্মীরের নেতা সেখ আবদুল্লা দিল্লীতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভারত সরকারের মন্ত্রীদিগের কাশ্মীরের-ভারতভুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনার পরে বলা হইয়াছে, কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রেরই অংশ। কিন্তু যে বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ভারত ও কাশ্মীর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে কেবল বলা যায়—A conclusion in which nothing is concluded. বল্লভভাই পেটেল যখন সামন্ত রাজ্যসমূহকে ভারতভুক্ত করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন—সে কার্য্য নূতন। যাহাতে অধিক বাধা-বিপত্তি ভোগ করিতে না হয়, সেই জন্য তিনি সামন্ত-রাজাদিগকে যে অধিকার দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা অতিরিক্ত অধিক এবং যে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও প্রভূত। কিন্তু কাশ্মীর সম্বন্ধে সেরূপ কোন কথা নাই। বিশেষ ভারত রাষ্ট্রই পাকিস্তানের "অনধিকার প্রবেশ" হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিয়াছে এবং সে জন্য ভারতের ধনক্ষয়ও অল্প হয় নাই। সে অবস্থায় সমগ্র কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারত-রাষ্ট্র-ভুক্তিই সঙ্গত। জম্মু ও লাডকের অধিবাসীরা তাহাই চাহে।

এ দিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহসা জাতিসঙ্ঘের নিকট মীমাংসা-প্রার্থী হওয়ায় কাশ্মীরের যে অংশ সেই প্রার্থনাকালে পাকিস্তানীদিগের অধিকারে ছিল, সে অংশ তাহারাই অধিকার করিয়া আছে। অর্থাৎ যদি বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত বলা যায়, তাহা হইলেও সমগ্র কাশ্মীর ভারতভুক্ত হইল, এমন বলা যায় না।

অথচ কাশ্মীরের উন্নয়ন কার্য্যে ভারত সরকার অবাধে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এখনও ভারত সরকার কাশ্মীর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অধিকার পার্লামেন্টে সদস্যগণকে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ইহারই বা কারণ কি?

মিশর—

মিশরের রাজা ফারুক বাধ্য হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার শিশু পুত্রকে রাজ্যাধিকারী ঘোষণা করিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য পুত্র তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। বলা হইয়াছে, ৭ মাসের পুত্র ৭ বৎসর বয়সে মিশরে ফিরিয়া সিংহাসন অধিকার করিবে। সৈনিকদিগের দাবীতে ফারুক এই কাজ করিয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, মিশরের রাজতন্ত্র শাসনের অবসান ঘটে নাই। যাঁহারা ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন, তাঁহারা ফারুকের শিশুপুত্রের নামে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তুরস্কে কামাল পাশা যেমন গণতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন—রাজার (সুলতান ও খলিফা) অধিকার লোপ করিয়াছিলেন, মিশরে তেমন হয় নাই।

ফারুকের রাজ্য-ত্যাগের সহিত বিদেশী রাজনীতিকদিগের চক্রান্তের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে মিশরে বিদেশীদিগের স্বার্থ যেরূপ তাহাতে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল মিশরে বিদেশী রাজনীতিক প্রভাব প্রবল রহিয়াছে এবং আজ—গণজাগরণের সময়ে—তাহার ষড়যন্ত্রও দিকে দিকে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা যে করিতেছে, তাহা ইন্দো-নেশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন।

মিশর তুরস্কের অধীন ছিল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় মিশরের খদিব (তুরস্কের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা) বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংলণ্ড-ফ্রান্স-রুশিয়ার দলে যোগ দিলে ঐ সকল দেশই তাঁহাকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারাই তদবধি তাঁহার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছেন।

মিশরের জনগণ কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহিয়াছে এবং সেই জন্য মিশরে অসন্তোষ বহুবার বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও কেহ কেহ মনে করিতেছেন, ফারুক আবার ফিরিয়া আসিয়া রাজত্ব করিবেন তবে তাহা অনুমান।

সুয়েজ খাল মিশরের মধ্য দিয়া খনিত। তাহাই প্রতীচী হইতে প্রাচীতে আসিবার অন্যতম প্রধান পথ। সেই পথ রক্ষায় য়ুরোপীয়দিগের স্বার্থ অত্যন্ত অধিক। সেই জন্যই ইংলণ্ড বহু অর্থের বিনিময়ে সেই খালে ভূতপূর্ব্ব খদিব ইশমাইলের অংশ ক্রয় করিয়া লইয়াছিল।

যদিও ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়া স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, তথাপি ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান এখনও "কমনওয়েল্‌থ"-ভুক্ত। উভয় রাষ্ট্রে এখনও ইংলণ্ডের স্বার্থ অল্প নহে। সুতরাং সুয়েজ খালে আপনার অধিকার রক্ষার আগ্রহ ইংলণ্ডের পক্ষে স্বাভাবিক।

মিশরের কি হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। তবে ইহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে যে, মিশরে বিনারক্তপাতে যে সত্য সত্যই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, এমন আশা সুদূরপরাহত।

ইরাণ—

ইরাণে এখনও শান্ত অবস্থা স্থাপিত হয় নাই। তথায় মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হইতেছে না, অর্থাৎ দলাদলির অবসান ঘটিতেছে না। বিশেষ আবাদানে তেলের কারখানা সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু মীমাংসা এখনও হয় নাই।

তৈল সম্পদ ইরাণের অন্যতম প্রধান সম্পদ। তাহার উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ইরাণের আর্থিক অবস্থা অক্ষু থাকিবে না।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৯

মন্থরা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

মন্থরা জাগ্রত আজ হিংসা-স্বার্থে চক্রান্ত-কুটিল,
কৈকেয়ীর কণ্ঠহার বার বার তারি উপহার।
ব্যথিত ভরত আজ তারে আর করে না ভৎর্সনা,
দেবকুলপ্রিয় রাম নির্ব্বাসিত প্রাণরাজ্য হ'তে।

কুব্জপৃষ্ঠ বক্রমন মন্থরার শুনি পদধ্বনি,
বিমাতা কৈকেয়ী মন আজ আর দ্বিধাগ্রস্ত নয়।

নির্ভয় মন্থরা তাই অযোধ্যার অন্তঃপুর ছেড়ে
বাহির বিশ্বের বুকে গর্ব্বভরে করে পদক্ষেপ।

অনুতপ্ত-দশরথ মৃত আজ। কৌশল্যা শ্রীহারা।
ভরত কোথায় আজ? কোথায় শত্রুঘ্ন অনুগামী?
মন্থরার অধিকার চারিদিকে প্রতিবাদহীন,
অঙ্গুলিসঙ্কেতে তারি চলমান পৃথিবী-গোলক।

কালচক্র ঘুরে চলে মন্থরার চক্রান্তে চঞ্চল।
কোথায় ভরত হায়! জনতার চক্ষে ঝরে জল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

। সোভিয়েট-উড়ো-জাহাজটিতে উড়ে আমরা কাবুল থেকে সোভিয়েট ীমান্ত-রাষ্ট্র উজ্‌বেকিস্থানের প্রধান শহর তাশকান্দে যাত্রা করলুম—তার াইরের আকার-আয়তন যেমন বিরাট···ভিতরের যন্ত্রপাতি আর আরামের ্যবস্থাও তেমনি চমৎকার! উড়ো-জাহাজখানির চেহারা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের 'এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারনাশনালের' বিদেশগামী ূর-পাল্লার 'কন্‌ষ্টেলেশন্' এরোপ্লেনের মত! তবে, সোভিয়েট-প্লেনের ্যবস্থা-বিধি একটু আলাদা-ধরণের! অর্থাৎ আমাদের দেশে কিম্বা উরোপ, আমেরিকায় যাত্রীবাহী দূর-পাল্লার বিমান-যানে আরোহীদের বসবার জন্য যেমন প্লেনের ক্যাবিনে সঙ্কীর্ণ চলন-পথের দু'পাশে সার দিয়ে এক জোড়া করে আসন সাজানো থাকে—সোভিয়েট উড়ো-জাহাজগুলিতে কিন্তু ব্যবস্থা তেমন নয়! সে-দেশের প্লেনে থাকে—একুনে একুশটি যাত্রী-আসন···ক্যাবিনের এক পাশে একের পিছনে একটি করে সাজানো সাত-খানি গদী-আঁটা সুদৃশ্য 'সীট' এবং অপর পাশে এক জোড়া করে চৌদ্দ-খানি অনুরূপ আরামপ্রদ বসবার জায়গা···দু'সার আসনের মাঝে চলা ফেরার পথ বেশ সুপ্রশস্ত···যাত্রীদের আনাগোনা বা স্বাচ্ছন্দ্য-বিহারেও তেমনি অসুবিধা ঘটে না! সনাতন বৈমানিক-রীতি-অনুযায়ী এ-সব প্লেনের মুখপ্রান্তে সামনের কুঠরীতে থাকে চালন-যন্ত্র, কল-কব্জা-মীটার আর বিমান-অধ্যক্ষ এবং তাঁর সহ-চালকরা; পরের কক্ষটিতে থাকে বেতার-যন্ত্রাদি এবং বিমান-যান্ত্রিকের দল—তার পিছনেই সুপ্রশস্ত এক কুঠরীতে জমা রাখা হয় আকাশ-যাত্রীদের বড় বড় মাল-পত্র-লটবহরাদি! ···মাল-কুঠরীর পরেই সুদীর্ঘ ক্যাবিন—সেখানে লম্বা সার দিয়ে যাত্রীদের বসবার আসন···তারই পিছনের অংশে অর্থাৎ প্লেনের ল্যাজের দিককার শেষ কোণটির এক পাশে সুসজ্জিত বাথ্‌রুম্ এবং আর এক পাশে যাত্রীদের খাবার-দাবার ও ছোটখাট দামী জিনিষপত্র রাখার নাতি-বৃহৎ গুদাম-ঘর! ···সারা প্লেনখানি পাঁচটি খোপে ভাগ করা! এ ছাড়াও সোভিয়েট দেশের উড়ো-জাহাজী-ব্যবস্থায় আরো এক বিশেষ পার্থক্য নজরে পড়ে! ইউরোপ, আমেরিকা এবং ও-সব দেশের অনুকরণে আমাদের ভারতবর্ষেও আজকাল যাত্রীবাহী বিমান-যানে আকাশ-যাত্রীদের সুখ-সুবিধা-আরামের তদ্বির-তদারকের উদ্দেশ্যে সুন্দরী Air-hostess বা পরিচারিকা···পান-ভোজনের বিচিত্র আয়োজন এবং বিলাস-আড়ম্বরের যেমন বহুল-ব্যবস্থা থাকে,—সোভিয়েট দেশের উড়ো-জাহাজে কিন্তু তেমন বিলাস-বাহুল্যের বালাই নেই একেবারে!

নিতান্ত সহজ, সরল, সুন্দর, অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু, নিপুণ দক্ষতায় যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বেশ সজাগ দৃষ্টি রেখে একাগ্র নিষ্ঠাভরে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলেছে আকাশ-চারী সোভিয়েট বিমান-যানগুলি! সুবিশাল সোভিয়েট রাজ্য-সফরে আকাশ-পথে আমরা যখন যেখানে গেছি···সর্ব্বত্রেই লক্ষ্য করেছি এই একই ব্যবস্থা-বিধি···এর এতটুকু ব্যতিক্রম কোথাও আমাদের চোখে পড়েনি! সব কিছু ঘরোয়া-ধরণের···কৃত্রিমতা বা ব্যবসাদারী প্যাঁচ নেই! অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট-প্লেনে রূপসী

তাশকান্দে আলীশের নাভৈ ইউনিভার্সিটি
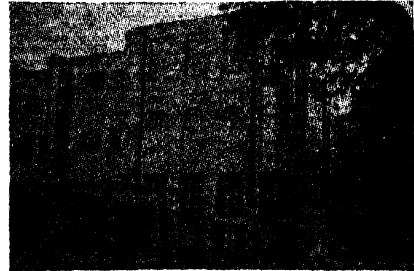
পরিচারিকার সুন্দর মুখের দেখা তো মেলেই না, উপরন্তু, আকাশ-পথে যাত্রাকালে আহারাদির যা কিছু ব্যবস্থা, সে-সবও করতে হয় যাত্রীদের নিজেদের! কেউ খাবারের পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে উড়ো-জাহাজে সফর করেন, আবার কেউ-বা সুবিধামত সে পালা সেরে নেন বিমান-বন্দরের সমৃদ্ধ খাদ্যশালায়—সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার সময় উড়ন্ত প্লেন যখন মাঝে মাঝে এঞ্জিনে তেল ভরবার কিম্বা যাত্রী ওঠানো-নামানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এরোড্রোমে দাঁড়ায় স্বল্পক্ষণের জন্য! ওদেশের উড়ো-জাহাজে মানুষ এবং মাল-পত্রের দরুণ ভাড়া-মাশুল যা ধার্য্য থাকে—তার অঙ্ক,—আমাদের দেশের মুদ্রা-মানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে দেখলে আপাত-দৃষ্টিতে অনেক বেশী বলে মনে হবে, তবে ওদেশের অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা জেনে যদি যথাযথ বিবেচনা করা যায়—তাহলে দেখা যাবে যে সোভিয়েট মুদ্রা-মানের হিসাবে সে-ভাড়ার অঙ্ক এমন কিছু বেশী

নয়! ও-দেশের অতি-সাধারণ একজন ঝাড়ুদার—প্রত্যহ শহরের পথে আবর্জ্জনা সাফ্ করে দৈনিক আট ঘণ্টা খেটে প্রতি মাসে মাহিনা উপার্জ্জন করে পাঁচশো রুবল্ (আমাদের দেশের টাকার হিসাবে প্রতিটি রুবল্ হলো এক টাকা দু' আনা)—অর্থাৎ মাসিক বেতন পাঁচশো বাষট্টি টাকা আট আনা! সারা দিনে শুধু আট ঘণ্টা খেটে এই রোজগার…বাকী ঘণ্টাগুলিতে সে নিজের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য মত খেটে উপার্জ্জনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে কিম্বা কোনো কলেজে বা পুঁথি পড়ে কারখানায় গিয়ে হাতে-কলমে কাজ শিখে নিজেকে গড়ে মানুষ করে উন্নতির পথে এগুবার সুযোগও পায় অপর্য্যাপ্ত! ও-দেশে পর্য্যটন-কালে আমরা এমন অনেক চাষী, মজুর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি অতি-সাধারণ জনের দেখা পেয়েছি, যাঁরা নিজেদের অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতায় সমাজে আজ বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত—সুপ্রচুর অর্থ এবং খ্যাতি পেয়েছে এমন অনেক কলের কুলী, কারখানার মিস্ত্রী, কামারশালার কামার, ইস্কুল-মাস্টার এবং অফিসের কেরাণী দেখেছি, যাঁরা সারা দিনের
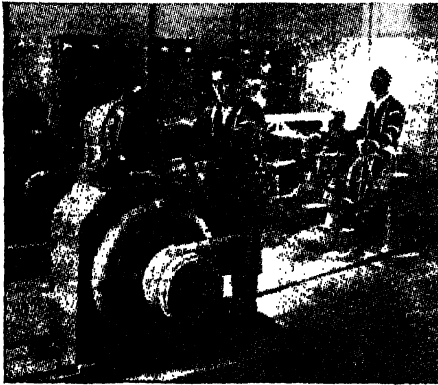
উজবেকীস্তানের একটি কৃষি প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক কেন্দ্র

খাটুনীর পর মস্কো রেডিওর আসরে কিম্বা কোনো সান্ধ্য-জলসায়—মাত্র মিনিট দশেক গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে বা কবিতা পড়ে অনায়াসে নগদ পাঁচশো রুবল্ পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করে মনের আনন্দে ঘরে ফিরেছেন। শুধু এই নয়, মাস-মাহিনা ছাড়াও ও-দেশে এমনি খেটে উপরি-উপার্জ্জনের পথও খোলা রয়েছে সুপ্রশস্ত এবং সুযোগও মেলে বহু রকমের!…সোভিয়েট-দেশের বাসিন্দারাও এ-সব সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে মনে-প্রাণে! ও-দেশের অতি-সাধারণ ধাঙড়-মজুরও মাস গেলে দু'তিন হাজার রুবল্ রোজগার করে নিতান্ত হেসে-খেলে গড়িয়ে! সুতরাং যে দেশে আয়ের পথ এমন সহজ, সুপ্রশস্ত…সেখানে ব্যয়ের মাত্রাও যে অন্য দেশের তুলনায় বেশী হবে—সেটা আর নতুন কথা কি! কিন্তু এসব কথা এখন থাক্—আমাদের পথের কথা বলি!

কাবুলের এরোড্রোম ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্লেন আমাদের ভেসে চললো ঊর্দ্ধ-গগনে…প্রায় তেরো-চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। কারণও ছিল এই এত উঁচু দিয়ে উড়ে যাবার। আসনের পাশেই ক্যাবিনের স্বচ্ছ কাঁচের জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখি—বিশাল বিস্তৃত হিন্দুকুশ পার্ব্বত্য-প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছি! যতদূর দৃষ্টি যায়—খালি পাহাড়ের পর পাহাড়ের সার—চারিদিকে ছড়ানো…এক অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থিতে গাঁথা রয়েছে যেন।…কোথাও ছেদ নেই…বিরতি নেই…শেষ নেই অসীম উঁচু-নীচু তরঙ্গায়িত রুক্ষ-বন্ধুর সুপ্রাচীন হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার। প্লেনের নীচে…ডাহিনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে সর্ব্বত্র চোখে পড়ে শুধু পাহাড় আর পাহাড়—তৃণ-শষ্পসজ্জাহীন রিক্ত হলেও এই সব সুউচ্চ গিরি-শৃঙ্গের শিরোদেশ অপরূপ মহিমা-মণ্ডিত হয়ে রয়েছে শ্বেত-শুভ্র চির-তুষারের মুকুট-ভূষণে।…অপরাহ্ণ-সূর্য্যের আলোয় দীপ্ত নীচে ধরণীর বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদ দেখতে দেখতে এগিয়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমু-দরিয়ার উপর দিয়ে উড়ে পার হয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমাদের প্লেন এসে থামলো সোভিয়েট সীমান্ত-সহর 'তেরমেজ'-এর প্রশস্ত বিমান-বন্দরে! আফগানিস্তান আর উজবেকিস্তানের প্রান্ত-সীমায় সোভিয়েট দেশের ছোট্ট সীমান্ত-শহর এই তেরমেজ!…ছোট হলেও

উজবেকীস্তানের এক যৌথ-কৃষি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা

সীমান্তের এ-সহরটির প্রাধান্য খুব দেশরক্ষার ব্যাপারে। সোভিয়েট রেলপথের পূর্ব্ব-[illegible] অঞ্চলের শেষ সীমা হলো এই তেরমেজ সহর…তাছাড়া ভারত-আফগানিস্তানের দিক থেকে সুবিশাল সোভিয়েট রাজ্যে প্রবেশ-কালে এখানকার দেশ-রক্ষী শুল্ক-ঘাঁটিতে সনাতন বৈদেশিক রীতি-অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্বদেশী এবং বিদেশী যাত্রীর বাক্স-প্যাঁটরা এবং ছাড়পত্রাদি পরীক্ষা করে দেখা হয়। সুতরাং সোভিয়েট সীমান্ত-রক্ষার ব্যাপারে এই ছোট্ট তেরমেজ শহরটির দায়িত্ব বড় কম নয়!

অতএব প্লেন থেকে নেমে আমরা সদলে গেলুম এরোড্রোমের [illegible] দেশরক্ষা-বিভাগের সুবৃহৎ দ্বিতল ভবনের নীচের তলায় [illegible] কাষ্টমস্-কর্ম্মীদের পরীক্ষা-ঘাঁটিতে। সেখানে, মুস্কিল বাধলো [illegible] নিয়ে।…অর্থাৎ কাবুল থেকে আসবার সময় সঙ্গে [illegible] দোভাষী না থাকার দরুণ আমরা যতই ইংরেজী আর [illegible] বলি, ওঁরা তার একটুকু মর্ম্ম বোঝেন না…আবার [illegible]

লোকজনরা ও দেশের ভাষায় এবং ফরাসী, ইতালী, স্পানিশ ও পুস্তু ভাষায় আমাদের যা বলবার চেষ্টা করেন—আমরাও তার কিছু বুঝি না। সে এক মহা সমস্যা। শেষে ওখানকারই একজন কর্ম্মী এ-সমস্যার সমাধান করলেন বাইরে থেকে তাঁদেরই একজন প্রহরী সহকর্ম্মীকে ডেকে এনে। প্রহরীটি এক-আধটু ইংরাজী বোঝেন এবং ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভাষায় কথাও বলতে পারেন অল্প-স্বল্প। তিনিই দোভাষী হয়ে আমাদের দুপক্ষের মাঝে আলাপ-আলোচনার সেতু রচনা করলেন—যদিও নিতান্ত নড়বড়ে সে সেতু।

তল্লাসী হলো…তবে বিশেষ হাঙ্গামা পোয়াতে হলো না এখানে। তেরমেজের কাষ্টমস্-কর্ম্মীদের ব্যবহার দেখলুম ভালো এবং ভদ্র। বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটে তছনছ করা দূরের কথা…আমাদের মুখের কথা বিশ্বাস করেই তাঁরা সে-সবের অধিকাংশই খুলেও দেখলেন না। যথারীতি সরকারী কাগজপত্রে সই করে নিষ্কৃতি পেলুম। তবে কাবুলের সোভিয়েট-দপ্তর থেকে আমার সঙ্গের Cine Cameraটির জন্য মঞ্জুরনামা নিয়ে আসি নি বলে, ওখানকার কাষ্টমস্-কর্ম্মীরা সেটিকে শীল-মোহর করে আমাদের এরোপ্লেনের সোভিয়েট অধ্যক্ষের জিম্মায় জমা রেখে দিলেন। সখের ক্যামেরাটি হাতছাড়া হওয়ার দরুণ আমাকে সংশয়াকুল দেখে ওখানকার কর্ম্মীরা বিনীতভাবে জানালেন—ওটির মঞ্জুরীপত্র না থাকার দরুণ ওঁদের দেশের দেশরক্ষা-বিধি অনুসারে সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করতে হয়েছে বলে ওঁরা দুঃখিত। তবে মস্কোয় পদার্পণ করে ওখানে এ-কথা জানালেই ক্যামেরাটি সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ পাবো। অগত্যা, মনের ক্ষোভ মনে রেখে দলের বন্ধুদের সঙ্গে এগুলুম বাইরে বিমান-বন্দরের বিশাল প্রান্তরে অপেক্ষমান আমাদের যাত্রা-বাহন সোভিয়েট উড়ো জাহাজের উদ্দেশে।

তেরমেজের বিমান-বন্দর-ভবনের বাইরে গ্রীষ্মের তাপ রীতিমত প্রখর …কাঠ-ফাটা রৌদ্রের তেজে চারিদিক যেন ঝলসে যাচ্ছে! অনেকটা ঠিক আমাদের দেশের চৈত্র-বৈশাখের নিদাঘ-দাহের মত! পথ-শ্রমে ক্লান্ত দলের অনেকেই বেশ তৃষ্ণার্ত্ত বোধ করছিলেন এই দারুণ গরমে, অথচ জলের এদেশী পরিভাষাটি না জানার দরুণ কিছুতেই সে-কথা আমরা ওখানকার কাকে বোঝাতে পারছিলুম না! অবশেষে বিমান-বন্দরের মধুহাসিনী তরুণী পরিচারিকাকে ইশারায় ইঙ্গিতে আমাদের প্রার্থনা জানাতে তিনি অনতিবিলম্বে ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁচের সোরাইয়ে সুশীতল পানীয় জল, সুস্বাদু লিমনেড এবং একরাশ গেলাস এনে হাজির করলেন, সেই সঙ্গে বিরাট এক কাঁচের পাত্রে অজস্র টফী, লজেঞ্চেস্, ক্যারামেল প্রভৃতি মিষ্টান্ন! ওদেশের প্রান্তবর্ত্তী বিমান-বন্দরে অতিথি-সৎকারের এই সাদর সমারোহটুকু সত্যই আমাদের তাক্ লাগিয়েদিয়েছিল! শুধু গেলাসে চুমুক দিয়েই তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে আসছিলুম কিন্তু তেরমেজের বিমান-বন্দর পরিচারিকাটি ছাড়বার পাত্রী নন্—সাদরে আমাদের সবাইকার হাতে মুঠো-মুঠো টফী, লজেঞ্চেস্ আর ক্যারামেল গুঁজে সোভিয়েট ভাষায় নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত মিষ্টি মুখে শুভ-সম্ভাষণ জানালেন। ভারতের বিষয়ে কি যেন প্রশ্নও তিনি করেছিলেন—কিন্তু ও দেশের ভাষা না জানায় তা বুঝলুম না! সেই অপরিচিতা বিদেশিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা এসে উঠলুম উড়ো-জাহাজের কন্দরে! তেরমেজ পিছনে রেখে, অনন্ত নীল আকাশের বুকে পাখা মেলে প্লেন আমাদের নিয়ে আবার উড়ে চললো তাশকান্দের পানে।

তেরমেজে আমাদের কাটলো প্রায় এক ঘন্টা। তারপর একটানা উজানী-হাওয়ায় ভেসে সোভিয়েট সীমান্তের কত গিরি-বন, নদী-প্রান্তর পার হয়ে পড়ন্ত সূর্য্যের আলো আকাশ থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই বিকালে সাড়ে চারটে নাগাদ আমাদের প্লেন এসে নামলো সোভিয়েট রাজ্যের উজবেকিস্তানের প্রধান সহর তাশ্‌কান্দের বিমান-বন্দরে!

তাশ্‌কান্দের বিমান-বন্দরটির আকার যেমন বিরাট…এখানকার ব্যবস্থাও তেমনি সুন্দর! চারিদিকে আধুনিক বেতার-যন্ত্রের লাউড-স্পীকার সাজানো—তারই মধ্য দিয়ে ভেসে আসছে অবিরাম সোভিয়েট দেশীয় নানা সঙ্গীতের সুর! কাবুল ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আফগানিস্তানের সোভিয়েট দূতাবাসের বন্ধুরা এখানকার চলচ্চিত্র-মন্ত্রী-সভার কর্ম্মীদের তারবার্ত্তায়

উজবেকীস্তানের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়

জানিয়ে রেখেছিলেন আমাদের আসবার কথা! কাজেই প্লেন থেকে নামতেই ওখানকার চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার দুজন তরুণ প্রতিনিধি এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন! তবে এখানেও তেরমেজের মত সেই ভাষা-বিভ্রাটের অসুবিধা! যাই হোক্, সদ্যলব্ধ বন্ধু দুজনের মধ্যে এক-জন ভাগ্যে অল্প স্বল্প ইংরাজী ভাষা জানতেন—তাই দুর্ভোগের মাত্রা এবারে আর তেমন প্রবল হয়ে উঠলো না!

উজবেকিস্তানের বন্ধুদের মুখে খপর পেলুম যে আমাদের এই আচমকা আগে এসে পৌঁছোনোর দরুণ, মস্কো থেকে সোভিয়েট চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভার যে দোভাষী প্রতিনিধির ভারতীয় দলের পথ-পরিদর্শক সহচর হয়ে সোভিয়েট রাজধানীতে নিয়ে যাবার কথা ছিল—তিনি নাকি এখনও এখানে এসে পৌঁছুতে পারেন নি! কারণ আমাদের পৌঁছানোর কথা ছিল দু'দিন পরে…আমরা এসে পড়েছি তার আগেই! তাহলেও কাবুলের সোভিয়েট দূতাবাসের মারফৎ আমাদের এ দেশে আসার কথা জানতে পেরেই—এঁরা অবশ্য সে-খবর তখনি মস্কোতে পাঠিয়েছেন তার-যোগে

এবং মস্কোর চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভাও তার উত্তরে এঁদের খবর জানিয়েছেন যে সেই রাত্রের প্লেনেই তাঁদের প্রতিনিধি অবিলম্বে আমাদের তত্ত্বিরের ভার নিতে সুদূর তাশ্‌কান্দের অভিমুখে রওনা হচ্ছেন! অতএব তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমাদের অবস্থিতি আপাততঃ এই তাশকান্দেই।

একটানা দীর্ঘ দুরূহ পথ এসে আমাদের অনেকেই বিশেষ ক্লান্তি বোধ করছিলেন…তাছাড়া নতুন দেশ দেখার উৎসাহ…কাজেই এ-ব্যবস্থার কারো কোনো আপত্তির কারণ ছিল না! আমাদের ক্লান্তি অপনোদনের উদ্দেশ্যে উজবেকী বন্ধুরা মালপত্রাদি সব পরে এসে নিয়ে যাবেন স্থির করে, ভারতীয় প্রতিনিধি সকলকে সাদর আহ্বান জানালেন ওখানকার হোটেলের আরামপ্রদ আশ্রয়ে বিরাম বিশ্রামের জন্য!

বিমান-বন্দরের সুবৃহৎ দ্বিতল ভবন পার হয়ে এসে ফুলে গাছে সাজানো বাগিচা-প্রাঙ্গণের প্রান্তেই দেখলুম সুদৃশ্য ক'খানি সোভিয়েট মোটর-গাড়ী 'পোবিয়েদা' (Pobeda) দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের অপেক্ষায়! আমরা যে যার আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সারি বেঁধে গাড়ীগুলি সতেজে বিমান বন্দরের আঙিনা ছেড়ে ছুটে চললো সহরের পথে!

চেহারায় এবং বেশ-ভূষায় ও দেশের সুন্দর স্বাস্থ্য আর সৌষ্ঠবের স্পষ্ট পরিচয় পেলুম! জনাকীর্ণ সহরের পথে কোথাও কোনো জায়গায় অসুন্দর, মলিন, জীর্ণ, দারিদ্র্যের চিহ্ন নজরে ঠেকলো না …এমন কি—রাস্তার মোড়ে কোথাও শতছিন্ন চীরধারী কোনো ভিখারীর চেহারা পর্য্যন্ত নেই! কথাটা হয়তো আশ্চর্য্য ঠেকবে অনেকের কাছে—যেমন আমারও লেগেছিল এদেশে আসবার আগে! অর্থাৎ, আমাদের আগেই যাঁরা ভারতবর্ষ থেকে এ রাজ্যে এসেছিলেন পরিব্রাজক হয়ে, দেশে ফিরে তাঁদের অনেকেই বলেছেন, সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথাও নাকি তাঁরা কোনো দুঃখী-আতুর ভিখারী চিহ্ন দেখতে পাননি…এমন কি বিশেষ অনুসন্ধান করেও! এ-ব্যাপারটা তখন খুবই আজগুবি ঠেকেছিল…কিন্তু যেদিন তাশ্‌কান্দে পদার্পণ করে সোভিয়েট সমাজের হাল-চাল, রীতি-নীতি স্বচক্ষে সব প্রত্যক্ষ করলুম প্রথম, সেদিন উপলব্ধি করলুম আমার আগেকার ধারণা ভুল! যে কথাটা তখন আজগুবী বলে মনে হয়েছিল, এসে দেখলুম তা খাঁটী!

তাশকান্দের পথে যানবাহনের ভিড়ও বেশ…তবে এলোমেলো বিশৃঙ্খলার ভাব নেই কোথাও…সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, চৌমাথায় লাল, সবুজ, হলদে রঙের বৈদ্যুতিক সঙ্কেতআলো জ্বলে নিবে পথের যানবাহন এবং লোকজন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে সুষ্ঠু সহজ-ভাবে…অহেতুক ভিড় বা জটলা নেই কোথাও সহরের রাজপথে…পদচারী পথিকের দলও অযথা পায়ে চলার ফুটপাথ ছেড়ে যানবাহন চলার পথে নেমে ভিড় করে চলে বিশৃঙ্খলা বা বাধা-বিঘ্ন বিপত্তির সৃষ্টি করে না এতটুকু—যে যার পথে চলেছে—অপরের সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে। অবান্তর হৈ-হুল্লোড় হাঙ্গামা, চেঁচামেচি হট্টগোল কিম্বা অকারণ সোরগোল নেই কোথাও…আগাগোড়া বেশ সংযত, সুন্দর, সহজ, সাবলীল ভাব সহরের সর্ব্বত্র—সেটা বিশেষ করে চোখে পড়লো আমাদের। অবিরাম ট্রাম, বাস, ট্রলীবাস চলেছে সহরের পথ মাড়িয়ে…বোঝাই হয়ে…কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। সুন্দর শিষ্টাচার এবং সংযম সভ্যতার সঙ্গে সব কাজ চলেছে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল ভাবে। এমনি ভাবে সহরের পথে পথে সোভিয়েট সমাজ-জীবনের এমন প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে পেতে প্রায় মিনিট কুড়ি গাড়ী ছুটিয়ে এসে আমরা নামলুম তাশকান্দের সেরা হোটেলে 'হোটেল তাশকান্দ' (Hotel Tashkand)। মস্কোর সোভাগী পথ-পরিদর্শক [illegible] আপনার [illegible] সময়টুকু এইখানেই আমাদের বিরামের ব্যবস্থা।

উজবেকী-শিল্পের প্রতীক আলীশের নাভৈ থিয়েটার তাশকন্দ

সহরের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাশ্‌কান্দের বিমান-ঘাঁটি! একটু এগুতেই চোখে পড়লো সোভিয়েট দেশের চেহারা…তাশ্‌কান্দের বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা, লোক জন, পাথরে বাঁধানো পথ ঘাট, সুসজ্জিত ফুলে-ফলে পাতায় সাজানো সুন্দর তরুবীথি উদ্যান! আকাশের বুকে বিকেলের আলোর আভা তখনও মিলিয়ে ম্লান হয়ে যায় নি! পথে লোকজনের বেশ ভিড়…দিনের শেষে দলে দলে সবাই কাজ সেরে যে যার ঘরে ফিরে চলেছে…কেউ বেরিয়েছে বেড়াতে, আবার কেউ বা ভিড় জমিয়েছে দোকানের সাজানো পশরার সামনে…চারিদিকে অপরূপ সুন্দর স্নিগ্ধ শান্তি-শ্রী! সহরের সুপ্রশস্ত পথের দু'ধারে গাছের সার…তারই কোল ঘেঁসে পদচারীদের কংক্রীট পাথরে বাঁধানো চলন-পথ! সে পথের ধারে ধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা জমির উপরে সাজানো ফুলের বাগিচা…রঙ-বেরঙের ফুলে পাতায় রঙিণ হয়ে রয়েছে! পথের চলন্ত লোকজনদের

সোভিয়েট দেশের এই হোটেলটির সাজ- [illegible]

হোটেলের কর্ম্মীদের ব্যবহারও বেশ ঘরোয়া ধরণের···আমাদের প্রত্যেকের যত্ন আরামের দিকে তাঁরা সকলেই দেখলুম সতত সজাগ এবং তৎপর··· বিদেশী অতিথিদের সেবায় কোনো ত্রুটি না হয়—সেজন্য অপরিসীম প্রচেষ্টা···পান থেকে চূণটুকু খশতে দেবেন না—এমন আন্তরিক নিষ্ঠা সব বিষয়ে! সোভিয়েট রাষ্ট্রে অতিথি এবং বিদেশী পরিদর্শক হিসাবে এই খাতির যত্ন এঁরা যে শুধু ভারতবাসী আমাদের ক'জনকেই শুধু করছিলেন তা নয়···হোটেলের প্রত্যেকটি অতিথির সম্বন্ধেই এখানে লক্ষ্য করলুম ঐ একই ব্যবহার···কোনো রকম বৈষম্য বা কারো বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই এঁদের ব্যবস্থায়।

হোটেলের সুসজ্জিত কামরায় আমাদের আরাম-বিরামের ব্যবস্থাদি সেরে উজবেকী বন্ধু দুজন আবার ছুটলেন তাশকান্দের বিমান বন্দরে মালপত্র নিয়ে আসবার জন্যে। ইত্যবসরে আমরাও মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হলুম জলযোগের জন্যে। সাঁঝের বাতি জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলের মধ্যবয়সী মাতৃসমা মহিলা অধ্যক্ষা এসে সাদরে আমাদের সকলকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন ওদেশী ছাঁদের বিচিত্র আভরণে সজ্জায় সাজানো বিরাট এক খানা-কামরায়। ওদেশের নানা বিচিত্র খাদ্যসম্ভারে ভরা টেবিল···আমাদের দেশের মেয়েদের মত হোটেলের সেই মাতৃসমা মহিলা অধ্যক্ষা নিজে সারাক্ষণ সামনে থেকে স্বহস্তে পরিবেশন করে—এটা খাও···ওটা খাও বলে—নিতান্ত আত্মীয়ার মত পরম যত্নে ভোজ্য এবং পানীয়দানে আমাদের পরিতৃপ্তি সাধন করলেন। আমাদের সান্ধ্য-ভোজের মাঝামাঝি উজবেকী বন্ধু দু'জন মালপত্রাদি নিয়ে ফিরে এলেন বিমান-ঘাঁটি থেকে! তাঁরাও আমাদের সঙ্গে বসে গেলেন 'ডিনারে'!

শুধু বিশ্রাম ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না বলে, ডিনারের পালা চোকবার পর উজবেকী বন্ধুদের সঙ্গে শ্রীমতী খোটে, নিমাই এবং আমি বেরিয়ে পড়লুম তাশকান্দের পথে পথে পায়ে হেঁটে ঘুরে ওদেশী সহরের আর মানুষের পরিচয় জানতে। মহর্ষি আর মাদ্রাজের সঙ্গী তিনজন পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন—তাই তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলেন না···হোটেলেই রইলেন।

সন্ধ্যার পর সবে তখন রাতের সূচনা···সহরের পথে জন-স্রোতে জোয়ার বইছে সমানে···দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, মিউজিক-হল, সিনেমা, থিয়েটারের সামনে সুবেশে সজ্জিত লোকজনের ভিড় জটলা···চারিদিকে হাসি গান আনন্দের পসরা···সুশৃঙ্খল শান্তির হিল্লোল বইছে যেন।

তেরমেজের মত তাশকান্দের আবহাওয়ায় তাত্ নেই তেমন—পথে বেরিয়ে বেশ একটু ঠাণ্ডা বোধ করছিলুম—অনেকটা আমাদের দেশের হেমন্তকালের হিম-রাত্রির মত।

পথে বেরিয়ে—যেদিকে যাই—দেখি, আমাদের আশে পাশে ওদেশের কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমে···বিশেষ শ্রীমতী খোটের শাড়ীপরা চেহারা দর্শনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা ছেড়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আমাদের দিকে···বড়দের অনেকে [illegible] কেউ আগ্রহান্বিত হয়ে এসে আলাপ জমাবার চেষ্টা [illegible] আমায় অভিনন্দন জানিয়ে।

কেউ প্রশ্ন করেন—আমরা কোন দেশের মানুষ? প্রত্যুত্তরে আমাদের দোভাষী বন্ধুরা তাঁদের কাছে পরিচয় দেন এঁরা হলেন—'ইন্দিস্কী কিনো ডেলিগাৎসী' অর্থাৎ ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র প্রতিনিধি। পরিচয় পেয়ে ওদেশী বাসিন্দারা অনেকেই দেখলুম আমাদের দেশের কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের স্তুতিবাদ করে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন। সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার কথা এবং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের হাল-চালের খবরও জানতে চাইলেন অনেকে। সেই ক্ষণেকের আলাপ-সালাপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলুম—সোভিয়েট দেশের সাধারণ বাসিন্দারা ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী···নাহলে পথের সাধারণ মানুষ এমন অকপট আগ্রহে এগিয়ে স্বেচ্ছায় আন্তরিক আলাপ করবেই বা কেন?

খানিকক্ষণ এমনিভাবে তাশকান্দের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা অবশেষে গেলুম ওখানকার 'Park of Culture' বা 'কৃষ্টি-কলা-কাননে' ···সারাদিনের কাজকর্ম্মের পর ওদেশের বাসিন্দারা কি ভাবে বিচিত্র অনাবিল নাচ-গান হাসি-খেলা আনন্দে তাঁদের অবসর যাপন করেন, তার পরিচয় জানতে।

আমাদের দেশের বড় বড় সহরে লোকজনদের বেড়াবার এবং মুক্ত বায়ুসেবনের জন্য পাড়ায় পাড়ায় যেমন ছোট বড় সাজানো বাগান বা পার্ক আছে—ওদেশের এই 'কৃষ্টি-কলা কাননগুলি' সেই ধরণের। তবে আমাদের দেশের পার্ক এবং সোভিয়েট-রাজ্যের এই Culture Parkগুলিতে পার্থক্য আছে। আমাদের দেশের পার্কে সাধারণতঃ দেখা যায়—বেঞ্চের উপর জমেছে যত পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্ম্মবীরের গালগল্প আর পরচর্চ্চার স্রোত···মাঠের কোণে চলেছে ছোট ছোট ছেলেদের খেলাধুলো আর হৈ-চৈ। তার পাশে চানাচুর, আলু-কাবলি ফেরিওয়ালা, আর কুলপী মালাই বরফওয়ালাদের চীৎকার কলরব ···ফুলের কেয়ারির আড়ালে গাছের তলায় ক্লান্তি জুড়োতে সুখ-নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে শ্যামল ঘাসের শয্যায় বিশ্রান্ত দেহভার এলিয়ে পরম আরামে শুয়ে পড়ে আছে বিভ্রান্ত বেকারের দল! দিনের আলো মিলিয়ে যাবার পর গ্যাসের বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জনাকীর্ণ পার্ক ক্রমে জনবিরল হয়ে আসে···মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ে নিভৃত নির্জ্জন পত্র-কুঞ্জের অন্তরালে স্বপ্নাতুর-যুগলের বিশ্রম্ভালাপ, অফুরন্ত বিড়ি সিগারেটের ধূম্র কুহেলিজাল রচনা করে সুরু হয়েছে আড্ডাধারীদের বেপরোয়া হৈ-হল্লা-হুল্লোড়ের অশান্ত হুজুগ!···চারিদিকেই কেমন যেন অবসর-বিনোদনের অসার অন্তঃসারশূন্য অলস অবচেতনা!

সোভিয়েট দেশের Culture Parkএর চেহারা এর একেবারে উলটো। তৃণে-পুষ্পে সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত বাগানের স্থানে স্থানে সাজানো রয়েছে সাধারণ মানুষের অনাবিল আনন্দ উপভোগের জন্য নানা উপাদান···কর্ম্মশ্রান্ত কর্ম্মীদের চিত্ত-বিনোদনের এবং অবসর-উদ্‌যাপনের জন্য কত ব্যবস্থা। দিনান্তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সব 'কৃষ্টি-কলা কাননের' সুবিস্তৃত এবং সুবিশাল অঙ্গনে জ্বলে ওঠে অসংখ্য আলোর মালা···তাদের রোশ্‌নিতে রাতের কালো অন্ধকার [illegible] বাগান ভরে ওঠে [illegible] আনন্দে আলোর জৌলুসে।

শুধু আলোর শোভা নয়…বিভিন্ন লতা-পুষ্প-পল্লবে আর গাছের সার দিয়ে সাজানো 'কৃষ্টিকলা-কাননের' কাঁকর-ঢালা আঁকা-বাঁকা ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন পথের ধারে-ধারে সাজানো আছে, ব্রোঞ্জ কিম্বা পাথরের তৈরী সুন্দর সুন্দর বিচিত্র ছাঁদের বিরাট কত প্রতিমূর্ত্তি! এ সব প্রতিমূর্ত্তি-গুলিতে প্রতিফলিত হয় সোভিয়েট দেশের কৃষ্টিকলা ঐতিহ্যের গুণ-গরিমা বৈশিষ্ট্যের কথা ও কাহিনী। কোথাও বা সোভিয়েট দেশের কুশলী মর্ম্মর-শিল্পীরা পাথরে খোদাই করে জনসাধারণের কাছে শিল্পের ললিত-ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন ওদেশের অপরূপ ছন্দ-গাথা, কাব্য-কাহিনীর বিচিত্র প্রতিরূপ…কোথাও বা ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়ে রেখেছেন নব্য সোভিয়েট জনসাধারণের প্রতীক—চাষী, মজুর, কল-কারখানার কর্ম্মী, স্থপতি, বৈমানিক, বৈজ্ঞানিক আর দেশ-সেনাদের মূর্ত্তি। এছাড়াও দেখা যায় বিরাট সোভিয়েট রাজ্যের ষোলটি প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন বাসিন্দাদের নানা বিশিষ্ট প্রতিরূপ—তাদের নিজের নিজের দেশের নিজস্ব বসন-ভূষণ এবং পরিবেশের পরিচয়। কোথাও ধাতুফলকে কিম্বা মর্ম্মর-প্রস্তরে প্রতিফলিত হয়েছে সোভিয়েট দেশের ধন-ধান্য সম্পদ-গৌরবের গরিমা-উজ্জ্বল কাহিনীর প্রতিলিপি…শস্যের গুচ্ছ, 'নীপার ড্যাম', ভল্‌গা-ডন্ কেনাল', নব-নির্ম্মিত অসংখ্য সব বিরাট কল-কারখানা এবং বিচিত্র যান্ত্রিক উন্নতির বিভিন্ন বিকাশ-বিবরণীর বিন্যাসে। সোভিয়েট দেশের নর-নারী, কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের প্রসঙ্গও বাদ পড়ে নি সে দেশের ভাস্কর-শিল্পীদের এই সব রূপ-সৃষ্টির সাধনায়! পথের মোড়ে মোড়ে চোখে পড়ে ব্রোঞ্জ আর পাথরে গড়া ব্যায়াম-রত তরুণ-তরুণীর প্রতিমূর্ত্তি, ক্রীড়া-তন্ময় শিশুর দল, কর্ম্মব্যস্ত নর-নারীর প্রতিরূপ! তবে এ সব প্রতিমূর্ত্তির কোথাও এতটুকু কুরুচি বা কুশ্রীভাবের দেখা মেলে না…সবই আগাগোড়া সুস্থ সবল সুন্দর এবং স্বাভাবিক সুরুচির পরিচয় দেয় দর্শকের মনে। এই সুস্থ সবল সুরুচির বিকাশ দেখা যায় সোভিয়েট দেশের সর্ব্বত্র…শিল্প সাহিত্য কলা কৃষ্টি নৃত্য গীত অভিনয় এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে-কর্ম্মে ও জীবনের যাত্রাপথে! সুরুচি এবং সুস্থ সবল স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে—সোভিয়েট দেশের স্থান হবে সুউচ্চে…পৃথিবীর বহু বলশালী এবং বিত্তশালী দেশের অনেক অনেক উপরে!

'কৃষ্টি-কলা-কাননের' এই সব বিচিত্র ভাস্কর্য্যের মাঝে মাঝেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সোভিয়েট দেশের বিশিষ্ট নেতাদের প্রতিমূর্ত্তি-গুলি! সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় কবি পুশ্‌কিনের মূর্ত্তির পাশেই রয়েছে সোভিয়েট জন-নায়ক লেনিনের প্রতিমূর্ত্তি। আবার তাঁরই ওপাশে দেখা যায় বিগত জার্ম্মান যুদ্ধে নিহত সোভিয়েট শহীদ্ কুমারী জোইয়ার মূর্ত্তি…পার্কের পথের অপর প্রান্তে রাখা সোভিয়েট অধিনায়ক মার্শাল স্তালিন আর দেশনেতা রণবীর ভরোশিলভের পাথরের তৈরী প্রতিমূর্ত্তি দুটি যেন সেই অসাধারণ তরুণী বীরাঙ্গনার অমর-দেশপ্রেমের কীর্ত্তি-কলাপের কথা স্মরণ করে তাঁদের মৌন সম্মান জ্ঞাপন করছেন সর্ব্বক্ষণ!

এই সব বিভিন্ন প্রতিমূর্ত্তি আর পুষ্পলতা, গাছপালায় সাজানো বাগানের নানা জায়গায় ছড়ানো রয়েছে জনসাধারণের অবসর-কালীন চিত্ত-বিনোদনের বিচিত্র আনন্দ উপভোগের আয়োজন! কোথাও প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরে তৈরী হয়েছে বিরাট এক নাচের আসরের আঙিনা…ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণী, দলে দলে এসেছে এই নাচের আনন্দ আসরে যোগ দিতে! সেখানে রাষ্ট্রের ব্যয়ে ও ব্যবস্থায় সুনিপুণ অর্কেষ্ট্রা দলের পরিচালনায় বাজনার বন্দোবস্ত রয়েছে সুন্দর! সে বাজনার তালে তালে নাচ চলে নানান্ ছন্দে, নানা ভঙ্গিমায়! কখনও রুশীয় নৃত্য 'পোল্‌কা', কখনও 'মাজুর্‌কা', আবার কখনও বা 'ওয়াল্টজ্'… তারই মাঝে মাঝে ছেলে বুড়ো, পুরুষ মেয়ে অনেকেই একা বা দল বেঁধে এসে মহানন্দে নেচে যায় সোভিয়েট দেশের নানা বিচিত্র লোক-নৃত্য। যাঁরা এ সব নাচ নাচেন না, তাঁরা নাচিয়েদের চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নৃত্য ও বাদ্যের তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে হাততালি দিয়ে রচে তোলে এক অপরূপ সার্ব্বজনীন আনন্দের পরিবেশ! চারিদিকেই যেন বান ডেকে চলেছে আনন্দের…এমনি হাসি-খুশীর জোয়ার বইতে থাকে এই সব আনন্দ-আসরে! মনের কন্দরে হাজার দুঃখ-কষ্ট বাসা বেঁধে আঁকড়ে থাকলেও সে গ্লানি নিমেষে দূরে ভেসে উড়ে যায় আনন্দের এই ঝড়ে! শোক-দুঃখে-দুশ্চিন্তায় কাতর—নিতান্ত ভেঙ্গে-পড়া মনও চাঙ্গা হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা-ধারায়! এমনি অপরূপ এর প্রতিক্রিয়া!

মুগ্ধ তন্ময় হয়ে আমরা দেখছিলুম এই নৃত্য-লহর…এমন সময় নাচের আসর থেকে ওদেশী ক'জন তরুণ-তরুণীর নজর পড়লো আমাদের পানে। তাঁরা এগিয়ে এসে বন্ধুর মত আগ্রহ সমাদর প্রকাশ করে আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন, তাঁদের সে আনন্দ আসরে যোগ দিতে। আমাদের মধ্যে কারো কারো মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে কিন্তু বিশেষ কারণে সে বাসনা ত্যাগ করতে হলো তখনকার মত। অর্থাৎ, প্রথমতঃ এ সব নাচের অধিকাংশই আমাদের অজানা; দ্বিতীয়তঃ বিদেশে এসে বিদেশীদের সামনে বেয়াড়া নাচে বেহায়াপনা করে নিজেদের দেশের মান-ইজ্জৎ শেষে খাটো করবো! এই সব ভেবেই তখনকার মত, ওদেশের উৎসাহী বন্ধুদের কাছে মাপ চেয়ে বিদায় নিয়ে Culture Parkএর অপর অংশে অন্য ব্যবস্থার পরিচয় সংগ্রহ করতে আমরা সরে গেলুম।

(ক্রমশঃ)
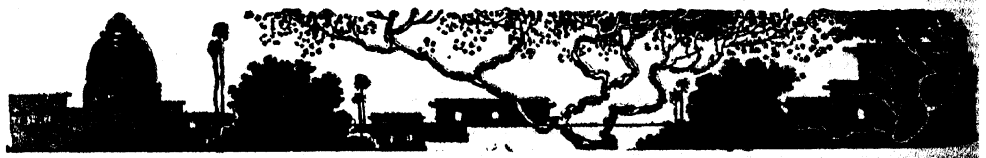
বিধান সভা—

গত দেড় মাসেরও অধিক কাল ধরিয়া কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশন হইয়া গেল। ২৪০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ১৬০ জন কংগ্রেস পক্ষীয় ও অপর ৮০ জন বিরুদ্ধ পক্ষীয় ছিলেন। ৮০ জন আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত—এমন দুটি দল আছে, বিধান সভায় তাহার সদস্য সংখ্যা একজনের অধিক নহে। তথাপি তাঁহারা নিজেদের স্বতন্ত্র দল বহিয়া ঘোষণা করেন। বিরুদ্ধ পক্ষের সদস্যগণ ন'টি দলে বিভক্ত। কংগ্রেস-শাসিত সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার সময় তাঁহারা সকলে একযোগে কাজ করিয়াছেন। তবে তাহা সকল সময়ে বা সকল বিষয়ে হয় নাই। অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেকে নিরপেক্ষ থাকিয়াছেন। দেড় মাসে তাঁহারা কোন গঠনমূলক কাজের কথা বলেন নাই—শুধু বিরুদ্ধাচরণের জন্যই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বক্তা ভাল—তাই সর্বদাই তিনি—সময়ে অসময়ে—কোন কথা বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনেক সময়ে তিনি যে নিরর্থক কথা বলিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সর্বদা কোন না কোন কথা বলিয়া সভা কক্ষ সরগরম রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ধীর ও স্থির বুদ্ধি—তাঁহারা যুক্তি ও তর্ক দিয়া সরকার পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গ দোষেই হউক, বা তীব্র বিরুদ্ধবাদী দলের প্ররোচনাতেই হউক, তাঁহারাও সময় সময় অধীরতা প্রকাশ করিয়া সভার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। শ্রীহেমন্তকুমার বসুর কথা না বলাই ভাল—তিনি প্রায়ই দণ্ডায়মান হইয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই—তাহাই তাঁহার বিশেষত্ব। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু যে কয়বার কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার ধীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীবিধানচন্দ্র রায় একাই এক শত। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও বুদ্ধি দেখিয়া শুধু তাঁহার দলের লোক নহে, বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণও চমৎকৃত হইয়াছেন। ৭১ বৎসর বয়সে প্রত্যহ এক স্থানে বসিয়া ৭।৮ ঘণ্টা কাজ করাই কঠিন ব্যাপার—ঐ সময়ের মধ্যে তিনি এক দিকে যেমন সকলের কথা শুনিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই সরকারী ফাইল পড়িয়া কাজ শেষ করিয়াছেন। এক সঙ্গে ২।৩টি বিষয়ে মন দিয়া কাজ করিতে খুব অল্প লোককেই দেখা যায়। বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সভায় এত গণ্ডগোল ও চীৎকার সত্বেও বিধানচন্দ্র একদিনের জন্যও ধৈর্য্য হারান নাই—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। কখনও কখনও হয় ত উত্তর দিবার সময় হাসিয়া বা ঠাট্টা করিয়া কড়া কথা বলিয়াছেন—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তিনি সকল অশিষ্ট উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজের পক্ষের কথাই যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেস পক্ষের ব্যারিষ্টার শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুপ্তের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ধীরতা ও স্থৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি কংগ্রেস পক্ষে থাকিয়াও সরকারের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা গঠনমূলক নিন্দা—ধ্বংসাত্মক নহে। এখন কথা, বিরুদ্ধ পক্ষের সদস্যগণ দেড় মাস কাল চীৎকার করিয়া বা গালি দিয়া দেশের কি উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা বার বার ভোটের দাবী করিয়াছেন—কোন কোন দিন সভার সময় নষ্ট করিবার জন্য ১৫ বার ভোটের দাবী করিতেও লজ্জা অনুভব করেন নাই। কিন্তু ভোটের ফল সর্বদাই একরূপ দেখা গিয়াছে। কম বেশী কংগ্রেস পক্ষে ১৪০ ভোট ও বিরুদ্ধে ৭০ ভোট—প্রায় সকল সময়েই দেখা গিয়াছে। শেষ দিকে তাঁহাদের সুবুদ্ধি হইয়াছিল—তাঁহারা আর বেশী ভোটগণনা দাবী করেন নাই। সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কার্য্যের দ্বারা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। অনেক সময়ে মনে হইয়াছে, তিনি বিরুদ্ধ দলের পক্ষেই সহানুভূতিসম্পন্ন—অধিকাংশ-দলকে তিনি যেন অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। তাহা হইলেও তাঁহার অল্পাংশ-দলের প্রতি অধিক দরদ—সভা-পালের যোগ্যতারই পরিচয়

দিয়েছে। তিনি যেমন ধীর, স্থির, বুদ্ধিমান—তেমনই সরল ও সুবিচারক। তাঁহার কার্য্যের ফলে সভা-পালের আসনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহাকে অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিব না—তবে তিনি যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে বসিয়া সকল বিষয় সুপরিচালনা করিয়াছেন, তাহা অপর কাহারও পক্ষে সহজে সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না।

বিরুদ্ধ পক্ষ কি বলিয়াছেন, তাহা সকলেই সংবাদ-পত্রের মারফত অবগত হইয়াছেন। যে কারণেই হউক, ষ্টেট্সম্যান ব্যতীত কোন সংবাদপত্রই সরকার পক্ষকে অধিক সমর্থন করেন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকা বা যুগান্তর পাঠ করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধ পক্ষের কাগজ বলিয়াই মনে হয়। বিরুদ্ধপক্ষের—বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট দলের সদস্যগণ সর্বদা সত্যকে গোপন করিয়া বিপরীত কথা বলিয়াই ঢাক পিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কংগ্রেস-সরকার যেন গত ৫ বৎসরে কোন ভাল কাজই করেন নাই—শুধু দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিরুদ্ধ-পক্ষের কথা শুনিয়া সর্বদা ইহা মনে হইয়াছে। সংবাদ-পত্রগুলি সে সকল কথাই বড় করিয়া বলিয়াছেন—সরকার পক্ষের কথা তাঁহারা সে ভাবে বড় করিয়া প্রকাশ করেন নাই। গত দেড়মাসে সংবাদপত্রসমূহে সরকারের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগের কথা প্রকাশিত হইয়াছে, সরকার পক্ষ হইতে সেগুলির প্রতিবাদেরও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। একমাত্র 'জনসেবক' পত্রেই সরকার পক্ষের কথা বড় করিয়া প্রকাশ করা হয়, অন্য কোন কাগজে তাহা করার ব্যবস্থা নাই। জনসেবকের প্রচার অধিক না থাকায়, সাধারণ লোক সরকার পক্ষের কথা জানিতে পারে না। তাহার ফলে দেশে সরকার-বিরোধী মনোভাবই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারী প্রচার বিভাগ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট—প্রচার বিভাগ হইতে যদি প্রত্যহ ২।৩টি করিয়া ইস্তাহার প্রস্তুত হইয়া সকল সংবাদপত্রে প্রেরিত হইত, তাহা হইলে সংবাদপত্রসমূহ অবশ্যই সেগুলি প্রকাশ করিতেন এবং বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সেগুলির কোন কোনটি অবশ্যই বড় করিয়া প্রকাশ করা হইত। তাহা করা হইলে দেশের জনগণের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব এভাবে বাড়িয়া যাইত না। এ বিষয়ে সরকারী প্রচার বিভাগের তথ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিশ্চেষ্টতার কিছুতেই প্রশংসা কর যায় না। এটা প্রচারের যুগ—প্রচার কার্য্য দ্বারা যুদ্ধ জ করা গিয়াছে—আর প্রচার কার্য্যের দ্বারা দেশবাসী মন জয় করা যাইবে না, এ কথা মনে করা ভুল। সরকা পক্ষের বলিবার বহু কথা আছে—পথ নির্মাণ, সেচে ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বাবদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহ জনসাধারণকে জানাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পথ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনা দাশগুপ্ত, চিকিৎসা বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীঅমূল্যধ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিধান সভায় যে সকল তথ্যপূর্ণ সুন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেগুলি যে ভাবে প্রচার করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রা মহাশয় প্রায় প্রত্যহ যে সকল অসাধারণ প্রয়োজনীয় কথ বলিয়াছেন, তাহা ত শুধু সরকার-পক্ষীয় সদস্যগণ শুনিয়াছেন—বিরুদ্ধ পক্ষের সদস্যগণকে ডাক্তার বিধানচন্দ্রে বক্তৃতার সময় উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছি—তাঁহারাও সেগুলি মন দিয়া শ্রবণ করেন নাই। অথচ ঐ সকল কথা আ প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন সরকারী প্রচার বিভাগ ছাড়া কে এ কাজের ভার লইবে বিধান সভায় বসিয়া একটি কথা বার বার মনে হইয়াছে সরকার পক্ষে যেমন—যে কোন একটি বিষয়ে একজনে অধিক বক্তার কথা বলার প্রয়োজন ছিল না—অনেক সময়ে তাহাই করা হইয়াছে—বিরুদ্ধ ৮।৯টি দলের নেতাদে একত্র ডাকিয়া তাহাদেরও বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন তাঁহাদের মধ্যে ১টি বিষয়ে ১জনের অধিক লোককে কি বলিতে দেওয়া হইবে না। বিধান সভার গৃহে বসিয় অনর্থক সময় কাটানো অপেক্ষা সদস্যদের বাহিরে অনে কাজ করিবার আছে; অবশ্য যে সময়ে বিধান সভা অধিবেশন থাকিবে না, সে সময়ে সদস্যগণ নিজ নি নির্বাচন কেন্দ্রে কাজ করিবার সময় পাইবেন। [illegible] বলিয়া শুধু চেঁচামেচি ও গালাগালি শুনিবার জন্যও প্রয়ো ৬।৭ ঘণ্টা করিয়া বিধান সভা গৃহে বসিয়া থাকারও কো অর্থ হয় না। পূর্বে ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ৩ঘণ্টা [illegible] বিধান সভার অধিবেশন হইত—এবার কোনদিন [illegible]

১০টা হইতে ২টা ও বিকাল ৪টা হইতে ৯টা সভা চলিয়াছে—প্রায় প্রত্যহ বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত সভা বসিয়াছে। তাহা সত্বেও বাজেট আলোচনার শেষ দিনে—কোন ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা বা আলোচনা হয় নাই—সময়াভাবে ১২।১৪টি ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব শুধু পড়িয়া শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। প্রথম হইতে সময় ভাগ করিয়া লইয়া ও তাহা মানিয়া কাজ করিলে এত বেশী সময় অপব্যয় করাও হইত না—শেষ দিনে এ অসুবিধাও হইত না। এ বিষয়ে আমরা সভা-পাল মহাশয়কে ভবিষ্যতের জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ করি। বিধান সভায় দর্শকের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। দর্শকের আসনের সংখ্যা মাত্র ২ শত—সেস্থানে প্রত্যহ ৮ শত দর্শককে প্রবেশ পত্র দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কোন কোন দল নাকি দর্শকের টিকিট বাহিরে বিক্রয় করিয়াছেন—এমন কথাও শুনা গিয়াছে। এ অবস্থায় দর্শক সংখ্যা স্থির না করিয়া দিলে দর্শকগণ শুধু অযথা হায়রাণ হইবেন। আমাদের বিশ্বাস, ওখানে কেহ মেলা দেখিতে যায় না, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, দেশহিতব্রতীরাই দেশের কথা ভাল করিয়া জানিবার জন্য দর্শকরূপে বিধান সভায় গমন করিয়া থাকেন—তাঁহারা যাহাতে ভাল করিয়া সভার কার্য্য পরিদর্শনে সমর্থ হন, তাহার ব্যবস্থা সকলেরই বাঞ্ছনীয় ও অভিপ্রেত।

স্বদেশী প্রচার—

গত ৩রা আগষ্ট রবিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক সভায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। লালা শ্রীরাম ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রস্তাবে বলা হয়—বর্ত্তমানে স্বাধীন সরকার দেশে সর্বাপেক্ষা বড় ক্রেতা—সরকার পক্ষ যাহাতে দেশীয় শিল্পসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য দেশী জিনিষ ক্রয় করেন, সরকারের সে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সে জন্য যদি স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন হয়, সরকার পক্ষকে তাহাও করিতে হইবে। একদিকে যেমন শিল্পপতিগণের প্রস্তুত দ্রব্যের উপর সরকারকে নির্ভর করিতে হয়, অন্য দিকে তেমনই সে সকল শিল্পপতি যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়েও মন দিতে হইবে। শিল্পপতিদিগকেও অন্য একটি প্রস্তাবে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রস্তুত মালের গুণ বাড়াইবার চেষ্টা করেন। বিদেশী জিনিষের তুলনায় স্বদেশী জিনিষের দাম বেশী ও তাহার স্থায়িত্ব কম হইলে লোক সে জিনিষ কিছুতেই ক্রয় করিবে না। শিল্পপতিরাও যাহাতে কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে উৎসাহী হন, তাহাদের সে জন্য বিশেষভাবে আবেদন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, দেশকে রক্ষা করিতে হইলে স্বদেশী প্রচারের প্রয়োজন আজ আরও অধিক, সে কথা যেন আমরা একবারও বিস্মৃত না হই।

ফরক্কায় গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা—

গত ৬ই আগষ্ট বুধবার বিধান সভায় একটি বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনা কালে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন—মুর্শিদাবাদ জেলার ফরক্কায় প্রস্তাবিত ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের রেল-সড়কসহ গঙ্গা বাঁধের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত জরুরী ও অত্যাবশ্যক এবং ভারতসরকারের এ সম্বন্ধে যথা-শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বাঁধের পরিকল্পনাটি তাঁহাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। ঐ বিষয়ে কোন উত্তর আসে নাই—ডাঃ রায় বলেন, উহার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। ঐ প্রস্তাব উত্থাপন কালে শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—এই রেল ও সড়কসহ বাঁধটি পশ্চিম বঙ্গের খণ্ডিত অংশ তিনটিকে সংযুক্ত করিবে এবং ভাগীরথী নদীর পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিবে। পশ্চিম বাংলার তিনটি অংশের প্রথমটিতে কোচবিহার, জলপাইগুড়ী ও দার্জিলিং পড়িয়াছে, দ্বিতীয়টিতে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ আছে—তৃতীয়টিতে কলিকাতাসহ ১০টি জেলা পড়িয়াছে। এ গুলির সংযোগের জন্য ফরক্কার বাঁধ, রেল ও পথের প্রয়োজন। উহার ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা হইবে।

যুবকগণের রাইফেল শিক্ষা—

গত ৫ই আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র-সভায় বক্তৃতা দান কালে পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রপাল ডক্টর

শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—দেশ রক্ষার জন্য এখন লোক তৈয়ার করা প্রয়োজন! সেজন্য সকল ছাত্রকে রাইফেল চালানো শিক্ষা করিতে হইবে। পুলিসের ইন্সপেকটার-জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার ঐ সভায় জানাইয়াছেন যে বেসরকারী চেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গে ২০টি রাইফেল ক্লাব খোলা হইয়াছে—তাহাতে ১৫ হাজার লোক রাইফেল চালানো শিক্ষা করিয়াছে। রাষ্ট্রপাল ঐ সকল ক্লাবের মারফতে দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে রাইফেল চালানো শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। স্বাধীন ভারতে বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ভার ও দেশের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা দমন করিবার ভার বাঙ্গালী যুবকগণেরই গ্রহণ করিতে হইবে। সেজন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে ভাল। সুখের বিষয় এ বিষয়ে সর্বত্র উৎসাহ দেখা যাইতেছে ও লোক কাজে অগ্রসর হইতেছে। সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে এ কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে এবং তাহার ফলে দেশরক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে বিরাট সৈন্য বাহিনী পোষণের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

রাজা প্যারীমোহন কলেজ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন ক্রমে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া কলেজের নাম পরিবর্তন করিয়া 'রাজা প্যারীমোহন কলেজ' নাম করা হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পিতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শিক্ষা প্রচারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, বাংলার শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। রাজা প্যারীমোহন ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠা ও তাহা রক্ষার জন্য যেরূপ অর্থব্যয় ও সময় দিতেন, তাহা অসাধারণ বলিলেই চলে। তাঁহার নামে কলেজের নামকরণে সত্যই গুণের সমাদর করা হইল। রাজা প্যারীমোহনের বহুমুখী প্রতিষ্ঠা ও দেশের উন্নতি বিধানে কার্য্যাবলীর কথা আজ প্রচার করা প্রয়োজন। আশা করি, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও তাঁহার বংশধরগণ সে বিষয়ে চেষ্টার ক্রটি করিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি—

গত ৭ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনের শেষ দিনে এক প্রস্তাবে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবী করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র নিম্নলিখিত কথা বলেন—(১) মহানন্দা নদীর সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গা উপত্যকার পূর্ণিয়া জেলার সদরও কিষণগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। বিহারের অধিকাংশ বাংলা-ভাষাভাষী অধিবাসী মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরে থাকেন (২) ভাগীরথী উপত্যকার সাঁওতাল পরগণার রাজমহল, পাকুড়, দুমকা ও জামতাড়া এবং দেওঘর মহকুমা পশ্চিমঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হউক—ঐ অঞ্চলে হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ১৭ জন মাত্র। (৩) দামোদর উপত্যকার হাজারিবাগ জেলার সদর ও গিরিডি মহকুমা এবং মানভূম জেলার সদর মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হউক। সদর মহকুমার একটি অংশ সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকায় পড়িয়াছে, ইহাকেও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অবশ্য ধানবাদকে বিহারের সহিত সংযুক্ত রাখার জন্য যেটুকু অংশ প্রয়োজন, তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই উপত্যকায় হিন্দী-ভাষীর সংখ্যা শতকরা ১৯ জন মাত্র। (৪) সুবর্ণ-রেখা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবে। কিন্তু টাটানগর সহ কিছুটা অংশ বিহারকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই উপত্যকায়ও বাংলা-ভাষাভাষীরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। বিহারের ঐ সকল অঞ্চলে জনবসতি খুব কম—পশ্চিমবঙ্গ ঐ অংশ পাইলে এখানকার বহুলোক ঐ অঞ্চলে যাইয়া বাস করিবে ও পশ্চিমবঙ্গের জনবহুলতা হ্রাস পাইবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাসভবন—

গত ৬ই আগষ্ট রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৭ তম মৃত্যু বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ভারত সভা হলে সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে—রাষ্ট্রগুরুর বারাকপুরস্থ বাসগৃহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রয় করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করুন। ঐ গৃহে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ ৫০ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন—ঐ গৃহের সহিত জাতির উত্থানের ইতিহাসের বহু স্মৃতি জড়িত। উহা গঙ্গাতীরে প্রশস্ত জমীর উপর সুবৃহৎ গৃহ। বর্তমানে ভাড়া দেওয়া আছে। যেমন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাঁঠালপাড়াস্থ বাস-গৃহ সরকার গ্রহণ করিয়া তাহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছেন, তেমনই রাষ্ট্রগুরুর বাসগৃহও জাতীয় সম্পত্তিতে

যাহাতে পরিণত হয়, সে জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা দেশবাসী সকলেরই কর্তব্য। ভারত সভা হলের সভার ঐ প্রস্তাবটি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে—আমরা ও বিষয়ে সকল দেশহিতকামীকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা—

আদম সুমারীর পরিচালক শ্রীঅশোককুমার মিত্র পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যায় পঞ্চম স্থান ও আয়তনে নবম স্থান অধিকার করে। প্রতিবর্গ মাইলের লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়। প্রথম স্থানাধিকারী ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে প্রতি বর্গ মাইলে ১১০০ লোক বাস করে—দ্বিতীয় পশ্চিম বাংলায় প্রতিবর্গ মাইলে ৮০৬ লোক বাস করে। কলিকাতায় প্রতিবর্গ মাইলে ৭৮৯০০ লোক বাস করে। কলিকাতা ছাড়া ২৮টি থানায় কলকারখানার জন্য ঘনবসতি আছে—কারখানা অঞ্চলের জনসংখ্যা মোট জন সংখ্যার শতকরা ৪২ জন। যদি বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষি প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে জমীর অভাবে বহু কৃষক বেকার হইয়া পড়িবে। কারখানা অঞ্চলে এখনই বেকারের সংখ্যা খুব বেশী। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আজ ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে। আদম সুমারীর হিসাব লইয়া শিক্ষিত দেশবাসীর আলোচনা করা প্রয়োজন—কারণ তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সমস্যা সমূহের সমাধান করা সম্ভব হইবে।

রাজ্যপালের দান—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র পরলোকগত পুত্রের নামে 'সুধীরকুমার মুখার্জ্জি তহবিল' গঠনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুবকগণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে ঐ টাকা হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে। সম্প্রতি রাজ্যপাল মহাশয় বাঙ্গালী যুবকগণকে সামরিক মনোভাবাপন্ন করিবার জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার দানের কথা দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব—

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট্ পরিচালিত বিগত আন্ত-কলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় লা-মার্টিনেয়ার কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী ও বাংলা উভয় বিভাগেই মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গত বৎসরেও তিনি ইংরাজী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক লাভ করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

ইংরাজী-ভাষী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া ইংরাজী বিভাগে শীর্ষ স্থান অধিকার করা ও সেই সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলাতেও সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীমতী কৃষ্ণা "ভারতবর্ষ" পত্রিকার পরলোকগত সম্পাদক ও অন্যতম সত্বাধিকারী সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অফিসিয়াল্ রিসিভার শিবপুর নিবাসী এটর্ণী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। আমরা শ্রীমতী কৃষ্ণার উত্তরোত্তর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পরলোকে ডাঃ বিভূতিভূষণ বরাট—

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ চিকিৎসক বিভূতিভূষণ বরাট মহাশয় বিগত ১৯শে আষাঢ়, হ্যারিংটন ষ্ট্রীটস্থ নিজ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭১ বৎসর। ১৯০৭ সালে তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে এম্-বি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মেডিকেল কলেজে প্রত্যেক পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী ছিলেন এবং বহু পদক প্রভৃতি লাভ করিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি
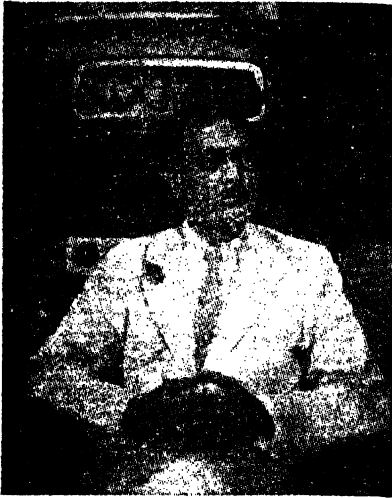
বিভূতিভূষণ বরাট

কিছুদিন ঐ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। তাঁহার কর্মনিষ্ঠা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি জীবদ্দশায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার গুপ্ত দানেরও অভাব ছিল না। তাঁহার একমাত্র পুত্র ডাঃ নির্মলকুমার এবং দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন বর্তমান। ডাঃ বরাটের স্বর্গারোহণে কলিকাতার চিকিৎসক মহলে যে বিশেষ অভাব ঘটিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

ভারতের খাদ্যাবস্থা—

ভারতের খাদ্য-সচিব জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই কলিকাতায় এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—ভারত সরকার ১৯৫২ সালের জন্য ৪৮ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিলেই চলিবে। তিনি আশা করেন, আগামী বৎসরে দেশের খাদ্যাবস্থার আরও উন্নতি হইবে। হিমাচল প্রদেশ, পূর্বপাঞ্জাব, পেপসু, উত্তরপ্রদেশও বিহার রাজ্য আগামী বৎসরে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ উদ্বৃত্ত রাজ্যই থাকিবে। রাজস্থান, মধ্যভারত ও সৌরাষ্ট্র প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ থাকিবে—দক্ষিণ ভারতে ঘাটতি অনেক কমিয়া যাইবে। শুধু বোম্বাই রাজ্য ও কলিকাতায় বিদেশ হইতে আনীত খাদ্যশস্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগামী বৎসরে বিদেশ হইতে ২৫ লক্ষ টনের অধিক খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন থাকিবে না। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

পরলোকে বেলা মিত্র—

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও নেতাজীর সহকর্মী শ্রীহরিদাস মিত্রের সহধর্মিণী বেলা মিত্র গত ১৫ই শ্রাবণ রাত্রিতে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে রাণী ঝান্সী বাহিনী কর্তৃক শিয়ালদহ ষ্টেশনে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ২ লক্ষ টাকা বিতরিত হইয়াছিল। রাজনীতিক কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তাঁহার স্বামী ও অপর ২২ জনের মুক্তি ব্যবস্থা তিনি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা সম্ভব করাইয়াছিলেন। শ্রীনেহরু প্রভৃতির দ্বারা তিনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈনিকদেরও মুক্তি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমাজ-সেবার ক্ষেত্রেও তিনি বহু কাজ করিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসাহায্য—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর আদর্শের পরিপূর্ণ সার্থক রূপদানের পথে অর্থাভাব সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। সেজন্য বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীজহরলাল নেহরু দেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন প্রচার করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া বার্ষিক সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। তথায় (১) হিন্দী (২) ভারততত্ত্ব (৩) বাংলা সাহিত্য (৪) অর্থনীতি ও

গ্রামীণ অর্থ নীতি (৬) সৈনিক বিদ্যা (৭) ভারতীয় শিল্প-কলা ও সৌন্দর্য্যতত্ব (৮) ভারত মার্গ সঙ্গীত (৯) ভারতীয় ইতিহাস ও (১০) ভারতীয় দর্শনের বিশেষ অধ্যাপক নিয়োগের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন। ৫ বৎসরের অর্থ সংগৃহীত হইলে উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগ করা হইবে। শ্রীনেহরুর এই আহ্বানে, আমাদের বিশ্বাস, দেশবাসী উপযুক্ত সাড়া দিবেন এবং অর্থাভাবের জন্য বিশ্বভারতীর কার্য্য যাহাতে বন্ধ না থাকে, সে বিষয়ে ভারতের সকল রবীন্দ্র-অনুরাগী ব্যক্তিই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার—

গত ২৯শে জুলাই নয়া দিল্লীতে গান্ধী স্মারক নিধির (গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার) ট্রাষ্টী বোর্ডের বার্ষিক সভা হইয়াছিল। শ্রী জি-ভি-মবলঙ্কার সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীজহরলাল নেহরু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীরাম, এ-পি-বেম্বল, কস্তরীভাই লালভাই, গোপীচাদ ভার্গব ও লক্ষ্মীদাস পুরুষোত্তমদাস উপস্থিত ছিলেন। নিধি সারা ভারতে ৪টি গান্ধী স্মৃতি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবে—(১) রাজঘাট (২) সবরমতী আশ্রম, আমেদাবাদ (৩) ওয়ার্দা সেবাগ্রাম আশ্রম ও (৪) মাদুরা। তাহা ছাড়াও ভারতের সর্বত্র যেখানে গান্ধীজির স্মৃতি বিজড়িত আছে—এমন ১০০ স্থানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হইবে। এতৎব্যতীত ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে সংগৃহীত চিত্র লইয়া গান্ধীজির জীবন-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। নিধির সৃষ্ট গান্ধী তত্ব প্রচার সমিতি গান্ধীজির লেখা প্রচারের ব্যবস্থা করিতেছে। মোট ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল—তন্মধ্যে ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। ২টি পৃথক ট্রাষ্ট হইতে (১) সবরমতী আশ্রম ও (২) বাংলার পাটকল অঞ্চলে গান্ধী স্মৃতি শ্রমিক হাসপাতাল করা হইবে। দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে স্মৃতি স্তম্ভাদি করার পর সাড়ে ৮ কোটি টাকা গঠনমূলক পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে। গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের এই অর্থ দেশকে সমৃদ্ধ করুক—সকলেই ইহা কামনা করে।

পরলোকে মোহিতলাল মজুমদার—

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও প্রথিতযশা কবি মোহিতলাল মজুমদার ৬৪ বৎসর বয়সে গত ১০ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রি সাড়ে ৯টায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ১৫ দিন রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি করোনারী থ্রম্বসিসে ভুগিতেছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কাঁচরাপাড়ায় মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়—তাঁহার পৈতৃক বাস ছিল হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে।

অন্তিম শয়নে মোহিতলাল মজুমদার ফটো—শ্রীপান্না সেন

সামান্য স্কুল শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-প্রতিভা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে স্বীয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বৎসর কাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি বঙ্গবাসী কলেজে প্রাইভেট এম্-এ ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তাঁহার কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে 'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'হেমন্ত গোধুলী' প্রভৃতি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লিখিত সমালোচনা গ্রন্থ 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম বরণ, রবি-প্রদক্ষিণ, সাহিত্য কথা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

১৯০৪ সালে হুগলী বলাগড় স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ১৯০৮ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে তিনি বি-এ পাশ করেন। কর্মজীবনের প্রথমে কিছুকাল তিনি 'কানুনগো' রূপে সরকারী চাকরী করেন ও পরে তাহা ছাড়িয়া কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতে আসেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রের নবপর্য্যায় ৩ বৎসর সম্পাদন করেন ও কিছুদিন 'বঙ্গভারতী' নামে মাসিক

পত্রের সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি এক সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ তথা বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সাধারণতঃ পূরণ হইবার নহে। তাঁহার কাব্য-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের যুগেও সম্যক সমাদর লাভ করিয়াছিল—কাজেই তাহাকে সাধারণ প্রতিভা বলা যায় না। তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচক বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল। 'ভারতবর্ষে'ও তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

বাঙ্গালীর সম্মান লাভ—

জেনিভায় আন্তর্জাতিক আইন কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন সার বি-নরসিংহ রাও। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে সেই প্রতিনিধি পদ প্রদান করা হইয়াছে। রাধাবিনোদবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-রূপে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস জেনিভাতেও তাঁহার আইন-জ্ঞান তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিবে। বাঙ্গালীর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দ লাভ করিবেন।

ভারতের বিদেশী ব্যবসায়ে ভারতীয়—

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর যখন বহু ইংরাজ ও ও অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায়ী ভারত হইতে তাঁহাদের কলকারখানা সরাইয়া লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাঁহাদের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন—তাহার ফলে কারখানার মালিকগণ এদেশে থাকিয়া যান। তখন হইতে কয় বৎসর কাল শ্রীনেহরুর নির্দেশমত বিদেশী কারখানাগুলিতে বড় চাকরীতে ভারতীয় গ্রহণ চলিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবার ঐ সকল কারখানার বিদেশী মালিকগণ বড় বড় চাকরীতে কাজ করাইবার জন্য বিদেশ হইতে লোক আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছে। পরাধীন ভারতে বিদেশী মালিকের কারখানায় যে কাজ করিয়া বিদেশীরা মোটা বেতন পাইত, সেই কাজ করিয়া ভারতীয়গণ তাহার এক চতুর্থাংশ বেতনও পাইত না। স্বাধীন ভারতে যাহাতে এই বৈষম্য না থাকে, সেজন্য শ্রীনেহেরু নির্দেশ দিয়াছিলেন। বর্তমানে কারখানার মালিকগণ কেন সে নির্দেশ অমান্য করিতেছেন জানি না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ দেশ হইতে ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তি দূর করা যাইবে না।

উত্তরপ্রদেশে বাঙ্গালী সম্মানিত—

উত্তরপ্রদেশস্থ এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি উক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলার বাহিরে এই বিশেষ সম্মান লাভ—বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। যোগ্যতা থাকিলে যে অন্য রাজ্যেও বাঙ্গালী উপযুক্ত সমাদর লাভ করেন, আজ প্রাদেশিকতা-দুষ্ট দেশে এই ঘটনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

শ্যামনগরে বালিকা বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ—

গত ৩১শে জুলাই সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় শ্যামনগর (২৪পরগণা) উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। ঐ উৎসবে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। জলবৃষ্টি সত্বেও সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় কর্ম্মী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল, শ্রীমণিমোহন সুর প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থ সাহায্যে বিদ্যালয়ের নূতন বিতল গৃহনির্মাণ সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

ম্যাঞ্চেষ্টার—১৭, ১৮ ও ১৯শে জুলাই

ইংলণ্ড ঃ ৩৪৭ (৯ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড; হাটন ১০৪, ইভেন্স ৭১, মে ৬৯। গোলাম আমেদ ৪৩ রানে ৩ এবং দিভেচা ১০২ রানে ৩ এবং মানকড় ৬৭ রানে ২ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ৫৮ (মঞ্জরেকার ২২ এবং হাজারে ১৬। টু্ম্যান ৩১ রানে ৮ এবং বেডসার ১৯ রানে ২ উইঃ) ও **৮২** (অধিকারী ২৭, হাজারে ১৬ এবং সেন নট আউট ১৩। বেডসার ২৭ রানে ৫ এবং লক ৩৬ রানে ৪ উইঃ)

ম্যাঞ্চেষ্টারে অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২০৭ রানে ভারতবর্ষকে হারিয়ে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' পেয়েছে। মোট চারটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে ইংলণ্ড উপর্য্যুপরি তিনটিতে ভারতবর্ষকে হারিয়ে দিয়েছে। আর একটি টেষ্ট ম্যাচ বাকি। পাঁচদিনের খেলা তিন দিনেই শেষ হয়ে যায়। প্রথম দুটি টেষ্টে ভারতবর্ষ হার স্বীকার করলেও ব্যর্থতার দিক থেকে এতখানি শোচনীয় হয়নি। তৃতীয় টেষ্টে ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি আমাদের সারা মন ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। সুদীর্ঘ কালের অনুশীলনে ভারতীয় ক্রিকেট যতটুকু এগিয়েছিল আজ তার থেকে অনেক পিছনে চলে গেছে। বলির পাঁঠার মত ব্যাটসম্যানরা কাঁপতে কাঁপতে এসে, উইকেটে গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এবারের টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড টসে এই প্রথম জয়ী হয়ে ব্যাট করতে নামল। আধঘণ্টা ধরে মন্থরগতিতে খেলা চলতে থাকে, ১ ঘণ্টায় রান ওঠে মাত্র ২৮। ১৩০ মিনিটের খেলায় এক উইকেটে ৭৮ রান উঠলে পর বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে হয়। প্রথম দিনে খেলায় ২ উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ১৫৩ রান দাঁড়ায়। হাটন নট আউট ৮৫ রান করেন। এই রান ক'রে টেষ্ট ক্রিকেটে জ্যাক হবস প্রতিষ্ঠিত ৫,৪১০ রানের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। টেষ্টে সর্ব্বোচ্চ মোট রান হিসাবে রেকর্ড রইলো হ্যামণ্ডের ৭,২৪৯ এবং ব্র্যাডম্যানের ৬,৯৯৬ রান।

রাত্রের বৃষ্টির দরুণ দ্বিতীয় দিন খেলা দেরীতে আরম্ভ হয়। উইকেট খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেলেও মাঠের চারদিকই ভিজে থাকে।

বৃষ্টির দরুণ দ্বিতীয় দিন মাত্র ৩¼ ঘণ্টা খেলা সম্ভব হয়। হাটন ১০৪ রান করেন। টেষ্টে এই নিয়ে তাঁর ১৬টি সেঞ্চুরী। তাঁর এই রান তুলতে পাঁচ ঘণ্টা ৫মিনিট সময় লাগে; বাউণ্ডারী করেন ১০টা। হাটনের সেঞ্চুরীর থেকে পিটার মে'র ৬৯ রানই দর্শকদের কাছে আনন্দদায়ক হয়েছিল। বৃষ্টির দরুণ লাঞ্চের পূর্ব্বে মাত্র ৭৫ মিনিট খেলা হয়। এর পর প্রবল বারিপাতের ফলে ২¼ ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকে। ভিজে উইকেটে ইংলণ্ড ক্রমশই ভারতীয় বোলারদের হস্তগত হ'তে থাকে। এ অবস্থায় ৫৬ রানে ৪টে উইকেট পড়ে যায়, দিভেচা ১৪ রানে ২টো উইকেট পান। নির্দ্ধারিত সময়ে ৭ উইকেটে ইংলণ্ডের ২৯২ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনের খেলায় ৯ উইকেটে ৩৪৭ দাঁড়ায়। অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের রানের সঙ্গে ৫৫ যোগ হয় এবং আরও ২টো উইকেট যায় গোলাম আমেদের বলে। এই রানের ওপর ইংলণ্ড ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। ইভেন্স ৭১ রান করেন। তার মধ্যে ১টা ছয় এবং বাউণ্ডারী ৯টা। এই রান করার দরুণ ইভেন্স ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাটিং এভারেজ

তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন—খেলা ৩, ইনিংস ২, নট আউট শূন্য, মোট রান ২৪১, সর্ব্বোচ্চ রান ১০৪ এভারেজ ৮০·৩৩।

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। যাঁরা ভেবেছিলেন ভারতবর্ষের ফাস্ট-মিডিয়াম বোলারদের তুলনায় ইংলণ্ডের ওপনিং বোলার বেডসার এবং টু্ম্যান উইকেটের সুযোগ বেশী নিতে পারবেন তাঁদের ধারণা কার্য্যক্ষেত্রে ঠিকই হ'ল। ইংলণ্ডের এ দু'জন বোলার ভারতবর্ষের পক্ষে খেলার সূচনা থেকেই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালেন। দলের মাত্র ৪ রানে রায় গোল্লা ক'রে টু্ম্যানের বলে খোঁচা লাগিয়ে হাটনের হাতে ধরা দিলেন। এই থেকে তাসের ঘরের মত ভারতবর্ষের উইকেট পড়তে লাগলো, মাত্র ৫ রানে ৩ উইকেট পড়েছে ; রায়, মানকড়, অধিকারী—ওপরের তিনজন আউট হয়েছেন। এই দারুণ পতনের মুখে বহুবারের মত ভারতীয় দর্শক মণ্ডলী একান্তভাবে হাজারের খেলার ওপর ভরসা করলেন। অনিশ্চিতভাবে খেলা আরম্ভ করলেও বিপদের মুখে হাজারে একাগ্রতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সহযোগীরা এলোপাতাড়ি খেলে দলকে আরও বিপদের মুখে ফেলে দেন। উমরীগড় এই টেষ্ট ম্যাচের পূর্ব্বে এই মাঠেই লাঙ্কাসায়ারের বিপক্ষে ডবল সেঞ্চুরী ক'রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, টেষ্টে তার কোন মর্য্যাদাই রাখতে পারলেন না। উইকেটের উপর সব সময়েই তাঁকে বলির পাঁঠার মত চিন্তান্বিত দেখা যায়। বার বার ভুলভাবে পা ফেলে এবং এমন আনাড়ির মত ব্যাট চালিয়ে খেলতে থাকেন যে, তিনি প্যাভেলিয়নে ফিরতে পারলেই যেন বেঁচে যান। এই ভুল খেলার ফল হাতে নাতে তাঁকে পেতে হয়েছে—টু্ম্যানের বলে তাঁর উইকেটের একটা বল ত্রিশ গজ দূরে ছিটকে পড়েছে। মাত্র ১৭ রানে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে যায়। এই সময়ে টু্ম্যান ৪.৫ ওভার বল দিয়ে ২টো মেডেন নিয়ে মাত্র ৫ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেয়েছেন। হাজারে এবং মঞ্জরেকার ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে লাঞ্চ পর্য্যন্ত দলকে বাঁচিয়ে রাখেন। ফলো-অন্ থেকে রেহাই পেতে ভারতবর্ষের তখন আরও ১৬১ রান দরকার। কিন্তু লাঞ্চের পর খেলার অবস্থা ভারতবর্ষের অনুকূলে গেল না। লাঞ্চের পর ২০ মিনিটের মধ্যেই ভারতবর্ষের বাকি ৫টা উইকেট পড়ে গেল।

প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষ মাত্র ৮৫ মিনিট খেলেছিলো। এর মধ্যে অধিনায়ক হাজারে একাই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন ৭০ মিনিট। টেষ্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের পক্ষে ৫৮ রান ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বনিম্ন রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছিল ১৯৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিসবেন মাঠে।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে ইংলণ্ড মাত্র ২½ ঘণ্টা সময় নেয়। ভারতবর্ষের দু' ইনিংসের ২০ উইকেটে রান দাঁড়ায় মাত্র ১৪০। ২য় ইনিংসে বেডসার ২৭ রানে ৫টা এবং সারের নবাগত টেষ্ট বোলার টনি লক পান ৩৬ রানে ৪টে উইকেট। তিনটি টেষ্ট ম্যাচে ফ্রেড টু্ম্যান ৬ ইনিংসের খেলায় ২৪টা উইকেট নিয়ে ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেষ্ট সিরিজে এলেক বেডসার প্রতিষ্ঠিত ২৪ উইকেট পাওয়ার রেকর্ডের সমান করেছেন।

বিশ্ব অলিম্পিক গেমস ঃ

ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি সহরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বিশ্ব-অলিম্পিক গেমস প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে শেষ হয়েছে। অলিম্পিক গেমসের পবিত্রতা বহন ক'রে যোগদানকারী দেশগুলির প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেছেন। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় করার পক্ষে বিশ্ব অলিম্পিক গেমসের প্রভাব যে অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য্য।

আলোচ্য বছরের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ৫৯টি দেশের ৫,৮৭০জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। পুরুষের সংখ্যা ৫,২৯৭ এবং মহিলার সংখ্যা ৫৭৩। রাশিয়ার যোগদান সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জারের রাজ শাসনকালে রাশিয়া শেষ যোগদান করেছিল ১৯২৪ সালে। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়া অলিম্পিক গেমসে সুদীর্ঘ কাল যোগদান করেনি। অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাশিয়া কদাচিৎ যোগ দিয়েছে ফলে ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা না নিয়ে অলিম্পিকে প্রথম যোগদানের বছরে তারা যে প্রচুর সাফল্য লাভ করেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। আধুনিক কালের অলিম্পিকের সূচনা থেকে (১৯৩৬ সাল ব্যতীত) আমেরিকা শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল। আমেরিকার [illegible]

পতে কোন দেশ ছিল না। আলোচ্য বছরের অলিম্পিকে রাশিয়ার সাফল্য আমেরিকার সুদীর্ঘকালের একাধিপত্য অনিশ্চিত করে তুলেছে।

১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক গেমসে অসাধারণ ব্যক্তিগত সাফল্য লাভ করেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জাটোপিক। তিনি ৫,০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার এবং ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়ে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর সাফল্য আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই তিনটি অনুষ্ঠানে তিনি পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯৪৮ সালের গত লণ্ডন অলিম্পিকে জাটোপেক ৫,০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তাঁর সহধর্ম্মিণী মিসেস ডায়না জাটোপেকোভা মহিলা বিভাগে জাভেলিন নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় ১৬৫ ফিট ৭ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম ক'রে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। সুতরাং ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক গেমসকে নিঃসন্দেহে Zatopek's olympiad' বলা যায়। রেকর্ড প্রতিষ্ঠার দিক থেকে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক গেমস বিগত কালের সমস্ত অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে এত সংখ্যক দেশ এবং প্রতিনিধি যোগদান করেনি; দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ২০০টি বিষয়ে পূর্ব্ব অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ হয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ক'রে উপর্য্যুপরি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। কুস্তিতে মাদ্রাজের কে ডি যাদব ব্যাণ্টম ওয়েটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন। এই দুইটি পদক ছাড়া ভারতবর্ষ অন্যান্য অনুষ্ঠানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ১-১০ গোলে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে পত্র-পাঠ বিদায় নেয়।

গত বারের অলিম্পিকের রানার্স-আপ যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার ফুটবল খেলাটাই বিশেষ উপভোগ্য হয়। বিরতির সময় রাশিয়া ০-৩ গোলে হারতে থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে যুগোশ্লাভিয়া আরও ১টা গোল দিয়ে ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। এরপর রাশিয়া একটা গোল শোধ দিলে গোল দাঁড়ায় ৪-১। যুগোশ্লাভিয়া আরও একটা গোল ক'রে ৫-১ গোলে এগিয়ে থাকে।

রাশিয়ান ফুটবল দলের সুনাম যথেষ্ট; যে সব দেশের পক্ষে অলিম্পিক জয় সম্ভব—এমন একটি তালিকায় রাশিয়াকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল।

যুগোশ্লাভিয়া ৫-১ গোলে জিতছে। এ অবস্থায় রাশিয়াকে একটা ফুটবল টিম বলেই মনে হয়নি—এমনি তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ তারা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। খেলার ১৩ মিনিটের মধ্যে রাশিয়া ৪টে গোল শোধ দিয়ে সমস্ত দর্শকবৃন্দকে বিস্মিত করে দেয়। খেলা শেষের এক মিনিট আগে রাইট-ইন্ গোলে একটা প্রচণ্ড সট করেন; গোল চীৎকারে সমগ্র মাঠ উল্লসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার গোলরক্ষক এই অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দেন। অতিরিক্ত সময়ে রাশিয়াই খেলায় প্রাধান্য বিস্তার ক'রে খেলেছিল কিন্তু কোন পক্ষেই গোল হয়নি। ইংলণ্ডের আর্থার এলিস রেফারী ছিলেন; তিনি বলেন, এরকম উত্তেজনাপূর্ণ খেলা আমার জীবনে দেখিনি। আমার মতে, আর পাঁচ মিনিট সময় পেলে রাশিয়া জিতে যেত। অবিশ্যি দ্বিতীয় দিনের খেলায় রাশিয়া ১-৩ গোলে হেরে যায়।

বিগত পাঁচটি বিশ্ব অলিম্পিকের হকি খেলায় ভারতবর্ষ উপর্য্যুপরি চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। প্রথম চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯২৮ সালে। আলোচ্য বছরের খেলায় ভারতবর্ষ ৪-০ গোলে অষ্ট্রিয়াকে, সেমি-ফাইনালে ৩-১ গোলে ইংলণ্ডকে এবং ফাইনালে ৬-১ গোলে হল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে বাবু ২, রথবীরলাল ১, এবং জেণ্টল ১ গোল করেন।

ইংলণ্ডের বিপক্ষে বলবীর সিং হ্যাট-ট্রিক করেন। ফাইনালে হল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের ৬টি গোলের মধ্যে বলবীর সিং হ্যাট্-ট্রিক সমেত একাই পাঁচটি গোল দেন, বাবু একটা গোল করেন। ফাইনালে শুক্‌নো মাঠ পেয়ে ভারতবর্ষ তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে নেয়। বলবীর সিং এবং বাবুর যৌথ আক্রমণের সঙ্গে হল্যাণ্ড পেরে উঠতে পারে নি। পাকিস্তান প্রথম খেলায় সহজেই ফ্রান্সকে

৬-০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে হল্যাণ্ডের কাছে ০-১ গোলে হেরে যায়।

ইংলণ্ড ২-১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫২ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২৬টা খেলায় ৪০ পয়েন্ট পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ২৬টা খেলার মধ্যে ড্র ৬, এবং হার ৩। এরিয়ান্স ক্লাব নির্দ্ধারিত দিনে খেলায় যোগদান না করায় ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব শেষের খেলাতে পুরো পয়েন্ট লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিপূর্ব্বে ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯১৬, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে লীগ বিজয়ী হয়েছে। এইবার নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ছ'বার লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো। সব থেকে বেশী লীগ পেয়েছে ক্যালকাটা এবং মহঃ স্পোর্টিং—৮ বার।

আলোচ্য বছরের খেলার প্রথমার্দ্ধে গত বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গলদলের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোহনবাগান শোচনীয় ব্যর্থতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লা থেকে অনেক নীচে নেমে যায়, ভবানীপুর এই সুযোগে ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে। সমান ২৪টা খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের ৩৮ পয়েন্ট, ভবানীপুরের ৩৪ পয়েন্ট, ব্যবধান চার পয়েন্টের। এ অবস্থায় বাকি দুটো খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলের মাত্র ১টা পয়েন্ট পেলেই হাতের মুঠোয় লীগ এসে যায়। খেলা বাকি মহামেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে। ভবানীপুর তার বাকি দুটো খেলায়—ই, আই, আর এবং পুলিশের বিপক্ষে জিতলেও ইষ্টবেঙ্গল দলের লীগ পাওয়া আটকায় না। কিন্তু মহমেডান দলের সঙ্গে ভাল খেলেও ইষ্টবেঙ্গল হেরে যায়। ২৫টা খেলায় ৩৮ পয়েন্ট দাঁড়ায়—লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের এখনো এক পয়েন্ট দরকার; বাকি খেলা এরিয়ান্সের সঙ্গে। কিন্তু এ খেলা শেষ পর্য্যন্ত হয়নি; এরিয়ান্স ক্লাব তাদের ফুটবল সম্পাদক মহাশয়ের মাতৃবিয়োগ উপলক্ষে এক শোক-সভার আয়োজন করে। খেলার এবং শোক সভার সময় একই সময়ে পড়ায় এরিয়ান্স খেলায় যোগদান করেনি। ফলে আইনসঙ্গত ভাবেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়েন্ট পেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়াসীপ লাভ করেছে।

দলের ছ'জন খেলোয়াড়কে অলিম্পিকে পাঠিয়েও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যে এই সম্মান লাভ করেছে তা বড় কৃতিত্বের পরিচয়।

সাহিত্য-সংবাদ

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "চক্রান্তজালে নারী"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আঁধি" (৩য় সং)—৩৲, "পাহাড়িয়া"—১৲
নিরুপমা দেবী প্রণীত উপন্যাস "অন্নপূর্ণার মন্দির" (৮ম সং)—৩৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "বন্ধু" (৪র্থ সং)—১৸৹
পুষ্পলতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "মরু-তৃষা" (২য় সং)—৩৷৹
শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৬ষ্ঠ খণ্ড)—৪৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "কারাগারে কৃষ্ণা"—১৷৷৹
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "নারী"—২৸৹, "খুনের পরে"—১৸৹, "নির্ভীক মোহন"—২৲, "দস্যু বনাম মোহন"—২৲, "অসামান্য মোহন"—২৲, "অতিমানব মোহন"—২৲, "সমস্যা-সাগরে মোহন"—২৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকাবর্জ্জিত নাটক "সিপাহী-বিদ্রোহ"—১৲
শ্রীঅনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "স্ত্রী"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "এঁরাই মানুষ"—১৷৹
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ 'নুরজাহান"—১৲
রফি উদ্দীন প্রণীত "মানবতার প্রাণশক্তি"—২৷৹
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ-সংকলিত "ঋগ্বেদীয় মন্ত্র-সংকলন"—১৷৷৹
খোশলাল প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মানবতা"—১৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দত্তা" (১৪শ সং)—৩৲, "অরক্ষণীয়া" (১৯শ সং)—১৷৹, "শেষ প্রশ্ন" (১৬শ সং)—৫৲, "মেজদিদি" (১৬শ সং)—১৷৹
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "প্রফুল্ল" (১০ম সং)—২৷৹
আরতি চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মিতালী"—৷৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা

প্রথম খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পটভূমিকা

ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

(১)

জ্ঞানীর ব্রহ্ম নির্গুণ, ভক্তের ভগবান সগুণ। শাণ্ডিল্যসূত্র ভক্তির সংজ্ঞা দিতেছেন,—

'সা পরানুরক্তি্রীশ্বরে'।

বৈষ্ণবধর্মের গোড়াতেই আসিতেছে অনুভূতির কথা, ভক্তির কথা, আত্মনিবেদনের কথা। বহু পাশ্চাত্য মনীষী ভগবান যে অনুভূতি-সংবেদ্য এবং ধর্মের (religion) প্রতিষ্ঠা অনুভূতির তথা feelingএর উপর, তাহা স্বীকার করেন এবং ইহাও বলেন যে জ্ঞানের সংগে অথবা নৈতিক ব্যবহারের সংগে ধর্মের মূলতঃ কোন যোগসূত্র নাই।* অনুভূতি হইতে রতি, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি একে একে স্ফুরিত হইয়া ভাবে পরিণত হয়, নীরস তথাকথিত জ্ঞানিগণের সেরূপ হয় না, একটা তার্কিক মনোবৃত্তির সংগে বুদ্ধির কসরৎ—intellectual gymnastics—লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন :

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

---

* According to Schleiermacher religion has, 'as such, no necessary connexion with either intelectual insight or moral conduct, but is a kind of feeling which he described as a 'sense and feeling for the infinite' and a 'feeling of absolute dependence'. * * * According to Prof. Rudolph Otto the basis of religion is a kind of feeling known as numinous feeling : the Divine is, in man's consciousness, *Mysterium tremendum et fascinans*, the Mystery which causes him to shudder and yet draws him towards Itself.—W. R. MATTHEWS.

নানাজাতি, নানাধর্মী, নানা সম্প্রদায়ী ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছে তাঁহাতে নানা গুণ, নানা ভাব, নানা attributes আরোপ করিয়া। য়ুহুদীর জিহোবা শব্দে ভগবানের সত্তা লক্ষিত হয়, গ্রীসীয়গণের জিয়ুস্ শব্দে বুঝায় ভগবানের অমরত্ব, রোমকদের জুপিটর অর্থে বুঝায় ভগবানের লোকপিতৃত্ব, পারসিকগণের অহুরমসদ ঘোষণা করিতেছে ভগবানের অপাপবিদ্ধত্ব, মুসলমানের আল্লা ভগবানের পূজনীয়ত্ব সূচিত করে এবং খ্রীষ্টধর্মিগণ ভগবানকে তাবৎ স্থাবর জংগমের নিয়ন্তা সদা-প্রভু পরমপিতা ও তদীয় পুত্র যীশুকে ভগবানের অবতার ও জীবের মোক্ষদাতৃরূপে অর্চনা করেন। হিন্দুর ঈশ্বর শব্দে প্রকটিত হয় ভগবানের ঈশিত্ব, শক্তিমত্ব ও প্রভু-ভাব। এই নামটি ভগবত্তত্ত্বে একটি সার্থক নাম; ইহাতে বুঝায় ভগবানের ঈশ বা ঐশ্বর্যভাব।

ঈশ ভাব কিরূপ?—যেভাবে ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, অদৃষ্টের বিধাতা, পাপের শাস্তা,সাধুর পরিত্রাতা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। দর্শনের নির্গুণ শাশ্বত সত্তা, অজ্ঞেয়বাদীর অবাঙমনসগোচর পরমতত্ত্ব, বাক-চিন্তা-জ্ঞানের অতীত বস্তু। উপনিষদের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ; যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে কতকগুলা ঋণাত্মক বাক্য 'নেতি নেতি' শব্দ প্রযুজ্য হয় এবং যাঁহার তটস্থ (approximate) লক্ষণ বর্ণনা করিতে 'তজ্জলান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যাহার অর্থ, 'তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহার দ্বারা জীবিত, এবং তাঁহাতেই লীন'। সগুণ ভগবান সকল জীবের উপাস্য. সকল ধর্মের প্রতিপাদ্য এবং যাবতীয় নরনারীর কাছে তাঁহার একটা সহজ ও স্বাভাবিক আবেদন আছে। ইনিই জিহোবা, জিয়ুস, জুপিটর, অহুরমসদ, আল্লা, গড; ইনিই হিন্দুর একমেবাদ্বিতীয়ম হইয়াও গুণভেদে ত্রিবিধ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর; এবং কর্মভেদে অসংখ্য,ত্রেত্রিংশকোটি। আবার স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ জগৎ ভেদে বেদান্তের প্রতিপাদিত ভগবানকে যথাক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও "ঈশ্বর" [তৃতীয় পুরুষ] বলা হয়। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর হইলেন যোগিজন-ধ্যানগম্য পরমাত্মা। ভগবদগীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যময় মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বিশ্বে পরিব্যাপ্ত তাঁহার বিভূতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী আছে:

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ ঊর্জিতমেব বা।
তত্ত দেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহশ সম্ভবম্॥ ১০।৪১

জগতে যাহা কিছু বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও বলবৎ তাহা ভগবানের অংশসম্ভূত বলিয়া জ্ঞান করিবে।

জ্ঞানের পথে যেমন শাশ্বতসত্তার উপলব্ধি হইয়াছে সেইরূপ অনুরাগ বা ভক্তির পথেও সেই বিশ্বনিয়ন্তা সচ্চিদানন্দময় পরাৎপরের উপলব্ধির প্রচেষ্টা হইয়াছে। এ শেষোক্ত পথে শাশ্বতসত্তার সহিত একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ভাব (attitudes) বর্তমান। ভগবানের এই ভাবটি হই মধুরভাব, মাধুর্য। এইভাবে তিনি দয়াময়, স্নেহময় ও প্রেমময় এবং সম্বন্ধে প্রভু, পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, পতি প্রণয়িণী। যখন আমরা দেখি যে, অনাদি, অনন্ত, নিরাকার নির্বিকার, নিরঞ্জন, অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য, অদ্বিতীয় পর ব্রহ্ম মায়ায় মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া উদ্ধব-অক্রূরের প্রভু নন্দ-যশোদার পুত্র, শ্রীদাম-সুদামের সখা, ব্রজগোপীর কা হইয়াছেন তখন আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি যে ভগবা শুধু ঈশ্বর নহেন তিনি মধুময়; মধু হইতে মধুর, মাধুর্যময় ভগবানের ঈশিত্ব, শক্তিমত্ব বুঝাইবার পক্ষে যেমন ঈশ্ব নাম সার্থক, তেমনি তাঁহার মাধুর্য, মধুময়ত্ব বুঝাইবার জ রাম, হরি, কৃষ্ণ নাম সার্থক। রাম নামে মনোরম, অভিরা ভাবটি প্রকাশিত হয়, হরি নামে তাঁহার স্নিগ্ধকর, চিত্তহ ভাব এবং কৃষ্ণ নামে চিত্তবিনোদন প্রেমময় আকর্ষ ভাব প্রকটিত হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগময় মধুরভাবে ভগবানে ভজন সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ। গৌড়ীয়াচার্যগণ উক্ত অনুরাগকে রস আখ্যা দিয়াছেন; এবং পুরুষ ও নারীর যে কান্তাকা মধুময় সম্পর্ক তাহার মূল রসকে শৃংগার বলিয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বর সম্পর্কিত যে যুগলতত্ত্বে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে তাহাতে মানবাত্মা বা জীবকে 'নারী' ও ঈশ্বরকে 'পুরুষ' ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে জীবই individual soul, এবং ঈশ্বর পুরুষোত্তম supreme soul. গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই প্রতী অনুরাগভজনে [রাগানুগামার্গে] যুগলমূর্তি ধরিয়া এ অভিনব অতিদৈহিক মিলন ঘটাইয়া অপার্থিব romance এর সৃষ্টি করিয়াছে। অতীন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তাকে [রসস্বরূপে] আমাদের জীবনে ধরিবার তথা আস্বাদন করিবার উপা

ভাবমুখে। বৈষ্ণবাচার্যগণ এই ভাবসাধনারই পথিকৃৎ; এবং এই ভাবসাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপজীব্য। রসসৃষ্টির কথা—যথা শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস ও ভাবের কথা—যথা ভাব বিভাব-সঞ্চারী-অনুভাব এই ধর্মের মণিকোঠায় অনুস্যূত। ভাবের আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, world's sweetheart; শুধু অবতার নহেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মা [শ্রীরাধা] কর্তৃক পরমাত্মার [শ্রীকৃষ্ণের] উপলব্ধিকে কান্তাকান্তমিলনসম্ভোগের সহিত উপমিত করা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে এই সম্ভোগ নিবিড়তম হওয়ায় পার্থিব romance ও দেহাশ্রয়ী উপভোগ ছাড়াইয়া এক বিচিত্র উচ্চস্তরের—sublimated—রসবৈদগ্ধ ও অপূর্ব অপ্রাকৃত আস্বাদনের ইংগিত দেওয়া হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণাবতারের মুখ্য প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়াছেন:

> প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
> রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
> রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
> এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদগম॥
> ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সর্বজগৎ মিশ্রিত।
> ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন:

> ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি, সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি ও সর্বরসে পূর্ণ সবার আধার।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে নারায়ণ ও কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও রসগতবিচারে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বিদ্যমান।—

> 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি'

—শৃংগাররসবিচারে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ রসোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণই অখিলরসামৃতসিন্ধু। শ্রীমদ্ভাগবত এই অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয় দিতেছেন:

বলরামের সহিত কৃষ্ণ কংসালয়ে উপস্থিত হইলে যাঁহার যেরূপ রস তিনি সেই রসেই কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীররসপ্রিয় মল্লগণের কাছে তিনি সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হইলেন। মধুররসপ্রিয় ভামিনীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। সখ্যবাৎসল্যপ্রিয় গোপগণ তাঁহাকে স্বজনরূপে গণ্য করিলেন। নৃপতিগণ তাঁহাকে সার্বভৌম নরপতিরূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত অসৎ রাজন্যবর্গের নিকট তিনি শাসকরূপে প্রতীয়মান হইলেন। ভোজপতি কংস তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাটরূপে, দেবকী ও বসুদেব তাঁহাকে অনিন্দ্য-সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। শান্তরসপ্রিয় যোগিগণ তাঁহাকে পরমতত্ত্ব-রূপে ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পর দেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিতেছেন:

> 'রসো বৈ সঃ, রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি।'

সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপদগ্ধ জীব আনন্দলাভ করে। আকাশের ন্যায় ভূমা এই আনন্দই রস; যদি এই রস না থাকিত তাহা হইলে কেই-বা স্পন্দিত হইত? কেই-বা জীবিত থাকিতে পারিত? তিনিই সকল জীবকে আনন্দ প্রদান করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ, নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্ম শুধু নহেন—তিনি সাকার, অগুণ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দের অনুভবিতা এবং নিখিল জীবকে সেই আনন্দের অনুভাবয়িতা। প্রশ্ন এই, একমাত্র বস্তু স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া কিরূপে সকলকে সেই আনন্দের অনুভব করাইয়া থাকেন? এই জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে হ্লাদিনী-শক্তি ও রাধাতত্ত্বের মাধ্যমে।

(২)

এক্ষণে ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রে কিরূপ ধারণা আছে তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

ভগবান অবিচিন্ত্য শক্তির আধার।

> কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
> চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥ চৈঃ চঃ মধ্যঃ

ইহাদের মধ্যে চিচ্ছক্তি অন্তরংগা, মায়াশক্তি বহিরংগা ও

জীবশক্তি তটস্থা। অন্যথা, বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধা, পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া। পরাশক্তিই চিচ্ছক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি; মায়াশক্তি কর্মশক্তি। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ বলেন, ভগবানের পরাশক্তি জ্ঞান (=সম্বিৎ), বল (=সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (=হ্লাদিনী ভেদে ত্রিবিধা। চৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে—

> ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
> তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন ॥

নিরুপাধি ব্রহ্ম যেন ভগবানের static অবস্থা। সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানকে বুঝিতে হইলে জীব ও জগৎকে আনিতে হয়, শক্তিত্রয়কে সাম্যাবস্থায় (in equilibrium) ফেলিয়া রাখা চলে না।

ভগবান সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। তিনি পূর্ণ সৎ হইয়াও মায়াকল্পিত পদার্থনিচয়কে যে শক্তির সাহায্যে সত্তাযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহাই সন্ধিনী শক্তি। সন্ধিনীর উৎকর্ষ হইল সংবিৎশক্তি। সংবিৎশক্তির কার্য হইল প্রকাশ; সদবস্তু যদি প্রকাশিত না হয় তবে অলীক হইয়া পড়ে এবং অপ্রকাশিত বস্তু সৎ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পুনশ্চ, সংবিৎশক্তি যদি প্রকাশময় কার্যকে আনন্দময় না করিতে পারেন তবে প্রকাশের সার্থকতা থাকে না, প্রকাশও অকিঞ্চিৎকর হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন:

> আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
> আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
> আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।

প্রাণিগণ আনন্দ হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকে এবং সেই প্রকাশমান আনন্দ সাগরেই মিশিয়া যায়।

তারপর জীবশক্তি। উহাই কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। জল ও ডাঙ্গার সীমানা (boundary) হইল একটি রেখা, যাহাকে বলে তট। চিদ্‌জগৎ ও অচিদ্‌জগতের মাঝের সীমান্ত রেখাকে বৈষ্ণবাচার্যগণ "তট" বলেন। চিদ্‌জগৎ হইল শ্রীবিষ্ণুর শাশ্বত নিবাস, আর অচিদ্ জগৎ হইল মায়ার (মায়া শক্তির) রাজত্ব। শ্রীবিষ্ণুর একটি শক্তি যখন এই তটে প্রকট হয়, তখন ইহা হয় "তটস্থা শক্তি"। জীব মায়াবশ, ভগবান মায়াধীশ। এই 'দুরত্যয়া গুণময়ী' মায়াকে বশ করা সহজ নয়, ইহা 'দৈবী'। আবার, জীব চিৎ কণ,—atom of spirit; এ জন্য জীব কৃষ্ণের অনুগত, নিত্যদাস। এইটি জীবের স্বভাব। কিন্তু জীব মায়াবশ হওয়ায় মায়ারূপী অক্টোপাস তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরিয়া একটা কৃত্রিম স্বভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে বলে "নিসর্গ"। এই নিসর্গজনিত জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ, কিন্তু তটস্থা শক্তির সাহায্যে জীবের অন্তর্মুখী হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রসংগক্রমে বলি, স্বভাবত যে আকর্ষণ সেটি যেন centripetal force, আর নিসর্গহেতু বিপ্রকর্ষণটি হইল centrifugal force! বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিতেছেন যে জীব দুঃখভোগ করে কৃষ্ণবৈমুখতা নিবন্ধন।

> কৃষ্ণভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
> অতএব মায়া তাঁরে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ চৈঃ চঃ মধ্যঃ

এখন হ্লাদিনীর কথা বলিতেছি।

শ্রীভগবান সকল সৌন্দর্যের সার। তাঁহার আনন্দঘন রূপকে বলা হয় 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'। ইহাই নিত্যরূপ। ভগবানের এই সৌন্দর্য অনুভব করাইবার জন্য যে শক্তি তাঁহার নিত্যসিদ্ধা অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাহাকেই "হ্লাদিনী" বলিয়াছে। এবং জীব এই আনন্দ অনুভব করিবার জন্য যে বিশেষ মানসিক অবস্থায় উন্নীত হইবে তাহাকে 'প্রীতি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, জীব দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, সংসারতাপতাপিত ও নিরন্তর ব্যাকুল হওয়ায় শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইতেছে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—নিত্যানন্দময় ভগবানের নিত্যলীলা নিকেতনে সুখের পরিবর্তে দুঃখ কোথা হইতে আসিল?

জ্ঞানীরা বলেন—নিজের অবিদ্যাজনিত জীব দুঃখভোগ করে; কিন্তু ধ্যানধারণা সমাধির সাহায্যে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হইলে অবিদ্যা ঘুচিয়া যায়।

প্রশ্ন এই—আমার স্বরূপ যদি আনন্দময় হইল তবে অবিদ্যার প্রথম প্রবেশ হইয়াছিল কি উপায়ে? আমি স্বেচ্ছায় নিশ্চয় অবিদ্যাকে বরণ করি নাই? পুনশ্চ আমার দুঃখের কারণ যদি অপর কেহ হয়, তবে ধ্যান ধারণাদির সাহায্যে দুঃখনাশ করিয়া আমার কোন লাভ নাই; কারণ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার স্কন্ধে দুঃখ

চাপাইবার সামর্থ্য যাঁহার আছে তিনি আমায় দুঃখে ফেলিলে আমার করিবার কিছু থাকে কি?

জ্ঞানী বলিতেছেন—তোমার ভুল হইতেছে; কারণ, দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, অপর—কিছু অসৎ। অসৎকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিলে আর দুঃখ থাকিতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলিব—আমরা সামান্য নর, জ্ঞানী নহি। অসৎকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দিবার শক্তি আমাদের কোথায়? কারণ, সংসারযাত্রার শুরু হইতেই আমরা অসৎকে সৎরূপেই বুঝিয়া আসিয়াছি। এবং শুধু আমরা নয়, তত্ত্বোপদেশকারী হে জ্ঞানিন্, তুমিও তাহা বুঝিয়া আসিয়াছ। কারণ, ভেদজ্ঞানই ত মিথ্যাজ্ঞান! এ মিথ্যাজ্ঞান না থাকিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধজ্ঞান জন্মায় না। তবে তাই যদি না জন্মাইল তবে তুমি তত্ত্বোপদেশক হইয়া গুরুর আসনে বসিয়াছ কেন? তোমার ত ইহা মিথ্যা ব্যবহার হইতেছে।

জ্ঞানী বলিতেছেন—আমি করুণার বশীভূত হইয়া দুঃখনিমগ্ন জীবনিবহের উদ্ধারের জন্য তত্ত্বোপদেশ দিতেছি।

আমরা বলিব—জ্ঞানীর যুক্তি অসার। কারণ, ব্রহ্ম ব্যতীত সকল বস্তুই যাঁহার নিকট মিথ্যা, তাঁহাতে কারুণ্যরসের উদ্ভব হইতে পারে না। ভেদজ্ঞান না জন্মাইলে জীবহৃদয়ে করুণার উদ্রেক হওয়া সম্ভব নয়, ইহা কি অনস্বীকার্য? অতএব, মানুষ করুণাময় হইলে 'জ্ঞানী' হইতে পারে না।

এই জাতীয় তর্কের নিরাস পূর্বক ভক্তিমার্গ সংসারদগ্ধ জীবের হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিবার জন্য যে প্রকার সাধনপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন তাহাকে ভগবৎপ্রীতি বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন যে আনন্দস্বরূপ ভগবান স্বয়ং অনুভব করিবার জন্য এবং জীবকুলকে সেই আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণা করিয়া থাকেন। এই হ্লাদিনীশক্তি ভগবানে বর্তমান থাকায় শ্রুতি ভগবানকে রসরাজ বলিতেছেন।

আস্বাদ্যমান আনন্দকে শাস্ত্র 'রস' এই অভিধান দিয়াছে; অর্থাৎ, রস হইল একপ্রকার অভিলাষ যাহার সাহায্যে চিন্ময় আনন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে। এই রস জীবের আজন্মসিদ্ধ। মানুষ যখন এই আনন্দের আস্বাদ করে তখন তাহার অন্তঃকরণে যে সব অনুকূলবৃত্তি ও ভাবের উদ্রেক হয় তাহা হ্লাদিনীর ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। ভগবান স্বয়ং আনন্দময়, রসরাজ হইয়া যে শক্তির প্রভাবে এই মায়াময় সংসারে নিজাংশ [চিন্ময়] জীবরূপে প্রবেশ করাইয়া ইচ্ছাপূর্বক দেহাত্মাভিমানের দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়া অহরহ দুর্বিষহ দুঃখভোগ করিতেছেন সেই বিশ্বকল্যাণবিধায়িনী স্বরূপশক্তির নামই হ্লাদিনী।

> হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
> আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥ চৈঃ চঃ

এক্ষণে প্রেমের তাৎপর্য বোদ্ধব্য। জীবমাত্রেই সুখাভিলাষী; জীবনের সুখভোগের আকাংক্ষা জীবনে পরিতৃপ্ত হয় না। তাহার কারণ এই যে, ক্ষণিক বিষয়ানন্দে নিত্য নূতন সুখান্বেষণের বাসনা বর্ধিত হয় এবং উপভোগের দ্বারাও মনে প্রশান্তি আসে না। এজন্য আচার্যগণ বলিতেছেন যে, যাহা অপ্রাকৃত যাহা নিত্যস্নিগ্ধ যাহা ভূমার ন্যায় সর্বব্যাপী—সেই অপরিচ্ছিন্ন অনাদিনিধন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শাশ্বত সুখ। একবার সেই 'আনন্দচিন্ময়-রসপরিভাবিত' মূর্তির আস্বাদন ঘটিলে বৈষয়িক সুখ নিরর্থক হইয়া পড়ে ও সংসারী জীব ব্যাকুলতা প্রকাশ করে না। তাই, নিত্যসুখরূপ কৃষ্ণের প্রতি যে আকাংক্ষা, রতি, প্রীতি বা প্রেম সঞ্জাত হয় তাহাই হ্লাদিনী শক্তির পরিণতি।

> সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
> ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ চৈঃ চঃ

(৩)

মূল ভক্তিরস পঞ্চপ্রকার,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরস সম্বন্ধে ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন:

> 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'—

শান্তভাবেই ব্রহ্মের উপাসনা বিধি। এই শান্ত উপাসনায় মমতার গন্ধ নাই; শান্তরসের ভক্ত, স্বর্গ মোক্ষ নরকতুল্য জ্ঞান করেন; তাঁহার কৃষ্ণে অচলনিষ্ঠা ও তিনি বিগততৃষ্ণ। দাস্যরসে শান্তরসের স্থায়ীভাব বর্তমান; এতদ্ব্যতীত ইহাতে কৃষ্ণে 'পূর্ণৈশ্বর্য-প্রভু-জ্ঞান' থাকে। সখ্যরসে থাকিবে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন এবং কৃষ্ণের সখ্যহেতু গৌরব সম্ভ্রমহীন অসংকোচ মানসিক অবস্থা। বাৎসল্যরসের

চারি গুণ—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যের অসংকোচ অবস্থা এবং মমতার আধিক্যহেতু তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার। মধুর রসে পূর্বপ্রকার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারি রস অনুস্যূত; তদুপরি অতিরিক্ত গুণ 'নিজাংগ দিয়া সেবন' বর্তমান থাকিবে।

এখন ভাব সম্বন্ধে ইংগিত দিব। কোন ভাল জিনিস দেখিবার জন্য মনে একপ্রকার আসক্তি জন্মে; কি উপায়ে উহা পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য চিন্তা হয়, পাইলে অপূর্ব আনন্দময় চিত্তের একীভাব জন্মে; পাইবার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি বিদ্বেষ আসে, তাহার বিষয় ভাবিতে পাইলে মন প্রসাদ লাভ করে। এই যে জিনিসটির প্রতি আসক্তি, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, উৎফুল্লতা ও তাহার প্রতিবন্ধকের প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির উদ্রেক হয় এইগুলিকে আলংকারিগণ 'ভাব' বলিয়াছেন।*

উপরিউক্ত যে ভাল জিনিসের প্রতি আসক্তির কথা বলিয়াছি, সেই জিনিসটি যদি ভগবান হন তবে ভাবের গাঢ়তা আরও সুস্পষ্ট হয়। রস হইতে আসে প্রেম, প্রেম হইতে ভাব। অনুরাগ যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, মন সেই বিষয়ের প্রতি একটা অনুকূল উন্মুখতা দশা লাভ করে; উহাই ভাব। ভাবের তীব্র পরিণতি হইল 'মহাভাব' বা 'মোদন'। হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা প্রভাবিত উপচীয়মান রসের পরিণতি যখন চরমে পৌছায় তখন আসে মহাভাব। তখন মানসিক দশা এরূপ যে 'যাহা যাহা দৃষ্টি ফিরে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। চরিতামৃতকার বলিতেছেন :

> হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
> ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

* ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ভাব অপর ভাবের অধীন। যে প্রধান ভাবকে অবলম্বন করিয়া ঐ অধীন ভাবগুলি উৎপন্ন হয় তাহাকে 'স্থায়ীভাব' বলে। যে সকল কারণে স্থায়ীভাবের উদয় হয় তাহাকে বলে 'বিভাব'; এবং যাহাকে অবলম্বন করিয়া হর্ষ-শোক-ভয়-বিস্ময় প্রভৃতি চিত্তবিকার ঘটে তাহাকে বলে আলম্বন-বিভাব'। যাহারা রসের উদ্দীপন করে তাহারা 'উদ্দীপন-বিভাব'। 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী' ভাব হইল সেইগুলি যেগুলি অস্থায়ী; ইহা তেত্রিশ প্রকার। স্থায়ীভাবের কার্যকে 'অনুভাব' বলে। অনুভাবনিবন্ধন করুণ, বীর, রৌদ্রাদি সাধারণ রসের অনুভূতি জন্মে।

> মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
> সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥

শ্রীরাধা হইলেন মহাভাবস্বরূপা, অর্থাৎ মহাভাবই হইল শ্রীরাধার স্বরূপবিগ্রহ। কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীরাধার প্রেমময়রূপ শ্রীরূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে যেরূপ ফুটিয়াছে তাহাতে এই রাধাভাবের পরিচয় অল্পই মিলে; কিন্তু পরবর্তী শ্রীজীবগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি আচার্যগণ শ্রীরাধার যে রসভাবময়ী সমুজ্জ্বল মূর্তি ফুটাইয়াছেন ও তাঁহাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে স্থান দিয়াছেন তাহাতে উপলব্ধি হয় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের মূলভিত্তিই হইল শ্রীরাধা। হ্লাদিনীর প্রভাবে জীব প্রেমের সর্বোচ্চ ধাপ যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন তাহাতে উঠিতে পারে একান্ত রাধাভাবেই। আধ্যাত্মিক-ভাবে রসরাজ 'কেবলানন্দ-ভাবদ্বন্দ্বরূপ' শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তিকেই শ্রীরাধিকা বলা হয়।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ—এই আত্মনিবেদন ভাবটি সম্বন্ধে এই স্থানে লিখিয়াছেন :

"এই আনন্দময় রস যখন প্রেম-সূর্যের নবোদিত কিরণে বিকশিত ভক্তের হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়, তখন অদর্শনের আবেগ, দর্শনের জড়তা, বিরহের উৎকণ্ঠা, মিলনের তৃপ্তি, ভয়ের ব্যাকুলতা, চিন্তার অবসাদ, আশার প্রফুল্লতা প্রভৃতি রসময় ভাবগুলি আরতি প্রদীপের মত শত শত ভাবে দীপ জ্বালাইয়া তাঁহার আরতি করিতে থাকে। এই আত্মানন্দময় রসের আস্বাদনের সময় তুমি আমি এ ভেদবুদ্ধি থাকে না, অথচ অলৌকিক আস্বাদন থাকে।"

এই আস্বাদন ব্যাপার বুঝাইতে গিয়া চৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন :

> "না সো রমণ না হাম রমণী";
> "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি তদানীং মতিরভূৎ।
> মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা॥"

এক্ষণে কাম ও প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন; কারণ, বৈষ্ণবদর্শনের অনেক স্থানে উহারা সমানার্থক (Synonymous) প্রতীয়মান হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন :

> প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎপ্রথাম্।
> ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গোপিকাদিগের শুদ্ধ প্রেমের নামই কাম; ফলতঃ, উহা প্রকৃত (লৌকিক অর্থে প্রযুক্ত কাম নহে, বিশুদ্ধ প্রেম মাত্র।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥ চৈঃ চঃ

অন্যত্র উভয়ের পার্থক্য বুঝান হইতেছে:

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥

* * *

অতএব কাম, প্রেম বহুত অন্তর।
কাক অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখলাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥ চৈঃ চঃ

গোপীদের কৃষ্ণভজনকে রাগানুগমার্গে ভজন বলে। গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এই অপূর্ব রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে পর্যবসিত। যুগলতত্ত্ব হইলেও ইহার জুড়ি অন্য কোন ধর্মে মিলে না। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান উপজীব্য, অদ্বয় ঈশ্বরতত্ত্ব—

"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ"। চৈঃ চঃ

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই মূলবস্তু এবং কৃষ্ণসেবাতেই নিখিল বস্তুর তৃপ্তি।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ভাঃ ৪।৩১।১৪

ভাবার্থ এই: বৃক্ষের মূলে উত্তমরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখাপ্রশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, মূল ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে জলসেচন করিলে তাহা হয় না; প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে যেরূপ সমুদয় ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিসাধন হয়, ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক পৃথক ভাবে অন্নলেপন দ্বারা হয় না; সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজার দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে, তাঁহাদের আর পৃথকভাবে পূজার প্রয়োজন হয় না।

একমাত্র রাধাভাবের মাধ্যমে কৃষ্ণবস্তুকে আস্বাদ করা সুসাধ্য! রসশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রেমময় তুলিকায় চিত্রিত করিয়া এই রাধাতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন, বাংলার যুগাবতার শ্রীচৈতন্য এই তত্ত্বকে সার্থক করিয়াছেন নিজের জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া। বস্তুত, তিনি শ্রীরাধার ভাব লইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ বস্তুকে আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

ডঃ সুশীলকুমার দের মতে কৃষ্ণদাস 'চৈতন্যচরিতামৃত' শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনী নহে, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। "ইহাতে একদিকে ভাবমাধুর্যের আস্বাদন, অন্যদিকে ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, একদিকে নবদ্বীপের সহজ সরল প্রেমোল্লাস, অন্যদিকে বৃন্দাবনের সূক্ষ্ম ও দুরূহ তত্ত্ব-বিচার; চৈতন্যধর্মের এই দুইটি বিভিন্ন ঐতিহ্য এই গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।" এই গ্রন্থের মতে—

রাধা পূর্ণশক্তিঃ কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ চৈঃ চঃ

জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার লীলা প্রকটিত হইয়াছে জীবের কাছে এবং জীবের বিরহ ব্যথা অহরহ গুমরিয়া উঠিতেছে; নচেৎ লীলার কোন প্রয়োজন হইত না। পক্ষান্তরে, সৃষ্টি যদি অনাদি হয় তবে লীলাও অনাদি এবং বিরহেরও অবসান নেই, ইহা শাশ্বত এবং দুর্নিবার। আবার, জীব ও জগৎ চলিয়া গেলে রহিল নির্গুণ ব্রহ্ম, absolute deity, কোনও attributes নাই। অতএব সেটা ভগবানের ঔপপত্তিক অস্তিত্ব—theoretical existence। আসলে জীব ও জগৎ প্রপঞ্চিত না হইলে তাঁহাকে ধরিবার বা তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিবার কোন উপায়ই থাকিত না, আস্বাদন করা ত দূরের কথা। বাস্তবিকই, বৈষ্ণবের কাছে 'মায়া' মিথ্যা নয়, ভগবৎ সাধনার প্রকৃষ্ট সোপান।

ক্রন্দন

শক্তিপদ রাজগুরু

তাজগঞ্জের বাইরে ছোট বাড়ীখানাকে ঘিরে কোন্ স্বপ্নজগতের পরিক্রমা ঢালু চড়াইএর একাংশে রচনা করেছে কোন্ সর্বত্যাগী শিল্পী তার মন জগতের নিভৃতনীড়! কেউ বড় একটা ওদিকে যায় না! সকলের কাছেই যেন ও একটা পরিত্যক্ত ঠাঁই—কি একটা রহস্য ওকে ঘিরে রয়েছে, যা আজও অনেকের কাছে অজ্ঞাত!

চাঁদনীরাত নিস্তব্ধ-নীরব হয়ে আসে তাজের চারিদিক, দূর হতে আগত টুরিস্ট যাত্রীদের ভিড় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্যান্টনমেণ্ট কোর্ট হতে আগত টাঙ্গা-ওয়ালাদের ঘোড়ার চীৎকার, তাদের কলরব, যাত্রীদের টুকরো কথাবার্তার শব্দ থেমে গেছে! বড় ফটকের মধ্যের প্রাঙ্গণে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম বটঅশথগাছগুলোর মাথায় চাঁদের আলোর লুটোপুটি, জনহীন রুক্ষ মৃত্তিকার বুকে রচনা করে আলো ছায়ার মায়াজাল—! বিশাল চত্তরের এক কোণের দিকে উঁচু দরওয়াজা হতে নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে শেখ সপ্রু।

দীর্ঘ বিশাল চেহারা, একমুখ শাদা দাড়ির উপর চিক-চিক করে চাঁদের আলো, আলখাল্লাটা পা ছাড়িয়ে প্রায় মাটিতেই লুটোতে থাকে—বৃদ্ধ এগিয়ে আসে, পিছনে হাত দুখানা আলতো ভাবে রেখে, এগিয়ে আসে! দীর্ঘ চত্তরের মধ্য দিয়ে গাছের নীচে আলো আঁধারি পার হয়ে এগিয়ে আসে বৃদ্ধ!···

সাত দরওয়াজার উঁচু মিনারের উপর সোনারংএর গম্বুজ চাঁদের আলোর কোন মরীচিকার সৃষ্টি করেছে! জয়পুরী লাল পাথরের গায়ে জমে রয়েছে কোন আদিম অন্ধকারের ছোঁয়া!···বৃদ্ধ সাত-দরওজা পার হয়ে এগিয়ে চলেছে তাজের দিকে, ঘাসের হালকা চটি আর আলখাল্লার নাড়াচাড়ার একটু শব্দ ওঠে! আর চারিদিক নীরব নিঝ্ঝুম!···

দূরে শ্বেতপাথরের পথটা দিয়ে ঝিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে তাজের পানে!···পিছনের পটভূমিকা বিশাল উন্মুক্ত তারাকিনী আকাশ—তার কোলে মর্মর স্বপ্নমুখর তাজ!

কোন্ ছায়ামূর্তির মত এগিয়ে চলেছে শ্বেত আংরাখায় মোড়া—কোন আত্মভোলা স্রষ্টা! দ্বারোয়ান শান্ত্রী সকলেই চেনে ওকে—নিশীথ রাত্রে প্রত্যহই তাজের যাত্রী! ফেরে রাত্রির শেষ প্রহরে, নীরবে তাজগঞ্জের দিকে বার হয়ে যায়!

শেখ সপ্রুর কাহিনী কেউ বড় একটা জানে না, নিজের জীবনকে দুর্বোধ্য একটা রহস্যে পরিণত করে রেখেছে! স্তিমিত-প্রায় আঁখিতারায় বৃদ্ধের কোন সুদূরের আভা!··· শিরাবহুল হাতগুলো ছিনি-হাতুড়ীর স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে···, কঠিন পাথর···নরম মোমের মত কেটে কেটে পড়তে থাকে···, ফুটে ওঠে তার মধ্যে থেকে কোন শিল্পীর সাধনা রূপে রসে প্রাণবন্ত হয়ে!

সে আজ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা, শেখ সপ্রু তখন যুবক মাত্র! ফতেপুর সিক্রীর ওপাশে বন্ধুর পর্বত সমাকীর্ণ একটা গ্রামে মানুষ হয়ে ওঠে—বাবা—মা কারুর সন্ধান সে জানে না!···মানুষ করেছিল···বৃদ্ধ শেখ—চিস্তির বাইরে তার শ্বেতপাথরের ব্যবসা, কিশোর বালক তখন হতেই ছিনি ধরতে শিখেছে···, পাথর ঘসে সমান করে··· বাটালির ঘায়ে পল তুলতে শিখেছে!···মনের কল্পনাকে কঠিন পাষাণে রূপ দেবার ভাষা খুঁজেছে!

বৃদ্ধ শেখ···অনুভব করে তার হাতের কাজ দেখে পাথরে যাদু তুলতে পারবে সপ্রু! তার মত পাথরের থালা-বাটি-সিংহাসন আর জাফরি তুলতেই সপ্রু আসে নি দুনিয়াতে!···

আরাবল্লীর রুক্ষ প্রান্তর সীমার এপারেই 'মুঞ্জ' ···খেজুর গাছের গুঁড়ি জঙ্গল!···দূর দূরান্তর হতে গাগরী নিয়ে আসে জল ভরতে ঝরণার বুক হতে—আশে পাশের বস্তির অনেক মেয়েরা! মাথায় পর পর তিনটে—কোমরে একটা গাগরী নিয়ে অবলীলাক্রমে ছন্দবদ্ধ গতিতে তারা চলেছে গ্রামের পানে!

পাহাড়ের উপর হতে সপ্রু রোজ বৈকালে চেয়ে থাকে

...দের দিকে। দূরে উৎরায়ের নীচে তারা মিলিয়ে যায়—মিলিয়ে যায় তাদের গানের সুর!...ম্লান অপরাহ্ণে নিষ্প্রভ দিনের আলোয় সারা মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে আসে!...

ময়ূরের কেকাধ্বনিতে ভরে ওঠে প্রান্তরের বুক...একা সপ্রু বসে থাকে! পাহাড়ীর নীচে গ্রামে জলে ওঠে একটার পর একটা দেউটি!

কানাড়ি বস্তির নীচেই পাথরের বুক চিরে গড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু ধারায় ঝরণার জল! ভিড় জমে মেয়েদের ঐখানেই! হঠাৎ কাকে যেন তারা আসতে দেখে...একটু সচকিত হয়ে ওঠে!..."যোড়া পানি!"

মেয়েদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে যায়! "এ মুন্নি তুবো বালাতা হ্যায়!"

লজ্জায় মুন্নির মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠে!...তবু তৃষ্ণার্ত্ত সপ্রুকে গাগরী হতে জল ঢেলে দিল—সেই!

আঁজলা ভরে জল খেয়ে সপ্রু চেয়ে থাকে মুন্নীর দিকে! স্বাস্থ্য সৌন্দর্য...গঠন-সুষমা সব কিছুই যেন ভগবান তাকে হাত দিয়ে দিয়েছেন!...

মেয়েদের হাসাহাসি দেখে তার জ্ঞান ফিরে আসে! তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত হয়ে চলে আসে! কানে আসে পিছন দিক হতে হাসির টুকরো!...

একটা স্বপ্ন!...সলজ্জ একখানা মুখ...মধুর হাসি চোখের কামনা-বিলাসী দৃষ্টি...নিটোল স্বাস্থ্য সব...গাগরী হতে জল ঢালার শব্দ...সব কিছু মিলিয়ে সপ্রুর মনে যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি হয়েছিল ভুলতে পারে নি সে! অতীন্দ্রিয় মনকে ভরিয়ে রেখেছিল!

বুড়ো শেখ একটু বিস্মিত হয়ে যায়! কদিন হতেই দেখছে সপ্রুর একটা পরিবর্তন! নিবিষ্ট মনে কদিন ধরে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাটিয়ে চলেছে!

শাদা জব্বলপুরী পাথরটা কুঁদে চলেছে!...মুখে যেন তার অসীম আনন্দরেখা—চোখে কোন সুদূরের দৃষ্টি!!

বুড়ো শেখ এতদিন কাজ করে এসেছে—, নিছক পাথর-ব্যবসায়ীর বৃত্তি! পানদান—তোষা—পিয়ালা গড়েছে! বড় জোর নকল করেছে তাজমহল! জীবনে সেই তার সবচেয়ে বড় শিল্পের নিদর্শন! কিন্তু সপ্রুর কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে যায়!!

একি!! এ চোখ—এ হাত সে কোথা হতে পেল? সে তাকে এসব শেখাতে পারে নি! হয়ত খোদারই মর্জি।

সারা মূর্ত্তিটার মধ্যে ফুটে উঠেছে কোন এক রূপলাস্যময়ী নারী করুণার কমনীয়তা নিয়ে। দু চোখে তার স্নেহ—প্রীতি—প্রেমের স্পর্শ!...কি রূপ...!

কিন্তু বিস্মিত হয়ে যায় শেখ! একে সে দেখল কোথায়! এ যে হুবহু মুন্নি—শেঠ হরলালপ্রসাদের মেয়ে!! বিস্মিত বৃদ্ধ সপ্রুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে!

মুন্নি কদিন হতে নিয়মিতই দেখত সপ্রুকে পাহাড়ীর গায়ে, আর কিন্তু দেখতে পায় নি! মাঝে মাঝে মনের কোণে জাগত আশার আলো—হয়ত আজ দেখতে পাবে! কিন্তু বাড়ী ফিরতেই একদিন বাবার চীৎকার শুনে থমকে দাঁড়ায়! তার মাথা হতে গাগরী গুলো নিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়!

আর কোনদিন সে যদি ঝরণায় যায় তবে শেষই করে দেবে তাকে।

বাবার দুচোখে আগুনের শিখা!...তার জল আনতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল!

বেদনোর বড় ধনী শান্তাপ্রসাদ যেদিন কিনতে এল মূর্ত্তিটা—তার পর থেকেই যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল সপ্রুর উপর! হরলালের মেয়ের মূর্ত্তি গড়বে ওই লুচ্চাটা—আর তাই কিনে নিয়ে যাবে দুশ্চরিত্র পত্তনিদার শান্তাপ্রসাদ!! হরলালের খানদানে বাধে—তার বংশমর্য্যাদা ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে শিক্ষা দেবে ওই বুড়ো আর সপ্রুকে!!

বুড়ো মূর্ত্তিটা যে এত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে কেউ ভাবতেই পারেনি! সে সপ্রুকে না জানিয়েই বিক্রী করবার ব্যবস্থা করে...কিন্তু সব কিছু উল্টে গেল!

বস্তির বুকে রাত্রি নেমে এসেছে! কদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর সপ্রু একটু ঘুমিয়েছে—বুড়ো শেখ...আল-বোলার নলটা মুখে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবছে!...মাঝে মাঝে নীরবতা ভেদ করে রিজার্ভ ফরেষ্টের দিক হতে ভেসে আসে...দু একটা ময়ূরের কেকাধ্বনি!...

হঠাৎ...কাদের কোলাহলে সব ভেসে যায়!...ওকি!!

বিস্মিত হয়ে যায় বৃদ্ধ! সপ্রু চোখ মুছতে মুছতে ছুটে যায়—তাদের কারখানা ঘরে আগুন!!

শেঠ হরলাল দাঁড়িয়ে থেকে আগুন ধরিয়েছে! আগুনের মধ্যেই ঢুকে পড়ে সপ্রু—তার মূর্ত্তিটা!!…কিন্তু খুঁজে পায় না!

ঝলসে—আগুনের আঁচে আধপোড়া হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে…হরলাল প্রচণ্ড হাসি হাসছে!

তার আশে পাশে ছড়ান রয়েছে ভাঙা মূর্ত্তিটা! চুরমার হয়ে গেছে! কুড়োতে যাবে সপ্রু—তার ঘাড়টা ধরে সোজা করে তোলে…হরলাল!…"তার বংশ মর্য্যাদায় আঘাত করে তার জমিদারীতে বাস করতে পারবে না! কেন সে তার মেয়ের অপমান করেছে?"

অপমান করেছে—? সে—? ঠিক বুঝতেই পারে না, অপমানটা সে করল কোনখানে!! যাকে তার সাধনা দিয়ে সে দেবীর আসন দিতে চেয়েছিল—সম্মান করতে চেয়েছিল—এরা বলে অপমান!! তার সমস্ত সাধনা এদের অত্যাচারে এক মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেল?

আগুন নিভে গেছে!…চারিদিকে ছড়ান তার এতদিনের প্রচেষ্টা! এর চেয়ে তার মৃত্যুও ছিল ভালো!

…আরাবল্লীর ওপারে নতুন সূর্য্য ওঠে! সারা অন্ধকার মুছে যায়—নীরবে বসে থাকে স্বপ্ন-বিভোর হয়ে! কি কি সে করবে! বৃহত্তর জগতে কি তার শিল্প বাঁচতে পারবে না? সে কি তার একমুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে না? কি হবে এই অখ্যাত জঙ্গলে পড়ে থেকে!!

যাযাবর সপ্রু!…দক্ষিণ ভারতের অন্ত-প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়ায়! সারা মনে কোন্ দুর্বার নেশা! কি সে চায়—কেন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিকদিগন্তে সেই জানে না! মনমদ হতে চলেছে নিজাম স্টেট রেলওয়েতে!…বন্ধুর পার্বত্য পথ দিয়ে…আরও—আরও দূরে!

প্রায় বাহান্ন মাইল মোটরে গিয়ে তবে অজন্তা পর্বতগুহা!!

স্তম্ভিত হয়ে যায় সে! পর্বতের গুহাতে কোন অতীত যুগের শিল্পীর প্রাণঢালা সাধনা! রসে রঙে রূপে সজীব হয়ে রয়েছে আজও তাদের প্রচেষ্টা! মায়ের স্নেহ—বিলাসিনীর লাস্য—ধরিত্রীর কঠিন কঠোর রূপকে তুচ্ছ করে…নির্জন-পর্বত গাত্রে কালের প্রভাবজয়ী হয়ে বেঁচে রয়েছে!…

অন্ধকার হয়ে আসে!…জনহীন পর্বত-সানুদেশে এ যাযাবর সপ্রু! কোন্ মহাযাত্রাপথের যাত্রী সে! মুন্নি…তাকে আজ সে ভুলে গেছে!!

রাত্রি হয়ে আসে! আকাশ সীমায় তারার ঝিকিমি আংরাখা বিছিয়ে সারারাত্রিই কাটিয়ে দেয় সে স্বপ্নপুর রাজত্বে! মনের দুর্বার বেগ যেন আজ প্রকাশ পথ খুঁ পায়! তার শিল্প রূপ নেবে প্রাণে স্পন্দনে!…

কন্যাকুমারী ভারতের শেষ দক্ষিণ সীমান্ত। পাল ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছে গাড়ীখানা, তীর্থযাত্রী সপ্রু নিয়ে! নীল মেখলার মত সীমাহীন সমুদ্র!…সন্ধ্যা অন্ধকারে ঝকমক্ করে ঢেউ এর মাথায় শতমাণিক আভা!

লাল শঙ্খগুলো ঢেউএর তালে তালে নীল জলে ঘু বেড়ায়,…দিনান্তে রচনা করে সমুদ্র বালুচর—আর ভে যায় ঢেউএর আঘাতে বারে বারে!!

দক্ষিণ ভারতে সপ্রু সন্ধান পায় তার শিল্পী মনে প্রকাশপথ! আজও তার পথে প্রান্তরে মন্দির গাত্রে ও নটরাজের মূর্তি নয়—সারাবিশ্বের কোন মহাসৃষ্টি এ ধ্বংসের রূপায়ন করেছে প্রতিভাবান শিল্পী! গৌরী কমনীয়তা…সৌম্য সুহাস মূর্তি…শিল্পীর কল্পনাতে ফু উঠেছিল বহু আগে সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্য—প্রেম, প্রীতি রূপ নিয়ে!! সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ছন্দ, বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন গুণ, দোষকে রূপ দিয়েছে শিল্পীই তার সাধ দিয়ে—তার কল্পনা দিয়ে! জনসাধারণ বরণ করে নিয়ে তার কল্পনাকে—পূজা করেছে তার আদর্শকে!…

সেদিন সপ্রু যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়! তার মনে মধ্যে এতদিনের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়ে ওঠে! আ আবার ছিনি-হাতুড়ি ধরতে বসে যায়! দীর্ঘ তিনবৎ পর আবার কায করছে সে!!…সারা মনের চিন্ত গভীরতা তার ছিনির আঁচড়ে ফুটে ওঠে প্রতিটি রেখায়।

অম্বুনাথম্ মন্দির প্রাঙ্গণের সেই রাত্রির কথা ভুল পারেনি সপ্রু!…নর্তকী মহালক্ষীর নাচ দেখতে গিয়েছি …অস্পষ্ট আলোয় উন্মুক্ত চত্বরে নাচ হচ্ছে! সপ্রু স্তম্ভি হয়ে চেয়ে থাকে!…

ভারতনাট্যমের এক অধ্যায় নাচের মধ্য দিয়ে ফুটি তুলেছে নর্তকী!…"ভরর্নম"

প্রিয় তার এলনা!···ছয় ঋতু পর পর এলো গেলো—ন্ত এলো সৌন্দর্য্যের সমারোহ নিয়ে, বর্ষা এল মিলনের কুল বাসনা নিয়ে,—তবু সে এলোনা!! বিপ্রলব্ধা য়িকার সারা মুদ্রা—মূক অভিনয়ে···ছন্দমাধুর্য্যে দেহ-লিত্যে তার না বলা বাণী···ছড়িয়ে পড়ল দর্শকের মনে!

সপ্রু যেন স্বপ্ন দেখে!

সেও শিল্পী, যা তার মনে রেখাপাত করে সে আরও ন্দরতর ক'রে সেই রেখাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে শ্চয়ই পারে!···

মন্দিরের দেবদাসী আজ···সারা ভারতের মধ্যে ন্যতমা শ্রেষ্ঠ নর্তকী হতে আশা রাখে!··লোকটাকে নেনা, কিন্তু কোথায় যে একটা আগুন লুকোনো আছে র মনের মধ্যে এটা অস্বীকার করতে পারে না!···

মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকে মহালক্ষ্মী, মুখ চোখ···সব ছু ছাড়িয়ে তার মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে···কোন দাম নাচের ছন্দসুষমা—যার সন্ধান সে কোনদিনই পায় নিজের মধ্যে!!···

আজীবন দেখে এসেছে মহালক্ষ্মী মন্দিরের পূজারীদের বেহার—ধর্মের অন্তরালে কামনার পাশবিকতা!! প্রকাশ-থ সে খুঁজছিল, আজ যেন সে পেয়েছে সেই পথের সন্ধান!

শিল্পী মনের ছোঁয়া পেয়ে মহালক্ষ্মীর সারা মনের স্বপ্ত তিভার হয়েছে জাগরণ! ভারতের প্রত্যেকটি সহরে র নাম-সম্প্রদায় গড়ে তুলে সে বার হয়েছে রিভ্রমণে!···

নাচের পরিকল্পনা করে সপ্রু নিজে! ভঙ্গিমার রিকল্পনা করে ভাস্বর সপ্রু···রূপায়িত করে তোলে তাকে হালক্ষ্মী—তার দেহলাবণী দিয়ে তনুভঙ্গিমার রেখায় রেখায়!

জহুর সমুদ্র বেলায় রাত্রির নীরবতা ঘনিয়ে আসে! াকুটাস—নারিকেল বনের সীমান্ত পার হয়ে রূপালী লুরাশির বুকে উছলে পড়ে ঢেউএর রাশি···! যেন কান সুদূরের আহ্বান···! কদিন পর পর নাচের মহড়া য়ে ক্লান্ত হয়ে দুজনে তারা গেছে—সপ্রু আর হালক্ষ্মী!···

সারা পৃথিবী হতে মুছে গেছে সব! আছে মাত্র তারা জন! সমুদ্রের কল্লোল পারে কোন অতীন্দ্রিয় মনের প্ন-পরশ আজ শিল্পী মনকে অবশ করে তোলে! মহালক্ষ্মীর সারা মন পার হয়ে আজ নারীত্ব প্রকাশ-পথ খুঁজে পায়। চাঁদের আলোয় হারিয়ে ফেলে নিজেকে মহালক্ষ্মী! সে নারী···সারা মন আজ ব্যাকুল হয়ে ওঠে কোন মহত্তর সৃষ্টির উন্মাদনায়! সপ্রু কি সাড়া দেবে!

সপ্রু লক্ষ্য করেছে মহালক্ষ্মীর উন্মাদনা; নিশীথরাত্রের অন্ধকারে তার ক্ষণিকের স্মৃতি সারাজীবনকে বিষিয়ে দেবে! নারী শিল্পী হতে পারে—কিন্তু প্রাকৃতিক বাধা তাকে শতবাহু দিয়ে আঁকড়ে রাখতে চায়!

সে শিল্পী হয়ে আর একজন শিল্পীকে বাধা দেবে না তার সাধনায়! আর মহালক্ষ্মীর মধ্যে কোন আকর্ষণ সে পায় না! যা তার দেবার নেবার সবই ফুরিয়ে গেছে। তবু কেন এ প্রেমের অভিনয় শিল্পীর জীবনে!

মহালক্ষ্মীর উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করে সপ্রু তার গণ্ড দেশে! সারা শিরা-উপশিরায় কোন এক উন্মাদনা! নিবিড় নিথর রাত্রে জহু-বিচের বালু-বেলায় লেখা রইল তাদের জীবনের দুর্বলতার একটু ইতিহাস—মহাসিন্ধুর ঢেউএ তা মুছে যাবে সে জানে।

পরদিনই মহালক্ষ্মী যাত্রা করল সুদূর প্রাচ্যে তার নৃত্য-সম্প্রদায় নিয়ে—কিন্তু সঙ্গে সে পেল না সপ্রুকে। সে রাত্রি শেষেই সপ্রু চলে গেছে সম্প্রদায় ছেড়ে। কোথায় গেছে কেউ জানে না!

ওদের দুজনের পথ দুদিকে—মধ্যে ব্যবধান রচিত হল দুস্তর পারাবারের।

সে আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসর আগেকার কথা। সে সব যেন সপ্রুর মনে স্বপ্ন বলে বোধহয়! ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে এসে পড়ে আগ্রায় কোন এক রমণীয় প্রভাতে। টাঙ্গা করে ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশন হতে তাজের দিকে আসছে—দুদিকে নির্জন বনানী—এ্যাসফেলটামের রাস্তাটা দিয়ে ছুটে আসছে টাঙ্গাটা!···ঘোড়ার খুরের শব্দ, টাঙ্গা-ওয়ালার গজলের সুরে—প্রভাতের প্রথম আলো—সব কিছু মিলে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে তার মনে!

সেই থেকে সহরের বাইরে তাজগঞ্জ মহল্লার এক প্রান্তে রয়ে গেছে সপ্রু! জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে! সারাদিন সে···রচনা করে তার স্বপ্ন—রোজ রাত্রি নিশীথে আসে তাজে···! কেন আসে

জানে না—কিন্তু অনুভব করে কোন অশরীরী আত্মার দুর্বার আকর্ষণ—সে না এসে থাকতে পারে না।

চাঁদনী রাত্রে যমুনার দিকে মিনারের নীচে কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সপ্রু! এ সময় এখানে নারী কে এল?···নীচে যমুনার নদীগর্ভ—! নীল জলরেখা চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি তোলে···কার যেন কান্নার শব্দ! এগিয়ে যায় সপ্রু!!

"কোন হায়? রোতি কিঁউ?"

মেয়েটি মুখ নামিয়ে কাঁদে!···বিশাল মর্ম্মর চত্বরে একা সপ্রু আর মেয়েটি!···কি করবে ঠিক করতে পারে না—দ্বারোয়ানকে ডাকবে নাকি—?

পিছন ফিরেই দেখে মেয়েটি আর নাই সেখানে! কে জানে কোথায় মিশিয়ে গেছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর পায় না তাকে!

চিন্তিত মনে ফিরে আসে সপ্রু!

কাজ করতে যাবে—মাঝে মাঝে মনে হয় কে ওই নারী! তার কান্না মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না কেন?

সারা ভারতের—পশ্চিম পাঞ্জাবের বুকে চলেছে ধ্বংসের প্রলয় লীলা!···পুণ্য মৃত্তিকার বুক রঞ্জিত হয়ে গেল কাদের রক্তে! কোন এক প্রচণ্ড উন্মাদনায় ভরে গেল সারা ভারতের বুক!···একি সর্বনাশা আগুনের ছোঁয়া এল কেউ জানে না! যেখানে গড়ে উঠেছিল সাম্য প্রেমের মহান বাণী—মানুষের রক্তে সেই বেদীতল রঞ্জিত হয়ে উঠল! সপ্রু আজ ছিনি-হাতুড়ি ধরতে ভুলে গেছে! স্তম্ভিত হয়ে দেখে—কার চোখে নেমে এল সর্বনাশের কালো ছায়া।

আগ্রাও বাদ গেল না!···তাজের মিনার হতে দেখে সপ্রু নিশীথ রাত্রে···দয়াল বাগ—রাজা কি মণ্ডী···আরও ওদিকের দিগন্ত লাল হয়ে গেছে!!···কাদের কোলাহল—আর্তনাদের শব্দ রাতের বাতাস ভারি করে তোলে, তাজের নির্জন পাষাণ বেদীতল ভরে ওঠে তাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে!

একি!! হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ গুমরে ওঠে তাজের, অন্ত্যপ্রত্যন্তে!···তাড়াতাড়ি নেমে আসে সপ্রু!! সেই রাত্রের মেয়েটি কাঁদছে। কান্নার শব্দ গুমরে ফেরে রাতের তমসায়!!···

যমুনার দিকের চত্বরে···কাঁদছে সে! দুচোখে জলরেখা চোখে তার বেদনার রাশি! পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে চায়—সপ্রুর চোখে ভেসে ওঠে অসহায়া ক্রন্দনরতা নারী—বিশ্বের ব্যাকুল বেদনা তার চোখে।

—"কোন হায় তুম! রোতি কিঁউ?"

একি!! বিস্মিত হয়ে যায় সপ্রু!···নারীমূর্তি কোথা[illegible] মিলিয়ে গেছে!···আর দেখা যায় না!! কিন্তু কে [illegible] বুঝতে পারে আজ!···কে কাঁদে—কেন কাঁদে আজ [illegible] কারণ সপ্রুর কাছে আর অজানা নেই। কোলাহল[illegible] ভেসে আসছে—কাদের আর্তনাদ আজ ওই ক্রন্দনরত[illegible] নারীর কান্নার সুরে সুর মিলিয়েছে। সে রূপ দেবে [illegible] ব্যাকুল ক্রন্দনকে, সজীব করে রাখবে তার প্রতিভা দিয়ে।

কয়েকদিন বার হয়নি সপ্রু! দিনরাত্রি সে কা[illegible] করে চলেছে—আশে পাশে জমেছে পাথরের টুকরো—তী[illegible] ছেনির আঘাতে রূপ নেয় সেই অশরীরী নারী—যার কা[illegible] রূপায়িত হয়ে ওঠে মূক পাষাণের বুক ভেদ করে।

সারা ভারতের লাঞ্ছিতা কলা-লক্ষ্মী আজ তা[illegible] মানসপুত্রের কাছে আবেদন জানায়—প্রকাশ করো আমা[illegible] ব্যথা—প্রেম-সাম্যের বেলাভূমিতে আজ জন্তুর এ[illegible] তাণ্ডবলীলা তুমি প্রকাশ কর শিল্পী!

তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় সপ্রুর!···আবার ছেনি চালা[illegible] থাকে। রেখায়িত হয়ে ওঠে ক্রন্দনবিধুরা নারীর ব্যাকু[illegible] আবেদন!

ভোরের আলো ফুটবার আগে সারা মহল্লা কোলাহ[illegible] ভরে ওঠে—কারা চড়াও হয়েছে!! রাতের আঁধার রা[illegible] হয়ে ওঠে—আগুনের শিখায়! কাদের আর্তনাদ[illegible] কোলাহল ছাপিয়ে শোনা যায় রাইফেলের শব্দ—জনতা[illegible] যেদিকে পারে সরে পড়ে!

প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়···সপ্র[illegible] প্রাণহীন দেহটা পড়ে রয়েছে, পিঠে একটা গভীর ক্ষত![illegible] আশেপাশের বসতির অনেকেই পালিয়েছে! মিলিটা[illegible] পাহারায় রয়েছে সারা এলাকা।

ক্রন্দনরতা কলালক্ষ্মীর মূর্তি সে শেষ করে গেছে![illegible] আজ মূর্তিটা যেন সজীব হয়ে উঠেছে। চোখে মুখে তা[illegible] ব্যাকুল আবেদন!···নীচে শক্ত মাটিতে পড়ে রয়েছে সপ্র[illegible] প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা!! উন্মাদ কারা হত্যা করে গে[illegible] স্রষ্টাকে!

হিন্দু মুসলমান কোন জাতিরই অন্তর্গত সে ছিল না—সে ছিল শিল্পী—স্রষ্টা! তবু তার জন্মগত পরিচয়টা[illegible] উন্মাদের দল ক্ষমা করতে পারেনি!

... ...

মূর্তিটা আজও আছে তাজগঞ্জের ওপাশে। পশুশক্তি[illegible] কাছে কলালক্ষ্মী আজ বন্দীনী! অনেকে বলে আজ[illegible] তারা শুনতে পায় গভীর নিশীথ রাত্রে কার ক[illegible] ক্রন্দনধ্বনি! ওই মূর্তিটার আশে পাশে!!

তার বন্দীদশা কবে মুক্ত হবে কে জানে!!

স্কুল-কলেজের সময়

শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে আশা জাগিয়াছিল যে সোণার বাঙ্গলা বা সোণার ভারতে যাহা কিছু সোণার ছিল সকলই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যাঁহারা একটু চিন্তা করেন তাঁহারা জানিতেন যে 'সে রামও' হঠাৎ আসিবে না, সুতরাং 'সে অযোধ্যা'ও হঠাৎ গড়িয়া উঠিবে না। আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তর্দ্দেশিক, আন্তর্জ্জাতিক প্রভৃতি নানাবিধ বাস্তব ও কাল্পনিক পরিস্থিতি 'রাম-রাজ্যে'র পুনরাবির্ভাবের অন্তরায় হইবে। কিন্তু তাঁহারা এটুকু আশা করিয়াছিলেন—অন্ততঃ যে সকল প্রথা বা ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন দেশের কল্যাণার্থ অবশ্য কর্ত্তব্য, অথচ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বা বিনাব্যয়ে সাধ্য, সেগুলি দেশের লোক ইংরাজ চলিয়া যাওয়ার অল্পকাল পরেই ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু সে বিষয়েও হতাশ হইতে হইয়াছে।

কিঞ্চিন্ন্যূন দুইশত বৎসরের বৈদেশিক শাসনে বাঙ্গালীর জীবন নানা-প্রকারে নিপীড়িত হইয়াছে। তাহার ফলে পরিণত বয়সে যখন স্বাধীনতার মুখ দেখিলাম, তখন আমরা নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি। স্বাধীনতা আমাদের নষ্ট জীবনীশক্তি ফিরাইয়া দিতে পারে নাই, পারিবেও না। কিন্তু যাহাদের জীবন এই সবে আরম্ভ হইয়াছে—সেই শিশু, কিশোরদিগের জীবনীশক্তিকে অকারণ নিস্পেষিত না করিয়া তাহাকে রক্ষা করার এবং পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করার ব্যবস্থা সরকার ও দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা স্কুল কলেজে যায়, যাহারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল, খাদ্য সঙ্কটের দিনে তাহারা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত খাদ্য না পাইতে পারে, কিন্তু যেটুকু বা যে রকম খাদ্য পায় তাহা সুপরিপক্ক হইয়া রস, রক্ত, মাংস, মজ্জা প্রভৃতিতে স্পষ্টভাবে পরিণত হইতে পারে, তাহারা মানুষের মত দাঁড়াইবার সুযোগ পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা কেন হইবে না বুঝিতে পারি না।

যাহা কিছু ইহার পরিপন্থী তাহার মধ্যে স্কুল ও কলেজের সময় অগ্রগণ্য অথচ সহজে পরিবর্ত্তনীয়। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বৈদেশিক শাসক নিজেদের দেশের অভ্যাস অনুসারে এবং হয়ত ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে পঙ্গু করার গূঢ় উদ্দেশ্যে প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নের পরিবর্ত্তে মধ্যাহ্নে বিদ্যালয় ও অন্য সমস্ত কাজকর্ম্মের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী তদ্বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে অন্ততঃ প্রাথমিক (প্রাইমারি) শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে তাহাও মধ্যাহ্নে হইতেছে—ফলে শিশুকে একেবারে প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ অনুপযোগী স্বাস্থ্যহানিকর সময়ে বিদ্যালয়ে যাইতে ও থাকিতে হইতেছে। যেমন পরাধীনতা সাধারণ ভারতবাসীর সহিয়া গিয়াছিল, তেমনি মধ্যাহ্নে কাজ করাও সহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা আমাদের স্বাস্থ্য, শক্তি, আয়ুঃ কি ভাবে হ্রাস করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজ আসার ঠিক পূর্ব্বে নবাবী আমলে দরবার, আদালত, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা প্রভৃতির কাজ সমস্ত প্রাতঃকালে ও প্রয়োজন হইলে অপরাহ্ণেও হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল বাংলা দেশের স্কুল ও কলেজের কথাই বলা হইতেছে, কারণ তাহার পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ নহে।

প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের সুবিধা অসুবিধা নিম্নে দেখান হইয়াছে।

প্রাতঃকালিক ব্যবস্থা

১। স্বাধীন বাংলার ব্যবস্থা—যাহার ফলে যোদ্ধৃজাতি গঠিত হইয়াছিল—বাঙালী স্বাস্থ্যবান্, জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ হইয়াছিল।

২। ব্যায়াম ও সামরিক শিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষেও অতিশয় উপযোগী।

৩। শৈশব হইতে অতিহিতকর প্রাতরুত্থানের অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে—পঠন পাঠনের উৎকৃষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

৪। (ক) শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদিগকে রাত্রির বিশ্রামের পর নূতন উৎসাহে উদ্যমের সহিত কাজ করার প্রকৃষ্ট সুযোগ দেয়। সকালে ৩।৪ গৃহে ছাত্র পড়াইয়া শিক্ষককে অনেক সময় অতিশয় ক্লান্তভাবে ক্লাসে আসিয়া কাজ করিতে হয়।

(খ) শিক্ষক শিক্ষিকা কর্ত্তৃক উৎসাহের সহিত পাঠদান ও ছাত্রছাত্রী কর্ত্তৃক মনোনিবেশসহ পাঠগ্রহণ সম্ভবপর হয়—ফলে ক্লাসকক্ষের মধ্যে অনেক পরিমাণে পঠন বিষয় আয়ত্তীকরণ অবশ্যম্ভাবী।

(গ) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সর্ব্বোচ্চ তাপের সময় ও মধ্যাহ্নে ভোজনের পর যথোচিত বিশ্রামের অবসর দেয়। ফলে অপরাহ্ণে পুনরায় উৎসাহের সহিত লেখাপড়া করা এবং পরে খেলাধূলায় আনন্দের সহিত যোগ দেওয়া সম্ভবপর হয়।

এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ পল্লীঅঞ্চলে পিতামাতার সহিত একত্র আহারের সুযোগ সুবিধা হইয়া থাকে।

রবিবার ও ছুটীর দিন শিক্ষক শিক্ষিকারা কিরূপ অনুভব করেন তাহা ভাবিলেই দুই রকম সময়ে কাজের মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

(ঘ) যাহাদিগকে অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন তাহাদের জন্য অপরাহ্ণে অতিরিক্ত শিক্ষাদান (coaching class) সম্ভবপর।

৫। ইতিহাস সমিতি, বিজ্ঞান সংঘ, কারিগরি বা ব্যবসা শিক্ষা স্কাউট ও ব্রতচারী দল, মণি মেলা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠানে

কার্য্যের উপযোগী স্থান ও সময় পাওয়া যায়—ফলে ঐ গুলির প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর হয়।

৬। দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল তরুণদের স্বাস্থ্যের সম্যক্ গঠন বিষয়ে প্রকৃষ্ট ভাবে সহায়তা করে। যদি অন্ততঃ ১৭।১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে তাহাদের শরীর সুগঠিত হইবার সুযোগ পায়, পরে পরিণত ছাত্রজীবনে বা কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্নে কাজ করিতে হইলেও তাহারা তাহার কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হয়।

৭। বর্ত্তমান গৃহাভাবের দিনে বহু সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের জন্য বিদ্যালয় গৃহের অংশ অনায়াসে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ব্যবহৃত হইতে পারে।

মধ্যাহ্নিক ব্যবস্থা

১। বিদেশী শাসক কর্ত্তৃক নিজেদের অভ্যাস অনুসারে ও গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রবর্ত্তিত—ফলে দুইশত বৎসরের কম সময়েও বাঙ্গালী জাতি স্বাস্থ্য, নীতি ও আর্থিক অবস্থা বিষয়ে একেবারে দুর্ব্বল, পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

২। ব্যায়াম ও সামরিক শিক্ষার পক্ষে একেবারে অনুপযোগী; ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী নহে।

৩। বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও মধ্যাহ্নে হওয়ায়, শৈশব হইতেই বেলায় শয্যাত্যাগের কুঅভ্যাস গঠিত হওয়ার সহায়তা করে—ফলে পঠনপাঠনের পক্ষে উৎকৃষ্ট সময় অনেক নষ্ট নয়।

৪। (ক) সারাদিনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী আহারের পর শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীকে দৌড়িয়া আসিয়া অকালমরণ বরণ করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বলেন—"মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতি"—যে আহারের পর দৌড়ে যমরাজ তাহাকে ধরার জন্য তাহার পিছনে দৌড়ান।

(খ) ক্লান্ত, নিদ্রালু, শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্ত্তৃক অনাকর্ষক পাঠদান এবং ছাত্রছাত্রী কর্ত্তৃক আগ্রহ অভিনিবেশহীন পাঠ গ্রহণ—ফলে প্রথম দুই তিন ঘণ্টার পর ঘন ঘন ক্লাস ছাড়িয়া মলমূত্রত্যাগের স্থান প্রভৃতিতে যাওয়া অনিবার্য্য—নিজেদের অতীত বিদ্যালয়জীবনের দিকে তাকাইলে এ সকল কথা অনেকেরই মনে পড়িবে।

(গ) অপক্ক, অপ্রস্তুত খাদ্য কোনও রকমে গলাধঃকরণ করিয়া শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীকে দৌড়াইয়া বিদ্যালয়ে আসিতে হয়। অপরাহ্ণ খেলাধুলায় যোগদান কেবল বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে। কয়েকজন খেলাধুলাপ্রিয় নাম ও পদাকাঙ্ক্ষী ছাত্রছাত্রী ভিন্ন কেহই সারাদিনের ক্লান্তির পর উহাতে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত যোগ দেয় না।

(ঘ) এইরূপ ক্লাস সম্ভবপর নহে।

(ঙ) এই শাখাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃত কাজের অবসর পায় না, বিদ্যালয়ের কার্য্যতালিকায় নামমাত্র শোভা হইয়া থাকে।

(৬) শৈশব হইতেই তাহাদের স্বাস্থ্য এমন ভাবে নষ্ট হইতে আরম্ভ হয় যে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা অম্ল, অজীর্ণ, শূলব্যথা, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পতিত হয়।

(৭) মধ্যাহ্নে বিদ্যালয় চলিলে সেরূপ সুযোগ পাওয়া যায় না।

উপরে বর্ণিত চিত্র শতকরা ৮০টির অধিক সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়েই বিশেষ উন্নত অবস্থা দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ব্যতিক্রম সাধারণ শোচনীয় অবস্থার পোষক প্রমাণমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চপদস্থ নেতা বা সরকারী কর্ম্মচারীগণের এই শোচনীয় অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিতে পারে। কিন্তু যিনিই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট, তিনিই উপরিউক্ত বর্ণনা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

গত ৩৫ বৎসরের অধিককাল প্রাতঃকালিক শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। যতদূর মনে হয় এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন ভূতপূর্ব্ব জেলা ও দায়রা জজ মায়াতরু হালদার মহাশয়। তিনি মুন্সেফ থাকা অবস্থা হইতে বহু বিদ্যালয়ের সম্পাদক বা সভাপতি ছিলেন এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দুরবস্থা লক্ষ্য করতঃ সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সমর্থনও করেন। কিন্তু এই জাতিগঠনমূলক প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাহ্যই করেন নাই।

১৯৩৯ সালের ১৫ই আগষ্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় যে প্রেসনোট বাহির হয় তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর বিদ্যালয়ের সময় সম্বন্ধে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও হিতকর প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিদ্যালয়ের বড় ছুটী কমাইয়া তাহার কাজ করার দিনসংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং দৈনিক কাজ করার সময় ৫ হইতে ৪ ঘণ্টায় কমাইতে হইবে। তিনি মনে করেন যে বিদ্যালয়গুলি সকালে বেলা ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিবে। কেবল শীতের কয়মাস আরও একঘণ্টা পরে বসিবে ও বন্ধ হইবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে তিনি বলিতে চান যে এই (প্রাতঃকালিক) ব্যবস্থা দেশের চিরাচরিত প্রথার অনুকূল হইবে এবং ইহাতে ছাত্রছাত্রী তাহাদের গুরু আহারের পর বিশ্রামের ও অপরাহ্নে খেলাধুলা ও ব্যায়ামে যোগদান করিবার যথেষ্ট অবসর পাইবে। বিদ্যালয়সমূহও অন্য নানা কার্য্যের জন্য মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সময় পাইবে। প্রদেশের শিক্ষাবিদ্-গণকে এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অনুরোধ করি।"

শ্রীযুক্ত এ, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (আই এন-এর মেজর জেনারেল) ইংরাজ আমলে ১৯৩৮।৩৯ সালে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর থাকাকালীন এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। কেবল স্কুল কলেজের সময় নয়, অফিসের সময়ও পরিবর্ত্তন করার বিষয়ে তিনি প্রদেশব্যাপী অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন এ সংবাদ সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। কেহ কেহ বলেন যে ইহার ফলেই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার উপরিউক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ প্রস্তাব বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এমন কি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সমর্থন লাভ করিয়াছিল মনে হয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ আসিয়া পড়ায় ইহা অগ্রসর হয় নাই। জনাব ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রিসভাও এ বিষয়ে গুরুতরভাবে বিবেচনা করিতেছেন এরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শাসকসম্প্রদায়ের অনিচ্ছা জন্য এরূপ কোনও প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিত্বকালে

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন বিবেচনা সম্পর্কে যে প্রশ্নাবলী প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রাতঃকালীন শিক্ষা ব্যবস্থাও স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এযাবৎ কোনও ফল দেখা যায় নাই।

সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হওয়ায় আশা হয় যে উহার সদস্যগণ এই হিতকর ব্যবস্থা সত্বর প্রনয়ন করিবেন। উহার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ ইতোমধ্যেই বোর্ডের সদস্য ও অন্য শিক্ষাব্রতীদের বিবেচনা জন্য প্রাতঃকালিক শিক্ষাদানপ্রথা প্রবর্ত্তনের অনুকূলে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে গ্রীষ্মাবকাশ অনাবশ্যক বোধে বন্ধ করিলে এবং ছুটী কমাইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রাতঃকালীক ব্যবস্থায় স্কুলে পড়ানোর সময় কম না হইয়া বরং বেশী হইবে, তিনি কোনও কোনও মাসে যতটা কম ধরিয়াছেন তাহা অপেক্ষা দৈনিক আধঘণ্টা বাড়ান যাইতে পারে। তাহা হইলে পল্লী অঞ্চলে গ্রীষ্মাবকাশ কমাইয়া বর্ষাবকাশ দেওয়ার যে প্রথা আছে তাহা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে না। বর্ষার অসুবিধা জন্য ১০।১২ দিন স্কুল বন্ধ করিলেও স্কুলের কাজের সময় কমিয়া যাইবে না। শ্রীযুক্ত চন্দের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় এই প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে আলোচিত হইয়াছে। বোর্ডের সদস্যগণ সাহস করিয়া সভাপতি মহাশয়কে সমর্থন করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে স্কুলের কাজের ব্যবস্থা হইলে কোন্ সময় হওয়া উচিত বা সম্ভবপর তাহা নিয়ে বলা হইতেছে। শীতের তিন চার মাস ব্যতীত অন্য কয় মাস ৬।৩০ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত স্কুল করিলে কাহারও অসুবিধা হইবে না মনে হয়। কেবল নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সকাল ৭।৩০ হইতে ১১।৩০ পর্য্যন্ত স্কুলের কাজ চলিবে। মধ্যে খাওয়ার জন্য কিছু সময় দিতে হইবে। বর্ত্তমান টিফিনের সময় বাদ (শনিবার ভিন্ন অন্যদিন) প্রায় ৫ ঘণ্টা স্কুলের কাজ হয়। নূতন ব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে স্কুলের কাজ কিছু কম হইবে মনে হইলেও কাজের সুফলের তুলনায় সে ক্ষতি কিছুই নহে। আবার এই ক্ষতি পুরণ হইয়া যাইবে—যদি দীর্ঘ অবকাশ বা অন্য কতকগুলি ছুটী একেবারে বন্ধ করা বা কমাইয়া দেওয়া হয় এবং শনিবারে পুরা কাজ করা হয়। স্কুল প্রাতঃকালে হইলে গ্রীষ্মাবকাশ অনাবশ্যক এবং পূজাপার্ব্বণ, রমজান, খ্রীষ্টমাস প্রভৃতির ছুটী অনেক কমাইয়া দেওয়া যায়। শান্তিনিকেতন বা অন্য কোনও কোনও বিদ্যালয়ে কাহারও জন্ম বা মৃত্যুতিথি পালন জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হয় না। ক্লাসের সেইদিনের কাজ কিছু বন্ধ রাখিয়া ঐরূপ তিথি-পালন-অনুষ্ঠান সেখানেই করা হয়। ছুটী কমার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকারা যে ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ করিবেন তাহা তাঁহাদিগকে বৎসরের মধ্যে কয়েকদিন সবেতন ছুটী দিয়া পূরণ করা যাইতে পারে। এখন বেশীর ভাগ স্কুলে বৎসরে ১০।১২ দিন ভিন্ন পুরা বেতনের ছুটী নাই। সুতরাং যখন তখন অকারণ ছুটী পাওয়া অপেক্ষা অসুখ বা অন্য প্রয়োজনের সময় কয়েকদিন সবেতন ছুটী পাওয়া অনেকেই পছন্দ করিবেন মনে হয়।

পাঠ্যতালিকা হাল্কা হইলেও ৫ ঘণ্টা স্থলে ৪ ঘণ্টা স্কুল মোটেই ক্ষতিকর হইবে না। পাঠ্য বিষয় কমান বহু পূর্ব্বেই উচিত ছিল। এ বিষয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র বহুদিন আন্দোলন করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইংরাজী এত বেশী পাঠের প্রয়োজন কি আছে? নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত এত বেশী ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ান অনাবশ্যক। যদি ইহাকে পঠনযোগ্য বিষয় হিসাবে রাখিতেই হয়, তবে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধ এবং আমাদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসটুকুই যথেষ্ট মনে হয়। ভারত ইতিহাসের মধ্যেও বাংলার ইতিহাসের প্রাধান্যই যথেষ্ট। ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়েও পাঠ্যবিষয় হ্রাস করিবার প্রচুর অবসর আছে। এ বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যতদিন বড় বড় বই ও দুর্ব্বহ পাঠ্যতালিকার ভার ছাত্রছাত্রীর স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লওয়া না হইবে এবং তাহাদের পরীক্ষা-বিভীষিকা দূর করার ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন ব্যায়াম বা সামরিক শিক্ষায় তাহারা স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের সহিত কখনই যোগদান করিবে না এবং তাহাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যশ্রী কখনই ফিরিয়া আসিবে না।

স্কুলের বৎসর (School session) এর সময় পরিবর্ত্তন হইলেও বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যে সময় নষ্ট হয় তাহার অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্কুলের কাজের বৎসর। কিন্তু পূজার ছুটীর পর হইতে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে ক্লাসে আর পড়া হয় না। পুরাতন পাঠ আলোচনার নামে অনেক সময় অকারণ নষ্ট হয়। নিয়মিত ভাবে পুরাতন পড়া পুনরালোচনা হইবে এবং নূতন পড়া দেওয়ার সময় যাহা শিক্ষকের অনুপস্থিতি বা অন্য কারণে ছেলেরা বুঝিবার সুযোগ পায় নাই তাহা এই সময়ে পড়াইয়া দিলে সত্যই ছাত্রদের উপকার হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ স্কুলেই শিক্ষক বসিয়া থাকেন এবং ছাত্রছাত্রীকে মনে মনে পড়িতে বলা হয়। তাহারা অল্পই পড়ে, বেশীর ভাগ সময় নষ্ট করে। অনেকে বাড়ীতে পড়ার জন্য স্কুলেই আসে না। তাহাতে অধিকন্তু স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। পরীক্ষা দেওয়ার পরও একমাস অন্ততঃ তিন সপ্তাহ কোনও কাজ হয় না। ছেলেরা স্কুলেই আসে না। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া এবং পরে বই কেনার জন্য ঐ পরিমাণ সময়ই বৃথা যায়। যদি পূজার ছুটীর পর অর্থাৎ প্রায় নভেম্বর হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত স্কুলের বৎসর (School session) স্থির হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত ভাবে বৃথা সময় নষ্ট করা কমিয়া যাইবে। ছুটীর পূর্ব্বে পরীক্ষার সমস্ত কাজ হইয়া গেলে ছুটীর মধ্যে বই-কেনা আদি শেষ করিয়া ছুটীর পরই নূতন বৎসরের কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে। কর্ত্তৃপক্ষ যে বৎসর এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাহিবেন, সেই বৎসর Session দুই মাস আগাইয়া দিলে অল্পই অসুবিধা হইবে। সেই বৎসরের পাঠ্যবস্তু কিছু কম হইবে এই মাত্র।

নূতন নূতন শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত প্রশ্ন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে 'কাগজ দেখা'র জন্য পরীক্ষকদিগকে এত পরিশ্রম করিতে হয় না, স্কুলের এত সময়ও নষ্ট হয় না। 'পরীক্ষকের খেয়াল' বলিয়া যে বদনাম

মাছে তাহাও আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে দারুণ গরমের ধ্যে পরীক্ষকদিগকে প্রবেশিকার উত্তর পত্র দেখিতে হয়। অক্টোবর । নভেম্বর মাসে স্কুলের বৎসর শেষ হইলে জানুয়ারী মাসে স্কুল-ফাইনাল রীক্ষা হওয়া সম্ভবপর হইবে এবং উত্তরপত্র দেখাও মার্চ্চ মাসের মধ্যে শব হইয়া যাইবে।

স্কুল-ফাইনাল দেওয়ার পর হইতে কলেজের কাজ আরম্ভ হওয়ার র্ব্বে পর্য্যন্ত ছাত্রসমাজ দ্বারা গ্রামোন্নয়ন কাজ সম্ভবপর হইতে পারে। াহাতে একদিকে যেমন বয়স্ক শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি দ্বারা গ্রামের উপকার ইবে, তেমনি অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদিগের অতি উত্তম শিক্ষা হইবে, যে শিক্ষা াহাদের লেখাপড়া অপেক্ষা জীবনে অধিক কাজে লাগিবে। ভারতের কানও কোনও রাজ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বশ্ববিদ্যালয় এরূপ শিক্ষণের একটি সার্টিফিকেট কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার ময় অবশ্য-দেয় এই বিধান অনায়াসে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের সাময়িক অনুমতি লইয়া খড়্গপুরে বি. এন. আর স্কুলগুলিতে প্রাতঃকালিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। কালে বিদ্যালয়ের পরিচালনা এবং ঐ বিষয়ে অভিভাবকদিগের আলোচনার মধ্য দিয়া ঐ নূতন ব্যবস্থার ভালমন্দ বিবেচনার প্রকৃষ্ট যোগ হইয়াছিল। সেখানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রচুর! তখন এক হাইস্কুলেই প্রায় ১৪০০ ছাত্র ও ৫০ জন শিক্ষক ছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের কম বাঙালী। চিন্তাশীল ব্যক্তি আজকাল বিরল। ছেলেদের কিসে প্রকৃত ভাল হইবে একথা কয়জন ভাবেন? সুতরাং কোনও নূতন জিনিষ, যতই ভাল হউক, কেহ প্রথমে ভাল মনে করিতে পান না। খড়্গপুরে এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে স্কুলের বাহিরে শিক্ষাদান (Private tuition) এর অসুবিধা এবং অন্য কতক বাস্তব ও কতক কাল্পনিক আশঙ্কায় প্রাতঃকালীন ব্যবস্থা ভাল চোখে দেখেন নাই এবং অভিভাবকদের আন্দোলনের তলে তলে থাকিয়া বিরুদ্ধতা করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাঁহারা নিজেদের স্বাস্থ্য এবং ছেলেদের স্বাস্থ্য ও পড়াশুনা বিষয়ে এত উপকার বোধ করিলেন যে কি করিয়া পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইবে তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

অভিভাবকদের মধ্যেও মতভেদ হয়। যাঁরা কারখানায় কাজ করিতেন—যাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী—তাঁরা সকাল হইতে বেলা এগারটা ও আবার সাড়ে বারটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত কারখানায় বা সময়ে অন্যত্র কাজ করিতেন তাঁরা সকালের ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, এই ব্যবস্থায় ছেলেরা সকালের স্কুল সারিয়া তাঁহাদের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনের সুযোগ পাইয়াছিল এবং তাহাদিগকে সকালে আটকাইয়া রাখিবার জন্য আর গৃহশিক্ষকদের প্রয়োজন ছিল না। যাঁরা অফিসে—অর্থাৎ ১০টা-৫টায় কাজ করিতেন—বাঙ্গালীই বেশী— তাঁরা অনেকেই এই পরিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আপত্তির মধ্যে যেগুলি একেবারে বাজে তাহা বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য থাকে নীচের তিনটি মাত্র।

প্রথম—দিনের বেলায় যে সকল অভিভাবককে অফিস আদালতে যাইতে হয়, সকালে স্কুল হইলে তাঁহারা ছেলেদের সকালে দেখাশুনার সুযোগ পাইবেন না। বাংলা দেশে এরকম অভিভাবক কয় জন আছেন যাহারা নিজে ছেলেদের প্রকৃত দেখাশুনা করেন? ইচ্ছা থাকিলে তাঁহারা সন্ধ্যায় সে কাজ করিতে পারেন এবং অন্য অনেক প্রকারে ছেলেদের সাহায্য করিতে পারেন। সকাল-স্কুলের সুফলে যদি স্কুলের কাজ ঠিকমত হয়, বিকেলে দেখাশুনার বিশেষ প্রয়োজন থাকিবে মনে হয় না। সন্ধ্যাবেলাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়—গৃহকর্ত্রীরা মধ্যাহ্নের পর বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের সুযোগ পাইবেন না—ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া আহারাদির পর তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবে। তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমি সকল 'মা'কে স্থিরভাবে একথা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি, পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় গৃহ মধ্যে ধীরে ধীরে 'পিতৃশাসন'এর স্থলে 'মাতৃশাসন' প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমাদের দেশের ছেলেরা সেই শাসনের সুফল লাভ করিবে, শাসন বা গৃহশিক্ষা একদিন 'বিদ্যাসাগর' বা 'নেপোলিয়ন' তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছিল। খড়্গপুরে যে সকল 'মা' সকাল স্কুলের প্রতিবাদ লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে যে প্রশ্ন করিয়া বিদায় করিতে পারিয়াছিলাম, আজ বাংলার 'মা'য়েদের নিকট সেই প্রশ্নই করিতেছি—সন্তানপ্রাণ জননীর মধ্যে এমন কে আছেন যিনি ছেলেদিগকে সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য, তাহাদের অকালমরণ নিবারণ জন্য তাঁহার দুপুরের বিশ্রাম, খোসগল্প বা পাড়াবেড়ানো ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন? আর এই বিশ্রাম আদিতে মাত্র কয়েকদিন ব্যাঘাত হইবে; ছেলেরা মাতৃশাসনের শৃঙ্খলার মধ্যে আসিয়া গেলে তাঁহারা নিশ্চিত বিশ্রাম-আদির জন্য অবসর পাইবেন।

তৃতীয়—স্কুলের বাহিরে গৃহে অতিরিক্ত শিক্ষাদান জন্য শিক্ষক (Private tuitor) পাওয়া যাইবে না। কারণ, শুধু স্কুলের শিক্ষক কয়জন দ্বারা এই কাজ হয় না। বেশীর ভাগই শিক্ষাব্যবসায়ী নহেন, অফিসে বা অন্যত্র কাজ করেন, অতিরিক্ত আয় জন্য সকাল সন্ধ্যায় কখনও পাঁচ ছয়টি বিভিন্ন বাড়ীতে ছেলেদের পড়ান। সকালে স্কুল হইলে তাঁহারা মাত্র একবেলা এই সুযোগ পাইবেন। এই কেরাণী গৃহশিক্ষকরাই সকালে স্কুল হওয়ার বিরোধীদের অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহারাই অভিভাবকদিগের সমক্ষে প্রাতঃকালিক ব্যবস্থার নানা অসুবিধা চিত্রিত করিয়া দেখাইতেন। স্কুলে শিক্ষাদান সফল হইলে এবং অপরাহ্নে অতিরিক্ত শিক্ষাদানের (Coaching) ব্যবস্থা থাকিলে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন কেন হইবে বুঝি না। এই গৃহশিক্ষার (Private tuition) ব্যবস্থা বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম অভিশাপ। এই অভিশাপকে যদি আশীর্ব্বাদ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, সকাল সময় বাদ গেলেও বাংলাদেশের বর্ত্তমান বেকার সমস্যার মধ্যে অনুপযুক্ত, অর্দ্ধ-উপযুক্ত এরূপ গৃহশিক্ষকের অভাব হইবে না।

প্রাতঃকালিক ব্যবস্থায় উপরি উক্ত বা অন্যান্য অসুবিধা হওয়া সম্ভবপর ধরিয়া লইলেও, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সেগুলি ঐ ব্যবস্থার সুফলের তুলনায় নগণ্য এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেও যখন এপ্রিল ও মে

যে সকালে স্কুল হয় তখন যদি পরিবার বা সমাজের কোনও ক্ষতি বা পদ না হয়, বৎসরের বাকী কয়মাসেও একই ভাবে ঐ ব্যবস্থা চালাইতে রা যায়। কয়েকটী স্থানে ইতোমধ্যেই জনমত এই পরিবর্ত্তনের অনুকূলে ওয়ায় সেখানের স্কুল সকালে বসিতেছে—ইহা সুখের কথা, আশার কথা ন্দেহ নাই।

অফিসের সময় পরিবর্ত্তন জটিল সমস্যা হইতে পারে ; সে জন্য এখানে হার আলোচনা করিতে সাহসী হইলাম না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ভৃতি জিলায় এপ্রিল, মে, জুন এই গরমের তিনমাস আদালত অফিস-াদি সকালে বসে। জাতির স্বাস্থ্যের জন্য অন্ততঃ ঐ জিলাগুলিতে র মাস কেন ঐ ব্যবস্থা থাকিতে পারে না বুঝি না। কলিকাতার ফিসসমূহে পরিবর্ত্তনে অসুবিধা হইতে পারে। কারণ যাঁহারা অফিসে জ করেন তাঁহারা অনেকে দৈনিক ট্রেণে যাতায়াত করেন। কিন্তু ছা করিলে ইহার সমাধান হওয়া অসম্ভব না হইতেও পারে।

কলেজগুলিও অনায়াসে সকালে বসিতে পারে। আজকাল মফঃস্বলে লেজের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় মফঃস্বল হইতে অল্প ছাত্রই লিকাতার কলেজে যোগ দেওয়ার জন্য দৈনিক ট্রেণে যাতায়াত করে। বছাত্রীরা যাহাতে কলিকাতা না যাইয়া গ্রামাঞ্চলে শান্ত পরিবেশের ধ্য লেখাপড়া শেখে সেই উদ্দেশ্যে সরকার আজকাল মফঃস্বলের কলেজগুলিকে গড়িয়া তোলার জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং সকালে কলেজ হইলে বিশেষ অসুবিধা না হওয়ার কথা। বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেও অনেক কলেজ সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় পৃথক্‌ভাবে বসে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক্ অধ্যাপক এমন কি উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষও আছেন। এখনই যদি কোথাও কোথাও সকালে কলেজ চালান সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বরাবরের জন্য ঐ ব্যবস্থা কেন সম্ভবপর হইবে না বুঝি না।

যাহা হউক, যদি কলেজ, অফিস, আদালত প্রভৃতি সর্ব্বত্র এক সঙ্গে সময়ের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর না হয়, অন্ততঃ স্কুলগুলিতে পূর্ব্বকালের মত প্রাতঃকালিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনে আর একদিনের জন্যও বিলম্ব না করিয়া বাঙালী জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা সরকার, শিক্ষাবোর্ড ও সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি এই পরিবর্ত্তনের পথে স্থান-বিশেষে বিশেষ কোনও বাধা বা অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান স্থানীয় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষাবোর্ডের অনুমতি লইয়া নিশ্চিত করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাও যেমন তাহার দোষগুণ লইয়া একদিনে গড়িয়া উঠে নাই—তেমনি এ ভরসা করা অন্যায় হইবে না যে, প্রাতঃকালিক শিক্ষাদানের ন্যায় সুব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তন বাংলার ভাগ্য-বিধাতার কৃপায় নিশ্চিত অল্পকাল মধ্যে সাফল্যমণ্ডিত ও সুফলদায়ী হইবে।

গানের ডাক

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তোমায় আমি ডাক দিয়েছি
সারা জীবন গানে গানে
দ্বারে দ্বারে ঘর ফিরেছি
শুধিয়ে গেছি কানে কানে।
গান গেয়েছি ‘কোথায় তুমি’
সে কোন স্বর্গ সে কোন ভূমি
গানে আমার সেই বেদনার
বাণী তাহা কে না জানে।
কোথায় তুমি, তুমি কোথায়
এই মরতে সেই অমরায়
তীর্থ-পথের ধুলায় ধুলায়
তীর্থ-পথিক যায় যেখানে।

গোপন পথে খেয়াল মতে
গিয়েছিলাম অন্ধকারে
হায় রে আশা! হায় দুরাশা!
যায় কি পাওয়া সেথায় তারে।
অন্ধকারে ধ্রুব তারা
তারি দ্বারে দেয় পাহারা
রাত পোহানো ভোরের তারা
অন্ধকারের পরপারে।
পূব গগনের আগমনী
গেয়ে ওঠে ভোরের পাখী
অরুণ হল হায় অমনি
প্রভাত রাঙা স্বর্ণ মাখি

কণ্ঠে আমার আনন্দে প্রাণ
আকণ্ঠ গান ভরায় তানে।

মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত কয়েক বছর ধরেই মেদিনীপুর জেলার দীঘা জায়গাটির ওপর ভ্রমণকারীদের নজর পড়েছে। দীঘা মৌজাটি কাঁথি মহকুমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের তীরে। কলকাতা থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দূরে যে এমন সুদৃশ্য ও রমনীয় বেলাভূমি আছে তা হয়ত অনেকেরই জানবার সুযোগ হয়নি।

শোনা যায় ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি এ জায়গাটি খুব পছন্দ করতেন। সেই সময়ে বহু ভ্রমণকারী নানা কষ্ট স্বীকার ক'রেও এই সুন্দর জায়গাটি দেখতে যেতেন; যদিও রাস্তা খারাপ থাকার দরুণ দ্রুত যান বাহনের মোটেই সুবিধা ছিল না, এমন কি বর্ষাকালে দীঘায় পৌঁছান এখনো অসম্ভব।
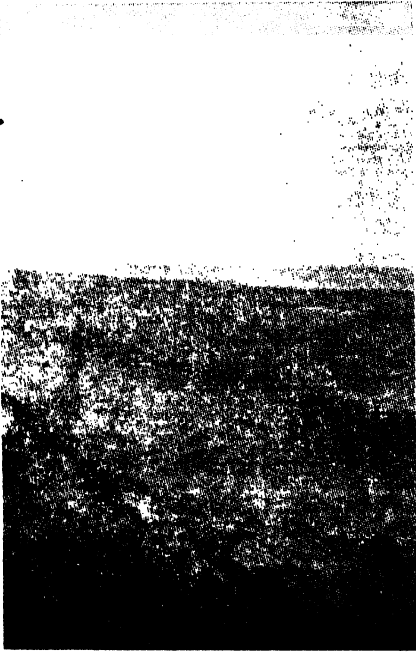
বেলা ভূমি—দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

যাই হোক পথের কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে একবার গিয়ে দীঘার সমুদ্র তীরে দাঁড়ালে সমস্ত কষ্ট স্বীকার সার্থক বলে মনে হয়। গ্রামের শ্যামলক্ষেত্র ও গ্রাম-প্রান্তের বালিয়াড়ির সারের পরেই সহসা চোখে পড়ে অপার সমুদ্রের নীল জলরাশি। বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে এসে সরোষে আছড়ে পড়ছে ক্ষিপ্ত ঢেউগুলি। সম্মুখে কল্লোলিত সবুজ সমুদ্র, আর দুধারে যতদূর চোখ যায় কাঁচা-সোনা রংএর অর্দ্ধ-বৃত্তাকার বেলাভূমি। বেলাভূমির প্রস্থ ভাঁটার সময় অন্ততঃ দুশ গজের কম নয়। দৈর্ঘ্যেও প্রায় পনের মাইল হবে। জোয়ারের সময় অবশ্য অনেকটা অংশ জলে ডুবে যায়। এত কি অথচ এত দীর্ঘ বেলা ভূমি সচরাচর চোখে পড়ে না। এখানকার বেলা বোম্বাই, করাচি বা পুরীর মত নয়, এখানকার একটী অদ্ভুত বৈ আছে। এর বালুস্তর নরম নয়, প্রায় আধুনিক কালের কংক্রিটের রা মতই কঠিন ও মসৃণ। সাইকেলে বা মোটরে চড়ে এর ওপর দিয়ে অ ভ্রমণ করা যায়। এমন কি অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিমানপোতও অনা এর ওপর নামতে পারে। প্রায়ই সৌখীন ভ্রমণকারীরা বিমানপোতে দীঘায় সমুদ্র স্নান করতে যান। বিখ্যাত বৈমানিক স্বর্গীয় ভব

সমুদ্রের ঢেউ।

মুখোপাধ্যায়ের শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা অনেকেরই হয়ত এখনো আছে। বহুকাল পূর্বেই তিনি দীঘায় যাতায়াত করতেন।

এখানকার সমুদ্র তরংগ পুরীর মত অতি বিক্ষুব্ধ এবং দুর্দান্ত নয়। দীঘার কাছে সমুদ্রোপকূল সঞ্চরণ-বিলাসী অর্থাৎ কোথাও তীর স'রে যায়, আবার কোথাও ভূখণ্ড গ্রাস করে এগিয়ে আসে। দীঘা-মৌজা নাকি এখন সমুদ্র-গর্ভে। শোনা যায় এখানে নাকি ডিগ সাহেবের বাংলা ছিল, সেটি এখন প্রায় দেড় মাইল দূরে সমু সমাধিস্থ হয়েছে। বর্তমান দীঘার কাছে গ্রামগুলিতে মাটির ভিতর

ঝিনুক পাওয়া যায় সেইজন্য গ্রামবাসীরা অনুমান করেন হয়ত বহুপূর্বে এই গ্রামগুলিও সমুদ্রগর্ভে ছিল। ক্রমশঃ ভূখণ্ড জেগে ওঠবার সংগে সংগে মানুষও বাস করতে শুরু করেছে।

কলকাতা থেকে রেলপথ কণ্টাইরোড ষ্টেশন হয়ে চলে গেছে! কণ্টাইরোড (স্থানীয় নাম বেলদা) থেকে কাঁথি সহর ছত্রিশ মাইল দূরে, বাসে ক'রে ঘণ্টা আড়াই তিন লাগে—বাস ভাড়া লাগে দুটাকা দুআনা। খড়্গপুর থেকেও বাসে ক'রে কাঁথিতে যাওয়া যায়—তাহলে আরো বিশ মাইল বাসে যেতে হয়। কাঁথির রাস্তা নবপরিকল্পনায় এ্যাসফাল্ট দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। বংকিমচন্দ্র কাঁথিতে থাকা কালেই কপালকুণ্ডলা রচনা করেন। ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে কাঁথির অধিবাসীদের কীর্তিকলাপ অবিস্মরণীয়।

কাঁথি থেকে বাইশ মাইল দূরে হল দীঘার অবস্থান। দীঘার তিন
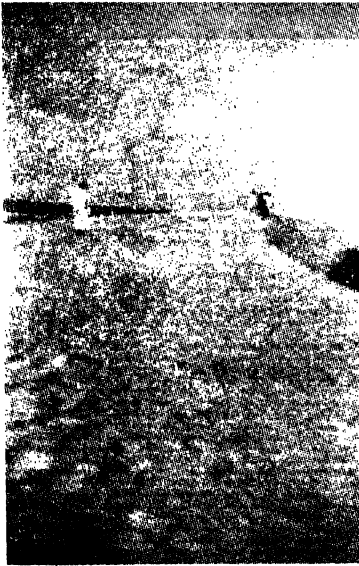
বালিয়াড়ি—বাঁ দিকে সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে

চার মাইল পরেই উড়িষ্যার প্রারম্ভ। দীঘার রাস্তারও বর্তমানে প্রভূত উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। রাস্তা তৈরি ও মেরামতের কাজ যে রকম দ্রুতবেগে এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনার সংগে করা হচ্ছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে অতি সহজে এবং বিনা ক্লেশে দীঘায় পৌছান যাবে। বর্তমানে কণ্টাইরোড থেকে দীঘা অবধি বাস যাত্রা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। বাসে চলতে চলতে মনে হয় যাত্রাশেষে শরীরের অংগপ্রত্যংগগুলি স্ব স্ব স্থানে থাকলে বাঁচি। বাস-চালকদের বাস-চালনার অদৃষ্টপূর্ব কৌশল এবং দুঃসাহসে মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চ হতে থাকে।

দীঘায় পৌছানর পর সমস্যা হচ্ছে বাসস্থানের। ঘর বাড়ী অতি অল্পই আছে। দুটি সরকারি বাংলো ও তিনচারটি ভদ্রলোকের নিজস্ব বাংলো আছে। সরকারি বাংলোর একটি হল বনবিভাগের ও অপরটি সেচ বিভাগের। বাংলো দুটিই সুন্দর এবং এক বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আধুনিক গৃহসজ্জার কোন অভাবই নেই। এ ছাড়া 'নাড়াজোলের রাজার' একটি মনোরম উদ্যানবাড়ী আছে—বিরাট এবং সুশোভিন অংগনের মধ্যে হালফ্যাসানের প্রাসাদ। অংগনের একধারে জলখেলা করবার জন্য আধুনিক বাঁধান পুকুর আছে। গৃহস্বামী নিজস্ব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও করেছেন।

আরো বাংলো বা হোটেলের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত হঠাৎ গিয়ে পড়লে ভ্রমণকারীদের অসুবিধায় পড়বার সম্ভাবনা খুবই।

বেলা-ভূমির পরেই গ্রামপ্রান্ত ধরে সমান্তরালভাবে চলে গেছে বালিয়াড়ি (বালির টিলা)। কতকগুলি বালিয়াড়ি খর্বকায় ঝোপজংগলে

বালিয়াড়ির ওপর থেকে স্লিপ খাওয়া

ঢাকা পড়ে তৃণশ্যামল হয়ে রয়েছে। আবার কতকগুলি কেবলই রুক্ষ বালির পাহাড়। প্রায় দুতলা আড়াই-তলার সমান উঁচু হবে। কোনটা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ষাট গজ, কোনটা বা একশ দেড়শ গজের অধিক।

বালিয়াড়ির ওপরের ভাগও বেশ চওড়া। কোন কোন বালিয়াড়ির আয়তন ও প্রসার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

বালিয়াড়ির পরেই ছোট গ্রাম। গ্রামগুলিতে লোক সংখ্যা অল্প থাকায় জন্য খাদ্যসামগ্রীও অপ্রচুর। তিনমাইলের মধ্যে হাট বা বাজার কিছুই নেই। তবে গ্রামে খোঁজ করলে আনাজ, দুধ, মাছ কিছু কিছু পাওয়া যায়। এখানে কুমড়ো, ঝিঙে, শশা, উচ্ছে, তিল প্রভৃতির চাষই বেশী। কাজুবাদামও ফলে খুব। গ্রামে জেলেদের বাসই অধিক।

দীঘার জেলে

বালিয়াড়ির ওপর থেকে গ্রামের দৃশ্য—

সমুদ্রের মাছত আছেই, গ্রামে পুকুরের মাছও পাওয়া যায়। বর্ষা বা শীতেই সমুদ্রের মাছ বেশী ধরা হয়। দীঘা থেকে মাইল দুই দূরে একটি ছোট নদীর মোহনা আছে, সেইখানেই জেলেদের ভীড়।

শীতকালে নানা জাতীয় পাখীর আমদানি হয়ে ভ্রমণকারী ও শিকারী উভয়ের কাছেই জায়গাটি মনোরম হয়ে ওঠে। দীঘা থেকে কয়েকমাইল দূরে জংগলের মধ্যেও অনেক শিকার পাওয়া যায়।
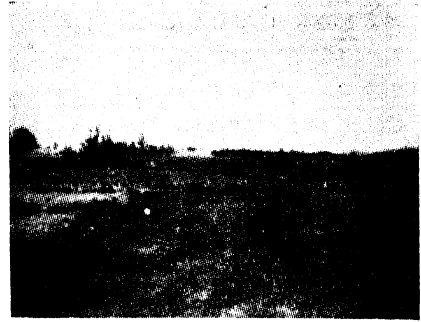
দীঘার অবস্থান ও আবহাওয়া দুইই উপভোগ্য। এখানকার শীত ও উত্তাপ কোনটাই কষ্টকর নয়। সুতরাং দীঘা জায়গাটির যদি কি উন্নতিসাধন করা যায় এবং যাতায়াতের সুবিধা ক'রে দেওয়া হয় তাহ ক্রমে এ জায়গাটি যে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হবে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবংগের দক্ষিণ ভাগ কয়েক শত মাইল সমুদ্রবেষ্টিত থাব সত্বেও আজও সমুদ্রোপকূলে কোন স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে ওঠেনি এটা বড় আশ্চর্যের বিষয়। দীঘার উন্নতিসাধন করা হলে জায়গাটি পশ্চি বংগের একটি দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠবে একথা বলা বাহুল্য এ স্বাস্থ্যান্বেষী ও ভ্রমণকারীদের গতিবিধির প্রাচুর্যের সংগে সংগে কাঁ মহকুমার অধিবাসীদেরও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হবার সম্ভাবনা সমধিক

সনেট

আশা দেবী

নেমে আসে কুহূ রাত্রি চন্দ্রহীন বিষণ্ণ গম্ভীর
রাশি রাশি কৃষ্ণ মেঘ সঞ্চরিছে নিঃশব্দ চরণ
মৃত্যুর কালিমা মাথে নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ নদীতীর,
দিনের রাধিকা কোন্ ঘন শ্যামে করিল বরণ।
রুষ্ট নেত্র ফেলি চায় দিকে দিকে মৌন তাল বীথি
অকস্মাৎ পত্রপুঞ্জে উচ্চকিত আহত মর্ম্মর—
শস্যহীন প্রান্তরেতে রিক্ততার নিঃশব্দ আহুতি,
অরণ্যের শীর্ষপারে ঝড়ো-হাওয়া মূর্চ্ছিত-মন্থর।
যে আকাশে জেলেছিনু প্রত্যাশার তারা দীপগুলি—
মেলেছি প্রার্থনা শত সপ্তর্ষির আশিস্-সম্ভব
আজ সেথা বজ্রবাহি অমারাত্রি উঠিছে আকুলি—
শূন্যের শ্মশানে বুঝি সপ্ত ঋষি হয়ে গেছে শব।

জীবনের সাথে মোর থাক তবু অন্ধ দ্যূতক্রীড়া—
ভরিয়া করোটি-পাত্র করি পান রাত্রির মদিরা॥

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

চণ্ডীমণ্ডপে নিয়মিত পাশার আড্ডা বসিয়াছে—মতিঠাকুর আজ আসেন নাই, দিগরগ্রামে কি একটা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আছে, সশিষ্য তিনি সেখানে গিয়াছেন,—সারদা পাঁচু প্রভৃতি খেলিতে বসিয়াছেন। পাঁচু কহিল—সারদা, ঐ লোকনাথের ভাই মেলা থেকে একটা পিদিম এনেছে তা ঝড়ে নেভে না। সুন্দর জিনিষ, তবে রেড়ির তেলে জ্বলে না, কেরাচিন না কি তেল দিয়ে জ্বালাতে হয়—

সারদা কহিল—কি রকম? চুবড়ীর মাঝে পিদিম বসিয়ে নিয়েই ত আমরা ঝড়ে আম কুড়াই। সেটা আবার কি রকম?

—না গো না, সে ও রকমই নয়, পিতলের চারকোণা একটা খাঁচার মাঝে কাঁচ দেওয়া, নীচে পিদীম, হাওয়া ঢুকতেই পাবে না, তা নিভবে কি ক'রে?

—আলোচনাটা ধীরে ধীরে গুরুত্ব লাভ করিল—ভগবতী কহিলেন—হ্যাঁ, লণ্ঠন আলো শুনেছি বটে, পাঁচু যাও'না নিয়ে এস, জ্বালিয়ে দেখা যাক—

সারদা কহিল—ঝড়ে যদি না নেভে তা হ'লে ত আম কুড়োবার বেশ মজাটি হয়। তা হ'লে আর আম কুড়োতে দিচ্ছি না কাউকে—সব আম কুড়িয়ে নিয়ে আসবো—

পাঁচু গিয়াছে লণ্ঠনটা আনিতে, কেমন দেখিবার জন্য।

ভগবতী কহিলেন—তুমি ত কেবল আম কুড়োবার কথা ভাবছো, আঁধার রাতে যাতায়াত করা, তা ছাড়া বিয়ে পৈতে ব্যাপারে কত সুবিধে হয়।

কিরূপ সে আলোটি তাহা দেখিবার জন্য সকলেই সাগ্রহে বসিয়া আছেন—আলোচনায় জিনিষটি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, এমন সময় প্রশ্ন উঠিল—আলো না হয় মেলা হইতে আনা যাইতে পারে, কিন্তু কেরাচিন পাওয়া যায় কোথায়।

সারদা কহিল—হ্যাঁ হ'য়েছে, ঐ আমদপুরের হাটে কেরাচিন বিক্রি হ'তে দেখিছি—ও লাল মত রং পাতলা, একটা কেমন যেন গন্ধ নিমতেলের চেয়েও উগ্র—

লোকনাথ লণ্ঠন লইয়া উপস্থিত হইলেন—সারদা হাতে করিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন—জ্বালাও—জ্বালাও দেখি ঝড়ে টেঁকে কিনা?

লোকনাথ কহিল—ঝড় কোথায় যে দেখবে? তবে নেভে না একথা সত্যি—

সারদা কহিল—রাখো, ঝড় আমি তৈরী করে দিচ্ছি মন্তর দিয়ে, পরীক্ষেটা হাতে হাতে—

ভগবতী পরিহাস করিলেন—তুমি পরিসাধন আরম্ভ করেছ নাকি?

—হ্যাঁ খুড়ো, আমার বহু সাধন আছে।

যাহা হউক চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরান হই এবং তাহা হইতে গন্ধকের কাঠি জ্বলিল এবং লণ্ঠন ধরা হইল। লণ্ঠন বেশ জ্বলিতেছে, আলো কতটুকু হইতো তাহা বোঝা যায় না, কারণ তখনও অপরাহ্ণের রৌ নিষ্প্রভ হয় নাই।

সারদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—দাও ত আলো ঝড়ে নেভে কিনা দেখে আসি—

লোকনাথ কহিল—ঝড় কোথা?

—দাও না দেখাচ্ছি—সারদা আলোটা হাতে করি লইয়া ধরিবার স্থানটি ভাল করিয়া ধরিয়া কহিলেন—ব এল ঝড় এল, দেখো তোমরা ঝড় এলো—

হঠাৎ সারদা লণ্ঠন লইয়া ভোঁ দৌড় দিলেন—চণ্ডীমণ্ডপে পাশের রাস্তা দিয়া রসিখানেক এক দৌড়ে গেলেন এ আর এক দৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন—আলো তখন জ্বলিতেছে—আশ্চর্য্য—

সারদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন—নিবু নি হ'য়েছিল তবে একেবারে নেভে নাই। আলো উঁচুতে উঠাইয়া কহিলেন—আ রামচন্দ্র, এ কালির ভূত হ'য়েছে—এতে আর কি আ থাকবে?

লোকনাথ তাহার আদরের আলোটির সম্মানহা হইতেছে দেখিয়া কহিলেন—ওই বুঝি ঝড়—

—ঝড় নয় ত কি ? ঝড়ে বাতাস চলে, আর এতে য় আমি চ'ললাম—এই ত তফাৎ—

সারদা মল্লিকের উপস্থিতবুদ্ধি দেখিয়া ভগবতী প্রশংসা করিলেন—সারদার কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি আছে, কেমন ঝড়ের বেগটা দেখিয়ে দিলে—

সারদা কহিল—বুদ্ধি ত ছিল তা আমিও জানি, কিন্তু ব্যাপারটি জানো—তোমার খুড়ির বুদ্ধির সঙ্গে হার মেনে গেলুম—

—কি রকম ?

—আমি এ হেন সারদা মল্লিক, দশ গ্রামের লোক যাকে জানে—কিন্তু খুড়ির কাছে একেবারে কেঁচো—

—কেন ?

—ও রে বাবা, সে রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখলে আগেই আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া—

—কি রকম ঘটনাটা বলই না—

সেদিন খেতে বসে বলেছি—তরকারীতে নুণ একটু কম হ'য়েছে। তা তিনি ব'ললেন—জন্ম গেল রাঁধতে আজ নুণ কম হ'য়েছে, বুড়ো কালে আমাকে রাঁধা শিখতে হবে ? আমি বললাম—তা নয়, হয়ত ভুলে—কেন ভুল হবে কেন ? অত ভুল আমাদের হয় না, সে হয় তোমার মত মিন্‌ষেদের, যারা বাউরী কুর্ম্মী পাড়ায় কামিন খুজ্‌তে যায়। আমি বললুম—ধর ভুলে, অন্য কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে যদি একটু কম হয়ে থাকে।—তার মানে আমি রাঁধতে রাঁধতে অন্যের কথা চিন্তা করি। রাঁধতে রাঁধতে আমি পরপুরুষের কথা চিন্তা করি। এই বুড়ো কালে আমার ছেলে চণ্ডীর বয়স হল চৌদ্দ, আমি আজ পরপুরুষের কথা ভাবি, আমায় অসতী নাম দিলে রে এই বুড়ো কালে—ঐ অলপ্পেয়ে মিন্‌ষে কি বললে রে—এ—এ—

সারদা মল্লিক স্ত্রীকণ্ঠ অনুকরণ করিয়া ভেঁউ ভেঁউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—থামো সারদা কেঁদো না—আহা—হা—তারপর কি হ'ল—

সারদা তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে আমার কি হ'লরে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমায় অসতী বল্‌লে রে ?

বনলতা ছুটিয়া আসিয়া শাশুড়ীকে খবর দিল—মা চণ্ডীমণ্ডপে সব কাঁদছে। বড়বৌ ছুটিয়া গিয়া জানালা ফাঁক করিয়া দেখিলেন—সারদা মল্লিক কাঁদিতেছে, আর সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—

বনলতা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঠের মত দাঁড়াইয়াছিল ; শাশুড়ী কহিলেন—কিছু না বৌমা, সারদা মল্লিক কি যেন একটা রঙ্গ ক'রছে—দেখে এসো—

বনলতা জানালার ফাঁকে দেখিল—সব হাসিতেছে শুধু সারদা কাঁদিতেছেন। সেও বুঝিল, এটা একটা রঙ্গ—সে শুনিয়াছে এই রকম রঙ্গ করিয়াই সারদা মল্লিক গ্রামটাকে সর্ব্বদা সরগরম রাখে। বনলতা একটু দেখিয়া চলিয়া গেল—

হঠাৎ সারদা চুপ্ করিয়া কহিলেন—তারপর আমি দণ্ডবৎ করে নাকে খত দিয়ে বললুম—দোহাই তোমায়, নুণ ঠিক হ'য়েছে—সুন্দর হয়েছে, আর একটু দাও ত বেশ লাগ্‌ছে—

সকলেই জানিত সারদার স্ত্রী অত্যন্ত ভালমানুষ, তাহার মুখে কোনদিন কেহ কঠোর কথা শুনে নাই। এবং সারদা অনেক সময় অন্য-উদ্দেশ্যে তাহার স্ত্রীকে লইয়া এইরূপ গল্প করিয়া থাকে।

লোকনাথ হঠাৎ উঠিয়া কহিলেন—দাও, আলো দাও আমার, অসভ্যটা কোথাকার, সারদা তুমি এমনি অপমান করবে না বলছি—

লোকনাথ রাগিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি, লোকনাথ চট্‌লে কেন ?

সারদা কহিল—সেদিন দেখি লোকনাথদার সঙ্গে বৌঠানের বেঁধেছে আর বৌঠান অমনি ক'রে কাঁদছে—আর দাদা আমার বৌঠানের পায়ে দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে আছেন।

কথাটা যে লোকনাথের উদ্দেশ্যে এবং তাহাকে রাগাইবার জন্যই হইয়াছে সকলে তাহা বুঝিয়া পুনরায় আর একবার হাসিয়া উঠিল—

তখন অপরাহ্নের রৌদ্র অদূরে আম্র-বৃক্ষের মাথায় উঠিয়াছে—একখানা শুকনা ডালে নীলকণ্ঠপাখী ডিগবাজী খাইতেছে—কাকের পিছনে কতকগুলি ফিঙ্গে লাগিয়াছে। আজকার মত চণ্ডীমণ্ডপের আসর ভঙ্গ হইল—

সারদা পাঁচু প্রভৃতি কয়েকজন ফিরিতেছিলেন, পথে দেখিলেন, একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক কাহার বাড়ীতে

তত্ত্ব লইয়া যাইতেছে। তাহারা প্রশ্ন করিল—হরিপদ চাটুয্যের বাড়ী কোন্‌টা ?

—কোথা থেকে আস্‌ছ তোমরা—

—ময়নাডাল থেকে ? মুখুজ্যেমশায় পাঠিয়েছেন ?

—ও বৌমার বাপের বাড়ীর তত্ত্ব, বেশ বেশ। এস—

সারদা সাদরে তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। পাঁচু একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—কি খুড়ো কি ?

—এস এস খুড়ো, বৌমার বাপের বাড়ী থেকে শীতের তত্ত্ব এসেছে, মিষ্টিমুখ করে যাও—

পাঁচু বুঝিলেন—সারদার মাথায় পুনরায় দুষ্টুবুদ্ধি চাপিয়াছে। পাঁচু দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সারদা কহিল—যাও ভগবতী খুড়োদের যাদের পাও ডেকে আনো—

পাঁচু প্রস্থান করিল, সারদা কহিলেন—তা তোমরা আজ থাক্‌বে ত ? না কি ফিরে যাবে ? তোমার নাম কি গো বেটি ?

—না, হুজুর ফিরে যাবো, এখনত বেলা আছে। নাম মোহিনী—

—তা বিদেয় নিয়ে যাও। মোহিনী, তোমার বেটার নাম কি ?

সারদা তাহাদিগকে দুইসের চাউল ও দুই আনার পয়সা দিয়া কহিলেন—তা ব'লো, বৌমা ভালই আছেন। বৌমা ত গেছেন গা ধুতে, আস্‌তে দেরী হবে—

—তা হুজুর আমরা চল্লুম—বাড়ীর সব ভালই আছেন।

—বেশ বেশ—

লোক দুইটি চলিয়া গেল—সারদা পাত্রটি খুলিয়া দেখিলেন—একখানা শাড়ী, একখানা ধুতি ও একখানা মোটা চাদর শীতের জন্য। প্রচুর নাড়ু ও অন্যান্য মিষ্টান্ন—

পাঁচুরা কয়েকজন ফিরিয়া আসিলেন। সারদা কহিল—এস এস, সব মিষ্টি মুখ কর !

সকলে হৈ হৈ করিয়া মিষ্টান্ন প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল, —সারদা কহিল থাক্—হরিপদর বৌমার জন্যে দুচারখানা রাখ্‌তে হবে ত ?

—হ্যাঁ, তা না হয় রাখলে, কিন্তু এখন কে দিতে যাবে ! —কাপড় দু'খানা ত দিতে হবে—

—কেন—আমি যাবো। ভাবনা কি ? হরিপদর বৌ আবার লজ্জাবতী, আমাকে দেখ্‌লে এক গলা ঘোমটা দেয়। তাকেও দেখে আসি—তোমরা দাঁড়াও—

সারদা তাড়াতাড়ি একখানা শাড়ী পরিয়া একগলা ঘোমটা দিয়া চুপড়ী মাথায় চলিলেন। পাঁচুরা কয়েকজন পিছন পিছন চলিলেন তামাসা দেখিতে। সারদা হরিপদর বাড়ীতে সরাসর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দেউড়িতে বসিয়া পড়িলেন। হরিপদর পুত্রবধূ ঘর ঝাঁট্‌ দিতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কেগো ? কোথা থেকে এসেছ—

সারদা স্ত্রীকণ্ঠ অনুকরণ করিয়া কহিলেন—আমি মোহিনী, ময়নাডাল থেকে এসেছি, মুখুজ্জেমশায় পাঠিয়েছেন—

হরিপদর পুত্রবধূর বয়স এই পনর ষোল হইবে। বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছে জানিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—বাবা কেমন ? মা কেমন আছেন ?

—ভাল গো, ভাল,—মাঘ মাসেই তোমাকে ঘর নিয়ে যাবে—

বধূটি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল—এবং 'বস' বলিয়া চলিয়া গেল। সে আনন্দে শ্বাশুড়ীকে যাইয়া সংবাদ দিল—মা, বাবা তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

হরিপদর স্ত্রী আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি পাঠিয়েছেন বেয়াই—

—ওই ত হোতা আছে—

হরিপদর স্ত্রী তত্ত্বের জিনিষগুলি দেখিতে দেখিতে কহিলেন—ওমা এ কটা মিষ্টি আমি কার মুখে দেব। পাঠালে দুটো বেশী করে পাঠাতে হয় ! তা তুমি বাপু মেয়েমানুষ, একগলা ঘোমটা দিয়ে কেন ?

সারদা কহিলেন—ময়নাডালের মেয়েরা ঘোমটা দিয়েই ভিনগাঁয়ে যায়—ঘোমটা দিয়েই ফিরে আসে—মিষ্টি নিয়ে যায়—বিদেয় নিয়ে আসে—

বধূটি ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল—ও মা, ওর যে গোঁফ দেখা যাচ্ছে—

শ্বাশুড়ী মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিলেন—কে গা তুমি বটে—এই কটা মিষ্টি নিয়ে এসেছ—

সারদা ঘোমটা ফেলিয়া কহিলেন—আমি সারদা বটে। মিষ্টি পাড়ায় দিতে হবে না বৌঠান, আমরা খেয়েছি—

হরিপদর স্ত্রী ঘোমটা টানিয়া কহিলেন—রামচন্দ্র—

সারদা শাড়ী গোটাইয়া লইয়া সদর রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। রাস্তায় সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল—কি হ'ল সারদা—কি হ'ল—

সারদা ততক্ষণে নির্বিঘ্নে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

এমনি করিয়া চলে দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন। গোপালপুর যেন একটা বৃহৎ পরিবার, ভগবতী তাহার যেন কর্তা, সারদা বিদূষক। সকলে আপন আপন কাজ করিয়া শাকান্ন সংগ্রহ করে, কেহ গানে, কেহ খেলায়, কেহ কীর্ত্তনে অবসর বিনোদন করে, তাহার মাঝে প্রতিবেশীদের লইয়া চলে হাস্য পরিহাস—নিষ্কলুষ সুবিমল আনন্দের স্রোত—সিপাহীদের যুদ্ধের সংবাদ, জয় পরাজয়ের সংবাদ, হাটের মারফতে লোকমুখে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হয়।

সকলেই সকলের উপর নির্ভর করিয়া পরম আনন্দে চলে তাহারা যুগ যুগান্তর—এই দীর্ঘ যাত্রা তাহাদের বংশপরম্পরায়,—বহু পুরাতন আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা—

পৃথিবীর আবর্ত্তন চলে—আসে রাত্রি, আবার দিন—

আতুরীকে আর একটা কথা বলিবার জন্য ভরতের মনটা ছটফট করিতেছিল—একবার সে শেষ কথাটা তাহার নিকট শুনিয়া লইয়া তাহার পরে ভিনগাঁয়ে সাঙ্গার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আতুরীকে সে কখনও একা পায় না। সোহাগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল—আতুরী সেদিন গিয়াছে মনিব-বাড়ীতে ধান ভানিতে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আসিবে—

ভরত গরুগুলি মাঠ হইতে আনিয়া চণ্ডীতলায় স্বল্প পরিসর মাঠে চরিতে দিয়া বসিয়াছিল—আতুরী এই পথেই ফিরিবে। ভরত বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং যে কথাটা বলিবে তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে ঠিক করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, আকাশে বিরাট একখানা চাঁদ উঠিয়াছে, উত্তর হইতে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করে, ভরত তবুও বসিয়া রহিল—হাঁ আতুরী এতক্ষণে আসিতেছে, কাঁচড়ে চাল লইয়া দ্রুত পদক্ষেপে আসিতেছে। ভরত ডাকিল—আতুরী তু শোন—

আতুরী একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—বল্ না—রাত হতে লেগেছে

তু সাঙ্গা করবি না—

—না তোকে করবো না—কতবার ত বল্‌তে লেগেছি, তু ছাড়্।

ভরত কহিল—তু সাঙ্গা কর, পৈচে, তাবিজ আর এক কুড়ি টাকা যতুক দেবেক, মোর ঘরকে চল—

আতুরী একটু হাসিল—ভরতের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া একটু করুণার স্বরে কহিল—মু ত পৈচে তাবিজ আর টাকাকে সাঙ্গা করবেক না, সাঙ্গা ক'রবেক মনের মনিষকে—মনের মনিষ তু হ'তে পারবি—

—কেনে নারবো—

—মোর মন ত নারবেক—

আতুরী বিলম্ব না করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। ভরত দুঃখিত হইয়াছিল—কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে গরুগুলি লইয়া তাহাকে যাইতেই হইবে। সে আনমনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া গরুগুলি গোহালে তুলিল। ছেলেটা দুপুরের ভাত লইয়া বসিল—নিমতেলের প্রদীপ জ্বালাইয়া। ভরত উঠানে একটা খাটিয়া পাতিয়া পচাই পান করিতে লাগিল। বুকখানা তাহার আজ ফাটিয়া যাইতেছে—সে ভাবিয়াছিল দুইটি গরু বিক্রয় করিয়া সে পৈচে তাবিজ গড়াইয়া দিবে, আতুরী তাহার ঘরে আসিবে—কিন্তু তাহাতেও রাজি হইল না। এ যে কত বড় ত্যাগ তাহা আতুরী বুঝিল না—

শুভ্র চাঁদ, মধ্যাকাশে দীপ্তি পাইতেছে, দূরের শালবন নীল রেখার মত আকাশের পটে আঁকা—ভরতের দুঃখ নেশার ঘোরে যেন আরও উত্তেজনা লাভ করিতেছে—সে বসিয়া অগোচরে কাঁদিতে লাগিল—হয়ত এমনি করিয়া আদিম মানব প্রকাশের ব্যাকুলতায় কাঁদিয়া মরিয়াছে, গিরিগাত্রে নারীমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছে, বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া প্রথম সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করিয়াছে—পৃথিবীর বুকে রাখিয়া গিয়াছে তাহার অতৃপ্ত-হৃদয়-নিঃসৃত করুণ গাথা

আজ বৃহস্পতিবার—

বৈঠকখানায় বসিয়া ভগবতী মতি ঠাকুরকে দিয়া একটা কার্যের ফর্দ্দ করিতেছিলেন। পৌষমাসের দশমীতে তাহার

মাতার বার্ষিকী, এমন সময় শ্যামপুরের ছিদাম ও তাহার স্ত্রী আসিয়া পৌছিল। মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাহারা প্রণাম করিল। কহিল—হুজুর আমরা এসেছি—

—কেন? তোদের কি কাজ?—ভগবতী মুখে কথাটা বলিলেও চোখটা তাহার ফর্দ্দের দিকেই ছিল এবং মনটা ছিল হিসাবের দিকে।

ছিদাম কহিল—হুজুর—

ভগবতী ফিরিয়া তাকাতেই তাহার সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল—ঐ অবগুণ্ঠনা ছিদামের স্ত্রী সেদিন আসিয়াছিল ছাড় করিবার উদ্দেশ্যে। ছিদাম তাহাকে পাচলী দিয়া মারিয়া জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিল। ভগবতী কহিলেন—ছিদাম তুই বাইরে যা, শুনি ওর কাছে—

ছিদাম চলিয়া গেলে ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—কিরে ছাড় করবি? তোর সাঙ্গা ঠিক ক'রেই রেখেছি—

যুবতী মাথা নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল—না হুজুর—

—কেন? সেদিন ওরকম মারলে তার ঘরে থাক্‌বি কেন?

—আর মারবেক না—ও বলেছে—

—সেদিন যে নালিশ করলি ও তোকে ভালবাসে না, মারে—

যুবতী অবনত মাথা না তুলিয়াই কহিল—মারে হুজুর, ও ভালওবাসে—

—ও মারেও বটে, আবার ভালবাসেও বটে—

মতি ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া—দাম্পত্য-কলহে ঐই হয়—

ভগবতী মনে মনে হাসিতেছিলেন, তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন—ছিদাম—

ছিদাম আসিল। তিনি কহিলেন—এই তোর বৌ, আশনাই করে বলছিলি—তারে নিয়ে ঘর করবি কেন?

—সেটা ঠিক লয় হুজুর—

—তবে সেদিন ব'ললি কেন?

—ঘাট হইছেন হুজুর—

ভগবতী কহিলেন—ওরা যে মিথ্যা কথা বলেছে, ওদের শাস্তি কি হওয়া উচিত। ভগবতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মতি ঠাকুরের দিকে চাহিলেন।

ছিদাম কহিল—যা হুকুম বাবু—

মতি ঠাকুর কহিলেন—যা এবার বৈশাখ মাসে দুটো বট আর দু'টো আমগাছ লাগাবি রাস্তার ধারে—

যুবতী সোৎসাহে কহিল—হাঁ হুজুর—

—হ্যাঁ, ছায়ায় বস্‌লে যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দে তা হ'লে থাক্‌বি তোরা—যা—

তাহারা চলিয়া গেল—ভগবতী পুনরায় ফর্দ্দে মনোনিবেশ করিলেন।

(ক্রমশ)

দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহান নাটক

অধ্যাপক শ্রীবিমলকান্তি সমাদ্দার

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রচনার কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ বিভাগ নাট্যকারের রচনাকে বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করে বলিয়া অবলম্বন করা হয়, নতুবা রচনার পশ্চাতে স্রষ্টার যে কবিচিত্ত ক্রিয়াশীল তাহাকে যেমন টুকরা টুকরা করিয়া রুদ্ধদ্বার বাতায়ন প্রয়োজনীয়-সংখ্যক কক্ষে বিভক্ত করা যায় না, রচনার কালকেও তেমনি বিভক্ত করা বাস্তবপর নয়।

মানবচিত্তের আপাতবিরোধী ভাব ও বৃত্তিনিচয়—মননশীলতা ও আবেগাকুলতা, বিজ্ঞতা ও কৌতুকপরিহাসপ্রিয়তা, বিষয়বুদ্ধি ও উদাসীনতা, আনন্দ ও বেদনা বোধ—কোন্ রহস্যময় প্রণালীতে পরস্পর সংমিশ্রিত, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে বলা কঠিন। ট্র্যাজেডির গম্ভীরতা ও প্রহসনের লঘু চপল হাস্য তরলতা জীবনের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের মত একই কালে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। তবে সাধারণ সূত্র এই যে—উভয়ের একটি প্রবল হইলে অপরটি অনুপস্থিত থাকে—জ্যৈষ্ঠের ও শ্রাবণের আকাশের সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণে অনেক প্রভেদ।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের অবসান ঘটে—১৩১০ সালে তারাবাঈ রচনার সঙ্গে। 'তারাবাঈ' নাটকে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা ও নাট্যকাব্য যুগের সাময়িক অবসান ঘটে। ১৩১০ সাল দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর; এই সময়ে

কবির পত্নীবিয়োগ হয়। অনুরক্ত বন্ধুজন পরিবৃত দাম্পত্য জীবনের যে আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশে হাসির গানগুলি রচিত হয় সে জীবন হইতে কবি চিরতরে নির্ব্বাসিত হন।

১৩১১ হইতে প্রতাপসিংহ নাটকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। প্রতাপসিংহের গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল ১৩১২ সালের ১লা বৈশাখ। ১৩১৬ সালে চন্দ্রগুপ্ত প্রকাশের সহিত এই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিমান যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকগুলি—প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত এই সময়ের রচনা।

তৃতীয় অধ্যায় ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিতে পারা যায়। নুরজাহান ১৩১৩ সালের রচনা; সাজাহান ইহার দুই বৎসর পরে রচিত। সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। জনপ্রিয়তার দিক হইতে চন্দ্রগুপ্তও প্রসিদ্ধ। দেবকুমার রায় চৌধুরী নুরজাহান নাটককে কবির শ্রেষ্ঠ নাটকচক্রের মধ্যে পরিগণনা করিয়াছেন। নুরজাহান নাটক সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব্বে ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে দুই একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার।

বর্ত্তমানের অপরিচিত প্রাত্যহিক পটভূমিকা বর্জ্জনপূর্ব্বক সুদূর অতীতলোকের অপরিচিত চিরপ্রদোষ রাজ্যের মানব সমাজে ও নগর জনপদে উত্তীর্ণ হইয়া বিচার বুদ্ধি তর্কের প্রখর দিবালোক সম্পাতে তাহাকে সম্পূর্ণ —জানা ও সম্পূর্ণ বোঝা এবং বিশেষ তথ্য হইতে সার্ব্বভৌম সত্যে উপনীত হওয়া ঐতিহাসিকের কাজ। অতীত-বিলাসী কবি ও উপন্যাসিক আমাদের চারিদিকের এই খররৌদ্রকে ম্লান করিয়া বর্ত্তমানের সহিত অতীতকে একাত্ম করিয়া তোলেন। অতীতকে মস্তিষ্ক দ্বারা পুনরাবিষ্কার ঐতিহাসিকের দায়িত্ব। অপর পক্ষে অতীতলোককে কল্পনা দ্বারা নূতন করিয়া সৃষ্টি ও বর্ত্তমান জীবনের ক্ষেত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার স্বপ্নছায়ায় আজিকার দিনের সংশয় সন্দেহ-প্রশ্ন—সমস্যাকণ্টকিত সংসারক্ষেত্র হইতে পলায়নপর জ্বরাতুর মানুষের নূতন জীবন যাপনের প্রয়াস তাহার কাব্যে ও সাহিত্যে প্রকাশমান। সেই অপরিচিত জীবনের স্বাদগ্রহণ তাহার লক্ষ্য, পুরাতত্ত্ব-চর্চ্চা তাহার সেই রসসৃষ্টির পক্ষে অবলম্বন ও উদ্দীপন—বিভবস্বরূপ। পাঠকের তাহা উপরি-পাওনা।

ঐতিহাসিক জীবন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে নাটকের কারবার তাহার সম্পর্কেও এই নীতি সত্য। নাটক যে ইতিহাস নহে—বিশুদ্ধ সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের অন্তর্গত, ঐতিহাসিক নাটক-প্রণেতাকে তাহা মনে রাখিতে হইবে।

সেক্‌স্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; একভাগ ইংলণ্ডের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া ও অপরভাগ অতীত রোমকে লইয়া, দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা প্রথম ভাগে ইতিহাসকে অনুসরণ করার একাগ্রতা লক্ষণীয়। ইতিহাসের যে প্রধান চরিত্রগুলি নাটকে স্থান পাইয়াছে তাহাদের যথাযথ চিত্রণ তিনি আপন দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই যথাযথ চিত্রণের অর্থ ঘটনার সত্যের উপস্থাপন সম্পর্কে নয়; ইংলণ্ডের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে দর্শক সমীপে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য নাটকের বিষয়ীভূত হইবা[র] পক্ষে যাহা সর্ব্বাধিক উপযোগী, সেই ঐতিহাসিক চরিত্র ও কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে তিনি উপন্যস্ত করিয়াছেন।

যে মূল উৎস হইতে তিনি নাটকের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা[র] ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তোলেন নাই। এমন কি ইতিহাসকে কোন কোন স্থলে নির্ম্মমভাবে তিনি উল্টাইয়াছেন। 'নির্জ্জলা' ঐতিহাসিক তাহাতে ব্যথিত হইলেও সাহিত্য-রসিক হইবেন না। ক্যাথারিণে[র] মৃত্যু ও এলিজাবেথের জন্ম—এ দুই ব্যাপারের কোনটা অগ্রগামী তাহ[া] জানিবার জন্য Henery VIII পড়িবনা, ক্যাথারিণের জীবননাট্যে[র] শেষ দৃশ্য দর্শক ও পাঠকের অনুভূতির জগতে যে কারুণ্যের চিরন্তন উৎ[স] হইয়া রহিয়াছে সেখানেই নাটকের সার্থকতা। ইতিহাসবিষয়ক এ[ই] নাটকগুলিতে ঘটনার যে ভার আছে রোমক-ইতিহাস-সম্পর্কিত নাটক[-] গুলিতে সে ভার লঘু হইয়া ভাবের ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করিয়া গিয়াছে। সেক্‌স্‌পীয়রের রোম তাহার আপন বাসভূমি ইংলণ্ড এবং তাহার আপ[ন] কল্পনার রাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত রশ্মিমালায় সীজার, ব্রুটাস, অ্যান্টনি, ক্লি[ও]প্যাট্রা, কোরিও লেনাস, ভলামনিয়া নূতন ঐশ্বর্য্য নিয়া দেখা দিয়াছে।

হ্যামলেট-লিয়ার-ম্যাকবেথে যে ক্ষীণ ঐতিহাসিকতা বর্ত্তমান তাহা[র] বলে তাহাদের ঐতিহাসিক নাটকের স্বীকৃতিলাভ আজ আর হয় না যদিও সেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িক দর্শকমণ্ডলী সেগুলিকে ঐতিহাসিক নাটক বলিয়াই একদা গ্রহণ করিয়াছে।

বেন জনসন্ ইতিহাসের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। Sejanus ও Catiline নাটকদ্বয়ে ইতিহাসের সত্যসম্পর্কে তাঁহার পণ্ডিতজনোচি[ত] জ্ঞান ও সুক্ষ্মদৃষ্টি, বাস্তবানুগতা, সত্যসন্ধতা, পাঠকের কাছে প্রাচী[ন] রোমের তোরণদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। সে-দিনের রোমের জীবনযাত্রা রাজপরিষদবর্গের ও নাগরিকদের হাব ভাব কথাবার্ত্তা সাজপোষাক দৃশ্যে[র] পর দৃশ্য এক অখণ্ড ঐক্যে গ্রথিত হইয়া এক জীবন্তশোভাযাত্রা রচন[া] করিয়াছে। কিন্তু এত শক্তি, এই অবিচল সত্যনিষ্ঠা, এত পাণ্ডিত্য, অং[শ] এবং সমগ্রতার উপর এই তুল্যানুরাগ—ইহার ফলেও, পাঠকের যাহা চর[ম] প্রাপ্য তাহা আমাদের লাভ হয় নাই। চরিত্রের যে মানবীয়তা দেশ ও কালের গণ্ডীর বাহিরে সর্ব্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রস্তুত করি[য়া] চিরন্তন আত্মীয়তা স্থাপন করে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলিতে তাহা নাই।

কিন্তু ইতিহাসের যে একটা স্বাধীনতা-বিলোপী বাঁধন আছে, নির্দ্দি[ষ্ট] রেখা দ্বারা ভাবের জগৎ যে সেখানে পরিসীমিত, তাহা অস্বীকার করিবা[র] উপায় নাই। কবি-কল্পনাকে এখানে সংযত করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমি[ত] উপকরণে শিল্পসৌধ রচনা করিতে হইবে।

যাহা ঘটিয়াছে তাহার অস্বীকার দর্শকের রস-গ্রহণে ব্যাঘাত সৃ[ষ্টি] করিতে পারে, প্রসিদ্ধ চরিত্র সম্পর্কে যে ধারণা পুরুষপরম্পরায় এ[ক] ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে নস্যাৎ করিবার চেষ্টা নাটকীয় ভ্রা[ন্তি] সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হয়। কিন্তু দর্শকের প্রতীতি অক্ষুণ্ণ রাখি[য়া] যাহা ঘটিতে পারিত, সে কর্ম্ম বা উক্তি যে চরিত্রের পক্ষে উপযোগী [তাহা] জীবনে তাহা বিন্যস্ত করায় ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ [হইল]

িত্যের ক্ষেত্রে তাহার স্বীকৃতি রসিকজনের সমর্থন লাভ করিয়াছে। তহাস-রাজ্যের মানুষের জীবনধারায় সমুদ্রের উদ্বেল প্রবাহ ও গম্ভীর ল্লোল বর্ত্তমান। তাহা অতীতকালের সংকীর্ণ সীমা হইতে বহু শতাব্দীর াভূমি অতিক্রম করিয়া আমাদের জীবনের নিস্তরঙ্গ বাঁধা জলাকে যখন ক্রমণ করে তখন আমাদের এই গণ্ডময় অস্তিত্ব অকস্মাৎ এক বিপুল স্তারের গম্ভীর মহিমায় ধন্য হইয়া উঠে। ছোট ছোট হাসি-কান্না ওয়া-পাওয়া সুখ-দুঃখ একান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। ঐতিহাসিক করণ লইয়া সাহিত্যিক যখন রসসৃষ্টির প্রয়াসে ব্যাপৃত তখন অতীতের ই পরিবেশ, সেই গম্ভীর কলধ্বনি, সেই অর্ধ-পরিচিত অপরিচিত নবসমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের পুনরুজ্জীবন, অনুভূতির রঙে রসে স্বচ্ছ-ছল জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত গ্রন্থের শুষ্ক কয়েকটী পাতার মধ্যে বিধৃত িতে চাই। দেবকুমার রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক টকগুলির সম্পর্কে বলিয়াছেন "তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতি বধানতার সহিত লিখিত। কোন স্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে তক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাস নীরব, মাত্র সেইখানেই তাঁহার হিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।" উক্তিটি ত্বপূর্ণ, অতএব বিচার-সাপেক্ষ।

নুরজাহান ভারত ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র। আলোচ্য নাটকে াকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। নাটকের বিষয়বস্তু ভারত ইতিহাসের টী অভিনব প্রতিভাশালিনী, শক্তিময়ী, তেজস্বিনী, রূপলালসা ও রতার প্রলয়বহ্নিতে প্রদীপ্ত জীবনের একটী বিশেষ অধ্যায় হইতে ীত। সাজাহান নাটকের বিষয়বস্তু সিংহাসনলাভের উদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধ যোগ্যতম ঔরংজীবের সাফল্য; অথচ সাজাহান চরিত্র সেখানে আধুনিক টকের Tragic Heroর গুণধর্ম্মে লক্ষণাক্রান্ত। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের ৗরব, দীর্ঘদিন পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিমান একচ্ছত্র ভারত শাসন, প্রথম ৗবনের উচ্ছৃঙ্খলতা, পিতৃদ্রোহ—সকলের সমন্বয়ে যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ও রুষকার তাহার আলোক-চক্রের আবেষ্টনে আপাত নিষ্ক্রিয় বৈক্লব্য-াপ্ত জরাতুর সাজাহানকে নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখিতে পাই তিনি হাকাব্যের নায়কের আরোপিত গৌরবে অভিষিক্ত। অস্ত্রের ঝনঝনা ও করুণ হত্যার আর্ত্তরবের উর্ধ্বে আগ্রার প্রাসাদকক্ষে আবদ্ধ তাঁহার দীর্ঘশ্বাস যে করুণ বাষ্পসঞ্চার করিতেছে তাহা সমগ্র নাটকখানিকে াজেডির মর্য্যাদা দিয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে সেক্সপীয়র তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে ট্রাজেডির পকে তেমন ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারেন নাই যেমন Hamlet lacbeth বা Lear-এ সম্ভবপর হইয়াছে। এই খাঁটি Tragedy-লিতে বৃহৎ আদর্শ ও আলোকসামান্য কল্পনা, অনুভূতি, ত্যাগ ও হিংসা ই জগৎ সংসারে তাঁহাদের জীবনের যাহা কাজ তাহা দ্বারা সীমাবদ্ধ। ট্যকার এখানে অনন্যোপায়। বাহিরের জগতে যে সাফল্য-অসাফল্যে ীবদ্ধ, ঐতিহাসিক নাটকে মুখ্যত তাহাকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার স্বর্লোকে প্রবেশ করেন, অপর পক্ষে যে গভীর অন্তর্ভেদী বন্দ্ব হাহাকার—ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি তাহা সংসার-যাত্রার সাধারণ জয়পরাজয়ের উ... তাহা জীবনমৃত্যুর বিরুদ্ধ আকর্ষণে মানুষকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। ঐতিহাসিক নাটকে আমাদের সহানুভূতি হিসাবী, ভাবাকুলতাবর্জ্জিত, সংসারিক বুদ্ধি, বিজয়ী বীরকে কেন্দ্র করিয়া প্রসাদলাভ করে, ট্র্যাজেডিতে যে নিজ্জিত, যে বিধ্বস্ত প্রবল পুরুষকার ও প্রতিকূল ভাগ্যবিধাতার সংঘাত-মুহূর্ত্ত যাহার জীবন উজ্জ্বল জ্যোতিঃশিখায় জ্বলিয়া উঠে তাহার প্রভা আমাদের দৈনন্দিনতাকে লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তোলে। নুরজাহান নাটকে বাহিরের যে বিপ্লব তাহার শেষ অঙ্কে ছাড়া নুরজাহান বিজয়িনী। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার একটী ভ্রূভঙ্গী ঘটনা-স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। যেমন নাটকে, তেমনি ইতিহাসে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেই তাঁহার বিজয়-শকট আকস্মিকভাবে রুদ্ধগতি হইয়া পড়িল। এই পরাজয়ে যে ট্র্যাজেডি তাহা, এই একদা শক্তিময়ী নারীর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও বিপুল মহিমার কথা স্মরণ রাখিয়াই বলা চলে, আমাদিগের অনুভূতিকে গভীর ভাবে আলোড়িত করিতে পারে না।

নাটকে নূরজাহানের বিজয়রথের চক্রতলে যতগুলি মূঢ় স্বল্পশক্তি মানুষ নিষ্পিষ্ট হইয়াছে—জাহাঙ্গীর তাহাদের অন্যতম—সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারিত। কণ্ঠলগ্ন এই সুন্দরী সর্পী তাঁহার শ্বাসরোধ করিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সাজাহান যে উক্তি করিয়াছেন তাহা বিশেষ অর্থপূর্ণ—"সেই দুষ্টা উচ্চাশিনী নারী শেষে পিতাকে হত্যা কর্লে, পিতাকে বিলাসে সজ্জিত করে' বিভোর করে' রেখে শেষে তাঁকে জীবনের মধ্যাহ্নে হত্যা কর্লে।" অথচ জাহাঙ্গীর এ সম্পর্কে কোন বিশেষ মন্তব্য কোথাও প্রকাশ করেন নাই। নিষ্ঠুর নিয়তির প্রতি যে অভিযোগ নুরজাহান তাহার স্বগতোক্তিতে বার বার করিয়াছেন Laocoon-এর দশায় নিপতিত জাহাঙ্গীরের চরিত্রে সে সম্পর্কে গভীরতর বর্ণপাতের সম্ভাবনাকে নাট্যকার উপেক্ষা করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর চিত্রশিল্পী, বহু ভাষাবিদ্ ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। প্রতিহিংসায় তিনি অমানুষিক ছিলেন, অথচ তাহার চরিত্র ঔদার্য্য-রহিত ছিল না। তাঁহার আত্মজীবনীর শুধু ঐতিহাসিক নয়, একটা সাহিত্যিক মূল্যও আছে। এই নাটকীয় গুণবিশিষ্ট চরিত্রটী নাটকে পূর্ণ গৌরব পায় নাই।

নুরজাহান নাটকের ঘটনাকাল মোটামুটি ২২ বৎসর তিন মাস। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য আসফ (ইতিকদ্খানা) শের খাঁ (শের আফকুল) ও নুরজাহানকে সম্রাট্ আকবরের মৃত্যু সংবাদ ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইতেছে। আকবরের মৃত্যু হয় ইংরাজী ১৬০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর এবং এক সপ্তাহ শোককাল উদ্‌যাপনের পর ২৪শে অক্টোবর সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাটকের শেষ দৃশ্য সেই অন্তবর্ত্তী কালের, যখন সাজাহান সম্রাট হইয়াছেন অথচ শারিয়ারকে হত্যা করা হয় নাই। সাজাহান নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন ১৬২৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১৬২৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী শারিয়ারকে হত্যা করা হয়। অতএব ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ অর্ধ হইতে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী প্রথমার্ধ কালের ঘটনা লইয়া নাটকখানি রচিত বলা যাইতে পারে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যের উপস্থাপনা প্রসঙ্গে নাট্যকার লিখিয়াছেন "ভাদ্র মাসের ভরা দামোদর খরস্রোতে বাহিয়া যাইতেছে।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে সে সময়ে আশ্বিন সবে শেষ হইয়াছে, উপরি লিখিত ইংরাজী মাস গণনার সহিত বাংলা মাসের হিসাবে ইহা সহজেই ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

ইতিহাস রচনাকালে তীক্ষ্দৃষ্টিতে তুস-কুঁড়ার মধ্য হইতে যত্ন-সহকারে শস্তকণা আহরণ করিতে হয়; জনশ্রুতিকে যাচাই করিয়া, তৌল করিয়া, সম্ভাবনীয় ও সম্ভূতের মধ্যবর্ত্তী ভেদরেখা নির্ণয় করিয়া, প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপনীয় অস্তিবাচক ও নেতিবাচক কোন সাক্ষী গরহাজির না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সত্যে পৌছাইতে হয়। ঐতিহাসিক সাহিত্যের রচনায় ঐতিহাসিক পলিমাটীর ঘটনার বীজবপন দরকার; কিংবদন্তীর চোরাবালি হইতে রসগ্রহণের চেষ্টায় ব্যর্থতা আসিতে পারে। কিন্তু নাটক কেবল পণ্ডিতের জন্য নয়; কিংবদন্তী যেখানে বহুবিদিত এবং বহুজনগ্রাহ্য সেখানে সাহিত্যিকের দুশ্চিন্তার কারণ নাই। জাহাঙ্গীরের সহিত নুরজাহানের বিবাহপ্রাক্ প্রণয়-কাহিনী প্রমাণসিদ্ধ নয়। সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই।* নিরঙ্কুশ নাট্যকার এখানে বহু আগাছায় আচ্ছন্ন ইতিহাসের সংকীর্ণ গলিপথ পরিচ্ছন্ন করিতে না গিয়া জনশ্রুতির দরাজ রাজপথটী গ্রহণ করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাহিনী অবলম্বনে নুরজাহান চরিত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্বের সংঘটন সম্ভবপর হইয়াছে।

খোরাসানের সুলতানের উজির খাজা মহম্মদ শরীফের পুত্র এবং একদা স্বয়ং উজির পদে নিযুক্ত মির্জা গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ (গিয়াস বেগ, খান আয়াস ও পরে ইতমদ্উদ্দৌলা নামে প্রসিদ্ধ) স্বদেশে ভাগ্য বিপর্যয়ে ও নূতনতর সৌভাগ্যের সন্ধানে সপরিবার ভারতে আসেন। মরুপথে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কন্যা নুরজাহানের জন্ম হয়। আয়াস আকবরের রাজসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ন এবং প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে শের আফকুনের সহিত নুরজাহানের বিবাহ হয়; শের আফকুনের (ব্যাঘ্রবিজয়ী) প্রকৃত নাম আলিকুলি ইস্তাজলু। পারস্যরাজ দ্বিতীয় সাহ ইসমাইলের (১৫৭৬—৭৮) রন্ধনশালায় ইনি পরিবেষক ছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর বা হত্যার পরে ইনিও ভারতে পলায়ন করিয়া আসেন এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহমান খান খান্নার সহিত পরিচিত হন। আকবরের বিরুদ্ধে সেলিমের বিদ্রোহের সময় কিছুকাল ইনি সেলিমের পক্ষে ছিলেন, পরে সেলিমকে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষে যোগদান করেন। সিংহাসনলাভের পর বর্ধমানে উচ্চপদ প্রদান করিয়া শের আফকুনকে প্রেরণ জাহাঙ্গীরের ঔদার্যের পরিচয়। আগ্রা হইতে বঙ্গদেশ শাসন তখন সহজসাধ্য ছিল না, জলভাগবহুল এই প্রদেশে ষড়্যন্ত্র ও বিদ্রোহের পঙ্কে পাঠান শাসনকর্ত্তারা সহজেই ডুবিতেন। মানসিংহ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখানে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন নাই। প্রকৃতপক্ষে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় বঙ্গদেশ মোগল শাসন নিরপেক্ষ ছিল। আত্মপক্ষ পরিত্যাগের ফলে একদা-প্রিয় শের আফকুনের প্রতি জাহাঙ্গীর বিরক্ত ছিলেন, এইবার বঙ্গদেশের বহুকাল ব্যাপী ষড়্যন্ত্রের পঙ্কে লিপ্ত বলিয়া শের আফকুন সন্দেহভাজন হইলেন। জাহাঙ্গীর কুতুব খাঁকে শাসনকর্ত্তারূপে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং শের আফকুনের প্রতি সমুচিত দণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। কুতুবখাঁ শের আফকুনের দ্বারা নিহত হইলেন (১৬০৭ খৃঃ অঃ)। মেহেরুন্নিসা ও তাঁহার কন্যা লাডিলি বেগম সুলতান সেলিমা বেগমের সঙ্গিনী নিযুক্ত হন ও প্রাসাদে স্থান পান। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে নওরোজের মেলায় জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সেই বৎসর মে মাসেই তাঁহাকে বিবাহ করেন। নুরজাহানের বয়স তখন ৩৪ বৎসর। কী যাদুমন্ত্রবলে তখনও ক্ষীণাঙ্গী এই পারস্য-সুন্দরী প্রথম যৌবনের লাবণ্য-প্রবাহ আপন দেহের তীক্ষ্ণরেখাবলির মধ্যে লীলাভরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃগয়ায় অশ্বারোহণে, আগ্নেয়াস্ত্রচালনায় তিনি পারঙ্গমা ছিলেন। জাহাঙ্গীর শুধু তাঁহার সৌন্দর্য্য মোহে আত্মবিস্মৃত হন নাই। ললিতকলা চর্চ্চা, কাব্য রচনা, বিবিধ চারুশিল্পে দক্ষতা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের স্বগতোক্তিতে চারুশিল্পের দক্ষতার উল্লেখ আছে এবং মহবৎখাঁর শিবির আক্রমণের সময়ে একটীমাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার মধ্যে দৈহিক শক্তি ও সাহসের পরিচয় রহিয়াছে। এই নুরজাহানকেই নাটকে আমরা পাইতেছি।

ইতিহাস নুরজাহান-চরিত্রে আরও বহুতর গুণ আবিষ্কার করিয়াছে ন্যায়ের পক্ষে অত্যাচারিতের পক্ষে তাঁহার অবিচলিত সহানুভূতি ছিল প্রায় ৫০০ দরিদ্র কুমারীর বিবাহের ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীরের জীবনের শেষের সাত বৎসর ব্যতীত তাঁহার শাসনে কোথাও কালিমার স্পর্শ লাগে নাই।

নুরজাহানের শাসনকালকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে নাট্যকারকেও সে বিষয়ে আমরা অবহিত দেখিতে পাই। প্রথম ভাগ ১৬১১—১২ হইতে ১৬২২ এবং দ্বিতীয় ভাগ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ১৭২৭ [illegible] পর্য্যন্ত। প্রথম ভাগে নুরজাহান, আসফখাঁ, ইতমদ্উদ্দৌলা ও সাজাহান এই শাসকগোষ্ঠী জাহাঙ্গীরের অভিমত ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং জাহাঙ্গীরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া রাজ্য শাসন করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নুরজাহান-জননী আসমত বেগম ও ১৬২২ খৃষ্টাব্দে পিতা ইতমদ্উদ্দৌলা প্রাণত্যাগ করেন। সাজাহানের সহিত নুরজাহানের মৈত্রীবন্ধনও ছিন্ন হইল। ইতিহাসের সহিত যোগ রাখিয়া পাঠ না করিলে নাটকের এই অংশের মর্মে প্রবেশের এক অসুবিধা হয়। সমগ্র মোগল রাজবংশে তখন খসরুর ন্যায় জনপ্রি[illegible] আর কেহ ছিল না। সম্রাট আকবর তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন পত্নীপ্রেমে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, সৈনাপত্যের গুণের অভাব থাকিলে ব্যক্তিগত সাহস ও শক্তি তাহার ছিল, মাতুল মানসিংহ তাঁহার [illegible] এবং আকবরের মৃত্যুকালে মানসিংহের নেতৃত্বে এক সময়ে সকলেই [illegible]

* History of Jahangir—Dr. Beni prasad. pp. 181—182.

করিয়াছে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তা খসরু। নুরজাহানও তাহাই মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহের ফলে তাঁহার শোচনীয় পরাজয়, জাহাঙ্গীরের সম্মতিক্রমে তাহার চক্ষু উৎপাটন (১৬০৮ খৃঃ) ও পরিশেষে শাসক-চতুষ্টয়ের চক্রান্তে সাজাহান কর্ত্তৃক তাহার হত্যার (১৬২১ খৃঃ) পরে সাজাহানের সিংহাসনপ্রাপ্তির সম্ভাব্যতা বাড়িয়া যায়। নুরজাহান বুঝিতে পারেন যে সাজাহানের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যকামী ব্যক্তি নুরজাহানের প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ গোঁড়া না হইলেও নুরজাহান শিয়া ছিলেন এবং আপন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত। সাজাহান সুন্নি। এই কারণেও সাজাহান দূরে সরিতে বাধ্য হন। নুরজাহানের কণ্টকদ্বারা কণ্টকোৎপাটনের নীতি এইবার চরমে উঠিল। খসরু ও সাজাহানের বিদ্রোহের (১৬২৩—২৬) অন্তবর্তী ১৭ বৎসর সাধারণভাবে বলিতে গেলে শান্তিময় ছিল। এইবার যে স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ নুরজাহানচক্রের শাসন অবনতভাবে স্বীকার করিয়া নিতে পারেন নাই, তাহাদের স্বজনপোষণ ও বর্ষীয়ান্ সভাসদ্গণের প্রতি অবিচার যাহার রুচিকর না হওয়ায় রাজসভা হইতে দূরে আফগানিস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই মহবৎখাঁকে সাজাহানের বিরুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে প্রেরণ করা হয়।

সাজাহানের বিদ্রোহও নুরজাহানের জাল বিস্তারের ফল। খসরুর হত্যার পরে কান্দাহার-সমস্যায় ব্যাপৃত রাখিবার জন্য সাজাহানকে কান্দাহার অভিযানে অগ্রসর হইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। নুরজাহান জানিতেন সাজাহান ইহাতে সম্মত হইবেন না, তখন তাঁহাকে রাজাদেশ অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত করা ও তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করা চলিবে। সাজাহান আদেশ অমান্য করিলেন, ঢোলপুর পরগণা—সম্রাটের সম্মতি সহজপ্রাপ্য হইবে কল্পনা করিয়া—আপন জায়গীরভুক্ত করিয়া নুরজাহানকে সুযোগ দিলেন তাঁহার তিল প্রমাণ অপরাধ তালপ্রমাণ করিয়া জাহাঙ্গীরের কাছে উপস্থাপনার এবং পরিশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। প্রধানতঃ আত্মপক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে (১৬২৬ খৃঃ) সাজাহান আত্মসমর্পণ করেন।

সাজাহানকে বিদ্রোহের ফলে গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। মহবৎখাঁর ক্ষমতার সর্ব্বময়তা ও পরভেজের সহিত তাঁহার মিলন নুরজাহানকে বিচলিত করে। এই মিলনের আশু বিচ্ছেদ সাধনের জন্য সাজাহানের সন্ধি-প্রস্তাবে সহজেই নুরজাহান সম্মত হন। সাজাহান তখন পরাজিত, বন্ধুহীন, সম্রাটের রোষভাজন। সন্ধিস্থাপনের পরে মহাবৎখাঁকে নুরজাহান বঙ্গদেশে পাঠান এবং পরভেজকে বুরহানপুরে বিশ্বস্ত উজীরের তত্ত্বাবধানে থাকিতে বাধ্য করেন।

এইবার মহাবৎখাঁর পালা। কিন্তু নুরজাহানের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসে। শারিয়ারকে সিংহাসন দিবার প্রচেষ্টা কোন স্বাধীনচিন্তাশক্তিসম্পন্ন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে মানিয়া লওয়া অসম্ভব ছিল। খসরুর মৃত্যুর পরে সব দিক দিয়া খুরম সিংহাসনলাভের পক্ষে যোগ্যতম বলিয়া সাধারণে বিবেচিত হন। বীর, সাহসী এই যোদ্ধ‌্ পুরুষকে জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দ্বিতীয়তঃ নুরজাহান-শাসনচক্র ভাঙিয়া গেলে আসফখাঁ তাঁহার জামাতা সাজাহানের পক্ষে, প্রকাশ্যে না হইলেও, সবিশেষ অনুকূল শক্তিরূপে পরিগণিত হন। মাতা ও পিতার মৃত্যুর পরে নুরজাহানের স্বেচ্ছাচারিতা অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া পড়ে। এদিকে নুরজাহানের হাতের ক্রীড়নকরূপী শারিয়ার উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান। বীরত্বহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য, কুষ্ঠকল্পরোগবিশেষে আক্রান্ত ব্যক্তিত্বহীন 'না-সুদনি' ('Good for nothing') এই হতভাগ্য অপেক্ষা পরভেজও নিশ্চয়ই যোগ্যতর ছিলেন। এই ব্যক্তির প্রতি স্বার্থের অনুরোধে নুরজাহান কর্ত্তৃক পক্ষপাত ও পদোন্নতি সাম্রাজ্ঞীর প্রতি ওমরাহদের বিদ্বেষের অপর কারণ।　　(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভক্তির সরল পথ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভক্তি শব্দ ভজ্ ধাতু হতে সম্পাদিত, ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। শব্দের ধাতু, প্রত্যয়, মূল বা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করলে, প্রত্যেক প্রসঙ্গে বাদানুবাদ, নীরস পাণ্ডিত্য এবং তর্কের অবকাশ অবশ্যম্ভাবী। অথচ জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং সংস্কারবশে আমরা জানি যে—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর। আর যেথায় তর্ক চলে চলুক, ভক্তির পথে তর্ক চলে না। কারণ ভক্তি একান্ত নিজস্ব নিগূঢ় চিত্ত-বৃত্তি। এর মূল—অনুভব, আকাঙ্ক্ষা এবং অনুরাগ। মন বিষয়কে ভালবাসে বিষয়কে লাভ করবার কামনায়। সেথায় ক্ষুদ্র আমিত্ব ষোলো আনা বিদ্যমান। লাভের বিষয়ও স্বল্পপরিসর সীমায় বদ্ধ। সন্তানকে স্নেহে ভালবাসে জননী আপনাকে ভুলে, তার কল্যাণ কামনায়। মহান হলেও এ স্নেহের মূলে আছে মমত্ববোধ। কিন্তু এরা উপেক্ষার ভাব নয়। এরা পরম প্রেমের ক্ষীণ ছায়া।

কামনা-বর্জ্জিত প্রেম আত্মদানের তৃপ্তি। সে প্রেম আদর্শের প্রতীককে আপনার প্রাণের মাঝে প্রতিষ্ঠা করে। আত্ম-নিবেদনেই নিস্বার্থ-প্রেম চরিতার্থ। নিজের প্রসারের অনুভূতিতে আকাঙ্ক্ষা ডুবে যায়। প্রগাঢ় প্রেমে

আধারের মাঝে মানুষের ব্যক্তিত্ব হয় অবলুপ্ত, থাকে কেবল সেই সত্তার অনুভূতি, প্রেম যাকে নিজের হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছে। অবশ্য নিজের অভিরুচি, কল্পনা, অজ্ঞাত প্রেরণা হতে উদ্ভূত হয় আদর্শের রূপ। কিন্তু প্রেম প্রকৃত হলে, প্রেমিক আপনাকে ডুবিয়ে দেয় ভালবাসার সাগরতলে।

বহু ক্ষেত্রে এ অবস্থার পরিণতি হয় ক্রমোন্নতির বিধানে। কামনা, বাসনা, স্নেহ, মোহ বা রূপ—প্রথম আকর্ষণের হেতু হতে পারে। আসক্তি হতে ক্রমে প্রেমের প্রকৃত বিস্তৃতি আত্ম-প্রকাশ করে। রূপ-তৃষা যেথায় সাধ্য—প্রেম স্থায়ী হয় না, গভীর হয় না। সে ক্ষেত্রে রূপ মোহ আনে, প্রেম জাগায় না। যে রূপের মোহে ভালবাসে, অন্যত্র অধিক রূপের বিকাশ হলে তার প্রেমের পাত্র পরিবর্ত্তিত হয়। সে প্রেম আত্ম-হারা করে না প্রেমিককে।

আত্মহারা প্রেমের পরম ও চরম রূপ ভক্তি। আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে ভক্ত ভক্তির পাত্রকে উচ্চ ভাবে। পিতৃভক্তের চিত্তে পিতার আসন উচ্চে। সেথায় প্রেম আছে এবং আরও কিছু আছে যা পিতা-পুত্রের মাঝে একটি সহজ ব্যবধানের সৃষ্টি করে। গুরুভক্তিও ঐ শ্রেণীর। গুরু সেই পরম পদ দেখিয়ে দেন যাঁর বিষয় শিষ্য কিছু জানে না। গুরু-ভক্তি তাই সাধারণতঃ গুরু-সেবা। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মানুষের প্রতি ভক্তি যতই গভীর হক না—পূর্ণতার অভাব অনুভূত হয় আধারে। মানুষে নিবেদিত প্রেমে পূর্ণভাবে আধারকে লাভ করলেও বাকী থাকে সামগ্রী যথেষ্ট। পিতা দেবতা, গুরু ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের আভাস। দাম্পত্য প্রেমের মাধুরী সন্ধান দেয় চির-মধুরের। কিন্তু সেথায় পূর্ণতা কোথা? পূর্ণতার অভাব জেগে ওঠে মনে, অশ্রদ্ধায় নয় গাঢ় শ্রদ্ধায়, মাধুরীর অভাবে নয় অফুরন্ত মাধুরীর মাধুর্যে। পিতা পূর্ণতার আদর্শ নির্দেশ করেন। ধর্ম-গুরু আরও গভীর পূর্ণতার প্রতি চিত্তকে আকৃষ্ট করে। প্রকৃত গুরু বুঝিয়ে দেন যে তাঁর প্রতি নিবেদিত ভক্তি—পূর্ণ পুরুষের বেদীতে আত্ম-নিবেদনের ক্ষীণ শিখা জ্বালানো মাত্র। সে শিখার আলোক অনন্ত জ্যোতির পথ নির্দেশ করে।

ভক্তি শুদ্ধচিত্ত-বৃত্তি—একান্ত নিজস্ব সামগ্রী বিশ্ব-বিজয়ের। ইন্দ্রিয় বহু সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে যায় জীবকে। চিত্তকে বহু মিথ্যা পথের সন্ধান দিয়ে ব্যস্ত রাখে। কিন্তু সেই বৃথা ব্যস্ততার মাঝেও আমরা উপলব্ধি করি যে জীব মাত্র নিজের স্বার্থে তৃপ্তি পায় না। তার প্রাণ চায়—অন্যের ভালবাসা। তার হৃদয় চায়—অন্যত্র প্রেমের ডালি পৌঁছে দিতে। সেই অন্য জীবকে ঘেরা প্রেম ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে—তৃপ্তিরও পরিসর বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান মানুষের প্রকৃতির বিশেষত্ব। তাই বিশ্বাস দৃঢ় হলে স্বচ্ছ হলে আর যুক্তি, তর্ক বা আলোচনার অবকাশ থাকে না ভক্তির পথে।

মানব-মনের একটা বিশেষ ভাব—অসন্তুষ্টি। সে ভোগ চায়, কিন্তু ভোগ তাকে তুষ্ট করে না। বিশাল সাম্রাজ্য লাভ ক'রে বিশ্ব-জয়ী বীর আরও বিশালতার অভাবের অভিযোগ শোনে গোপন মনে। প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডার হতে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ ক'রে জ্ঞানী অভিযোগ করেন যে তাঁর আবিষ্কার জ্ঞানসাগরের বিরাট বালুবেলার একটি বালু-কণা মাত্র। দার্শনিক, কবি ও পরম ভক্তের চিত্তের অন্তস্তল হতে দীর্ঘ-শ্বাস বহে অতৃপ্তির। সবার হৃদয়ে গুমরে ওঠে প্রসারের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমরা বুঝি না যে সে অতৃপ্তি পরা-ভক্তির বীজ। সে অতৃপ্তি নিবৃত্তির জন্য ছুটাছুটি করি, তাই একদিন মনের উর্বর ক্ষেত্রের সন্ধান পাই যেথায় ভক্তিলতা বীজ রোপণ করলে—উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।

ঈশ্বরে অনুরক্তি পরাভক্তি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি মানুষের সহজ সংস্কার। নানা বিষয় পথ ভোলায়, তবু শ্রদ্ধা জন্মে—কিন্তু দৃঢ় হয়না। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করে। প্রকৃত জ্ঞানই পরম জ্ঞান—ভগবদ্‌জ্ঞান। সে জ্ঞান পরম ভক্তির নামান্তর মাত্র। মানুষের আস্তিক্য-বুদ্ধি জ্ঞান-পিপাসার মূলে বিদ্যমান। মানুষ প্রকৃতি-গত আস্তিক্য-বুদ্ধির বিলোপ সাধন ক'রে নাস্তিক হয়। কারণ বিরাটের প্রতি শ্রদ্ধারূপে আস্তিক্য-বুদ্ধি জীবের প্রাণে বিরাজিত।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—আমি সবার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। স্মৃতি ও জ্ঞান উদ্ভূত হয় আমা হতেই। আবার তাদের অভাবেরও সৃষ্টি হয় আমার দ্বারা। বেদ সকলের দ্বারা আমিই বেদ্য বেদান্তের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। আমিই আবার প্রকৃত বেদের অর্থবেত্তা।

কাজেই তাঁকে জানবার বাসনাও যেমন প্রকৃতিগত াকে ভুলে ইতস্ততঃ দৌড়বার বাসনাও তেমনি জগতের ারা। তাই কবির কথায়, সদাই মন বলে—

কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

যতই অস্পষ্ট হক্, যতই অপূর্ণ হক, শক্তিমানের শক্তির হর প্রত্যেক জীবকে স্মরণ করিয়ে দেয় একটা সত্য। ়ই পরিদৃশ্যমান বিরাট বিশ্বের একজন অপ্রতিম-প্রভাব ষ্টা আছেন। তাঁরই অনুবর্ত্তিত নিয়মে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ার্য্যের দ্বারা এ পৃথিবী সচল।

বিশ্ব স্রষ্টাকে জানবার প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় কল শ্রেণীর লোকের মাঝে। তাঁর বিরাট রূপ শ্রদ্ধা াগায়। আজও যার সমাজকে জ্ঞানের আলো উদ্ভাষিত রে নি, এমন আদিম মানুষ প্রমাণ করে এ সত্য। তমনি এ সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া যায় শিশুর মতি-গতি াল-চলন পর্য্যবেক্ষণ করলে। নিজের নিরাময়তা এবং াত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টায় আদিম-মানব গুহা রচনা করে, াততায়ীর অভিযান হতে রক্ষা পাবার অভিলাষে। সে নুকরণ করে বিশ্বের সৃষ্টি। তবু সে ভয় পায়, প্রাণ খোঁজে হায়—যার উপর সে নির্ভর করতে পারে। তখনই প্রশ্ন ঠে কে সে? কিন্তু সে যে বিরাট, তার শক্তি অসীম। াছ উপড়ে ফেলে তার বায়ুস্রোত—বনের প্রবল জন্তুকে নিঃশেষে মেরে ফেলে তার অভিঘাত। শ্রদ্ধা জাগে মানব নে আপনি। ভক্তি-লতার সে কি সহজে-পাওয়া বীজ নয়?

আদিম-মানুষের দলপতির প্রীতি বা রোষ তার ীবনের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রথার বিরাম নাই থা-কথিত স্বাধীন মানুষেরও সমাজে। যে স্রষ্টা সূর্য্য ন্দ্র, গিরি প্রান্তর, নদ-নদী সাগর সরোবর সৃষ্টি করেছেন, যিনি মুহূর্ত্তে দলপতি বীরের প্রাণ-বায়ু হরণ ক'রে তার দহকে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনায় পরিণত করতে পারেন, তিনি মহা-শক্তিমান, তিনি শত সহস্র সজ্ঞপতি বীর হতে চ্চ সিংহাসনে সমাসীন। এ ধারণা সহজে মানুষের মনে াত্ম-প্রকাশ করে। এ তার বৃত্তি। মানবতার বিশেষত্ব জ্ঞান। আস্তিক্য-বুদ্ধি তার জ্ঞানের অনিবার্য্য দোসর। এ সংস্কার অসভ্যের এবং অতি সভ্যের প্রাণে বিরাজিত। কে সে? তার আকার, প্রকার, ভাব এবং কর্ম্ম-প্রণালীর ধারণায় পৃথক, সভ্য নর হতে সভ্য নর। তাই স্মৃতি জ্ঞানের অপোহনের তিনিই বিধাতা—একথা গীতা শাস্ত্র গেয়েছেন। স্রষ্টা রুষ্ট না করুণ, নর-বলিতে তাঁর সন্তোষ না একান্ত মনে প্রণিধানে তাঁর সাযুজ্য লাভ হয়—এ সকল প্রশ্ন ও ধারণা বুদ্ধি-জীবী মানুষের বিচার বিতর্কের পরিণাম। কিন্তু সবার চিত্তের পট-ভূমি আস্তিক্য-বুদ্ধি।

নাস্তিক্য বুদ্ধির জনক মানুষের উত্তরকালের বিচার। প্রত্যেক আন্তরিক নাস্তিককে তার নিজের আস্তিক্য সংস্কার দমন ক'রে আপনার মতবাদ প্রচার করতে হয়েছে। চার্ব্বাক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের ফলে নিজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। কপিলের ঈশ্বরাসিদ্ধে সিদ্ধান্তের মধ্যে দার্শনিকের সংস্কারের সঙ্কেত পাওয়া যায়। এঁদের তর্ক মাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধি ঘিরে নয়, নিজের সহজলব্ধ জন্মের দোসর আস্তিক্য ধারণার সঙ্গে।

নর-শিশুর মধ্যে এই আস্তিক্য-বুদ্ধির উন্মেষ লক্ষ্য করা যায় শিশুকাল হতে মানুষকে পর্য্যবেক্ষণ করলে। তার জননীর স্নেহ এবং শক্তির কাছে মাথা হেঁট করতে শেখে শিশু বুদ্ধি। অথচ সংস্কারবলে সে জানে যে চাহিলেই পাওয়া যায় মাতৃ-স্নেহ। বাল্যকাল হ'তে নর ধীরে ধীরে যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশের সন্মুখীন হয়, তার মনে তাদের স্রষ্টার বিকাশ-শক্তির প্রশ্ন জাগে। গাছ আসে কোথা হ'তে, তাতে ফুল ফোটায় কে এবং সে শুকিয়ে যায় কোন কঠোর বিধানে। এসব কথা সদাই শুনতে পাওয়া যায় শিশুর-মুখে। এ প্রেরণার উৎস-মুখে আছে তার ধারণা বিরাটের। তার কাছে সে মাথা হেঁট করতে শেখে, গাছের ফল পেয়ে কৃতজ্ঞতার আমেজ পায় মনে। ইহাই ভক্তির বীজ। এই ভাব বাড়লেই ক্রমশঃ ভক্তিলতা বেড়ে ওঠে।

নারদের মতে ভক্তি পরম প্রেমরূপা। পরম প্রেম অবশ্য লৌকিক বা সাধারণ প্রেম নয়। কিন্তু প্রেম যে পরম প্রেমের আভাস—একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রেম সম্প্রসারণের বাহন। এই পার্থিব বৃত্তি প্রবল প্রেমের

স্রোত পরমের দিকে নিয়ন্ত্রণ করলে পরম প্রেমে পরিণত হওয়া কি অসম্ভব? যার প্রাণ রসহীন, সে মাত্র পরের প্রজ্ঞা নিয়ে কাল কাটায়। তার মাধুরীর উপলব্ধি হবে কোথা হতে।

শাণ্ডিল্য সূত্র বলেছেন—ভক্তি ঈশ্বরে পরা-ভক্তি। কিন্তু অপরা ভক্তিতে কি তার বীজ নাই?

গীতা বলেছেন—ভারতে স্থূল দেহ উৎপন্ন হলেই ইচ্ছাও দ্বেষ উত্থিত হয়। ইচ্ছাও দ্বেষের দ্বন্দ্বে মোহ জন্মে। প্রাণীগণ সেই মোহের দ্বারাই অভিভূত হয়।

তাই সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরকে আমরা ভুলি। রাগ ও দ্বেষের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সহজ অনুরাগকে অন্তরমুখ করলেই সহজে ভক্তির উৎস-মুখ খুলে যায়। একবার তার পরশ পেলে জগৎ ভিন্নরূপ ধরে, কারণ তখন হৃদয় দেখে তাঁরে, অনলে, অনিলে, চির-নভোনীলে, ভূধর শিখরে গহনে, বিটপী লতায় জলদের গায় শশী তারকায় তপনে।

এই সহজ সংস্কারকে পথ ছেড়ে দিলে, সে নিজে নির্ব্বাচন করে ভক্তির পথ।

সত্তাবাদ

আস্তিক ও নাস্তিক সত্তাবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সত্তাবাদীদিগের মধ্যে সকল বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর ও ধর্ম্মে বিশ্বাসী, কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঈশ্বরবাদীদিগের মধ্যে কিয়োকেগার্দ, মার্সেল ও লাভেল উল্লেখযোগ্য। হেইডেগার, সার্ট্রা, বেভিয়ার ও ব্যাটালি নিরীশ্বরবাদী।

কিয়ার্কেগার্দ ধর্ম্মে প্রটেস্ট্যান্ট ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় তিনি অতিশয় আমোদ ও বিলাস-প্রিয় ছিলেন, অতিরিক্ত মদ্যপান তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিয়া তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে এক প্রবল ঝটিকার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহার পরে তাঁহার মন সময়ে সময়ে যেমন নির্ম্মল আনন্দে প্লাবিত হইত, তেমনি তীব্র যন্ত্রণায় অভিভূত হইত, এবং তিনি মানসিক সাম্য হারাইয়া ফেলিতেন। ইহার ফলে তাঁহার বাকদত্তা এক মহিলার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। হয় তো তাঁহার সহিত বিবাহে তাঁহার প্রণয়িনী সুখী হইবেন না ভাবিয়াই তিনি সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

কিয়ার্কেগার্দের মতে সত্য বিষয়ীগত (Truth is Subjective)। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, সত্য যখন আমার জীবনের সহিত এক হইয়া যায়, তখন ভিন্ন আমি সত্যের প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হই না, এই অর্থে যেমন, তেমনি "আপেক্ষিক অর্থেও" (relative sense) সত্য বিষয়ীগত। যাহা সত্য, তাহা সংবিদ্ আপনার মধ্য হইতে সৃষ্টি করে। স্বাধীন ক্রিয়াই সত্য। কিন্তু কিয়ার্কেগার্দের স্বাধীন কর্ম্ম যুক্তি-মূলক নির্দ্ধারণ (ratinal choice) নহে। ইহা একটা যুক্তিহীন প্রেরণা (impulse), অন্ধকারে লম্ফপ্রদানের মতো। বিষয়গত অনিশ্চিতিকে (objective incertitude) অসীম আগ্রহে দুঃসাহসে বরণ করাই স্বাধীনতা। এই যুক্তি-বর্জিত অনৈশ্চিত্য বরণ করিয়া—অন্ধকারে লম্ফপ্রদান করিয়া—কিয়ার্কেগার্দ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। যুক্তির সহিত তাঁহার বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর প্রমাণযোগ্য কোনও প্রত্যয় নহেন। তিনি আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সত্তা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহাকে অপমান করার সমান।

কিয়ার্কেগার্দের মতের মধ্যে শৃঙ্খলা নাই। গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের চিন্তা সু-সম্বদ্ধ। দে-কার্ত বাহ্যজগৎ ও মনের পরস্পরের উপর ক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। মার্সেল দেহকে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সংযোগসূত্র বলিয়াছেন। আমাদের স্বকীয় দেহের অনুভব হইতেই আমরা স্বকীয় অস্তিত্বের অনুভূতি প্রাপ্ত হই। আবার দেহের অনুভব হইতে বাহ্যজগতের অস্তিত্বের জ্ঞানও লাভ করি। যখন আমরা কোনও বস্তুর অস্তিত্বের কথা বলি, তখন সেই বস্তু যে আমার দেহের সংস্পর্শে আসিতে সমর্থ, এবং আমার দেহের সহিত সংযুক্ত, ইহা বিশ্বাস করি বলিয়াই উহা বলি। আমার দেহ এবং আমার মধ্যে যে সংযোগ, তাহা যদিও ঘনিষ্ঠ, তথাপি তাহার স্বরূপ আমার অজ্ঞাত। এই সংযোগ দ্বারাই আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান রক্ষিত হয়।

মার্সেলের মতেও মানুষের অস্তিত্ব তাহার সারের পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রত্যেকেই তাহার ব্যক্তিগত সার নিজেই সৃষ্টি করে। বাঁচিয়া থাকা ও Existence তাঁহার মতে এক কথা নহে। কুকুর বাঁচিয়া থাকে।

ুষ Exists। আপনাকে সৃষ্টি করাই অস্তিত্ব। তাহা কেবল মানুষেই ারে। মানুষের ইচ্ছাই মানুষের সৃষ্টি করে। এই ইচ্ছা দ্বারা মানুষ নবরত আপনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই যে আপনাকে অতিক্রমণ, া অসঙ্গ ঈশ্বরের অভিমুখে গমন। মানুষ অসঙ্গের অংশভাক্। ঈশ্বর ন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য ইহা সত্য, এই জ্ঞানও যতটা যুক্তিযুক্ত, া অপেক্ষা অধিকতর মিষ্টিক। কিন্তু মার্সেল বলেন, দর্শন এবং ষ্টিক মতের মধ্যে কোনও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে কি না তাহা ন্দেহের বিষয়। আমরা যে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ই, তাহার কারণ ইহা নহে, যে ঈশ্বর কোনও উন্নত জীবনের আদর্শ মাদিগের নিকট প্রকাশিত করেন। কোনও আদর্শই আমাদের জ্ঞানে বিভূর্ত হয় না। কিন্তু একটা উন্নততর অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে আমাদের ায় নিহিত শক্তিই আমাদিগকে চালিত করে। লক্ষ্য অধিগত হইবার র আমরা তাহার সুস্পষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হই। ইহাতে আমাদের বুদ্ধির নিও প্রেরণা নাই। এ প্রেরণা প্রাণের প্রেরণা।

বিশ্বাস বুদ্ধিদ্বারা অর্জিত হয় না, তাহা বুদ্ধির বিষয় একেবারেই ে। বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আমাদের ইচ্ছার গতি ও নৈতিক প্রকৃতির noral disposition) উপর। কোনও বিশেষ মত অপেক্ষা ব্যক্তি াই বিশ্বাস অধিকতর আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রচারিত মত পক্ষা প্রচারক-ব্যক্তির উপরই বিশ্বাস ন্যস্ত হয়।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে মার্সেলের মতও সম্পূর্ণ ক্তর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহার বিশ্বাস যুক্তিহীন। তাহার বিশ্বাস া কি না, তিনি তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। বিশ্বাসদ্বারা জীবন বৎ হয়, ইহা বিশ্বাস করিলে জীবনের মধ্যে অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহা া জীবন-পথ আলোকিত হয় বলিয়াই তিনি বিশ্বাস অবলম্বন রিয়াছেন।

অন্যান্য Existentialistদিগের মতো মার্সেল ও anguish অথবা তির কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুর চিন্তা হইতেই তাঁহার anguish ভূত। মার্সেলের মতে জীবন যে অর্থহীন এই বোধ এবং এই বোধ তে যে হতাশার উদ্ভব হয়, তাহা স্বাভাবিক। জীবন যে সম্পূর্ণ হীন বলিয়া প্রতীত হয়, ইহার কারণ জীবনের স্বরূপের মধ্যেই নিহিত। অর্থহীন জীবন বহন করিয়া মৃত্যুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে হয়, া হইতে যে হতাশার উৎপত্তি হয় তাহা একটা নিদারুণ তথ্য। ইহা তে মুক্তির উপায়-স্বরূপে যাহারা আত্মহত্যার সমর্থন করেন, মার্সেলের তাহাদের যুক্তি অখণ্ডনীয়। আমরা যে জীবনে সম্মতি দেই, জীবন ন করিতে স্বীকৃত হই, তাহা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য, একটা াসের ফল।

মার্সেল তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া বিশ্বাস অবলম্বন রিয়াছেন। ইহার ফলে নিরীশ্বর Existentialistদিগের আশাহীন বাদ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে চল্লিশ বৎসর স তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হতাশা ক্ষণিক লাভন-রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে জয় করিয়াছিলেন এবং আশাকে জীবনের পাথেয় রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন "জীবের পক্ষে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো আত্মার পক্ষে আশা অপরিহার্য্য। আশা যেখানে নাই, আত্মা সেখানে শুষ্ক ও প্রাণহীন।"

হেইডেগার ফ্রেবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি মানুষের অস্তিত্বকে "জগতের মধ্যে স্থিতি"—বিশেষ অবস্থার মধ্যে অবস্থিতিমাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই Da-sein—নিজের ইচ্ছা অথবা নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে জগতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া। মানুষ যখন জানিতে পারিল, তখন দেখিতে পাইল সে জগতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই স্বেচ্ছাহীন Engazment হইতেই তাহার স্বাধীন Engagement এর প্রয়োজনের উদ্ভব। এই নিঃসম্বল পরিত্যক্ত অবস্থায় তাহাকে নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইতে হয়। ইহার পরিণতি যে মৃত্যুতে, তাহা সে জানে। জগতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া কোথাও কোনও অর্থ অথবা যুক্তি দেখিতে পায় না। সকলই যুক্তিহীন, অর্থহীন, বলিয়া প্রতীত হয়। কোন বস্তুরই কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা হইতেই anguish-এর উদ্ভব। আমার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া জাগতিক বস্তুকে আমার উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়করূপে ব্যবহার করিতে পারি; আমার উদ্দেশ্যের সহায়করূপে তাহা অর্থবৎ হয় বটে—কিন্তু পরিণাম? পরিণাম অপরিহার্য্য মৃত্যু। মৃত্যুতে সব শেষ। সেই মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে পরিহাস করিয়া কোনও কিছুরই কোনও মূল্য নাই বুঝিয়াও, যখন আমি আপনাকে Engage করি, তখনই প্রকৃত অস্তিত্ব (authentic) আমার হয়। কিন্তু সকলে এই সত্যের আলোক সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং অধিকাংশ মানুষই স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়—দশ জনে যাহা করে, তাহাই করে। তাহাদের অস্তিত্ব Das Manএর অস্তিত্ব, unauthentic, প্রকৃত অস্তিত্ব নহে।

সারট্র্যর শূন্যবাদ

সারট্র্যর মতে জগৎ প্রতিভাসের সমষ্টি হইলেও এই প্রতিভাস মনের সৃষ্টি নহে। জ্ঞানের পূর্ব্বে মনের বাহিরে জ্ঞেয় বস্তু বর্ত্তমান থাকে। যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে সারট্র্য L'en Soi অথবা স্বগত বস্তু (thing-in-itself) বলিয়াছেন। En Soi নিরেট বস্তু, তাহার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক নাই। সেই জন্য ইহা আপনার নিকট অস্বচ্ছ (opaque)—অর্থাৎ সংজ্ঞাহীন। En Soi শব্দের অর্থ আপনা হইতে অভিন্ন হওয়া—এই অভিন্নতা-বশতঃ En Soi আপনা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না—তাহা যাহা নয়—হইতে পারে না। সংবিদের সহিত দর্পণের তুলনা করা যায়। কিন্তু En Soi দর্পণের মত নহে, অন্য কোনও বস্তু তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সুতরাং অন্য কিছু হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায় না। ইহা যে কোনও আদর্শকে অনুসরণ করিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহাও নহে। ইহার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই, কোনও অর্থ নাই। ইহা আছে মাত্র। ইহার অস্তিত্বের মধ্যে কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহার কোনও প্রয়োজ

নাই। ইহার অস্তিত্ব আকস্মিক—ঐকান্তিকভাবে আকস্মিক; যুক্তি-বিহীন ও অপ্রয়োজনীয়।

En-Soi বৈশিষ্ট্য-বিহীন। কোন গুণ দ্বারাই বিশেষিত নহে। ইহার জ্ঞাতা সংবিদের অনুপস্থিতিতে ইহা শৃঙ্খলাহীন, যুক্তিবর্জ্জিত তমোভূত Chaos মাত্র। এই যুক্তিহীনতার বোধ হইতে বিবমিসা বোধের উদ্ভব হয়।

এই যুক্তিহীন জগৎ যখন আমার জ্ঞাত জগতে পরিণত হয়, তখন ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অর্থবৎ হয়। তখন ইহা শৃঙ্খলামণ্ডিত প্রাতিভাসিক জগতে পরিণত হয়। এই জগৎ সকলের নিকট একইরূপে প্রতিভাত হয় না। চিত্রকর, এনজিনিয়ার ও মেষপালকের নিকট একই পার্ব্বত্য দৃশ্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশ্যের উপযোগীরূপে জগৎ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বস্তু আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্যের সহিত যে সকল বস্তুর সম্বন্ধ নাই, আমাদের নিকট তাহাদের অস্তিত্বই নাই। আমাদের উদ্দেশ্যের উপযোগীরূপে জ্ঞানে আবির্ভূত হইয়াই তাহারা বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরে তাহারা পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। পর্ব্বতের অপর পারে অবস্থিত কোনও স্থানে গমনেচ্ছু লোকের নিকট পর্ব্বত বাধা স্বরূপ; পর্ব্বতারোহণেচ্ছু লোকের নিকট সেই পর্ব্বতই তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়। জগৎ যখন আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তখন আমার নিজের অস্তিত্বও আমার নিকট প্রকাশিত করে। আমাদের অস্তিত্ব জগতের উপর নির্ভর করে না। জগৎই সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভরশীল। আমরা না থাকিলে জগৎ থাকিত না। যাহা হইতে বাহ্য সত্তার উদ্ভব হয় আমিই সেই সত্তা। এই "আমি" অর্থাৎ সংবিদ্‌কে সত্তাবাদিগণ Pour Soi (ইহার নিজের জন্য For itself) নাম দিয়াছেন। Pour Soiএর উদ্ভব হইতেই উহাদের উৎপত্তি।

আমার জ্ঞানে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হয়, অন্য মানুষ তাহাদের অন্তর্গত। তাহারা আমার সজাতীয়; তাহাদেরও সংবিদ আছে। কিন্তু তাহারা আমাদের উদ্দেশ্যের সহকারী অথবা প্রতিবন্ধকরূপেই আবির্ভূত হয়। সুতরাং আমার জগতে আবির্ভাবের জন্য তাহারা আমার উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাহাদেরও "তাহাদের জন্য" সত্তা (pour soi) আছে। তাহাদের নিকট আমিও তাহাদের উদ্দেশ্যের সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধকরূপে প্রতিভাত হই। আমি তাহাদের জ্ঞাত জগতের নানাবস্তুর মধ্যে একটি বস্তুতে পরিণত হই। আমি pour soi হইতে পতিত হইয়া অন্যের বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হই। কবিগণ যে আদর্শ-সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, ভ্রাতৃ-ভাবে উদ্বুদ্ধ মানবমণ্ডলীর সমবায়ে গঠিত প্রেমরাজ্যের কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তব মানব-সমাজ তাহার বিপরীত। সংবিদসম্পন্ন বিভিন্ন মনের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রেমের সম্বন্ধ নহে। প্রত্যেক মানুষই তাহার স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী। অন্য মানুষকে তাহার উপায়রূপে ব্যবহার করিতে চায়। যাহাকে প্রেম বা ভালবাসা বলা হয়, তাহাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। প্রেমিক যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে অধিকার করিতে চায়। কোনও বস্তুকে যেভাবে অধিকার করা যায়, সেভাবে না হইলেও, মানুষের প্রতি প্রেম একপ্রকার বিশেষভাবে অধিকার করার ইচ্ছামাত্র। প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদের স্বতন্ত্র সত্তা আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে চায়, এবং যখন তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তখন তাহার প্রেমের পাত্রকে হারায়, প্রেমের পাত্রের স্বতন্ত্র সত্তার লোপ হয়, এবং প্রেমিক আবার তাহার স্বকীয় নির্জ্জনতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং প্রেমিকদের মধ্যেও সংঘর্ষ বর্ত্তমান। জগতে যদি কেবলমাত্র একটি মানুষ থাকিত, তাহা হইলে অস্তিত্বকে পরম মঙ্গল বলিয়া মনে করা চলিত, কিন্তু বহু মানুষের অস্তিত্ব-বশতঃ তাহা অমঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। যে জগতে অন্য লোকের অস্তিত্ব আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশই আদিমপাপ (Original Sin).

সারট্রের মতে আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে। দেহ-বিহীন সংবিদ অসম্ভব। দেহ ও সংবিদ অভিন্ন। সারট্রা সংবিদকে একটি অতিরিক্ত অনাবশ্যক প্রতিভাস (epi-phenomenon) বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের মধ্যে প্রভেদ এই, যে অন্যান্য প্রাণীর সংবিদ নাই, মানুষের আছে। মানুষ আপনার কাছে এবং জগতের কাছে বর্ত্তমান—অর্থাৎ আপনার ও জগতের অস্তিত্ব জানিতে পারে; অন্যান্য বস্তু—প্রস্তর, বৃক্ষ প্রভৃতি En-soi; তাহারা আপনাদের মধ্যে বর্ত্তমান, আপনাদের সম্বন্ধে নহে (not for themselves); তাহারা pour soi নহে। Pour-soi-এর অর্থ সংবিদ্ (Consciousness)। সংবিদের জন্যই, সংবিদের দ্বারাই জগতের উৎপত্তি। এই সংবিদ কি? সারট্রা বহির্জগৎ ও আন্তর্জগতের দুইটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না? তিনি আত্মার (Soul) অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সংবিদের কোন আধেয় নাই, তাহার মধ্যে কিছুই নাই। সংবিদ কিছুই না—অবস্তু (nothing)—ইহার বস্তুত্ব নাই, ইহা বিশুদ্ধ প্রতিভাস মাত্র। সংবিদের জন্যই শব্দ শ্রুত হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টির ভাবী আবির্ভাব অনুমিত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু যে শব্দ শোনে, যে অনুমান করে সে কিছুই না। জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে যে সত্তার (being) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে যাহা জ্ঞাত হয়—যাহা সর্বদাই আছে তাহাই মাত্র। জ্ঞাতার অস্তিত্ব নাই, তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। যে কারণের জন্য 'জ্ঞাত' বিষয়ের আবির্ভাব হয়, তাহাই মাত্র জ্ঞাতা। কিন্তু সে কারণ কি? জ্ঞাত যাহা, তাহা আপনা হইতে উপস্থিত হয় না, অনুপস্থিতও নহে। তাহার আবির্ভাব কাহার নিকট? কিছুর নিকটই নহে (to nothing)। যাহা-দ্বারা বস্তুর আবির্ভাব হয়, সেই অবস্তুই (nothing) pour-soi। কিন্তু জ্ঞাত-বর্জিত কোনও সত্তা অস্তিত্বই ইহার নাই। সুতরাং জগৎই সংবিদ। এই জগতের বাহিরে সকলই অবস্তু। এই অবস্তুই মানুষ। যাহার সমীপে (জ্ঞাত বিষয়ের) উপস্থিতি হইতে সংবিদের উদ্ভব, তাহা হইতে ভিন্ন হওয়াই সংবিদের প্রকৃতি। যখন কোনও একটি বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন আমি সেইটি

ই, এই জ্ঞানই হয়। 'জানা' অর্থ যাহা আমি নই, তাহাই অবগত হওয়া। বিষয়-বর্জিত সংবিদের অস্তিত্ব নাই। বস্তুর প্রতিরূপ, স্মৃতি, কামনা, ভয়, ঘৃণা, সহানুভূতি প্রভৃতি কোনও তথাকথিত আত্মিক পদার্থ সংবিদের মধ্যে নাই। সংবিদের বহিঃস্থ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতেই এই সকলের উদ্ভব হয়। কিন্তু কাহার সম্বন্ধ? উত্তর—কিছুরই নহে। সংবিদের অন্তরতম প্রদেশেও অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত-বিষয়ের অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। জ্ঞাতার দর্শন কখনও পাওয়া যায় না। যে সংবিদে জগৎ জ্ঞাত হয়, তাহা অবস্তু, তাহা কিছুই নহে। এই সমস্ত কথার অর্থ নিতান্তই অস্পষ্ট। ইহাতে অবস্তু দ্বারা বস্তু-সিদ্ধির প্রমাণ, অসৎ হইতে ভাবের উদ্ভব প্রমাণের চেষ্টা সুস্পষ্ট।

কিন্তু জগতের জ্ঞানের সময়ে, জগতের কাছে উপস্থিতির সময়, যদি সংবিদ্‌ অবস্তু হইয়া যায়, তাহা হইলে নিজের কাছে উপস্থিতির সময়, আত্ম-জ্ঞানের সময়, আত্ম-পরিচিন্তনের (self reflection-এর) সময়, সংবিদের কী হয়? এই প্রশ্নের সারত্র্য যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অতি দুর্বোধ্য। নিজের নিকট উপস্থিতি বলিলে নিজের নিকট হইতে দূরে অবস্থিতির সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়। সংবিদ যেমন pour-soi, তেমনি En-soi-ও বটে। En-soi রূপে সংবিদ সর্বদাই আপনার মধ্যে বর্তমান। Pour-soi রূপে সংবিদ আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। যখন আপনার জ্ঞান হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদের উদ্ভব হয়—দূরত্বের উদ্ভব হয়, En-soi-এর মধ্যে ফাঁক অথবা শূন্যের আবির্ভাব হয়। এই নিজের নিকট উপস্থিতির দ্বারা, নিজের জ্ঞানের দ্বারা সত্তার খর্বতা সাধিত হয়, সত্তা নিম্নে পতিত হয়। সংবিদ একটি পীড়া, কুসুমে কীট।

সংবিদ বস্তুত্ব-হীন হইলেও সারাত্র্য তাহার এক আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষমতা হইতেছে "শূন্যে পরিণত করিবার" ক্ষমতা, বিনাশ করিবার ক্ষমতা। যখন আমরা কিছু কল্পনা করি, তখন সম্মুখে বর্তমান বস্তুদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন পিটারকে খুঁজিতে কোনও কাফেতে প্রবেশ করি তখন পিটারের মূর্তি সংবিদে উদিত হয়। কাফেতে ভোজনরত ব্যক্তিগণ তখন সংবিদের নিকট শূন্যে বিলীন হয়। আবার যখন পিটার কাফেতে নাই বুঝিলাম, তখন তাহার মূর্তি বিনষ্ট হয়; পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিদিগের মূর্তি তখন সংবিদে জাগ্রত হইয়া উঠে। দুঃখিত অবস্থায় যখন আমি আমাকে দুঃখিত জানিয়া বলি—"আমি দুঃখিত", তখন En-soi আমি pour-soiতে পরিণত হইয়াছে, En-soi হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আমি জ্ঞাতরূপে En-soiকে জ্ঞানের বিষয় করিয়াছি। En-soi-এর বিনাশসাধন করিয়াছি। En-soiকে বিনাশ করিয়া pour-soi আবির্ভূত হয়, আবির্ভূত হইয়া pour-soi আবার En-soiর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। বিনষ্ট En-soi-এর অভিমুখী pour-soi একাধারে pour-soi ও En-soi উভয়ই হইতে চায়—অর্থাৎ জাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া En-soiএর যে সত্তা বিনষ্ট হইয়াছিল, En-soi তাহার পুনরুদ্ধার করিতে চায়, আবার জাতৃত্বও রক্ষা করিতে চায়। কিন্তু En-soi এবং pour-soi পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মী; কেননা pour-soiএর অর্থই হইতেছে En-soi হইতে বিভিন্নতা। মানুষ কখনই pour-soi—En-soi হইতে পারিবে না। সুতরাং চিরকালই তাহাকে তাহার লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে হইবে—লক্ষ্য কখনই অধিগত হইবে না, এইজন্যই সংবিদ একটি পীড়া, সংবিদাপন্ন হওয়া দুর্ভাগ্য।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনই হয় (যাহা Existentiast গণ বলেন), তাহা হইলে অন্ধভাবে এই অনধিগম্য মরীচিকার অনুসরণ কেন? এই উন্মত্ত প্রচেষ্টা পরিহার করিয়া—সংবিদের প্রতি লোভ বর্জন করিয়া—মানুষ কেন En-soi-এর শান্তির মধ্যে আশ্রয় খোঁজে না? ইহার উত্তরে সারত্র্য বলেন, স্বাধীনতার অর্থ নির্দ্ধারণের স্বাধীনতা; নির্দ্ধারণ না করিবার স্বাধীনতা নহে। (freedom to choose, not freedom not to choose)। "আমি কিছু নির্দ্ধারণ করিব না"—ইহাও নির্দ্ধারণ। নির্দ্ধারণ না করিবার স্বাধীনতা মানুষের নাই। সুতরাং এই স্বাধীনতাও যুক্তিহীন—absurd। এই যুক্তিহীন অস্তিত্ব-বহন করাই মানুষের নিয়তি। কিন্তু ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা-দ্বারা এই নিয়তি হইতে তো মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। আত্মহত্যা করিব না কেন? ইহার উত্তর দিয়াছেন Albert Camus এবং Georges Bataille. তাঁহারা বলেন, জগতের যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেই মানবের গৌরব। পরিণাম যাহাই হউক, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না—এই মনোভাব পোষণ করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ? নাস্তিক Existentialist গণ মানুষের এই দুর্ভাগ্যের কারণ-স্বরূপ কোনও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শূন্যে আস্ফালন! অর্থহীন বীরত্বাভিনয়!!

সারত্র্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না; ঈশ্বর নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগের মতে ঈশ্বর কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট নহেন, তাঁহার কারণ তিনি নিজে; তিনি Causa Sui। কিন্তু তিনি যদি তাঁহার অস্তিত্বের কারণ হন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়—তাঁহার কার্য্যরূপে আবির্ভাবের পূর্ব্বে, কারণ রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা স্ববিরোধী। ইহাই সারত্র্যের যুক্তি। কিন্তু ঈশ্বর নিজের কারণ—ইহার অর্থ ইহা নহে, যে তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার অর্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও কারণ নাই। তিনি স্বয়ম্ভু। তাঁহার অস্তিত্ব সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিক, পরিনিষ্ঠিতা অকৃত। ইহাই তাঁহার প্রকৃতি।

সারত্র্যের "দায়িত্বে"র ধারণা দুর্বোধ্য। তাঁহার মতে সংবিদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যাহা বাছিয়া লইয়াছিলাম (original choice) তাহা দ্বারাই আমাদের সজ্ঞান-ক্রিয়া সকল নিয়ন্ত্রিত। এ রকম কিছু যে আমরা করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের জানা নাই—তাহা পরিচিন্তন (Reflection) আবির্ভূত হইবার পূর্ববর্তী। সুতরাং তাহা অনুমান করিবার কোনও ভিত্তি নাই। কিন্তু সারত্র্য বলেন, যে আমরা দায়িত্ববোধ ও anguish হইতে ইহা অনুমান করা যায়।

দায়িত্ব শব্দ সারট্রা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট নহে। কাহারও নিকট যে আমাদের কর্ম্মের জন্ম আমরা দায়ী, তাহা সারট্রা স্বীকার করেন না। সারট্রার দায়িত্ব ঈশ্বরের নিকট নহে; সমাজের নিকট নহে, নিজের নিকট নহে। "আমাদের যাহা ভালো লাগে, তাহাই যে আমরা করি, তাহা নহে। তবুও আমরা যাহা, তাহার জন্ম আমরা দায়ী। ইহা সুস্পষ্ট।" তাহার মতে জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহার সবকিছুর জন্মই আমরা দায়ী। গত বিশ্বযুদ্ধের জন্ম তিনি আপনাকে দায়ী মনে করিয়াছেন। সংগ্রামশীল জগতে মানুষকে স্বাধীন বলিয়া তাহার কর্ম্ম তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ফল বলিয়া স্বীকার করিয়া, জগতের যাবতীয় ঘটনার দায়িত্ব নাকি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। Old Testment-এর জব যখন বলিয়াছিলেন, "মাতৃগর্ভে আমি কেন মরিলাম না", তখন তিনি তাহার জন্মের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, কেননা তাহা না হইলে, তিনি তাহার জন্মের দিনকে অভিসম্পাত করিতে পারিতেন না। তেমনি ফ্রান্সের পরাভবের জন্ম আক্ষেপ করিয়া সারট্রা সেই পরাভবকে স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার নিকট সেই পরাভব সত্য হইয়াছিল। সুতরাং তিনি তাহার জন্ম দায়ী। এই হেঁয়ালি বো[ঝা] কষ্টকর!

সারট্রোর মতে 'অস্তিত্ব' আগন্তুক (contingent)। আবশ্[যক] (necessary) নহে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি থাকে, তা[হা] হইলে তাহাও আগন্তুক, আবশ্যক নহে। এই আগন্তুক অস্তিত্ব [ও] আবশ্যক অস্তিত্ব উভয়ই তাঁহার মতে যুক্তিহীন। ইহা সত্য যে যাহা[রা] ঈশ্বরের-স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে অচিন্ত[নীয়] বলিয়াছেন। মন তাঁহার ধারণা করিতে পারে না, বাক্য তাঁহা[র] প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু ইহার অর্থ ই[হা] নহে, যে তাহার অস্তিত্ব যুক্তিহীন, absurd। সারত্রো En-soi-[এর] অস্তিত্ব pour-soi-এর অস্তিত্ব, স্বাধীন ইচ্ছা সকলকেই যুক্তিহ[ীন] বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সত্তা (Being) যুক্তিহীন, কারণহীন[,] তাহা অনিয়ত, অনবশ্য (without necessity)। যাহা কিছু আ[ছে] সকলই যুক্তিহীন—তাহার উৎপত্তি যুক্তিহীন, স্থিতি যুক্তিহীন, তাহা[র] বিনাশ আপাতিক ও যুক্তিহীন। সুতরাং বলিতে পারা যায়, সারট্রে[র] দর্শনও যুক্তিহীন। (ক্রমশঃ

অনন্যা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিয়েছ তোমার পাত্র হ'তে
সুধার পাত্রে আরও কী অমৃত আছে?
আমি চলেছিনু নিরুদ্দেশের পথে
হঠাৎ দাঁড়ালে একলাটি মোর কাছে।
তখন আমার তৃষ্ণার জ্বালা বুকে
তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যেন, চৌচির,
শুষ্ক অধরে দাহ, বিশুষ্ক মুখে
অগ্নির জ্বালা, সারা দেহ অস্থির।
আমার অধরে ছিল নাক আস্বাদ
তোমার অধর পাত্রে তখন সুধা
উপচিয়া পড়ে, আমি যেন উন্মাদ
মুহূর্ত্তে চাই মিটাতে সকল ক্ষুধা।
অঞ্জলি পাতি দাঁড়ানু সমুখে তব
ঊর্দ্ধে তুলিয়া তৃষ্ণাকাতর আঁখি
তৃষা মিটাবার ভঙ্গিটি অভিনব
অধরে আমার চুম্বন দিলে আঁকি।

দু' বাহু বাড়ায়ে তোমারে ধরিতে যাই
তুমি আগে এসে আপনি দিলে যে ধরা,
দারুণ অগ্নি-দাহন তৃষ্ণা তাই—
অমৃত শীতল পরশে ভুবন ভরা।
সেই সে ভুবনে ভুবনমোহিনী নারী,
সেই সে তৃষায় তুমিই অমৃতময়ী
এ মরু হৃদয়ে ক্ষণ মেঘসঞ্চারী
বিদ্যুল্লতা হবে কি মরণ-জয়ী?
তুমি মরীচিকা কাঁপিছ দ্বিপ্রহরে
আমি মরুশিখা আমারে লবে কি বুকে
তৃষ্ণাহরণ বরণ-স্বয়ম্বরে
সায়াহ্ন চিতা দেখিবে সকৌতুকি?
অঞ্জলি পাতি আবার দাঁড়ানু আমি
অনেক দিয়েছ আরও আরও কিছু দাও,
তৃষিত বক্ষে আসুক বন্যা নামি
ও গো অনন্যা হৃদয়-অর্ঘ্য নাও।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তারপর দিন সমস্ত দুপুর-বিকেল ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সরমা। কাল রাত্রে ঘুম একরকম হয়নি বলতে গেলে, তবু আজকের যে ঘুমটা সেটা সহজ ঘুম নয়, ব্যবস্থা করে ডেকে নিয়ে আসতে হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা পানপাত্র খালি পড়ে আছে।

সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে। বিষণ্ণ সন্ধ্যা, সমস্ত শরীরটা একটা দারুণ অবসাদ, মনের তো কথাই নেই। বারান্দায় একটা হেলানো চেয়ারে অলসভাবে বসে আছে; চাকরকে বলা—যে কেউ আসুক, বলবে শরীর অসুস্থ, তাই ঘুমোচ্ছে।

সকাল বেলাই একবার বাইরে চলে গিয়েছিল একটা ছুতো করে। ফিরে এসে দেখে, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেটা সফল হয়েছে—খগেন তার জিনিসপত্র নিয়ে বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছে।

—ভালোই হোল, অযথা একটা বাক্-বিতণ্ডা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছিল।

কিন্তু অসহ একটা শূন্যতা; যেন কিছু নেই, কিছু হবার নয়! সামনের শুধু ম্লান-অস্তরাগ-লিপ্ত আকাশের মতো একটা শূন্যতা—তারই গায়ে দুটো জীবনের কত বিচিত্র চিত্র ফুটে ফুটে মিলিয়ে যাচ্ছে।···দুটো জীবনই বৈকি—মাঝে একটা মৃত্যুর ব্যবধান; ওদিককার জীবনে সরমার মৃত্যু হয়ে গেছে যে!

এখন মৃত্যুর এপার থেকে এই জীবনকে দেখছে সরমা। কত বিচিত্র মৃত্যুপথ চেয়েই না এই জীবনে এসে পৌঁচেছে সবাই!

এক এসেছে সে। তার বাবা একজন প্রবীণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। বিদ্যায়, জ্ঞানে, অর্থে, প্রতিষ্ঠায় সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সরমা শুনেছে—অকালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কোথায় গিয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন তিনি।···চারটি সন্তানের মধ্যে এক সরমা, সেই বড়। সরমা যে শেল হেনে এসেছে তারপর তিনি নাকি সন্তানদের প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়েছেন—কোথায় পড়ে আছে, কী ভাবে, সরমা তার সন্ধান পায় নি।

আবার এও দেখছে—বাপেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মেয়েকে। স্বামী আইনের শরণ নিয়ে বিফলমনোরথ হয়েছে, পাগল হয়ে গেছে, আত্মহত্যা করেছে। আবার স্বামী-স্ত্রীতেও এসেছে। আর্ট, প্রগতি, কৃষ্টি—এই সব বড় বড় গালভরা নাম নিয়ে এসে প্রবেশ করে; রূপ থাকতে, কলা-প্রতিভা থাকতে যারা এল না—তাদের করেছে ব্যঙ্গ। এসেছে স্ত্রীর ভরসাতেই, নিজে একটা পর্দা হ'য়ে, একটা শোভনতা (অন্তত তাদের বিবেচনায়)—তারপর সেটা রক্ষা করা প্রয়োজন হয় নি, অন্তরীক্ষে গিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

মা নিয়ে এসেছে মেয়েকে, ভাই নিয়ে এসেছে ভগ্নীকে; অন্য আত্মীয়ের কথা তো ছেড়ে দিতেই হয়। শিশু আসছে, কিশোরী আসছে, যুবতী আসছে—দিনে দিনে, নিত্য নূতন মৃত্যুর সংবাদ। মৃত্যুর ওদিকে জীবনের শত বৈচিত্র্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব তেমন চোখে পড়ত না, এদিক থেকে সরমা দেখেছে মরণের উলঙ্গ মিছিল; স্তম্ভিত হয়ে গেছে, সে-হিসাবে তার এক ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে চলে আসা তো কত মার্জনীয়। এখন কিন্তু আর চোখেই লাগে না ওসব।···আজ আবার একটা অবসন্নতার মাঝে সেই সব নিজের কদর্যতায় উঠছে ফুটে।

সমাজের বুকের ওপর দিয়ে এ কী একটা সর্বনাশ এগিয়ে চলেছে। যত এগুচ্ছে ততই করছে শক্তিসঞ্চয়!

সর্বনাশ আরও এইজন্য যে—সবাই আসছে দারিদ্র্যের জন্যই—এমন নয়। নিতান্তই শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, প্রগতি··· সেদিন এল বিশাখা—শিক্ষিতা, সুন্দরী, সম্পন্ন গৃহের গৃহিণী—স্বামীর সঙ্গে মতভেদ একটা বিশেষ সিনেমা-দেখা নিয়েই; একটি শিশুপুত্র, তার সুদ্ধ মায়া কাটিয়ে চলে

এল। সে এখন সিনেমার জন্ম দেবে, একটা অভিনয়ে সরমার কো-অ্যাক্‌ট্রেস।

আগেও হয়েছে এ-ধরণের ব্যাপার, পাপেপুণ্যেজড়িত মনুষ্য-সমাজই তো ছিল থিয়েটার। কিন্তু তারা বাইরে এসে একপাশে দাঁড়াত। সিনেমা আছে সমাজের গা ঘেঁষে, এখান থেকে এরা সমাজকে প্রগতির পথে টেনে আনবার জন্য দেয় 'বাণী'; কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতাদের ইণ্টারভিউ দিয়ে কলা-কৃষ্টির জন্য ত্যাগের কথা, তপস্যার কথা তুলে মনকে করে বিভ্রান্ত।

তারপর এদিককার জীবন।···এই তো কালকের খগেন-মলয়ার ব্যাপার গেল।···মৃগাঙ্কও ছিল এর মধ্যে! সরমা এসে পড়ল দেখে আর এল না। অথচ সরমার মনে আছে—গোড়ায় একদিনকার কথা—ঠাট্টা-বিদ্রুপের মধ্যে ঐ মৃগাঙ্ক হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে—"থাক্, মলয়া রয়েছে, নয় তো এর উত্তর দিতাম।"···স্ত্রীর বন্ধু-কন্যা ব'লে বাক-সংযম!

এই জীবনেরই আর একটা দিক—বীভৎস, ভয়াবহ—ভয়াবহ, চোরাবালির মতো। মৃগাঙ্ক আর সোনাদি স্বামী-স্ত্রী মোটেই নয়। সোনাদি ওর বিধবা শ্যালিকা।··· ওরা সিনেমার অভিনয়ের দিকে যায় নি, অন্য একটা দিক সামলাচ্ছে দুইজনে মিলে; ওদের প্রতিভা এই দিকেই খুলেছে। নিতান্তই অভিনয়ের দিকে যায় নি বলে সমাজে খানিকটা যাতায়াতের পথ আছে খোলা, ওরা দুজনে সেই পথে গিয়ে সরমার মতো অসতর্কদের নিয়ে আসে টেনে।

ওর আসার ইতিহাসটা সমস্ত মনে পড়ে যাচ্ছে সরমার—এই ম্লান সন্ধ্যায় যেন অন্য আর একজনের একটা করুণ জীবনকাহিনী ওর তপ্ত চক্ষু দুটিকে অশ্রু-সজল করে তুলছে···হে ভগবান, আর কি সে কোনদিনই পারবে না ফিরে যেতে ঐ জীবনে?

কটা মাস আরও গেল কেটে। খগেনের পর ঐ মৃগাঙ্ককেই আশ্রয় করতে চেয়েছিল সরমা। আশ্চর্য! কেমন করে, কী বিপাকে যে এই সব ধরণের ঘটনা নিত্যই ঘটছে এদিককার এই জীবনক্ষেত্রে! অথচ নিত্যই ঘটছে। এর ফল এই হোল যে সোনাদির দুয়ার একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল সরমার কাছে। মৃগাঙ্ক-সোনাদি কোম্পানীতে সোনাদিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এক সময় খগেন বলেছিল—she is the brain. সেটা টের পেয়েছিল সরমা আগেই; কিন্তু কথাটার পূর্ণ সত্যতা জানতে পারলে—সোনাদি তার আর মৃগাঙ্কর ব্যাপারটা জানতে পেরে যখন তার শত্রুতা আরম্ভ করলে।

এমন একটা বিপর্যয়ের কালো মেঘ উঠল আকাশ জুড়ে যে, পুরুষের বিষয়ে একটা ঘৃণা আর আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গেলেও আবার একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হোল সরমাকে।

দিন এগিয়ে চলল এই করে। কখনও সফলতার উল্লাসে বেগমত্ত, কখনও ঐ সফলতার ক্লান্তিতেই অবসন্ন, মন্থর। এখন পূর্ণ যৌবন, পূর্ণ শক্তি, সবটাই সফলতা এখন; কিন্তু বুঝতে পারছে যত সফলতা, ততই পরিণাম আসছে দ্রুত এগিয়ে। মূল্য দিতে হয় চরম, অত্যাচারে অনিয়মে দেহ-মন পড়ছে ভেঙে।···দেখছে তো চারিদিকেই এ জীবনের আয়ু কত অল্প, যতদিন দেহের সুষমা; কিন্তু কতদিনই বা সেটুকুকে আগলে আগলে রাখতে পারা যায়? আজকের স্টার—কালকের উল্কাপাতে মুঠোখানেক ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। অতীতের মতো ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয়, বরং অতীতের চেয়ে বেশিই; কটা বৎসর আর? তারপর?···এই চরম মনে হোলে এক এক সময় কী যে হয়, ইচ্ছে হয় সেই অদূর ভবিষ্যৎটাকে আজই ফেলি এনে, চোখের কাছে এনে প্রত্যক্ষ করি তার বিভীষিকা। পার্টি, অনিয়ম, অত্যাচার—গা ঢেলে দেয় সরমা, আর ভেবে দেখে না কোথায় তলিয়ে চলেছে।

দু বছর প্রায় হয়ে এল। গোটা তিন সিনেমা মুক্তিলাভ করেছে এর মধ্যে, তার ভেতর একটাতে সরমাই নায়িকার ভূমিকায়। একটা খুব চলল, আর দুটো ওৎরায় নি, তবু তার মধ্যে যা সামলেছে তা সরমাই।···হাতে কনট্র্যাক্ট রয়েছে অনেকগুলি—ছোট বড় সবরকম···পেরে ওঠা শক্ত, তবু "না" বললে চলে না; অনুরোধ আছে, উপরোধ আছে। অর্থও আছে। যতদিন দেহের সৌষ্ঠব, কামিয়ে নিতে হবে, ওর চুক্তি-মূল্য এখন বারো হাজার পর্যন্ত উঠেছে।

শুধু তাই তো নয়, যতই আসুক, থাকে না। এ জীবনের যেন এ-ই নিয়ম, সর্বদাই অভাব, বিলাসিতার উঁচু

শিখর লক্ষ্য ক'রে এগুতে হয়, না হলে প্রেষ্টিজ অর্থাৎ কৌলিন্য থাকে না। অর্থ আসছে, কর্পূরের মতো গন্ধ ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে মিলিয়ে। সবার ইতিহাসই এই।···গাড়ি বদলি করেছে দুবার সরমা এর মধ্যে।···ঐ রকম এক একটা উল্লাস মাঝে মাঝে ; নৈলে চলে না।

চেষ্টা করে, ভাববে না ; কিন্তু সে চেষ্টা কবে কারই বা হয়েছে সফল ? ধীরে ধীরে একটা আতঙ্কই জমে উঠছে মনে।

মাঝে মাঝে ওদিক'কার জীবনও এক একটা আতঙ্ক হানে। সে আঘাত কিন্তু এ-ধরণের নয় ; কখনও সামান্য একটি কথার মাধুর্যই চিরন্তন জীবনের সুখ-দুঃখের স্নিগ্ধ একটি অপরূপ প্রত্যাশা তোলে জাগিয়ে। কখনও সামান্য একটি ঘটনা তার বেদনা, তার নৈরাশ্য দিয়ে বুকের মধ্যে একটা হাহাকার তোলে। বৈরাগ্যের শুচিতা, তার মধ্যে আশার ইঙ্গিত—মনে হয় ফিরে যাই সব ছেড়ে, ছিন্ন বস্ত্রে, শুধু পতিতের তপ্ত অশ্রুটুকু সম্বল করে—যাদের ভাসিয়ে দিয়ে এলাম অকূল পারাবারে, খুঁজে দেখি তারা কোথায়, জড়িয়ে ধরি বুকে। নিজেকে অশুচি বলে মনে হয় না, কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না ; পাওয়া যাবে বৈকি ক্ষমা ভগবানের, তার সঙ্গে মানুষেরও সমবেদনা আছে ; আছে বৈকি।—অনন্ত পাপ, পদে পদেই ভ্রান্তি ; তার সমান্তরালেই যদি তাঁর ক্ষমা না থাকে তো সৃষ্টি চলে কি করে ?

একদিনের কথা।

বাইরে ছবি তোলা হবে, কলকাতা থেকে দশ বারো মাইল দক্ষিণে, ছোট একটি নদীর ধারে একটি গ্রাম বাছা হয়েছে। ছোট পার্টি, তার মধ্যে সরমা আছে।

ওর ছবি তোলা হয়ে গেল বিকালের আগে। জায়গাটার শান্ত স্নিগ্ধতা ওর লাগছে বড় ভালো, বিকালের দিকে সে স্নিগ্ধতা আরও অপরূপ হয়ে উঠল যেন। ফেরবার কথা সন্ধ্যার পরে, ও বললে—"আমি একটু ঘুরে আসি ততক্ষণ, আপনাদের হোক।"

খগেনও আছে এ দলে ; (এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়)। একটু দুষ্টামি করেই বললে—"আমিও আসি ?"

সরমা হেসে উত্তর করলে—"ভয় নেই, হারাব না।"

একজন খগেনের হয়ে বললে—"চোখের আড়াল হওয়াও তো কম ভয়ের কথা নয়—সেই কথা বলছে খগেন।"

একটু হেসে, ফিরে দেখে সরমা চলে গেল।

নদীর কখনও কাছে, কখনও খানিকটা তফাৎ দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তাটা। ছোট গ্রাম, এখানে-ওখানে ছড়ানো ছাড়া-ছাড়া বাড়ি। খানিকটা কৌতূহল জাগিয়েছে সরমা—দোরের চৌকাঠে, গাছের তলায়, পথের ধারে থমকে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, তবে ছেলেমেয়ের পাল শুটিঙের ওদিকেই, নিরুপদ্রবেই এগিয়ে যেতে পারছে।

যতই এগুচ্ছে, মনটা কেমন যেন কী হয়ে যাচ্ছে—চারিদিকে ছোট ছোট সংসার-চিত্র—যাওয়া-আসা—জলের কলসী কাঁকালে পৈঠা বেয়ে ওঠা—শিশুর হাত ধরে কেউ উঠানে গিয়ে উঠল—কেউ দাওয়ার ওপর ব'সে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে···এদিকে মন্থর নদী স্রোত, তীরের ঝোপে ঝিল্লির একটানা রব—মনে হচ্ছে এই যেন অনন্ত প্রবহমান জীবনের সুচিন্তিত আপন রূপ—আর যা হচ্ছে না হচ্ছে সব যেন অবান্তর, ব্যতিক্রম, ক্ষণিক।···আজ অনেক আগে থেকেই ওর মনে একটা নূতন চিন্তা উঠেছে খগেনকে নিয়ে।—খগেন একটা প্রণয়-অভিনয়ে ওর কো-অ্যাক্টার আজ—যতই এগুচ্ছে, চিন্তাটা যেন ততই দানা বেঁধে উঠছে···ধরো, সমস্ত জীবনটাই যদি অন্য পথে যেতো—সোনাদি গোড়ায় যা ভাবা গিয়েছিল যদি তাই হোত, খগেনও যদি হোত একটু অন্য রকম, যাতে জীবনের গতিটা অন্যদিকে পড়ত ঢলে ওর মনীষা, ওর সৌন্দর্যপ্রীতি নিয়ে··· তারপর যদি···তারপরেও যদি···মনটা যে আজ কী সুরে বাঁধা হয়ে গেছে, এত অসম্ভব 'যদি'র রাশির মধ্যে দিয়েও বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলছে এগিয়ে···অনুতাপ হচ্ছে, খগেন যেমন বললে আসার কথা, আসতে বললেই হোত। অন্তত নীরব থেকে গেলেও সেটা সম্মতিতেই দাঁড়াত ; তারপর কেউ যদি আসে, সরমার তো চেনা পথ নয়।··· আজ একটা যেন লগ্ন ছিল—বলবার যে—'চলো, ফিরে যাই, বাঁধি আমাদের নীড়, এখনও সময় উৎরে যায় নি।··· এসোনা, হারিয়ে যাবার কথা নিয়েই বেরিয়েছিলাম, এই গ্রামেই হারিয়ে যাই আমরা দুটিতে···'

"বৌমা!"

—পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, সরমা বাঁ দিকে ফিরে চাইলে।···গোলপাতায় ছাওয়া তিনটি ঘর তিন দিকে, মাঝখানে উঠান, দেয়ালের বালাই নেই।

সামনের ঘরের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে একটি বধূ মাঝের পৈঠাটিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘরের দিকে রাঙা পাড়ের ঘোমটা একটু বাঁকানো।…কি উত্তর দিচ্ছে, চাপা গলায়; বাড়িতে কোথাও নিশ্চয় বর রয়েছে।

এইটুকুই চিত্র। খানিকটা তার কল্পনাই, কিন্তু সরমা অভিভূতের মতো রইল দাঁড়িয়ে।…সেই কলেজের দিনের ঠাট্টা করে "বৌমা" বলে ডাকা সবার।…সত্যই এই সম্ভাবনাই ওর মধ্যেও ছিল নাকি কোনদিন স্বপ্ন, এই অবগুণ্ঠনের মতোই নব-যৌবনের একটি সন্নত ব্রীড়ার অন্তরালে?…দাঁড়িয়েই আছে, কী একটা আবেগে সামনের পা একটু উঠে পড়ল—যাবে একবার, আর কিছু না, দুটো কথা কইবে—নৈলে যেন বাঁচে না।

হুঁস হোল; পা'টা টেনে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইল।…না, এ চলবে না, সে-অধিকার ও চিরতরেই হারিয়েছে। ওর পদস্পর্শে গৃহস্থের অঙ্গন হবে কলুষিত। হয়তো বধূটি তুলসীমঞ্চে দীপ জ্বেলে দিতে চলেছে, সরমা গিয়ে কথা কইলেও তার সারা অঙ্গ হয়ে উঠবে অশুচি।

কে যেন কষাঘাত করে সরমার মুখটা নদীর দিকে দিলে ফিরিয়ে। ম্লান নত দৃষ্টি নিয়ে ও আরও অনেকটা দূরে নদীর ধারটিতে গিয়ে বসল।

হারিয়েই গেছে। বাস থেকে ওরা হর্ণ দিয়েছিল, শুনতে যে পায় নি—তার কারণ শুধু এই নয় যে সে এসে পড়েছে অনেক দূরে।…সন্ধ্যা হয়ে গিয়ে যখন জ্যোৎস্না স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন দলের কয়েকজন ওকে এইখানে করলে আবিষ্কার।

আর পারছে না সরমা; ভগবান তাকে মুক্তি দিন; কোথায় তাঁর ক্ষমা? সে-বিশ্বাস ভেঙে গেলে তার উপায় কি হবে?

একটি ভুল, তারই ওপর ভগবান তাঁর শ্লেষই হেনে যান—আরও সফলতাই আসে, আরও সমাদর, আরও অর্থ, মর্যাদা…

কবে কার উদ্দেশে একটি ছোট্ট ডাক শুনে মনে কি হয়েছিল তা মন থেকে যায় মিলিয়ে। না হয় তাই যাক সব মুছে—মিটে, স্রোতে গা এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুক; তাও তো কৈ হয় না?

একদিন কী মনে হোল, নিজেরই একটা ছবি দেখতে গেল—একা। এ ছবিটায় তার প্রধান ভূমিকা তো নয়ই এমন কি বেশিও কিছু নেই, মাঝামাঝি দু'টি দৃশ্যে খানিকটা সংলাপ, একটি নাচ আর একটা গান আছে সিনেমাটা উৎরে গেছে, শুনছে প্রধান আকর্ষণ হয়েছে নাকি ঐ দুটি দৃশ্য। টেলিফোনে ফার্ষ্টক্লাসের মাঝামাঝি একটা জায়গা রিজার্ভ করে রেখেছিল—কেমন একটা সাধ হয়েছে, সবার মধ্যে অপরিজ্ঞাত হয়ে চারিদিকের মতামত শুনবে। যখন আরম্ভ হয়ে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার, সেই সময় সরমা এসে প্রবেশ করল। পোষাক-প্রসাধনের দিক দিয়েও নিজেকে লুকুবার একটা প্রয়াস আছে।

এ ক্লাসটায় ভিড় নেই তেমন, তবু কিছু কিছু কানে আসছে। সামনে কাছাকাছি কোথাও দুজন বন্ধু ব'সে আছে—তাদের মাঝে মাঝে মতামত, চিনেবাদাম ভাঙার শব্দের সঙ্গে। অনুকূলই। একজন বারতিনেক দেখেছে, বন্ধুকে দেখাতে নিয়ে এসেছে, কথাবার্তায় টের পাওয়া গেল সরমারই নাচগানটুকু প্রধান লক্ষ্য।

ঠিক পেছনেই আছে একটি দম্পতি, কম বয়সের। তাদের কথা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে; ফিস্ ফিস্ আওয়াজ, বিরাম নেই বললেই চলে—

"এ কী এমন জিনিস!—সেই তো থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। ভাল্লাগ্‌ছে না।"

"একটু স্থির হয়ে দেখো না, অত উতলা হ'লে চলে! জমে আসছে তো প্লট।"

"আমিও জমে আসছি—শীতে। ভালো লাগবে তবেতো।"

"তোমার ভালো লাগানো যে কত শক্ত! পিসিমার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে কপালে একগাদা সিঁদুর মেখে আসতে পারতে তো…"

"আমি এই উঠলাম!"

"বোস', বোস'…কী ছেলেমানুষী কর!"

"ফের যদি ঐ সব বলো তো যাবই উঠে…ভারী তো পথ—একলাই চলে যেতে পারব।"

"বোস চুপ করে, লক্ষ্মীটি।"

একটু চুপচাপ গেল। কয়েকটা দৃশ্য গেল বেরিয়ে।

"কেমন লাগছে এবার ?"

"তুমি ও-ধরণের কথা যদি আর বলো···"

"আচ্ছা, বলব না।···জমে আসছে না ?"

"ছাই জমে আসছে।···আমি মা-কালীর কাছে মনে মনে মানৎ করলাম—দুজনে গিয়ে নাকে খৎ দিয়ে পুজো দিয়ে আসব, অপরাধ নিও না মা।···যেতে হবে।"

"যাব; কিন্তু অপরাধীকে সামনে দেখলে তো আরও চটেই যাবেন।···উঃ! উঃ!—লাগে!···আচ্ছা যাব গো!··· এইবার দেখো একটু চুপ করে, অরুণার নাচটা আসছে।"

"কে অরুণা ?"

"কেন, সেদিন দেখলে না 'ছায়া-বিথি'তে ? প্রশংসাও তো করলে অত, ভুলে গেছ এর মধ্যে ?"

"ও! বুঝেছি; সেই জন্যেই আসা!···না, আমার মনে অত দাগ কেটে বসে যায় নি তোমার মতন।··· অরুণার নাচ! তাইতো বলি!···উঠতে অরুণা, বসতে অরুণা···"

সিঁদুরে—অভিমানে—ঈর্ষায় চমৎকার লাগছে—এক সঙ্গে কত রকম সুর, তার ওপর প্রশংসা; অরুণার মন এখন ওদের সঙ্গেই।

"চুপ করো লক্ষীটি; এই দেখো—এসে গেছে সেই সীন্‌টা।···নাচে ভালো বলেছি, সেটুকুও তোমার সইবে না, এরকম ক'রে তো···"

এমন সময় সামনে বোধ হয় থার্ড ক্লাস থেকে হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল—"দিদি !! দিদি !! আমার দিদি !!"

"এই! এই! থামো!"

"না, আমার দিদি !! আমি যাব দিদির কাছে !!···"

আওয়াজ শুনে মনে হোল ছিটকে বেরিয়ে গেছে। রব উঠল—"আলো জেলে দাও!···লাইট! লাইট!"

আলো জ্বালতে জ্বালতে সে ততক্ষণ স্টেজের নিচে চলে গেছে, তাকে ধরে ফেলেছে দু'তিনজনে, চেঁচাচ্ছে— "আমার দিদি !! আমার দিদি !! আমার দিদি ছিল !! নিয়ে চলো আমায় !!"

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কুঁজো হয়ে ছটফট করছে!

এদিক থেকে একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবা গিয়ে পৌঁচেছে ততক্ষণ। হাতটা ধরেছে। সবাই বুঝেছে ট্র্যাজেডীটা; প্রশ্ন—মন্তব্য হচ্ছে—"কেন ওকে নিয়ে আসা মশাই?···কে হয় আপনার?···যেও দিদির কাছে খুকি, এখন চলে এসো···ও-দিদির কাছে আর যেন না যেতে হয় মশাই···কী যে সর্বনাশ হচ্ছে চারিদিকে!···"

যুবকটি মেয়েটিকে নিয়ে নিঃশব্দে ওদিককার দরজা দিয়েই আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

সরমা কাঠ হয়ে বসেছিল এতক্ষণ। অনেকে উঠেছে, কৌতূহলবশে এগিয়েও গেছে অনেকে; ও পারে নি।

মিনিট তিন-চারের ব্যাপার, তারপরেই আলো নিভে চিত্র আবার আরম্ভ হোল।

সরমা তেমনি একভাবেই বসে রইল।···কে ছিল মেয়েটি? তারই বোন সুরবালা? বয়স তো এই রকমই হবার কথা; তার মূঢ় আতঙ্কিত দৃষ্টি দিয়ে ভালো করে দেখবার উপায় ছিল না, তিন চারজনের ধস্তাধরির মধ্যে ছটফটও করছিল মেয়েটি, দূরেও; তার পরেই চলে গেল ঘর থেকে।···কে ছিল?···বাবা তার ভাই বোন তিনটিকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন, হয়তো নেইও আর এ-পৃথিবীতে।···এখন তাদের এই দশাই নাকি? অপরিচিতের আশ্রয়ে···হয়তো একজায়গায়ও নয়, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। সুরবালার রূপ আছে, হয়তো বোকামি করে তাই আশ্রয়দাতা নিয়ে এসেছিল—দিদির কৃতিত্ব দেখিয়ে আকৃষ্ট করবে সিনেমার দিকে।

একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়ই প্রায়; এই সীনে তার সঙ্গে আছে কুসুম, নূতন এসেছে, তারই বোন নয় তো?···পুরো সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কী যে মনের অবস্থা হয়েছে, কোন অবলম্বনই যেন আঁকড়ে ধরতে পারছে না, নিজের জীবনই চারিদিক থেকে যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কী সর্বনাশ হোল!—যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে কত শতগুণ বেশি!···এক সময় মনে হয়েছিল—একলাই তো, নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সরে দাঁড়াই নিজের তেজে; সেই তেজ আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

একবার ইচ্ছা হয়েছিল এগিয়ে যেতে, তারপর ওরা বেরিয়ে যেতে, বাইরেও চলে গিয়ে দেখতে, কে? সাহস হোল না, যদি সুরবালাই হয়!—শতসহস্র দৃষ্টির লাঞ্ছনার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে বুক গেল কেঁপে; দুবছরের মর্ম-

নিংড়ানো ব্যথা একটি মুহূর্তের মধ্যে জমে উঠেছিল ; কিন্তু পারলে না।···যদি কুসুমেরই বোন হয় তো—সামনে এখনই তার পাশে সরমাকেও যে তারা সবাই দেখলে। যে-দৃষ্টি একটু আগেই ছিল প্রশংসায় সমুজ্জ্বল সেই দৃষ্টিই এখন, কুসুমকে সামনে না পেয়ে, তারই ওপর বিষ উদ্গীরণ করবে।···পারলে না।

অত সাধ করে দেখতে আসা নিজের দুটো সীন—কখন্ যে বেরিয়ে এসেছে টেরও পায় নি। অনেক পরে, যখন একটু হুঁস হোল, আলোর ভয়ে চোরের মতোই অন্ধকারে-অন্ধকারে বেরিয়ে গেল সরমা।

কলকাতা ভালো লাগছে না, বিষ বাষ্পে যেন ভরে উঠেছে কলকাতা, হাঁপিয়ে উঠেছে সরমা। ইচ্ছে করছে এ জীবন ছেড়ে দিই, কোথাও পালাই, বাবার মতো অজ্ঞাতবাস। গোটা দুই ভালো কনট্র্যাক্ট নেয়ও নি; কিন্তু পালাবে, কোথায়? যেখানেই যাক, নিজের জীবন যে ওর সামনাসামনি হয়ে দাঁড়ায়; এ শত্রু যে ছায়ার চেয়েও অনতিক্রম্য।

কলকাতার জীবন অন্যদিক দিয়েও অসহ্য হয়ে উঠেছে। যত প্রতিপত্তি বাড়ছে ততই ঈর্ষাও পাচ্ছে বৃদ্ধি চারিদিকে, শত্রুর সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে। সোনাদি তো উঠে-পড়ে লেগেছে; ন্যায়-ধর্ম তো তারই দিকে—সেই না একদিন সরমাকে এইখানে পথ দেখিয়ে আনে! তারই পায়ে মারবে ছোবল!

সবচেয়ে বড় কথা আর যুদ্ধ করবার স্পৃহা নেই সরমার, এমন কি বিনা যুদ্ধে যেন পরাজয়ই মেনে নিতে চায়।

সে বড় সর্বনাশের কথা! ওর মিত্রও তো আছে, তাদের সংখ্যাও বেড়েছে, সিনেমা-জগতে একটা উজ্জ্বল তারকা, সে যদি এইভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায়!···ঠিক এই রকমের একটা অবস্থা আসে, তাদের জানা। দুটো বছর তো কিছু নয়, আগেকার জীবনটা থাকে কাছে, স্মৃতি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আনে অবসাদ, আনে নিস্পৃহতা, এই জগতের জটিলতায় অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্যই শত্রুদের বাণ কাটাবার মন্ত্রও থাকে অনধিগত। এই ঝোঁকটা কাটিয়ে দিতে পারলে আবার একটানা বেশ চলে যায় শেষ পর্যন্ত।

মিত্র পক্ষ সতর্ক ছিল এবং সচেষ্টও ছিল।

বম্বে থেকে একদিন একটা প্রস্তাব এল—নায়িকার ভূমিকা না হলেও বেশ বড় ভূমিকাই, একটা হিন্দী চিত্রে। অর্থের দিক দিয়ে চুক্তি-মূল্য এখানকার একটা মূল ভূমিকারই মতো।

সরমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কলকাতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় ওর সিনেমা জীবনেই আবার একটা আস্থা ফিরে এল যেন!···এই জীবনেই একটা নূতন ধারা সৃষ্টি করা যায় না দূরে গিয়ে?···দেখাই যাক না।

কিছু কিছু কনট্রাক্ট এখনও রয়েছে কলকাতায়। কাজ আরম্ভ হয় নি, এমন গোটা তিন কাটিয়ে নিতে পারলে চেষ্টা-চরিত্র করে। গোটা দুইয়ে ওর কয়েকটা শুটিং হয়ে গেছে, বাকী যাওয়া-আসা ক'রে সেরে নেবে। ও সহানুভূতিই পেলে প্রায় সবার কাছেই।

বম্বে থেকে কলকাতাতে এসেই পার্টি একদিন চুক্তি ক'রে গেল।

এর পর থেকেই কোনও এক অদৃশ্য হস্ত ওর গতি নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে।

বম্বে মেলেই যাবার কথা, কিন্তু হঠাৎ একটা নূতন চুক্তি পেয়ে গেল। ওর যাবার দুদিন আগে মধুপুর নেমে, কাছাকাছি পাহাড় অঞ্চলে একটা শুটিং; দুটো দৃশ্যে, তাইতেই শেষ। সরমার তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু খাতিরে পড়ে গেল, মোটা টাকাও পাচ্ছে এটুকুর জন্য। শেষ পর্যন্ত রাজিই হয়ে গেল। ঠিক হোল আর এদিকে না ফিরে শুটিং সেরে মধুপুরেই গাড়ি ধরে একেবারে মোগলসরাইয়ে গিয়ে বম্বে মেল ধরবে।

সেই গাড়িটাই এই অভিশপ্ত গাড়ি।

এর পরেই ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুকুমারের অভিজ্ঞতা মিলে যায় অনেকখানি। ইঞ্জিনটা আসানসোলের সেই এক ঘণ্টার বিলম্বটা কমিয়ে চল্লিশ মিনিটে নিয়ে এসেছে। উৎসাহ গেছে বেড়ে, মধুপুরের অল্প বিরতিটুকু থেকেও কয়েক মিনিট বাঁচিয়ে নিয়ে আবার উন্মত্ত বেগে ছুটল। এই ধরণের অতি দ্রুত গাড়িগুলাতে চড়া একেবারেই অভ্যাস নেই, তায় এই অবস্থা, ক্লান্তির সঙ্গে ভয়েও অবসন্ন

হয়ে সরমা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, জেগে উঠল একেবারেই একটা খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে।

আঘাত লাগেনি, সুকুমারের যেটুকু লেগেছিল সেটুকুও নয়, ও শুয়েছিল একেবারে শেষের গাড়িটায়, যেটাতে ছিল বীরেন্দ্র সিঙের ছেলে আর পুত্রবধূ, তবে সেই একই কামরায় নয়।

ওর গাড়িতে ছিল একটি পাঞ্জাবী পরিবার। ঘুম ভেঙেই দেখে কর্তা সবাইকে নামাচ্ছে, গাড়ি অন্ধকার, একটা চেঁচামেচি পড়ে গেছে। বাইরের যে আওয়াজ সে রকম কথাও কিছু শোনেনি সরমা, জিগ্যেস করলে কি হয়েছে?

"অ্যাক্সিডেণ্ট্...নেমে পড়ো তাড়াতাড়ি সব... এগাড়িটা মনে হয় দাঁড়িয়েই আছে, তবে নেমে তফাতে সরে যাওয়াই ভালো"—নামাবার সঙ্গে সঙ্গে বলে যাচ্ছে।

আত্মরক্ষার সবুজ প্রেরণাতে সরমা হাতের ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল—ওদিকটা ওদের ভিড়; উল্টা দিক দিয়ে। নেমেই মাথাটা যেন গুলিয়ে গেছে, সামনের বিভীষিকা যেন আকৃষ্ট করছে।—কারা কাঁদে!... কি হোল?—খানিকটা এগিয়ে কিন্তু পালাবার যুক্তিটাই প্রবল হয়ে উঠল; যা দেখছে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে, সহ্য করতে পারছে না। খানিকটা ঘুরে ফিরে, মাড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে কিন্তু তখন দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। ঘুট ঘুটে অন্ধকার, মস্তিষ্ক কাজ করছে না। এক সময় আন্দাজে প'ড়ে উঠে, ঢালু বেয়ে বাঁধের নিচে চলে এল; তখনও কিন্তু দিকভ্রান্তিটা ঘোচে নি; একটা আবছায়া ধারণা আছে নিজের গাড়িটার দিকে ফিরে যাচ্ছে, তারপর একটু এগিয়েই চোখে পড়ল ইঞ্জিনের গহ্বরে সেই আগুনের শিখা।...আর কিন্তু ইচ্ছা নেই সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে ফিরে যেতে—সাহস নেই বলাই ঠিক। গাড়ির মধ্যে ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু সে দুটোর মায়া নেই আর। সামনেই চলল। গল্প শোনা, কোম্পানীর লোক নাকি যারা বেঁচে যায় তাদেরও মেরে ফেলে, মোকদ্দমার সম্ভাবনা কমাবার জন্য। কে জানে সত্য কি মিথ্যা, কিন্তু মনের ওপর বিভীষিকার যে চাপ তার মধ্যে সে ভয়টাও রয়েছে।

নিচে নিচে অনেকখানি এগ্নিয়ে গিয়ে তারপর বাঁধের ওপর উঠল।...অগ্নিগর্ভ ইঞ্জিনটাকে যেন বিশ্বাস হয় না; যেন ধ্বংস-প্রাপ্ত একটা যন্ত্র নয়, একটা আহত দানব, মৃত্যু যন্ত্রণার বিক্ষেপেই হঠাৎ খানিকটা ছুটে আসতে পারে।... সবই বিশ্বাস হচ্ছে আজ, মন নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝবার ক্ষমতাটা একেবারে হারিয়েছে।

এগিয়ে চলল। চোখ তুলতে সাহস হচ্ছে না, পারছেও না, রাস্তার যা অবস্থা। কী অন্ধকার! পেছনের ক্ষীয়মান আর্তধ্বনির গায়েই কী বিপুল স্তব্ধতা!...কোথায় চলেছে সে? অন্ধকারে দৃষ্টি স'য়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুদিকে জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সামনে দূরে দূরে জমাট অন্ধকারের মতো ওগুলো কি?...ও! পাহাড়। ঠিক তো পাহাড়ে জায়গায়ই যে।...বুকটা এমন ছাঁৎ করে উঠেছিল!

এর পরেই অন্য এক রকমের ভয় এসে মনটা অধিকার করে ফেললে—এই যে এত বড় একটা মৃত্যু উৎসব হয়ে গেল বনভূমিকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে...চিন্তু এগুতে সাহস করছে না—গা'টা ছমছম করে যেন অবশ হয়ে আসছে—একটা মাত্র একুশ—বাইশ বছরের মেয়েই তো ...দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই—ওকি!...একটি অন্ধকারের ঋজু রেখা লাইনের ওপর দিয়ে—এগিয়ে আসছে কি চলে যাচ্ছে ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু সচল।...সরমা পা তুলতে পারছে না। যে ভয়টা উঠেছিল তাতেই সম্মোহিত হয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইল—দৃষ্টিটা অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগুবার চেষ্টা করছে—স্পষ্টতা একটু বাড়ল—না, এগিয়েই যাচ্ছে, একটা ছায়া-মূর্তি লাইনের ওপর দিয়ে লঘুচরণে এগিয়ে চলেছে!

মানুষও তো হতে পারে, তারই মতো বিভীষিকার আতঙ্কে পালাচ্ছে।

একটু যেন সাহস পাচ্ছে, সরমা প্রাণপণ শক্তি দিয়ে এই সম্ভাবনাটুকুকে বিশ্বাসে পরিণত করবার চেষ্টা করছে... নিশ্চয় মানুষই হবে। পা বাড়ালে।...মানুষই নিশ্চয়— বহুদূরে রয়েছে বলে যেন মনে হয়, ঠিক যেখানে অন্ধকারটা জমতে জমতে একেবারে নিবিড় হয়ে উঠেছে। বোধহয় যেন সরমা লাইনের যে দিকটা ধ'রে চলেছে তার অপর দিক ধরে এগুচ্ছে মূর্তিটা, একটু কাছাকাছি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে—যদিও এখনও অনেকদূরে—পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না...যদি থাকেই পায়ের শব্দ।

তারপর বিশ্বাসটা যখন একটু দৃঢ় হয়ে এসেছে, একটা কাণ্ড হোল। চলা পথটুকুতে লাইনের পাথর গেঁথে গেঁথে গেছে, ওদিকে মনটা যাবার জন্যই বোধ হয় একটা ঠক্কর লেগে সরমা পড়-পড় হয়ে সামলে নিলে—খড়-খড় করে লাইনের কতকগুলা পাথর পড়ল গড়িয়ে। পায়ে একটু চোট লেগেছে, জুতার মধ্যে; খুলে দেখতে যাবে, খেয়াল হোল, না, ততক্ষণ লোকটা আরও এগিয়ে পড়বে। তখুনি সোজা হয়ে উঠে পা বাড়ালে।

কিন্তু কোথায় সে মানুষ!

শরীরটা এবার আরও অবশ হয়ে গেল সরমার, বোধ হয় সব মিলিয়ে দশ সেকেণ্ডও যায় নি যে সে চোখ ফিরিয়ে ছিল—কোথায় সে মানুষ!···বিশ্বাসটা ওর একেবারে গেল উল্টে। ওর মনে পড়ল এমনই তো হয়—সদ্যমুক্ত, নিঃসন্দিগ্ধ বিদেহী আত্মা পৃথিবীর আকর্ষণেই মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে চলেছিল, ঐ একটুখানি শব্দে মানুষের উপস্থিতির কথা টের পেয়েই সচকিত হয়ে আবার গেছে বায়ুতে মিলিয়ে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই; ফিরে যাবে কোথায় সরমা? তার মনে হচ্ছে এখন চারিদিকেই এই। মনে হচ্ছে দৃষ্টি ফেরালেই দেখবে ঐ মহাশ্মশান থেকে অশরীরীদের দীর্ঘ নিঃশব্দ ছায়া-মিছিল আসছে উঠে—একটা নিরন্তর স্রোতেই।···নিরুপায় হয়ে, চরম আশঙ্কায় যে সাহস—তাইতেই ভর করে ও এগিয়ে চলল সামনের দিকে। সেখানটা মনে হয়েছিল মূর্তিটা মিলিয়ে গেছে সেখানটা যে কী করে অতিক্রম করলে, নিজেই বুঝতে পারলে না।···গতি দিলে আরও বাড়িয়ে—দূরের আর্তনাদ খুব ক্ষীণ হয়ে এসেছে, সেও যেন শব্দের প্রেতাত্মাই।

পাহাড়ের সেই গলিটা এসে পড়ল, তার মুখেই সিগন্যালের লাল আলো, বরাবর একরকম মাথা নিচু করে আসছে বলেই এতক্ষণ দেখতে পায় নি। সাহসটা ফিরে এল, সামনে কিছু দূরে একটা স্টেশনেরও আলো যায় দেখা। ছুটতে ইচ্ছা করছে—নিঃসন্দেহভাবে মানুষ কাছে পেয়ে চেঁচাতেও ইচ্ছা করছে এখান থেকে; শুধু শক্তির অভাবে কোনটাই পারলে না।

স্টেশন নয়, তবু মানুষেরই কণ্ঠস্বর।

সরমা গিয়ে হল্ট-কীপারের রামায়ণ পাঠের মধ্যে দাঁড়াল।

(ক্রমশ)

নারীর প্রতি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জাগো নারী আপন গৌরবে,
ভূষণে বসনে নয় চিকণ দশনে নয়,
নয় হাবেভাবে নয় সাবান সৌরভে।
বেণীর বয়নে নয় চটুল নয়নে নয়
নয় করতল, নয়, অধর রঞ্জনে,
নর্তিত চরণে নয় অঙ্গের বরণে নয়
সাজো তুমি নারীত্বের কুসুম চন্দনে।

কন্যারূপে আনো নারি শান্তি বারি ভরা ঝারি
সেবার অঞ্জলি ভরি বিলাও প্রসাদ।
ভক্তি দিয়ে প্রীতি দিয়ে সব হৃদি কিনে নিয়ে
অনুদ্ধত পুণ্য শিরে লভ' আশীর্বাদ।
এস দয়িতার রূপে পতি পাশে চুপে চুপে
প্রেমের ভাণ্ডার খুলে দাও সগৌরবে।
তুচ্ছ হীরা মুক্তা হেম, হিয়ার গভীর প্রেম
চিরবন্দী বাহু পাশে করুক বল্লভে।
এস তুমি ভগ্নী হয়ে দ্বিতীয়ার বাটা বয়ে
সকল তরুণ ভালে ফোঁটা দাও আঁকি।
ঢালি পূত গঙ্গাজলে নিভাও কামনানল
ভ্রাতৃবন্ধুদের হাতে বাঁধি দাও রাখী।
সন্তানের বাহু হার হউক ভূষণ সার
জননী হইয়া তুমি দাঁড়াও চত্বরে।
পুরুষ তোমার পানে সন্তানের দৃষ্টিদানে
আনত করুক শির মুক্ত ভক্তিভরে।
তুমিও ময়ূরী নও আবার মরালী হও,
ফেলে দাও ধার-করা ময়ূরের পাখা।
লুকাইয়া নিজ কায়া সৃজন করোনা মায়া,
মুড়ায়োনা সোনা দিয়ে লোহা আর শাঁখা।
পুরুষের মনোবনে গর্জ্জে পশু খনে খনে
তবুও হয়নি ধ্বস্ত সমাজ সংসার।
তাহাদের উন্মাদিতে সাধকের যায় চিতে?
চাহ কি এ লোকালয় হোক ছারখার?
মনে রেখ সর্ব্বসী যে নারী নয় অপ্সরী সে,
তপোভঙ্গ কাজ তার, নাই তার পতি।
নহ তুমি বিদ্যাধরী, নহ কামসহচরী,
ভারতে আদর্শ তব সীতা অরুন্ধতী।

কবি-কুঞ্জ

নরেন্দ্র দেব

লণ্ডনে পৌঁছবার পরদিন থেকেই পত্নী আমার অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন ওখানকার 'কবি-কুঞ্জ' দেখে আসবার জন্য। সকলেই জানেন লণ্ডনের দুটি প্রসিদ্ধ উপাসনা মন্দির হ'চ্ছে 'সেন্টপলস্ কেথিড্রাল' এবং 'ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবি'। শেষোক্ত ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবির এক অংশের নাম হ'য়ে গেছে—"পোয়েট্স কর্ণার"! ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যিনি প্রথম কবিরূপে পূজিত হ'য়েছিলেন সেই

ওয়েস্ট্ মিনিস্টার এ্যাবি

'ক্যান্টারবারি টেল্‌সের' আদি-রসাত্মক কবি 'জিওফ্রে চসার' থেকে শুরু করে একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও যিনি জীবিত ছিলেন, সেই ছন্দ মিলের যাদুকর মহাকবি 'এ্যালফ্রেড্ টেনিসন্' পর্যন্ত সকলেরই সমাধি-স্মৃতি ও প্রতিমূর্তি আছে এই প্রার্থনা-গৃহের একটি কোণে। এই কোণটিরই নাম 'পোয়েট্স্ কর্ণার'।

গেলাম একদিন ভোরে উঠে উৎসুক চিত্তে এই তীর্থ দর্শন করতে। যুগ্মশীর্ষ ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবি সুন্দর কারুকার্য খচিত। এই অসংখ্য ছোট
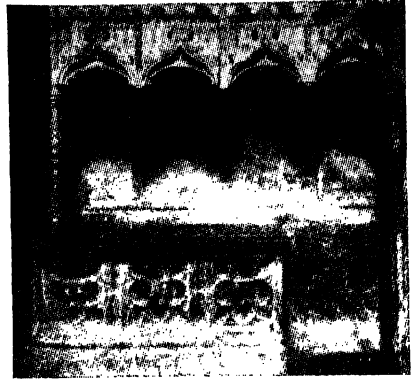
জিওফ্রে চসার

বড় চূড়ায় মণ্ডিত সুদর্শন মন্দিরটি বেশ ভাল লাগলো। স্থাপত্য শিল্পকলা-সমাকীর্ণ এই বিশাল উপাসনা-মন্দির লণ্ডনের গৌরবময় দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অন্যতম। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ভূমির চারিদিক সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা।
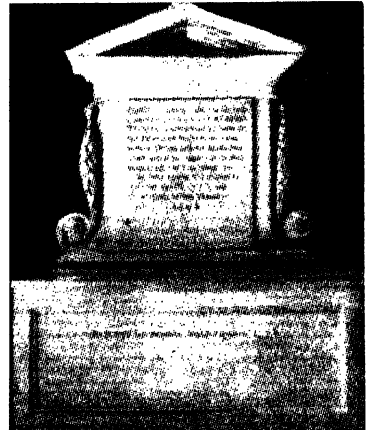
এডমণ্ড স্পেন্সার্

তার মধ্যে প্রশস্ত সেই ঘন প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারিপাশে রেলিংয়ের ধারে ধারে নানা তরুলতা শোভিত উদ্যান। ক্লান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য

মধ্যে মধ্যে আসন পাতা আছে। এ মন্দিরে প্রবেশের দুটি তোরণ দ্বার। একটি পশ্চিম-মুখী, অপরটি উত্তর-মুখী। পশ্চিম-মুখী দ্বারটিই হল প্রধান প্রবেশ পথ।

এ্যাবির অভ্যন্তরস্থ 'কবিকুঞ্জ'

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাঙ্গণের উপলবিস্তৃত প্রশস্ত পথটি পার হয়ে মন্দিরে ঢোকবার মুখে আমাদের হাতে একখানি ক'রে কাগজ দেওয়া হল। আগামী রবিবার এখানে যে উপাসনা হবে তারই কার্যসূচীসহ সংখ্যক লোকই আসেন। এঁদের অধিকাংশেরই আজকাল ধর্মের উপর আর আস্থা নেই। তাই, প্রধান প্রধান গির্জারও 'প্রার্থনা-হলে' তিন ভাগ আসনই শূন্য পড়ে থাকে। পল্লী অঞ্চলে কিন্তু রবিবার সকালে এখনও গির্জাগুলি উপাসনা ও প্রার্থনায় বিশ্বাসী নরনারীতে ভরে ওঠে। এটা যেন প্রতি সপ্তাহে তাদের একটা প্রতীক্ষিত সামাজিক সম্মেলন!

ইংরেজরা তাঁদের এই 'ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবি'কে শুধু যে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাসনালয় বলেই মনে করেন, তাই নয়, নানা পৌরাণিক উদ্ভট কাহিনী ও কিম্বদন্তীর ঘেরাটোপ বুনে এটিকে তাঁরা একটী রহস্যের আবরণে ঘিরে রেখেছেন। এর সম্বন্ধে সত্য তথ্য কতটুকু তা' আবিষ্কার করা কঠিন। সংশয়মূলক ঐতিহ্যের স্তূপে তা চাপা পড়ে গিয়াছে। এশিয়াই বলুন—আর য়ুরোপই বলুন, দেবালয়, তীর্থস্থান, উপাসনা গৃহ অর্থাৎ ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বত্রই দেখা যায় সেই একই আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রহস্যের অবাধ প্রচার।

মাইকেল ড্রেটন

বেন জনসন্

আহ্বান বা আমন্ত্রণ পত্র। আজকাল ভগবানের নাম করবার জন্যও লোককে ভাল ভাল গান ও বক্তৃতার লোভ দেখিয়ে ডাকতে হয়। নইলে, উপাসনায় লোক হয় না। ইংলণ্ডের একাধিক গির্জায় রবিবারের প্রার্থনায় যোগ দিতে গিয়ে দেখেছি লণ্ডনের বড় বড় উপাসনা গৃহে অতি অল্প-

যাক্ সে কথা। ইংল্যাণ্ড দীর্ঘকাল রোমানদের অধীন ছিল। ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবি যে অতি পুরাতন এ বিষয়ে কারো আর এখন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, ঠিক এটি না হলেও, এই খানেই যে এক সময়ে রোমানদের এক বিশাল মন্দির ছিল তার প্রমাণ বেরিয়েছে

ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবির মধ্যভাগস্থ ভূগর্ভ থেকে। রোমান হর্ম্যতল, বা মেঝে, বড় বড় রোমান ইট, টালি, এমন কি একটি রোমান শবাধার পর্যন্ত এই উত্তরমুখী প্রবেশ দ্বারের সামনে পাওয়া গেছে। রোমান প্রাচীরের খানিকটাও অক্ষত অবস্থায় এখানকার মাটির মধ্যে চাপা রয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন এই গির্জার কোনও কোনও অংশ সেই রোমান সৌধের ইট নিয়েই গাঁথা।

প্রতি রবিবারই এবং বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় দিনে এখানে ধ্যান ধারণা, উপাসনা, উপদেশ ও সঙ্গীত হয়। কাজের দিনও ফাঁক যায় না। সোমবার, শুক্রবার এবং শনিবার বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা থাকে। এখানে ওয়েস্ট

উইলিয়াম সেক্সপীয়ার

মিনিস্টার এ্যাবির কার্যসূচী তুলে দিলাম। এ থেকে পাঠকদের একটা পরিষ্কার ধারণা হ'তে পারে।

প্রতি রবিবার

সকাল ৮টা—প্রভু যীশুখৃষ্টের শেষ ভোজনের প্রসাদোৎসব
(রুটি ও মদ্যপান) (Celebration of Holy Communion)
সকাল ১০॥টা—প্রাতঃকালীন প্রার্থনা এবং ধর্মোপদেশ
" ১১৷টা—Holy Communion
(প্রতি মাসের দ্বিতীয় রবিবারে সমবেত সঙ্গীতসহ)

বৈকাল ৩টা—সান্ধ্য সঙ্গীত বা স্তবগান ও ধর্মোপদেশ
সন্ধ্যা ৬॥টা—উপাসনা ও ধর্মোপদেশ

কাজের দিন

সকাল ৮টা—Celebration of Holy Communion
" ৯॥টা—ওয়েস্ট মিনিস্ট্যার স্কুল উপাসনা
" ১০টা—প্রভাতী প্রার্থনা*
বৈকাল ৩টা—সান্ধ্য সঙ্গীত, ধর্মোপদেশ, বক্তৃতা

ওয়েস্ট মিনিস্টারে প্রবেশ করবার সময় মনে রাখতে হবে যে এই প্রসিদ্ধ উপাসনা মন্দিরের মধ্যে যে সব মানুষকে সসম্মানে সমাহিত করা হয়েছে জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে, তাঁরা অনেকে

জন মিল্‌টন

কিন্তু এ সম্মানের একেবারেই যোগ্য নন। সন্ধান নিয়ে জেনেছি, এ্যাবির কর্তৃপক্ষরা এমন একাধিক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরও সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ এখানে নির্মাণ করবার অনুমতি দিয়েছেন যাঁদের উত্তরাধিকারীরা বেশ মোটা টাকা

---

* খৃষ্টের জন্মদিনে, (Christmas Day) নববর্ষে, Circumcision (সুন্নৎ দিবস) খৃষ্টের অবতার রূপে প্রকাশের দিন, (Epiphany) উত্থান দিবস (Ascension Day)—(গুড্ ফ্রাইডে) 'সেন্ট পীটার্স দিবসে', সর্বসন্ত দিনে (All Saints Day) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ স্মরণীয় ও বরণীয় পর্বদিনে প্রভাতী প্রার্থনার পর Celebration of Holy Communion করা হয়।

এঁদের দক্ষিণা পাঠিয়েছেন। দেখে মনে হোল, এখানে ঐশ্বর্যের দ্বারা আভিজাত্য কেনা যায়।

আরও একটা কথা মনে রাখা চাই, সেটা আর কিছু নয়, এখানে সমাধি বেদীর জাঁকজমক ও স্মৃতিস্তম্ভের উচ্চতা দেখে যেন কেউ এ ভুল না করেন যে, স্বর্গগত মানুষটিও তবে নিশ্চয়ই একজন বেশ উচ্চস্তরের বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ওটা কেবলমাত্র মৃতের বংশধরের অর্থের আস্ফালন বা ধনের অহংকার!

এই প্রার্থনা গৃহের কক্ষতলস্থ ধূলির সঙ্গে কত বড় বড় রাজারাণীর দেহাবশেষ মিশিয়ে রয়েছে, কত স্যাক্সন, ষ্টুয়ার্ট, হানোভার রাজবংশের গৌরবমণি অখ্যাত-অজ্ঞাতের মতো এখানে আজ ভূলুণ্ঠিত হয়ে আছে।

কারু কারু পরিচয়-ফলক মেঝের উপর থেকে হয়ত এখনও সম্পূর্ণ প্রতিকৃতিও নানা পুস্তকে ও পত্র পত্রিকায় চখে পড়েছে। সেই 'বুয়োর ওয়ার' থেকে শুরু করে 'রুশো-জাপানীজ ওয়ার', চাইনীজ ওয়ার, পর পর দুটি প্রচণ্ড বিশ্বযুদ্ধে এবং হালের কোরিয়া যুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের জীবনে ঘটেছে। এর ফলে লর্ড রবার্টস, লর্ড কিচ্‌নার, ফিল্ড্ মার্শাল ভাইকউন্ট এ্যালেনবি, ভাইকাউন্ট প্লামার, প্রভৃতি বহু সামরিক খ্যাতিমানের সঙ্গে আমাদের খবরের কাগজ মারফৎ পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা অনেকেই এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও অনেক নামের সঙ্গে আমাদের কানের পরিচয় ছিল। যেমন লর্ড স্যালিসবারী, জোসেফ্ চেম্বারলেন, বনার-ল' প্রভৃতি, তাদেরও দেহাবশেষ এখানে স্থান পেয়েছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাঁদের নাম উৎকীর্ণ হয়ে গেছে সেই আউটরাম, ল্যারেন্স, ক্লাইভ্ প্রভৃতি অনেক

জন ফিলিপস্

জন ড্রাইডেন

টমাস গ্রে

মিলিয়ে যায় নি। কতলোকের তাও গিয়েছে। অথচ, এরই মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়বে হয়ত পয়সাওয়ালা বাজে লোকেদের বিরাট বিরাট এক একটি সমাধি-স্মৃতি; যা ভাস্কর্য শিল্পের দিক থেকে যেমনি অসুন্দর, তেমনি এই সুন্দর এ্যাবিরও সৌন্দর্য-হানিকর!

ওয়েস্ট্ মিনিস্টার এ্যাবির প্রধান বিশেষত্ব শোনা গেল যে, গোটা গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এইটিই নাকি একমাত্র মন্দির যা সম্পূর্ণ ইংরিজি কায়দায় তৈরি। অন্য সব গির্জাই এখানে রোম্যান বা ফরাসীদের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে। ওয়েস্ট্-মিনিস্টার এ্যাবির কবি-কুঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করবার আগে আমাদের দক্ষিণে ও বামে এমন বহুলোকের সমাধি দেখলাম যাঁদের নামের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীরা বিশেষ পরিচিত এবং যাঁদের ধুরন্ধরের শেষ শয্যা সসম্মানে রচিত হয়েছে এইখানে। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও যাঁরা স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছেন যেমন, সার টমাস্ আওয়েন আইজাক ওয়াটস্, এডমিরালে শোভেল ইত্যাদি, তাঁদেরও অনেকের সমাধি এইখানেই রয়েছে।

এই ক্রুশাকৃতি হলেরই দক্ষিণ বাহুটিতে 'কবিকুঞ্জ' রচিত হয়েছে। ব্রিটীশ জাতির ইতিহাসে 'ওয়েস্ট্ মিনিস্টার এ্যাবি' এমন একটি স্থান অধিকার করে র'য়েছে যেখানে ওদের জাতীয় ভাবধারা একেবারে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে গেছে। এখানকার এই কবিকুঞ্জই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। কাব্যসাহিত্য প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় সংস্কৃতিও কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই, 'ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবি' সন্দর্শনে যাঁরাই আসেন তাঁরাই সর্বাগ্রে

খোঁজ করেন—এখানে যে পোয়েটস্‌কর্ণার আছে শুনেছি, সেটি কোথায় ?

আমরাও সেই দলের। ব্যতিক্রম নই। এই মন্দিরস্থ সহযাত্রী দর্শকদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রতেই তিনি আমাদের বিদেশী বুঝে নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন এই কবিকুঞ্জের মধ্যে। ইনি একজন ইংরাজ দুহিতা। নাম কুমারী উইনিফ্রেড্ সিম্পসন। মুখে চোখে একটা অভিজাত সৌন্দর্যের সুষমা। অতি বিনম্র সুমিষ্ট ব্যবহার তাঁর —যেন কোনও খৃষ্টান মঠের চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী! কিন্তু বেশভূষায় বৈরাগ্যের কোনও লক্ষণই ছিল না। আমাদের পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলেন। আগ্রহের সঙ্গে নিজে আমাদের নিয়ে গিয়ে প্রত্যেক কবির সমাধি ও স্মৃতি ফলকের ইতিহাস এবং সেই কবির, সাহিত্যিকের বা শিল্পীর সবিশেষ পরিচয় আমাদের শোনাতে লাগলেন। তাঁর এই অযাচিত

স্যামুয়েল জনসন

অনুগ্রহের জন্য যদিও আমরা তাঁর কাছে ঋণী—তবু, একথা অস্বীকার করলে সত্য গোপন করা হবে, যে তিনি আগে থেকে আমাদের 'কোন্‌টি-কার' বলে দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে নিজেরা আবিষ্কারের আনন্দ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হয়েছিলাম।

প্রথমেই আমরা এসে দাঁড়ালাম আদি ইংরাজি-কবি জিওফ্রে চসারের সমাধির সামনে। আজ থেকে ৬০০ বছর আগে ইনি জীবিত ছিলেন। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম। পিতা জন চসারের ছিল মদ চোলাইয়ের কারখানা আর সরাইখানা। বিচিত্র এই কবির জীবন। সম্ভবতঃ স্কুল কলেজে পড়েছিলেন। প্রমাণ যদিও পাওয়া যায় নি কিছু। ১৩৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কবির ১৭।১৮ বছর বয়সের সময় তিনি যে ডিউক অফ ক্ল্যারেন্সের পত্নীর নিকট কিশোর-পরিচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন এটা জানা গেছে। এখান থেকে তিনি রাজ পরিবারে কাজ নিয়ে চলে যান। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের অভিযানে যোগ দিয়ে ব্রিটানীতে বন্দী হয়েছিলেন এবং রাজা যে ১৬ পাউণ্ড পণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে এনেছিলেন এখবরও পাওয়া যায়! কিন্তু এরপর ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দশ বছর তাঁর আর কোনও উদ্দেশ মেলে না। দশ বছর পরে একদিন হঠাৎ জানা যায় তাঁর কথা, যখন রাজকীয় ঘোষণায় প্রচার করা হয় যে—আমাদের প্রিয় তীরন্দাজ বীর জিওফ্রে চসারকে রাজার গৃহরক্ষীরূপে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁর জন্য একটি বিশেষ সম্মানসূচক মাসহারারও ব্যবস্থা হয়েছে।

রাণীর শয়নকক্ষের পরিচারিকা শ্রীমতী ফিলিপা চসার নামে একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া যায় ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। ইনিই যে কবি চসারের পত্নী ছিলেন এ বিষয়ে আজ আর কোনও সন্দেহের অবকাশ

ওলিভার গোল্ডস্মিথ
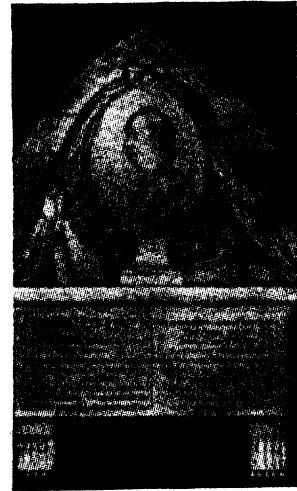
নেই। শোনা যায় এঁর দু'টি ছেলে এবং একটি মেয়ে ছিল। চসারের বিবাহিত জীবন নাকি সুখের হয়নি।

১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে চসারের সর্বপ্রথম কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখা "Death of Blanche the Duchess" শীর্ষক কবিতাটিতে। এই Blanche the Duchess ছিলেন John of Gauntএর পত্নী। তারপর ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকার্যে ব্রিটেনের বাইরে চলে যান এবং প্রায় দশ বারো বছর ধরে ক্রমাগত জেনোয়া, পিসা, ফ্লোরেন্স্ প্রভৃতি ইটালির নানাস্থানে, পরে ফ্রান্সের ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চলে এবং পরে তাঁকে আবার ইটালিতে ঘুরে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। ১৩৮২ খৃঃ অব্দে দেখা যায় তিনি লণ্ডনে কণ্ট্রোলার অফ কাস্টমস পদে নিযুক্ত হয়েছেন। রাজাদেশে তাঁকে প্রত্যহ একটি সুরাপূর্ণ কুজার উপহার দেওয়া হ'ত। শ্রীযুক্ত জন অফ্ গণ্ট্—যাঁর স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে চসার প্রথম কবিতা লিখেছিলেন তিনি কবিকে আমৃত্যু দশপাউণ্ড হিসাবে মাসহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

১৩৭৪ খৃঃ অব্দে তিনি রাজসরকার থেকে জায়গীর পান, যার আয় ছিল প্রায় হাজার পাউণ্ড। তারপর ১৩৮৬ সালে দেখা গেল তিনি কেন্টের নাইট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৩৬৯ খৃঃ অব্দে তিনি সেই যে কলম ধরেছিলেন সে কলম আর নিত্য নূতন রচনা থেকে বিরত হয়নি। আমরা এই সময়ের মধ্যে পেয়েছি তাঁর কাছে একে একে The Assembly of Fowls, The House of Fame, Troilus and Cressida. এবং The Legend of Good Women. চসারের প্রসিদ্ধ রচনা Canterbury Talesএর মধ্যে এর অনেকগুলি কাহিনীর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। যেমন, The Clerks, Man of Laws,

উইলিয়াম ওয়ার্ডসবার্থ

Prioress's, Second Nuns. এবং Kinghts Tales. বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে চসারের রচনায় নাকি ইতালীয় সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশী। 'দান্তে' ও 'পেত্রার্ক' প্রভৃতির তিনি ভক্ত ছিলেন এবং একাজ্যের ভার Boccaccioর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায় তিনি বড় অমিতব্যয়ী ছিলেন, দুঃসময়ের জন্ত কিছুই সঞ্চয় করেন নি। তাই শেষ বয়সে অর্থকষ্টে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। ১৪০০ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজ-আদেশে তাঁর শবদেহ ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবির এক কোনে সমাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু, কবি চসারের জনপ্রিয়তার জন্য সেই কোনটি শেষে 'Poets Corner' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

'কবিকুঞ্জ' বা Poets' Cornerএর এই ভাবে প্রথম উৎপত্তি হয়। ইংরেজের ইতিহাসে এর স্থান খুব উঁচুতে। ব্রিটিশের জাতীয় গৌরবের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হয়ে উঠেছে আজ ওয়াস্টমিনিস্টার এ্যাবির এই কোনটি। কবিতা যে অবহেলার ও অবজ্ঞার নয়, আমাদের দেশের অনেকেরই হিসাবী মস্তিষ্কে তা প্রবেশ করে না। জাতীয় সাহিত্য-কলার চরম বিকাশ এই কাব্যসম্পদের মধ্যেই। কবিই জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা।

চসারের দেহান্তরের প্রায় দু'শো বছর পরে ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে 'Shepheards Calendar' এর প্রসিদ্ধ কবি এড্‌মণ্ড্ স্পেন্সারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করে যান যে তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর কবিগুরু চসারের পাশে সমাহিত করা হয়। তিনিও

আলফ্রেড্ টেনিসন

ইংলণ্ডের জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা দেশবাসী পালন করেন। চসারের সমাধির নিকটেই এই কবিকুঞ্জের মধ্যে এডমণ্ড স্পেন্সার শায়িত আছেন। ১৬৩১ খৃঃ অব্দে এখানেই আনা হ'ল ইংলণ্ডের দেশ-প্রেমিক রাজকবি স্বর্গগত মাইকেল ড্রেটনকে। Poets Cornerএ প্রবেশ পথের দ্বারপ্রান্তেই রয়েছে ওর সমাধি। ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন সাহিত্য-সম্রাট 'বেন জনসনের' মৃতদেহ তাঁর ইচ্ছা মত এখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাহিত করা হয়। বোধকরি সমাধির এ বিশেষত্ব বিশ্বের আর কোনও মৃতদেহের ভাগ্যে ঘটেনি।

এর পর থেকে ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবির এই কোনটি যেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের শেষ শয্যা রচনার একমাত্র উপযুক্ত ও সম্মানজনক স্থান বলে গণ্য হ'তে শুরু হয়।

মহাকবি সেক্সপীয়রের মৃত্যু ১৬১৬ খৃঃ অব্দে 'ষ্ট্রাটফোর্ড অন আভনে' ঘটে এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু, রাজধানীর জনসাধারণ চেষ্টা করেন তাঁর মৃতদেহ সেখান থেকে তুলে ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবির কবিকুঞ্জে নিয়ে আসতে। কিন্তু স্টার্টফোর্ডবাসীরা এতে রাজী হয় না। তাঁরা কবির সমাধির উপর উৎকীর্ণ কবির লেখা লাইনগুলি দেখিয়ে লণ্ডনবাসীদের এ ইচ্ছায় বাধা দেন। কবিতাটি এই—

"Good Friends, for Jesus' sake forbear
To dig the dust enclosed here,
Blest' be the man that spares these stones,
And curst be he that moves my bones."

কাজেই ১৭৪০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত সেক্সপীয়ারের এখানে কোনো ঠাঁই মেলেনি। ১৬৭৪ খৃঃ অব্দ ব্রি-পল্ গেটে St. Giles গির্জায় সমাহিত

হেনরী ওয়ার্ডসবার্থ লঙফেলো

হওয়া সত্ত্বেও মহাকবি মিল্টনের সমাধি স্মৃতি যখন এখানেও একটি করা হ'ল, তখন সেক্সপীয়রের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য মনে হওয়ায় —সেক্সপীয়রেরও একটি মর্মর মূর্তি এই কবিকুঞ্জে স্থাপিত হ'ল। চমৎকার মূর্তিটি। কবি একটি স্তম্ভশীর্ষে রক্ষিত তাঁর গ্রন্থাবলীর উপর দক্ষিণ হস্তে কস্তু-গণ্ড হ'য়ে হেলান দিয়ে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। পদতলে আশ্রয় পেয়ে যেন ধন্য হয়েছে রাজা তৃতীয় রিচার্ড, পঞ্চম হেনরী ও কুইন এলিজাবেথ্। কবির বাম হস্তে ঝুলচে একখানি সত্ত কুণ্ডলীমুক্ত লিপি —তাতে উদ্ধৃত করা রয়েছে "Yea all which it inherit shall Dissolve,—" ইত্যাদি Tempest এর শেষের দিকের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রসিদ্ধ ছত্র।

গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণের গ্রন্থাবলীই এতকাল য়ুরোপে Classics-এর মর্যাদা পেয়েছিল। ব্রিটেনের আশ্চর্য শক্তিশালী কবি মহাপ্রতিভাধর মিল্টনকে বলা যায় নবযুগের ক্লাসিক্সের জনক 'Paradise Lost' প্রকাশিত হবার মাত্র ৩৪ বৎসর পরেই দেখা গে শ্রীযুক্ত জন ফিলিপস্ 'The Splendid Shilling' শীর্ষক একটি কবিতায় হুবহু মিল্টনের রচনাভঙ্গীর অনুকরণ করেছেন! যা এতকাল অত্যন্ত কঠিন, এমন কি দুঃসাধ্য বলেই মনে করেছিল লোকে, অকস্মাৎ একদিন জন ফিলিপস্ মিলটনের সেই রচনাভঙ্গীর অবিকল অনুকৃতি করে রসিকজনেদের সে ভুল ভেঙ্গে দিলেন। তখন থেকে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে বীরত্বগাথা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় ও দার্শনিক অ

ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবির সামনে আমরা

অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বলিত কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করাই প্রচলি হয়ে যায়।

কিন্তু, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজী কাব্য সাহিত্য আবার একান্তভাবে ছন্দানুব হয়ে ওঠে। কাব্যরসিকদের রুচি নিরতিশয় ছন্দানুরাগী হয়ে ওঠায় এই সম ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে বিবিধ ছন্দের বৈচিত্র্যও দেখা দেয়। যাক্ সে কথা মহাকবি মিলটনের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হবার পর সেক্সপীয়রে সঙ্গে কবিকুঞ্জে স্থান পেলেন ড্রাইডেন, ফিলিপস্ ও স্যামুয়েল জনসনে আবক্ষ প্রতিমূর্তি ; এবং কবিবর গ্রে' ও গোল্ডস্মিথের পদকাকৃতি কলা উৎকীর্ণ মূর্তি (Medallions) এঁদের সকলের একত্র সমাগমে কবিকু (Poets Corner) এইবার যেন গুলজার হয়ে উঠলো। অভি

গোল্ডস্মিথের সমাধি-স্মৃতি-ফলকে ডাঃ স্যামুয়েল জনসন যেদিন লাতিন ভাষায় লিখেছিলেন—"He practised every kind of literature. and touched nothing he did not adorn!" সেদিন ডাঃ জনসন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এই প্রসিদ্ধ কবিকুঞ্জে একদিন তাঁরও স্থান হবে।

মহাকাব্যের যুগ কেটে গেল। ক্লাসিক হয়ে উঠলো অপ্রচলিত সাহিত্যপদবাচ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্লাসিক কবিদের রচনা পাঠে রসিকজনেরা ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করলেন। সেদিনের উদীয়মান কবিরাও তাই কেউ আর বললেন না—

"আমি নারবো মহাকাব্য
সংরচনে ছিল মনে—"

মহাকাব্য রচনা করাকে তাঁরা পণ্ডশ্রম বলে মনে করতে লাগলেন। জনসাধারণেরও রুচি ও রসবোধের ধারা গেল বদলে। এ সময় মহাকাব্যের নামেই তাঁরা আতঙ্কবোধ করতেন। কাব্যলোকের অমরাবতীতে আবির্ভূত হলেন এই সময় একদল রোম্যান্টিক কবি। তাঁরা "ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর" এই সাম্যের গান গেয়ে প্রকৃতির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণায়। নকল কাগজের ফুলে শিল্পের কারুদক্ষতা যতই থাক, তবু সে তাজা ফুল নয়। নয় তা' পেলব কোমল, গন্ধ মধুর, বর্ণ সমুজ্জ্বল, স্নিগ্ধশীতল। তাই ব্যর্থ অনুকরণ ছেড়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন সত্যের পূজারী। এল ইংরাজী কাব্যের মধ্যে একটা আন্তরিকতার প্রাণস্পর্শ, যার প্রথম পূজারী ওয়ার্ড্‌সবার্থ। তারপর এলেন একে একে মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণে শেলী, কীটস্, বাইরণ প্রভৃতি। যদিও এরা এক একজন ছিলেন রোম্যান্টিক যুগের অতুল প্রতিভাবান কবি, কিন্তু ওয়ার্ডস্‌বার্থ ছিলেন স্বভাব-কবি। তিনি সরলভাবেই আপন মনোভাব প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর ব্যঞ্জনার মধ্যে কোথাও সচেতন কৌশল বা শ্রমসাধ্য কারুকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। ওয়ার্ডসবার্থ দেহরক্ষা ক'রেছিলেন লেকডিষ্ট্রিক্টে তাঁর প্রিয়তম লীলাভূমি রাইডাল লেকের তীরে। গ্রাসমিয়ারের গ্রাম্য গির্জার নির্জন প্রাঙ্গণে দেখে এসেছি তাঁর অনাড়ম্বর সমাধিটি। সেখানে পাশাপাশি আছে তাঁর প্রিয়জন ও পুত্র পরিবার।

তবু এ্যাবির এই কবিকুঞ্জেও ওয়ার্ডসবার্থের একটি সমাধি স্মৃতি রক্ষিত হ'য়েছে। কিন্তু শেলী, বাইরণ, কীটস্ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য কবিরা এখনও এখানে স্থান পান নি। অথচ ওয়ার্ডসবার্থের কবিবন্ধু কোলরাজের একটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি দেখলাম ওয়ার্ডসবার্থের সমাধি-স্মৃতির ঠিক মাথার উপর। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস আর কি! রাজকবি-হিসাবে ওয়ার্ডস্‌বার্থের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিলেন কবিবর আলফ্রেড্‌ টেনিসন। একসময় টেনিসনের জনপ্রিয়তা ও কাব্যযশোজ্যোতি ওয়ার্ডস্‌-বার্থের খ্যাতির দীপ্তিকেও ম্লান ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু, সেটা একটা সাময়িক বিকার মাত্র! টেনিসনের ছন্দের ঝুমঝুমি কাব্যরসপিপাসু লঘুচিত্তদের কিছুদিন মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু সে অনুরাগ স্থায়ী হয়নি। কুশলী শিল্পী টেনিসন সেদিন কাব্যলক্ষ্মীর চরণে যে নুপুর বেঁধে দিয়েছিলেন আজ তা' প্রায় নীরব হয়ে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত দুলাল ওয়ার্ডসবার্থ সেদিন কাব্যজননীর কণ্ঠে যে ডেজ্ ডেফোডিল ও প্রিমরোজের পুষ্পমাল্য পরম শ্রদ্ধায় পরিয়ে দিয়েছিলেন আজও সে আভরণ রসিকজনের অন্তর দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে টেনিসনের অপরিমেয় দান তা' বলে তুচ্ছ নয়। ইংলণ্ডের কাব্যাকাশে তিনি চিরদিনই একটি জ্যোতিষ্কস্বরূপ ঝলমল্ করবেন। এঁর সমসাময়িক ও সমকক্ষ কবি ছিলেন লঙ্‌ফেলো। ইনি বহুদিন য়ুরোপের নানা প্রদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেও এঁর জন্ম হয়েছিল আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ড অঞ্চলে, ১৮০৭ খৃঃ অব্দে এবং শেষ নিঃশ্বাসও ফেলেছেন ইনি ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে আমেরিকার মাটিতে তাঁর আপন গৃহ মাসাচ্যুসেট্‌স্‌এর বুকে। Henry Wadsworth Longfellow অষ্টাদশ বর্ষ একাদিক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। অজস্র কাব্য ও কবিতা লিখে গেছেন ইনি তার সুদীর্ঘ জীবনে—জনপ্রিয়তায় কারুর চেয়েই কম ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে এঁকে টেনিসনের প্রতিদ্বন্দ্বীই বলা চলে। ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবির কবিকুঞ্জে এই একটি মাত্র বিদেশী কবিকে স্থান দিয়ে ইংল্যাণ্ড বিশেষভাবে আমেরিকাকে সম্মানিত করেছেন। 'Evangeline' এবং Hiawathaর শক্তিশালী কবি হেনরী ওয়ার্ডস্‌বার্থ লঙ্‌ফেলোর অতি সুন্দর প্রতিমূর্তিটি ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবির Poets Corner এর যথার্থই শোভা বর্ধন করেছে। এঁর পর আর কোনও কবির সমাধি-স্মৃতি এই কবিকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনও।

'কবিকুঞ্জ' থেকে বাইরে আসতেই ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবির সামনে একদল কৌতূহলী সহযাত্রী আমাদের আলোকচিত্র তুলেছিলেন। ভদ্র তাঁরা। আমাদের হোটেলের ঠিকানায় একখানি ছবি ডাকে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

অধরা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কজ্জনবাঈ নামটা হঠাৎ সিনেমা-ষ্টারদের পুরোভাগে আসিয়া থামিল। রূপে ভঙ্গীতে বচনে সঙ্গীতে নৃত্যে চটুলতায় যেমন সে মোহসঞ্চারিণী, বিষাদে বৈধব্যে মালিন্যে হতাশায় তেমনি তার অশ্রুময় অভিব্যক্তি। নগরীর রাজপথের পোষ্টে পোষ্টে পত্রিকায় ক্যালেণ্ডারে ছড়ানো তার ছবি, ঝলোমলো তার নাম।

কজ্জনবাঈ বম্বের না পুণার না ব্যাঙ্গালোরের, হিন্দু না মুসলমান, তার মা আছে কি নাই, স্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত তা জানিবার জন্য ব্যগ্র। সিনেমা সাপ্তাহিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন পাঠায়, ঠিকানা জানিতে চায়, কিছুই সাড়া পাওয়া যায় না। আসলে কজ্জন তার সমস্ত পরিচয় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নয়। বাংলাদেশে এমন এক সময় আসিল যখন কার্জ্জন পার্ক বলিতেও লোকে কজ্জনবাঈ শুনিতে সুরু করে। সজ্জনও উৎসুক হইয়া ওঠে, যার এ সব বাতিক নাই।

হঠাৎ রূপ ও ছবির প্রশ্নোত্তর বিভাগে ছোট কয়টি লাইন প্রকাশ পাইল, কজ্জনবাঈ বাঙালী, কলকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ এবং তার একটি পাঁচ বছরের ছেলে আছে, কুমার তার নাম।

সেই ছোট কয়টি লাইন চায়ের দোকানে দোকানে, বাড়ীর রকে রকে, ঘরের আড্ডায়, কলেজের হলে হলে তুমুল তুফান তুলিল এবং মুরুব্বি গোছের লোকেরা মন্তব্য করিতে লাগিল—এ আমি আগেই জানতুম। কজ্জন দত্তদের বাড়ীর বৌ।

আর একজন বলিল, তবে ত খুব জানিস্? আমাদের পাড়ার সূর্য্য সেনগুপ্তের মেয়ে। আর একজন বলিল, আই সি এস্ ব্যানার্জীর নাৎনী।

কোনো একজন অবাঙালী নেতার কলিকাতায় আসার কথা, সকাল হইতে হাওড়া ষ্টেশনে ভিড় জমিয়াছে। উদ্যোক্তারা খুসি যে বাংলাদেশের আতিথ্যের বহর দেখাইতে পারিবে উৎসুক জনতার দ্বারা। নেতারই ফার্ষ্ট ক্লাস হইতে নামিল কজ্জনবাঈ, যতগুলি মালা জড় হইয়াছিল, তারই কণ্ঠে গিয়া উঠিল। জনতার হর্ষধ্বনি তাকেই অভিনন্দিত করিল এবং গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নেতার গাড়ীকে একলা ফেলিয়া ভিড় মিলাইয়া গেল। মুখে মুখে যেটুকু প্রচার হইয়াছিল তাহাতেই কজ্জন কোথায় গিয়া উঠিল তার অনুসন্ধান চলিল সজোরে। প্রেস ক্যামেরা ও গাড়ী লইয়া খবরের কাগজওয়ালারা ছুটোছুটি লাগাইল, কোনো ষ্টুডিয়োয় তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

কজ্জন যে বন্ধুর বাড়ী গিয়া উঠিয়াছিল, সেই বাড়ীর সামনে এক সিনেমা—কজ্জনের নূতন বই যেখানে খোলা হইবে। শার্শীর মধ্য দিয়া নিজে কজ্জন দেখিল, ভিড়ে ছেলেগুলা কী কাণ্ড করিতেছে, পুলিশ চুল ধরিয়া টানিতেছে, জামা ছিঁড়িয়া যাইতেছে। পয়সা পড়িয়া যাইতেছে, ধরিয়া ধরিয়া লরীতে তুলিয়া থানায় চালান করিতেছে—হাজত-কোর্টে হয়ত ২।৪৲ জরিমানা হইবে, তবু দৃক্‌পাত নাই, কজ্জনবাঈকে দেখিবার জন্য সব পাগল। বৃষ্টি আসিল, ভিজিল—রোদ উঠিল, ঘামিল—তবু কেহ নড়িবেনা; মাঝারি বয়সী ও টাকমাথা বৃদ্ধও কম নাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা অপেক্ষা করিবে কজ্জনবাঈয়ের নাচ গান শুনিবার জন্য—মেরী আঁ খোকা পিয়ারা, মেরী মুহব্বত্ কা ইন্‌সান—

সিনেমা'হলে ঢুকিয়াও সে দেখিয়াছে কজ্জনের কটাক্ষপাতে দুগ্ধপোষ্য শিশুর দল 'সিটি' দিয়া উঠিয়াছে। চিরযৌবনা কজ্জন!

ঘরটা ফাঁকা ছিল, ঈজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতেছিল বম্বেতে বাবার কাছে সাহেবী ষ্টাইলে সে মানুষ হইয়াছে, মারাঠি, গুজরাটি, পার্শী ও বম্বেওয়ালা কত ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব, অনর্গল ইংরাজীতে ও হিন্দিতে কথা আর টেলিফোন—বাংলা সে বলিতেই জানিত না। মেয়ের স্কুলে পড়া, ফ্রক পরিয়া ঘোরা। হঠাৎ একদিন পার্শীশাড়ী তাহাকে পরিতে হইল, সে নাকি বড় হইয়াছে। তখনো পরিচিত অপরিচিত লোকের সঙ্গে মোটরে ট্রেনে উহাকে জুহু, খান্দালা, এলিফ্যান্টা—মেরিন

ড্রাইভ, মালাবার হিল ঘোরা—সমুদ্রের তীরে তীরে স্বপ্নময় জীবন!

হঠাৎ একদিন মামার চিঠি আসিল, সম্বন্ধ ঠিক্ হইয়াছে। জোর করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনা হইল, জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হইল—সম্পূর্ণ অপরিচিত আবহাওয়ায় বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের এম-এ, বি-এল গোবেচারা স্বামীর পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইল—যেখানে পুরুষ মেয়ে কেহই অনর্গল ইংরাজীতে কথা কহিতে পারে না, বিলাতী খানা খায় না, অতিথি আসিলে বিলাতী কায়দায় অভ্যর্থনা করিতে জানে না। সিঁদুর পরে, মল পরে, নাকছাবি পরে, পায়ে আল্‌তা পরে।

সকালে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া বেলা ৩টায় ভাত খায়। টোষ্ট্ মুর্গীর ডিম বাড়ীতেই ঢোকেনা, যে ভাষায় কথা বলে, যে আলোচনা করে, যে 'বিচার' করে, তা তার কাছে যেম্‌নি দুর্ব্বোধ্য, তেম্‌নি কৌতুকের।

ময়দান বলিয়া একটা বস্তুও এখানে আছে, আছে হোলি গ্যাঞ্জেস্—বাড়ীর গাড়ীও আছে, সেখানে বিকালে স্বামীর সঙ্গে বেড়াইতে যাবার প্রস্তাবনাও নাকি হাস্যকর।

সুরমা, তুমি ওরকম ক'রে মুখ বুজে থাকো কেন?—স্বামীর এ কথায় তার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। স্বাধীন মানুষ কখনো এমন বন্দী হইতে পারে, এ তার কল্পনার অতীত ছিল। মনে মনে সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ একদিন প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার সাহসও তার ছিল। শুধু সুযোগটা জুটিতেছিল না।

পাঁচ মাস অবেলায় খাইয়া অনিয়ম করিয়া তার হজমের গোলমাল ও মাথা-ধরা সুরু হইল, অদ্ভুত রূপসী মেয়ের আগের লাবণ্য মিলাইয়া গিয়া মুখে ক্লান্তির আভাষ দেখা দিল। এম্‌নি এক রবিবারের বিকালে যখন শুনিল—মেটা আসিয়াছে তার সঙ্গে দেখা করিতে—তখন সে তীরবেগে নীচে নামিয়া গেল একেবারে বাহিরের ঘরে—যেখানে কুলবধূর যাওয়া নিষেধ।

আফ্‌টার এ সেঞ্চুরি আই মিট ইউ—বলিয়া উচ্ছ্বসিত ইংরাজীতে সে মেটা ও তার স্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাইল। তারপর ঠিক্ মেমের গলায় মেমের ধরণে মেমের ভঙ্গীতে তাহাদের নতুন কেনা মোটারটার সুখ্যাতি করিতে লাগিল এবং প্যাকার্ড কারের মেকানিজ্‌ম্‌টা কি—চালকের জায়গায় বসিয়া দেখিতে সুরু করিল।

চারিধারে শ্বশুর ভাসুর স্বামী ও স্বামীর মক্কেলরা—সুরমার মাথায় কাপড় নাই, আই অ্যাম্ কামিং বলিয়া উপরে ছুটিয়া তাড়াতাড়ি শাড়ী বদ্‌লাইয়া জুতা পরিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ লইয়া সে গাড়ীতে আসিয়া ষ্টীয়ারিং হুইল ধরিল—আর হাঁ-করা স্বামীকে বলিল, গ্র্যাণ্ডে যাচ্ছি।

মিসেস্ মেটাকে পাশে বসাইয়া গাড়ী চালাইবার মুখে তাহার কণ্ঠ শোনা গেল—স্প্লেন্‌ডিড্!

শ্বশুরবাড়ীর দরজায় সুরমার সেই শেষ কণ্ঠস্বর!

গ্র্যাণ্ড হোটেলে ফোন আসিল—তার স্বামীর গলা—আমাদের পরিবারের মাথা তুমি ডুবিয়ে দিয়ে গেছ, এবাড়ীতে আর না ঢুক্‌লেই আমরা খুসি হব।

এত ঠুন্‌কো সম্পর্ক। এত স্ফীত বংশমর্য্যাদা! সুরমার হাসি পাইল। বম্বের বাড়ীতে এতকাল যা তার দৈনন্দিন কাজ ছিল, শুধু ত তাই করিয়াছে, অন্যায় এর কোন্‌খানটা? বুঝিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সেই রাত্রেই পার্শী বন্ধুদের সঙ্গে সে বম্বে ফিরিয়া গেল। বন্ধুদের বলিল, বেঙ্গলীর স্বাধীনতা তোমাদের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ বেশী। এই দেখ, আমি বাড়ীতে না জানিয়েই চল্‌লাম।

ধনী ব্যবসায়ীর শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যার সিনেমায় ঢুকিতে একটুও দেরী হইল না, আপন প্রতিভায় সে কজ্জনবাঈকে প্রতিষ্ঠিতা করিল। একলাখ দুলাখ তিনলাখ কণ্ট্রাক্টের ফর্মে সই করিয়া নব নব অভিযানে নব নব অবদানে তার যাত্রা।

বম্বে পৌছিবার চারমাস পরে তার যে ছেলেটি হয়, তার নাম কুমার। কুমার পাঁচ বৎসরে পড়িয়া মাতৃভাষা বাংলা লিখিতে শিখিল মায়ের কাছে। একদিন বলে, আমার বাবাকে চিঠি লিখ্‌ব। লিখ্‌ব—এখানে চ'লে এসো।

মা লেখাইল, বয় আকার বয় আকার বাবা—এ, খয় আকার আর দন্ত্যনয় একার—এখানে, চ আর লয় একার—চলে, এ আর দন্ত্যসয় ওকার—এসো।

সে চিঠি ঠিক্ ঠিকানায় গেল, কিন্তু জবাব আসিল না।

ছেলের মুখ মলিন হইয়া যায়, বাবা কোথায়?—মা, আমার বাবা?

তোমার বাবা নেই, বলিলেই চুকিয়া যায়, কিন্তু ছেলে

ভবিষ্যতের একটা সুদূর সম্ভাবনা এমন করিয়া নির্মূল করিয়া দিতে তার বাধে।

তাই যে বাঙ্গালী ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তার বাড়ীতেই উঠিবে বলিয়া চিঠি লিখিয়া দেয়।

রূপালী হাওড়া ব্রীজ, এশিয়ার বৃহত্তম নগরীর প্রবেশ পথ হিসাবে সত্যই সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। গঙ্গার শীতল হাওয়ায় ওপারে হাইকোর্টের চূড়া হইতে বাগবাজারের ঘাট পর্য্যন্ত অসংখ্য হর্ম্ম্যমালার প্রথম হাতছানি মায়ের ডাকের মতই মনে হয়।

খবর দিয়াছে প্রবীরকুমারের কাছে—তার স্ত্রী সন্তানকে লইয়া শেষ বোঝাপড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

কজ্জনের বুকে ঝড় বহিতেছিল গাড়ী থামার শব্দে। সাবানের বিজ্ঞাপনে, ক্যালেণ্ডারের রঙীন ছবিতে এবং তার শ্রেষ্ঠ বইয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভঙ্গীতে ঝলোমলো শাড়ীতে অপরূপ প্রসন্নতায় বিখ্যাত কজ্জনবাঈ দাঁড়াইয়া উঠিল।

প্রবীরের মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, রীতিমত ভড়কাইয়াছে। চোখের শেষ তীর নিক্ষেপ করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম সারিল কজ্জন শেষ পরাজয় স্বীকার করাইতে।

কজ্জন বলিল, আমি সুরমা, এই তোমার ছেলে। ঘর বাঁধতে এসেছি।

চলো। আমাদের যে বাড়ীটা খালি হয়েছে সেইটায় গিয়ে উঠি, প্রবীরের উৎসুক উত্তর। ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল।

তোমাদের সেকেলে পরিবারে বুঝি কজ্জনবাঈয়ের ঠাঁই হবে না?

দরকার কি ঝামেলায়? আর অশান্তি সৃষ্টিতে?

কুমারের কিন্তু তার বাবাকে মোটেই পছন্দ হয় নাই, বাবারা পাজামা পরা হয়, ধুতিপরা নয়, এই তার জানা ছিল। আর হয় আরো একটু ফরসা, আর একটু ছিপছিপে।

ঘোমটা টানিয়া দিয়া অবগুণ্ঠিতা সুরমা নূতন করিয়া ঘর বাঁধিল। ছেলেকে স্কুলে দিয়া স্বামীকে আদালতে পাঠাইয়া সারা দুপুর রেডিয়ো শুনিয়া ইংরাজী বই পড়িয়া চিঠি লিখিয়া কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু দিন কাটে না।

বাড়ীতে সিনেমাওয়ালাদের আসর বসাইল। হুইস্কি ও সিগারেটের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু কলিকাতা বম্বে হইল না।

জলের মাছ ডাঙায় হাঁফাইয়া উঠিল। গৃহধর্ম্মপালনের জন্য ভগবান বুঝি তাহাকে সৃষ্টি করেন নাই।

পাঁচ বছর সিনেমা জগৎ হইতে দূরে থাকিয়া স্বামীকে একটি দুই বৎসরের কন্যা উপহার দিয়া আয়া গভর্নেসের ব্যবস্থা করিয়া দমদমে সে প্লেনে উঠিল—নূতন রোলে চারলাখ টাকার ফর্মে সই করিতে। হলিউড হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, কবীর রোডে সে পড়িয়া থাকে কি করিয়া?

কিন্তু যে সব পুরমহিলারা বলিল, মুখে আগুন, তারা প্রত্যেকে এবং তাহাদের কুমারী মেয়েরা কজ্জনবাঈয়ের বাড়ীতে এক কাপ চা খাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছিল।

এম-এ বি-এল প্রবীরকেও পাড়ায় কেউ জানিতনা, কিন্তু কজ্জনবাঈয়ের বাড়ী বলিলে অজ্ঞতেও দেখাইয়া দিতে পারিত।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে কি জানি কেন প্রবীরের উর্ব্বশী কবিতাটি বার বার পড়িতে ইচ্ছা করিত।

ইনি কে জানেন? ইনি কজ্জনবাঈয়ের স্বামী—শুনিলে নব পরিচিতের চোখেও সম্ভ্রম ফুটিয়া ওঠে এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিটির জন্য ঈর্ষা জাগে।

কজ্জনের চিঠি নিয়মিত আসে, ছেলেমেয়েরা কেমন আছে জানিতে চায়।

সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া একদিন সে ঘরে ফিরিবে এই আশা করা ছাড়া আর কি করিবার আছে? ওদিকে ছেলেমেয়েরা নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়া বড় হইয়া ওঠে। নূতনতর যুগে গিয়া যদি পৌঁছিতে পারে তবেই কল্যাণ।

আগমনী

বাগীশ্বরী—তেতালা

এস গো জননি এস দুঃখনাশিনি উমা,
বিপদে পড়েছে আজি তোমার সন্তানগণে।
কাতর হয়েছে যারা কি দিয়ে পূজিবে তারা,
তুমি যে গো দয়াময়ী দয়া কর জগজনে।
এমন দিন যে হবে মনে কভু না সম্ভবে,
তুমি না দেখিলে মাগো বাঁচিবে সবে কেমনে।
গোপেশ্বর জোড় করে সদা যাচে মা তোমারে,
পূর্ণ কর গো আশা জুড়াবে রাঙা চরণে ॥

কথা ও সুর ঃ সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ঃ গীত-বিশারদ শ্রীমহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ ২´ ৩
{ র্সা র্সা র্সা র্রা | র্সা ণা ধপা ধা | ধণা র্সা ণা ধা | মা জ্ঞা রা সা } |
এ স গো জ ন নি এ০ স দুঃ ০ খ না শি নি উ মা

০ ১ ২´ ৩
ধ্‌া ণ্‌া সা জ্ঞা | ঋা ধা ণা র্সা | ণা র্সা ণা ধপা | মা জ্ঞা রা সা ||
বি প দে প ড়ে ছে আ জি তো মা র স০ স্তা ন গ ণে

০ ১ ২´ ৩
{ মা মা ধা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সা র্জ্ঞা | র্রা র্সা ণা ধা } |
(১) কা ত র হ য়ে ছে যা রা কি দি য়ে পূ জি বে তা রা
(২) এ ম ন দি ন যে হ বে ম নে ক ভু না স ম্ভ বে
(৩) গো পে শ্ব র জো ড় ক রে স দা যা চে মা তো মা রে

০ ১ ২´ ৩
র্সা র্সা র্সা র্রা | র্সা ণা ধপা ধা | র্সা ণা ধা পা | মা জ্ঞা রা সা ||
(১) তু মি যে গো দ য়া ম০ য়ী দ য়া ক র জ গ জ নে
(২) তু মি না দে খি লে মা০ গো বাঁ চি বে স বে কে ম নে
(৩) পূ ০ র্ণ ক র গো আ০ শা জু ড়া বে রা ঙা চ র ণে

না। তবুও তিনি তাদের টাকা মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। যেহেতু তারা সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক এবং ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাদের যথাসর্বস্ব চলে গেছে; তাই তিনি নিজে নিঃস্ব হয়ে গেলেও তাদের টাকা দেন। শরৎচন্দ্রের দরদী মনের এও একটা কম পরিচয় নয়।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে যখন হাওড়ায় শিবপুরে থাকতেন এবং পরে আবার যখন এই হাওড়ারই একটি গ্রাম সামতাবেড়ে গিয়ে বাস করতেন, তখন তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের ছাড়াও অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং গ্রামের লোকদেরও নিয়মিত সাহায্য করে যেতেন। যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা তিনি রেঙ্গুনে শিক্ষা করেছিলেন, শিবপুর এবং সামতাবেড়ে থাকার সময় সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা তাঁকে যথারীতিই করতে হ'ত। তিনি নিজে দরিদ্রব্যক্তিদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে চিকিৎসা করে আসতেন। এমন কি নিজে অসুস্থ থাকলেও রোগীদের বাড়ীতে যেতে ছাড়তেন না। আর রোগীদের শুধু বিনামূল্যে চিকিৎসাই নয়, তিনি অনেকের পথ্যও কিনে দিয়ে আসতেন।

শরৎচন্দ্র দুঃস্থ ব্যক্তিদের কিভাবে চিকিৎসা করতেন, তার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁরই নিজের লেখা দুখানি পত্র থেকে কিছু করে এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এই পত্র দু'টির প্রথমটি তিনি লিখেছিলেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে, আর দ্বিতীয়টি লিখেছিলেন লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে।

(১)···"এই মাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা করে এলাম। সর্বাঙ্গে Tincture Iodine মাখিয়ে, arnica খাবার ব্যবস্থা করে, তাপসেকের বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফিরছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার উপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।"

(শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ১৬৩)

(২)···দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি। গরীবদুঃখীরা মরছেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম; নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি—আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত! দুর্ভাগ্য—কাবু হইয়া পড়িলাম (ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই —তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে), তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকার দিনটা চাপা আছে। আর এমনি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।"

(শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ৮৭)

শরৎচন্দ্র দরিদ্র গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে শুধু চিকিৎসাই করতেন না, তিনি তাদের আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্যও করতেন। সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু একদিন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে এ সম্পর্কে যা দেখে এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন—

"মনে পড়ে সেটা শীতকাল। উঠান ও দাওয়া ভরে গেছে, গ্রামের নানা-বয়সী স্ত্রীপুরুষে। সকলের মাঝখানে ইজি-চেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র···

সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্তি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করা গেল। শুধু পয়সা দিয়ে দায়-সারা নয়, ঘর গৃহস্থালীর সকল খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন—তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

—ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বন্তরী—

—কিন্তু ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি! ভেসে ভেসে শেষে ঐ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে শকুনে ভিড় করে এসেছে দেখে থাকতে পারলুম না। তুলে আবার মাঝ-নদীতে ফেলে দিয়ে এলাম। বামুনকে দিয়ে শেষটা মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হাঁরে ছবির মা?

বুড়ো ছবির-মা আঁচলে চোখ ঢাকল।···

সকাল বেলাকার সেই ছবি মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহকল্প। —অন্ততঃ বয়সের দিক দিয়ে—সত্বরই পরমাগতি লাভ করলেন। রইল মেয়েটা আর তার অটুট যৌবন। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্য থেকে তাড়িয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা নাকি কোন কোন সমাজমণির বংশদুলালকে খারাপ করেছে। বংশদুলালেরা যে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন, এমন নয়। বিপন্ন মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে —সেটিও আগের দিন মারা গেছে। দাহ করার লোক জোটেনি, মা আর মেয়ে কোন রকমে মড়া বয়ে এনে ফেলে দিয়েছিল রূপনারায়ণের চরে।"

এই উদ্ধৃতিটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র গ্রামের দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের কেবল বিনামূল্যে চিকিৎসা বা আর্থিক সাহায্যই করতেন না, তাদের প্রত্যেকের সুখ দুঃখের হিসাবও রাখতেন। আর শুধু তাই নয়, সমাজ-পরিত্যক্তা ও লাঞ্ছিতা নারীদেরও তিনি আশ্রয়স্থল ছিলেন। উদ্ধৃত অংশটি থেকে শরৎচন্দ্রের অতি কোমল হৃদয়েরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। একটি শিশুর মৃতদেহের উপরে "কাকে শকুনে ভীড় করে এলে" তিনি স্থির থাকতে না পেরে নিজেই গিয়ে মৃতদেহটাকে মাঝ-নদীতে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্রের হৃদয় যে কতখানি নরম ছিল, এই ঘটনা থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর বাড়ী ছিল হাওড়া জেলার পাণিত্রাস গ্রামে; এই পাণিত্রাসের পাশেই সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্র বাড়ী করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের দিদির গ্রাম পাণিত্রাস এবং নিজের গ্রাম সামতাবেড় ছাড়াও আশ পাশের অনেক গ্রামে তিনি কাপড়, অর্থ ইত্যাদি সাহায্য করতেন। এই সাহায্য দানের কথা উল্লেখ করে জলধর সেন এক জায়গায় লিখেছিলেন—

"একদিন প্রাতঃকালে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলাম।··· সেদিন প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে একরাশ ছোট বড় ধুতি শাড়ী

ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎচন্দ্র সমুখের টেবিলে অনেকগুলি আনি-দুয়ানি-সিকি গণে গণে রাখছেন। আমাকে দেখে বললেন—"দাদা, আমি এই দশটার গাড়ীতেই দিদির বাড়ী যাব। তা বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন সেই রাত দশটায়।

আমি বললাম—দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে, তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছো? আর কাঙালী বিদায়ের জন্য বোধ করি ঐ আনি-দুয়ানি?

শরৎচন্দ্র আমার দিকে চেয়ে বললেন—"না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়।' এই বলেই সে চুপ করলে। আসল কথাটা যেন গোপন করা তার ইচ্ছা। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করায় শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন—"দিদির গাঁয়ের আর চার পাশের গাঁয়ের দুঃখী মানুষদের যে কী দুর্দশা! তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই, সে যে কি—"

শরৎ আর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো—এই আমার শরৎচন্দ্র! এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি।"

অর্থ এবং কাপড়-চোপড় ছাড়াও শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে কয়েকটি রাস্তা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানকার লোকের জলকষ্ট দেখে একটি পুকুরও কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সামতাবেড় ও আশপাশের গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার তেমন সুযোগ ছিল না বলে, তিনি সামতাবেড়ে একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে থাকতেন, তখন সেখানকার গরীব প্রজারা তাদের প্রায় সকল দায় বিপদেই শরৎচন্দ্রের কাছে ছুটে আসত। শরৎচন্দ্রও তাদের সাধ্যমত সাহায্য করতেন। একবার হ'ল কি, স্থানীয় পত্তনিদার জমিদারের দেওয়া শিবোত্তর জমিগুলি গ্রাস করতে চেষ্টা করলে, প্রজারা কেঁদেকেটে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্র তাদের অভয় দিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফলে পত্তনিদার শরৎচন্দ্রেরই বিরুদ্ধে নালিশ এনে তাঁকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর এই বিপদের কথা উল্লেখ করে রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন—

"পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ মামলায় জড়িয়ে Civil এবং Criminal—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিনবছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেবতার আর সইল না, ঘাড়ে চাপলেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু অতি ক্ষুদে পত্তনিদারের চাপ দুর্বিষহ। ২১৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান, কিন্তু ২১৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে, আমি হাতে নিলে তা ছাড়িনে। তারপরে ফৌজদারী। যাক্ সে কথা, তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েছে।"

(শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ১৭৯-৮০)

এইরূপ প্রকাশ্যভাবে লোককে সাহায্য বা দান ছাড়াও শরৎচন্দ্রের বহু গোপন দানও ছিল। এই গোপনদানের ব্যাপারে তিনি নিজেকে আদৌ প্রকাশ করতেন না, অপরের হাত দিয়ে দুঃস্থ ব্যক্তিদের কাছে টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিতেন। তাতে করে যে সাহায্য নিত, সে প্রকৃত সাহায্যকারীর নামই জানতে পারত না। শরৎচন্দ্র কাশীর হরিদাস শাস্ত্রীর হাত দিয়ে সেখানকার একটি বিধবাকে এইভাবে সাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্র একবার কাশী বেড়াতে যান। সেখানে দৈবক্রমে একদিন একটি দুঃস্থা বৃদ্ধা বিধবার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। এই বৃদ্ধাটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন এবং অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হলে বৃদ্ধা শরৎচন্দ্রকে 'ছেলে' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। শরৎচন্দ্র এই বৃদ্ধার দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইলে, বৃদ্ধা নিতে চান নি; অথচ এই বৃদ্ধার অর্থের প্রয়োজন বিশেষভাবেই ছিল। তখন শরৎচন্দ্র গোপনে কাশীর হরিদাস শাস্ত্রীর হাত দিয়ে এই বৃদ্ধার কাছে অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দিতেন। এ যে শরৎচন্দ্রের টাকা, বৃদ্ধা এর আদৌ কিছু জানত না। তিনি গোপনে কি ভাবে বৃদ্ধাকে টাকা পাঠাতেন, এখানে শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি উদ্ধৃত করে সে সম্বন্ধে দেখান গেল।

"মা, তোমার চিঠি পেয়েছি।......তুমি বাসা বদল করে ভালই করেছ। এ ঘর কি পছন্দ মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে ত, হয়ত ২।১ টাকা ভাড়া বেশী দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়ী ভাড়ার জন্যে চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়ী ভাড়া চাইবেও না।"

শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে "সে টাকা হরিদাস দেবে" বলে যে কথা বলেছেন, সে টাকা কিন্তু তিনি নিজেই দিতেন, তবে টাকাটা হরিদাসের হাত দিয়েই বৃদ্ধার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এই চিঠির কথা উল্লেখ করে কাশীর এই হরিদাস শাস্ত্রী নিজেই একবার এক জায়গায় বলেছিলেন—"কি ভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করিতেন, তার একটি প্রমাণ এর মধ্যে আছে। চিঠিতে লিখিতেছেন, বাড়ী ভাড়া যা কিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্মগোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে টাকা তিনি আমার কাছে পাঠাইতেন, আমি বুড়ী মাকে দিতাম।" (সাহানা—১৩৪৬)

এইভাবে শরৎচন্দ্র বহু উপায়হীনা বিধবা নারীকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। (আগামীবারে শেষ)

"সব ভাল যা'র শেষ ভাল"—

কোন কোন নাটকে যেমন বিবাদ-বিসম্বাদের পরে শেষ অঙ্কে সহসা মিলন দেখা যায়, তেমনই পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার গত অধিবেশনে শেষ দিনে (২২শে শ্রাবণ) তিনটি বেসরকারী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়াছিল—

(১) ভারত সরকার অবিলম্বে ভাগীরথীর প্রবাহমূলে—মুর্শিদাবাদ জিলায় ফারাক্কায় বাঁধ ও সেতু নির্ম্মাণে অবহিত হউন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন প্রদেশে ঔষধের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কেন্দ্রী সরকারকে অনুরোধ করেন—প্রাদেশিক সরকারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কারখানা যেন পশ্চিমবঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত করা না হয়।

(৩) বিহারের কয়টি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হউক।

ফারাক্কায় বাঁধ ও সেতু নির্ম্মাণের বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বাঁধের প্রয়োজন প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার সার উইলিয়ম উইলকক্স বহুদিন পূর্ব্বে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তখনও দেশ বিভক্ত হয় নাই। সেই জন্য বাঁধের সঙ্গে সঙ্গে সেতু নির্ম্মাণের অর্থাৎ সেতুর জন্য বাঁধ ব্যবহারের বিষয় আলোচিত হয় নাই। আজ আমরা তাহার প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব্ব সেচ-সচিব শ্রীভূপতি মজুমদার বলিয়াছিলেন, বাঁধ নির্ম্মাণের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত ও সে জন্য আবশ্যক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে—এখন আর বাঁধ ও সেতু নির্ম্মাণে বিলম্বের কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহাতে আনুমানিক ব্যয় ৪০ কোটি টাকা হইবে। বিস্ময়ের বিষয় ইহার পরে ভারত সরকার সার বিশ্বেশ্বরায়কে প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে বলিলে তিনি মত প্রকাশ করেন—আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন! আর তাহার পরেই তিনি বিহারে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব সমর্থন করেন! বিহারে কোন কোন রাজনীতিক পশ্চিমবঙ্গে সেতু নির্ম্মাণে আপত্তি জানাইতেও দ্বিধানুভব করেন নাই। অথচ ভাগীরথীর সংরক্ষণ-সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার এই প্রস্তাব ভারত সরকার কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এই প্রস্তাব গৃহীত না হইলে যে অন্যায় হইবে, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।

ঔষধের কারখানা পশ্চিমবঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত করা যে রেলের অন্যতম কেন্দ্র স্থানান্তরিত করারই মত অসঙ্গত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত সরকার তাহাই করিতেছেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদ অবজ্ঞাত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপার তাহার সম্বন্ধে অন্যায় বলিয়াই বিবেচনা করে।

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তার-সাধন—

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তার সাধন বিষয়ে যে প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারি না। প্রস্তাবে বলা হয়, বিহারের নিম্নলিখিত অংশগুলি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হউক—

(১) মহানন্দা নদীর কূলে পূর্ণিয়া জিলার কৃষণগঞ্জ ও সদর ভাগ। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অধিবাসী অধিকাংশই মহানন্দার পূর্ব্বপারে বাস করে। মহানন্দাও বাঙ্গালার নদী—কারণ, উহা বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইয়া—বিহারের পূর্ণিয়া জিলার দুইটি মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়া শেষ হইয়াছে।

(২) রাজমহল, পাকুড়, দুমকা, জামতাড়া ও দেওঘর—এই সকল স্থানের অধিবাসীদিগের শতকরা ১৭ জনও হিন্দী ভাষাভাষী নহে।

(৩) গিরিধী মহকুমা সদর, মানভূমের সদর মহকুমা ও ঐ মহকুমার সুবর্ণরেখা উপত্যকাস্থ অংশ (বিহারের সহিত ধানবাদের সংযোগ জন্য আবশ্যক অংশ বাদ)। এই স্থানের অধিবাসীদিগের শতকরা মাত্র ১৯ জন হিন্দীভাষাভাষী।

(৪) সিংহভূমে ধলভূম মহকুমা এবং টাটানগর বাদ দিয়া মানভূমের অবশিষ্ট অংশ।

প্রস্তাবটিতে যে ভাবে টাটানগর ও ধানবাদ বাদ দিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আপত্তিকর। এই প্রস্তাব কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্য শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কংগ্রেস পক্ষ যে তাঁহাকে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহাতেই মনে হয়, ইহা কংগ্রেস পক্ষ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু প্রস্তাবে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যার উল্লেখ থাকিলেও প্রধান সচিব শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বলেন—ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতি প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট, সুতরাং পরিত্যাজ্য!

এইরূপে কংগ্রেসের সমর্থিত নীতি বিসর্জ্জন দিয়া তিনি বলেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন, তাহার কারণ—নদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা প্রয়োজন এবং আরও প্রয়োজন—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে বাসস্থান দিবার জন্য। তিনি বিহারের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন, যাহাতে বিহারের কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, সেই জন্য তাঁহারা ধানবাদ (খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ) ও টাটানগর (শিল্প-কেন্দ্র) বাদ দিতে চাহেন।

এই প্রার্থনা (দাবী নহে) এতই ভিক্ষাদ্যোতক যে প্রথমেই মনে হয়, নিশ্চয়ই কেন্দ্রী সরকার ও বিহার সরকার উভয়ের সম্মতি লইয়া ইহা উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। কিরূপে যে বিরোধী দল এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, তাহাও বুঝা যায় না। কিন্তু এই প্রার্থনাও বিহারে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। একজন বিহারী সচিব ভয় দেখাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গের সরকারের এই প্রস্তাবে বিহারে বাঙ্গালীদিগের অবস্থা বিব্রতকর হইয়া উঠিবে। যদি ইহাই ভারত রাষ্ট্রে অধিবাসীমাত্রেরই অধিকারের স্বরূপ হয়, তবে রাষ্ট্রের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিলে শঙ্কিত হইতে হয়।

কিন্তু এই সচিব কি ভুলিয়া গিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গেও বিহারীর অভাব নাই? প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কি তাহাদিগের অবস্থা বিব্রতকর হইতে পারে না?

বিহারী-সচিব বলিয়াছেন—বিহার পশ্চিমবঙ্গকে সূচ্যগ্র ভূমিও দিবে না। তাঁহার ঐ উক্তি কি কেন্দ্রী সরকারের সমর্থনের আশায় বলা হইয়াছে?

আবার বিহারের এক প্রাক্তন-সচিব নাকি বলিয়াছিলেন—এ বিষয়ে কোন বাদানুবাদ না করিয়া বলিয়াছেন, বিহারী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল, এই দুই জনকে মধ্যস্থতা করিতে দেওয়া হউক। আমরা ইহাতে এমন কথা বলিতে চাহিনা যে, এই ব্যবস্থা "ডাইনীর হাতে ছেলে অর্পণের" মত হইতেও পারে। কিন্তু এই দুইজন পূর্ব্বেই এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহাদিগকে মধ্যস্থ হইতে বলা বা তাঁহাদিগের পক্ষে মধ্যস্থতা করিতে সম্মত হওয়া সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যে কংগ্রেস-পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত প্রার্থনা-প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রস্তাব যে কংগ্রেসী সরকার কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল, তাহার অর্থ কি এমন নহে যে, কংগ্রেসের ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠননীতির "গঙ্গাযাত্রা" করা এই প্রস্তাবের অন্যতম উদ্দেশ্য?

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ যদি—অন্ধ্রের মত—তাহার দাবীতে অবিচলিত থাকে, তবে ভারত সরকারকে যেমন, বিহার সরকারকেও তেমনই সে দাবী স্বীকার করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে যত বিহারী অন্নার্জ্জন করিতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন বা করিবেন এবং তাহা লোককে জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে?

বিহার কি ভারত রাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে?

প্রেস কমিশন—

ভারত রাষ্ট্রে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে—বৃটিশের শাসনকালীন সংবাদপত্রের মত-প্রকাশ-স্বাধীনতা-সঙ্কোচক আইন সকল প্রত্যাহৃত হইবে, এমন আশা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে। সে সকল আইন প্রত্যাহার করা ত পরের কথা—স্বাধীনতা আরও সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ হইতেছে। সেই অভিযোগহেতু ভারত সরকার পার্লামেন্টে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রেস কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ দেশে সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থার আলোচনার উপায় করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হইবে, এমন ঘোষণা হইয়াছে। মধ্যে কোন সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের সভাপতি হইবেন—স্থির হইয়াছে।

বর্ত্তমান আইনগুলির বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করিয়া সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় আইন যাহাতে গণতন্ত্র-শাসিত দেশের উপযোগী হয়, তাহা করা যে কমিশনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইবে, তাহা অনায়াসে বলা যায়। আমেরিকায় সংবাদপত্রে সরকারের কার্য্যের সমালোচনা আইন-সঙ্গত; কারণ, তথায় রাজতন্ত্র শাসন নাই এবং যাঁহারা মন্ত্রী হইয়া দেশ-শাসনের ভার বহন করেন, তাঁহারা জনসাধারণের ভৃত্য। এমন কি আমেরিকার প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন—

"দেশ ও দেশের সকল প্রতিষ্ঠান দেশের অধিবাসীদিগের। তাহারা যখনই বর্ত্তমান সরকারের কার্য্যে বিরক্ত হয়, তখনই নিয়মানুগ অধিকার প্রযুক্ত করিয়া সেই সরকারের পরিবর্ত্তন করিতে বা বিপ্লবী অধিকার প্রযুক্ত করিয়া তাহার অবসান ঘটাইতে পারে।"

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভাবধি সরকার সংবাদপত্রের সমালোচনা সম্বন্ধে অসহিষ্ণু থাকায় সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিবার অভিপ্রায়ে নানা আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। সে বিষয়ে ভারতীয়-দিগের মতের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

সে সকল আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন জন্য ব্যবহারাজীবের প্রয়োজন। সেই জন্যই প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও অভিজ্ঞ হাইকোর্টের জজ সভাপতি মনোনয়ন করা হইয়াছে, বলা যায়।

ইংরেজের সময়ে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এক বার সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় আইন পরীক্ষার জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তৎকালীন ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী তেজ বাহাদুর সপরু তাহার সভাপতি ছিলেন।

যে কমিটীর কার্য্য অতি সামান্যই ছিল।

আমরা আশা করি, কমিশন সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

প্রকাশ, পার্লামেন্টের ২ জন সদস্য ও কাউন্সিল অব ষ্টেটের এক জন সদস্য কমিশনে সদস্য হইবেন এবং ৩ জন সক্রিয় সাংবাদিক সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবেন। যদি ৯ জন সদস্যে কমিটী গঠিত হয়, তবে অবশিষ্ট ২ জন সরকারের দ্বারা কি ভাবে মনোনীত হইবেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

কমিশনের কার্য্য কিরূপ হইবে তাহাও এখনও জানা যায় নাই।

আমরা মনে করি, সভাপতি যখন বাঙ্গালী তখন কমিশনের কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় হইলেই ভাল হয়।

সদস্যদিগের নামপ্রকাশে অযথা বিলম্বের কারণ কি, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

তমলুকে প্রত্ন-সন্ধান—

ভারত সরকার তমলুকে পুরাবস্তু অনুসন্ধান জন্য খনন কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। সে জন্য প্রথমে ৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। তমলুক—মেদিনীপুর জিলায়, রূপনারায়ণের কূলে অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন তাম্রলিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থানে 'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্পের স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন; লিখিয়াছিলেন—"তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।" সমুদ্র আজ তমলুক হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। এককালে তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। চীন হইতে পরিব্রাজকগণ তথাগতের দেশে তীর্থযাত্রায় আসিতে তাম্রলিপ্তে নৌকা হইতে অবতরণ করিতেন—বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। কেহ কেহ নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগের লিখিত বিবরণে আমরা ভারতের ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ পাইয়া থাকি।

তমলুকের খনন কার্য্য সম্পন্ন হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর—হয়ত বা তাহারও পূর্ব্বের নানা দ্রব্য পাওয়া যাইবে। এই স্থানে চীন প্রভৃতি দেশের নৌকায় চীনাংশুক দেখা যাইত। এখন মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে প্রাচীন মৃৎশিল্পের নিদর্শন—নৌকার অবশেষ প্রভৃতি পাওয়া যায়। সে সকল বহু দিন পূর্ব্বের। এখনও নিয়মিত ভাবে এই স্থানে আবশ্যক অনুসন্ধান হয় নাই। এই বার সে চেষ্টা হইবে। এই চেষ্টার ফলে যে বাঙ্গালার ও ভারতের বহু পুরাবস্তু পাওয়া যাইবে, এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একযোগে অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত করেন, তবে, বোধ হয়, ভাল হয়। ভারত সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় সে বিষয় বিবেচনা করিবেন কি?

আম্র বৃক্ষের সর্ব্বনাশ—

কলিকাতার কোন সংবাদপত্রে এক জন লিখিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের নানা কলকারখানার পণ্য প্রেরণের আধারের জন্য কাঠের প্রয়োজনে কয় বৎসর হইতে আম্র বৃক্ষ কাটা হইতেছে। তক্তার জন্য গাছ কাটিবার সময় বিচার করা হইতেছে না। বিশেষ সুন্দরবনের অধিকাংশ পূর্ব্বপাকিস্তান-ভুক্ত হওয়ায় তথা হইতে আর কাঠ পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নির্ব্বিচারে যে সকল গাছ কাটা হইতেছে, আম গাছ সে সকলের অন্যতম। হিসাবে দেখা যায়, মাসে প্রায় ২ শত টন আম কাঠ করাতে তক্তা করা হয়। লেখক বলিতেছেন, বর্ত্তমানে যে "প্লাইউড" প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে বাক্স করিলে তাহা কোনরূপে আম কাঠের বাক্স অপেক্ষা মন্দ হয় না। সুতরাং যাহাতে নির্ব্বিচারে এই ফলের গাছ নষ্ট করা না হয়, তাহা করা সরকারের কর্ত্তব্য।

আমাদিগের বন-বিভাগ আছে; কিন্তু, অন্য বহু বিভাগেরই মত, তাহার কাজ ত্রুটিপূর্ণ। গাছ কাটা হয়, কিন্তু তাহার স্থানে গাছ রোপণ করা হয় না। এখন কথা উঠিয়াছে—বনভূমি রচনা করিতে হইবে—নহিলে, এক দিকে যেমন বৃষ্টি কম হয়, আর একদিকে তেমনই মরুভূমি অবাধে অগ্রসর হয়। কিন্তু বনভূমি রচনায় অর্থ ব্যয় হয়—বনমহোৎসবের নামে অর্থের অপব্যয় করা হয়—অথচ আবশ্যক কাজ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি স্থানে—শাল, সেগুন ও শিশু গাছ সহজেই হইতে পারে। আজ সেগুন কাঠের ব্যবহার এত অধিক যে, তাহা দুষ্প্রাপ্য না হইলেও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে ও হইতেছে। সেগুন কাঠ প্রধানতঃ ব্রহ্ম হইতে আসিত—এখন সে আমদানী হ্রাস হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে নিকৃষ্ট জাতীয় সেগুন গাছ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সেগুন মধ্য প্রদেশের সেগুনের তুলনায় উৎকৃষ্ট। নদীয়ার কতকগুলি স্থানে এবং ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানে সেগুন গাছ ভালই হয়। কিন্তু সরকার সে সকল স্থানেও সেগুনের চারা যোগাইয়া তাহার বন রচনা করিতেছেন না। অনেক স্থানে অসার গাছই লাগান হইতেছে।

শাল অত্যন্ত দৃঢ়। শিশুও ভারী ও দৃঢ়। এমন কি পশ্চিমবঙ্গে বহুমূল্য মেহগিনিরও বৃদ্ধি বিশেষ সন্তোষজনক হয়। পথের পার্শ্বে ঐ সকল বৃক্ষ রোপণ করিলে প্রদেশের সম্পদ-বৃদ্ধি হয়। সেগুন, শাল ও শিশুর বনভূমি রচনা করা সহজসাধ্য।

বনভূমিতে কেবল যে বৃষ্টি বৃদ্ধি পায়, তাহাই নহে; গ্রীষ্মের সময় বনভূমি গোচরে পরিণত করা যায়—তাহাতে গবাদি গৃহপালিত পশু চরিতে ও খাইতে পায় এবং সারও পাওয়া যায়।

কদম্বকাষ্ঠে দেশলাইয়ের ভাল কাঠী হয়। যে সকল গাছে প্রদেশের উপকার অধিক, সেই সকলের চাষ করাই কর্ত্তব্য। রুশিয়ায় যেমন ক্ষেত্র-রক্ষার্থ "সেল্টারীং বেল্ট" গাছ রোপণ করা হইতেছে—পশ্চিমবঙ্গে সেইরূপ করার প্রয়োজনও অল্প নহে।

আম, কাঁটাল, জাম, তাল প্রভৃতি গাছের ফল আহারার্থ ব্যবহৃত হয়; সে সকল পরিপূরক ও পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং সে সকল গাছ নির্ব্বিচারে না কাটিয়া সে সকলের চারা রোপণ করাই সঙ্গত, প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য।

পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ সে দিকে দৃষ্টি দিবেন কি?

অপচয়—

আমরা বহুবার সরকারের ব্যবস্থার দোষে খাদ্যশস্য অপচয়ের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে বিহার সরকার ৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছেন। গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে সরকারের গুদামে ২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। ইহার অধিকাংশই বাহির হইতে আমদানী করা এবং প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে যে দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল তথায় কিছুদিন গুদামে ছিল। বৎসরের

আরম্ভে খাদ্যশস্য উপযুক্তরূপে মজুদ রাখিবার যে গুদাম সরকারের ছিল, তাহাতে ৩০ হাজার টন খাদ্যশস্য রাখা যায়; সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৫০ হাজার টন রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত স্থানে খাদ্যশস্য রাখিতে হইয়াছিল। ফলে গত এপ্রিল ও জুন মাসে ১৯৩৫ টন শস্য ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায় এবং সেই জন্য ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের ঐ মাল নিলামে ৩ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়। সরকার এখন এই বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন যে, ৩৭ কোটি টাকার খাদ্য-শস্যের মধ্যে ১১ লক্ষ টাকার মাল নষ্ট হওয়া তুচ্ছ ব্যাপার। সরকারের এই অভিমত কিন্তু দেশের লোক গ্রহণ করিবে কি না, সন্দেহ। যে স্থানে খাদ্য-শস্যের অভাবে লোক পথে ঘাটে বাটে অনাহারে মরিতেছে, তথায় ১৯৩৫ টন খাদ্যশস্য মজুদ রাখার ত্রুটিতে অব্যবহার্য্য হওয়া কখনই সমর্থিত হইতে পারে না; কারণ, তথায় এক মুঠা শস্যেরও মূল্য আছে। ইহা অযোগ্যতার পরিচায়ক। যে শস্য অব্যবহার্য্য বলিয়া বিক্রয় করা হয়, তাহাই আবার সরকারী গুদামে উঠে নাই ত? বিদেশ হইতে পুরাতন মাল ক্রয় করার জন্য দায়ী কে?

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগমনকারী নরনারীর সংখ্যা আবার বর্দ্ধিত হইতেছে—শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশনে যেমন, বনগ্রাম রেল-ষ্টেশনেও তেমনই তাহাদিগের সংখ্যাধিক্য ও দুর্দ্দশা বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক। কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন ছাপাইয়া তাহারা বহুবাজার ষ্ট্রীটেও আসিতে বাধ্য হইয়াছে—যে স্থানেই ফুটপাতের উপর গাড়ীবারান্দা আছে, সেই স্থানেই তাহারা পড়িয়া থাকিতেছে। দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদিগকে সরাইয়া শিবিরে লইবার ব্যবস্থাও করিতে পারিতেছেন না। ইহা আমরা অযোগ্যতার পরিচয় বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, এমন অবস্থা যে অনিবার্য্য তাহা ছাড়পত্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবের সময়ই তাঁহাদিগের বুঝিতে পারা সঙ্গত ছিল। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তি ভিত্তিহীন। এই উদ্বাস্তুদিগের আগমন পূর্ব্ববঙ্গে আর্থিক দুরবস্থার ফল নহে। কারণ, সে দুরবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও অল্প নহে—হয়ত পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় আরও শোচনীয়। তবে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের দুরবস্থার অন্ত নাই। সে দুরবস্থা কেবল অর্থনৈতিক নহে—সামাজিক ও রাজনৈতিকও বটে। অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর পক্ষে ধনপ্রাণমান লইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়াছে।

দেশ ও প্রদেশ বিভাগের সময় ভারত সরকার এই সকল উদ্বাস্তুকে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিয়া দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সে কথা ভারত সরকারও অস্বীকার করেন না।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত—ব্যবস্থার ত্রুটি ও আন্তরিকতার অভাব—এই দুই কারণেই পুনর্ব্বাসন কার্য্য সফল হইতে পারিতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে রেল-ষ্টেশন হইতে লোক সরাইয়া আশ্রয়কেন্দ্রে লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও করিতে পারিতেছেন না, তাহার কারণ কি? তাঁহারা যে কাশীপুরে পাটগুদামে—মানুষের বাসের অযোগ্য স্থানে—উদ্বাস্তুদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অবিলম্বে তাহার প্রতীকার করিতে আদেশ করেন নাই?

"কল্যাণী" নগরের পরিকল্পনা না করিয়া যদি কলিকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে এক সময়ে সমৃদ্ধ কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায়-পরিত্যক্ত গ্রামসমূহের উন্নতি সাধন করা হইত, তবে কি অনেক অল্পব্যয়ে বহুলোকের বাসের ব্যবস্থা করা যাইত না?

উদ্বাস্তুদিগকে সাহায্য দান ব্যাপারে যে সকল অযথা ত্রুটির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে, সে সকলের সংশোধন যদি না হয়, তবে অর্থ কেবল ছিদ্রকুম্ভে বারির মত বাহির হইয়া যাইবে—তাহাতে অভিপ্রেত ফললাভ হইবে না।

যে সকল পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী সত্য সত্যই ভারতরাষ্ট্রের প্রজা হইবে, সাহায্য পাইবার অধিকার কেবল তাহাদিগেরই আছে, স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। নহিলে যাহারা "গাছেরও পাড়ে—তলারও কুড়ায়" হিসাবে পাকিস্তানেরও আনুগত্য স্বীকার করে, তাহারা ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসী বলিয়া সাহায্য লাভের অধিকার দাবী করিতে পারে না।

সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের, তথা সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে জানাইয়া দিবেন?

শ্মশানে স্মৃতি রক্ষা—

কলিকাতার কোন সংবাদপত্রে একখানি ছবি প্রকাশিত হয়—নিমতলায় শ্মশানে যে স্থানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শবদাহ হইয়াছিল, তথায় গরু চরিতেছে। ইহাতে নরেন্দ্র দেব ও তাঁহার এক বন্ধু বহু লোককে পত্র লিখিয়া "রবীন্দ্র ভারতীর" নিকট "এই শোচনীয় অবস্থায় প্রতিকারের জন্য" এক আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এই বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে পত্র-ব্যবহারও চলিতে থাকে। "রবীন্দ্র-ভারতীর" সম্পাদক জানান, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শ্মশানে স্মৃতি রক্ষার বিরোধী ছিলেন। শ্মশানে যদি প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির "চিতাভূমি সংরক্ষণ-ব্যবস্থা হয়, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়? নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের চিতাভূমির অদূরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিতাভূমি। এই শ্মশানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি বহু বরেণ্য বাঙ্গালীর শব ভস্মীভূত হইয়াছে। যদি সকলের জন্য স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে ভবিষ্যতে আর কাহারও ঐ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবার স্থান থাকিবে না।

মানুষের মৃত্যুর পরের কথা—

"They say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshyd gloried
and drank deep,
And Bahram the great Hunter—
the wild Aas
Stamps o'er his Head, but cannot,
break his Sleep.

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শব "শান্তি নিকেতনে" লইয়া যাইবার বিরোধী

ছিলেন। তিনি নিমতলা শ্মশানে সাধারণ লোকের মতই তাঁহার শবদাহের পক্ষপাতী ছিলেন—শুনা গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য—রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা-ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে? সেই অর্থে যে গৃহ কিনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তথায় নূতন সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে, সে গৃহে রবীন্দ্রনাথের জন্মও হয় নাই, মৃত্যুও হয় নাই। তাহাতে তাঁহার কোন অধিকারও ছিল না। তাহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বৈঠকখানা বাড়ী ছিল ও পরে তাঁহার জ্ঞাতিরা তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন।

আমরা আশা করি, স্মৃতি সমিতির কার্য্য-বিবরণ জনসাধারণের অধিগম্য করা হইবে।

পাকিস্তান ও ভারত-রাষ্ট্র—

আগামী ১৫ই অক্টোবর হইতে ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান উভয়ে যাতায়াতে ছাড় প্রয়োজন হইবে।

পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার—

(১) বরিশালে ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের মুসলমান প্রেসিডেন্টদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন—এক মাসের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে হইবে।—

(ক) মোট প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ও অপ্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা—

(খ) হিন্দু পরিবারসমূহের কোনটির কত জন নরনারী বৎসরের অধিকাংশ কাল ভারতে বা পাকিস্তানে বাস করেন।

(গ) হিন্দুদিগের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির আনুমাণিক মূল্য।

(ঘ) প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের কত জন নরনারী রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন।

হিন্দুরা—বিশেষ রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হিন্দুরা যে পাকিস্তানে অবাঞ্ছিত, তাহা সকলেই জানেন। তদনুসারে এই নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) বরিশালের পুরাতন সংবাদপত্র "বরিশাল হিতৈষীর" প্রচার পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক দুর্গামোহনবাবু বিনাবিচারে আটক হইয়া কয় মাস পরে মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহার পত্র কেন বাঙ্গালীর মুখপত্র বলা হয়, সে জন্য প্রথমে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। তাহার পরে পত্রে "বন্দেমাতরম" লিখিত থাকে—এই "অপরাধে" পত্রের প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

(৩) পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি বলিয়াছেন—ভারতরাষ্ট্র পাটের চাষ বাড়াইয়া পাকিস্তানের ক্ষতি করিতেছে। তাহার পরে বলা হইয়াছে—পাকিস্তান ভারত রাষ্ট্রের পাট শিল্প ও ব্যবসা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বিদেশে সস্তাদরে পাট বিক্রয় করিবে। এই ব্যবস্থায় যে কৃষকদিগের ক্ষতি অনিবার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু—"সপত্নীর পানপাত্রে অমেধ্য গুলিয়া পান ও" যে সম্ভব, তাহার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ আছে।

এই সকল ব্যাপার হইতে সহজেই ভারতরাষ্ট্র সম্বন্ধে পাকিস্তানের মনোভাব বুঝিতে পারা যায়।

আমরা আশা করি, ভারত সরকার ইহা বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

স্কুল কোড—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা হস্তান্তরিত করিয়া যে বোর্ডের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক কত টাকা ব্যয়-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য। এই বোর্ড গঠিত হইবার পরেই স্কুল কোড রচনায় প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন এবং রচিত কোড বহাল করিতে উদ্যোগী হওয়ায় চারিদিক হইতে তাহার প্রতিবাদ হয়। সমগ্র প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি লোকমত না লইয়া জনকয়েক লোক ইচ্ছামত করেন, তবে তাহা যে স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। পশ্চিম বঙ্গের—সমগ্র ভারতের—শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ইংরেজ তাহার নিজ প্রয়োজনে এ দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা দেশকাল পাত্রোপযোগী ছিল না; তাহাতে জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান প্রস্ফুরিত হওয়া ত পরের কথা—ক্ষুণ্ণ করাই অভিপ্রেত ছিল। সে পরিবর্ত্তন—প্রচলিত নানাদোষদুষ্ট প্রথার সামান্য সামান্য পরিবর্জ্জনে বা পরিবর্ত্তনে সম্পন্ন হইতে পারে না।

বোর্ড এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন কাজে উৎসাহ দেখান নাই।

আমরা আশা করি, দেশের লোকমত গ্রহণ না করিয়া—বিশেষজ্ঞদিগের মত বিচার বিবেচনা না করিয়া বোর্ডকে কখনই নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে না। শিক্ষা-সচিব নবাগত—বিশেষ শিক্ষা-বিভাগের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না এবং তিনি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যেন, কোন দলের বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কাজ না করেন।

কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকার—

মিষ্টার পাতিল বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। সম্প্রতি এক সভায় তিনি অভিযোগ করিয়াছেন—কংগ্রেসী সরকারের অযোগ্যতার জন্য কংগ্রেস লোকের বিরাগভাজন হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেসের ছাড়ে যাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদে বা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হ'ন, তাঁহারা সচিব হইতে ব্যস্ত থাকেন। আর সরকারের অর্থাৎ সচিবদিগের কেবল নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভের জন্য কংগ্রেসকে ব্যবহার করিতে আগ্রহ হয়। তিনি বলেন, বোম্বাই প্রদেশের প্রধান-সচিব মোরাজী দেশাই তাঁহাকে লিখিয়াছেন—লোককে কর স্থাপনের প্রয়োজন বুঝাইয়া সে জন্য লোকমতের সমর্থন লাভ করা সরকারের কাজ নহে। সরকার করস্থাপন করিবেন; কংগ্রেস কমিটী লোককে তাহার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিবেন। অর্থাৎ কংগ্রেস কমিটী সরকারের কাজের সমালোচনা করিতে পারিবেন না—সরকারী কাজ সমর্থন করিবেন—এই পর্য্যন্ত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসী সরকার ও কংগ্রেস কমিটী উভয়ে দলাদলি হইতে পারে। তাহার অনিবার্য্য ফল কি, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ক্ষমতা লাভ করিয়া কংগ্রেসী সরকার যে লোকমতও পদদলিত করিতে আগ্রহশীল হইতে পারেন, তাহাই পাতিল মহাশয়ের উক্তিতে দেখা যাইতেছে। তাঁহার উক্তির জন্য পাতিল মহাশয়কে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করা হইবে কি না, কে বলিতে পারে? ইংরেজীতে চলিত কথা আছে—ক্ষমতা মানুষকে হীন করে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মানুষকে হীনতার সর্ব্বনিম্ন স্তরে লইয়া যায়। কংগ্রেসকে যদি রাখিতে হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্ববৎ স্বাধীনভাবে লোকের কল্যাণ সাধনের সুযোগ দিতে হইবে।

চিকিৎসাগার—

কলিকাতায় কালীঘাট রোডে একটি ধর্ম্মশালা লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন ও "মিশনারী অব চ্যারিটি" একযোগে নিঃস্বদিগের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহা "নির্ম্মল হৃদয়" নামে অভিহিত হইয়াছে।

কলিকাতার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যার তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা অতি অল্প। বহু দরিদ্র রোগগ্রস্ত লোক যে বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে রাজপথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা প্রতিদিন আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই অবস্থায় "লেক হাসপাতাল" বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার—দুই তিনটি ব্যতীত কোন বেসরকারী হাসপাতালে অর্থ সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত! বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে সরকারী হাসপাতাল না থাকিলেও সরকার বেসরকারী হাসপাতালটিকে (ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠান নহে) অর্থ-সাহায্য দেন না। কলিকাতার উপকণ্ঠে যে কবিরাজী যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিচালিত হয়, তাহাও ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠান না হইলেও—সাহায্য পায় না বলিলেই হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব স্বয়ং আলোপ্যাথ। তাঁহার অন্য কোন মতে চিকিৎসায় হয়ত আস্থা নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত মতই প্রবল করা ও অভ্রান্ত বিবেচনা করা নিরাপদ বা বাঞ্ছনীয় নহে। বলা হইয়াছে, কলিকাতায় যে ৩টি কবিরাজী হাসপাতাল আছে সে ৩টি সম্মিলিত হইলে, তবে সরকারী সাহায্য বর্ধিত হইবে। কিন্তু বেসরকারী আলোপ্যাথিক হাসপাতালের অভিজ্ঞতা কিরূপ? যখন কলিকাতায় একাধিক বেসরকারী আলোপ্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তৎকালীন সরকার বলিয়াছিলেন, সকল প্রতিষ্ঠান এক না হইলে তাঁহারা অর্থ-সাহায্য দিবেন না। কিন্তু কয়টির একত্রীকরণ সম্ভব না হইলেও সরকার প্রধানটিকে অর্থ সাহায্য দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে কয়টির মিলন ঘটে।

সরকারী সাহায্য যে প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে রত হাসপাতাল-মাত্রই পাইতে পারে, তাহাই মনে করা সঙ্গত। রোগীরা যে বিনাচিকিৎসায় পথে না মরিয়া আশ্রয় ও চিকিৎসা পাইবে—তাহা যদি বাঞ্ছিত হয়, তবে যে সকল হাসপাতাল সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে—সে সকল সরকারী সাহায্য অবশ্যই পাইতে পারে।

আজকাল কোন কোন হাসপাতালে রোগীকে অস্ত্রোপচারের জন্যও প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহার কারণ বুঝা যায় না। কারণ, হাসপাতাল "নার্সিং হোম"—অর্থার্জ্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নহে।

কলিকাতার উত্তরে সাগর দত্তের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের অবস্থা যে শোচনীয় হইয়াছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গ সরকারও জানেন। কিন্তু আজও সরকার তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া তাহার আবশ্যক সুব্যবস্থা করেন নাই। ইহার কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল অনিবার্য্য। হাসপাতালের আয় বর্দ্ধিত করিবার জন্য যদি আইন প্রণয়ন করিতে হয়, তবে তাহা করা সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। আমরা এই বিষয়ে আবার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

কলিকাতার বে-সরকারী হাসপাতালগুলিতে যদি যথাযথ কার্য্য-পরিদর্শন জন্য—পরিচালক সমিতিতে সরকারের প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সরকার হইতে অর্থ-সাহায্য করা হয়, তবে যে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, আমরা আশা করি, সরকার তাহা স্বীকার করিবেন।

কলিকাতায় আরও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ও বর্ত্তমান হাসপাতালগুলির বিস্তার সাধন প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সরকারকে সাহায্যদান কার্য্যে অবহিত হইতে হইবে।

নেপাল—

নেপালে নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হইয়াছে। নেপালের রাজা পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা—অদূর ভবিষ্যতে নির্ব্বাচিত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিতে পারিবেন। অবশ্য, যখন কোন দেশে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, তখন সহসা তাহা নিবৃত্ত হয় না। নেপালে কি হইবে কে বলিতে পারে?

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, নেপালে অশান্তি; আর নেপালের সীমান্তে—তিব্বতে—কম্যুনিষ্টবাহিনী রহিয়াছে। নেপালে যখন প্রথম হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তখন যে একটি দলের নেতার সহিত কম্যুনিষ্টদিগের যোগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দেখা গিয়াছে।

এ দিকে ভারত সরকার নেপাল সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিতেছেন ও করিবেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নাই। ভারত সরকার যে নেপালকে (অর্থাৎ নেপালের বর্ত্তমান সরকারকে) সাহায্য করিতেছেন, তাহা যেমন দেখা দিয়াছে, তেমনই দেখা গিয়াছে, বিদেশের জন্য—গুর্খা-সৈনিক সংগ্রহে তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রে ঘাঁটিও দিয়াছেন। সে কথা প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে—সংবাদপত্রে প্রকৃত তথ্য প্রকাশের পরে—স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তিনি যখন বিষয়টি অস্বীকার করিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

নেপালে যদি বিশৃঙ্খল অবস্থার বিস্তার লাভ ঘটে, তবে ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না।

মিশর ও ইরাণ—

মিশরে রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ ও দেশত্যাগের পরে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা শান্ত বলা যায় না। ক্ষমতা লইয়া রাজনীতিক দলসমূহে মতভেদ হইয়াছে এবং তাহার ফল কি হইবে, তাহা আশঙ্কার বিষয়। এই সুযোগে বিদেশীরা—দেশের "ত্রাণকর্ত্তা" সাজিয়া আবার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে করিতে পারেন না, এমন নহে। কারণ, মিশরে বিদেশীদিগের স্বার্থ সাধারণ নহে। মিশরেরই মত ইরাণেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে ইরাণের সরকার অন্য দেশে তৈল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। সে ব্যবস্থা যদি হয়, তবে বোধ হয়, ইরাণের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সুবিধা হইবে। কারণ, তাহা হইলে—সরকারের পক্ষে প্রজার কর-ভার বর্দ্ধিত না করিয়া দেশে সুশাসনের ব্যবস্থা করা অনায়াসে সম্ভব হইবে। প্রজাসাধারণ যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে দেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আশঙ্কার আতঙ্ক আর শাসকদিগকে চিন্তাকুল করিতে পারে না।

ভাদ্র ১৫ই—১৩৫৯

শারদীয়

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

বন্ধু, তোমরা দেখ পুরাতন ছবি,
ঝলমলে শরতের আগমন তিথি,
সুশুভ্র কাশের বনে প্রভাতের রবি,
ছড়ায় সোনার রঙ, চিরন্তন রীতি।
শেফালির গন্ধে ভরা মলয় বাতাস,
আউশ কাটার গান মাঠে মাঠে কত!
এই মেঘ আর রোদ রঙের আকাশ,
কোকিল দোয়েল ডাকে, সুর অবিরত!!
ধানে ধানে ভরা ক্ষেত নতুন ফসলে,
আশাবাদী কবি রচে শারদীয় গান।
ভরা-নদী বয়ে যায় জল ছল ছল,
চিরন্তন শরতের এই অবদান॥
বন্ধু, আমরা দেখি শরতের দিন,
বিশীর্ণ কঙ্কাল দেহ শুধু জ্বালা ধরে
ধান্যহীন রুক্ষ মাটি, সূর্য মলিন,
আগমনী বাজে হেথা রোদনের স্বরে!
সূর্য আছে, আলো নাই, নাই আশা রবি,
দেহ আছে, প্রাণ নাই, প্রকৃতির শোভা!
এ দিনের কবি তাই নাহি আঁকে ছবি,
পুরাতন শরতের রঙ মনলোভা॥

শারদ প্রত্যাশা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কে জানে সে কার মায়াদণ্ডের স্পর্শ লাগিবে দিনে,
জানি দেবতার সে আবির্ভাব মুহূর্ত্তে লব চিনে।
দিগ্ দিগন্তে সোনার হাসিতে উঠিবে উদ্ভাসিয়া,
রাতের চাঁদের জ্যোৎস্না প্লাবনে উচ্ছল হবে হিয়া।

এখনো আকাশ বেদনা-আকুল, ছল ছল আঁখি তার,
চোখের পাতায় ছায়া ভেসে যায়, বুকেতে মেঘের ভার।
থাকিয়া থাকিয়া বাজে রিমি ঝিমি মল্লারে বাঁধা বীণ,
চকিত তড়িৎ চমকিয়া ওঠে; মূর্চ্ছিয়া পড়ে দিন।

সব আবরণ সরায়ে ফুটিবে নব মহিমায় রবি,
জগতে আবার জাগিয়া উঠিবে নূতন দিনের ছবি।
প্রভাত আসিবে পূর্ব্বের পথে স্বর্ণমুকুট শিরে,
অশ্রুত সুর সরণী রচিবে রজত-রজনী ঘিরে।

মেঘেরা থাকে না। ম্লানিমা থাকে না।
শোন শোন আগমনী,
জীবন-ছন্দে আলোকের সুর এখনি উঠিবে রণি।
ঊর্দ্ধে জাগিছে অসীম আকাশ, অনন্ত বিস্ময়
এ কি আনন্দ! জানি জানি হবে নবীন সূর্য্যোদয়।

১৫

চিল রূপে পিতামহ অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কেমন যেন অস্বস্তি হইতে লাগিল। সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাণী, ছোঁ মারতে ইচ্ছে করছে। ওই যে লোকটা ঠোঙায় করে' তেলে-ভাজা নিয়ে যাচ্ছে—"

চিল-রূপিণী বাণী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"ওই সব দিকে যদি আপনার মন যায়, তাহলে আর গল্পে মন দেবেন কি করে'"

"তা বটে। কিন্তু তেলে-ভাজাও নিতান্ত খারাপ জিনিস কি?"

"তাহলে তেলে-ভাজা নিয়েই থাকুন। ভবিষ্য যুগের চার্ব্বাকের গল্প থাক তাহলে"

"না, না—ওটা শুনতেই হবে। তাহলে এক কাজ করি এস, এই চিল-রূপ পরিত্যাগ করি। কারণ যতক্ষণ চিল থাকব ছোঁ মারতে ইচ্ছে করবে খালি। হাঁস হতে আপত্তি আছে?"

"আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু হাঁস হলে একটা বিপদ আছে। হাঁস হলে অনেক শিকারীর লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আমরা অবশ্য মরব না, কিন্তু গল্পটা বিঘ্নিত হবে"

"গল্প তৈরি হয়ে গেছে না কি"

"অনেকক্ষণ! বাইরে আপনি তেলে-ভাজার দিকে নজর দিলেও আপনার মনের আকাশ যে অনেক আগেই কল্পনার রঙে বিচিত্র হয়ে উঠেছে"

"কি করে' বুঝলে"

"বাঃ, আমি বাণী, আমি বুঝব না?"

"সঙ্গে সঙ্গে গল্পও বানিয়েছ?"

"গল্পটা কিন্তু শুনতে হবে একজন কবির মারফত। ঠিক শুনতে নয়—দেখতে হবে"

"দেখতে হবে? তার মানে—"

"সে লিখে যাবে, আর তার মনের ভিতর বসে' আপনি দেখবেন। আপনার একটা অংশ তার মনকে কল্পনাবিষ্ট করবে—আর একটা অংশ তার চোখের ভিতর দিয়ে দেখবে সে কি লিখছে"

"আর তুমি কোথা থাকবে"

"তার লেখনীর মুখে"

"বুদ্ধিটা মন্দ করনি। চল, তাহলে হাঁসই হওয়া যাক। নীল রঙের হাঁস হলে কেউ আমাদের আর দেখতে পাবে না। আকাশের সঙ্গে মিশে যাব আমরা"

"বেশ"

"চার্ব্বাক সামনের গাড়িতে বসে' বেশ খোশগল্প জমিয়েছে দেখছি। আচ্ছা এত গাড়ি কোথা চলেছে? বড় বড় সব কলসী রয়েছে প্রত্যেক গাড়িতে। ব্যাপারটা কি"

"মনে হচ্ছে ওগুলো ঘৃতপূর্ণ। কোথাও যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে বোধ হয়। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি, দেখতেই পাবে সব"

ক্ষণকাল পরে ঊর্দ্ধে ঘন-নীল-বর্ণ হংস-মিথুন শকট-শ্রেণীকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। মাথার উপরে নিঃশব্দে পাখা ঘুরিতেছে। নিঃশব্দে জ্বলিতেছে বৈদ্যুতিক আলোটা। মনে হইতেছে যেন এক বিচিত্রবেশী বৃহৎ পতঙ্গ কবির টেবিলের উপর নীরবে বসিয়া আছে, কবির কল্পনা-জ্যোতিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন সবিস্ময়ে দেখিতেছে কবি কি লিখিতেছেন।

ভবিষ্য যুগের কবি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন। তাঁহার প্রেরণার মূলে যে সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি যে তাঁহার সৃষ্টিকর্ম্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ভাবকে ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং বাণী যে লেখনীমুখে প্রচ্ছন্নরূপে আসিয়াছেন—এসব কথা কবির সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনি নিজেই বুঝি স্রষ্টা। কথা ও কাহিনী সবই বুঝি তাঁহার নিজস্ব।

আবেগভরে লিখিতেছিলেন তিনি।

"যা চিরকালের মতো নাগালের বাইরে চলে গেছে তাকে, মানে, তার দেহটাকে—অভিমান-ভ্রূভঙ্গী-হাসির ঝলক যে তন্বী দেহটাকে ক্ষণে ক্ষণে স্থূলতার সীমা পার করে' নিয়ে যেতে চাইত কিন্তু পারত না এবং সেই পারা-না-পারার দ্বন্দ্ব আরও অপরূপ করে' তুলত যাকে—সেই দেহটাকে, আলিঙ্গন-পাশে বাঁধবার সম্ভাবনাটুকুও যখন অবলুপ্ত হল তখন তাকে নূতন রকমে যে আবার পাওয়া যেতে পারে এ আশা আমার মনে জাগে নি কোনদিন। কল্পনায় তাকে পাচ্ছিলাম অবশ্য অহরহ, নানারূপে, নানা বেশে, নানা ভঙ্গীতে—আমার চেয়ে ঢের বেশী বিদ্বান, ঢের বেশী রূপবান, তাকে বিয়ে করেছে এ জেনেও ক্ষণকালের জন্য তাকে পর ভাবতে পারি নি, আমি নিজেও বিয়ে করেছি একজন অনবদ্যা সুন্দরীকে, কিন্তু আমার মানসলোক পূর্ণ করে' রেখেছিল আলেয়া—হ্যাঁ, মনে মনে তাকে পাচ্ছিলাম অহরহ, কিন্তু বাস্তবেও যে তাকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে পেয়ে যাব, পাওয়া যে সম্ভব, একথা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। পেয়ে গেলাম কিন্তু। অভিনব উপায়ে। আপিসের ছুটি ছিল সেদিন। বউবাজার ষ্ট্রীটে যে বোর্ডিং হাউসে থাকতাম তারই ছাতে উঠে পায়চারি করে' বেড়াচ্ছিলাম। মনের মধ্যে অসংখ্য মধুকর যেন গুঞ্জন করছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কোন বসন্তের আগমনী গাইছে ওরা? একটা খামখেয়ালী এলো-মেলো হাওয়া চারদিক তোলপাড় করছিল। কোলকাতা শহরের হট্টগোলও যেন মাঝে মাঝে উতলা হ'য়ে উঠছিল সেই হাওয়ার তোড়ে···অসংখ্য মধুকর গুঞ্জন করে' চলেছিল আমার মনে···এমন সময়, বসন্ত নয়, হঠাৎ বর্ষার সম্ভাবনা সূচিত হ'ল ঈশান কোণে। মুগ্ধ নেত্রে উদীয়মান নব-জলধরের দিকে চেয়ে রইলাম। আকাশ পরিব্যাপ্ত করে' মদমত্ত ঘনকৃষ্ণ হস্তীযূথ ছুটে আসছে! সেই কৃষ্ণ পটভূমিকায় একটা শাদা বাড়ি সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইতিপূর্ব্বে শাদা বাড়িটা একাধিকবার আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু ওর বিশিষ্ট রূপটা ইতিপূর্ব্বে দেখি নি। কালো মেঘের পটভূমিকায় সেদিন প্রথম দেখতে পেলাম। মনে হল যেন বাড়ি নয়, অহল্যা, অভিশপ্তা-পাষাণী, বুক-ভরা তৃষ্ণা, মুখে ভাষা নেই, নবোদিত মেঘের দিকে চেয়ে আছে অবরুদ্ধ মৌন প্রত্যাশায়। তারপরই ঠিক···নবোদিত মেঘে তখনও বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয় নি···আমার সমস্ত দেহে, শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হ'ল। ওই পাষাণ অট্টালিকার ক্ষুধিত আত্মাকে যেন মূর্ত্ত দেখলাম। ছাতের উপর আলসে ধরে' চেয়ে আছে মেঘের দিকে, নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে, নীলাম্বরীর আঁচলটা এলো মেলো হাওয়ায় উড়ছে, মনে হচ্ছে তার মৌন অধীরতা যেন ভাষা পেয়েছে ওই উড়ন্ত অঞ্চলপ্রান্তে, যেন ওর সমস্ত সত্তা উড়ে যেতে চাইছে অসীম আকাশে ওই কালো মেঘের দিকে···হঠাৎ হাওয়ায় তার মাথার কাপড়টা সরে' গেল, আলেয়াকে চিনতে পারলাম। আলেয়া ? এত কাছে আছে? নিরুপমবাবু এলাহাবাদ থেকে বদলি হ'য়ে এসেছেন না কি! এর পর খানিকক্ষণ আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক কি করেছিলাম, কি ভেবেছিলাম মনে নেই। ঘণ্টাখানেক পরে আপাদমস্তক জলে ভিজে দুরবীণটা কিনে যখন বাসায় ফিরলাম তখন আলেয়া ছাত থেকে নেমে গেছে। তখন তাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তারপর থেকে অনেকবার দেখেছি। নানাভাবে, নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন ঘটনার আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যে বহুবার কাছে পেয়েছি তাকে। অনেক দূরে নাগালের বাইরে যে বীণাটা বাজছিল ওই দুরবীণের সহায়তায়, তার নানা আলাপ নানা ঝঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ করে তুলেছে আমার ক্ষুধিত চিত্তকে। বস্তুত, ওই দুরবীণটাই শেষে হয়ে উঠল আমার অবসর-বিনোদনের একমাত্র সঙ্গী এবং ওই দুরবীণের মাধ্যমেই আমি শিখর সেনকেও আবিষ্কার করলাম।

আমি শিখর সেনের গল্পটাই লিখতে বসেছি। আমার কথাটা এসে পড়ল প্রসঙ্গত। শিখর আমার বাল্যবন্ধু।

তাকে কিন্তু আমি চিনি নি। আমার জীবনে যেমন মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটেছে তার জীবনেও যে ঘটেছিল তা আমি অনেকদিন জানতামই না। শিখর স্বল্পভাষী লোক ছিল, তাছাড়া অনেকদিন ছাড়াছাড়িও হয়েছিল আমাদের। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেই চাকরি নিতে হয়েছিল আমাকে, শিখর গিয়েছিল কলেজে। পিতৃমাতৃহীন শিখরকে মানুষ করেছিলেন তাঁর বিপত্নীক মামা। তিনিই তাকে এম, এস, সি পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন। শিখরের খবর আমি মাঝে মাঝে পেতাম চন্দ্রমোহনের কাছে। চন্দ্রমোহন আমাদের উভয়েরই বন্ধু ছিল। একই গ্রামে বাস ছিল তাদের। তাই মাঝে মাঝে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে যখন দেখা হত তখন শিখরের খবর পেতাম। চন্দ্রমোহন লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি, কিন্তু ব্যবসা করে' প্রচুর উন্নতি করেছে সে। বাড়ি কিনেছে কোলকাতায়। ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই আসতে হয় তাকে এবং যখনি আসে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। তার মুখেই শিখর সেনের অনেক খবর পেয়েছি। শিখর সেন প্রথম যৌবনে সে ডায়েরি লিখত সেই ডায়েরিটাও হস্তগত করেছিল চন্দ্রমোহন। বলেছিল, শিখর সেন যখন মামার সঙ্গে কলহ করে' চলে আসে তখন তার মামা শিখরের সমস্ত বই খাতা বিক্রি করে' দেন এক মুদিকে। সেই মুদির দোকান থেকে সে উদ্ধার করেছিল ডায়েরিটা। এই ডায়েরির পাতাতেই শিখরের প্রথম যৌবনের প্রণয় কাহিনীটা লিপিবদ্ধ আছে। এ কাহিনী আমি জানতাম না। তার জীবনের দ্বিতীয় অংশ —অর্থাৎ মামার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর কোলকাতায় সে যে জীবন যাপন করেছে সেই জীবনের খানিকটা, আমি শুনেছিলাম আমার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে। কিছু কিছু আমি নিজেও দেখেছি স্বচক্ষে। অর্থাৎ শিখর সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান তার সবটা আমার প্রত্যক্ষ নয়। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি, কল্পনাও করেছি কিছুটা। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কি এই তিনের সমন্বয় নয়? আমার নিজের জীবনের সঙ্গে ওর জীবনের অদ্ভুত রকম একটা মিল আছে বলেই ওর কাহিনীটা লিখতে বসেছি। দূরবীণের ভিতর দিয়ে আমার আলেয়ার অপরূপ আবির্ভাব দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পেলাম শিখর সেনকে, এক নূতন শিখর সেনকে, যাকে আমি চিনতাম না। দেখলাম সে-ও অনুসরণ করছে আর এক আলেয়াকে। মনে হ'ল সে শিখর সেন নয়, পতঙ্গ, আমারই মতো পতঙ্গ, প্রদক্ষিণ করে' চলেছে এক জ্বলন্ত শিখাকে, যে শিখা শেষে তাকে —কথাটা মনে হলে এখনও আমি শিউরে উঠি। উমেশ মামার (আমার সেই আত্মীয় পুলিশ অফিসারটির) কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ভয় হয়, আমারও ওই পরিণাম হবে না কি! মাঝে মাঝে লোভও হয়, মনে হয় আহা সত্যিই যদি ওরকম পরিণাম, ওরকম নাটকীয় পরিণাম আমার জীবনেও হ'ত, ওরকম একটা তীব্র জ্বালাময় আনন্দময় দুঃখের শেষে আমার জীবনেও সত্যি যদি যবনিকা-পাত হত, কি ক্ষতি ছিল তাতে? শিখর সেনকে ঈর্ষা হয়। নিজের আদর্শ থেকে সে চ্যুত হয় নি, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে সত্যকেই আঁকড়ে ছিল।..."

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক থামিয়া গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। বিদ্যুৎ-প্রদীপ্ত টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিলেন। কাহিনীর গঠন-কৌশল কিরূপ হইবে সেই চিন্তায় তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, সীমাহীন কল্পনালোকে দিশাহীন হইয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু প্রতিভা কাহিনীর সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু টেবিল-ল্যাম্পকে দেখিতেছিলেন না। তিনি উৎসুক নেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন যাহা সহজে দেখা যায় না, যাহা মাঝে মাঝে সহসা দেখা দেয়। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ থাকিয়া অবশেষে তিনি যে অধ্যায়টি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার নাম-করণ করিলেন—'কমল-কিশোরের আত্মকথা'। তাহার পর আর একটি ছোট কাগজে লিখিয়া রাখিলেন —'শিখর সেনের কলিকাতা প্রবাসের ডায়েরি'। তাঁহার মনে হইল এই দুই অংশে গল্পটি বলিলে সম্পূর্ণভাবে গল্পটি বলা হইবে।

অগণিত নক্ষত্রের আলোকে আকাশ ঝলমল করিতেছে! অস্তাচলচূড়াবলম্বী শুক্লা তৃতীয়ার শশী দিগন্তরেখায় মোহাচ্ছন্ন মানসে স্বপ্নলোক সৃজন করিতেছে। আলো-আঁধারির প্রহেলিকায় মহাকাশ রহস্যময়, ছায়া-পথের নীহারিকা-লোকে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণা আহত

াণাতন্ত্রীবৎ কম্পিত হইতেছে। পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া লিয়াছে নীল হংস-মিথুন।

পিতামহ বলিলেন, "কমল-কিশোরই কালকূট হয়ে ঠল না কি শেষে"

বাণী উত্তর দিলেন, "স্রষ্টার কল্পনায় যা একদা কালকূট ছিল তাই যদি এখন কমল-কিশোর হয়ে ওঠে তাতে াশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পঙ্কই তো পঙ্কজে রূপান্তরিত য়—"

এক্ষেত্রেও তা হচ্ছে কি? কালকূটই কি কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হচ্ছে? বিশ্বাস কর বাণী, আমি খন সৃষ্টি করি তখন বুঝতেই পারি না যে ছাই পাঁশ কি চ্ছে! একটা অদ্ভুত আনন্দস্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে যা দেখি বা অনুভব করি, তাই আমার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কি যে হচ্ছে তা বুঝতেই পারি না তুমি যতক্ষণ না তাকে পরিচ্ছন্ন রূপ দাও। আমার ভাবের তুমিই ভাষা। তাই তোমাকে জিগ্যেস করছি, কালকূটই কি কমল-কিশোর হ'য়ে ফুটছে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। কালকূটের কামনা ওর মধ্যে ফুটেছে; কিন্তু সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি না এখনও"

পিতামহ আর কোন কথা বলিলেন না।

নীল হংস-মিথুন পুনরায় উড়িয়া চলিল। তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, অস্তগামী চন্দ্রকে তাহারা বুঝি কিছু বলিবে, তাই তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

প্রেম ও প্রয়োজন

গোপাল ভৌমিক

বেশ বেশ, শুনে খুব আশ্বস্ত হলেম—
জীবনে পেয়েছ টাকা, নাই পাও প্রেম।
স্বামী-পুত্রে ভাগ্যবতী মোটর-চারিণী
তোমাকে ভুলতে আমি আজও যে পারিনি
সে-কথা নতুন করে জানিয়ে কি ফল—
কাঠ-ফাটা আকাশে কি থাকে ঝড় জল?
কান্না ভুলেছ তুমি, আনন্দে হাসো না—
স্বর্গের সমিধ নেই, রয়েছে বাসনা।

বেশ বেশ, শুনে খুব আনন্দ পেলাম—
বহু দূরে কলিয়ারী, স্বামীর কি নাম?
ডাক্তার সেন? তার ভাল রোজগার—
সে-কথা বুঝেছি দেখে দেহের বাহার!
আমার এ চোখে তুমি তবু কঙ্কাল—
কৃত্রিম স্ফীত দেহে সঞ্চিত জঞ্জাল।
মনে হয় জীবনের সব বুঝি ভুল—
কৃষ্ণচূড়ার গাছে আজ নেই ফুল।

আমার খবর চাও? আমি একরূপ—
উড়িয়ে পুড়িয়ে দেই জীবনের ধূপ।
মাঝখানে কেটে গেছে যে দশ বছর—
স্বপ্নের স্মৃতিতে ছিল তারা উর্বর।
এ মহা মুহূর্ত আজ যদি বা পেলেম—
মনে হয় সব আছে, নেই শুধু প্রেম।
আবার দু'চোখে তাই জালিয়ে আগুন
সুতীক্ষ্ণ শায়কে ভরি জীবনের তূণ।

নব-ধারাপাত

রামেন্দু দত্ত

কাঁচা কৈশোরে জীবনে আমার এমনি আরেকবার—
সারাটা দুনিয়া মরুভূমি হয়ে করেছিল হাহাকার।
সেদিনো তুমিই একাকী আমার সম্বল ছিলে, হরি!
আজ কেন তবে তেমনি বিপদে প্রতিপদে ভয়ে মরি?
কোথা ভগবান্ কর মোরে ত্রাণ, যেন গো রক্ষা পাই!
কল্যাণ যাহে হয়, তাই দিয়ো, অন্য কিছু না চাই॥

সারাটা জীবন ভরিয়া আমায় অনেক দিয়েছ স্বামী
ফেলেছি ছড়ায়ে, সদ্ব্যয় তা'র হয় ত করিনি আমি।
আপনার জনে, অথবা ধনী ও মানীদের সেবা করি'
স্বার্থপরের মতন থেকেছি, পরের দুখে না স্মরি'!—

ছেলে-মেয়ে-বৌ, বোন-ভাই-সখা, সখীদের তরে কত
অকাতরে ব্যয় করেছি অর্থ, অপদার্থের মত!
আজ তা'র ফল বোঝালে দেবতা; ধন্য করুণা তব;
বৃদ্ধের এই 'নব-ধারাপাত'! 'পাঠশালা' অভিনব!

আজ গৃহহারা হয়েছি এবং হারায়েছি মোর সব,
নাহি সম্মান, সম্পদ, আশা, বন্ধু কি বৈভব;
ছেলে মেয়ে বৌ পরেরও অধম ব্যবহার দিল মোরে
একমুঠা ভাত, এতটুকু ঠাঁই, জোটেনা কাহারো দোরে।

কোথায় মাধুরীময় হে মাধব! চিরসখা, প্রিয়তম!
ভ্রান্ত অধম অপরাধী তব আশ্রিতে আজি ক্ষম!
আর যেন আমি ক্ষণেকও ভুলিয়া অপরাধ নাহি করি;
কুকুর সেবা করা ভালো তবু আত্মীয়ে নয়, হরি!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাশকান্দের কৃষ্টি-কলা-কাননে সে নাচের আসর ছেড়ে এগিয়ে এসে দেখলুম—পথের আশে-পাশে রঙীন আলোয় আলো-করা ফোয়ারার ধারে পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত বীথি এবং লতা-কুঞ্জের মাঝে মাঝে সারি সারি ছোট বড় বহু বিচিত্র 'ষ্টল' (stall) বা কুঠুরী সাজানো—যেমন আমাদের দেশের মেলায় একজিবিশনে বা কার্নিভালের প্রাঙ্গণে দেখা যায়! তফাৎ এই যে—আমাদের দেশে সে সব মেলায় ষ্টলগুলির অস্তিত্ব ক্ষণিকের··· আর আনন্দ-পশরায় ভরা এ-সব 'কাল্‌চার-পার্কের' সুদৃশ্য রুচি-সুন্দর বিচিত্র কুঠুরীগুলি পাকা-ছাঁদে পাকা-রকমে গড়া এবং তাদের স্থিতির

উজবেকীস্তানের বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণারত ছাত্রী

মেয়াদও সুদীর্ঘ। এ সব কুঠুরীতে সর্ব্বত্রই, কর্ম্মশ্রান্ত লোকজনের দেহ-মন চাঙ্গা করবার এবং আনন্দে সময় কাটাবার জন্য নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের নানা ব্যবস্থা রয়েছে—এত রকম যে, বলে শেষ করা যায় না! কোথাও বসেছে গানের জলসা, কোথাও খেলার বন্দুক বা বল্ ছুড়ে লক্ষ্যবেধের ব্যবস্থা, কোথাও যন্ত্রচালিত ঘূর্ণ্য নাগর-দোলা। প্রাঙ্গণের অপরাপর অঞ্চলে কোথাও দেখি—সঙ্গীত-পিপাসুর দল জমেছে যন্ত্র-সঙ্গীতের আসরে, কোথাও ম্যাজিকের খেলা, রঙ্গ-কৌতুকের বৈঠক, আবৃত্তির আখড়া, দৈহিক ক্রীড়া-কসরতির আঙিনা—এমনি কত কি! এ সবের মাঝে মাঝে নক্ষত্র-খচিত উন্মুক্ত আকাশের নীচে কিম্বা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচিত্রিত কুঠুরীতে অভ্যাগতদের জন্য পান-ভোজন এবং আরাম-বিরামের ব্যবস্থাও প্রচুর। সোভিয়েট দেশের এই অভিনব কৃষ্টি-কলা-কাননের চারিদিকে অনাবিল আনন্দের এমনি স্বতস্ফুর্ত্ত স্রোত বয়ে চলে রাত প্রায় শেষ পর্য্যন্ত। সবাই এখানে আনন্দে আত্মহারা—অথচ, কোথাও কোনোখানে এতটুকু অশোভন বা বেহায়া বেলেল্লাপণা কিম্বা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার কুশ্রী কদর্য্যতা নেই! তা ছাড়া, এখানকার এই আনন্দ-মেলার আসরে আর একটি ব্যাপার বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্য দেশে কার্নিভাল্, একজিবিশন কিম্বা মেলায় সচরাচর যেমন ভাগ্য-পরীক্ষা বা ক্রীড়া-চাতুর্য্যের অজুহাতে নানা ধরণের জুয়াখেলার প্রচলন দেখা যায়—সোভিয়েট দেশের কোথাও কিন্তু তার চিহ্ন দেখিনি। ওখানকার ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা তাস-পাশার আড্ডাতেও জুয়ার নেশায় মত্ত কোনো জুয়াড়ীর দেখা পাইনি! জুয়া এবং জুয়াড়ীর স্থান নেই নাকি এই সোভিয়েট সমাজ-জীবনে!

এমনি ভাবে, তাশকান্দের কৃষ্টি-কলা-কাননের বিরাট অঙ্গনে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে সোভিয়েট দেশের সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের সহজ সুন্দর সামাজিক কিছু পরিচয় নেবার আগ্রহে আমরা এমন তন্ময় যে ঘড়িতে কখন রাত বারোটা বেজে গেছে—হুঁশ ছিল না। রাত অনেক হলেও মন আগ্রহে সজীব···কিন্তু দেহ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সারাদিনের সুদীর্ঘ পথশ্রমের দরুণ। কাজেই মনের উৎসাহ-অনুসন্ধিৎসা মনে রেখে সে রাত্রির মত হোটেলে ফিরে এলুম। সহরের পথে লোক-জনের ভীড় তখনও বেশ···সিনেমা, থিয়েটার, নাচঘরের নৈশ-আসর তখন সবে শেষ হয়েছে। ঘর-ফিরতি নরনারীরা অপ্রত্যাশিতভাবে ক'জন ভারতবাসীকে তাশকান্দের পথে দেখে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে রইলেন!

হোটেলে ফিরে দেখি—সঙ্গীরা সব যে যার ঘরে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন ···শুধু অধ্যক্ষা মহিলাটি জেগে বসে আছেন আমাদেরই প্রতীক্ষায়। আনন্দ-মেলার অভিনব অভিজ্ঞতার আমেজে মন আমাদের ভরপুর ···তবু, দেশে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এসে দূর বিদেশে অপরিচিতা অনাত্মীয়া এই বিদেশিনীর আন্তরিক স্নেহ-মমতার স্পর্শটুকু এত ভালো লেগেছিল সেদিন—যে তা বলে বোঝাবার নয়!

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁচের বিরাট জানলায় বাইরে

দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখি সোনালী রৌদ্রের আভায় সারা সহর ঝলমল করছে। পথশ্রমে ক্লান্ত সঙ্গীদের অনেকে তখনও শয্যাশায়ী…কাজেই প্রাতরাশের বিলম্ব বুঝে—চট্‌পট্ স্নানাদি সেরে আমি একা হোটেল ছেড়ে বেরুলুম সহরের পথে পদচারণ করে ওদেশের সাধারণ জীবন-যাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয় আহরণের উদ্দেশ্যে।

পথে লোক-চলাচল সুরু হয়েছে…ট্রাম, ট্রলীবাস, মোটরের ভীড় সবে জমতে আরম্ভ করেছে—দোকান-পাট সব একে একে দরজা খুলছে…চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ত জীবনের হিল্লোল…রাতের ঘুমন্ত সহর জেগে উঠেছে দিনের আলোর স্পর্শে!

অনুসন্ধিৎসু পরিব্রাজকের মত এ-পথে, সে-পথে, নানা পথে ঘুরে সহরের সব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি…অজানা জায়গা…অচেনা পথ-ঘাট…ভাষাও জানি না ওদেশের…সঙ্গে কোনো দোভাষী বন্ধু নেই সহায়তা করবে—তবু কোনো অসুবিধা বোধ করিনি…এমন কি হোটেলে ফিরে আসার সময় পথের নিশানাও ভুল হয়নি একবার।…আমাকে বিদেশী এবং সঙ্গীহীন একা দেখে পথচারীরা অনেকেই সাগ্রহ-কৌতূহলে আলাপ করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন।…ওদেশী ভাষা না জানার দরুণ তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার অসুবিধা হলেও দু'পক্ষের কারো ব্যাঘাত ঘটেনি মনের ভাব আদান-প্রদানের ব্যাপারে! সঙ্গে ছিল আমার পকেট-বুক…তাতে রুশীয় ভাষার যে সব সাধারণ চলিত প্রতিশব্দগুলি সযত্নে সঙ্কলন করে টুকে রেখেছিলুম…সেগুলির অপ এবং অর্ধ-প্রয়োগে, কোনোমতে বাক্যালাপে কাজ-চলা-গোছ সেতু রচনা করে নেওয়া গিয়েছিল। পথচারীদের অনেকেই দেখলুম ভারতবর্ষের বিষয়ে জানবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত…আমাদের দেশের সম্বন্ধে নানা কথা জানতে চাইলেন তাঁরা।…সাধ্যমত তাঁদের সে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে ভারতীয় প্রথায় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতি-নমস্কার জানিয়ে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে গেলুম তাশকান্দের সুপ্রসিদ্ধ আলি শের নাভৈ অপেরা হাউসের বিশাল প্রাঙ্গণে।

তাশকান্দের সন্নিকটে স্টালিন যৌথকৃষি-প্রতিষ্ঠানের তুলা চাষের ক্ষেতে

আলি শের নাভৈ ছিলেন উজবেকিস্তানের জাতীয় কবি, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক এবং গণজাগরণের রাজনীতিজ্ঞ বীর-নেতা! বলশেভিক মতবাদের অভ্যুদয় এবং আন্দোলনের বহু বহু যুগ আগে তিনি তাঁর অপরূপ কাব্য এবং যৌক্তিক বাগ্মিতার মাধ্যমে এদেশের পরাধীন জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বাধীনতার মহামন্ত্রে এবং তাঁরই দীক্ষায় আর বীর নেতৃত্বে উজবেকিস্তানের বাসিন্দারা যুদ্ধে তৎকালীন-গৃধ্নু-বর্ব্বর বিদেশী শাসকদের পরাস্ত করে, শোষণ-পীড়ন দাসত্ব বন্ধনের কলঙ্ক-গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত স্বাধীন করেছিলেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জনকল্যাণ-সাধনায় মহাপুরুষ হলেও কবি, দার্শনিক, সংস্কারক বীর, রাজনীতিবিশারদ মহাত্মা আলি শের নাভৈয়ের বিচিত্র কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত হয়েছিল নিতান্ত সহজ, সরল, সাধারণ ভাবে! যশ-খ্যাতি, মান-ঐশ্বর্য্য, নেতৃত্ব ক্ষমতা সব কিছুই পেয়েছিলেন তিনি দেশের ও দশের কাছে, তবু নির্লিপ্ত ফকিরের মত একান্তে একনিষ্ঠভাবে মহান্ আদর্শের সাধনায় ব্রতী থেকে অনাড়ম্বর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে গেছেন এই মনীষী! বিরাট-চরিত্র আলি শের নাভৈ পরলোকগত হলেও তাঁর পবিত্র স্মৃতি আজও উজবেকিস্তানের ছোট বড় প্রত্যেকটি মানুষের মনে সদা-জাগরূক রয়েছে…এমন কি সোভিয়েট আমলেও অতীতের এই গণ-আন্দোলনের নেতা দার্শনিক কবির পুণ্য স্মৃতির প্রতি এদেশের লোকের অবিচল ভক্তি-শ্রদ্ধার এতটুকু বিচ্যুতি ঘটেনি! সোভিয়েট দেশবাসীরা তাঁদের প্রিয় কবিকে যে কতখানি আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন এবং ভালোবাসেন, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে—এই পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতি-পূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত তাশকান্দের আলি শের নাভৈ বিশ্ববিদ্যালয়, আলি শের নাভৈ অপেরা হাউস প্রভৃতি সুবিশাল সৌধমালার প্রতিষ্ঠায় এবং সহরের সেরা সড়কের শিয়রে অধিষ্ঠিত তৃণপুষ্প-পল্লবসজ্জায় সুসজ্জিত বাগিচায়-ঘেরা গণ-নেতা আলি শের নাভৈয়ের বিরাট মর্ম্মর মূর্ত্তির রচনায়!
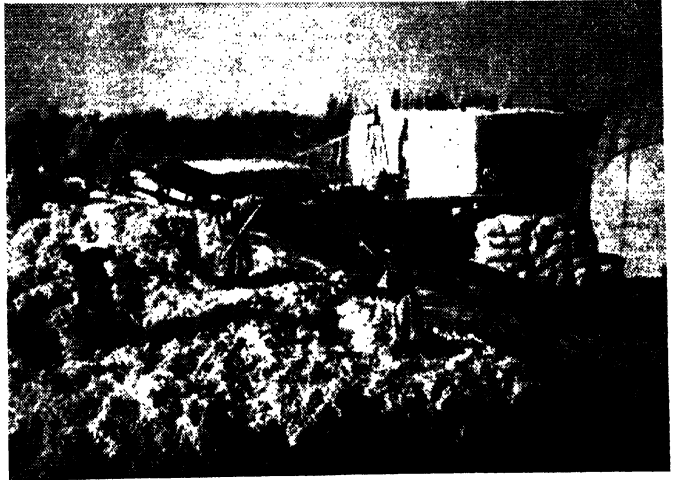
ওদেশের লোক-কবির পুণ্য-স্মৃতির পূজায় সোভিয়েট অধিবাসীদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের এই অপরূপ নিষ্ঠা দেখে মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের লোকায়ত কবি-সাহিত্যিকের কথা! রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের পর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে—অথচ শুধু কাগজে-

কাগজে গালভরা কথায় বোনা আবেদন-পত্র ছাপিয়ে চাঁদা আদায়, আর সভা-সমিতির বৈঠকে তাক্-লাগানো বুক্‌নি এবং বড়-বড় পরিকল্পনার ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি জাহির করে সাধারণ-জনের মনকে ধাঁধানো ছাড়া—আমাদের দেশের পাণ্ডারা এই দুই মনীষীর স্মৃতি চিরন্তন করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন কতখানি—ভাবলে লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে! নিমতলার শ্মশান-ভূমির যে অংশটুকুতে রবীন্দ্রনাথের নশ্বর-দেহাবশেষ ক'বছর আগে চিতা-ভস্মে পরিণত হয়েছিল—আজ সেখানে ছাগল, গরু চরে বেড়াচ্ছে অবাধে! আমাদের দেশের জাতীয়-কবির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে মর্ম্মর-মন্দির প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, সে পবিত্র স্থানটুকুকে পশুর উৎপাত-উপদ্রব থেকে বাঁচিয়ে রাখার সম্বন্ধেও স্মৃতি-রক্ষা-কমিটী সম্পূর্ণ উদাসীন!…উজ্‌বেকিস্তানের জাতীয়-কবি আলি শের নাভৈয়ের স্মৃতি-পূজার প্রতীক তাশ্‌কান্দের সেই অপরূপ বিরাট অপেরা হাউস এবং মর্ম্মর মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে দু'দেশের দুই জাতীয়-কবির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা-নিবেদনের পার্থক্য সেদিন বিশেষ করেই আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল!

সহরের পথে প্রাতঃভ্রমণের সময় আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করলুম। এখানে আসবার আগে শুনেছিলুম সারা সোভিয়েট দেশের পথে-ঘাটে বিদেশীদের পক্ষে একা স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা এবং যত্র-তত্র বিচরণে নাকি বিশেষ বাধা-নিষেধ ও অসুবিধা-অন্তরায় ঘটে এ দেশীয় গোয়েন্দা-পুলিশের কড়া ব্যবস্থার ফলে! এই সব গোয়েন্দা-পুলিশের লোক এদেশে-আগন্তুক প্রত্যেক বিদেশীকে অনুক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করে বেড়ায় প্রত্যেকটি কার্য্যকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে! এঁদের এই কড়া-নজরকে এড়িয়ে চলা বিদেশীদের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার! এ-কথা শোনা ছিল বলেই তাশ্‌কান্দের পথে-পথে একা ঘুরে বেড়ানোর সময় আগাগোড়া সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলুম, আমার আশে-পাশে পিছনে গোয়েন্দা-পুলিশের ফেউ লেগেছে কিনা—কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, সারা পথে শুধু যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ-কারী ট্রাফিক-পুলিশের পাহারওয়ালা ছাড়া আর কোনো পুলিশ-ব্যাপার কোথাও চোখে পড়েনি। এমন কি সহুরে-বাসিন্দার ছদ্মবেশে এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পেলুম না—আমার পিছনে-পিছনে আমার উপর যে নজর রেখেছে।

মনের আনন্দে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পথে-পথে ঘুরে হোটেলে ফিরে দেখি, সঙ্গীরা ইতিমধ্যে স্নানাদি সেরে প্রাতরাশের জন্য প্রস্তুত! সদলে আমরা খানা-কামরার দিকে এগুচ্ছি, এমন সময় মস্কো থেকে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-মন্ত্রীসভার প্রতিনিধি শ্রীযুত আব্রাহামফ্ এসে হাজির—এখান থেকে আমাদের পথ-পরিদর্শক এবং দোভাষী-সহচর হয়ে মস্কোয় নিয়ে যাবেন! কাল বিকালে আমাদের তাশ্‌কান্দে পৌঁছানোর তার-বার্ত্তা', পেয়েই ইনি সন্ধ্যায় প্লেনে মস্কো ত্যাগ করে আজ এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেচেন—ভদ্রলোকের বয়স প্রায় বছর চল্লিশ…খুব অমায়িক মিশুক মানুষ—অল্পক্ষণেই রীতিমত বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেললেন আমাদের সঙ্গে!

তাশকান্দের রাজপথ—উজ্‌বেকী জাতীয় কবি আলি শের নাভৈয়ের নামে উৎসর্গীকৃত

প্রাতরাশের সময় শ্রীযুত আব্রাহামফের মুখে খবর পেলুম, মস্কোতে সবাই নাকি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন আমাদের অপেক্ষায়। কাজেই বললেন, সুদীর্ঘ একটানা পথ-পরিভ্রমণের দরুণ আমরা যদি পরিশ্রান্ত বোধ না করি, তো আজই রাত দুটোর সময় তাশ্‌কান্দ থেকে প্লেনে চড়ে আকাশ-পথে রওনা হতে পারি সুদূর মস্কোর অভিমুখে! এ-প্রস্তাবে আপত্তি ছিল না কারো—বিশেষ, আমরা সকলেই বিশেষ উৎসুক যুগ-যুগান্ত-কালের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রুশীয়-রাজধানীর রূপ-গরিমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেবার জন্য! কাজেই সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হলো, সেই রাত্রেই আমরা তাশ্‌কান্দ ছেড়ে মস্কোর পথে পাড়ি দেবো! তাশকান্দ থেকে মস্কো অনেক দূরের পথ…দ্রুতগতি বিমান-যানে একটানা উড়ে চলেও এই সুদীর্ঘ পথ-অতিক্রমে সময় লাগে প্রায় পনেরো ঘণ্টা!

খাওয়া-দাওয়া সেরে উজ্‌বেকিস্তানের চলচ্চিত্র-বিভাগের সেই তরুণ বন্ধু দু'টির সঙ্গে শ্রীযুত আব্রাহামফ্ বেরুলেন আমাদের মস্কো-যাত্রার বন্দোবস্ত করতে! আমাদের দলের অনেকে সেঁধুলেন নিজেদের কামরায় ক্ষণিক বিশ্রাম এবং দেশে চিঠিপত্রাদি লেখবার অভিপ্রায়ে। সঙ্গীদের

বিশ্রামরত দেখে আমি কি করবো ভাবছি—এমন সময় আমাদেরই হোটেলের বাসিন্দা কজন চৈনিক তরুণ-তরুণী এসে নিতান্ত-পরিচিতের মত টেনে নিয়ে গেলেন তাঁদের কামরায় ! চৈনিক-নেতা মাও-সে-তুঙের নব-গঠিত চীন দেশ থেকে এঁরাও এসেছেন সুদূর সোভিয়েট রাজ্য সফরে ! এঁদের মধ্যে কেউ পিকিংএর কারখানার শ্রমিক-নেতা, কেউ বা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী—এমনি কত কি ! এঁরা এসেছেন মস্কোতে-অনুষ্ঠিত ট্রেড-ইউনিয়ন বৈঠকের অধিবেশনে চীন দেশের বিভিন্ন শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে ! আমাকে প্রাচ্য-দেশীয় পেয়ে মহা-উৎসাহে তাশকান্দের হোটেলের কামরায় বসেই তাঁরা অভিনব অন্তরঙ্গভাবে চীন-ভারত মৈত্রী-সম্পর্কে গল্প-আলাপ জমিয়ে তুললেন অবিলম্বে ! আমাদের আসবার আগে থেকেই এই চৈনিক-পরিদর্শকের দলটি এখানে এসেছেন এবং থাকবেন এখানে আরো ক'দিন—কাজেই তাশকান্দের অনেক কিছুই এঁরা ইতিমধ্যে দেখেছেন এবং জেনেছেন ! এঁদের কাছে এদেশের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল !

মধ্য-এশিয়ার যে বিশাল সুদীর্ঘ অঞ্চল সোভিয়েট-রাষ্ট্রের অন্তর্গত, তার বিস্তার—পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর থেকে—পূর্ব্বে চীনদেশের সিংকিয়াং প্রদেশ এবং দক্ষিণে ইরাণ ও আফগানিস্তানের সীমান্ত দেশ থেকে উত্তরে কাজাগ্‌স্তান্ পর্য্যন্ত ! মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চারটি প্রজাতান্ত্রিক প্রদেশ আছে—উজ্‌বেকিস্তান, তুর্কমেনিয়া, তাজিকীস্তান্ এবং খার্-গীজিয়া ! এই চারটি দেশের সমষ্টিগত পরিধি হলো ৪৪৮,৭৪৫ বর্গ মাইল—লোক-সংখ্যা ১১,০০০,০০০ !

মধ্য-এশিয়ার সূত্রপাত—তুষার-শীর্ষ পামির, তিয়ান্‌সান্ এবং আলা-তাউ পর্ব্বতমালা থেকে। এই সব উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গের তুষার-গলিত জলধারা বিবিধ স্রোতস্বিনীরূপে পাহাড়ের গা বয়ে নীচেকার তটভূমি প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়ে বেশীর ভাগই মিলিয়ে গেছে বিশুষ্ক-বিশাল মরুভূমির বুকে ! শুধু এ-অঞ্চলের আমু-দরিয়া এবং সীর-দরিয়া নদী দু'টি এর ব্যতিক্রম !···মরুভূমির অকরুণ বালুতেই বিলীন না হয়ে—এ দুটি নদী উত্তরে আরল সাগরের জলরাশিতে গিয়ে মিশেছে। মাত্র এই দুটি নদীর কল্যাণে উর্ব্বর শস্য-শ্যামল কূলে-কূলে যুগযুগান্ত ধরে বসতি করে আসছে এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা ! তাই মধ্য-এশিয়ার সমগ্র ইতিহাস দিনে-দিনে গড়ে উঠেছে এই দুই নদীরই উপকূলে ! অনুর্ব্বর, রুক্ষ, মরুময়, অকরুণ মরুর সন্তান—এদেশী মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক এবং মানসিক জীবন-যাত্রার ধারাও তাই বিচিত্র ছাঁদের ···নগ্ন-গাত্র পাহাড়ের বুকে, বিশুষ্ক-মরু-প্রান্তরে জলাভাবের দরুণ এক টুকরো ফশলের জমি রচে তোলবার চেষ্টায় এদের প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়···নদীমাতৃক দেশের শ্যামল শান্তি-সুখের সহজ জীবন-যাত্রার স্বপ্ন এদের কাছে অপরিজ্ঞাত ! নির্দ্দয়-প্রকৃতির সঙ্গে সর্বদা সংগ্রাম করে বাঁচতে হয় এদের···তাই দেহে এরা বলিষ্ঠ পরিশ্রমী কষ্টসহিষ্ণু···মনেও তেমনি কঠোর, নির্ম্মম, অশান্ত !

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-কেন্দ্র বলেই ইতিহাসের সেই আদি যুগ থেকে মধ্য-এশিয়ার এইসব অঞ্চলের উপর দিয়ে নানা দেশের, নানা বাণিজ্য-সম্ভার এবং নানা জাতির বণিক-পশারীদের নিত্য যাতা-য়াতের বহু বিচিত্র বাণিজ্য-পথ সৃষ্টি হয়েছে আবহমান কাল ধরে ! এই ভাবে বাণিজ্য-বেশাতী এবং সওদাগরী লোকজনের আসা-যাওয়া, মেলা-মেশার ফলে কালে-কালে এসব অঞ্চলের গিরিপাদমূলে, নদীতটপ্রান্তে, শ্যামল প্রান্তরে কিম্বা মরু-উদ্যানের কিনারা ঘেঁষে যুগে-যুগে বহু মানুষের বহু বছরের বহু পরিশ্রমে গড়া কত সুসমৃদ্ধ নগর, জনপদ, সৌধ-অট্টালিকা-প্রাসাদ, ইমারত এবং বিচিত্র সামাজিক জীবন ও রাজনীতি সভ্যতার ধারা কতবার কতরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং কালের প্রকোপে ধ্বংস বিনষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে—আবার উদাসীন প্রকৃতির নির্ম্মমতা আর বহিরাগত দুর্দ্দম বিদেশী লুণ্ঠন-লোভী গৃধ্নু গ্রীক, তাতার, মঙ্গোল, আরব এবং রুশীয় অভিযাত্রীদের নৃশংস-বর্ব্বরতার ঝঞ্ঝা-তাড়নায় ! এখানকার অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা—শুধু বিরোধ অশান্তি হিংসার রক্তে রাঙা ! চাষের যোগ্য জমি কেড়ে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা চলতো নিত্য মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে ! বহু নদী উপনদী ছিল জলভারে প্রাণবন্ত, খরস্রোতে চঞ্চল-উচ্ছল—উত্তরে পাঁচশো ছশো মাইল বয়ে চলে আর্ক্‌টিক সাগরে তারা মিশেছিল। কিন্তু কালক্রমে বালির বুকে সে সব নদী-উপনদীর কতগুলি যে প্রাণ-ধারা নিঃশেষে বিলীন করেছে, আজ তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। সে সব নদী উপনদী মরে বিলুপ্ত হবার ফলেই ওদিককার ভূগোলের চেহারা গিয়েছে বদলে।

৩২৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মাসিদনিয়াধিপতি গ্রীক-বীর আলেকজান্দারের হাতে মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস-সমৃদ্ধ সমরখন্দ্ সহর অগ্নিদাহে হয় ভস্মীভূত—সে আমলে সমরখন্দের নাম ছিল মারকান্দ্ (মার্কণ্ড ?) ! বিজয়ী আলেকজান্দার এখানে গ্রীক-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরব অভিযাত্রীরা আমু-দরিয়া নদী পার হয়ে সমরখন্দ্ দখল করেন এবং এখানে মাবারান্নকার মুসলিম রাজ্য স্থাপনা করেন। মাবারান্নকার কথার অর্থ—নদী-পারের রাজ্য ! এর পর তাতার-বীর চেঙ্গিশ্ খানের অভিযান—১২২১ খৃষ্টাব্দে। চেঙ্গিশ্ খানের হাতে সমরখন্দ্ আবার অগ্নিদাহে ধ্বংস হয় ! তারপর ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল-বীর তৈমুরলঙ এসে এদেশ অধিকার করেন—তাঁর হাতে হয় সোনার সমরখন্দের প্রতিষ্ঠা ! তৈমুরলঙের বর্ব্বর নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁকে অভিসম্পাৎ করতো, কিন্তু সে নিষ্ঠুরতার স্মৃতি মুছে আজও তাঁর হাতে-গড়া মর্ম্মর-স্তম্ভ—তৈমুর-পত্নী বিবি খানের স্মরণ উদ্দেশ্যে—তৈমুরের হৃদয়-বৃত্তির ভাস্বর স্মৃতির মত জ্বলজ্বল্ করছে। ভারত, চীন, পারস্য থেকে সুদক্ষ বহু কারু-শিল্পী, স্থপতিবিদ্‌দের নিয়ে গিয়ে এ বিরাট মর্ম্মর-স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করানো হয়।

তৈমুরের মৃত্যুর ৭০ বৎসর পরে সমরখন্দ আবার ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়···বালির গ্রাসে নদী-উপনদীর ঘটে বিলোপ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে সোনার সমরখন্দ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়।

তৈমুরলঙের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট ক'টি রাজ্যের

সৃষ্টি হলো—খিভা, কোকন্দ এবং বোখারা। এ সব খণ্ড-রাজ্যের শাসক পালক ছিলেন বিভিন্ন বংশীয় খানেরা! তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ বেধে থাকতো নিত্য-নিয়ত…তার ফলে, জন-সাধারণের উপর চলতো দুরন্ত পীড়ন নিগ্রহ। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বোখারার চাষী-প্রজার দল মরিয়া হয়ে বিপ্লব করে। বোখারার নির্ম্মম শাসক রকৃখিম্ খানের হাতে সে বিপ্লব চূর্ণ হয় এবং বিপ্লবীদের অস্থি-কঙ্কালের স্তূপের উপর রকৃখিম্ খান্ বিরাট এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে বিজয়-গর্ব্বে আত্মহারা হয়েছিলেন।

এরপর ১৮৬৩-৯৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার 'জার'-এর সঙ্গে ঘটে এই সব খান্‌দের যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম পর্ব্বতের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত সারা মধ্য-এশিয়া হলো রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।…রুশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও খিভা, কোকন্দ, বোখারা প্রভৃতির শাসনভার ন্যস্ত রইলো এ সব অঞ্চলের খান্‌দের হাতে—করদ-সাম্রাজ্যের মত এবং এই খানেরা যাতে না বিরোধ-বিপ্লব বাধায়—সেজন্য তাদের উপর কড়া-নজর রাখবার জন্য নিয়োজিত থাকতো রুশীয় সেনাধ্যক্ষ! এই সব সেনাধ্যক্ষেরা ছিল দারুণ অত্যাচারী—নৃশংসতায় রূপকথার দৈত্যের তুল্য। তাদের সে অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করে থাকা ভিন্ন মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীদের গত্যন্তর ছিল না!

অবশেষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে হলো জন-জাগরণ…গণ-বিপ্লব বাধলো এ সব অনুন্নত অঞ্চলে…বোখ্‌রা এবং খিভার খাঁনেরা হলেন আসনচ্যুত। বিপ্লবী জন-গণ শুধু যে সুদীর্ঘকালের অত্যাচার-অবিচারের অবসান ঘটিয়ে মধ্য-এশিয়া অঞ্চলকে মুক্ত-স্বাধীন করলেন তাই নয়—বিশুষ্ক-পরিতক্ত জমির সংস্কার-সাধন ও চাষ-আবাদে মনোযোগী হলেন এবং এই জন-গণের অক্লান্ত উদ্যম-পরিশ্রম এবং সাধনা-যত্নের ফলে ১৯৪০ সালের পূর্ব্বেই বিস্তীর্ণ এই মরুময় অঞ্চল হয়ে উঠলো শস্য-সম্পদে উর্ব্বর!

আজ সোভিয়েট-রাষ্ট্রর অংশ-হিসাবে মধ্য-এশিয়া অঞ্চলের সর্ব্বত্রই বহু উন্নতি সংসাধিত হয়েছে। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে ট্রান্স-ইরানীয়ান্ এবং ট্রান্স-আফগান—বড় বড় সড়কের সৃষ্টি হয়েছে। এ সব সুন্দর সড়ক সাধারণের পক্ষে যেমন নিরাপদ এবং সহজগম্য—তেমনি সোভিয়েট রাজ্য-রক্ষায় প্রধান সহায়!

(ক্রমশঃ)

মোদের বাঁচাতে রহিবে কি কেউ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আর কতকাল খেলাঘরগুলি
বাঁচায়ে রাখিব যুগ সংঘাতে!
স্বপন সৌধ হোয়ে যায় ধূলি
সব-হারাদের অভিসম্পাতে।
জানিনা কখন ভাঙনের ঢেউ
রচিবে মোদের ভয় কোলাহল!
মোদের বাঁচাতে রহিবে কি কেউ,
ফুটিবে কি কোন প্রাণ-শতদল!
কোথা কাঁদে যেন শত পথহারা!
ভাগ্য গগনে নিবিল কি তারা?

সমাজ-জীবন ভেঙে ভেঙে পড়ে,
গণশক্তির ভীরু অন্তর:
যুগাবর্ত্তের দুর্দ্দম ঝড়ে
লোক-যাত্রার গতি মন্থর।

দৃষ্টির পথে জিজ্ঞাসু মন
শত দিকে ধায় অশান্ত হয়ে,
শ্রম বিপ্লবে পরিবর্ত্তন
এসেছে প্রাণের অতৃপ্তি লয়ে।
ঐক্যশক্তি সংহতি নাই,
জন-অরণ্যে শ্বাপদেরে পাই।

মহামানবের হত্যার পরে
দানবীয় গতি শেষ কোন্‌খানে?
ছুটিতেছে সদা পথে প্রান্তরে
নিষাদের আঁখি মায়ামৃগ পানে।
আলেয়ার আলো মনোরঞ্জনে
ভূমি ও ভূমার মাঝখানে জ্বলে;
দুরাশার কোন্ কণ্টক বনে
আশার তাড়না ঠেলে নিয়ে চলে।

হৃদয় আজি'কে হারায়েছে আর,
ওঠে চারিদিকে মর-হাহাকার।

গ্রামে গ্রামে আর এলো না ফাগুন
দুঃখই শুধু রহে আমরণ,
কৃষাণ কুটীরে লেগেছে আগুন,
ভূমিলক্ষ্মীর শোনো ক্রন্দন।

কর্ম্মবিমুখ মানুষেরা যত
বসে বসে করে কত জল্পনা!
ছিন্ন পত্রে পড়েছ কি শত
কল্পনা আর পরিকল্পনা!

চলে যাওয়াদের ডেকে আনা মিছে,
ওরাই মোদের ফেলেছে কি নীচে?

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা—

বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীএস-কে-পাতিল খ্যাতনামা কর্ম্মী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি কংগ্রেস-সংস্থা ও কংগ্রেস-সরকারের মধ্যে সুসংবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন যে নির্বাচনের সময় কংগ্রেস সংস্থার কর্ম্মীদের সাহায্যেই কর্ম্মীরা নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর শাসন-যন্ত্রের সহিত কংগ্রেস-সংস্থার কর্ম্মীদের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহার ফলে কর্ম্মীদের কাছে নানাপ্রকার অসুবিধা সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেজন্য তিনি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিতে চান যাহার ফলে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সহিত কংগ্রেস-চালিত শাসন-যন্ত্রের ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধ পরিষ্কার হয় এবং উভয় দল একযোগে কাজে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। কংগ্রেস-কর্ম্মীরা শাসকদিগের সাহায্য ও সমর্থন লাভ না করিলে কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে—অন্যদিকে শাসকগণের পক্ষেও শাসন-কার্য্য সুপরিচালনা করা সম্ভব হয় না। শ্রীপাতিল এই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন—আমাদের বিশ্বাস তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

বঙ্গ-বিহারের সীমা প্রশ্নে শ্রীনেহরু—

পশ্চিম বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবী করিয়া পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার গত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় বিহারের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়া বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বিষয়টি কংগ্রেস সভাপতি তথা ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে এক পত্র দিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—উভয় পক্ষ যদি বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে একটা মীমাংসার চেষ্টা করেন তবেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। নচেৎ বিবাদ বাড়িয়া যাইবে ও উভয় পক্ষেরই মনোভাব ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করিবে। বিহারেও যেমন বহু বাঙ্গালী বাস করে, পশ্চিম বঙ্গেও তেমনই বহু বিহারী বাস করে। বিবাদ তীব্র হইলে তাহা উভয় পক্ষেরই ক্ষতিকর হইবে। বিহারবাসী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রাসাদ বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতি, তিনি ও শ্রীনেহরু উভয়ে একত্র হইয়া এ বিষয়ে সুমীমাংসার চেষ্টা করিলে বিবাদ আর বাড়িতে পারিবে না।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি—

গত ১৭ই আগষ্ট রবিবার বিকালে দক্ষিণ কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করেন, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রপাল পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদবাবু বলেন—হিন্দী রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হইলেও যে সকল ভাষার সাহিত্য শতাব্দীর সাধনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই সকল ভাষা লুপ্ত হইতে পারে, একথা তিনি স্বীকার করেন না। বাংলার বহু অতীত গৌরব লুপ্ত হইলেও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য এখনও গৌরবের আসনে সমাসীন। বাংলার বাহিরে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার করাই সমিতির উদ্দেশ্য। দেবনাগরী অক্ষরে বাংলা পুস্তক ছাপা হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সহজেই প্রসার লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রাথমিক শিক্ষকগণের দাবী—

গত ১৮ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসুর

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল—(ক) প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতনের হার বৃদ্ধি (খ) শিক্ষা-সেস ও শিক্ষাকর আদায় প্রণালীর ত্রুটি সংশোধন (গ) বিগত বর্ষের আদায়ীকৃত শিক্ষা-সেসের উদ্বৃত্ত অংশ হইতে প্রাথমিক শিক্ষকদের অতিরিক্ত মাগ্‌গী ভাতা প্রদানের জন্য স্কুল বোর্ডগুলিকে ক্ষমতা দান (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংশোধন করিয়া গ্রামাঞ্চলের ন্যায় সহরাঞ্চল হইতেও শিক্ষা-সেস ও শিক্ষাকর আদায় (ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির গৃহনির্মাণ ও সংস্কার সাধন (চ) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই প্রকার শিক্ষোপকরণ প্রদান ব্যবস্থা (ছ) শিক্ষকগণকে স্কুল বোর্ডের কাজে যাতায়াতের ভাড়া প্রদান (জ) মাধ্যমিক শিক্ষার সিলেবাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাথমিক সিলেবাস সংশোধন (ঝ) মেদিনীপুর জেলার শিক্ষকগণকে বাকী বেতন প্রদান প্রভৃতি। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে অবহিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে সত্বর শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

নুতন প্রধান সেনাপতি—

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কে-এম-কারিয়াপ্পা আগামী ১৫ই জানুয়ারী অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থানে লেপ্টেনান্ট-জেনারেল মহারাজ রাজেন্দ্র সিংহী ভারত রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। ১৯২১ সালে রাজেন্দ্র সিংহী সৈন্য বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন ও ১৯৫১ সালে উত্তর আফ্রিকায় স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার হইয়া গমন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি বিশেষ কাজে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন—১৯৪৫ সালে তিনি পুনরায় আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দিল্লী ও পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি তথায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষরূপে সকল ব্যবস্থার সুপরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি হায়দ্রাবাদ যুদ্ধেরও নায়ক ছিলেন।

উপেক্ষিত সহীদ প্রফুল্ল চাকী—

সহীদ ক্ষুদিরাম বসুর সহযাত্রী সহীদ প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরের ঘটনার পর মোকামা ষ্টেশনে পুলিসের গ্রেপ্তার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর ক্ষুদিরামের বিচার হয় ও দিনের পর দিন সকলে তাহার নাম শুনিতে থাকে। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর ক্ষুদিরামের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু প্রফুল্ল চাকীর কথা লোক ভুলিয়া গিয়াছে। গত ৩১শে শ্রাবণ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রবিবাসর-সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ও প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সহীদ প্রফুল্ল চাকীর কথা লোক বিস্মৃত হইবে না।
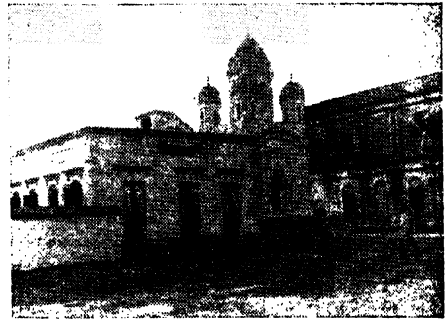
কাঁঠালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিম ভবন (গত সংখ্যায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে) ফটো—তারক দাশ

বঙ্কিম গ্রন্থমালা—চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাবলী দেখা যাইতেছে ফটো—তারক দাশ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ সমাগত খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ
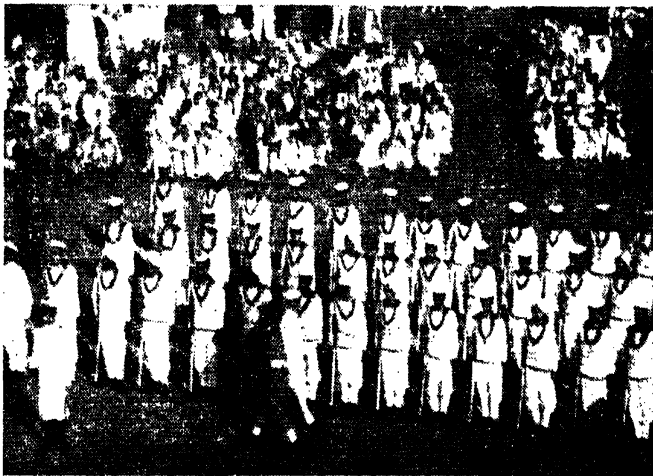
দিল্লীতে ষষ্ঠ স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় সৈনিকদের কুচকাওয়াজ। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর রক্ষিদল পরিদর্শন—পশ্চাৎ ভাগে উৎসব দর্শনরত নরনারী

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ—

ভারত রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একখানি ইতিহাস রচনার জন্য একটি সম্পাদক বোর্ড গঠন করিয়াছেন। পার্লামেণ্টের সদস্য, খ্যাতনামা দেশসেবক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ঐ বোর্ডের সদস্য ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত ঘোষ সুপণ্ডিত ব্যক্তি—তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়—

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় অটোয়ায় কমনওয়েল্‌থ সম্মেলনে যোগদানের জন্য গত ২৩শে আগষ্ট সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় বিধান সভার গত অধিবেশনে তাঁহার কার্য্যের দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, বিদেশেও তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষায় সমর্থ হইবেন এবং তিনি এই ভ্রমণে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন, তাহার দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

১৮৭৩ সালে রাণাঘাটের স্বনামখ্যাত ডাক্তার রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৯২ সালে পোর্ট কমিশনার্স অফিসে সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর কাল রাণাঘাট হইতে নিত্য যাতায়াতের পর ১৯০৮ সালে কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হন। কয়েক বার তাঁহাকে পোর্ট কমিশনার্সের সেক্রেটারীর
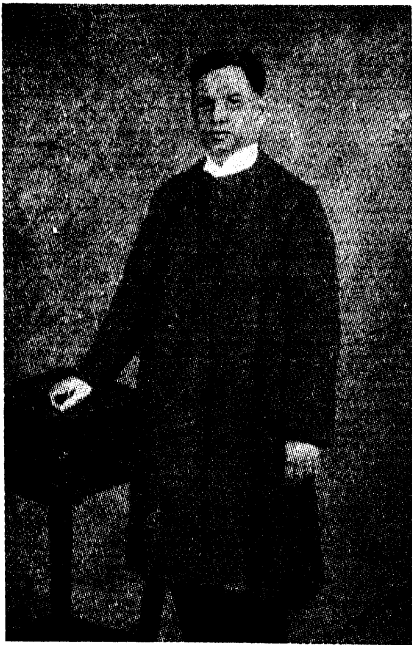
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পদেও কাজ করিতে হইয়াছিল। নিজ কর্ম নৈপুণ্যের জন্য তিনি বৃটীশ সরকারের 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ও কলিকাতা বালীগঞ্জ রাসবিহারী এভিনিউতে গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী। গত ১৯শে আগষ্ট নগেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—

আগামী ১১ই অক্টোবর হইতে ১৭ই অক্টোবর গ্রীস দেশে এথেন্সে যে জগতের মেডিকাল এসোসিয়েসনসমূহের সম্মেলন হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের উপ-মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও নয়া দিল্লীর ডাক্তার এস-সি-সেন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অমূল্যবাবু শুধু চিকিৎসক হিসাবে নহেন, সমাজ-সেবী কর্ম্মী হিসাবে এ দেশে সুপরিচিত। তিনি মন্ত্রীরূপে কাজ করিবার নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য এথেন্স হইতে ইউরোপের কয়েকটি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা দেখিয়া আসিবেন। অমূল্যবাবুর এই নির্ব্বাচনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—

সমগ্র ভারতে ৫৫টি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে। উহার প্রতিটির জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে এবং এই ৫৫টি পরিকল্পনায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক উপকৃত হইবে। ঐ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও সংস্থা সম্পূর্ণ ভারতীয়। সকল দিক হইতে ভারতের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীএস-কে-দে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ২৫শে আগষ্ট ওয়ার্দায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় খ্যাতনামা গান্ধীবাদী নেতা শ্রীযুত কিশোরী লাল মশরুওয়ালা, শ্রীশঙ্কর রাও দেও, শ্রীজে-সি-কুমারাপ্পা প্রভৃতির সহিত পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে কার্য্যকরী করা হইতেছে।

শ্রীগোলবদন ত্রিবেদী—

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীগোলবদন ত্রিবেদী গত ১৯শে আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বোর্ড বাতিল হওয়ার পর জেলা-শাসক স্কুল বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। শ্রীগোলবদনবাবু খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী, তাঁহার নির্ব্বাচনে যোগ্যেরই সমাদর করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অশ্বেতকায়দিগের প্রতি শ্বেতকায়দের অত্যাচার ও বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা

দক্ষিণ আফ্রিকার কংগ্রেস ও বর্তমান অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির প্রতিবাদে নির্বাচিত নেতা ডাঃ কে-এস মোরাকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় নেতা ডাঃ এম ইয়াস্থফ দাদু

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ—

ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণ সহরে আন্ত-পার্লামেন্টারী সম্মিলনে যোগদানের জন্য গত ২৬শে আগষ্ট বিমানযোগে করাচী হইয়া বার্ণ যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমুকুট বিহারী লাল ভার্গবও আখবর হোসেন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। শ্রীযুত গুহই ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে কউস্ সহরে আর একটি সম্মিলনে যোগদানের পর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে যাইয়া আর একটি পার্লামেণ্টারী সম্মিলনে যোগদান করিবেন। শ্রীগুহ ভারতবর্ষের লেখক। আমরা বাঙ্গালীর এই গৌরব লাভে আনন্দিত।

কলিকাতায় হোটেল প্রভৃতির উন্নতি বিধান—

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগ সম্প্রতি কলিকাতার হোটেল, রেস্তোরা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান প্রভৃতিতে স্বাস্থ্যসম্মত বিধিগুলি প্রবর্ত্তিত করার জন্য নোটীশ দিয়াছেন। অধিকাংশ স্থানেই স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালিত হয় না—তাহার ফলে কলিকাতায় নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে দোকানগুলিকে নূতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এত দিনে যে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধি হইয়াছে ইহাই সুখের কথা। যাহাতে বিধিগুলি পালিত হয়, সে জন্য দৃষ্টি রাখিয়া জনগণের ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

মার্কিন মহিলা ক্লাব।—১৯৩৮ সালে এই বিশেষ ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকার নিউজার্সি প্রদেশের ক্লিফটন শহরে। বর্তমানে ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য সমাজ-সেবা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ক্লাবের মহিলারা সর্বসাধারণের সর্বপ্রকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। চিত্রে কর্মরত ক্লাবের মহিলাদের দেখা যাইতেছে

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের উপ-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকে এক পত্র দিয়া জানাইয়াছেন যে—তরুণকান্তি তাঁহার পুরা বেতন দেশের জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য দান করিবেন। বিধান সভার সদস্যরূপে কুমার শ্রীবিশ্বনাথ রায়ও তাঁহার বেতন, ভাতা প্রভৃতি রাজ্যপালের নিকট দরিদ্র সাহায্যের জন্য দান করিবেন। তরুণকান্তি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের পুত্র এবং মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পৌত্র। কুমার বিশ্বনাথ রায়ও তাঁহার সহৃদয়তা ও দানের জন্য সর্বজনপরিচিত। তাঁহাদের এই দান তাঁহাদিগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে এবং আমাদের বিশ্বাস, দেশে অনুকৃত হইবে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারত সরকারের অডিট্ ও একাউণ্টস্ সার্ভিস বিভাগের সিনিয়র অফিসর শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি ভারত সরকারের অডিট্ ডিফেন্স সার্ভিসের ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি কিছুদিন আসাম রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রীর ডেপুটি সেক্রেটারী এবং কম্পট্রোলার ছিলেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুসাহিত্যিক, ইনি "ভারতবর্ষ" পত্রিকারও নিয়মিত লেখক। সুধাংশুবাবুর এই নব নিযুক্ত কার্য্যে আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

জন্মাষ্টমী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শুধু কংস-কারাগারে? শুধু কি হে মাত্র একবার
জন্মেছিলে মুছাইতে দুঃখ-দগ্ধ বসুধার ভার?
আমি দেখি জন্মলীলা অভিনীত যুগে যুগান্তরে,
অভিনীত অহরহ মানবের অন্তরে অন্তরে।
অশ্রু বাষ্প মেঘে তুমি দাও দেখা ইন্দ্রধনুসম,
বেদনামৃণালবৃন্তে তুমি নীলপদ্ম মনোরম।

যেথা বন্দী মানবাত্মা ভাষাহীন রুদ্ধ বেদনায়
বন্ধন মোচনপ্রার্থী অশ্রুলিপি তোমারে পাঠায়,
নিত্য সেথা দেখি কৃষ্ণ, তব আবির্ভাব আকস্মিক
অষ্টমীর অর্ধরাতে চন্দ্রোদয়ে উজলিয়া দিক।
দুঃসহ বেদনাভরা পৃথিবীর পঞ্জরে পঞ্জরে—
নিত্য হেরি হে সুন্দরি, জন্ম তব বিস্মিত অন্তরে।

আজো তাই জীবনের অন্ধকার মথুরা-কারায়—
বসে আছি জ্যোতির্ময়, তব শুভ জন্ম প্রতীক্ষায়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

গত ৩০শে আগস্ট শনিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা-দিবস—লেক অঞ্চলে সোসাইটির নিজস্ব ভবনে মহা আড়ম্বর সহকারে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠানের নতুন ডাইভিং বোর্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। সোসাইটির সভ্য এবং সভ্যাগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিবিধ মনোরম জল ক্রীড়া এবং জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের পদ্ধতি উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে জল এবং আগুন যেমন অপরিহার্য্য তেমনি বিপদ জনক। ক্ষেত্র বিশেষে উভয়ই বহুসংখ্যক জীবনহানি এবং প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। অজ্ঞতার কারণে বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের বহু লোক অসহায় অবস্থায় জল এবং আগুনের কবলে প্রাণত্যাগ করে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে মানুষকে উদ্ধার করা বীরত্ব এবং পরম মহত্বের পরিচয়। সাঁতার না জানা এবং উদ্ধার কার্য্যের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার দরুণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বহুলোকের চোখের সামনেই অসহায় মানুষকে প্রাণ রক্ষার কাতর নিবেদন জানিয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ হারাতে হয়েছে—আবার উদ্ধার করতে গিয়ে উদ্ধারকারীই প্রাণ দিয়েছে।

সুতরাং মনুষ্য-সমাজের স্বার্থের প্রয়োজনে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আত্মরক্ষা এবং উদ্ধার কার্য্যের বিধি-ব্যবস্থা প্রত্যেকেরই সম্যকরূপে জানা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের দেশ অনেক পিছনে পড়ে আছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ব্যাপকভাবে এ সম্পর্কে হাতে-কলমে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ঐ সব দেশের উদ্ধারকারী দলগুলির অসীম সাহসিকতা এবং মহানুভবতার দৃষ্টান্ত—মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি এবং কর্ত্তব্যবোধেরই পরিচয়।

মানব সমাজের প্রতি মমতা এবং কর্ত্তব্যবোধের অনুপ্রেরণায় ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি বিগত তের বছর আমাদের দেশের সমাজ জীবনের বহু আপদ-

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির নিজস্ব ভবন ও নব প্রতিষ্ঠিত ডাইভিং বোর্ড ফটো—শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
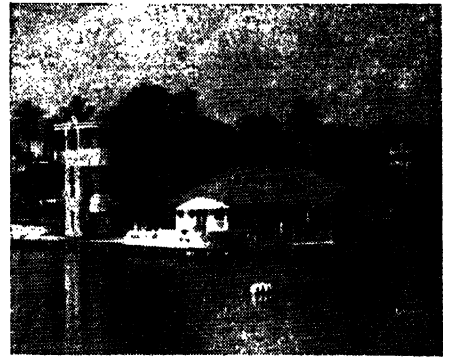
বিপদে এবং সামাজিক ক্রিয়া-পর্ব্বে প্রশংসার সঙ্গে সেবা ক'রে এসেছে। সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য, (১) জল-স্থলে সম্ভাব্য সকল প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে মানুষের জীবন রক্ষা করা, (২) বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রপীড়িত অঞ্চলে মানুষের সেবা করা, (৩) সাঁতার এবং জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারের পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে-কলমে জনসাধারণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষাদান করা।

আমরা আন্তরিকভাবে মানব সমাজের এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

কে ডি সিং (বাবু)—ভারতীয় অলিম্পিক হকিদলের অধিনায়ক

জেণ্টল—ভারতীয় অলিম্পিক হকিদল ছবি—মুরারী দত্ত

প্রতিষ্ঠানটির বিপুল সাফল্য কামনা করি এবং আরও কামনা করি এই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শে আমাদের দেশে আরও নব নব প্রতিষ্ঠানের জন্ম হউক।

চতুর্থ টেষ্ট ঃ

ওভাল—১৪, ১৫

ইংলণ্ড ঃ ৩২৬ (শেপার্ড ১১৯, হাটন ৮৬, আইকিন ৫৩। মানকড় ৮৮ রানে ২ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ৯৮ (হাজারে ৩৮। বেডসার ৪১ রানে ৫, ট্রুম্যান ৪৮ রানে ৫ উইঃ)

ওভালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেষ্ট—আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের শেষ খেলাটি বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অমীমাংসিত ফলাফল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে পর পর তিনটি টেষ্টে ভারতবর্ষ হেরে যাওয়াতে ইংলণ্ড 'রাবার' পেয়ে যায়। সুতরাং ইংলণ্ডের দিক থেকে চতুর্থ টেষ্টের ওপর খুব বেশী আগ্রহ না থাকারই কথা। ভারতবর্ষের কথা কিন্তু অন্য রকম, তাদের হাতে এই শেষ সুযোগ —একটা টেষ্টেও জয়ী হয়ে মান-সম্ভ্রম যা কিছুটা বজায় রাখা যায়! কিন্তু ভারতবর্ষের সে আশা আর পূর্ণ হ'ল না। বরুণ দেব ভারতবর্ষের প্রতিকূলে গেলেন এবং সেই সুযোগে ইংলণ্ডের দুই ধুরন্ধর বোলার ট্রুম্যান এবং বেডসার ভারতবর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালেন। খেলার গোড়ার দিকে বৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতিকূলে গিয়ে ইংলণ্ডকে জয়লাভের পথে সহায়তা করেছিল কিন্তু শেষের দিকে ভারতবর্ষের অনুকূলে গিয়ে খেলাটা ভণ্ডুল ক'রে দেয়।

হাটন টসে জিতে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে নবাগত খেলোয়াড় শেপার্ডকে নিয়ে ব্যাট করতে নামেন। দলের ১৪৩ রানের মাথায় হাটন ৮৬ রান করে রামচাঁদের বলে ফাদকারের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। চা-পানের সময় এক উইকেট গিয়ে ইংলণ্ডের ১৫০ রান দাঁড়ায়। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না পড়ে ইংলণ্ডের রান ছিল

ধরম সিং—ভারতীয় অলিম্পিক হকিদল
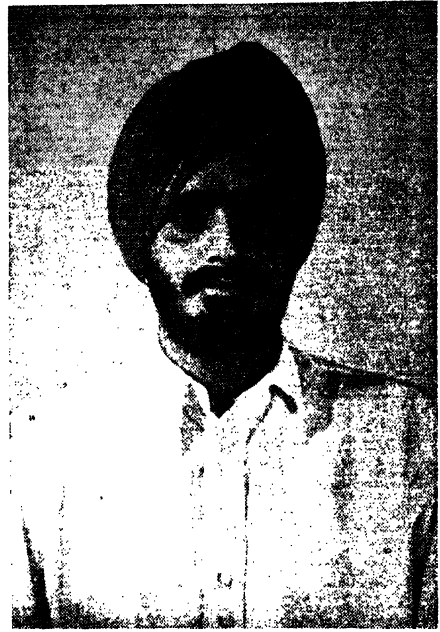
উধম সিং—ভারতীয় অলিম্পিক হকিদল ছবি—মুরারী দত্ত

৫৬। ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ-গতিতে রান করা খুবই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মানকড় খুব নিখুঁত বল ছাড়তে থাকেন। মানকড়ের বলে ইংলণ্ড জব্দ হয়ে যায়। লাঞ্চের পূর্ব্বে মানকড় ১৩ ওভার বল দিয়ে ১২টা মেডেন পান এবং ইংলণ্ডকে মাত্র ১টা রান করতে দেন।

প্রথম দিনের খেলাতে ইংলণ্ডের ২ উইকেট গিয়ে ২৬৪ রান দাঁড়ায়। শেপার্ড ১১৯ রান ক'রে তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনে প্রথম সেঞ্চুরী করেন। এই টেষ্ট খেলা নিয়ে শেপার্ড ইংলণ্ডের পক্ষে ৬টি টেষ্ট খেলায় যোগদান ক'রে মোট ৯টি ইনিংস খেলেছেন।

দ্বিতীয় দিন খেলা আরম্ভের ৪৫ মিনিট আগে সামান্য বৃষ্টি পড়তে থাকে। খেলা আরম্ভের সময় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, সূর্য্যের আলো মেঘের আবরণ ভেদ ক'রে আসতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের এক ঘণ্টার খেলায় পূর্ব্বদিনের রানের সঙ্গে মাত্র ২৯ রান যোগ হ'ল, এদিকে ইংলণ্ডের ২টো উইকেট পড়ে গেল। রান দাঁড়াল ৪ উইকেটে ২৯৩। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের মোট রান হ'ল ৩২৬, ৬ উইকেটে; দু'ঘণ্টার খেলায় ৬২ রান ওঠে ৪টে উইকেট পড়ে। ঠিক লাঞ্চের পূর্ব্বে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং ৫টার আগে পর্য্যন্ত খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। আম্পায়ারের ঘোষণা মত পাঁচটার সময় খেলা পুনরায় আরম্ভ হয়। মাঠের শোচনীয় অবস্থা দেখে ৬ উইকেটে ৩২৬ রানের ওপরই ইংলণ্ড ১ম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে ভারতবর্ষকে ব্যাট করতে ছেড়ে দেয়।

ভারতীয় দলের খেলার সূচনা থেকেই বিপর্য্যয় দেখা দিল। ২৫ মিনিটের মধ্যে দলের মাত্র ৬ রানে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। দলের কোন রান না হওয়ার আগেই রায় আউট হ'লেন। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজের সাতটা ইনিংসে রায় এই নিয়ে পাঁচটা 'গোল্লা' করলেন। বেডসার ৩টে এবং টু্ম্যান ২টো উইকেট পেলেন। দলের এই দারুণ পতনের মুখে এসে দাঁড়ালেন হাজারে এবং ফাদকার। ৬ষ্ঠ উইকেটের এই জুটি সেদিনের মত দলের পতন

এম-এল-মিত্র

ভারতীয় অলিম্পিক হকিদলের ম্যানেজার

কেশব দত্ত—ভারতীয় অলিম্পিক হকিদল

রোধ করে নট আউট রইলেন। রান দাঁড়াল ৪৯, পাঁচ উইকেটে।

ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ওল্ড ট্রাফোর্ডের মত ওভাল মাঠেও বরুণদেবের কৃপায় ইংলণ্ড দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য লাভ করলো। আকস্মিক ভাবে লাঞ্চের সময় ঝড়বৃষ্টি নামায় ফাইনাল টেষ্টের গতি ইংলণ্ডের অনুকূলে গেল।

বৃষ্টির দরুণ তৃতীয় দিন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিন খেলা আরম্ভ হয় কিন্তু বৃষ্টির দরুণ ৬৫ মিনিটের বেশী খেলা হয়নি। ভারতবর্ষের বাকি পাঁচটা উইকেট ৪৯ রানে পড়ে গেলে প্রথম ইনিংসের খেলা ৯৮ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষকে ফলো-অন করতে হয় এবং ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তার ২২৮ রানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লাঞ্চের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পক্ষে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করার সময় ছিল না এবং বৃষ্টির দরুণ সেদিন খেলা আরম্ভ কর আর সম্ভবও হয়নি।

খেলার শেষ দিনও আবহাওয়ার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হ'লনা; ফলে ৪র্থ টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হল। চারটি টেষ্ট ম্যাচের ব্যাটিং এভারেজ তালিকায় নিজ নিজ দলের পক্ষে দলের অধিনায়কই শীর্ষস্থান লাভ করেছেন; ইংলণ্ডের পক্ষে হাটন—গড়পড়তা: খেলা ৪, ইনিংস ৬, নটআউট ১, মোট রাণ ৩৯৯, সর্ব্বোচ্চ রাণ ১৫০ এবং এভারেজ ৭৯.৮০। ভারতবর্ষের পক্ষে হাজারে—গড়পড়তা: খেলা ৪, ইনিংস ৬, নটআউট ১ বার, মোট রাণ ৩৩৩, সর্ব্বোচ্চ রাণ ৮৯ এবং এভারেজ ৫৫.৫০। দুই দলের এভারেজ তালিকায় হাজারের স্থান ৪র্থ। গড়পড়তার হিসাবে ইংলণ্ডের পক্ষে বোলিংয়ে টনি লক শীর্ষস্থান (এভারেজ ৯.২৫) পেলেও টুম্যান এবং বেডসার এই দু'জন বোলারই ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতির ভূমিকায় ছিলেন। টুম্যান আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে মোট ২৯টা উইকেট নিয়ে ইংলণ্ড-ভারতবর্ষের টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষে একটি টেষ্ট সিরিজে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল বেডসারের—২৬টা উইকেট ৩টে টেষ্ট খেলায়। হিসাবে

ক্লডিয়াস—ভারতীয় অলিম্পিক হকিদল
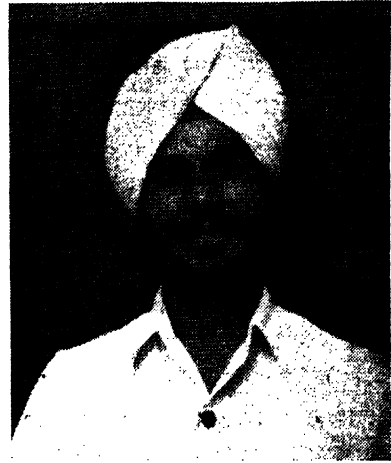
বলবীর সিং
ভারতীয় অলিম্পিক হকিদলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করেছেন

দেখা যায় ট্রুম্যান বেডসারের থেকে একটা বেশী টেষ্ট খেলে এই রেকর্ড করেছেন। ট্রুম্যানের প্রথম তিনটে টেষ্টের হিসাব ধরলে ২৪টা উইকেট পাওয়া হয় অর্থাৎ বেডসারের রেকর্ডের সমান। উভয় দেশের পক্ষে একটা টেষ্ট সিরিজে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড ভিন্নু মানকড়ের—৫টা টেষ্টে উইকেট ৩৪টা। অর্থাৎ মানকড় বেডসারের থেকে ২টো এবং ট্রুম্যানের থেকে একটা বেশী টেষ্ট খেলে এ রেকর্ড করেছেন।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিং এভারেজ তালিকায় শীর্ষস্থান এবং সর্ব্বাধিক উইকেট পেয়েছেন গোলাম আমেদ—উইকেট ১৫টা (এভারেজ ২৪·৭৩)।

ভারতবর্ষ—ইংলণ্ড

টেষ্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ও বিবিধ রেকর্ড

স্থান	বৎসর	ইংলণ্ডজয়ী	ভারতজয়ী	ড্র	মোটখেলা
ইংলণ্ড	১৯৩২	১	০	০	১
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	২	০	১	৩
ইংলণ্ড	১৯৩৬	২	০	১	৩
ইংলণ্ড	১৯৪৬	১	০	২	৩
ভারতবর্ষ	১৯৫১-৫২	১	১	৩	৫
ইংলণ্ড	১৯৫২	৩	০	১	৪
মোট ফলাফল :		১০	১	৮	১৯

সেঞ্চুরী সংখ্যা : ভারতবর্ষ—১৩ : ইংলণ্ড—১২

ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চরাণ : ২১৭ ডব্লউ হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড), ওভাল, ১৯৩৬

১৮৪—ভিন্নু মানকড় (ভারতবর্ষ) লর্ডস, ১৯৫২

	ভারতবর্ষ	ইংলণ্ড
বৃহত্তম ইনিংস :	৪৮৫ (৯ উঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাই, ১৯৫১-৫২	৫৭১ (৮ উইঃ), ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৩৬
ক্ষুদ্রতম ইনিংস :	৫৮ (ম্যাঞ্চেষ্টার ১৯৫২)	১৩৪(লর্ডস, ১৯৩৩)
ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড :	৩ বার	৮ বার
৪০০ কিম্বা ততোধিক রাণ :	৩ বার	৭ বার
৫০০ কিম্বা ততোধিক রাণ :	৩	২ বার

বিশ্ব অলিম্পিকের অভিজ্ঞতা ঃ

বিশ্ব অলিম্পিকের হকিতে ভারতবর্ষ উপর্যুপরি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেলেও হকির তুলনায়

ফুটবল ভারতবর্ষে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই জনপ্রিয়তার সঙ্গে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটেই বৃদ্ধি পায় নি। অলিম্পিকে এই পরাজয়ের পর ভারতীয় ফুটবল দলের খেলার ত্রুটি সম্পর্কে বিদেশের সংবাদপত্রে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবং সমালোচকগণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা যদি আমরা সংশোধনের চেষ্টা না করি তাহ'লে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় এইরূপ শোচনীয় পরাজয় বারবার বরণ ক'রে মুখে চূণকালি নিয়ে জনসাধারণের টাকার অপব্যয় ক'রে দেশে ফিরতে হবে।

ভারতীয় ফুটবল দলের ত্রুটি স্বরূপ বলা হয়েছে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের দৈহিক গঠন ফুটবল খেলার পক্ষে উপযোগী নয়। খেলোয়াড়দের যথেষ্ট বলিষ্ঠ হ'তে হবে। এই দৈহিক বলিষ্ঠতাই ফুটবল খেলার প্রাথমিক যোগ্যতা। খেলার পদ্ধতির মধ্যে প্রথম ত্রুটি, ভারতীয় দল 'Third-back system' অনুসরণ করে না। খেলায় আধিপত্য লাভের পক্ষে এই পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন। অহেতুক পায়ে বল ধরে রাখা এবং দলের খেলোয়াড়কে ফাঁকা যায়গায় পেয়েও বল পাশ না ক'রে পায়ের কসরৎ দেখিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে পরাস্ত করার দুর্দ্দমনীয় লোভ ভারতীয় ফুটবল খেলার মস্ত বড় ত্রুটি। পায়ের এ কৌশল দর্শনীয় এবং একমাত্র কার্য্যকরী হ'তে পারে যদি বিপক্ষদলের খেলোয়াড়রাও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে দল পাশ ক'রে বল খেলবে সেখানে পায়ের এ কৌশল একমাত্র দর্শকদের আনন্দ দেবে কিন্তু অন্যদিকে দলকে বিপদের মুখে পড়তে হবে। আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পদ্ধতি আজ অচল। প্রয়োজন সময়ে বল ড্রিবল করা দোষের নয় কিন্তু আমাদের দেশে যখন তখন বল ড্রিবল করা খেলোয়াড়দের মজ্জাগত দোষে দাঁড়িয়েছে—দর্শকরাও এই ধরণের খেলায় প্রচুর উৎসাহ দিয়ে খেলোয়াড়দের মাথা খেয়েছেন।

অলিম্পিক ফুটবল দল না পাঠিয়ে টাকাটা দেশের ফুটবল খেলার গঠনমূলক পরিকল্পনায় দান করলে দলের সঙ্গে দু'জন ম্যানেজার এবং একজন হিসাব-রক্ষকের বিদেশ ভ্রমণের আনন্দের খোরাক হ'ত না বটে, তবে ভবিষ্যৎকালের বংশধরদের যথেষ্ট উপকার হ'ত। যুগোশ্লোভিয়া বনাম ভারতবর্ষের খেলা সম্পর্কে ভারতীয়দলের ফুটবল ম্যানেজার ভারতীয় দলের অসুবিধার কারণ হিসাবে বিবৃতিতে বলেছেন, অলিম্পিক গেমসের বিধিমত মাঠের আকার ছোট থাকায়, ভারতীয় দলের খেলার পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়েছে। এ অসুবিধা তো দুই পক্ষেরই। মাঠের আকারই যদি খেলার পক্ষে অসুবিধার কারণ হয় তাহলে তাঁরা কেন দল নিয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে অলিম্পিক আইন মত তৈরী মাঠেতে ভারতীয় দলকে পাকা-পোক্ত করে নিয়ে যাননি? নাচ্‌তে না জানলে উঠনের দোষ দেওয়া কোন দায়িত্বশীল কর্ম্মকর্ত্তার উচিত কি?

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্রোপন্যাস "কানামাছি"—২৷৷০,
উপন্যাস "ঝিন্দের বন্দী" (৮ম সং)—৩৲
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কাল-কল্লোল"—৪৷৷০
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "কারটুন" (৩য় সং)—২৲
শ্রীপুষ্পলতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "মরু-তৃষা" (২য় সং)—৩৷৷০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিরাজ-বৌ" (২৩শ সং)—২৲
শ্রীনরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থ "মেঘ-দূত" (১৩শ সং)—৬৲,
"দেওয়ান-ই হাফিজ"—৫৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রাজঘাট"—৩৲
শ্রীঅনিল সেন প্রণীত উপন্যাস "যুগে যুগে"—১৷৷৵০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "লায়লী-মজনু"—২৷৷০
কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত সঙ্গীত-গ্রন্থ "বন-গীতি" (২য় সং)—২৷৷০
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী
"সাইকেলে বঙ্কান ভ্রমণ"—৩৲
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "রঘুবীর" (৯ম সং)—২৷৷০
শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস "বাস্তব ও কল্পনা"—৩৲,
গল্প-গ্রন্থ "অন্তর্য্যামী"—২৷৷০
ষ্টীফেন ভিন্‌সেণ্ট বেনে প্রণীত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ "আমেরিকা"—৸০
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত সমালোচনা-গ্রন্থ
"রবীন্দ্র-মানস"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীসুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার বাণী ও সাধনা-প্রণালী এখনও জনসাধারণের নিকট যে এত অপরিচিত থাকিতে পারে, তাহা ভাবিলে সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার নিজের লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে, প্রতিপাদিত বিষয়গুলি এত অল্প আয়াসে আয়ত্ত হইয়া যায়, যে তাহাও এক আশ্চর্য্যের কথা। তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির শক্তি যাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বমুখে উচ্চারিত বাণীর শক্তি যাঁহারা তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন—তাঁহারা জানেন। যাঁহারা তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন অন্যের লেখাও তাঁহার লেখার পার্থক্য কি এবং কোথায়। এইরূপ কেন হয়, ইহার কারণ কি? এই অনুসন্ধানেও আমাদের বেশী দূর যাইতে হয় না, কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন—অন্তরস্থিত ঐশী শক্তিকে বাহিরে সম্মুখে রাখিয়া কিছু করিলে বা বলিলে, উহা ঐশী শক্তির ক্রিয়া হয়, ঐশী শক্তিসম্পন্ন হয়—মানবীয় শক্তি সে তুলনায় তুচ্ছ। ইহা কিছু নূতন কথাও নহে। সিদ্ধ যোগীদের এরূপ শক্তির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়, পড়াও যায়, এমন কি কেহ কেহ প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই দেখেন নাই, তাঁহার স্বমুখ-নিঃসৃত বাণীও স্বকর্ণে আরও অল্প লোকই শুনিয়াছেন। তাঁহার লেখাও বেশীর ভাগ লোক এখনও পড়েন নাই। অনেকে পড়িবার চেষ্টা করিয়া, বিষয়ের জটিলতা এবং ইংরাজী ভাষার অজ্ঞতার জন্য, একটু চেষ্টা করিয়া পিছাইয়া যান। অনেকে আবার ইংরাজী না জানার জন্য কোনওরূপ চেষ্টাও করিতে পারেন না। শেষের দুইটী কারণ বিদ্যমান না থাকিলে, শ্রীঅরবিন্দের প্রবর্ত্তিত যোগ সম্বন্ধে আমাদের বা কাহারও কিছু বলিতে যাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া কিছুই হইত না। কারণ আমরা যাহা বলিব, তাহা যোগীর লেখনী-প্রসূত হইবে না। কাজেই যে কাজ তাঁহার লেখা পড়িলে হয়, তাহা অন্যের লিখিত

প্রবন্ধ পাঠে স্বভাবতই হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়েন না বা ইংরাজী ভাষা না জানার জন্য পড়িতে পারেন না, মুখ্যত এ আলোচনা তাঁহাদেরই জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম বাংলাভাষাভাষীদের নিকট হইতে বহুদূরে—পণ্ডিচেরীতে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সেখানে যাওয়া সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। শ্রীঅরবিন্দ নিজে ইংরাজী-শিক্ষিত, এমন কি যৌবনেও মাতৃভাষা জানিতেন না। যখন প্রথম বাঙালী তাঁহার পরিচয় পাইল তখন তিনি স্বদেশপ্রেমিকরূপে দেখা দিয়াছেন। তারপর বাঙালী তাঁহাকে স-হিংস ক্রান্তিবাদী বলিয়া জানিল। তারপর লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি দীর্ঘজীবন যাপন করিলেন। কানাঘুষায় লোকে জানিল তিনি যোগাভ্যাস করিতেছেন। ভীতু বাঙ্গালী কিন্তু রাজকোপ ভয়ে তাঁহার সহিত কোনও সংস্রব রাখিল না। তিনি বাঙালীর নিকট একরকম অপরিচিতই রহিয়া গেলেন। আজও বাঙালী-সাধারণে তাঁহাকে চেনে না। অথচ এই মহামানবই আজ যুগ পরিবর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের প্রচার—বহুল প্রচার, মানবের মঙ্গলের জন্য—জগতের মঙ্গলের জন্য বিশেষ আবশ্যক। কারণ তাঁহার বাণীর ও সাধনা-প্রণালীর প্রচারেই যুগ পরিবর্ত্তিত হইবে। মায়ের সন্তান আমরা, মায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা আমাদের দিয়াই মা করাইবেন। বর্ত্তমানে এই প্রচার-কার্য্য পরিমাণে বড়ই কম। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যরা নিজ নিজ সাধনাতেই মগ্ন থাকেন—কারণ সাধনার নির্দ্দেশে প্রাণের আদান প্রদানও নিষিদ্ধ (Basis of yoga p 93)। সাধনা স্বভাবতঃ ব্যক্তিগত হয়। দলবদ্ধ, সংঘবদ্ধ সাধনা খৃষ্টিয়, মুসলমানধর্ম্মের অঙ্গ হইলেও এবং মহাত্মা গান্ধীজী দ্বারা সামাজিক কল্যাণ কামনায় কতকাংশে গৃহীত হইলেও—হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুধর্মের বর্তমান অগ্রণী ব্যাখ্যাতা স্বামী বিবেকানন্দও ইহা অনুমোদন করেন নাই (Romain Rolland—Vivekananda p 245-6)। দলবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ সাধনার সামাজিক দৃষ্টিতে কিছু উপকার থাকিলেও অন্তরের যে সাধনা মনীষীরা চিরকাল চাহিয়াছেন—তাহার সহিত ইহার কোনও সংস্রব থাকে না। কাজেই শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য সম্প্রদায়ের নিকটও ইহা আশা করা যায় না। এসব সত্ত্বেও কিন্তু ভারতবাসীর মনকে শ্রীঅরবিন্দের মুখাভিমুখী করাইয়া দিবারও একটা প্রয়োজন বিশেষভাবে আছে। আর একাধিক কারণে—তাহা নিজ নিজ মাতৃ-ভাষা দ্বারা করাই আরও বেশী দরকার।

শ্রীঅরবিন্দের মূলকথা কি এবং শাশ্বত হিন্দু ধর্মের সহিত এই বাণীর কি সম্বন্ধ এইবার তাহারই আলোচনা করিব। এই বাণীর নূতনত্ব কোথায় এবং কতটুকু সেদিকে সামান্য ইঙ্গিতই করিব, কারণ সম্পূর্ণ তথ্যটি প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি ও ভাব অনুসারে লইতে হইবে।

প্রথমে কিন্তু ধর্ম বলিতে আমরা কি বুঝি—তাহা স্পষ্ট করিয়া লওয়া বিশেষ দরকার। হিন্দুর নিকট ধর্মের অনেক ভেদ ও স্তর আছে। ধর্ম সামাজিক হইতে পারে, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য করিলে সমষ্টির কল্যাণ হয় এই সব করণীয় কার্য্য সামাজিক ধর্মের অন্তর্গত—যেমন পূর্ত্তকর্মাদি। স্বর্গ কামনা করিয়া এক প্রকার ধর্মাচরণ বিহিত আছে যেমন যজ্ঞ, পূজাপাঠ ইত্যাদি "স্বর্গকামো যজেত।" এর পরেও আবার ধর্ম আছে "যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে"—অর্থে যে ধর্ম আচরণে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়; সৃষ্টির উর্দ্ধে যাইতে পারিলে জীব মুক্ত হইয়া যায়, কালের করাল কবল আর তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। "যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি,ন সন্ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ।" এই ধর্ম শরীর প্রাণ ও মনের উপরে। অন্য ধর্মাদির শরীর—প্রাণ ও মন লইয়া।

পরাধর্ম উপনিষদে বিশদভাবে বর্ণিত। স্বর্গকামীর ধর্ম বেদের কর্মকাণ্ডে নিহিত। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মচর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা থাকিলেও গার্হস্থ্যাশ্রমেরও সমধিক প্রশংসা আছে। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১।৪।২, ১।৪।৩, ১।৯ ও ১।১১।১ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উপনিষদের ধর্ম কর্মী গৃহীর জন্য, যথেচ্ছাচারীর জন্য নহে। যিনি পূর্ত্তকর্মাদি করিয়াছেন, স্বর্গ কামনায় যজ্ঞাদিও করিয়াছেন এবং যিনি অচীর্ণব্রত তিনিই পরাধর্মের অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের উপাসনার অধিকারী হন, ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত।

এই ব্রহ্ম আমাদের ইন্দ্রিয়লভ্য নহে বলিয়াই উপনিষদে কথিত। শরীর, প্রাণ ও মন এ তিনের দ্বারা লভ্য নহে।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্
হৃদা মনীষা মনসাভি ক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

কঠ ২।৩।৯

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
কঠ ২।৩।১২

এবং এই ব্রহ্ম আবার "আত্ম-বিদ্যা তপোমূলম"—এবং শুধু সূক্ষ্মদর্শীরাই বহু চেষ্টায় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে দেখিতে পান "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়াদর্শিভিঃ—কঠ ১।৩,১২

কালপ্রবাহে হিন্দু বৈদিক সমাজের প্রাণশক্তি হারাইল। কিন্তু পরাধর্ম দূর হইতে সুদূরপরাহত হইতে থাকিলেও, হিন্দু তাহাকে আঁকড়াইয়াই থাকিল। দুর্বল জাতি, কলিতে অন্নগত প্রাণ ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াও দুর্বল শরীরেই ব্রহ্মলাভের আশা ছাড়িতে পারিল না। সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে অদ্যাবধি আমরা বহু ধর্মগ্রন্থ, বহু সাধকসন্ন্যাসী এবং সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়ের উত্থান দেখিতে পাই—যাহাদের উদ্দেশ্য মূলতঃ এক হইলেও পন্থা বিভিন্ন। কিন্তু সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে, যে কলির অন্নগত জীব আজও ব্রহ্মের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার অভাবে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই আমরা যুগ যুগ ধরিয়া নিত্য ভোগ করিতেছি। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, অভাব, অনটন, ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ—এই পৃথিবীকে এখনও বিকৃত করিয়াই রাখিয়াছে। ধর্মের নানাবিধ শাসন, অনুষ্ঠান, পূজা-পাঠ, বার-ব্রত, আমাদিগকে আমাদের শরীর, প্রাণ ও মনের উপরে লইয়া যাইতে পারে নাই। ইহাদের শাসন ও শোষণের বৃথা চেষ্টাতেই কাল অতিবাহিত হইয়াছে।

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টন্তি তামাহুঃ পরমাম্ গতিম্"

আমাদের নিকট মরীচিকামাত্রই হইয়া আছে।

আমাদের এই মহা দুর্দ্দিনে, সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্যুর অধীনতা এবং অবিদ্যার সহস্র অত্যাচার স্বীকার করিবার পর আজ আবার শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সামনে সেই প্রাচীন শাশ্বত সনাতন ধর্মই নবরূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি দাবী করেন—তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগাভ্যাসে কলির অন্নগত জীবও মায়াপাশ ভেদ করিতে সমধিক সমর্থ হইতে পারে। শরীর, প্রাণ ও মনের উপরে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতে কলির জীবও পারিবে—পারিবে শুধু নয়, ইহাই তাহার জন্মগত অধিকার। ভগবানকে এ দাবী পূরণ করিতেই হইবে এবং সেজন্য তিনি আর্ত্তবিশ্বহৃদয়ের মূর্ত্ত প্রতীকস্বরূপে মায়ের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন এবং মা তাঁহার আবেদন গ্রাহ্যও করিয়াছেন। পূর্ব্বেও একবার অশ্বপতি এই ভাবেই উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বহৃদয়ের আবেদন জানাইয়া সূর্যশক্তি সাবিত্রীকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া মানবের উপর কালচক্রের গতি-রোধ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—আবার তিনি আসিবেন কারণ—

"A date is fixed in the calender of fhe
unknown
An omniversary of the Birth sublime"
Soritis Bk. canto IV p 55.

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—একজনে আগুন ধরালে দশজনে পোয়াতে পারে। সকলকেই আলাদা কাঠ খড় যোগাড় করে আগুন ধরাতে হয় না। এই আগুন একবার তিনি ধরাইয়াছিলেন। অনেকেরই শীত নিবারণ হইয়াছিল। এখনও সে আগুন নির্বাপিত নয়। আবার নূতন আগুন শ্রীঅরবিন্দ জ্বালাইয়াছেন—বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় তিনিও জ্বালাইয়াছেন। যে কেহ ঐ উত্তাপ লইতে পারেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যোগাভ্যাসে—

ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং। শ্বেঃ ২।১২

রোগ, শোক, জরা, ভয় কাছে আসিবে না—মৃত্যু পীড়া দিবে না।

শ্রীঅরবিন্দ ঋষি। ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা। তিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ তিনি দেখিয়াছেন। আমরা কল্পনা করি, বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করি, অনুমান করি, প্রমাণ করি, কিন্তু তিনি এ সব মনের খেলার ও বুদ্ধির কসরতের উপরের লোক। "তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগুঢ়াম্"। বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মত তিনি সূক্ষ্ম জগতে বহু বিচরণ করিয়া, সূক্ষ্মজগৎসমূহ মন্থন করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, যাহা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার বাণীতে প্রমাদের স্থান নাই, সবই প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ।

তন্ত্রের মতো, শ্রীঅরবিন্দ কার্য্যাত্মক ব্রহ্মকে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদোক্ত মায়া বা প্রকৃতিকে মাতৃরূপে দেখিয়াছেন। এই মা কিন্তু আমাদের মনোজগতে পরিচিত স্ত্রীচিহ্নধারী মা নহেন। ইনি সকল চিহ্নধারী অথচ কোনও চিহ্নধারীই নহেন—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ, ন চৈবায়ং নপুংসকঃ
যদ্ যদ্ শরীরমাদত্তে, তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥
শ্বেঃ ৫।১০

ইনি নিজেই বিশ্বরূপে প্রতিভাত এবং বিশ্বের উপরেও অবস্থিত।

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমা।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥
শ্বেঃ ৪।২

ইহার মূর্ত্তির ও রূপের সীমা পরিসীমা নাই। যে কেহ সপ্তশতী চণ্ডী পড়িয়াছেন তিনিই মায়ের অনন্ত রূপের পরিচয় জানেন। শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছেন, মায়ের সব রূপ পৃথিবীর কাছে থাকে না। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে মায়ের কোটি কোটি রূপ অনন্তকাল ধরিয়া কাজ করিতেছে। পৃথিবীতে আমরা তাঁহার চারটি রূপের সহিত কারবার রাখি—মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী।

এই মায়ের সহিত কিন্তু আমাদের সত্যকার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, যদিও তিনি সকলেরই অন্তর্নিহিত, হৃদয়ে অবস্থিত, তথাপি আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না। কারণ তিনি নিজেকে এমন করিয়া অবিদ্যা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যে অবিদ্যা ভেদ না করিলে তাঁহাকে জানা সম্ভব নয় এবং আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকেও বহির্মুখী করিয়াই মা সৃষ্টি করিয়াছেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন।" কঠ ২।১।১

কিন্তু মা নিজেই আমাদের শরীরে অবস্থিত থাকিয়া বহির্বিষয় গ্রহণ করেন।

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ শ্বেঃ ৩।১৮

তাঁহাকে না দেখিলেও মা কিন্তু আছেন—"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য" ইত্যাদি

মা আছেন—আমি বহুর মধ্যে মার এক প্রকাশ মূর্ত্তি, যতক্ষণ মাকে না দেখিতেছি, ততক্ষণ আমি নিজেকে পৃথক মনে করি। এই পৃথক বোধই সর্বনাশের মূল—

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।
কঠ ২।১।১০

এই পৃথক ভাব দূর করিবার উপায়ই পরাধর্ম। যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদে যম বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনুং স্বাম্॥ ১।২।২৩

অর্থাৎ কেবলমাত্র জীবের চেষ্টায় ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। চেষ্টার পর কৃপারও প্রয়োজন। চেষ্টা ও কৃপা এই দুই হইলে তবেই এই একত্ব বোধ হয়।

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে কিন্তু আরও বলা হইয়াছে যে—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ
এতৈরূপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মাবিশতে
ব্রহ্মধাম॥ ৩।২।৪

অর্থাৎ উপনিষদোক্ত উপায়ে তপস্যা করিলে সাধক নিজের তপস্যা প্রভাবেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে পারেন। কৃপার উল্লেখ নাই। মুণ্ডকোপনিষৎ বুঝিতে হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে গৃহীর নিকট প্রকাশিত হইলেও এই উপনিষদোক্ত পথ সন্ন্যাসীর জন্যই কথিত এবং সন্ন্যাসের প্রশংসাও মুণ্ডকের ১।২।১১ এবং ৩।২।৬ শ্লোকে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উপরন্তু পরিশেষে—"নৈতদচীর্ণ ব্রতোহধীতে" বাক্যেও এই বিধান স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কৃপা অগ্রাহ্য করিয়া শুদ্ধ তপোবলে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা সাধারণের পক্ষে কদাচ নহে।

কৃপা দরকার, ইহা শ্বেতাশ্বেতরের ৬।২১ শ্লোকেও পাই "তপঃ প্রসাদাৎ দেবপ্রসাদাৎ চ"।

পরবর্ত্তীকালে তপস্যার ক্ষমতা যেমন কমিয়া আসিয়াছে—কৃপার উপর তেমনিই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও সম্প্রদায় শুধু কৃপার কথাই বলেন। এমনও শোনা যায় ভগবান সর্ব্বক্ষণ কৃপা করিবার জন্য আমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন, শুধু আমি মুখ

খুলিয়া একবার চাহিব, এই অপেক্ষাতেই তিনি যুগ যুগ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন। মনকে আলোড়িত করিবার পক্ষে এমন শক্তিপূর্ণ কবিত্ব দুর্লভ। শ্রীচৈতন্যদেবের "মাগুর মাছের ঝোল ও যুবতী মেয়ের কোলের" লোভ দেখানোর কথাও মনে পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—যোগসিদ্ধির জন্য মায়ের কৃপা এবং তপস্যা উভয়েরই সমধিক প্রয়োজন। তাঁহার কথিত তপস্যা কি এবং সে তপস্যা আমাদের দ্বারা কতখানি সম্ভব ইহাই বিচার্য্য। তাঁহার তপস্যাবিধি তাঁহার নিজের লিখিত "Mother" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রথম ৩৪টি পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার মতে কৃপাও মায়ের খেয়াল মাত্র নহে। তপস্যা ঠিকমত হইলে কৃপা অবশ্য আসিবে। মা কৃপা করিতে বাধ্য হন্। প্রত্যেক সাধকের এই কয়েকটি পত্র নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিত। ইহার নিত্য পাঠ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ঐ নির্দেশ-গুলি অনুসারে শরীর প্রাণ ও মনকে সংযোজিত করিলেই শ্রীঅরবিন্দ-কথিত যোগসিদ্ধ হইতে পারে। এই বিধি-গুলি যেরূপ সহজ ও সরল, ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবও তদ্রূপ পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল। এগুলি বুঝিবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধনার কঠোরতারও প্রয়োজন নাই। মাকে হৃদয়ে বসাইবার জন্য হৃদয়কে শ্মশানেও পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো, যে কার্য্য করিতেছ তাহাই করো—শুধু অকপটচিত্তে মাকে ডাকা আর যে শরীরে মাকে বসাইতে চাও—মায়ের মন্দির জানিয়া ঐ শরীরকে পরিষ্কার রাখো। শ্রীঅরবিন্দের তপস্যার নির্দেশ শুধু এইমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না—যে সাধকের একমাত্র কাজ মায়ের মন্দির, মায়ের অবস্থিতির জন্য পরিষ্কার করা মাত্র। আসন পবিত্র হইলে উহা শূন্য পড়িয়া থাকিবে না। উহা যিনি আসিয়া অধিকার করিবেন তিনিই মা। একবার মা তোমার হৃদয়ে বসিলে সাধকের একত্ববোধের জন্য, অতীন্দ্রিয়ে বিচরণ করিবার জন্য—যাহা কিছু আবশ্যক তাহা মা নিজেই করিয়া দিবেন। সাধকের কোনও কর্ত্তব্য আর থাকে না। ইহাই মার কৃপা—

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যদিও ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বাররূপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল (তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্লী প্রথম অনুবাক) তথাপি কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে ঐগুলিকে সম্পূর্ণ দমন করাই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হয়।

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাম্ গতিম্ ॥

কঠ ২।৩।১০

এই নির্দেশ অনুসারেই আমাদের দেশে প্রচারিত বহুল সাধনারাশি দৃষ্ট হয়। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই কঠোর সাধনারাশি শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের জন্য যে বিধি দিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব এবং তাঁহার যোগলব্ধ এবং দীর্ঘকাল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর জগতে বিচরণপ্রসূত জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইন্দ্রিয়-দমন, নিগ্রহ ইত্যাদি কঠোর সাধনা যাঁহারা করেন তাঁহারা সাধারণ কর্ম্মজগতের বাহিরে চলিয়া যান। সেইজন্য এ সব সাধনা ত্যাগমার্গে বিচরণকারী সন্ন্যাসীরই করণীয় নহে। অথচ সন্ন্যাসী লক্ষে একজনই হয়, বাকী ৯৯,৯৯৯ জনের গতি কি হইবে? গৃহীদের লইয়াই তো জগৎ —ইহাদের উপায়ই চাই। জগৎ প্রবাহ চলিবে, অথচ মনুষ্য অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হইবে—ইহাই সমস্যার পূরণ, ইহাই শ্রীঅরবিন্দের চেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার সকল নির্দেশ।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—সাধকের যতক্ষণ দ্বৈত বোধ আছে, ততক্ষণই তাহার নিজের চেষ্টার দরকার। সাধককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই স্থানে আলো ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা, স্বার্থপরতা ও সমর্পণ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। সেই জন্য অতীন্দ্রিয়কে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। অর্থাৎ শরীর, প্রাণ ও মনকে আশ্রয় করিয়া যখনই কোনও কামনা বা বাসনা, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সাধককে মা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় বা বস্তুর দিকে আকর্ষণ করিবে তখনই সাধককে বুঝিতে হইবে কেহ তাহাকে বিপথে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। এ অবস্থায় সাধককে বিচার করিয়া বিষয় হইতে মুখ ফিরাইয়া মায়ের দিকে পুনরায় লইয়া যাইতে হইবে। পাঠক মনে করিতে পারেন—ইহাতে নূতনত্ব কোথায়? নেতি নেতি বিচার করা

তো আমাদের প্রাচীন পন্থা। নূতন কথা শ্রীঅরবিন্দ কি বলিলেন? প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দুই-টি-ই বিচার নাম-ধেয় হইলেও—উহারা এক নহে এবং ইহাদের পার্থক্য-ই কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিয়া দিতে চাই। সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছেন যে আমাদের মনোজগতে পরিচিত আসক্তি প্রভৃতি গুণাবলী—যাহাকে আমরা আমাদের নিজেদের স্বভাব বলিয়া মনে করি, আসলে সেগুলি আমাদের সহজাত স্বভাব নহে। আমাদের শরীর, প্রাণ ও মন স্থূল জড় জগৎ হইতে, প্রাণ-জগৎ ও মন-জগৎ হইতে প্রাপ্ত তিন জগতের সমন্বয়। কিন্তু মায়ের সৃষ্টি-জগতের সীমা পরিসীমা নাই। এই পৃথিবীর অতি সন্নিকটেই অবিদ্যার জগৎ আছে। এই জগৎ সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম জগৎ হইতে প্রবাহিত ভাবধারা সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। যেরূপ বায়ুর মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়া আছি সেইরূপ এই অবিদ্যার জগতও আমাদের চতুর্দিকে বর্তমান। আমাদের মধ্যে যখন আমরা কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদির প্রকাশ দেখিতে পাই—তখন আমাদের বুঝিতে হইবে—অবিদ্যা জগৎ হইতে ইহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই বিচার করিয়া তখন নিজ শরীরে প্রবিষ্ট ঐ বৃত্তি-গুলিকেও আমায় তাড়াইয়া দিতে হইবে। নিজ শক্তিতে না পারিলে মায়ের আশ্রয় লইতে হইবে। এইরূপ বিচারে আমার দৃষ্টি আমার অন্তরের দিকেই যাইবে—যেখানে মাকে বসাইতে চাহিয়াছিলাম—সেখানে কামনা বাসা লইয়াছে। প্রথম কাজ কামনাকে সরাও—আবার মাকে বসাও। নেতি-বিচার কিন্তু এইরূপ নহে। নেতি-বিচারে বিষয় বস্তুতে দোষারোপ করা হয়। বিষয় বস্তু হইতে মনকে তুলিয়া লইবার জন্য বিষয়কেই চিন্তা করিতে হয়। আক্রান্ত অধিকৃত শরীরে প্রাণ ও মনের ক্লেশের সীমা পরিসীমা থাকে না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারীদের যন্ত্রণার কথা বিলক্ষণ সুপরিচিত এবং এইরূপ চেষ্টার সাফল্যও খুব কম।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। কোনও যুবতীকে দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। আমার ভিতরে পশুভাব প্রবেশ করিল। শরীর প্রাণ মন সকলে উহাতে যোগ দিল। নেতি-বিচারে মনকে বুঝাইতে হইবে—যুবতী অনিত্য—উহার যৌবনের উপাদান—রক্ত সার মেদ মজ্জা অস্থি ইত্যাদি—উহাতে লোভনীয় কিছু নাই। এই চেষ্টা করিতে গিয়া আমি কিন্তু তাহার যৌবনকেই সামনে ধরিয়া রাখি, সেই জিনিষেরই চিন্তা করি, যাহা আমাকে লুব্ধ করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্ত্তিত বিচারে আমি কিন্তু এ পথে যাইব না। আমার মন আকৃষ্ট হওয়া-মাত্র আমি নিজ অন্তরের দিকেই চাহিব—আমার হৃদয়ে এ বিজাতীয় ভাব কেন আসিল? ইহা তো মা নহে। অতএব ইহাকে তাড়াইতে হইবে—হৃদয় হইতে ইহাকে তাড়াইয়া দিলেই আমি মুক্ত। বস্তুতে বিকার নাই—মনেও বিকার নাই—বিকার অবিদ্যার আক্রমণজনিত। আমি ঐ অবিদ্যাকে তাড়াইয়া দিলেই যুবতীর যৌবন আমার কাছে অবিদ্যামূর্ত্তিতে আর দেখা দিবে না। ঐ যুবতীই তখন মায়ের মত কন্যার মত হইয়া যাইবে। আনন্দময়ী মূর্ত্তিতেই পরিণত হইবে। তাহারই মধ্যে আমি আমার মাকেও দেখিতে পাইব। পাঠক দেখিবেন, এ বিচার কতদূর বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানসম্মত। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের বিশেষত্ব। সমগ্র বিশ্বমায়েরই রূপ। মায়ের মধ্যে পাপ নাই—তবে এ জগতে যাহা তাঁরই রূপ তাহাতে পাপ কি করিয়া থাকিবে। বস্তুতে, বিষয়ে তাই পাপ নাই। পাপের প্রবাহ ভিন্ন। তুমি সেই প্রবাহ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখো। পাপ শরীর আশ্রয় না করিতে পারিলে—মাই তাহা আশ্রয় করিবেন। সুপরিষ্কৃত শরীরে মা আসিয়া বসিলেই—দ্বৈত ঘুচিয়া যাইবে। তিনিই কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিবেন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নানার খেলা নয়, একেরই খেলা।

শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যেকটি নির্দেশেই এইরূপ এক একটি নূতন কথা আছে। অর্থকেও তিনি অনর্থ বলিয়া ত্যাগ করিতে বলেন নাই। উপনিষদও বলে নাই। তৈত্তিরীয়তে—"ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং" (১।১১।১) এবং ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক এ উভয়ের সামঞ্জস্যও শ্রীঅরবিন্দের দ্বারাই সম্ভব। অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা তাঁহার Mother শীর্ষক পুস্তিকার ১৯ হইতে ২৬ পৃষ্ঠায় নিহিত আছে। জিজ্ঞাসু পাঠককে উহাই পড়িয়া লইতে অনুরোধ করিব।

আহার সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ, শ্রীঅরবিন্দেরই মত। কোনও আহার্য্য বস্তুকেই তিনি ত্যাগ করিতে

বলেন নাই। আহার্য্য সামগ্রীতে কোনও দোষ নাই। শরীরে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই আহার করা যাইতে পারে। একমাত্র নির্দেশ, লোভ করিয়া আহার করিবে না—প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করিবে না, ঘৃণা করিয়া আহার করিবে না, তৃপ্তির সহিত আহার করিবে, রসাস্বাদনে ধর্মজীবনের হানি হয় না। আহার মায়ের মন্দিরের রক্ষার্থ প্রয়োজন মনে করিয়া, সেই রূপে, সেই পরিমাণে আহার করিবে—যতক্ষণ দ্বৈত ভাব আছে—আহার্য্য বস্তু মায়েরই সামগ্রী জানিয়া মাকে নিবেদন করিয়া আহার করিবে। পাঠককে শুধু উপনিষদোক্ত বিধিগুলির সহিত এই বিধিগুলির ঐক্য স্মরণ করাইয়া দিয়া এ আলোচনাও এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীঅরবিন্দ কোনও সম্প্রদায় স্থাপন করিতে আসেন নাই। তাঁহার নির্দেশমত চলিতে হইলে কোনও চিহ্নেরও প্রয়োজন নাই। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইরূপই থাকিতে পারে; তিলক টিকি মালা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতা-সূচক কোনও চিহ্নের প্রয়োজন নাই—কারণ তাঁহার যোগ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য। বিশ্বমানব সম্প্রদায় তাঁহার লক্ষ্য। বিশ্বমানবের কোনও বিশেষ এক অংশের জন্য তিনি নহেন। কারণ সমস্ত বিশ্বই মায়ের রূপ—প্রত্যেকের মধ্যেই এই ভাব আনিতে হইবে যে—তিনি নিজে এবং বিশ্বরূপে প্রতিভাত—এই জগৎ সবই মা নিজে—সবই এক, দ্বিতীয়ের স্থান নাই—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"।

শ্রীঅরবিন্দ এই যোগের নাম—Integral Yoga দিয়াছেন। Integral কথাটির ভাব সর্ব্বাঙ্গীন অর্থাৎ সকল অঙ্গ ব্যাপিয়া যে যোগ তাহাই। আমাদের বুদ্ধি জ্ঞান চায়, হৃদয় ভক্তি চায় এবং শরীর কর্ম চায়। যে হেতু যোগ integral সেই জন্য এই যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের তিনেরই সমধিক প্রয়োজন, কারণ বুদ্ধি, মন এবং শরীর, সকলকেই এই যোগের সহিত যোগ দিতে হইবে—অন্যথায় যে অংশ যোগ না দিবে, সে অংশ বাদ পড়িয়া যাইবে। কোনও এক অংশ বাদ পড়িলে আমার সাধনা সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না। আমার এক অংশে আলো ও অপর অংশে অন্ধকার রাজত্ব করিতে থাকিলে শরীরে মায়ের আবির্ভাব হইতে পারে না। এই তিনের সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দ করিয়াছেন, উপনিষদের মত জ্ঞানকে তিনি অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে··· পরা চৈবাপরাশ্চ"। কোনও বিদ্যাই তিনিও অগ্রাহ্য করেন নাই। মূর্খতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। অথচ শুষ্ক জ্ঞানচর্চা তাঁহার পন্থাও নহে। সেইরূপ সমর্পণ ও বিশ্বাসের মূলে ভক্তি চাই—ভক্তি না হইলে সমর্পণ হয় না; কিন্তু এ ভক্তি মনের বিলাসরূপী উচ্ছ্বসিত ভক্তি নহে। এ ভক্তি মন ও প্রাণের ভক্তি, মাতার প্রতি পুত্রের ভক্তি; শুষ্ক জ্ঞানচর্চার মত তিনি ভক্তির আবেগকেও গ্রাহ্য করেন নাই। ইহারা integral যোগের অঙ্গ নহে। কর্ম ত্যাগ উপনিষদে বারণ; কর্ম ত্যাগ করিলে মিথ্যাচরণ হয়। শ্রীঅরবিন্দ কর্ম-ত্যাগ করিতেও বলেন না। সবগুলিকে এক করিলে যাহা দাঁড়ায়, শ্রীঅরবিন্দ তাহাই চাহিয়াছেন।—সব বিদ্যাই জানা চাই—মা আছেন সে জ্ঞান থাকা চাই, মাকে বিশ্বাস করা চাই—ভক্তিভরে নিজের সর্ব্বস্ব তাঁহাকেই অর্পণ করা চাই—এবং নিজ সকল কর্ম তাঁর ভৃত্য এবং পুত্রবোধে তাঁহাকে অর্পণ করা চাই—ইহাই শ্রীঅরবিন্দ কথিত integral যোগ। মনুষ্য সমাজ যেমন এই ভাবে প্রণোদিত হইবে—পৃথিবী তেমনই অবিদ্যার আক্রমণের ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিদ্যার রাজ্যে প্রবেশ করিবে। বিদ্যার রাজ্যে তুমি আমি নাই—যেখানে সবই মা—কাজেই বিবাদ বিসংবাদ বিষাদও সেখানে থাকিতে পারে না। ইহাই তাঁহার বাণী। কলির অন্নগত জীবের প্রতি আশ্বাস বাণী, মাভৈঃ বাণী—

ভারতবাসী—যদি তুমি এই আশ্বাস বিশ্বাস করো, যদি তুমি এই নূতন জগতের জীব হইয়া চির সুখে বাস করিতে চাহো, আর যদি নিজের চেষ্টাতেই এ যোগ আয়ত্ত করিতে না পারো তবে তোমার প্রতি আরও আশ্বাস বাণী রহিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়া গিয়াছেন—দেহ ছাড়িলেও যতদিন জগৎ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হইবে—ততদিন তিনি সূক্ষ্ম শরীরে এই পৃথিবীতেই থাকিবেন। তাঁহার সকল শক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া পণ্ডিচেরীর আশ্রমেই আছে। চাবিকাঠি তাঁহার সাবিত্রী মায়ের কাছেই আছে। সেখানে কৃপা অজস্রধারে বিতরিত হইতেছে। সূক্ষ্ম-শরীরধারী জগন্মাতার শরণ লইতে না পারিলে স্থূল-দেহধারী সাবিত্রী মায়ের শরণ লও। হিন্দুর কাছে পণ্ডিচেরী দূর নহে। যে হিন্দু উইল করিয়া চারধাম করিতে পারিত, তাহার কাছে একবার পণ্ডিচেরী যাওয়া তো মুখের কথা। যদি নিজেকে দুর্বল মনে করো—যদি আশীর্ব্বাদ চাও তো মায়ের শরণ লও। তাঁহার শরণ লইলে—

"ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতাঃ আশ্রয়তাং প্রয়ান্তি—"

নমঃ পরম ঋষিভ্যো—নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ।
মা বিদ্বিষা বহৈ—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রাতের অতিথি

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

সার্কিট কোর্ট করতে জলপাইগুড়ি গিয়েছি। অনেকগুলো দায়রার মকদ্দমা জমে গিয়েছে, বেশ দিনকতক থাকতে হবে। সার্কিট হাউসে উঠেছি। আদালতের কাজ শেষ করে সন্ধ্যা বেলাটা আর কাটতে চায় না। সারা দিন মাথার এবং চোখের খাটুনির পর একটা হাল্কা বই নিয়েও বসতে ইচ্ছা করে না। তিস্তার তীরে সান্ধ্য ভ্রমণ তবু তার চেয়ে ভাল লাগে। দেবীচৌধুরাণীর স্মৃতিবিজড়িত তিস্তা, খরস্রোতা কলস্বনা তিস্তা, বনানী-পরিবেষ্টিত তিস্তা। মোট কথায় তিস্তা অপূর্ব্ব নদী। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ ভাল লাগে ?

টর্চ হাতে করে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। সময় কি করে কাটে সে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় না। অগত্যা তিস্তার দিকেই রওনা হই। পথে যেতে যেতে হঠাৎ রামবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রামবাবু একজন স্থানীয় পদস্থ কর্ম্মচারী। জিজ্ঞাসা করলাম :

'কোথায় যাচ্ছেন ?'

তিনি বললেন, 'সিভিল সার্জেন ডাক্তার মুখার্জির বাড়ী তাস খেলতে। আপনিও চলুন না। আলাপ হয় নি তাঁর সঙ্গে ?'

ডাক্তার মুখার্জি নূতন এসেছেন বদলী হয়ে এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটে নি, কাজেই আলাপও হয় নি। সৌজন্য হিসাবেও ত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত। আমি সহজেই রাজি হয়ে পড়লাম, বললাম :

'বেশ ত চলুন না।'

দুজনে সিভিল সার্জ্জেন-এর বাংলোতে গিয়ে হাজির হই। রামবাবু সোজা আমাকে তাঁদের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন। ঘরখানি আলোকোজ্জ্বল, অনেকগুলি মানুষের সমাবেশে কলরব মুখরিত। মাঝে একখানি ব্রীজ খেলার টেবিল স্থাপিত হয়েছে। তার চারিপাশে চারখানি চেয়ার প্রত্যেকটিতে একজন খেলোয়াড় উপবিষ্ট। তাঁদের আশে পাশে আরও কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা উপবিষ্ট, কেউ বসেছেন গদি মোড়া 'কাউচ'এ, কেউ চেয়ারে, কেউ বেতের মোড়ায়। মনে হল তাস খেলা বেশ জোরেই চলেছে। তবে এ তাস খেলা এমন ধরণের নয় যে দর্শক এবং খেলোয়াড় সকলকেই রামগরুড়ের ছানার মত মুখ করে বসে বসে খেলার অগ্রগতি লক্ষ্য করতে হবে। হাল্কা গল্প বা উচ্চ হাসি সেখানে মানা নাই বা খেলোয়াড়দেরও তাতে যোগ দিতে বাধা নাই মনে হল। চারিদিকে বেশ একটা হাল্কা পরিবেশ জাজ্বল্যমান অবস্থায় বর্ত্তমান দেখে মনটা খুসীতে ভরে গেল।

রামবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। জানলাম খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন হলেন ডাক্তার সাহেব স্বয়ং এবং বিরুদ্ধ পক্ষের একটি মহিলা হলেন তাঁর সহধর্ম্মিণী। তার পর ছিলেন ঘোষ সাহেব ফরেষ্ট অফিসার, বোস সাহেব স্থানীয় ব্যাঙ্কের এজেণ্ট ও মিত্র সাহেব চা-বাগানের মালিক। মিসেস ঘোষও ছিলেন। আর ছিল একটি তিন বছরের ফুটফুটে মেয়ে যার মাধুর্য্য আমাকে স্বতঃই তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর এটি কে ?'

মিসেস মুখার্জি সগর্ব্বে বলে উঠলেন 'এটি আমার নাতনী।'

'খাসা নাতনী ত। নাম কি তোমার ?'

আমার কথার উত্তরে সে নামটি বলি বলি করেও বলেনা, ওষ্ঠ বিস্ফারিত ক'রে আবার তাকে দাঁতে কামড়ে ধরে। কি যেন এসে বাধা দেয়। লজ্জা নারীর সহজাত জিনিষ। তিন বছরের মেয়ের আচরণেও তার এ বিষয় অশিক্ষিতপটুত্ব বেশ নজরে পড়ে।

ডাক্তার সাহেব তার সঙ্কোচ দূর করবার জন্য উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'নাম বল, বল তোমার নাম। উনি তোমার জজ-দাদু হন।'

তিন বছরের গরবিনী নাতিনী তখন বলেন, 'আমার নাম বনমালা মুখার্জি।'

আমি বললাম, 'খাসা নাম ত।' তার পর একটা আরাম কেদারা নিয়ে আরাম করে বসেছি।

হঠাৎ বনমালা গা ঝাড়া দিয়ে চঞ্চল হয়ে বলে ওঠে, 'দদ দাদু, নমচ্‌কার।'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বলি, 'তাইত নমস্কার করা হয় নি তোমাকে। নমস্কার।'

সকলের ওপর দিয়ে একটা হাল্কা হাসির হাওয়া বয়ে যায়। মিসেস মুখার্জি বুঝিয়ে দেন যে অতিথিরা আসলে বড়দের অনুকরণে সকলকেই ওই একরত্তি মেয়ের নমস্কার করা চাই। আমি নূতন আগন্তুক, তাই এই স্বাগত সম্ভাষণ প্রথম অবস্থায় আটকে গিয়ে পরে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে।

দেখলাম—ডাক্তার দম্পতীর সহৃদয়তায় এখানে মানুষকে নির্ম্মল আনন্দ দানের একটি সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটাকে ঠিক তাদের আড্ডা বললে অন্যায় হবে। তাস এখানে একটি উপলক্ষ। তাকে কেন্দ্র ক'রে অতিথিদের আনন্দ দানের ব্যবস্থার কোন কার্পণ্য নাই। যিনি তাস খেলতে চান তাঁর জন্যও আয়োজন আছে। হাল্কা ছোট গল্প আছে, সাহিত্য আলোচনা আছে, সঙ্গে আছে অফুরন্ত চা ও সিগারেটের ব্যবস্থা। যিনি পান খেয়ে ওষ্ঠ রঞ্জিত করতে চান, তাঁর জন্য পানেরও ব্যবস্থা আছে। সাধে কি আর রামবাবু এখানে প্রতি সন্ধ্যায় এমন ভাবে আকৃষ্ট হন? আর মিত্র সাহেব আর বোস সাহেব?

কাজেই ভেবে দেখলাম এখানে এসে ভুল করিনি। সঙ্গীহীন সন্ধ্যা কাটাবার জটিল সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে ভেবে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু কে জানত সেদিন আমার ভাগ্যে স্বস্তি লেখা ছিল:না? শীঘ্রই দলের মানসিক ক্ষুধা-নিবৃত্তির প্রয়োজনে গল্প বলার দরকার হয়ে পড়ল। গল্প নাকি এখানে এ রকম প্রায়ই হয়, চা বাগানের গল্প হয়, শীকারের গল্প হয়, কয়েদীর গল্প হয়। যা হয় একটা হলেই হল। ঘোষ সাহেবের কাছে অনুরোধ এল বাঘের গল্প বলতে হবে, কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেলেন। মিত্র সাহেব সদ্য মফঃস্বল করে এসেছেন, আজ বড় শ্রান্ত, তাই চা বাগানের গল্প বলতে আজ তিনি নারাজ। ডাক্তার সাহেব আজ নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে চান, আজ তিনি গল্প বলবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ঘোষ সাহেব হঠাৎ আমাকে বিপদগ্রস্ত করে বসলেন এই বলে যে আজ ত জজ সাহেবকে পেয়েছি—তিনিই গল্প বলুন না।'

প্রথম আবির্ভাবেই বক্তা হতে চাইছিলাম না, তাই ইতস্তত করে অনুরোধটা ভদ্রভাবে এড়িয়ে যাবার একটা উপায় খুঁজছিলাম।

এমন সময় ডাক্তার সাহেবের তিন বছরের নাতিনীর সত্যিকার ক্রন্দন আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দিল। ডাক্তার সাহেবের মেম সাহেব ত—কি হয়েছে, কি হয়েছে—করে আকুল। শেষে জানা গেল ব্যাপারটা কিছুই নয়। নাতিনীটি তার বাবার কোল জুড়ে সুখে সমাসীন থাকা অবস্থায় বাবার হাতের আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ সুখের আতিশয্যেই হবে—পিতার অলক্ষিতে তাঁর আঙুল সজোরে কামড়ে দিয়েছেন, আর পিতা মারা উচিত কিনা ভাবতে সময় পাবার আগেই নিতান্ত বৃত্তি-পরিচালিত হয়েই কন্যার গালে চপেটাঘাত করে বসেছেন। তাই গরবিণীর চোখ-ভরা জল আর মুখ-ভরা কান্না। আঘাত তাকে ততটা কাঁদায় নি যতটা অভিমান।

খবর শুনে আমরা সকলে হেসে অস্থির। কন্যার মা ও ঠাকুরমা তার ক্রন্দন নিবারণে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলাম এই হিড়িকে আমার বুঝি ফাঁড়াটা কেটে গেল। কিন্তু কোথায় কাটল? ঘোষ সাহেব ছাড়বার বা ভোলবার পাত্র নন। তিনি আবার বললেন: 'বলুন গল্প।'

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমাকে রীতিমত কোণ-ঠাসা করলেন। তবু আমি হাল ছাড়তে প্রস্তুত নই।

কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত দিক হতে এক নূতন আক্রমণ এসে আমায় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করল। তিন বছরের বনমালা কান্না থামিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে হঠাৎ আমার কাছে এসে বলে কিনা, 'দদ দাদু, গল্প বল।' অগত্যা আর কোথায় যাই? গল্প বলতেই হয়। আমি গল্প বলা সুরু করি।

আপনাদের এই তিন বছরের নাতিনীর কাণ্ড দেখে আমার এক দন্তাঘাতের গল্পই মনে পড়ে গেল। ফৌজদারী আপিল শুনতে এই গল্প পেয়েছিলাম। তাই আপনাদের উপহার দিচ্ছি।

বাংলার এক মহকুমা সহরের মধ্যে বাজার। বাজারের আশে পাশে কতকগুলি ছোট ছোট একতলা বাড়ী। সেখানে কতকগুলি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরও বাস, যেমন দোকানদার, ভুষো মালের কারবারি ইত্যাদি। সেখানে একটি বাড়ীতে এক দম্পতী বাস করে।

ঘটনার দিন সেই দম্পতী রাত্রে শয্যা গ্রহণ করেছে। গভীর রজনী, তারাও নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময় গৃহিণীর হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল, তাঁর গলার নিকট কার হাতের স্পর্শ পেয়ে। ঘর অন্ধকার ছিল, কাজেই চোখে কিছু দেখা সম্ভব ছিল না। তিনি জেগে উঠেই স্বামীকে দিলেন জাগিয়ে।

স্বামী কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি ঘরের মধ্যে নিশ্চয় কোন চোরের অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে সিদ্ধান্ত করে, তাকে আক্রমণ করবার জন্য শয্যা ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বৃথা কালক্ষেপ না করে অন্ধকারে এক আবছায়া মূর্ত্তি দেখে তাকেই আততায়ী বিবেচনা করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল দুইজনে এক রীতিমত মল্লযুদ্ধ। এ যেন বিরাট রাজার ভবনে ভীমের সহিত কীচকের যুদ্ধ। এদিকে গৃহিণী ব্যাপারটা কি হচ্ছে ঠিক না বুঝতে পেরে চিৎকার করতে সুরু করেছেন। সেই চিৎকার শুনে এক প্রতিবেশী কাঁসর বাজাতে আরম্ভ করে দিল, আর—কেন ঠিক বলা শক্ত—চিৎকার করে বলতে সুরু করল 'বাঘ বেরিয়েছে, বাঘ বেরিয়েছে।'

পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল। তারা জেগে উঠে জানালা ঈষৎ ফাঁক করে করে আতঙ্কগ্রস্ত মন নিয়ে বাহিরে উঁকি মারতে লাগল। কেউ যে বাহিরে আসবে তা কারও সাহস হল না। বাঘ বেরিয়েছে, যদি ধরে নিয়ে যায়।

এদিকে মল্লযুদ্ধের ফলটা ঠিক ভীম ও কীচকের যুদ্ধের মত অত ট্র্যাজিক হল না। গৃহস্বামী অনুভব করলেন যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বেশ বলবান পুরুষ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, নাদুস নুদুস চেহারা, তাঁকে ছাড়িয়ে পালাবার মতলবে আছে। কি করে তাকে আটকায়? গলা ধরতে গেল কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী গলা মুক্ত করে নিল। গলায় বুঝি একটা তুলসীর মালা ছিল, সেটা ছিঁড়ে গেল। তখন কি করে? মাথার চুল ধরবার আশায় মাথায় হাত দেয়। ওমা, ভাগ্য প্রতিকূল, হালফ্যাশানের লম্বা চুল যে মাথায় নাই, মাথায় ছোট ছোট কদম-ছাঁটা চুল। চোর বুঝি প্রায় হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন তার কোমর জড়িয়ে ধরল, যেমন করে ডুবন্ত মানুষ যা পায় তাই জড়িয়ে ধরে। চোর মশাই যেন কাবু হয়েছে মনে হল, সে যেন আর নড়তে পারছে না। এবার প্রতিবেশীরা এসে পড়লে বেশ হয়। কিন্তু তারা ত আসে না। এত দেরী কেন? আর কতক্ষণ রাখা যায়? হায় রে—সে কি জানত যে তাদের বাঘের ভয় ধরেছে?

হঠাৎ গৃহস্বামী অনুভব করল তার হাতে ছোরার আঘাত। অগত্যা হাতের বাঁধন ছেড়ে দিতে হল। আততায়ীর হাতে ছোরা ছিল, কিন্তু সে ত ছোরা নিয়ে যুদ্ধে নামবার সময় পায় নি। তবু সেই বা ছাড়ে কেন? প্রত্যুৎপন্নমতি তার যথেষ্ট। ছোরা না থাক, দাঁত ত আছে। দাঁত দিয়ে সজোরে তাকে কামড়ে দিল, কোথায় তা কে জানে। অন্ধকারে সে কি দেখতে পায় নাকি?

চোরের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। হাতের বাঁধন আলগা হতেই সে চটপট নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের দরজাটা খুঁজে বার করল। সশব্দে হুড়কো খুলল, এইবার বুঝি পালায়।

কিন্তু গৃহস্বামী বদ্ধপরিকর চোরকে তিনি আটকাবেনই। একবার শেষ চেষ্টা না করে কি ছাড়া যায়? প্রবল উৎসাহে তিনি চোরের পিছু নেন। এবার খোলা দরজার ভিতর দিয়ে বাহিরের যে সামান্য আলো আসছিল তাতে লক্ষ্য বস্তু ঈষৎ প্রকট। ডান হাত গিয়েছে ক্ষতি কি? বাঁ হাত দিয়ে তাকে ধরতে গেলেন। এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ মাত্র বিলম্ব হয়েছিল, লক্ষ্য বস্তু ভ্রষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তার পরণের ধুতিখানার অংশ মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল। সেটা দাঁতে পুরে, হাতে আর দাঁতে ধরে তিনি পড়ে থাকেন। রীতিমত 'টাগ অফ ওয়ার' সুরু হয়ে গেল চোরে আর গৃহস্বামীতে।

ঘটনাটা চরম উত্তেজনায় পৌঁচেছে। শ্রোতাদের মন বেশ নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি যে এদিকে বেশ বিপদে পড়ে গেছি তা কেউ বুঝছেন না। এই ভদ্র সমাজে,

নারী ও পুরুষের মিশ্র বৈঠকে ফলাফলটা বলা ঠিক হবে কিনা এই নিয়ে ইতস্তত করছি। কিন্তু কৌতূহলী শ্রোতৃবর্গ আমায় ভাবতে সময় দেন কই? খালি বলেন—'বলে যান তারপর কি হল।' আর আমি বলি, 'এই যে বলি', আর সময় নেই ভাববার জন্য।

আর ত দেরী করা চলে না, এবার গৃহকর্ত্রী স্বয়ং তাগিদ দিয়ে বলেন, 'টাগ অফ ওয়ার'এর ফলটা কি হল বলুন।'

ডাক্তারসাহেব বলেন, 'কে জিতল বলুন।'

আমি বললাম, 'কেউ জিতল না।'

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাঁরা বলেন, 'সে কি করে হয়? একপক্ষ ত জিতবেই।'

আমি বললাম, 'তা নাও হতে পারে। ধরুন একপক্ষ যদি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়, মানে দড়ি না টেনে ছেড়ে দিয়ে পালায়, তা হলে? তা হলে কি হয়?'

ডাক্তার সাহেব তখন আমার মূল উক্তির উপর ভাষ্য করে বললেন, 'তা হলে সেই চোর লজ্জার মাথা খেয়ে, বসন ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেল বলুন।'

আমি উত্তর দিলাম, 'আপনার অনুমান একেবারে ঠিক। অত্যন্ত দুঃখের কথা এত চেষ্টা করেও চোরকে আটকে রাখা গেল না। সে পালিয়ে গেল নিজের আস্তানায়। রাস্তায় অবশ্য কেউ তাকে বাধা দিতে আসে নি, কারণ বাঘের ভয়ে কেউ ঘরছাড়া হয় নি।'

চোর ধরা পড়ে নি শুনে আমার শ্রোতারা যেন একটু হতাশ হয়ে গেলেন। গৃহস্বামীর এমন উদ্যম ও সৎ-সাহস বৃথা গেল, সত্যই খারাপ লাগবার কথা। আমি তখন বললাম, 'চোর কিন্তু শেষে সত্যিই ধরা পড়েছিল জানেন?'

সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ নানা প্রশ্নবাণ দ্বারা আহত হলাম, 'তাই নাকি?', 'কি করে?', 'কেমন করে?' ইত্যাদি।

আমি তখন গল্প বলে চললাম।

পরদিন দারোগা এলেন তদন্তে। গৃহস্বামী তাঁর কাছে হাজির করলেন সেই পরিত্যক্ত বসন ও ছেড়া তুলসীর মালা, আর দেখালেন তাঁর ক্ষত চিহ্নিত হাত।

মফঃস্বলে এই ধরণের দারোগার আবির্ভাব একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। আশে পাশে নানা কৌতূহলী লোকের সমাগম হয়ে থাকে। তারা দেখতে আসে ব্যাপারটা কি। দারোগাকে ঘিরে শীঘ্রই একটা জনতার সৃষ্টি হল। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিবেশী ছিল—আবার অনেকে বাহিরের লোক। দারোগা প্রতিবেশীদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিলেন নানা প্রশ্ন—গৃহস্বামীর উক্তির সমর্থন লাভের আশায়।

জনতার মধ্যে হঠাৎ দারোগার নজর পড়ল এক পরিপুষ্ট দেহ, নধর, তিলকধারী বৈষ্ণবের ঘাড়ের উপর। সেখানে বর্ত্তমান সুস্পষ্ট মানুষের দাঁতের আঘাতের চিহ্ন। দারোগা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তোমার ঘাড়ে এ কিসের দাগ?'

সে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে, পড়ে গিয়ে ছড়ে গিয়েছিল।'

দারোগা বললেন, 'ছড়ার দাগ কি এই রকম হয় নাকি? এ যে দুপাটি দাঁতের স্পষ্ট চিহ্ন। ঠিক কথা বল।'

সে কিছু উত্তর দিতে পারল না। দারোগা তাকে সেই ছেঁড়া মালা দেখালেন, সেই কাপড় দেখালেন, কিন্তু সে তাদের স্বত্ব স্বীকার করল না। জানা গেল এই বোষ্টম ঠাকুরটি গৃহস্বামীরই প্রতিবেশী এবং তাদের পরিচিত। কিন্তু গৃহস্বামী ত দাবী করতে পারেন না যে তাকে চিনতে পেরেছেন।

যাই হোক—দারোগা তাকে বিচারের জন্য হাকিমের কাছে পাঠালেন। বিচার হল। রাত্রে গৃহে অনধিকার প্রবেশ ও মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তার দীর্ঘ মেয়াদের আদেশ হল।

তারপর আসামী আমার কাছে আপিল করেছিল এবং সেই সূত্রেই এই অদ্ভুত গল্পের সঙ্গে আমি পরিচিত হবার সুযোগ পাই।'

ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপিলে কি ফল হল?'

আমি বললাম, 'আপিলে আমি রায় বহাল রেখে-ছিলাম। চেনা না যাক, তুলসীর মালা বা কাপড়ের মালিক কে ঠিক না হক; নধর মাংসল চেহারার অনুভূতি, কণ্ঠে মালা ধারণে বৈষ্ণবত্বের প্রকট প্রমাণ, আসামীর প্রতিবেশীত্ব এবং সর্ব্বোপরি দাঁতের আঘাতের চিহ্নের সমর্থন আমার মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে নি যে সেদিন রাতের অতিথিটি এই আসামী ভিন্ন আর কেউ নয়।

সঙ্গীত-সাধক কবি রামনিধি গুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

বাঙ্গালা দেশ গানের দেশ, বাঙ্গালা সাহিত্যও মূলতঃ গানেরই সাহিত্য। সুর ও বাণীতে বাঙ্গালা গানে যে শিব-শক্তি মিলন দেখা যায়, তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ।[১] খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে বিবিধ রাগরাগিনীতাল-লয়সম্বলিত গানের ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে। চর্য্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণবজীবনীকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যে গানের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য্য যে, বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীতের রূপায়নে স্থানীয় লোকসঙ্গীত ও দেশজ রাগরাগিণী ইত্যাদির প্রলেপ পড়িয়াছে। কৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই, ছুঁতমার্গও নাই—ইহা বিশ্বমনের মিলনভূমি। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী বিজয়ের পর হইতেই উত্তর-ভারতীয় বিশুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতে ঈরাণী প্রভাব আসিয়া পড়ে। এই প্রভাবে ভারতীয় সঙ্গীত আপনার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, বরং ঈরাণের আমদানী গজল [<আঃ গজোল্=প্রেমসঙ্গীত], মর্সিয়া [<আঃ মর্সিয়া=শোকসঙ্গীত], কাওয়ালী [<আঃ কৌয়ালী=ধর্ম্মসঙ্গীত] প্রভৃতি সঙ্গীতকে আপনার রঙে সুন্দরতর করিয়া লইয়াছিল। সঙ্গীত-সম্রাট রামতনু পাণ্ডে ওরফে মির্জ্জা তানসেন—(১৫৩১-৮৯ খ্রীঃ)—এর সঙ্গীতগুলি ইহার সাক্ষ্য দেয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুর মার্গসঙ্গীত-[ধ্রুবপদ>ধ্রুপদ]-এর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তানসেনবংশীয় কলাবিৎ বাহাদুর খাঁর আগমনের পর হইতে মার্গ সঙ্গীতে বিষ্ণুপুরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিষ্ণুপুর বাঙ্গালার দিল্লী, রাগসঙ্গীতে 'বিষ্ণুপুরী রীতি' গুণীজনের অভিনন্দন লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় সঙ্গীতে ঈরাণীয় প্রভাবের ফলে পাঞ্জাবের লোকসঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছিল টপ্পা। খেয়াল [<আঃ খেয়াল্] ও টপ্পা [<হিঃ টপ্-পা] 'রঙ্গীন' গানেরই প্রকারভেদ[২]। লঘু সুরে ও লঘু তালে গেয় টপ্পা সঙ্গীত[৩] গোলাম নবী মিঞা ওরফে শোরী মিঞা—(জন্মকাল একাদশ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে)—র প্রভাবে উত্তর ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বুন্দেল খণ্ডের লোক সঙ্গীত হইতে 'দাদরা'—[দর্দ্দুর (ভেক) তুল্য প্লুত গতি হেতু]—র সৃষ্টি। ধ্রুপদ—খেয়ালের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশে টপ্পা, ঠুংরী [<হিঃ ঠুম্‌রী]—রও প্রচলন হইয়াছিল। এই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে, দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে ঈদৃশ মিশ্রণ ঘটে নাই। পদাবলী সাহিত্যে বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্ত্তনের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি গাওয়া হইত। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলও রাজসভায় গাওয়া হইত। তাবৎ মঙ্গলকাব্যেই রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে তবে অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীতগুলির সূক্ষ্মশিল্প অন্যত্র বিরল। নানা দিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী স্মরণীয়। এই শতাব্দীতে মুসলমান (আরবী, ফারসী, তুর্কী) ও ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সঙ্গীত, শিল্পকলা, ভাষা (আরবী, ফারসী, তুর্কী) ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র ছিলেন এই শতাব্দীর সন্ধিলগ্নের কবি।

তাঁহার কাব্যের অনুরণন পরের শতাব্দীর অনেকখানি ব্যাপিয়া ছিল। এই শতাব্দীতে নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে খেঁড়ু বা খেউড় [<সং ক্ষেবড়] নামে এক জাতীয় গ্রাম্য-ভাবাপন্ন আদিরসাত্মক অশ্লীল প্রণয়গীতির প্রচলন ছিল। ভারতচন্দ্র তদীয় বিদ্যাসুন্দরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥" নদীয়া—শান্তিপুর হইতে এই গান চুঁচুড়া হইয়া কলিকাতায় আসে। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে এই গানের কেন্দ্র হইয়াছিল ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা। সঙ্গীতবিদ রামনিধি গুপ্ত এই গানের সংস্কার করিয়া 'আখড়াই' [আখড়া <প্রাঃ অক্‌খবাড় <সং অক্ষবাট] গানে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। শ্লীলতাহীনতার পঙ্ককুণ্ডে রামনিধি ললিত পঙ্কজ প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন।

আখড়াই গান কালোয়াতী গানেরই শাখা বিশেষ এই। গানের গাওনা শেষ হইত মাত্র তিনটি গানে। প্রথমটি ভবানীবিষয়ক বা মালসী, দ্বিতীয়টি প্রণয় গীতি বা খেউড় এবং তৃতীয়টি প্রভাতী। এই গানের ঠাট বা style অনেকটা ধ্রুপদ-খেয়ালের মত রাগ ও আলাপ প্রধান। বাজনা ও সঙ্গত ছিল। গানের গতি বা লয় (tempo) চার জাতীয়—পিঁড়ে বন্দী (overture), দোলন (swing), সব দৌড় (full tempo) এবং মোড় (climax)[১]।

১ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। আষাঢ় ১৩৫২]

২ কৃষ্ণানন্দ ব্যাস—সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম।

৩ "Etymologically derived from a Hindi word 'Tap-pa'-which means tripping or frisking about with light fantastic toe, a tappa-means a light song of a light nature. Tappa-unlike Kavi, Panchali and yatra-was essentially Baithaki gan or songs for the drawing room which was appreciated chiefly if not wholly by the upper class." [—Hindu Music. Quoted from Jnanendra mohan Das's 'Dictionary of the Bengali Language (Bangala-Bha-s-ar abhidhan). Vol I. Edn. 2 (1937 (P. 896]

১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১০৪৭]

সঙ্গীত সাধক কবি রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু ১১৪৮ বঙ্গাব্দে (১৭৪২ খ্রীঃ) হুগ্‌লী জেলার ত্রিবেণীর নিকট চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ উত্তর কলিকাতার কুমারটুলিতে বৈদ্যবৃত্তি করিতেন। এই সময় কলিকাতা অঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামা হওয়াতে হরিনারায়ণ গুপ্ত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চাপতায় যান। রামনিধির বাল্য শিক্ষা গ্রামেই হইয়াছিল। পরে পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা-দান মানসে ও আত্মবৃত্তি পরিচালনার জন্য হরিনারায়ণ পুনরায় কলিকাতা আসেন। তখন কলিকাতা ইংরেজদিগের রক্ষাব্যবস্থায় অনেকটা শান্ত। এক পাদরীর নিকট রামনিধি ইংরেজী শিক্ষা করেন। তৎকালীন ছাপরার কালেক্টরী আফিসের পদস্থ কর্ম্মচারী পিতৃপ্রতিবেশী রামতনু পালিতের তদ্বিরে রামনিধি তদধীনে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এক কেরাণীর কাজ পাইয়াছিলেন।[২] ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দশসালা বন্দোবস্তের সময় কর্ম্মসূত্রে ছাপরায় গিয়া কেরাণী রামনিধি তত্রস্থ হিন্দুস্থানী কলাবিদগণের নিকট উত্তমরূপে মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া গোলাম নবী মিঞার অনুসরণে বাঙ্গালা ভাষায় টপ্পা সঙ্গীত প্রবর্ত্তন করেন। আবাল্য-সঙ্গীতানুরাগী রামনিধির চাকুরী করা হইল না। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মসী ছাড়িয়া বাঁশী লইলেন।

তখন শোভাবাজার বটতলার পশ্চিমে একটি বড় আটচালা ছিল। এখানে বহু সৌখীন ও গুণী লোকের সমাগম হইত। নিমতলার বিখ্যাত নারায়ণ মিত্র তদীয় সৌখীন ভদ্র সন্তান দ্বারা গঠিত 'পক্ষীর দল' লইয়া এই আটচালায় আসিতেন। এই স্থানে আখড়াই গান হইত। শোভা-বাজার রাজবাড়ীর মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ১৭৩২-৯৭ খৃঃ এই আখড়াই গানের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। নবকৃষ্ণের পারিষদ ছিলেন রামনিধির অগ্রগামী ও আত্মীয় কুলুইচন্দ্র সেন। রামনিধির পুত্র জয়গোপাল গুপ্তের মতে কুলুইচন্দ্র রামনিধির নিকটসম্পর্কীয় মাতুল-পুত্র[৩] পুনশ্চ নবীনচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন বসুর মতে কুলুইচন্দ্র নিধুবাবুর মাতুল[৪] ছিলেন। যাহাই হউক, কুলুইচন্দ্রের পর রামনিধি আখড়াই সঙ্গীতে অনেক নূতন ঢঙ্‌ বা technique সংযোজন করেন। ১২১০ বঙ্গাব্দে (১৮০৪ খৃঃ) রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর (নবকৃষ্ণের পুত্র) আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখন এই দল পেশাদারী করিত এবং গায়কদিগের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণযাত্রাখ্যাত শ্রীদাম দাস (মৃত্যু ১৮২০ খৃঃ), রামঠাকুর, নসীরাম স্যাকরা প্রভৃতি। ১২১২-১৩ বঙ্গাব্দে (১৮০৬-০৭ খৃঃ) নিধুবাবুর উদ্যোগে কলিকাতায় দুইটি আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। একদল বাগবাজার ও শোভাবাজার এবং অপর দল পাথুরিয়াঘাটা (মদনতলা)-র সপারিষদ নীলমণি মল্লিক লইয়া গঠিত হইয়াছিল। উভয় দল বাদী হইলে প্রথমোক্ত দল পরিচালনা করিতেন স্বয়ং নিধুবাবু এবং দ্বিতীয় দল পরিচালনা করিতেন শ্রীদাম দাস ও গোকুলচন্দ্র সেন (কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র)।[১] নিধুবাবুর আখড়াই গান খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম-ভাগের কলিকাতাকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। যদিচ সৌখীন আখড়াই দলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পেশাদারী দলের অবলুপ্তি ঘটিয়াছিল, তথাপি আখড়াই গান সুদীর্ঘ দিন স্থায়ী হইল না। জনসাধারণের মন সুরপ্রধান গানে স্বস্তি পাইল না। অবশেষে, আখড়াই গান ভাঙ্গিয়া নিধুবাবুর সহযোগিতায় তদীয় সঙ্গীত-শিষ্য বাগবাজারবাসী মোহনচাঁদ বসু উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কথা ও সুরপ্রধান হাফ-আখড়াই বা নিম্‌-আখড়াই গানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।[২] রামনিধি গুপ্তের তিন বিবাহ—প্রথম বিবাহ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে শুকচরে, দ্বিতীয় ১১৭১ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোতে এবং তৃতীয় বিবাহ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়ার অন্তর্গত বরিজহাটী গ্রামে। সপুত্র প্রথম ও দ্বিতীয় পত্নীর দেহান্তর হয়। তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র চতুষ্টয় ও কন্যাযুগলের মধ্যে মৃত্যুকালে কবির তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা বর্ত্তমান ছিল। ১২৩৫ বঙ্গাব্দের (১৮২৯ খৃঃ) ২১শে চৈত্র সুবৃদ্ধ বয়সে কবির দেহান্তর হয়[৩]।

নিধুবাবুর গানের সংখ্যা ৪৫০।৫০০ শতেরও অধিক। গানে কোন ভনিতা না থাকাতে অনেক কবিযশঃপ্রার্থীদিগের রচিত গানও নিধুবাবুর নামে চলিয়া গিয়াছে। কবিরত্ন উপাধিক শ্রীধর কথক ও রাধামোহন সেনের অনেক গানও [যথা—'না হলে পতন তরু দহন হইল আগে'[৪]; 'সে কেনরে করে অপ্রণয় ও তার উচিত নয়'[৫] ইত্যাদি] আসলে কাহার রচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। একাধারে সুগায়ক ও সুকবি

---

১ নিধুবাবুর জীবৎকাল লইয়া মতভেদ আছে। সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে জীবৎকাল ১৭৪২-১৮৩৯ খ্রীঃ [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৯৭৪]; 'সঙ্গীতমুক্তাবলী'-তে আছে ১৭৬৭-১৮৩৪ খ্রীঃ [২য় খণ্ড। পরিশিষ্ট পৃঃ ৭]; 'বিশ্বকোষ'-এ আছে ১৭৪১-১৮৩৪ খ্রীঃ [১৬ ভাগ পৃঃ ৪৮৯]; 'বাঙ্গালীর গান',-এ ১৭৪২-১৮২৯ খ্রীঃ [পৃঃ ৬৬-৬৭]। দীনেশচন্দ্র সেন বিশ্বকোষকে সমর্থন করিয়াছেন [বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য। ৮ম সংস্করণ। পৃঃ ৩৫৭]।

২ শোনা যায়, চাকুরীকালীন নিধুবাবু রামপ্রসাদের মত কোম্পানীর 'ডে-বুকে' দৈনিক একটি করিয়া টপ্পা লিখিতেন। কাহিনীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে অবশ্য স্বতঃই সন্দেহ হয়। তবে ইহা সত্য যে, নিধুবাবুর গান-গুলিকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর গানের অনেকখানিই কম পড়িয়া যায়।

৩ গীতরত্ন [তৃতীয় সংস্করণ] পৃঃ ।৶০-॥৶০

৪ গীতাবলী [দ্বিতীয় সংস্করণ] পৃঃ ১৩

---

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—সংবাদ প্রভাকর (১লা শ্রাবণ, ১লা ভাদ্র (১২৬০) [নিধুবাবুর জীবনী]।

২ খৃষ্টীয় ১৮-১৯শ শতকের নাট্যগীতের তিনটি ধারা—(ক) দাঁড়া-কবি <প্রাচীন আর্য্যা-তর্জ্জা] (খ) চপ-ভাসাকীর্ত্তন-যাত্রা-পাঁচালী [<প্রাচীন কীর্ত্তন] (গ) আখড়াই [<খেউড়]। কবিগান=তর্জ্জা+পাঁচালী+খেউড়। হাফ্‌-আখড়াই=কবিগান+পাঁচালী।—[সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১০৫৫]

৩ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২) পৃঃ ৬৬, ৬৭

৪-৫ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২) পৃঃ ৮৩, ৯০

নিধুবাবুর গানগুলি মার্গ-সঙ্গীতের ছাঁচে ঢালা বলিয়াই আকৃতিতে সংক্ষিপ্ত, প্রকৃতিতে সুসংযত, কাব্যসম্পদে রসঘন ও ভাবে সুসংহত। ভারতচন্দ্রের কাব্যপ্রবাহের তথা যুগগত বিলাসিতার জোয়ারে পড়িয়াও নিধুবাবু তদীয় গানগুলিতে যে সংযম ও শালীনতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। গানগুলির ভাষা পুরাপুরি বাংলা, কচিৎ সংস্কৃত-মিশ্রিত ['ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি সদাশিবে শুভঙ্করী নিরানন্দে আনন্দদায়িনী'[১]], ইংরেজী শব্দ একটিও নাই, মুসলমানী শব্দ প্রয়োগ সুবিরল ['গোসা (<আঃ গুস্‌সা) কোরো না প্রাণ আমার কি দোষ'[২]] গানগুলিতে প্রধানতঃ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সঙ্গীত বলিয়া স্তবকগুলি অস্থায়ী ও অন্তরাপদে সানুপ্রাস হ্রস্ব ও দীর্ঘ হইয়াছে। অনুপ্রাস, রূপক, যমক, বিপ্রতীপ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগও গানগুলিতে সুপ্রচুর। বাঙ্গালা ভাষার উপর কবির আন্তরিক টান ছিল ['নানান' দেশের নানান্ ভাষা। বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা'[৩]] কবি বৈষ্ণব-কবিতা হইতে প্রেমের আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্ম মানবিকতার ধর্ম্ম, বাঙ্গালার সাধনা প্রেমের সাধনা। বাংলার সঙ্গীতে কানু ছাড়া গীত নাই। সমস্ত প্রেমের গানের প্রচ্ছন্ন নায়িকা শ্রীরাধিকা। বৈষ্ণবের রাধা বিদেশীদিগেরও মন মাতাইয়াছিল। চ্যাপম্যান সাহেব তো বলিয়াই বসিলেন—"Oh Ra-dha—I wish to have you as my wife'[৪]। বৈষ্ণব-পদাবলী কল্পতরুই বটে। ইহার তলদেশে বসিয়া অগণ্য কবি 'চারিফল কুড়াইয়া খাইয়াছেন'। নিধুবাবুর গানে প্রেমের আদর্শে সুফীবাদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। মানে-অপমানে, সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিচ্ছেদে, দেহে-প্রাণে একাত্ম এই প্রেম সর্ব্বদিকে বিরাজমান। চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্যের প্রেমের আদর্শ সুফীবাদের রঙে রঙীন হইয়া নিধুবাবুর গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে [যথা—'সেই সে পীরিত প্রাণ পারে লো রাখিতে, দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে'[৫] ; 'মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না'[৬] ; 'যেই দিকে চাই সেই দিকে পাই দেখিতে তোমারে'[৭] ইত্যাদি]। বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবমাধুর্য্যও নিধুবাবুর রচিত গানগুলির অন্যতম সম্পদ। এই গীতাংশগুলি ইহার প্রমাণ দেয়—

ভারতচন্দ্রের অনুরণনও দুই-একটি গানে শোনা যায়—

[ক] যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনী।
অযতনে প্রেম-ধন কোথা হয় ধনি॥

[খ] এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায়।
চোরের নাহিক ভয় সাধুজন ভীত হয়
বিচার হে তায়॥

[গ] আমার কি হলো সই, ওরে ধর ধর।
বিরহ বাতাসে সঘন হুতাশে
অঙ্গ কাঁপে থর থর॥

নিধুবাবুর একটি গানে 'অমরুশতক'-এর-একটি শ্লোকের হুবহু অনুবাদ পাওয়া যায়—

খাম্বাজ—ত্রিতাল

বিরহেতে মরি হে বিধি অনুকূল হইয়ো।
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করিয়ো॥
যে আকাশে বাস তার আকাশের ভাগ মোর
এবে সে এই বাসনা তাহাতে মিলায়ো॥
পবন তার ব্যজনে তেজ মিশুক দর্পণে
জলে সেই জলে রেখো তার ব্যবহারীয়।
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিয়ো।[১]

নিধুবাবুর গানগুলির মধ্যে রায়গুণাকরের ন্যায় বহু সুভাষিতের সন্ধান মিলে।

নিধুবাবুর তত্ত্ববিষয়ক ও প্রেমের গানগুলি অপূর্ব। গীতিকাব্যোচিত নৈসর্গিক পটভূমিকায় অনেকগুলি গান রচিত হইয়াছে। বিরহ-দহনে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় নিধুবাবুর গানগুলিতে।

নিধুবাবুর গানগুলিতে ভৈরবী, কালাংড়া, রামকেলী, মুলতান, পরজ, বিভাস, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, আশোয়ারী, খট্, কল্যাণ, ললিত, আলাহিয়া, যোগিয়া, গান্ধার, মালকোষ, টোড়ী, দরবারী, বসন্ত, বাহার, বাগেশ্রী, হিন্দোল, গৌরী, বেহাগ, আড়ানা, সিন্ধু, সোহিনী, কানাড়া, ছায়ানট, পূরবী, ইমন, পূরিয়া, ভূপালী, কাফী, কামোদ, কেদারা, মল্লার, গৌড়, গারা, জয়জয়ন্তী, পিলু, দেবগিরি, সুরট, বারোয়াঁ, পাহাড়ী,

১ গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৪১

২ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২) পৃঃ ৮৮

৩ পরে শ্রীমধুসূদনের কাব্যে ইহার প্রতিধ্বনি পাই—'মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে'।

৪ সুরেন্দ্রনাথ কুমারের সাহায্যে চ্যাপম্যানের "Vaishnava Lyrics" সংগ্রহের ভূমিকা [খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বৈষ্ণব রস সাহিত্য পৃঃ ১১৫ দ্রষ্টব্য]।

৫-৭ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২) পৃঃ, ৬৮, ৭০, ১০০.

১ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২)। পৃঃ ৮৮
'অমরুশতক'-এর মূল শ্লোকটি হইতেছে এই—
"পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহঃ স্বং স্বং বিশত্বালয়ং
যাচিত্বা দ্রুহিণং প্রণম্য শিরসা ভূয়াদিদং মে বপুঃ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥"
এই শ্লোকটি সুভাষিতাবলী' [৩৫৫] ও 'পদ্যাবলী' [৩৪০]-তেও উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসেরও অনুরূপ একটি পদ আছে—
"যাঁহা পহু অরুণচরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত॥" ইত্যাদি
[পদকল্পতরু—১৯৫৩]

হাম্বীর, ধানশ্রী, বেলোয়ারী প্রভৃতি প্রচলিত রাগরাগিণী শুদ্ধ এবং মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গানগুলির মধ্যে এই রাগরাগিনীগুলিরও সাক্ষাৎ পাই—গুর্জ্জরী, শ্যাম, সরফর্দা, ভাটিয়ারী, গৌড়, রাগসাগর, শঙ্করতারণ, সোহরাই ও দেশকার। তালের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে কাওয়ালী, একতালা, ত্রিতাল, আড়া, আড়াঠেকা, হরি, মধ্যমান, ঠুংরী, পিঁড়েবন্দী, আখড়াই প্রভৃতি—'জলদ' ও 'ঢিমা' উভয়বিধ লয়ে।

নিধুবাবুর আখড়াই গানের একটি প্রদর্শনী নিম্নে উৎকলিত হইল—

[ক]

ভবানীবিষয়ক

বাগেশ্রী—পিঁড়েবন্দী

অচিন্ত্য চিন্তারূপিণী চিন্তামণী সনাতনী
বিঘ্নরূপা চরণে তারিণী।
সত্ত্ব রজ তম গুণ গুণত্রয় তব গুণ
গুণময়ী গুণপ্রসবিনী॥
অনুপমা রূপ তব সে রূপ স্বরূপ-রূপ
কোন রূপ তাদৃশ না জানি।
নখ পরে নিশাকর পদতলে দিবাকর
জ্ঞানরূপা আনন্দরূপিণী॥[১]

[খ]

প্রণয়গীতি

কল্যাণ—জলদ ত্রিতাল

আমি কি কখন তোমারে ওরে না দেখে থাকিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ শূন্য দেহ হয় প্রাণ
সচেতন হয় পুনঃ তব মুখ হেরি॥
প্রথম মিলনাবধি বুঝিয়াছি মনে
কদাচিৎ নহি সুখী তোমার বিহনে
এবে এই নিবেদন বিচ্ছেদ না হয় যেন
নয়ন নিকটে থাক সদা সাধ করি॥[১]

[গ]

প্রভাতী

ভৈরবী—জলদ ত্রিতাল

সুজন সহিত প্রেম কি পরমাধিক সুখ
যে করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীত চাঁদের সহিত
শশী ও তেমতি তারে
তোষে সুধাদানে॥
শীতল হইবে বলে পতঙ্গ অনলে জ্বলে
ত্যজয়ে জীবনে।
যার যেবা ভাব সেইরূপ লাভ
শঠের স্বভাব ভাল
না হয় কখনে॥[২]

বাঙ্গালা গীতি-সাহিত্যে নিধুবাবুর টপ্পা সঙ্গীতগুলি অমূল্য রত্নস্বরূপ। এই গানগুলি বাংলার তথা বাঙালীর জাতীয় সম্পদ ও গৌরবের বস্তু।[৩] যে গীতিকাব্যের ধারা একদা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে উৎসারিত হইয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত, নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথি রায়ের পাঁচালী প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙালীর 'গানের রাজা' কবিগুরুর কাব্যে পুষ্পিত ফলিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ধনী করিয়া তুলিয়াছে।

১ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২) পৃঃ ১১০

১-২ দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান (১৩১২) পৃঃ ৮৭, ৬৭

৩ গঙ্গাচরণ সরকার—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা (১৮৮০ খৃঃ) পৃঃ ৫০

রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য (১৯৩৫ সংবৎ) পৃঃ ৪৪-৪৫

নিধুবাবুর জীবৎকালেই তাঁহার গীত-সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার নাম সম্ভবতঃ 'রসিকমনোরঞ্জন' (আনুমানিক ১৮২০-৩০ খৃঃ)।—সুকুমার সেন—[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৯৭৬-৭৭]

বাংলাদেশের মজুরশ্রেণী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ডু, এম-এ ; ডি-এস-ই

(১)

বাংলার মজুরদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। ষ্টেশন, কারখানা, ডক্, কয়লার খনি, কর্পোরেশন—সর্ব্বত্রই দেখা যাবে ভিন্নভাষাভাষী অবাঙ্গালীর দল। এদিকদিয়ে বাংলার মজুরশ্রেণী "নিজদেশে পরবাসীর মতো।" এতে মনে হয়—হয় এখানকার মজুরশ্রেণী অন্যপ্রদেশের মজুরদের মতো অভাবী নয়, না-হয়—কলকারখানায় খাটতে এরা নারাজ। কারখানার কাজে যেটুকু পরিশ্রম দরকার হয়—সেটুকু শ্রম করতে বাঙ্গালীরা কাতর। বাংলাদেশে ৯৭টা চটকল আছে—তাতে প্রায় তিন লক্ষ মজুরের অন্নসংস্থান হয়। এদের মধ্যে দেখা যায়—শতকরা এগারো কি বারো জন মাত্র বাঙ্গালী। শতকরা চল্লিশ জন বিহারী, ত্রিশ জন উত্তর প্রদেশের, পাঁচজন মধ্যপ্রদেশের ও বাকী তের চৌদ্দজন অন্যান্য প্রদেশের। আসলে, চটকলের কাজকে বাঙ্গালীরা ভাল চোখে দে'খে নাই। বাংলাদেশের চটকলগুলো গ'ড়ে উঠ্‌বার গোড়ার দিকে—মাত্র 'কাপালিক' নামে একশ্রেণীর মধ্য হতেই মজুর জুটতো। এ কাজটা তখন হেয় ব'লে গণ্য হতো। পরে বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে বাংলার রেলে যোগাযোগ হবার পর, ঐ সব প্রদেশ হতে দলে দলে লোক এসে চটকলগুলো ভরিয়ে দিল। পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলার সঙ্গে তখন কলিকাতার রেলে যোগাযোগ স্থাপিত না হওয়ার দরুণ—ঐ সমস্ত জায়গা হতে মজুরেরা আস্‌বার সুযোগ পায় নাই। তা ছাড়া চটকলের কাজে যারা মাথা গলাতে পেরেছে তারা তাদের তিনকুলের আত্মীয় স্বজনের ভাতের যোগাড় ক'রে নিয়েছে। একটা চটকলে একবার শুনা গিয়েছিল যে—একজন মজুরের বাট্‌জন আত্মীয়স্বজন সেই কলে কাজ করে।

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষি-প্রধান। এখানে শতকরা ৭৫ জন কৃষিজীবী। এদেশে অল্প আয়াসেই অন্নের সংস্থান করা যায়। তাই অনেকে বলেন—এদেশের জল হাওয়াই নাকি দেশটাকে উৎসন্নে দিয়েছে। বাংলায় মজুর খাটতে আসে—বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজ হ'তে। শুধু কারখানায় কেন—বাংলাদেশে চাষের কাজ করতে ও ধান কাটতে—অন্য প্রদেশ হ'তে দলে দলে মজুর আসে। দেখা যায়—বাংলাদেশের মজুরদের প্রত্যেকেরই দুইএক বিঘা জমি আছে। তাই চাষের সময় ও ফসল কাটার সময়—এদেশের কারখানাতেও মজুরের অভাব ঘটে। কারখানাদারেরা এই সময়—তাঁদের ঠিকেদার বা সর্দ্দার পাঠিয়ে নিজেদের খরচে বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে মজুর আমদানী করেন। চা-বাগানের মজুর যোগাড়ের অবস্থাও একই রকম। এখানেও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য। তাই বাগানের মালিকেরা ঠিকেদার বা "আড়কাঠী" পাঠিয়ে মজুরের সংস্থান করেন।

(২)

বাংলার চাষীমজুর কারখানার মজুর অপেক্ষা অধিকতর সুখে কাল কাটায়। কারখানার মজুরেরা পল্লীজীবনের মাধুর্য্য হতে বঞ্চিত। পল্লীর শান্তিপূর্ণ জীবন, উন্মুক্ত মাঠ, স্নিগ্ধ হাওয়া, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আনন্দ পল্লীর মজুরদিগকে চিরদিনই তাদের কুঁড়ে ঘরের দিকে টেনে রাখছে। তাই দেখা যায়—চাষী মজুরেরা মাঝে মাঝে চাষ আবাদ শেষ ক'রে সহরের দিকে পাড়ী দেয়—বাড়তি কিছু "যথালভ্যং" উপায় ক'রে আনতে। কিছুদিন 'কুলিব্যারাকে' থাকার পরই তারা ও'ঠে হাঁপিয়ে। কলকারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনী, জানলাবিহীন বন্ধ ঘর, আর সাহেবী আইনে সময়মতো হাজিরা দেওয়া ও কারখানা ছাড়া—এইসব তাদের ধাতে সহ্য হয় না। খেয়ালখুশী-মতো কাজ করতে যারা পাড়াগাঁয়ে অভ্যস্ত—তারা আইন-কানুন মাফিক কাজ করা ও চলাফেরা করাটাকে সহজে বরদাস্ত ক'রে উঠ্‌বে কি ক'রে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—তারা নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ্-খাইয়ে উঠ্‌তে পারে না। তা ছাড়া, আত্মীয়-স্বজনের কাছ-ছাড়া হওয়ার ফলে—তাদের মন কেঁদে উঠে বাড়ীর জন্যে। তারা যে "ঘরমুখো বাঙ্গালী"। বাড়ী ছেড়ে কল্‌কাতা আসাই—তাদের কাছে একটা অভিযান। এ দিক দিয়ে শুধু মজুরশ্রেণী কেন—শিক্ষিত ছেলেরাও কল্‌কাতায় পা দিয়েই বাড়ীতে নিরাপদে পৌছানোর খবর দেয়। আর একদিক দিয়ে, পল্লীমজুরের এই সাময়িক আয়ের মোহ—তাকে তার অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সহরের মাঝে এসে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে নিজেই নিজের কর্ত্তা হয়ে উঠে। নিজের লোকের বা সমাজের শাসনের বালাই এখানে থাকে না। ফলে—কারখানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর—সে আশ্রয় নেয়—হয় তাড়ীর দোকানে, না হয় অসৎসঙ্গে পড়ে নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। কারখানায় কাজ করতে এসে—পুষ্টিকর খাদ্যের ও পরিপূর্ণ খাবারের (Balanced diet) অভাবে—তার দৈহিক অবনতিই শুধু ঘটে না—মানসিক অবনতিও ঘটে।

এদেশের মজুরদের হাতে কাঁচা টাকা এলেই—তারা সাধারণতঃ অমিতব্যয়ী হয়ে উঠে। যতদিন ট্যাঁকে পয়সা থাকে—ততদিন এদের কাজ করার গরজ থাকে না। জীবনধারার উন্নতির জন্য সঞ্চয় করতে এরা অভ্যস্ত নয়। তাই কারখানার মজুরেরা একবার বিয়ের মরশুমে বা চাষ-আবাদের সময় বাড়ী গেলে—হাতের টাকা না ফুরানো পর্য্যন্ত কারখানায় ফেরে না। অনেক সময় দেখা যায়—বাজারে একজন ভদ্রলোক যে মাছটা কিনতে সাতবার চিন্তা করেন—একজন মজুরশ্রেণী

লোক এসে দ্বিধাবোধ না করে, এমন কি দরদস্তুর ছাড়াও সেটা কিনে ফেলে। বাড়ী গিয়ে কারখানার মজুরেরা এমন অভাবে পড়ে যে—অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় ফিরবার ট্রেণভাড়া পর্য্যন্ত যোগাড় করে উঠতে পারে না। এদিকে কারখানার মালিকেরা নূতন মজুর ভর্ত্তি করতে বাধ্য হন। ফলে, বাড়ী হতে ফিরে এসে—বাংলার মজুরেরা দেখে যে—তাদের চাকরী নাই—অসহায় অবস্থায় তারা কুলি-ঠিকেদারদের কবলে পড়ে চাকরী যোগাড়ের জন্য। বাড়ী হতে রিক্তহস্তে ফেরার দরুণ ঠিকেদারের কাছে ঋণে বাঁধা পড়ে, আর দিনের পর দিন কারখানার গেটে চাকরীর উমেদারী করার জন্য ভিড় জমাতে থাকে। বাংলার মজুরশ্রেণীর সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি বা ভবিষ্যতের ভাবনার বালাই আদৌ নাই। হাতে পয়সা থাকলেই মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ খেয়ে—বিয়েতে খাওয়াদাওয়া করে অর্থের অপচয় করে থাকে। এক সময়ে এক কারখানার মজুরদের মাইনে বাড়াবার কথা উঠলে—মালিক জানালেন যে এদের জীবনযাত্রার বর্ত্তমান অবস্থায় এদের হাতে বেশী পয়সা আস্‌লেই—এরা বেশীদিন বাড়ীতে অলস ভাবে দিন কাটাবে, আর নেহাৎ টানাটানির মধ্যে না পড়লে— পুনরায় কাজে ফিরবে না! এই অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা যায় না।

(৩)

বাংলার মজুরশ্রেণী চিরদিনের অভাবী। আবহমান কাল হতে তাদের দিন একই ভাবে কাটছে। ঋণজালে জড়িয়ে জীবনটা কাটায়। (They are born in debt, live in debt and die in debt.) তবে একটা দিক দিয়ে তারা সুখী। তাদের অভাব অল্প—আর অল্পেই তাদের আশা মেটে। যুদ্ধের হিড়িকের সময় হতে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাদের রোজগার কিছুটা বেড়েছে বটে। কিন্তু সেই পরিমাণে বেড়েছে—তাদের দৈনন্দিন খরচ! তাদের আয়ের প্রায় ৬০ ভাগ খরচ হয়—খোরাকীর জন্য। কাজেই বিলাসিতার ছোঁয়াচ এদের লাগ্‌বে কি ক'রে? মান্ধাতার আমল হ'তে—একখানা ছোট ধুতি ও একখানা গামছা, আর বড় জোর একটা ফতুয়া এদের চিরাচরিত বেশ। বিশ্বের লোক জীবন-যাত্রার পথে মোটর হাঁকাক্‌ বা ফিটনে চড়ুক্ আর বর্মা চুরুট টানুক্ তাতে এদের ঈর্ষার উদ্রেক হবে না। তারা তাদের ঠাকুরদাদার আমলের গরুর গাড়ীটী আর খেলো হুঁকোটী নিয়েই ব্যস্ত ও সন্তুষ্ট। হাতে দুপয়সা এলে অবস্থার যে উন্নতি ঘটাবে—এ খেয়াল তাদের নাই। তাই নিজেদের গণ্ডীর অর্থাৎ মজুরশ্রেণীর উপরে যে উঠা যায়—এটা তাদের চিন্তার বাইরে। শিক্ষার অভাবে তারা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'। তাদের জীবনধারার মান সেকেলে ধরণের; কাজেই তাদের না আছে উদ্যম, না আছে জীবনে কোন লক্ষ্য। পুরুষানুক্রমে বাপছেলে একই পথ অনুসরণ ক'রে চিরাচরিতভাবে মজুর খেটে জীবন কাটায়। ছেলে ৮।১০ বছরে পা দিলেই, তার পারিপার্শ্বিক বিধান অনুযায়ী—আয়ের ব্যবস্থা তাকে করতে হয়। তাই বাংলার মজুরের ছেলে মানুষ করার রেওয়াজ নাই। অবশ্য মজুরশ্রেণীর জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশের সরকার এখনও ক'রে উঠতে পারেন নাই। কলিকাতার আশে পাশে কতকগুলি কারখানায়—যেমন সুপ্রসিদ্ধ জুতা ব্যবসায়ী বাটা কোম্পানী, ইছাপুর পিস্তল ফ্যাক্টরী, কেশোরাম কটন মিল প্রভৃতিতে কুলি মজুরদের ছেলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোলিয়ারী অঞ্চলেও যেমন চিনাকোরী কোলিয়ারীর মালিকেরা সাঁওতাল মজুরদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা খুলেছেন। মজুরদের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রেরও অংশ গ্রহণ করা দরকার। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের সরকার মজুরদের শিক্ষা দেওয়ার কাজটায় কারখানা মালিকদের প্রচেষ্টাকেই যথেষ্ট মনে করে—সম্ভবতঃ এ বিষয়ে অগ্রণী হন নাই। তবে মজুরদের লেখাপড়া শেখানোর শুভ প্রচেষ্টা—কম বেশী অনেক কারখানাতেই গত কয়েক বৎসর হতে দেখা যাচ্ছে। মালিকশ্রেণী এখন উপলব্ধি করেছেন যে—মজুর খাটানোর পরিবর্ত্তে মাহিনা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, মজুরদের জীবনকে আনন্দদায়ক করে তোলা, তাদের মানসিক, দৈহিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা ও তাদের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করাও মালিকের দায়িত্ব। তাই দেখতে পাই—বজবজে বিড়লা চটকলে, মুঙ্গিতে বাটার জুতা কারখানায়, সাঁকতোরিয়ায় বেঙ্গল কোল কোম্পানী—সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে তাতে সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আর বয়স্কদের জন্য বিনা বেতনে নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(৪)

বাংলার তথা সারা ভারতের মজুরদের সকল অবনতির মূল শিক্ষার অভাব। এদেশের কারখানার মজুর বল্‌তে—অপটু কুলি মজুরই বুঝায়। বছরের পর বছর অপটু হিসেবে কাজ করার পর—তারা পটু বলে গণ্য হয়। তারা স্বীয় চেষ্টায় হাতে-নাতে কাজ শিখে পটুত্ব লাভ করে। শুনা যায়—বিলেতের একজন মজুর এদেশের পাঁচজনের কাজ করে থাকে। তার অন্যতম কারণ—সেখানকার মজুর শিক্ষিত, আর শিক্ষা দিয়ে তাদিকে পটু করে তোলা হয়। আর এই শিক্ষার ফলে—তারা জীবনে আনন্দ উপভোগ করে ও উচ্চ ধারায় জীবনযাপন করে। শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এখানকার মজুরদের যথেষ্ট কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার আলোক পেলে—তারাও দুনিয়ার যে কোন শ্রমিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে—তাতে সন্দেহ নাই। এ ছাড়া আর এক দিক দিয়ে বিলেতের কারখানা-মজুরেরা এদেশের মজুরদের চাইতে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। বাংলার মজুর তার চিরদিনের প্রিয় পল্লীকে নিতান্ত দায়ে না পড়লে ছেড়ে আসে না বা কুলিগিরির চাকরী করতে রাজী হয় না। এখানকার শতকরা ৭৫ জন মজুর পল্লীবাসী, আর বিলেতের কারখানার মজুর আজন্ম সহরবাসী। তাই এখানকার মজুরদের কারখানার আবেষ্টনীতে খাপ খাওয়ানো একটা বড় সমস্যা। ওদেশের শ্রমজীবীরা একটা শ্রেণী বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাদের একটা পৃথক সত্তা গড়ে উঠেছে। তাদের নিজেদের দাবীদাওয়া আছে ও দাবী পেশ করার জন্য জোরালো ট্রেড ইউনিয়ন আছে। সরকারের উপর চাপ দেবার জন্য সেখানে শ্রমিকপার্টি বর্ত্তমান। এই শ্রমিক দলই একদফা

ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য চালিয়ে গেল। সেখানে এটা স্বীকৃত হয়েছে যে ধনিকদের স্বার্থ ও শ্রমিকদের স্বার্থ এক নয়—তবে এই দুইএর সামঞ্জস্য সাধন করা যেতে পারে। এদেশে কেউ কেউ মনে করেন যে—এখানে শ্রমিকরা আলাদা শ্রেণী (Class Conscious) হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নাই। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে—গত ২০ বৎসরের শ্রমিক আন্দোলনের ফলে—বিশেষ করে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করার পর—শ্রমিকদের মধ্যে তারা যে আলাদা একটা শ্রেণীর মানুষ—এই অনুভূতি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৩৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে ঘোষণা করেন—সেটা এই মতবাদেরই সমর্থক। এই ঘোষণা শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রামের (class struggle) পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে। শিল্প অঞ্চলে শ্রমিকগণনার ফলে দেখা গিয়েছে যে—সেখানকার শতকরা ২৫ জন মজুর—মজুর-বাপমায়ের ছেলে। তারা পুরুষানুক্রমে মজুর হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবধানের ফলে—মজুরশ্রেণী নিজেদের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। নিজদিগকে বা নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে সমাজের উচ্চতর স্তরে তোলার জন্য তারা মোটেই চিন্তিত নয়। তারা তাদের অর্থনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে নিজদিগকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। পক্ষান্তরে মধ্যশ্রেণীর পিতা ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য ও ছেলেদিগকে সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত করতে সর্বদাই ব্যগ্র। এই সমস্ত হতে বুঝা যায়—আমাদের দেশে ইতিমধ্যে মজুরের একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছে। মালিকেরা মজুরদের ঠিক সেইটুকুই দেন—যেটুকু তাদের (মজুরের) নেহাৎ বেঁচে থাকার জন্য দরকার—আর যাতে তারা বংশপরম্পরায় মজুর যোগান (supply) দিয়ে আসতে পারে। ধনীদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই আজ শ্রেণীসংগ্রামের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

(৫)

বাংলার কারখানার মজুরদের পল্লীর সঙ্গে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তারা আসলে পল্লীবাসী। অনেকে বলেন—কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের মজুর—পল্লীর লাঙ্গল-ছাড়া মজুর। এই সমস্ত শ্রমিক সাময়িকভাবে মাত্র সহর-বাজারে এসে হাতুড়ী ধ'রে। গ্রামের মজুর সহরে আসলেও—সেখানে তাঁদের মন বসে না। কারখানা-মজুরদের এই গ্রাম-প্রীতি একটা সুলক্ষণ বলা যেতে পারে। গ্রামে চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় একটা আস্তানা থাকার ফলে—তারা আপদবিপদের দিনে সেখানে ফিরতে পারে। আজকাল মজুরদের মাঝে ধর্মঘট তো লেগেই আছে। মালিকেরাও সময়বিশেষে 'লক্-আউট' ক'রে বসেন। এই রকম সময়ে—যখন ভাতের লড়াই চলতে থাকে—আর কাজ থাকে না, সহরে থাকার চাইতে মজুরেরা তাদের পিতৃভূমিতে গিয়ে দিনযাপন করতে পারে। কারখানা ও গ্রামের এই যে সম্বন্ধ—এ বিষয়ে ১৯৩১ সালের হুইটলে কমিশন (Royal Commission on Labour in India) যে মন্তব্য করেছেন—তা উল্লেখযোগ্য। এই কমিশনের মতে কারখানার শ্রমিকদের পল্লীপ্রীতি—তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক; সেজন্যই তাদিগকে সময় সুযোগে নিজ নিজ পল্লীতে ফিরে যেতে সাহায্য করা উচিৎ। তাদের আয়ের দিকে দেখা যায়—চটকলে একজন মজুর ৫৮৸০ ন্যূনতম বেতন পায়। কাপড়ের কলে ৫০৲ ও লোহার ফ্যাক্টরীতে ৫৫৲। এর দ্বারা ৫।৭টী পোষ্য নিয়ে সহরে বাস করতে তার অর্থের সঙ্কুলান হবে কি ক'রে? তাই মজুরদের পরিবারের কিয়দংশ পল্লীতে থেকে যায়। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে—কারখানার মজুরদের পুরোপুরি সহরবাসী হওয়া—তাদের অসুবিধারই সৃষ্টি করবে। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিক অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের—এই অভিমত। তিনি আরও বলেছেন যে পাড়াগাঁয়ের মজুর কারখানার মজুর অপেক্ষা ভালভাবে কাল কাটায়। তাই তাঁর মতে—কারখানাগুলোকে সহরে পুঞ্জীভূত ক'রে—আর তাতে কাজ করার জন্যে পাড়াগাঁ হ'তে মজুরকে না টেনে নিয়ে গিয়ে—বরং পল্লীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কারখানা গ'ড়ে তোলা উচিৎ। যেখানে কারখানায় কাজের জন্য মজুর মিলবে ও যেখানে কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যাবে—সেই সমস্ত জায়গাই হচ্ছে কলকারখানার উপযুক্ত স্থান। নজীর স্বরূপ দেখা যায়—রাশিয়া তার কাপড়ের কলগুলো বসিয়েছে—তুলোরদেশ মধ্যএসিয়া ও ট্রান্‌সককেসাসে। জাপান তার চরম শিল্পোন্নতি সত্ত্বেও আজ প্রধানতঃ কুটীর শিল্পের ও ছোটখাটো কারখানার দেশ। জাপানীরা তাদের সহর অঞ্চলের বড় বড় কারখানার সঙ্গে এগুলির পুরোমাত্রায় যোগাযোগ রেখেছে। এর ফলে বড় কারখানার সঙ্গে পল্লীর ছোট কারখানাগুলিও তাল্ রেখে চলতে পারছে। চেকোশ্লোভেকিয়া ও হলাণ্ডের উল্লেখযোগ্য শিল্প বলতে—সবই গ্রামাঞ্চলে। এর দরুণ সেখানকার মজুরেরা অবসর সময়ে চাষবাস দেখা, পশুপালন প্রভৃতিতে মন দিতে পারে। এইভাবে তারা আয়ের আর একটা পন্থা ক'রে নেয়। বিদেশে ছোট ছোট শিল্পকেন্দ্রিক যে সব সহর গ'ড়ে উঠেছে—সেগুলি সত্যিই মনোরম। তাতে থাকে—সাজানো-গুছানো বাগান, বেড়াবার পার্ক, খেলাধুলার জায়গা। এক কথায় মজুরদিগকে ভালভাবে রাখ্‌বার জন্যে যা কিছুর দরকার—সবই সেখানে পাওয়া যাবে। ইউরোপের বড় সহরের মধ্যে বা তার আশে পাশে যে সব কারখানা আছে—তাদের মজুরদের জন্যে এই সব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বাংলাদেশেও যে গ্রামাঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র গ'ড়ে উঠে নাই—তা নয়। তবে এই সব গ্রামাঞ্চল বলতে সুদূর পল্লী বুঝায় না। এগুলি কলিকাতারই সন্নিকট। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখাতে পারি যে—গঙ্গার আশে পাশে বাউরিয়া, সুজি, ফুলেশ্বর, চেঙ্গাইল, বিড়্লাপুর প্রভৃতিতে যে সব কাপড়ের কল, চটকল রয়েছে—সেগুলি সবই কলিকাতা মহানগরী হ'তে ১৬।১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এগুলি একেবারে পাড়াগাঁয়ের মধ্যে। বিড়্লাপুরে (বজবজে) বিড়্লা জুট মিলের ৬ হাজার মজুরের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার মজুর আসে পাশাপাশি ১০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রাম হ'তে। এদের কেউ বা আসে নৌকায়। বিড়্লা কোম্পানী বাকী ৩ হাজার অবাঙ্গালী কর্মচারীদের জন্য ঘরবাড়ী তৈরী ক'রে দিয়েছেন। স্থানীয় মজুর—সকালে কাজে আসে, সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে। তাদের অধিকাংশ লোকই খাবার নিয়ে

াসে—সেটা দুপুরে টিফিনের সময় খেয়ে নেয়। এখানে একটা সুফল দখা যায়। সেটা হচ্ছে—পল্লীর আলস্যপরায়ণ চাষীমজুর তাদের বসর সময়ে স্বতঃই কারখানায় কাজ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে উঠে। ার এই মজুরেরা চাষবাসের কাজ ও কারখানার কাজ—দুদিকই জায় রেখে চলতে পারে। তাদের পারিবারিক জীবনও সুখের 'য়ে উঠে।

(৬)

এ পর্য্যন্ত আমরা বাংলাদেশের কারখানা মজুরের মোটামুটি পরিচয় য়েছি ও প্রসঙ্গক্রমে পল্লীর মজুরদের কথা উল্লেখ করেছি। বাংলার জুরশ্রেণীর মধ্যে পাড়াগাঁয়ের মজুররাই সংখ্যায় বেশী। তারা চিরদিনই ামের মাটী আঁকড়িয়ে রয়েছে। এদের অধিকাংশই গ্রামে গেরস্থর াড়ীতে দিন হিসাবে চলতি দর মতো ছুটো খাটে, কিংবা মাস হিসাবে া বৎসর হিসাবে মজুরী খাটে, কিষাণী করে বা চাকরের কাজ করে। নেক সময় এরা ইউনিয়ন বোর্ডের বা জেলাবোর্ডের রাস্তা মেরামতী াজে মাটী কাটে, দেশের লোকের পুকুর কাটে। এই সমস্ত মজুরদের ারও কারও ২।১ বিঘা জমিজমাও আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা ায়—এরা প্রায় মধ্যবিত্ত কৃষকশ্রেণীর মতোই স্বচ্ছল। মহার্ঘ্যতার দনে—এদের মজুরী খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মাসিক গড় আয় মফিসের কেরাণীবাবুদের আয়ের চাইতে বেশী হবে, তবে কম নয়। াধারণভাবে বলা যেতে পারে যে এদের অভাব কম ব'লে—এদের মবস্থা আজকালের দিনে মোটের উপর—মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের চাইতে ালই যাচ্ছে। কারখানার মজুরদের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে শ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাইবিউনাল্ (Industrial Tribunal) বসিয়ে বেচেয়ে কম মজুরীর হার বেঁধে দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে ভারত াভর্ণমেণ্ট ন্যূনতম মজুরীর একটা আইন (Minimum wages Act, ১948) পাশ করেছেন। জগতের অধিকাংশ দেশই মজুরদের বেতনের নম্নতম হার বেঁধে দিয়েছে। নির্দিষ্ট হারের নীচে বেতন দিয়ে মজুর াটানো বন্ধ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইন—যাতে মজুর চ্ছন্দে জীবনধারণের উপযুক্ত বেতন পায়—তার ব্যবস্থা করেছে। াদের দু পয়সা আছে—তাদের আবহমান কাল হ'তে এই চেষ্টা যে—ক ক'রে সবচেয়ে কম পয়সায় মজুর পাবে। আর মজুরেরা তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ অনেক সময়—যে কোন মজুরী, তা যতই কম হোক না কেন—নিতে বাধ্য হয়। মালিকদের এই চিরন্তন শোষণ-প্রবৃত্তির হাত হ'তে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য—ইংলণ্ড সকল দেশের আগে—১৯০৯ সালে নিম্নতম বেতনের আইন পাশ করে। আমেরিকায় ১৯১২ সালে এই আইন কার্য্যকরী হয়। ১৯১৫ সালে ফ্রান্সে অনুরূপ আইন তৈরী হয়েছে। অন্যান্য দেশের অনুপাতে এই আইন ভারতবর্ষের মতো গরীব দেশে আরও আগে পাশ হওয়া উচিৎ ছিল। ভারতীয় ন্যূনতম বেতনের আইনের বলে—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট আগামী ১৯৫৩ সালের মধ্যে কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরী বেঁধে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে—পল্লীর কৃষকদের আয় ব্যয়ের হিসাব, তাদের দিনমজুরী, দৈনন্দিন সংসার খরচ, আর্থিক অভাব অভিযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে। এই আইন কার্য্যকরী হ'লে পল্লীগ্রামের মজুরদের দুর্দশার কিছুটা লাঘব হবে ও তাদের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু পরিমাণে বাড়বে।

(৭)

শিক্ষার অভাব ও জীবন-যাপন ধারার হীনতা ছাড়াও বাংলার পল্লী মজুরের আর একটী চিরদিনের দুঃখের কারণ আছে। ম্যালেরিয়ায় তাদের জীবন অলক্ষে ক্ষয় পাচ্ছে। একে তারা সংসারের টানাটানির জন্য পুষ্টিকর খাবার (Balanced deit) পায় না—তার উপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। এই দুই-এ মিলে তাদের কার্য্যক্ষমতাও কমিয়ে দিচ্ছে।

জীবন-ধারার উন্নত আদর্শ তাদের সামনে কই? এরই অভাবে বাপ্-ঠাকুরদা মজুরী খাটাকেই জীবনের চরম সার্থকতা ব'লে মনে করে। এদের ছেলে একটু বড় হ'য়ে পাঁচন ধরতে পারলেই ভদ্রলোকের বা কৃষীর ঘরে রাখালী আরম্ভ করে। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে লাঙ্গলের বোঁটা ধরতে পারলেই তার চাকরীর উন্নতি ঘটে। তখন সে পুরোদস্তুর বয়স্ক মজুর হিসাবে গণ্য হয়। যদি এই অগণিত মজুরশ্রেণীকে রাষ্ট্রের সত্যিকারের নাগরিক ক'রে তুলতে হয়—তাহ'লে শিক্ষার আলো দিয়ে এদের চোখ্ ফোটাতে হবে। তখন এরা বুঝবে—কোন রকমে মদ-গাঁজা খেয়ে দিন গুজরাণ করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়; জীবনটা বৃথা-স্বপ্ন নয়—খাওয়া পরা ছাড়াও এর একটা উদ্দেশ্য আছে। বিজ্ঞানের যুগে যখন দুনিয়ার সব সম্প্রদায়ই অগ্রগতির পথে—তখন এরাই বা কেন থাকবে পিছনে প'ড়ে?

ছাব্বিশ

প্রায় এক নিঃশ্বাসেই সমস্তটুকু বলে গিয়ে সরমা থামল।

সুকুমারও একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ করেই সমস্তটা শুনেছে, একটা প্রশ্ন করেনি। থামলে প্রশ্ন করলে—"তার পর ?"

"তার পর আমার পাপের বোঝা আরও বেড়ে গেছে, প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে আরম্ভ…"

"কিন্তু অরুণা…" —বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়াতেই সিনেমার নামটাই বেরিয়ে গিয়ে থাকবে।

সরমা বললে—"আর অরুণা কেন ? তুমি সরমাই বলো ; আমি অনেক যত্নে এ-নামটাকে রুমালে একটি অক্ষরের মধ্যে আগলে বেড়িয়েছি এই দুটো বছর।"

"ঠিক তো, দেখো ভুল !…কিন্তু, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার সমস্ত স্মৃতিটুকু তো ফিরে এসেছে !…কখন্, কি ক'রে হোল এটা ?"

ও যেন সেইটেই বেশি ক'রে লক্ষ্য করছিল আগাগোড়া, মুখটা বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সরমার মুখটা ঠিক সেই অনুপাতেই হয়ে উঠেছে করুণ, বললে—"স্মৃতি তো যায় নি, এক কণাও নয়, এত পাপের ওপর কি ভগবানের অত দয়া পাওয়া যায় ? প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে আমি জলে মরেছি স্মৃতির আগুনে।"

"সে কি ! তুমি নাম ধাম—আগেকার জীবনের সব কিছুই কি ভুলে ছিলে না এতদিন ?…তবে !"

সরমা মুখটা ঘুরিয়ে নিলে, একটু পরেই সুকুমার টের পেলে সে কাঁদছে। কি বলবে ভেবে উঠতে না পেরে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ যাবার পর সরমা চোখ দুটো মুছে নিয়ে শরীরটা আলগা করে দিয়ে সামনে চেয়ে বসে রইল একটু ; শুধু একটা দীর্ঘশ্বাসে নিস্তব্ধতাটুকু একবার ভঙ্গ হোল, তারপর বলতে লাগল—"তবে…সে তো বললাম—পাপের বোঝা আরও বাড়িয়েই তুলেছি।…সব বলব, বলবার জন্যেই তো এসেছি, তোমারও দয়া যে শুনতে রাজি আছ। আমার কি ভয় ছিল জান ?—ভয় ছিল যে এই পর্যন্ত শুনেই তুমি ঘেন্নায় উঠে যাবে।…সব বলব আমি, কিন্তু একটা অনুরোধ, শেষ পর্যন্ত তোমার ক্ষমায় আমার অধিকার নেই, শুধু একটা বিশ্বাস রেখো, আমি যা করেছি, শুধু মানুষের মতন হয়ে একটু বাঁচবার লালসায় করেছি…যদি শেষ পর্যন্তও তোমার পাশে স্থান পেতাম, তোমার জীবনে কোন দাগই লাগতে দিতাম না… উঃ, বাবাগো !"

আবার চোখে অশ্রু নামল।

সুকুমার সান্ত্বনার স্বরে বললে—"কেঁদো না সরমা। না হয় নাই বললে ; এটাও বলবারই বা কী এমন দরকার পড়েছিল ?"

খানিকটা অশ্রু নেমে গিয়ে মনটা হালকা হোলে সরমা বলতে আরম্ভ করলে—"হল্টে এসে সুস্থ মানুষের সঙ্গ পেয়ে ভরসা ফিরে এল ; তখন চিন্তা উঠল এবার কি করব। একা মেয়েমানুষ, প্রথমটা একটু ভয় হয়েছিল, কিন্তু দেখলাম লোকটা প্রকৃতই ধার্মিক, গোড়াতেই আমায় 'মাঈ' বলে ডাকলে ; তেষ্টা পেয়েছিল, উঠে গেলাসটা ধুয়ে জল দিলে, তারপর সেই চারপাই-পাতা খুবরিটার সামনে নিয়ে গিয়ে বললে—সে আর কিছুই সাহায্য আপাতত করতে পারবে না, যদি ক্লান্ত হয়ে থাকি তো সেই চারপাইয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে পারি, রিলিফ-ট্রেন এলে সে তুলে দেবে।

ঘুমুবে কে ? আমি নিজের ভাবনা নিয়ে পড়লাম। ঠিক এইরকম একটা অবস্থায় তো কখনও পড়িনি—এতবড় একটা বিপদ, একটা পুনর্জন্মই ; তারপর এইরকম একটা শান্তির মধ্যে রামায়ণ পাঠ চলছে ; আমার মনটা সে রাত্রে ক্রমাগতই উথলে উথলে উঠছিল, তারই পাশে পাশে মনে পড়ছিল সেই কলেজের সময় থেকে আমার নিজের সমস্ত জীবনটা। তোমায় বলেইছি, আমি আর পারছিলাম না—ক্রমাগতই মনে হতে লাগল আবার তো সেই জীবনেই যাচ্ছি ফিরে—কলকাতা থেকে একরকম পালিয়ে বম্বে যাচ্ছি, কতকটা মুক্তিরই আশায়—কিন্তু সেখানকার জীবন

তো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে! এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা খেয়াল কি করে এসে গেল মাথায়—কেন, এই তো মরেই যাচ্ছিলাম!···এই চিন্তাটা ধরেই আমার মাথায় একটা আইডিয়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল আস্তে আস্তে—হোক না এইটিই মৃত্যু আমার। আমি যে ও-জীবনটা ছাড়তে পারছিলাম না তার কারণ যেখানে গিয়েই লুকোই, আমার জীবনই একসময় না একসময় আমায় ধরিয়ে দেবে। কিন্তু এতো বেশ হোল—সবাই জানে, কাগজে পর্যন্ত রটে গেছে আমি বম্বে মেলে সোজা বম্বে যাই নি; মধুপুরে নেমে একটা শুটিং শেষ করে ঠিক সেইদিনই বেরুবার কথা—যেদিন অ্যাকসিডেণ্টটা হোল। শুধু তাই নয়, পার্টির সবাই এসে তুলেও দিয়ে গেছে ঐ-গাড়িতেই; সুতরাং প্রমাণের তো কিছু আর বাকি নেই যে অরুণা মরেছে; এখন শুধু নিজের কাছে মরা। ঠিক ক'রে ফেললাম এখান থেকে বেরিয়ে একেবারে দূরে কোথাও যাব চলে আপাতত। কোথায়, কিরকম ক'রে তাই মনে মনে ঠিক করছি, এমন সময় কানে গেল একজন যেন বাঙালী এসে হল্ট-কীপারের সঙ্গে কথা কইছে। আমি ভয়ে আঁৎকে রইলাম, ধরা বুঝি এখুনি যাই পড়ে। তুমি চলে গেলে; নিশ্চিন্দি হয়ে বসেছি, দেখি লোকটা আবার বেরিয়ে গিয়ে তোমায় ডাকলে—আর ডাকলে আমারই খবর দিয়ে। তখন কি করে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল—শক্ লেগে আগেকার জীবনের সব ভুলে যাওয়ার কথা—যা একটা অবস্থা যাচ্ছে, এক রাশ প্রশ্ন হওয়াই সম্ভব—বাড়ি ঘর দোর, কে কোথায় আছে তাদের খবর দেওয়ার কথা—মিথ্যে বানিয়ে বলতে যাওয়ায় বিপদ অনেক—তার চেয়ে ওদিকটা একেবারে মুছে দেওয়াই নিরাপদ। তুমি আসা থেকেই মুখের ভাবে আরম্ভ ক'রে দিলাম। দেখলাম তুমি প'ড়েই গেছ ধাঁধায়। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করে নিশ্চিন্দি হলাম—তুমি আমায় চিনতে পারনি—হয় আমার কোন ছবি দেখাই নেই, না হয়···"

সুকুমার বললে—"দেখাই নেই। আমি ছবি দেখি কম, যা দেখি তাও ইংরিজী ছবি। বাংলা নাম-করাও গোটা দুই দেখে বড্ড হালকা লাগে, আর যাই নি।··· কিন্তু আশ্চর্য! শক্ লেগে ভুলে যাওয়ার যেরকম নিখুঁত···"

"হয়েছিল কি সত্যি তেমন নিখুঁৎ—এতক্ষণে খুব সামান্য একটু হাসির মতো ফুটে উঠল সরমার ঠোঁটের কোণে, যেন নিজের প্রবঞ্চনাকেই ব্যঙ্গ করে। তারপর বললে—"কিন্তু আশ্চর্য যা বলছ তার কিছুই নেই এর মধ্যে—দ্বিতীয় যে ফিলমটায় আমি হিরোইনের পার্ট করি তাতে এ-ই আমার পাট ছিল—মাথায় একটা আঘাত লাগার পর থেকে আগেকার সব ভুলে যাওয়া। আর, পার্টটা করা ছিল বলেই আমার ঐ উপায়টা ধাঁ করে পড়েও গেল মনে, নৈলে অমন যে হয় তাও আমার জানা ছিল না আগে; সাধারণ একটা রোগ নয় তো।"

সুকুমারও একটা ক্ষীণ হাসি মুখে করে চেয়ে আছে; তাতে কৌতুকের সঙ্গে আছে ক্ষমা। বোধ হয় মনে এও মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল—কবে কোন্ কোন্ জায়গায় অভিনয়ের মধ্যে যেন একটু অসঙ্গতির মতো মনে হয়েছিল তার; অত খেয়াল করে নি তখন।

এটা কিন্তু একটা ক্ষণিক কৌতূহলের কথা, এরকম একটা অদ্ভুত গল্প শুনলে যা না হয়েই পারে না। সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনটা এর সুগভীর ট্রাজেডির দিকে এসে পড়ল। সামনের দিকে চেয়ে সেও চুপ ক'রে বসে রইল, তার ভাবান্তরটা লক্ষ্য করেই সরমাও চুপ করলে। সুকুমার এক সময় বললে—"আমি ভাবছি সরমা, যখন হয়তো বলা দরকার ছিল, তখন বলো নি; এতদিন পরে তুমি আমায় ডেকে বসিয়ে কেন বলতে গেলে?—ওটা বাদ দিলেও তোমার এখন যে-জীবনটা গড়ে উঠেছে সেটা তো বেশসহজ।"

সরমা প্রতিটি কথা তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল; কেন যে আজ কথাটা তোলা তা না বলে উত্তর করলে—"প্রবঞ্চনাটা আর কতদিন চালাব?" "কথাটা অবশ্য 'প্রবঞ্চনা-ই, শুনতে খারাপও, কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো তা নয়—নিজেকেই নতুন করে গ'ড়ে তোলা···"

—ধীরে ধীরে কতকটা আত্মগতভাবেই বলতে বলতে সুকুমার হঠাৎ একটু চকিত হয়েই ফিরে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তাতে কোন বাধা হয়েছে সরমা?···এখানে—আমার কাছে?"

"এ-প্রশ্নের কী উত্তর দোব?—আমি তো দেবমন্দিরে আছি বললেও চলে—কিন্তু তোমার তো বাধা হয়ে আছি, বুঝছি না কি?"

"আমার ?···সেইজন্যেই তুলেছ কথাটা ?·· আ-মা-র···"

একটা টান দিয়ে কথাটা শেষ ক'রে সুকুমার আবার সামনের পানে চেয়ে চুপ করলে। সরমার মনে হোল এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, যেন একটা উত্তরই। কিন্তু এরকম মনে হওয়াটাও তো তার অন্তরের গোপনতম আশার প্রতিধ্বনিই হতে পারে। সরমা ওদিকটা আর না ভেবে ওর গোড়ার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরটা এতক্ষণে দিলে—"না, প্রবঞ্চনা বেশি দিন চালাবার সঙ্কোচে নয়, মিথ্যে বলেছি: প্রবঞ্চনা আর চালাতে পারলাম না বলেই তোমার সামনে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি আজ···"

"কি রকম ?"

আবার একটু সচকিত হয়েই চাইলে সুকুমার।

"বলি···"

তারপর তাকে নিয়ে মৃন্ময়ের গোয়েন্দাগিরির কথা আগাগোড়া সব বলে গেল—সেই প্রথম দিন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে তাকে দেখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি—সরমার অভিনয় ক'রে ক'রে ওর চোখে ধুলো দিয়ে যাবার চেষ্টা—কলকাতায় যাবার সময় ওদের বাড়ি যাবার জন্য মৃন্ময়ের ঠিকানা চাওয়া—কিন্তু এসে চুপ করে থাকা—অর্থাৎ গোলমাল না করে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকা—একটা ছুতো করে সরমার ফটো নেবার চেষ্টা—তার সঙ্গে সেই দিনের অপ্রীতিকর কাণ্ডটা যাতে আর কেউ কিছু না বুঝলেও মৃন্ময়ের প্রমাণটা দৃঢ়ই হয়ে গেল যে সরমার একটা রহস্য আছেই। এতদিন একটা লুকোচুরি চলছিল, সরমাও ছিল সাবধান—এর পর শিকার ধরবার কাছাকাছি এসে কি করে পদ্ধতিটাই বদলে ফেললে মৃন্ময়—যেন নিরাশ হয়েই হোক, বা যে-কারণেই হোক—ছেড়ে দিয়েছে ও চেষ্টা—অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করলে—একটা স্বস্তি অনুভব করে সরমাও কি করে অসতর্ক হয়ে গেল, আর সেই সুযোগেই মৃন্ময় আবিষ্কার করে ফেললে সরমা সিনেমার অভিনেত্রী একজন।

সুকুমার চুপ করে শুনছিল, এইখানে একটু বাধা দিয়ে বললে—"ও আমাকে একদিন নিজের জীবনের খানিকটা ইতিহাস বলে—কতকটা গায়ে পড়েই, তার সঙ্গে আমাদের দুজনের এখানকার জীবনের অদ্ভুত মিল !···এমন কি যে মেয়েটির কথা বলেছিল—তার নামও বলেছিল অরুণা···"

সরমা একটু ভ্রূ কুঁচকে শুনছিল, বললে—"বলেছিল, না ?···বুঝেছি, তুমি নিশ্চয় সহজভাবেই শুনে গিয়েছিলে, বিশ্বাস ক'রে গিয়েছিলে; ও তাই থেকেই প্রমাণ পেয়ে গেল, আমি তোমার কাছে সব লুকিয়েই তোমার সঙ্গে আছি। ওর গল্পটা আগাগোড়া মন-গড়া।"

সুকুমার নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল, জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু ওর এত মাথাব্যথা কেন এসব নিয়ে ? রইলামই বা আমরা এভাবেই।"

সরমা সুকুমারের সরলতায় একটু হাসলে, বললে—"তুমি থাকতে পার, অন্যেই বা থাকবে না কেন ? আমি কুরূপা নয়—একজন নামকরা সিনেমার অভিনেত্রী···"

"কী বলছ তুমি !···মৃন্ময়বাবু !···"

"তাই-ই; একটুও ভুল বলছি না, একটুও বাড়িয়ে নয়। তুমি কাল রতনডিহিতে রুগী দেখতে গিয়ে যে আটকে গিয়েছিলে, ও সেই সুযোগে আমায় মিথ্যে চক্রান্ত করে ডেকে নিয়ে ঠিক এই কথাটাই বললে—অর্থাৎ আমার বাঁচবার এই একমাত্র উপায়।"

পূর্ব রাত্রের সমস্ত ঘটনাটুকুও বলে গেল সরমা।

তবুও বিশ্বাস করতে একটু বেগ পেতেই হোল। সরমা প্রশ্ন করলে—"কিন্তু তুমি এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি দেখেছ এমন ? প্রথম দিকটা হয়তো নিছক কৌতূহলই ছিল ওর—সেটাও খুব স্বাভাবিক—আমার মুখটা চেনা-চেনা, অথচ লুকোবার চেষ্টা করছি, তারপর যখন সব টের পেয়ে গেল তখন সেই জ্ঞানটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে না ?···মৃন্ময় মদ খায়—জানতে ?"

সুকুমার খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেছে; এবার আর চমকে উঠল না, শুধু ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরিয়ে চাইলে, কথাটা যেন কানেই যায় নি, বা এত শোনার পর ওটুকু অবান্তর। খানিকটা সেইভাবেই চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলে—"তুমি কি বলে এলে ?"

সরমা গোড়ার দিকে গল্পটা আরম্ভ করবার সময় অভিভূত হয়ে পড়েছিল; অশ্রু দমন করতে পারে নি। এখন কিন্তু সেই ভাবটা আর নেই; এইবার বিচারকের কাছে রায় শুনতে হবে, মনটাকে বেশ শক্ত করে নিলে। অনুকম্পার ভিখারিণী হতে দেবে না নিজেকে; আজকের অনুকম্পা কাল অবহেলায় বদলে যেতে পারে, তার চেয়ে

বিচারই করুক সুকুমার, ভেবেচিন্তে যা তার রায় হয় তাই শুনিয়ে দিক।

বললে—"আমি ওকে কাল রাত্রি পর্যন্ত সময় দিয়েছি।"

সুকুমার আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেই রকম সামনের দিকে চেয়ে ব'সে রইল। উত্তরের জন্য তার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে সরমা এক সময় দৃষ্টিটা নিলে ফিরিয়ে। কী অসহ্যভাবে যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাটছে সে-ই জানে। বিচারের রায় শোনবার জন্য মনকে দৃঢ় করা যায়। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করার দৃঢ়তাকে ধরে রাখা যে সাধ্যে কুলায় না। অথচ তাগাদা দিয়ে নিজের মৃত্যুটাকে এগিয়ে আনতে বুক ওঠে কেঁপে।··· দুইজনেই চুপ করে বসে রইল। সরমা আর পারছে না, বুঝতে পারছে যে-কান্নাটাকে ঠেলে রেখেছিল, রুদ্ধ স্রোতের মতো যেন তা বুকের চারিদিকটা চেপে উদ্বেল হয়ে উঠছে। ঘুরে ঘুরে কবার দেখলে সুকুমারের মুখের পানে, কোন পরিবর্তন নেই, শেষে সংযম হারিয়েই প্রশ্ন করে বসল—"কী বলছ আমায়? কী উত্তর দোব?"

"আমি ভাবছি মৃন্ময়ের কথা সরমা, যতোই ভাবছি···"

"কিন্তু আমার কথা তাহলে কে ভাববে?"—বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে আবার হু হু করে কেঁদে উঠল। তার মধ্যেই ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল—"আমার যে কী ভয়, কাকে বোঝাই আমি?—কী জীবন থেকে যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি, সব শুনেও তুমি যদি বুঝতে না পেরে থাক তো আমার আর কী আশা?—আমার প্রতি ভগবান বিরূপ—আমি আর তাঁকে ডাকি না, মনে হয় ডাকবার অধিকারই হারিয়েছি—কিন্তু মানুষের তো মানুষের দুঃখ বোঝা উচিত—একটা ভুল করেছি বলে, একটু কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না যে ধ'রে উঠে আসি?···না, আমায় বাঁচাও—আমি রুম্মাকে সরিয়ে তোমার এঁটো কুড়ের দাসীই হয়ে থাকব—আমায় ঠেলো না।—মৃন্ময় যে উত্তরটা চায় সেটাই আবার আমায় গিয়ে দিতে হবে?—আমি কার ভরসায় যে অত তেজ করে তার কাছ থেকে চলে এসেছি তুমি জান—জান—আমায় আবার মাথা নিচু ক'রে···"

অনুকম্পাই ওর দরকার, অন্তর থেকে যা চায় সেটা গোপন করে রাখবে কতক্ষণ? সুকুমার একটু সরে এসে ওর পিঠে হাত দিলে, বললে—"মৃন্ময়ের কথা ভাবছি ব'লে তোমার কথা ভাবছি না বলিনি তো সরমা। তুমি চুপ করো। আমার যে কী উত্তর তা তো তোমায় অনেকদিন আগেই দিয়েছি, মনে আছে সেদিনের কথা, যেদিন ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার চোখে জল দেখি? সেদিনও আমরা এইখানেই ছিলাম বসে।"

"আমার পক্ষে কি তার একটি কথাও ভোলা সম্ভব? ···কিন্তু সেদিনে আর আজকে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ —সেদিনকার সরমা ছিল মাথার রোগের রুগী একটা, তাকে দয়া করা চলে, আর আজকের সে সরমা···"

পিঠে আঙুলের একটু চাপ দিয়ে সুকুমার বললে— "থাক্, আমার কাছে কোন প্রভেদই হয় নি—হ'তে যে পারে না এটা এতদিনেও যদি নিজের মন দিয়ে না বুঝে থাক তো বোঝাই কি করে আমি?···বরং একদিক দিয়ে হয়েছেই প্রভেদ, আমার তো আজ সেই আনন্দই রাখবার জায়গা নেই—"

"কি?"

"তুমি পূর্ণ হয়ে, নীরোগ হয়ে ফিরে এসেছ আজ— আমার পক্ষে তো তা-ই।···সরমা, এত আনন্দের মধ্যে তোমার একটা কথা শুধু আমায় পীড়া দিলে—রুম্মার মতন এঁটো কুড়ের দাসী হয়ে থাকবে তুমি?—এ উৎকট অপরাধী ভাবটা মন থেকে সরাও। এক পুরুষ তোমায় নামিয়েছে, আর এক পুরুষকে দাও না সুযোগ তোমায় তুলে ধ'রতে। আমি ভুল, পাপ—এ-সবকে ও-ভাবে দেখতে পারি না— ভ্রান্তি আর পাপের খাদ তো রাস্তার দুধারে, পরস্পরের হাত ধরাধরি করে পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে হবে এই কথাটাই তো আমার কাছে বেশি সোজা।···মৃন্ময়কে জবাব দিতে হবে—তুমি বোল' এবার থেকে আমাদের দুজনের জীবন···"

সরমা মাথা হেঁট করে শুনছিল, ঘুরে সুকুমারের হাতটা চেপে ধরলে, মিনতির কণ্ঠে বললে—"এই পর্য্যন্তই আজ থাক, বাকি যা তা কাল আরও ভেবে বোল; একটা দিন তো আছে হাতে—আমার অনুরোধ···"

সুকুমার পিঠে ধীরে ধীরে হাতটা বুলুতে বুলুতে স্নেহের দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে রইল।···বুঝেছে; কত মুখেই তো এ-ধরণের আশ্বাস শুনেছে সরমা—ভাবের আবেগে

হঠাৎ দেওয়া, তারপর তেমনি হঠাৎ ফিরিয়ে নেওয়াও। একটু মৃদু হেসে বললে—"বেশ, তাই বলব, কালই শুনো।"

সাতাশ

আনন্দও একটা প্রতিবন্ধক; সরমার ঘুম যা হোল তা শেষ রাত্রের দিকে সামান্য একটু, তারপর ভোর হ'তে না হ'তেই উঠে পড়েছে। এমন অপরূপ একটি প্রভাত ওর জীবনে পূর্বে আসেনি; দিনের প্রভাত আর নবজীবনের প্রভাতের সঙ্গমই তো আজ। আস্তে আস্তে বাইরে চলে গিয়ে খুব খানিকটা ঘুরে এল। উষার নিস্তব্ধতার মধ্যে লখমিনিয়াকে যেন একটা স্বপ্নলোক বলে মনে হচ্ছে··· স্বর্গলোকও এই রকমই কিছু হবে—যেখানে মানুষ জীবনের শাপমুক্ত হয়ে নবজন্মে গিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

সূর্যোদয় হবে এবার।···একটা কথা মনে হ'তে সরমা চঞ্চল-পদে বাগানে এল ফিরে, তারপর নদীর ধারে সেই জায়গাটিতে এসে বসল, কতদিনের হাসি-অশ্রুতে সেটি ওর কাছে তীর্থ হয়ে আছে। এইখান থেকে আজ সূর্যোদয় দেখবে। আজ, যা কিছু সুন্দর তাকে অভিনন্দিত করতে বড় ইচ্ছা করছে। ও আজ নিজে সুন্দর, তাই সুন্দরই আজ ওর আত্মীয়।

ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হোল। শীতান্তের দীপ্ত সূর্য, গিরিশ্রেণী ছেড়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকটা আলোয় হয়ে উঠল উদ্ভাসিত।

আরও দীপ্ত হবে। দক্ষিণায়ন শেষ করে সে এখন উত্তরের যাত্রী, নিজের দুরদৃষ্টকে দূরে রেখে চলেছে নিজের পূর্ণতার পানে—প্রতিমুহূর্তেই চলেছে এগিয়ে।···আজ এই মন্ত্র শোনাবার জন্যই সরমার বিধাতা তাকে ডেকে এনেছেন নাকি এখানে? কী আশা! কী আনন্দ!—অভিশাপ যদি আসেই, তার পেছনে এই রকম আশীর্বাদও যে রয়েছে!···আরও আশার কথা—একদিন মাস্টারমশাইয়ের মুখে যা শুনেছিল—যা প্রতিকূলতা শুধু জড়কেই ক'রে ধ্বংস, করে আবদ্ধ; আত্মার অভিমান চিরমুক্ত, কল্যাণই তার চরম লক্ষ্য, তাই বারবারই যদি বিঘ্ন আসে তো তাই থেকে শক্তিসঞ্চয় করেই সে নিজের যাত্রাপথে যাবে এগিয়ে।

কিন্তু এত সহজও তো নয়।···আশার সূর্যকে গ্রাস করবার রাহুও রয়েছে যে।

রুক্মা যখন কিছুক্ষণ পরে ওকে চায়ের জন্য ডাকতে এল, ওর মুখের সেই দীপ্তি একেবারে গেছে মুছে; নিজের চিন্তায় এমন মগ্ন যে, কাছে এসে পড়লেও পায়ের শব্দে হুঁস হোল না।···সুকুমার বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল, বললে—"বড় শুকনো দেখাচ্ছে তোমায়, শরীর খারাপ নেই তো?"

সরমা হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে—"তোমরা ডাক্তারেরা মানুষকে ভালো দেখতে জান না। শরীর খারাপ হ'তে যাবে কেন? অবিশ্যি কালকে রাত্তির একটু বেশি তো হয়েই গিয়েছিল।"

চায়ের টেবিলের সামনে গিয়ে বসল দুজনে। রুক্মা সব সরঞ্জাম ঠিক ক'রে দিয়ে বললে—"আজ হাটবার, আমি একবার ঘুরে আসতে যাচ্ছি; কোন কাজ নেই তো এখন?"

সরমা একটু ভ্রূ কুঁচকেই প্রশ্ন করলে—"তুই তো হাটে যেতিস না আগে!"

রুক্মা উত্তর করলে—"দুলীর বাপ সঙ্গে থাকবে···ভাবনা নেই।"

—ওর কথাবার্তা এই রকম, নগদানগদি সব মিটিয়ে ফেলে, সরমা একাই থাকুক বা সঙ্গে সুকুমার থাকুক। এখানকার শাড়ি পিরাণ ছেড়ে একটা খাটো সাঁওতালী মুটিয়া প'রে, হাটের ঝুড়ি থলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝংড়ুর আউট-হাউসের দিকে। সরমা চা ঢালতে ঢালতে বললে—"টুকলাম এই জন্যে যে ওর একটা দোষ হয়েছে ক'দিন থেকে।···হয়তো দেখা যাবে মিনষেটাকে হাটে পাঠিয়ে মৃন্ময়বাবুর বাসার কাছে ঘোরাঘুরি করছে।"

"সে কি!"—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলে সুকুমার, "মেয়েটাতো ভালোই জানতাম।"

"তাই। দুদিন দেখেছি, তার মধ্যে একদিন সন্ধ্যের সময়েই।···মৃন্ময়বাবুকেও তো ভালো বলেই জানতাম, তাই ওটা এতদিন ধরিনি।"

নীরবে চা পান করতে লাগল দুজনে, সুকুমার এক সময় বললে—"বড় দুঃখের কথা তো! আমাদের সংসারটা যখন ঠিক করে পাতব ভাবছি···"

সরমা দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করলে—"কাল রাত্তিরের কথা ধরে বলছ? কিন্তু, তা কি করে হবে?"

"কেন?···না হবার কি আছে?"—আবার চকিত হয়েই প্রশ্ন করলে সুকুমার।

"না হবারই সবটুকু। তুমি নিশ্চয় এখনও ভেবে দেখনি ভালো করে; আমি আগেও ভেবেছি, পরেও ভেবেছি।"···আজ সকাল পর্যন্ত।"

"এত ভাববার কি আছে? ছিলাম না কি সংসার পেতে আমরা? ঠিক করে পাতা মানে···মানে···"

"নিজেদের কাছে লুকোবারও কিছু নেই, সঙ্কোচেরও কিছু নেই—ঠিক করে পাতা মানে বিয়ে করা নিশ্চয়।—কী করে হয় সেটা···এখানে?"

"কেন?"—ভেবে কিন্তু উত্তরটা নিজেই পেয়ে গেল বোধহয়, বললে—"বেশ, বাইরে থেকেই চলো ওটুকু সেরে আসি; ভগবানকে সাক্ষী রাখার ব্যাপারটা ঠিক মতো হলেই হোল, বাকি আর সবতো লোকাচারই।"

"এখানকার সমাজকে প্রবঞ্চনা করবে?"

"যে-প্রবঞ্চনায় ওঁদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না তাতে দোষটা কি?"

"প্রবঞ্চনার সে কী কষ্ট তুমি জান না, আমি জানি। তবুও তুমি যা বলছ অনেকটা ঠিক, বেশি ভাবুকতায় জীবনকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। তবে অন্তত বুবুয়া আর মাস্টারমশাইকে না বললে আমি বরাবরই অশান্তিতে থাকব।"

"সে-রিস্ক্‌টা আমার মনে হয় নেওয়া যায়; ওঁরা যে রকম উদার, মহৎ। ওঁদের সম্মতি পেলে আমার মনে হয় সমাজপতিদেরই সম্মতি পাওয়া হোল। যারা নেমন্তন্নয় ঘোট পাকাবার জন্যেই সমাজে থাকে, তাদের বাদ দেওয়া যায়।"

সরমা প্রশ্ন তুলে মন জেনে রাখছে; লক্ষ্য করলে সুকুমার দেখত, ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে খানিকটা।

আবার প্রশ্ন করলে—"কিন্তু মৃন্ময়—তার কথা ভেবে দেখেছ?"

ভাবা সত্যই কিছু হয়নি সুকুমারের, ওর একটা আনন্দই সব চিন্তার জায়গা জুড়ে বসেছিল, বললে—"মৃন্ময়! ···তাকে তো তুমি উত্তরটা দিয়েই দিচ্ছ আজ, সে আর এর মধ্যে কেন···মানে, এখন তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রীই···"

"তার পাপের আশায় ছাই পড়ল, সে চুপচাপ ব'সে থাকবে? মৃন্ময় কতদিন এখানে, আমাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যে শান্তিতে থাকতে দেবে? শান্তি হোক, অশান্তি হোক—এক মুহূর্ত্তের জন্যে থাকা চলবে আমাদের এখানে?"

বাঁ হাতের ওপর রেকাবি, তার ওপর চায়ের কাপটা রেখে সুকুমার সরমার মুখের পানে ঠায় চেয়ে রইল। এতক্ষণ পরে ও যেন পরিষ্কারভাবে সবটা দেখতে পাচ্ছে; উত্তর জোগাচ্ছে না তাই। উত্তরের জন্যই যেন সরমাকে প্রশ্ন করলে—"তাহ'লে?"

সরমা একটু ম্লান হেসে বললে—"তাহলে আর কি? এইখানে স্বপ্ন ভেঙে গেল···অবশ্য, আমার স্বপ্ন।"

"আমার স্বপ্ন নয় সরমা?···বেশ, হয়েছে! এখান থেকে চলে যাই চলো আমরা।"

"তুমি লখমিনিয়া ছেড়ে যাবে! এও তো তোমার স্বপ্নই—বড় স্বপ্ন—তোমার আর বুবুয়ার···আর মাস্টার মশাইয়ের···ত্রিবেণীসঙ্গম।···সব চেয়ে সোজা উপায় কি জান?—আমায় সরে যেতে দাও"—গলাটা ধরে আসতে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

"আমার লখমিনিয়ার স্বপ্নের মধ্যে তুমি আছ জড়িয়ে সরমা—কতখানি যে তা কী করে বোঝাই তোমায়? তুমি চলে গেলে আমার স্বপ্নের থাকে কি?"

"বেশ, ছেড়ে যাওয়ার কথাই ধরি। ওকি বাইরেই আমাদের ছাড়বে? আমার ভবিষ্যতের সমস্তখানিই নির্ভর করছে ট্রেণ-দুর্ঘটনায় যে আমি মরিনি এটা প্রকাশ না হয়ে পড়া। ও যদি আর কিছু না ক'রে এইটুকু কথাই বাইরে প্রকাশ ক'রে দেয়, সমস্ত সিনেমা জগৎটা আমার ওপর ভেঙে পড়বে। আমি যদি শক্ত থাকতে পারি, তবু তোমার জীবন দুর্বহ করে তুলবে।"

"ও-কথা বললে কেন?—'যদি পারি শক্ত থাকতে'?"

"একটা সিনেমা-অভিনেত্রী, তার আত্মবিশ্বাস কতটুকু? এইখানে এসে যেটুকু সঞ্চয় হোল—মাত্র এই কয়েক মাসের পুঁজি—সেটা পরীক্ষায় ধরবার সময় হয়েছে কি?"

"নিজেকে তুমি নিজে বিশ্বাস না কর সরমা, একজন করে—আমি করি—সেটাও কি যথেষ্ট নয়?"

সরমা দৃষ্টি নত করে শুনছিল, একটু চুপ করে থাকার পর দরদর করে অশ্রু নামল চোখে। আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"আমি এত

আশা করিনি—দোহাই তোমার। আমায় বুঝে নাও, আমায় বাঁচাও। একটা সত্যিকার জীবনের স্বাদ পেয়ে আবার হারাবার ভয়ে যে আমি কত দুর্বল হয়ে পড়েছি, এবার নিরাশ হোলে আমি বাঁচবার শক্তি হারিয়ে যে কোথায় তলিয়ে যাব সেটুকু ভেবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকো দয়া করে'—আমায় এতবড় ভরসার কথা আজ পর্যন্ত কেউ শোনায় নি। একটা অসহায় মেয়েছেলে সত্যিই চাইছে বাঁচতে—এইটুকু বিশ্বাস ক'রে জোর ক'রে যদি কেউ আমায় আমার সর্বনাশ থেকে টেনে রাখতে পারে তবেই আমি বাঁচব। আর তা তুমিই পারবে। তুমি আমার শেষ ভরসা। তেমনি মৃন্ময় আমার শেষ শত্রুও—ওকে যে আমার কী ভয়—ঘরবার সমস্তটা জুড়ে যে ও আমার কী সমস্যা তা তোমায় বললাম—যা করলে, যেখানে নিয়ে গেলে এ-সমস্যা মেটে···"

"এখানে থেকেই এ-সমস্যা মিটতে পারে সরমা।"

"কি করে ?"

"অনেক উপায় থাকতে পারে, তার মধ্যে দুটোর আশা তো আমার এখনই রয়েছে। প্রথমটা নিতান্ত বৈষয়িক হিসেবের ব্যাপার। মৃন্ময় এখানে ভালো আছে—প্রতিপত্তি, আদর, অর্থ—সব দিক দিয়েই সে আশাতীত পেয়েছে এখানে, একথা আমায় ও নিজের মুখে অনেকবার বলেছে; আর এসব ক্রমে বাড়বেই। আমাদের যদি অনিষ্ট করে—যার জন্যে আমরা বাধ্য হই লখমিনিয়া ছেড়ে যেতে—তো ওকি এটা বোঝে না যে আমরাও ওর এই সাধুতার মুখোস টেনে ফেলে দিয়ে যাব, ওকেও লখমিনিয়া ত্যাগ করতে হবে?···আমি যখন তোমায় স্ত্রী বলেই গ্রহণ করতে রাজি আছি, তখন আর শুধু আক্রোশে ও এ-বিপদটা ডেকে আনতে যাবে কেন ?"

"দ্বিতীয় উপায় ?"

"দ্বিতীয় উপায়ও একটা আশা করা যায়। সেটা মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস, অবশ্য সেটা পরের কথা; কিন্তু আশা করতে দোষ কি ? ·· এ যা বললাম—প্রথম উপায়—এটাতে একটু মন খুঁৎ খুঁৎ করেই, যেন শয়তানের সঙ্গে আপোষ ক'রে থাকা। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছুর তো মূল্য আছে—এই করে সময় নিয়ে আমরা ওর বন্ধুত্ব অর্জন করবারই চেষ্টা করি না আস্তে আস্তে—আমার মনে হয় একটা লোভে পড়ে গেছে, এমন একটা অবস্থা, যাতে যে-কোনও সাধারণ মানুষও হয় তো ওর মতই লোভে পড়ে যেত···দেখি না, আমাদের ভালো ব্যবহারেই ওকে লজ্জিত করে ভালো ক'রে তুলতে পারি কিনা—সমস্যাকে ভয় না করে এগিয়েই যাই না। দেখি মেটে কিনা।

"কি জান সরমা ?—লখমিনিয়ার ওপর আমার বড় বিশ্বাস, এখানে অনেক কিছু পেলাম—এর চেয়েও বড় কিছু পাব বলে আশা হয়···সমস্যা না মেটে শেষ পর্যন্ত, আশা না হয় সফল, চলে যাব দুজনে। পৃথিবী অনেক বড়, ভগবানকে ভরসা করে দাঁড়াবার অনেক ঠাঁই আছে, তার জন্যে ভেবো না।" (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

নিরন্ধ্র তিমির দুর্গে বার বার করাঘাত করি—
বিচিত্র তৃষ্ণার তীর্থে খুঁজে ফিরি কোথায় প্রহরি !
হে প্রহরি, খোলো দ্বার—
চেতনার সিঁড়ি ভেঙে ঘুচে যাক্ এ ঘোর আঁধার।
সমুদ্রের ব্যথা লয়ে রিক্ত আজ মানুষের প্রাণ—
মুক্তির মুখর মন্ত্রে জ্বালো শিখা জ্বালো অনির্বাণ।

জীবনের তীর্থ পথে খুঁজি কারে, কি যে খুঁজে চাই,
অন্ধকারে বারে বারে দু' বাহু বাড়াই !
এ বিস্ময় স্বপ্ন আর বিস্বাদ বিষাদ দিনগুলি
মুছে দাও হে পৃথিবী, নাও তারে তুলি;
ভরে দাও পূর্বাচল অনন্ত বৈভবে—
তোমার হৃদয় লগ্ন উষ্ণ অনুভবে।

দরদী-মানুষ শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শরৎচন্দ্র শুধু দুঃস্থ ও লাঞ্ছিত মানুষদের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। ইতর জীব-জন্তুর প্রতিও তাঁর দরদের সীমা ছিল না। তাঁর নিজের পোষা পশুপক্ষীগুলিকে ত সন্তানবৎ পালন করতেনই, তাছাড়া অন্য জীব-জন্তুর উপরও তাঁর দয়ামায়া কম ছিল না।

শরৎচন্দ্র এক সময় একটি পাখী পুষেছিলেন। তিনি পাখীটির নাম দিয়েছিলেন—বাটুবাবা। বাটুকে তিনি এত ভাল বাসতেন যে, বাটুর জন্য রূপার দাঁড় ও সোনার শিকল করে দিয়েছিলেন। তিনি বাটুকে ভাল ভাল জিনিষ খাওয়াতেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাটুর সঙ্গে স্নেহালাপে কাটাতেন। এই আলাপের সময় বাটু তার নিজের ভাষায় হয়ত তার মনিবকে কৃতজ্ঞতা জানাত।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের পোষা পাখার যত্ন ত করতেনই, অপরে পাখী পুষে তাদের যদি আদর যত্ন না করত তাহলেও তিনি এই দেখে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতেন। শরৎচন্দ্র একবার কলকাতার একটা পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ এক বড়লোকের বাড়ীর ভিতরে একটা পোষা পাখীর আর্ত চীৎকার শুনতে পান। পাখীর এই করুণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত বড়-লোকের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেন। ভিতরে গিয়ে তিনি দেখেন, উঠানে একটি কাকাতুয়া পাখী তার দাঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে একটা দড়িতে তার নিজের গলা জড়িয়ে ফেলেছে এবং সেই জড়ানো ফাঁস থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই সে ঐভাবে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করছে। শরৎচন্দ্রের সেদিনকার পথের ভ্রমণ-সঙ্গী এবং এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন—

…"কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ভীড় ঠেলে শ্যামবাজারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। ফুটপাথ দিয়ে চলেছি। পাশের এক বৃহৎ বড়লোকের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কান পেতে কি যেন শুনছেন। রাস্তার কোলাহল ভেদ করে কানে এলো, কাকাতুয়া-জাতীয় কোন পাখীর আর্তচীৎকার। সেই চীৎকারের দিকে কান রেখে বলে উঠলেন—শুনছো? —দেখলাম রাগে তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

—বড়লোক! পাখী পোষবার সখ!

সঙ্গে সঙ্গে দেখি হন্ হন্ করে সেই বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন। আমি কিছু বলবার আগেই দেখি বাড়ীর দরোয়ান তাঁকে আটকেছে। তখন তাঁর পোষাকের উপর পড়েছে কংগ্রেসের প্রভাব এবং সেই পোষাক তার চেহারার ব্যক্তিত্বহীনতাকেই আরো পরিস্ফুট করে তুলেছে। তার ফলে হিন্দুস্তানী দরোয়ান রীতিমত রুক্ষকণ্ঠে তাঁকে প্রতিরোধ করে গর্জন করে উঠলো, আরে বাবু, ক্যায়া ম্যাংতা?

শরৎদা ব্যঙ্গের সুরে প্রত্যুত্তর দিয়ে উঠলেন, ক্যায়া ম্যাংতা?—সামনের উঠানে একটি কাকাতুয়া ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে একটা দড়িতে নিজের গলা জড়িয়ে ফেলেছিল এবং তার ফাঁস থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল।

শরৎদা দরোয়ানের বাধাকে ভ্রূক্ষেপ না করে, উঠানে সেই কাকা-তুয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে ফাঁস থেকে মুক্ত করলেন। দরোয়ান ততক্ষণে ধরে নিয়েছিল, বোধ হয় কোন দুঃসাহসিক চোর তার মনিবের কাকাতুয়াটিকে চুরি করতে এসেছে বা অনুরূপ একটা কিছু। তাই হাত পাকিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলো। আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, আরে ভাই! জান্‌তা হ্যায় কৌন…

আমার হিন্দুস্তানীকে গ্রাহ্য না করে দরোয়ান-পুঙ্গব প্রায় একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুজন অপরিচিত লোককে সেইভাবে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন; আপনারা? কি ব্যাপার? কাকে চান?

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না।

শরৎদা ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে ভদ্রলোকটিকেই প্রশ্ন করে উঠলেন, এ পাখী বুঝি আপনার? পাখী পোষবার খুব সখ আপনার না?

হঠাৎ একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখে এই ধরণের রুক্ষ প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক ত অবাক্! প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আপনি কি বলছেন?

শরৎদা তিক্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলে উঠলেন—জীবজন্তু পুষতে হ'লে অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন? কতক্ষণ ধরে পাখীটা যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁস নেই!

ভদ্রলোক এতক্ষণে হয়তো ধরে নিয়েছিলেন যে ভর্ৎসনা-কর্তা হয়তো পাগল!

আমি তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি বোধ হয় চেনেন না ওঁকে, উনি হলেন শরৎচন্দ্র……

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? ঔপন্যাসিক?

আমি বললাম,—হ্যাঁ!

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ হাত জোড় করে শরৎদার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, এভাবে যখন এসে পড়েছেন গরীবের বাড়ীতে তখন……

নিমেষে শরৎদার গলার সুর বদলে গেল। একান্ত পরিচিতের মতন বলে উঠলেন, না হে না, বিশেষ দরকারে বেরিয়েছি…হয়ত দেরী হয়ে গেল…চল…চল…নেপেন…

বলতে বলতে শরৎদা একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।…" (শরৎস্মরণিকা, ৪র্থ বর্ষ)

শুধু পাখীই নয়, কুকুর—আবার বিশেষ করে রাস্তায়-ঘোরা বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর প্রতিই যেন শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল আরও বেশি।

শরৎচন্দ্রের নিজের একটা কুকুর ছিল। তার নাম ছিল, ভেলু। ভেলু প্রথমে ছিল রাস্তার কুকুর। তখন তার জীবন কাটত অনাহারে অর্ধাহারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে। এই ভেলু একদিন কিভাবে শরৎচন্দ্রের চোখে পড়ে। অমনি শরৎচন্দ্র ভেলুকে পথ থেকে আনলেন বাড়ীর মধ্যে এবং তারপর থেকেই শুরু হয় ভেলুর আদর যত্নের পালা। ভেলু বেঁচে গেল। আর শুধু বাঁচাই নয়, সে এখানে থেকে পরম যত্নের সহিত আদরে লালিত পালিত হতে লাগল। ভেলুর প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতা ছিল অনির্বচনীয়। এই ভেলু যখন মারা যায়, শরৎচন্দ্র তখন শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়কার কথা উল্লেখ করে জলধর সেন এক জায়গায় লিখেছিলেন—

"ভেলু যখন অসুস্থ হয়ে পড়লো, বাড়ীতে যত রকম চিকিৎসা করা যেতে পারে শরৎচন্দ্র তা করলেন। অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে ভেলুকে বেলগেছিয়ায় পশু চিকিৎসালয়ে নিজে নিয়ে গেলেন, অন্য কারুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন না। ভেলু যে কয়দিন সেখানে বেঁচেছিল শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই পশু-হাসপাতালে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জরপ্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নানাহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সকাতরে চেয়ে থাকতেন।…কিন্তু কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃতদেহ শিবপুরের বাড়ীতে এনে সমাধিস্থ করলেন, সংবাদ পেয়ে আমি সেইদিন শিবপুরে গেলাম। আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে শরৎচন্দ্র কাঁদতে কাঁদতে বললেন—দাদা আমার ভেলু আর নেই।' তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হ'ল না।

এই আমার শরৎচন্দ্র। পালিত পশুর মৃত্যুতে সন্তান শোকাতুর… এই স্নেহবৎসল শরৎচন্দ্রকেই আমি চিনি, আমি জানি।"

ভেলু মারা গেলে শরৎচন্দ্র তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"সাতদিন সাতরাত খাইনি, ঘুমুইনি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোরে ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবার জোর করে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ওষুধ তার পেটে গেল না। কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে, সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোর বেলায় সে কান্না তার থামলো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর সেই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগলো—'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।' তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি।"

১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘরে একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি দেওঘরের রাস্তা থেকে একটা বেওয়ারিশ কুকুরকে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াতেন এবং আদর যত্ন করতেন। শরৎচন্দ্র যতদিন দেওঘরে ছিলেন, এই কুকুরটি ততদিন তাঁর কাছেই ছিল। তিনি কুকুরটির নাম দিয়েছিলেন—অতিথ। দেওঘর থেকে চলে আসবার দিন শরৎচন্দ্র এই অতিথকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

"গেটের বাইরে সার সার গাড়ী এসে দাঁড়ালো। মালপত্র বোঝাই দেওয়া চললো। অতিথ মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগলো কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশি।

একে একে গাড়ীগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়ীটাও চলতে সুরু করলে। ষ্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নাবতে গিয়ে দেখি অতিথ দাঁড়িয়ে। কি রে এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে—কি জানি মানে তার কি।

টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, বন্ধু এসে খবর দিলেন ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল, তারা বকসিস পেলে সবাই। পেলে না কেবল অতিথ। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম, ষ্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথ। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

বাড়ী ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলি মনে হতে লাগলো অতিথ আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ীর লোহার গেট বন্ধ—ঢোকবার যো নেই। হয়ত পথে দাঁড়িয়ে দিন দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা—তারপরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে। হয়ত ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই। তবুও দেওঘর বাসের কটা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।

(ভারতবর্ষ—১৩৪৪ ফাল্গুন)

রাস্তায়-ঘোরা বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর প্রতি যেন শরৎচন্দ্রের একটা বিশেষ মায়া ছিল। এদের খাওয়া-থাকার কষ্ট দেখে তিনি বড় অস্বস্তি বোধ করতেন। শরৎচন্দ্র একবার কাশীতে উত্তরা-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় সুরেশচন্দ্রদের পাড়ায় অনেকগুলো কুকুর ছিল, যেগুলো কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তাদের কোন মনিব বা প্রভু ছিল না। এরা একরূপ খেতেই পেত না। এই সব পথের কুকুরকে ডেকে কেউ কোনদিন খেতে দিত না। তাই এদের খাওয়ার কষ্ট দেখে, শরৎচন্দ্র একদিন একটা দোকানে গিয়ে এদের জন্য অনেক টাকার লুচি, পুরি, কচুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি কেনেন। তারপর একটা মুটের মাথায় ঐ সব চাপিয়ে সুরেশচন্দ্রদের বাড়ীর যে রকটা বড় রাস্তার দিকে ছিল, সেখানে নিয়ে আসেন। সেখানে বসে শরৎচন্দ্র পাড়ার পথের কুকুরগুলোকে ডেকে ডেকে পেটপুরে লুচি মোণ্ডা খাওয়ালেন।

শরৎচন্দ্রের এই ব্যাপার দেখে পথচারী ভদ্র-অভদ্র উপস্থিত সকলে

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র কাকেও কিছু না বলে শুধু সুরেশচন্দ্রকে বললেন—দেখ সুরেশ, পথের কুকুরগুলো দেখলেই আমার যেন কেমন কষ্ট হয়। এদের দেখবার কেউ নেই। কেউ এদের আদর করে কোন দিনই খেতে দেয়নি। বরং দেখতে পেলে অনেকেই এদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বেচারাদের জীবন সত্যিই বড় দুঃখের। আমার যদি টাকা থাকত, তাহলে আমি এদের জন্য একটা অন্নসত্র খুলে দিতাম।

শুধু পাখী বা কুকুরই নয়, ছাগল, গরু প্রভৃতি মূক জীবজন্তুর উপরও তাঁর এমনি একটা গভীর দরদ ছিল। শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে থাকার সময় একবার তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন, আগুন লেগে সেটি পুড়ে গিয়েছিল। সেই বাড়ীর নীচে একটি ধোপা থাকত। আগুন যখন দাউ দাউ করে বাড়ীর চারদিক ঘিরে ফেলে, তখন শরৎচন্দ্র জানতে পারেন যে, ধোপার ঘরে একটি ছাগলছানা বাঁধা রয়েছে। এই ছাগলছানাটিকে আগুনের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও সেদিন তিনি সেই আগুনের মধ্যে ঢুকেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ছাগলছানাটিকে রক্ষাও করেছিলেন।

সামতাবেড়ে থাকা কালে শরৎচন্দ্র নিজেও ক'টি ছাগল পুষেছিলেন। এদের মধ্যে একটা খাসিকে একজন কসাইএর হাত থেকে উদ্ধার করে এনে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র এই খাসিটির নাম দিয়েছিলেন "স্বামীজী"। এই ছাগলগুলিকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহের সহিতই পালন করতেন।

এই সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি পোষা গরুও ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটা অনেকদিন দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, তাই একবার একজন শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—এদের বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কেন? পিঁজরাপোলে বিদায় করে দিন না!

শরৎচন্দ্র এই কথা শুনে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন—এরা একদিন আমায় কত দুধ খাইয়েছে, আজ আমি এতখানি অকৃতজ্ঞ হব?

গরুর উপর শরৎচন্দ্রের যে কি দরদ ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর মহেশ গল্পে। এই গল্পে একটি গরুর যে করুণ চিত্র তিনি এঁকেছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে মূক প্রাণীকে নিয়ে এত ভাল গল্প বোধ করি খুব কমই রচিত হয়েছে।

পশু-পক্ষীর উপরে শরৎচন্দ্রের এতখানি দরদ ছিল বলেই তিনি নিজে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি অনেকদিন ধরে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির (C.S.P.C.A) হাওড়া শাখার সভাপতি ছিলেন। এই সমিতিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। সমিতির হাওড়া শাখার সভাপতি থাকা কালে, একবার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গাড়োয়ানরা এই পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে এবং এই নিয়ে কলকাতা ও হাওড়ায় এক ভীষণ হাঙ্গামারও সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময়টায় হাঙ্গামার কথা কিছু না জেনেই তিনি ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি ঢাকার পথে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু পথে যখন শুনলেন যে, গাড়োয়ানরা পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট সুরু করে দিয়েছে এবং এই নিয়ে হাঙ্গামাও আরম্ভ হয়েছে, তখনই তিনি ঢাকা যাওয়া বন্ধ করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। এ কথার উল্লেখ করে তিনি সেদিন ঢাকায় তাঁর আমন্ত্রণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—"ভাই চারু,—আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থাৎ C.S.P.C.A কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে, Surjeantদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়—কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনচি ৪জন মরেছে।

ও ত গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাওড়া সহরেও C.S.P.C.A আছে এবং আমি তার chairman, এও একটা বড় department; আজ হাওড়ার magistrate এবং S.P. কোনমতে হাওড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে, কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ, এই department-এর কর্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না, এই জন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্চি। কাল সকালেই আবার ফিরে আসতে হবে।

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে, কিন্তু এই না-যাওয়াটা আমার নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।"

(শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী পৃঃ ১৮৪)

গরুবাছুর, ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু ছাড়াও মাছ প্রভৃতির উপর পর্যন্তও শরৎচন্দ্রের মমতা ছিল। সামতাবেড়ে থাকার সময় তিনি সেখানে পুকুর কাটিয়ে সখ করে মাছ পুষতেন। মাছের উপরও যে শরৎচন্দ্রের কিরূপ ভালবাসা ছিল তা তাঁর "রামের সুমতি" গল্পের "কার্তিক-গণেশ" নামক মাছ দুটির কাহিনী থেকেই বেশ বোঝা যায়। এই কার্তিক-গণেশ মারা পড়লে, রামের কান্নাকে মনে হয় যেন এ শরৎচন্দ্রেরই কান্না।

মানুষের কালশত্রু বিষধর সাপের উপর পর্যন্তও শরৎচন্দ্রের স্নেহ ছিল। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর আশে পাশে অনেক বিষধর সাপ ছিল, কিন্তু তিনি কোন দিনই সেই সব সাপকে মারতেন না, এমন কি তাড়া পর্যন্তও দিতেন না। বরং অপরে তাড়া দিতে গেলে তিনি তাদের বিশেষভাবে বাধা দিতেন।

এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—"শরতের সাপের উপর আজীবন ভালবাসা ছিল। সামতার বাড়ীতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসের উপর বড় বড় সাপ রোদ পোয়াত। শরৎ পাহারা দিচ্ছেন, ছেলে-মেয়েদের মানা করছেন, 'ওরে তোরা ওদিকে যাস্ নে! আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্ছে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।"

এইভাবে মানুষের ভীষণ শত্রু সাপের উপরও শরৎচন্দ্রের মমতা ছিল। গাছপালার উপরও শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট দরদ ও যত্ন ছিল।

ছেলেবেলায় তিনি যেমন ফুলের বাগান করতেন, বেশি বয়সেও তেমনি সামতাবেড়ে তিনি নিজের হাতে ফুলের ও ফলের চারা লাগিয়ে বাগান করেছিলেন। তিনি নিজে নিয়মিত এই সব গাছের যত্ন করতেন। শরৎচন্দ্র জীবনের শেষদিকে কলকাতায় বাড়ী করে এখানে প্রায়ই থাকলেও তিনি যখনই তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে যেতেন, তখনই গিয়ে সেই সব গাছপালার যত্ন নিতেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন সামতাবেড়ে ছিলেন, সেই সময়ে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি তাঁর বাগানের এই সব গাছপালার যত্ন করতে ত্রুটি করেন নি। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "শরৎচন্দ্রের শেষের ক'দিন" প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ করে এক জায়গায় লিখেছেন—

"ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দেখালেন: দেখেছ এই গাছটা ; এটা ছিল একটা ল্যাংড়া আমের গাছ—কি দশা হয়েছে এর ! সোজা সুন্দর ছিল গাছটি, ঝাঁকড়া পাতাভরা : এখন নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পাতাগুলি শুকিয়ে গেছে।

বল্লেন শরৎ—গেল বছর খুব ফলেছিল, চমৎকার এত বড় বড় আম, কি মিষ্টি, কি সুন্দর স্বাদ—আজ কোথাও কিছু নেই, এই দশা, বলত ব্যাপার কি ?

গাছটার দিকে সত্যি যেন চাওয়া যায় না।

পরের দিন থেকে গোড়া খুঁড়ে খোলের জল, চুণ, শিংএর গুড়ো দেওয়া চল্লো, ছাতা মাথায় শরৎ বসে আছেন। দেখছেন কাজে ফাঁকি দেয় কিনা লোকগুলো।

ফুটে যাওয়া রজনীগন্ধার গোড়ার গ্যাঁজগুলো রোদ হাওয়া লাগার জন্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়াতে লাগলেন।..."

মানুষ, জীবজন্তু, এমন কি গাছপালার উপর পর্যন্তও শরৎচন্দ্রের এই যে এতখানি দরদ ও ভালবাসা, এ থেকে তাঁর কোমল হৃদয় ও দরদী মনের একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যই শরৎচন্দ্রের বুকের ভিতরটা যে কিরূপ নরম ছিল—আর সেই নরম স্থানটার মধ্যে অপরের জন্য কতখানি যে মমতা ও বেদনাবোধ ছিল, তা ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। তাঁর হৃদয়টা এতখানি কোমল ছিল বলেই, তিনি এমনি করে এক অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আর এতখানি সহানুভূতি ছিল বলেই তাঁর সাহিত্য তাঁর পাঠকপাঠিকাদের মনে এমনি করে সাড়া জাগাতে ও তাদের প্রাণে এত বড় একটা দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বোধকরি এতখানি কোমল হৃদয় ও দরদীমন নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও সাহিত্যিকই দেখা দেন নি।

পরীক্ষা প্রণালীর নব-রূপায়ন ও তাহার বিকল্প

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি-এস্-ই

শিক্ষার যাহা চরম লক্ষ্য, যেমন চরিত্র, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি—সেগুলির পরীক্ষার জন্য কোনও ব্যাপক এবং সার্থক ব্যবস্থা কোনও দেশেই হয়ত তেমনভাবে প্রচলিত হয় নাই। তবে জ্ঞান কৌশল সামর্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারে প্রদত্ত শিক্ষার আহরণ কোন ছাত্র কতটা করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ষাণ্মাসিক বাৎসরিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রচলিত আছে।

কিন্তু যে পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা আমরা প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্রের সারস্বত সাধনার পরিচয় সংগ্রহ করি তাহা কি সর্ব্বত্রই অভ্রান্ত ভাবে করা হয় ? আমরা কি জোর করিয়া বলিতে পারি যে আমাদের বিচারের মধ্যে মনুষ্যত্বের অপচয় কিছুই হয় না, অযোগ্যের সমাদর কিছুই হয় না, যোগ্যের অসম্মান কিছুই হয় না ?

আমাদের বিশ্বাস আমরা জোর করিয়া তাহা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় হয়ত অনেকে করেন না, কিন্তু তবুও অন্যায় অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য্য-ভাবে হয় এবং অনিবার্য্যভাবে তাহা হয় বলিয়াই সে অন্যায় লইয়া আমরা মাথা ঘামাই না। বছরের পর বছর যে সব ছাত্ররা কৃতকার্য্য হইল তাহাদের অভিনন্দন লইয়াই এতটা ব্যস্ত থাকি যে যাহারা অকৃতকার্য্য হইল তাহাদের কথা চিন্তা করিবার অবসর পাই না।

ছাত্র মহলে সুলভ হাততালি পাইবার লোভে আমরা অকৃতী ছাত্রদের লইয়া ওকালতী করিতেছি না। অকৃতী ছাত্ররা আমাদের সান্ত্বনার অপেক্ষা রাখে না। তাহাদের অকৃতকার্য্যতা যতই পীড়াদায়ক হউক না কেন, বয়সের গুণে এবং জীবনের প্রাচুর্য্যে তাহারা শীঘ্রই এই দুঃখকে ভুলিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে আমাদের নিজেদের তরফ হইতে ;—বৎসর বৎসর জাতির যে অর্থ সময় শক্তি ও সম্ভাবনার অপচয় হইতেছে তাহার তরফ হইতে, পরম প্রশান্তি লইয়া আমরা এতদিন ধরিয়া যে অপরাধ করিয়া যাইতেছি সেই অপরাধের তরফ হইতে—

ইহার প্রতিকার কোন পথে ? পঠন-ব্যবস্থা ভাল করিয়া এই অপচয় নিবারণের প্রসঙ্গ উপস্থিত আমরা তুলিতেছি না। তাহা ত করিতে হইবেই। কিন্তু পাঠন-ব্যবস্থা ছাড়া পরীক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া যে অন্যায়গুলি হইতেছে, সেই গুলির সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিতে চাই। সাধারণ অথচ, ব্যাকরণের শূন্য স্থান পূরণ, অশুদ্ধি সংশোধন, প্রকৃতি প্রত্যয়-নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারে ততটা হয় না, যতটা হয় সমালোচনা, প্রবন্ধ, সৃষ্টি-মূলক রচনা, রস-বিচার—প্রভৃতির মধ্যে। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, গল্প-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির বিচারে একটা সার্ব্বজনীন

মাপকাঠি নাই বলিয়া তাহার ফলটি যে কতটা অনিশ্চিত হয়, তাহা অনেকেরই জানা আছে। বিচারকদের ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগা, ব্যক্তিগত মত-বাদ, ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন প্রভৃতি তাঁহাদের বিচারকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিয়া তুলে। ফলতঃ এই জাতীয় পরীক্ষায় আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সম্পূর্ণ নির্ব্যক্তিকভাবে বিচার করিতে পারি না।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে একজন বিচারকের নিকট যে প্রবন্ধটি শতকরা ৮০ নম্বর পাইল, সেই প্রবন্ধটিই অন্য একজন বিচারকের নিকট হয়ত শতকরা ৩০ ও পাইল না। ফলে গড়ে বেশী সংখ্যা পাইয়া যে প্রতিযোগী প্রথম স্থান অধিকার করিল এবং তাহার প্রবন্ধটি যখন শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে সভায় পঠিত হইল, তখন তাহার মান দেখিয়া সভার অনেকেই হয়ত সন্তুষ্ট হইল না এবং পরীক্ষকের উপর পক্ষ-পাতিত্বের দোষারোপ করিল।

ঠিক এই জাতীয় একটি ঘটনা Toronto বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের পরীক্ষার ব্যাপারে ঘটিয়াছিল। ছাত্রদের উপর একটা বিশেষ গবেষণা করিবার জন্য বিভিন্ন বৎসর একই বিষয়ে প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে এক বৎসর যে প্রবন্ধটিতে শতকরা ৮০ নম্বর দেওয়া হইয়াছিল, অন্য বৎসর অন্য একটি ছাত্র—ঠিক সেই প্রবন্ধটিই অবিকল নকল করিয়া পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দ্বিতীয় বারে ঐ প্রবন্ধটি নম্বর পাইল মাত্র ৩৯ !

প্রবন্ধ-জাতীয় প্রশ্নের মধ্যে আর এক জাতীয় ব্যর্থতা আছে।

ইহাতে লেখার অপরিচ্ছন্নতা, বানান ভুল প্রভৃতি পরীক্ষকের মেজাজ বিগড়াইয়া দিয়া তাঁহার বিচারকে প্রভাবান্বিত করে। আমেরিকার State matriculation পরীক্ষায় একটি খাতায় সফলাঙ্ক হইয়াছিল ৫০ (অর্থাৎ—৬০ বিযুক্ত বানান ভুলের জন্য ১০), পরে এই খাতাটি নকল করাইয়া—পরীক্ষকের নিকট পাঠান হইল। এই বার খাতাটীর সফলাঙ্ক হইল ৭০।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে তথ্য-সমৃদ্ধির দিক দিয়া অবিকল এক হইলেও শুধু বানান ভুল থাকার জন্য দ্বিতীয় বারে—খাতাটিতে যত সফলাঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল, প্রথম বারে তাহার চেয়ে ১০ কম পাইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে B. W. Woodএর "Measurement of College work" নামক গ্রন্থের লিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ইতিহাসের প্রশ্ন ছয়জন পরীক্ষকের নিকট দেওয়া হইয়াছিল। এই পরীক্ষকগণের মধ্যে একজন নিজের কাজের সুবিধার জন্য কতকগুলি আদর্শ—উত্তর লিখিয়া রাখিয়া দিলেন। ভুল ক্রমে ঐ আদর্শ উত্তর পত্রটিই অন্য একজন পরীক্ষকের নিকট সাধারণ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের উত্তরপত্র হিসাবে প্রেরিত হয়। তাঁহার নিকট ইহা পাশ নম্বর পায় নাই ! পরে অন্যান্য পরীক্ষকের নিকট প্রেরিত হইলে দেখা যায় ঐ খাতাটির সফলাঙ্ক ৪০ হইতে ৯০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল !

সফলাঙ্কের এই যে পার্থক্য, ইহা পরীক্ষকদিগের অযোগ্যতার জন্য ততটা নহে—যতটা হইতেছে পরীক্ষা ব্যবস্থার অর্থাৎ প্রবন্ধ জাতীয় পরীক্ষার অপ্রতিবিধেয় ফল মাত্র। প্রবন্ধ জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দ, ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগা প্রভৃতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে বলিয়াই এইরূপ হয়—

An Examination of Examinations নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই জাতীয় পরীক্ষার (অর্থাৎ যে পরীক্ষায় ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রভৃতির কষ-লাগিয়া যায়) ব্যর্থতা দেখান হইয়াছে। একটি পরীক্ষায় যে যে খাতাগুলি একই নম্বর পাইয়াছিল, সেই খাতাগুলি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিকট পুনর্ব্বার পরীক্ষার জন্য পাঠান হইল। এইবার দেখা গেল—এই খাতাগুলি বিভিন্ন পরীক্ষকের নিকট বিভিন্ন ভাবে নম্বর পাইল এবং এই নম্বরের বিভিন্নতা ২১ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত হইয়াছে। অথচ মজার কথা হইতেছে—এক বছর পরে ঐ একই পরীক্ষকদের নিকট যখন ঐ খাতাগুলি আবার পরীক্ষার জন্য পাঠান হইল, তখন তাহাদের নম্বর প্রথম বারের তুলনায় শতকরা ৩০ হইতে ৩৫ পৃথক হইল।

আর একটি পরীক্ষার ফল আরও চমকপ্রদ। প্রথমবারের পরীক্ষায় তিনটি খাতাকে মাঝারি ধরণের বলিয়া স্থির করা হইল। পরে সেই খাতাগুলিই বিভিন্ন পরীক্ষকের নিকট পাঠান হইল। এইবার দেখা গেল, ঐ তিনটি খাতার মধ্যে প্রথম খাতাটির নম্বর ৪ হইতে ৫৪, দ্বিতীয়টির ১২ হইতে ৬৪ এবং তৃতীয়টির ১৬ হইতে ৫৬ পর্য্যন্ত হইয়াছে (ঐ পরীক্ষায় প্রথমবারে উচ্চতম প্রাপ্ত সংখ্যা ছিল ৮৪)

এই জাতীয় গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি, রসায়নাগার প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা করিলে আমরা সকলেই এই প্রকার গবেষণা করিতে পারি। কতকগুলি খাতা লইয়া পরীক্ষা করুন এবং পরীক্ষার সফলাঙ্কগুলি অন্য একটি কাগজে লিখিয়া রাখুন। কয়েক সপ্তাহ পরে ঐ খাতাগুলি আবার পরীক্ষা করুন। দেখিবেন প্রথমবারের পরীক্ষার সহিত দ্বিতীয়বারের পরীক্ষার নম্বরের অনেক পার্থক্য হইয়াছে।

পরীক্ষার বিচারের এই যে অনিশ্চয়তা এবং সার্ব্বজনীন মাপকাঠির অভাব—ইহা দূর করিবার জন্য একটা চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে এবং তাহার ফলে Objective test বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার Standardised test প্রভৃতি পরীক্ষা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার বিশেষত্ব হইতেছে এই যে ইহাতে পরীক্ষকদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা—মানসিক অবস্থা—ব্যক্তিগত মতবাদ প্রভৃতির উপর ছাত্রদের ততটা নির্ভর করিতে হয় না, তাহারা যতটুকু লিখিবে তাহারই উপর তাহারা নম্বর পাইবে। এই জাতীয় পরীক্ষায় রচনা আলোচনা প্রভৃতি প্রশ্ন থাকে না। এই জাতীয় পরীক্ষায় প্রশ্নগুলি খাতায় ছাপান থাকে এবং প্রশ্নের উত্তরগুলি ঐ খাতাতেই লিখিয়া দিতে হয়।

এই Objective test গুলিতে যে জাতীয় প্রশ্ন থাকে, তাহার দুই একটি দেখান হইল—

(১) অযুক্ত পদগুলি পূর্ণ কর।

(ক) আকবরের——খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

(খ) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়——নামক স্থানে।

(গ) বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়——খৃষ্টাব্দে।

(২) অনুপযুক্ত কথাগুলি কাটিয়া দাও।

(ক) ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় শীতকাল, বর্ষাকাল, গ্রীষ্মকাল।

(খ) পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশৃঙ্গ, মণ্টব্লাঙ্ক।

(গ) "ব্যক্তি ডুবে যায় দলে মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে"—

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ', কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা', সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' হইতে উদ্ধৃত।

(৩) যে শব্দটি শুদ্ধ তাহার নিচে দাগ দিয়া দাও।

(ক) ভৌগলিক, ভৌগোলিক, ভৌগোলীক।

(খ) উত্যাক্ত, উত্তক্ত, উত্ত্বক্ত।

(গ) বাল্মীকি, বাল্মিকি, বাল্মিকী।

(৪) শূন্য স্থানে ন বা ণ অথবা শ, ষ বা স বসাও।

(ক) প্র—তি, লব—, পি—াক।

(খ) অভিষে—ক, নৃ—ংশ, অধিবে—ন।

(৫) যুক্তি-প্রদর্শন কর।

আকাশে মেঘ থাকিলে শীত কম হয় কারণ—

(ক) মেঘ গরম।

(খ) মেঘ পৃথিবীর তাপকে বিকীর্ণ হইতে দেয় না।

(গ) মেঘ শীতকে আকাশ হইতে নামিতে দেয় না।

এই জাতীয় প্রশ্নের বিশেষত্ব হইতেছে এই প্রশ্নগুলিতে প্রবন্ধ বা রচনার আকারে উত্তর লিখিতে হয় না এবং ইহাতে পরীক্ষকের খুসী খেয়ালের সফলাঙ্ক (score) নির্ভর করে না। শুধু তাই নহে, ইহাতে অতি অল্প সময়েই পরীক্ষা দেওয়া যায়—শুধু পেন্সিল দিয়া ঠিক্ দিতে, কি অনুপযুক্ত শব্দটি কাটিয়া দিতে, কি শূন্যপদ পূর্ণ করিতে বেশী সময় লাগে না। পরীক্ষকের দিক দিয়াও সুবিধা যথেষ্ট—অতি অল্প সময়েই ইহাতে বহু সংখ্যক খাতা দেখিয়া ফেলা যায়।

এই জাতীয় পরীক্ষার আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে প্রশ্ন সংখ্যার প্রাচুর্য্য। ইহাতে এক ঘণ্টা পরীক্ষার জন্য হয়ত ২০০টি প্রশ্ন দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবন্ধজাতীয় প্রশ্নপত্রে তিন ঘণ্টার প্রশ্নের জন্য হয়ত ৬ হইতে ৮টি বা ১২টি প্রশ্ন দেওয়া হয়। তাহাতে ছাত্রদের সম্যক পরীক্ষা হয় না। ছাত্ররা বহু জিনিষ বাদ দিয়া শুধু important প্রশ্ন বাছিয়া বাছিয়া পড়াশুনা করিয়াই অনেক নম্বর পাইতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় বহু-প্রশ্নমূলক পরীক্ষার মধ্যে বিদ্যার একটা সার্ব্বভৌম পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ইহাতে উত্তর লিখিতেও বেশী সময় লাগে না, দেখিতেও সময় বেশী লাগে না।

খাতা দেখিবার জন্য বেশী সময় না লাগা—এই সুবিধাটি বর্ত্তমানকালে মোটেই হেলা করিবার জিনিষ নহে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক স্কুলেই ছাত্রসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে তাহাদের লইয়া সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আধি-ব্যাধি-র‍্যাশন-টিউসনি-পীড়িত শিক্ষক-মহাশয়দের একটা বিভীষিকার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ছাত্রদের ঘন ঘন পরীক্ষার ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের উন্নতি ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এ ক্ষেত্রে ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য প্রাচীন পদ্ধতির প্রশ্ন অর্থাৎ প্রবন্ধ-ব্যাখ্যা আলোচনা জাতীয় প্রশ্নের জন্য শতকরা ৭০-৭৫ এবং নূতন পদ্ধতির প্রশ্নের জন্য শতকরা ৩০ বা ২৫ নম্বরের ব্যবস্থা করিয়া এবং সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষার জন্য ঠিক তাহার বিপরীত অনুপাতে প্রশ্নের ব্যবস্থা করিলে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারটাও খানিকটা সহজসাধ্য হয় এবং দুই জাতীয় পরীক্ষার সুফলটিও পাওয়া যায়।

বুদ্ধি ও চেষ্টা থাকিলে সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিভিন্ন-শাস্ত্রেই যে নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন তৈয়ারি করা যায়, তাহা—আমাদের পূর্ব্ব-উদাহৃত আদর্শ প্রশ্নগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমানে ছাত্রদের একটা বড় দোষ হইতেছে তাহারা মূল পুস্তকগুলি না পড়িয়া শুধু অর্থ-পুস্তক—সহায়িকা জাতীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়াই পরীক্ষায় পাশ করিতে চেষ্টা করে। নূতন পদ্ধতির পরীক্ষার দ্বারা এই কু-অভ্যাসটি দমন করা যাইতে পারে। মূল পুস্তক হইতে এক আধটি অনুচ্ছেদ লইয়া তাহার মধ্যে অনুক্ত পদ পূর্ণ করিবার প্রশ্ন দিয়া এই উদ্দেশ্য সাধিত করা যায়। ইহাতে উত্তর লিখিবার জন্য অথবা উত্তরগুলি objective test এর মধ্যে এই ভাগ্যের অনিশ্চয়তা আছে, তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য কিছু কিছু সূত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রশ্নের প্রথমেই ছাত্রদের সাবধান করিয়া দিতে হইবে তাহারা যেন আন্দাজে না লিখে। ইহা ছাড়া আন্দাজে লেখাকে দণ্ড দিবার জন্য—শুদ্ধ উত্তরের জন্য যুক্ত চিহ্ন এবং অশুদ্ধ উত্তরের জন্য বিযুক্ত চিহ্ন দিয়া যথাসম্ভব দিলে আন্দাজে লিখিবার চেষ্টাটা অনেকটা সংযত হইতে পারে। পূর্ব্ব উদ্ধৃত ৫নং প্রশ্নের যে সব প্রশ্নে দুই তিনটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে একটি উত্তর যে নির্ব্বাচন করিতে হয়—(multiple choice test) সে ক্ষেত্রে সফলাঙ্ক দিবার জন্য এই সূত্রটি গ্রহণ করা যাইতে পারে—যথা

$$\text{সফলাঙ্ক নির্ভুল উত্তর}—\frac{\text{ভুল উত্তর}}{\text{সম্ভাব্য উত্তর}—১}$$

অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু সফলাঙ্ক = নির্ভুল উত্তর—ভুল উত্তর—এই সূত্র দ্বারাই ভালভাবে কাজ চলিতে পারে—

এই সম্ভাব্য ব্যবস্থা করিলেও যে ছাত্ররা আন্দাজে লিখিবে না তাহা নহে—তবে তাহাতেও খুব অসুবিধা নাই। কারণ কোন ছাত্রই এমন ভাগ্যবান হইতে পারে না যে Objective testএর শত শত প্রশ্নের অধিকাংশ উত্তরের ক্ষেত্রেই সে আন্দাজে লিখিয়া ফাঁকি দিয়া বেশী কৃতীত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবে।

পরীক্ষা করিবার জন্য বেশী সময় লাগে না। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ অংশ-গুলির সহিত ছাত্রদের পরিচয় জানিবার জন্য উদ্ধৃত উদাহরণের দ্বিতীয় প্রশ্নের 'গ' জাতীয় প্রশ্নের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বর্ণশুদ্ধির পরীক্ষার জন্য চতুর্থ প্রশ্নের ক খ জাতীয় প্রশ্নের ব্যবস্থা করা যায়। মোটের উপর নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন অনেক কাজেই লাগান যাইতে পারে। স্কুলে যদি cyclostyle এর ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নগুলি ছাপিয়া লইয়া ছাত্রদের হাতে হাতে দিয়া দিলে সেই প্রশ্নপত্রের উপরেই ঠিক্

দেওয়া ঢেরা-কাটা বা শূন্য পদ পূর্ণ করা জাতীয় কাজ করিয়া ২০।২৫ মিনিটের মধ্যেই ছাত্ররা ৫০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিতে পারে এবং সেইরূপ উত্তর পত্রের—৫০।৬০টি খাতা দেখিতে শিক্ষকমহাশয়ের হয়ত ১ ঘণ্টা ১॥০ ঘণ্টা সময়ও লাগিবে না।

তবে এই সম্বন্ধে একটা কথা আছে। নিছক নূতন পদ্ধতির প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত সমস্যার নিবারণ হয় না, আর ছাত্রদের জ্ঞানের সম্যক পরিচয়ও পাওয়া যায় না। কারণ এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে একটা "লাগে তুক্ না লাগে তাক্" জাতীয় ভাব আছে। যে সমস্ত ছাত্র অনুপযুক্ত পদটি কাটিয়া দিল, কিংবা উপযুক্ত পদটির নির্ব্বাচন করিল, তাহা আন্দাজে অন্ধকারে-ঢিল-মারার ব্যাপার হইল কিনা, সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

আরও একটা কথা আছে। এই তথাকথিত objective test দিয়াই আমাদের পরীক্ষার সব কাজ শেষ হয় না। কারণ শুধু জ্ঞানের পুটুলি মাত্র হওয়াই ত মানুষের লক্ষ্য নয়। কারণ অসম্বদ্ধ জ্ঞানের মাল-মশলা লইয়া আমরা যতটা কাজ করিতে পারি—তাহার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করিতে পারি যদি এই মালমশলাগুলির যথাযথ বিন্যাস ও গাঁথুনি দিয়া একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারি। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বলিয়াছেন—উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে তালিকাই মালিকাতে পরিণত হয়। যে প্রতিভা শুষ্ক তালিকাকে সুন্দর মালিকাতে পরিণত করিতে পারে, যে প্রতিভা ইট কাঠ পাথরের স্তূপ হইতে তাজমহল সৃষ্টি করিতে পারে, সে প্রতিভা হেলার বস্তু নহে। যে প্রতিভা মনের বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিতে পারে যে প্রতিভা চিন্তার স্তূপ হইতে যথাযথ নির্ব্বাচন ও গ্রন্থন করিতে পারে, যে প্রতিভা অস্ফুট মনোভাবকে স্ফুটতর করিতে পারে, যে প্রতিভা বস্তুভার হইতে যুক্তি ও সৌন্দর্য্যের বন্ধনযুক্ত রচনা বা "প্রবন্ধ" সৃষ্টি করিতে পারে, সে প্রতিভার প্রয়োজন আমাদের কম নহে। আমাদের মনে হয় মানুষের শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ হইতেছে মানুষের মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলার বিকাশ করা। কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্র সেই ব্যক্তিই অধিনায়কত্ব করিতে পারে, যাহার মধ্যে এই সুসংস্কৃত সুপরিচ্ছন্ন সুসম্বদ্ধ যুক্তি-শৃঙ্খলা ধরিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। প্রবন্ধজাতীয় রচনার মধ্যে এই যুক্তি-শৃঙ্খলার বিশেষ অনুশীলন হয়।

অনেকের বিশ্বাস সাহিত্য হইতেছে আবেগের জিনিষ, যুক্তির জিনিষ নহে। এ কথা ঠিক নহে। আবেগের প্রয়োজন সাহিত্যে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তির প্রয়োজনও কম নহে। যুক্তির বিষয়গুলিকে শুধু সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করিলেই সাহিত্যের কাজ শেষ হয় না। সাহিত্যের দাবী আর একটু বেশী। শুধু সত্য জিনিষটাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু নহে; সত্যকে সুন্দরভাবে কলাবদ্ধ ভাবে উপস্থাপিত করাও তাহার কার্য্য, সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য হইতেছে "Not truth, but fineness of truth."

ইহার সহিত যদি আবার আবেগের সংমিশ্রণ হয়, তাহা হইলে সাহিত্য অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। কবি বলিয়াছেন—

> One man with a dream at pleasure
> Shall go forth and conquer a crown
> And those with a new song's measure
> Can trample a Kingdom down.

ইহা শুধু কবিদিগের আত্ম-প্রশস্তির আদিখ্যেতার কথা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে সাহিত্যিকদের শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রুশো, ভলটেয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, শরৎচন্দ্র, গর্কী, ইব্‌সেন, বার্ণাড্‌শ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের বৈপ্লবিক প্রেরণা কম নহে।

কাজেই নিছক তথ্য বা জ্ঞানের খাতিরে নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা লইয়া মাতামাতি করিয়া আমরা প্রাচীন প্রবন্ধজাতীয় বা সাহিত্যিক রচনা-জাতীয় প্রশ্নকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিতে পারি না।

তাহা হইলে উপায়? যে প্রবন্ধজাতীয় প্রশ্নের ব্যর্থতা লইয়া আমরা এত কথা বলিলাম, তাহারই উপযোগিতা এখন অনস্বীকার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। তাহা হইলে আমাদের করণীয় কি? আমাদের করণীয় হইতেছে—প্রাচীন প্রবন্ধমূলক প্রশ্ন এবং তথাকথিত নূতন পদ্ধতির ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (Objective) পরীক্ষার প্রশ্ন, এই উভয় জাতীয় প্রশ্নের সমন্বয় করিয়া প্রশ্নপত্র তৈয়ারি করা। অবশ্য প্রবন্ধজাতীয় প্রশ্নে ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগা প্রভৃতি খানিকটা থাকিবেই, তাহা এড়াইবার উপায় নাই। তবে ইচ্ছাকৃত অবিচার, অহেতুক অনুগ্রহ-নিগ্রহ যাহাতে না হয়, পরীক্ষার বিচার যতটা নির্ব্যক্তিক হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করাই কি শিক্ষাতত্ত্বের শেষ কথা?

আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না। ভাল ছেলের বিচার কি শুধু পরীক্ষালব্ধ সফলতার উপরই নির্ভর করে? হয়ত তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া হইল যে নূতন পদ্ধতি ও প্রাচীন পদ্ধতির পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা আমরা অর্জ্জিত জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু জ্ঞানের পরিমাপের সহিত মনুষ্যত্বের পরিমাপ ঠিক হয় কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞানের আহরণ, না মনুষ্যত্বের বিকাশ?

আরও একটি কথা আছে। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—সুরেশ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া অন্তিম সময়েও মহিমের নিকট আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে পারিল না। তাহার বক্তব্য ছিল এই যে চিরদিন অন্যায় করিয়া আসিয়া অন্তিম সময়ে নাটকীয়ভাবে ক্ষমা চাহিলেই ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বাৎসরিক পরীক্ষাগুলি এই অন্তিম ক্ষমা চাওয়ার মতই জিনিষ। সারা বৎসর যে ছেলে ক্লাশ জ্বালাইয়া, কাজে ফাঁকি দিয়া, অপরের সারস্বত-সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সেই হয়ত পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রি জাগিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া, important বাছিয়া, ফাঁকি দিয়া পড়া তৈয়ারি করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিল এবং যে বিদ্যা উদগীরণ করিয়া সে পরীক্ষায় পাশ করিল, সে বিদ্যাও পরীক্ষার দু'চার দিন পরেই ভুলিয়া যাইল। সুতরাং

এই জাতীয় পরীক্ষায় পাশ-করা-ছাত্রদের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পাওয়া যায় না এবং মনুষ্যত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায় না।

যে বিদ্যার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের বিশেষ সম্পর্ক নাই, তাহা স্থায়ীভাবে মনের মধ্যে থাকিতে পারে না। পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েক দিন মাত্র মুখস্থ করিয়া যে পাঠ তৈয়ারী করা হয়, তাহা Cramming এরই নামান্তর মাত্র। Cramming করিয়া যাহা মুখস্থ করা হয়, পাঁচ মিনিট পরে তাহার শতকরা ৯৮ ভাগ, কুড়ি মিনিট পরে ৮৯ ভাগ, একঘণ্টা পরে ৭১ ভাগ, ৮ ঘণ্টা পরে ৪৭ ভাগ, দুদিন পরে ৬১ ভাগ এবং তিন মাস পরে ৩ ভাগ মাত্র মনে থাকে। কাজেই পরীক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি মুখস্থ করা বিদ্যা আমাদের স্থায়ী সম্পদ নহে। যে ছাত্র প্রতিদিন পড়াশুনা করে এবং অধীত বিদ্যার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি যাহার জীবনের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের সামিল, সেই স্থায়ীভাবে বিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে পারে।

কাজেই জ্ঞানের পরিচয়ের দিক দিয়াও বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের চেয়ে প্রাত্যহিক জীবনের পড়াশুনার ফলটাই হইতেছে ছাত্রদের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতর পরিচয়।

আরও একটা কথা আছে। বিদ্যা বা জ্ঞান খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ হইলেও মনুষ্যত্বের প্রয়োজন ইহার চেয়েও অধিক। বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যা বিক্রয়ের কেন্দ্র না করিয়া যদি মানুষ গড়িবার আশ্রমে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে শুধু পরীক্ষা পাশের হার বাড়াইবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। ছাত্রদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ আচার-আচরণের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইল। প্রতিদিনের আচরণের ভিতর দিয়াই মানুষের চরিত্র গড়িয়া উঠে। এই আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের ভিতর দিয়া এই আচরণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমাদের মনে হয় ছাত্রদের পাণ্ডিত্যের পরিচয়ের জন্য যেমন সাময়িক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, তেমনই তাহাদের দৈনন্দিন আচরণের ইতিহাসও একটা রাখা চাই। যে ছাত্র শুধু পণ্ডিতই হইয়াছে, চরিত্রবান্ হয় নাই, —তাহার মধ্য দিয়াও মনুষ্যত্বের অপচয় কম হয় নাই। সে অপচয়টুকুও নিবারণ করিতে হইবে।

যে যুগে ছাত্রদল গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভ করিত, তখন বোধ হয় এতটা অপচয় হইত না। কারণ সে যুগে যে যতই অভিজাত হউক না কেন, তাহাকে হয়ত গোরু চরাইতেও হইত, মাঠের আল বাঁধিতেও হইত। ফলে তাহারা শুধু গ্রন্থকীট পণ্ডিতই তৈয়ারি হইত না, কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবহারিক দক্ষতাও লাভ করিত।

শুধু তাহাই নহে, ইহার চেয়ে বড় কথা হইতেছে—ছাত্ররা জীবনের অনেকখানি সময়ই গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া প্রাত্যহিক জীবনের সদাচারের মধ্য দিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিত, বৎসরের শেষে একবার করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াই সারস্বত-সাধনায় সমাপ্তি করিত না।

গুরুরাও ছাত্র-বেতন-নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া ছাত্রদের তোষণ করিয়া তাঁহাদের বিদ্যা বিক্রয়ের দোকানের খরিদ্দার হিসাবে ছাত্রদের মন জোগাইয়া চলিতে বাধ্য ছিলেন না। যে ছাত্রের শ্রদ্ধা নাই, যত্ন নাই, শুশ্রূষা নাই, সদাচার নাই, নিয়ম-শৃঙ্খলা নাই, চরিত্র নাই, তাহাদের সারস্বত-সাধনার আশ্রম হইতে তাঁহারা বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিতেন। সেই জন্যই সে যুগে শ্রদ্ধাবান্ তৎপর সংযতেন্দ্রিয় ছাত্র তৈয়ারি হইতে পারিত। পরীক্ষোত্তীর্ণ স্নাতক ছাত্র শুধু পণ্ডিতই হইত না, তাহারা চরিত্রবান্ মানুষও হইত।

বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শুধু নূতন পদ্ধতির Objective test বা বস্তুতান্ত্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, প্রাচীন পদ্ধতি ও নূতন পদ্ধতির সমন্বয় করিলেও চলিবে না, ছাত্রদের মধ্য হইতে যাহাতে সাধু সংযত চরিত্রবান্ আত্ম-কর্ম্মক্ষম দেহ-মন-বিশিষ্ট পূর্ণ মানুষ তৈয়ারী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার দৈনন্দিন আচরণের উপর শৃঙ্খলা সংযমের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেই ব্যবস্থাটাই পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের চেয়েও বেশী প্রয়োজন।

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

তোমারেই যেন চেয়েছিনু বারে বারে,
গোপন মনের মিলন-অভিসারে ;
মধু-মলয়ার ছন্দে,
বন-মালতীর গন্ধে,
শুনেছিনু যেন বাঁশীখানি তব মনের আকাশ পারে!

জোছনায় ধোওয়া শরৎ-যামিনী শেফালির বাসে ভরা,
স্বপ্ন-মেদুর শুভ্র রজনী,—হৃদয় উদাস-করা
এমনি সে এক নীরব নিশায়
ছুটেছিল মন কোন সে দিশায়,
চেয়েছিল যারে উতলা পথিক পেল কি আজিকে তারে?

ডাবলিন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

গল্প আছে যে একজন আইরিশ ভদ্রলোক জাহাজ বানচাল হওয়ায় এক দ্বীপের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। সে দ্বীপের সহৃদয় অধিবাসীরা বিপন্ন বিদেশীর সেবা ক'রে তাকে সুস্থ করলে। জ্ঞানলাভ করেই আইরিশ জিজ্ঞাসা করলে—আমি কোথায় ?

সুশ্রূষাকারীরা দ্বীপের নাম করলে। আইরিশ জিজ্ঞাসা করলে—এখানে কোনো গবর্ণমেণ্ট আছে ?

নিশ্চয়—বল্লে দ্বীপবাসী সহৃদয়েরা।

আইরিশ তাল ঠুকে বল্লে—আমি তার বিপক্ষে।

অবশ্য এ গল্পের রসিক রচয়িতা ইংরাজ। আইরিশ তার হটকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-কেতন উঠিয়েছিল, দক্ষিণ আয়ারলাণ্ড বা এয়ারা স্বাধীন হবার বহু পূর্বে। ইংরাজ সেদিন যাকে দেখতে পারতো না তার চলন বাঁকা দেখতো। কাজেই সুবিধা পেলেই সাহিত্যের মারফত তার কুৎসা রটনা করত। এ বিষয়ে আমরা ভুক্তভোগী সুতরাং অলমতি বিস্তরেণ।
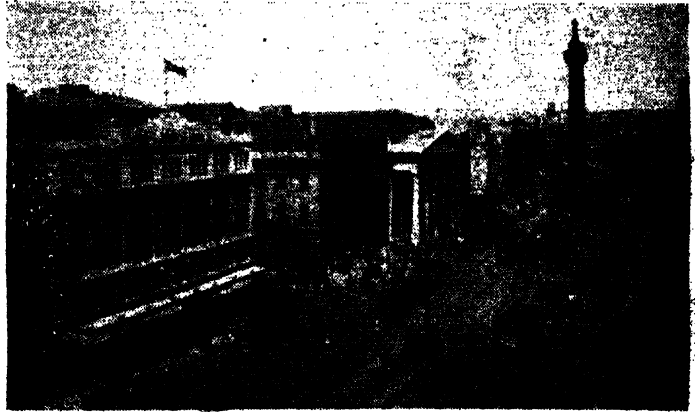
আমি ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ডাবলিন্ গিয়েছিলাম। লণ্ডন হতে ডাবলিন্ হাওয়াই জাহাজে চার ঘণ্টার পথ। আমি ডাবলিনে নেমেই বুঝলাম—পরের গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে এয়ারার লোকের মনোভাব যাহাই হ'ক তার স্বদেশ, তার ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি প্রীতি কোনো জাতির স্বদেশপ্রীতি হ'তে কম নয়।

আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম, সেথায় সেদিন ওদের পার্লামেণ্টের বহু সদস্য বাস করছিল—কারণ তখন সভার কর্ম ছিল সচল। আমি ভাগ্যক্রমে এক আইরিশ বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলাম সেথায়। তিনি কলিকাতার এক বড় ইংরাজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার। হ্যালো, মাই গড, প্রভৃতি আনন্দধ্বনির পর প্রথম প্রশ্ন হ'ল—কে সি, এয়ারা কেমন দেখ্‌ছ ?

চমৎকার !

আমি বন্ধুর মুখের ভাব ভুলব না। লোভী বালক গাছ-পাকা পেয়ারা হাতে পেলে যেমন উল্লসিত হয়, বন্ধুর মুখ তেমনি ভাব ধারণ করলে। তার পর কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য বল্লে—অবশ্য আমাদের কলিকাতা বোম্বাইয়ের মত বড় নয় ডাবলিন, কিন্তু এর পরিবেশ সুন্দর।

ও-কনেল ষ্ট্রীটে নেলসন্ ষ্ট্রীট—ডাবলিন

একথা স্বীকার করলাম। তার পর প্রশ্ন হ'ল মানুষ সম্বন্ধে।

আমি বল্লাম—যতটুকু দেখেছি ইংরাজদের মত মুখে-সরা (স্টাণ্ড অফিস) নয় এয়ারার লোক।

তখন সে ভিন্ন টেবিল হ'তে পরিচিত লোক ডাকলে। দল বেশ জমে উঠলো। গল্পের স্রোত ফিরলে বহু প্রসঙ্গকে। তাদের অভাব অভিযোগের বহু কথা শুনলাম। তাদের মনস্তাপের মূল কারণ—ইংরাজ-কূটনীতি দ্বারা আয়ারলাণ্ড বিখণ্ড করা, যার পরিণাম জাতীয়তা এবং অর্থনীতি উভয়ের সঙ্কোচ।

এয়ারার প্রাচীন গেলিক ভাষা চালাবার প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে কারণ তার প্রয়োজন ছিল ইংরাজকে হুমকী দেওয়া এবং ইংরাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠান এমন কি ভাষার উপর বিদ্বেষ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের মনোভাব। আজ কিন্তু বার্ক, গোল্ডস্মিথ, সেরিডানের

ও-কনৃনেল পুল—ওলিফি নদী—ডাবলিন

ভাষার আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এয়ারার ভাষা শুদ্ধ। লণ্ডনের শ্রমিক শ্রেণীর ককনী ভাষা হ'তে এয়ারার শ্রমিকের ভাষা স্পষ্ট—বরং অতি স্পষ্ট। এই উচ্চারণই আবার ইংরাজের রসিকতার বিষয়।

ভদ্রলোকদের গেলিক ভাষার উদাহরণ দিতে বল্লে
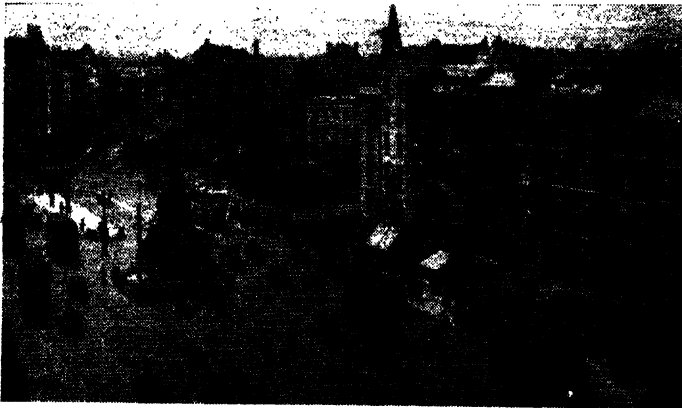
ওয়েস্টর ল্যাণ্ড ষ্ট্রীট এবং ও-কনৃনেল ষ্ট্রীটের মধ্যভাগে একটি স্ট্যাচু—ডাবলিন

হাসে। তবে বিদ্যালয়ে গেলিক পাঠ্য-বিষয় ও ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। পার্লামেণ্টে ইংরাজি চলে।

তাদের প্রত্যেকে নিজের দেশ, নিজের জাতির প্রত্যেক লোককে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসে ব'লে দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলি নাই একথা আমি বলছি না। পার্লামেণ্টের তর্ক বেশ তীব্র এবং তার বাহিরের প্রতিক্রিয়াও নিজ নিজ দলভুক্তের মধ্যে প্রবল। সে কথার পরিচয় পাওয়া যায় ভিন্ন দলের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়লে। বাস্তবকে এরা মেনে নেয়। আমার দলের নেতৃবৃন্দ প্রবর্ত্তন করেনি—সুতরাং প্রবর্ত্তিত বিধান বিষবৎ পরিত্যাজ্য—ঠিক এ মনোভাব য়ুরোপের কোথাও নাই। আমি ভূ-পর্য্যটকের দৃষ্টিতে একথা বলছি না। পার্লামেণ্টের সরকার-বিরোধী কতকগুলি সদস্যের সঙ্গে আলোচনার ফলে একথা বলছি। নিজের ব্যক্তি-শক্তির উপর এদের যথেষ্ট বিশ্বাস। সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি অভাব-অভিযোগের জন্য সরকারকে দায়ী করে না।

অবশ্য শান্তিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে এদের নাগরিক কর্ত্তব্য-জ্ঞান য়ুরোপের কোনো জাতি হ'তে কম নয়। তবে ইংরাজ বিনা প্রয়োজনে বা বিনা পরিচয়ে পরের সঙ্গে কথা বলে না। ফরাসী বা ইতালীয়ের মত উচ্চকণ্ঠে পথে কথা না কহিলেও, ডাবলিনের লোক ঠিক ইংরাজের মত ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে না। বিদেশীকে পথ চেনানো, স্থানের পরিচয় প্রভৃতি ব্যাপারে অচিনকে সাহায্য করা ইংরাজ নাগরিক কর্ত্তব্য বিবেচনা করে। একটু বোকা-বোকা দৃষ্টিতে কোনো অজানা সৌধ বা গিরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, উপযাচক হ'য়ে ইংরাজ বা স্কচ জ্ঞান-দৃষ্টি উন্মেষণ করবার চেষ্টা করে না, যতক্ষণ না তার সহায়তা যাচিঞা করা যায়। উদাসীনতাই তার পথ-চলার ভঙ্গি। এ বিষয়ে য়ুরোপের ল্যাটিন জাতির ব্যবহার ভিন্ন। আইরিশ গায়ে-পড়া না হ'লেও হেঁয়ালিভরা দৃষ্টির একটা হেস্তনেস্ত করতে উৎসুক। আমি একটা উদাহরণ দিই।

লিফী নদীর তীরে কাছারির পরপারে একটা প্রকাণ্ড দোকানে আমি মাল যাচাই করছিলাম। জামা কাপড়

ব্যাগ প্রভৃতির দাম লণ্ডন—এমন কি কলিকাতা হ'তেও কম। কিন্তু বেজে গিয়েছিল একটা। ক্ষুধানলের দাহন জঠরে। উপরে একটা ভোজনালয়ের সঙ্কেত। কিন্তু এমন বন্ধ দুয়ার যে বনাত ভেলভেট ছিটও মেঝের জুতার

ট্রিনিটী কলেজ—ডাবলিন

বিপনীর ব্যূহ ভেদ করে তার সন্ধান পেতে গেলে অনুসন্ধান আবশ্যক। আমি একটু এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় দুটি যুবতী আমার উপর কৃপা-পরবশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁরা আমার কোনও উপকার করতে পারেন কিনা।

তাঁদের সঙ্গে গিয়ে একটি টেবিলে বসলাম। পান-ভোজনের সঙ্গে গল্প চললো। গল্প ভারত ও আয়রল্যাণ্ড ঘিরে। দুজনেই গ্র্যাজুয়েট। দুজনে একই সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। বেতন সাপ্তাহিক সাত পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের নিরানব্বই টাকা। ওদেশে বাড়ী ভাড়া, পোষাক প্রভৃতির মূল্য অধিক। সুতরাং অর্থ হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। বাস কণ্ডাক্টারেরও বেতন সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড। পাঁচ পাউণ্ডের কমে বিলাতে কোথাও বেতন নাই।

আমি এখানে কোন্ স্থান দেখেছি এবং কি দেখা কর্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা হল। শান্তশিষ্ট শিক্ষিতা মহিলা দুটি। আমি যেন তাদের বহুদিনের পরিচিত। এমন কি একজনের জননীর তিনটি সন্তান কিরূপে পর পর পরলোকগমন করেছিল সে কথাও একটি মেয়ে দরদ দিয়ে বিবৃত করলে। একজন পিতৃহীনা, অন্যের পিতা ব্যারিষ্টার।

ইংরাজ এমন কাজ করে না। জিজ্ঞাসা করলে খাবার জায়গা দেখিয়ে দেয় নিশ্চয়, কিন্তু তারা ত্রিনিটি কলেজের গ্র্যাজুয়েট হয়েও কত বেতন পায় এ সমাচার দেয় না এবং তাদের জননীর শোক-সন্তপ্ত জীবনের কোনো অধ্যায়ের বর্ণনা করে না অপরিচিত বিদেশীর সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টায়।

আমার কলিকাতার বন্ধু বহু বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। তখন ওদের গল্‌ফ ক্লাবে প্রতি-যোগিতা চলছিল। তথায় আমন্ত্রিত হ'লাম। সবাই আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করলে। কিন্তু বিশ্রম্ভালাপের সময় এক প্রসঙ্গ—ইংরাজ কর্তৃক উত্তর আয়ারল্যাণ্ড অপহরণ। আর একটা তথ্য সংগ্রহ করলাম। বহু আয়রিশ নর ইংলণ্ডে শ্রমিক এবং বহু নারী পরিচারিকারূপে কাজ করে। এ
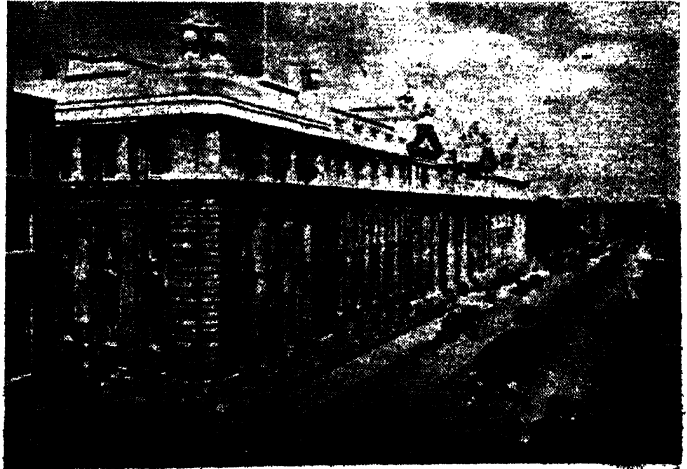
মেরিয়ন স্ট্রীটে গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ—ডাবলিন

ব্যাপারটা তাদের জাতীয় আত্মসম্মানের পক্ষে গ্লানির কথা। কিন্তু উপায় নাই। দেশ দরিদ্র।

তরুণীদের নির্দেশ মত সহরের বাহিরে ডাবলিন চিত্রশালায় গেলাম। সহর হতে অনতিদূরে। সেথায় চৈতন্য-

স্নানের ব্যবস্থা। নরনারী স্নান করছে। বালু বেলার এক রীতি—স্বল্পাদপি স্বল্প পোষাক। ডাবলিনের উপকণ্ঠে সাগর তীরে পল্লীতে রীতিমত বাস্ চলাচল করে। বিশ্রামের মনোরম স্থল। অবশ্য য়ুরোপের সর্বত্র যেমন ভোজনালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা—এ সৈকতেও তেমন।

ডাবলিনের ফিনিক্স্ পার্ক একাধারে অঙ্গে ধরে আছে চিড়িয়াখানা, প্রকাণ্ড বাগান এবং রম্য ভ্রমণের উঁচু নীচু পথ। একটি ক্ষুদ্র জল প্রবাহ এবং নাতি-উচ্চ শৈল এর শোভা বাড়িয়েছে। পশুশালায় কলিকাতা, লণ্ডন, এমন কি মহীশুর পশুশালার মত সংগ্রহ না থাকলেও, জীব জন্তু সুরক্ষিত। বিলাতের পশু পালকেরা নিজ নিজ পশুর সঙ্গে
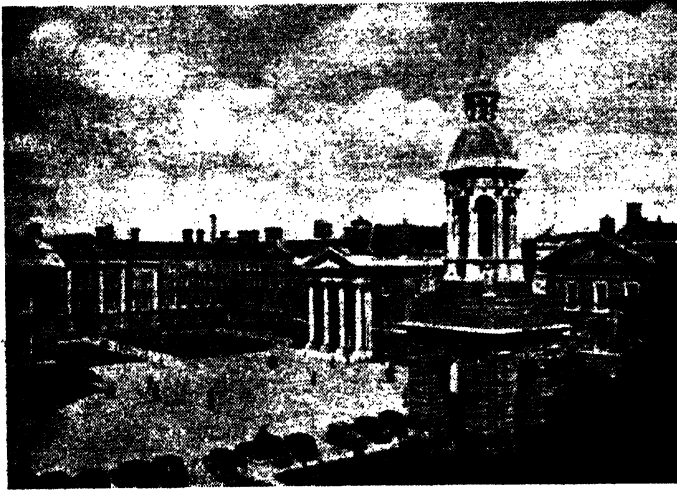
ট্রিনিটী কলেজের সম্মুখভাগ—ডাবলিন

বেশ বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এখানেও বন-মানুষ ও বড় বানরদের সঙ্গে একত্র বসে দ্বিপ্রহরে পশুশালার অধ্যক্ষ মধ্যাহ্ন ভোজন করে। জন্তুরা অবশ্য অনেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে নিজ নিজ চেয়ারে বসে। দু'একজন বানর প্রতিবেশীর পাত্র হ'তে কলা মূলা তুলে নেয়। তাহলেও তাদের শিক্ষা ও সংযম প্রশংসনীয়। চারিদিকে বেষ্টনীর বাহিরে দর্শকবৃন্দ উপভোগ করে এই অপূর্ব ভোজ। লণ্ডনের এ অনুষ্ঠান আরও বড়।

হাত্তীশালের একটি হস্তীকে নিয়ে তার রক্ষক সদাই খেলা দেখায়। সে ওঠে বসে। হাতী দর্শকের হাত হ'তে খাদ্য দ্রব্য নেয়। এ-খেলা কলিকাতাতেও চলে। কিন্তু যা' কোথাও দেখিনি বা শুনিনি সে অভিজ্ঞতা হ'ল হেথায়। আমি করীর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বল্লাম—এ আমার দেশের ভাই।

রক্ষী বল্লে—কিন্তু এখন এয়ারার অধিবাসী। এই দেখুন।

তার আদেশ মত হস্তী দাঁড়ালো এক তক্তায়। তার শুঁড়ে একটা ফ্লুট ধরলে রক্ষক। অবশ্য বাঁশী ডাহিনে বাঁয়ে চালাচ্ছিল মানুষ—কিন্তু ফুৎকার হস্তীর। সুন্দর সুর বাহির হ'ল সঙ্গীতের। দর্শকেরা স্থির হ'ল। সাহেবরা মাথার টুপি খুললে। কী ব্যাপার! সবাই নির্বাক। কী সঙ্গীত?

শেষে শুনলাম—হাতী বাজালো এয়ারার জাতীয় সঙ্গীত। গানের শেষে সবার মুখে হাঁসি। যুবতীরা আনন্দে নৃত্য করলে। আমি হস্তীর শুঁড় এবং হস্তী-রক্ষকের পিঠ চাপড়ালাম। ভারতের হাতী—এয়ারার জাতীয় সঙ্গীত—ভারতীয় পর্য্যটক এবং এয়ারার করী-সহচর—ভাবপ্রবণ স্বদেশ-ভক্ত আয়রিশ দর্শক—একটা হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপারের সৃষ্টি হ'ল। অবশ্য লাভবান হ'ল রক্ষক—কারণ ভারতীয় ও আয়রিশ সাধ্য-মত তাকে উপহার দিল।

ডাবলিন উত্তর দক্ষিণ লম্বা সহর। একে ভেদ করে পূর্ব-পশ্চিম চলেছে লিফ্ফী নদী। প্যারিসের সেনের মত এর দুদিক বাঁধা। বারোটি সেতু সহরের দুপার এক করেছে।

ওকনেল ষ্ট্রীট উত্তর দক্ষিণ চলেছে—অতি প্রশস্ত পথ। লিফ্ফীর উপর ওকনেল পুল—অপূর্ব। পথ প্রায় ১৫০ ফুট চওড়া—সেই স্থলটিই সহরের কেন্দ্র। লিফ্ফীর পারে দক্ষিণে কাছারী প্রভৃতি বিখ্যাত ইমারত।

ওকনেল সেতুর সন্নিকটে, বিশেষ দক্ষিণে, খুব বড় দোকান। চৌরঙ্গীর মত এস্থল জনস্রোতপূর্ণ। উত্তরে এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি।

ডাবলিনের গর্বের প্রতিষ্ঠান ত্রিনিটি কলেজ। এইটিই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজ অপেক্ষাকৃত নূতন সুদৃশ্য অট্টালিকা! ত্রিনিটি কলেজ বহু অট্টালিকায় পূর্ণ। প্রবেশ পথে দুটি প্রস্তরমূর্ত্তি বার্ক এবং গোল্ড-স্মিথের। ওকনেলের প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং উচ্চ নেলসন স্তম্ভ ও মূর্ত্তি সহরের শোভা সরকারী-দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং হতে বৃহৎ ও দৃষ্টি-সুখকর।

ডাবলিনের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং মেডিক্যাল কলেজ জগদ্বিখ্যাত। এখানে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করে এসেছেন আমাদের দেশের বহু প্রখ্যাত চিকিৎসক।

য়ুনিভারসিটির বিজ্ঞান ভবন—ডাবলিন

আমি একদিন দেল ই'রেন বা পার্লামেন্টে অল্পক্ষণের জন্য ছিলাম। তর্কের ফোয়ারা বেশ বলবান। রাজনীতি সর্বত্র বোধহয় সমান চাঞ্চল্যকর কাণ্ড।

পুরাতন প্রাসাদ, প্রকাণ্ড বাড়ি। বহু অট্টালিকা পূর্ণ সহর ডাবলিন। দুটি প্রোটেষ্টান্ট ক্যাথিড্রল বৃহৎ ধর্মভবন। অবশ্য কয়েকটি ক্যাথলিক গির্জা আছে।

একদিন এক ভদ্রলোক সহরের উত্তর পূর্ব প্রান্তে একটি নব-প্রতিষ্ঠিত সহরতলী দেখাতে নিয়ে গেলেন। পৌর সরকার এক রকমের বহু ইমারত গড়ছেন। কোনো বাড়ি দুই পরিবারের, কোনো বাড়ি চারটি পরিবারের। পরিষ্কার পল্লী। সেথায় দৈনিক ব্যবহার্য্য খাদ্য-দ্রব্যের বিপনী সরকারী-বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত। ভোজনালয়ও কয়েকটি আছে।

ডাবলিনের যাদুঘরে ওদের দেশের পুরাতন শিল্প

সম্ভারের সংগ্রহ আছে! আমাদের দেশের শিব-দুর্গা, বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি বিদ্যমান। তাদের বর্ণনা নির্ভুল নয়। আমার সময় ছিলনা তাই সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারিনি। সাহায্যের প্রস্তাব করলে হয়তো ওরা সহায়তা প্রত্যাখ্যান করত না।
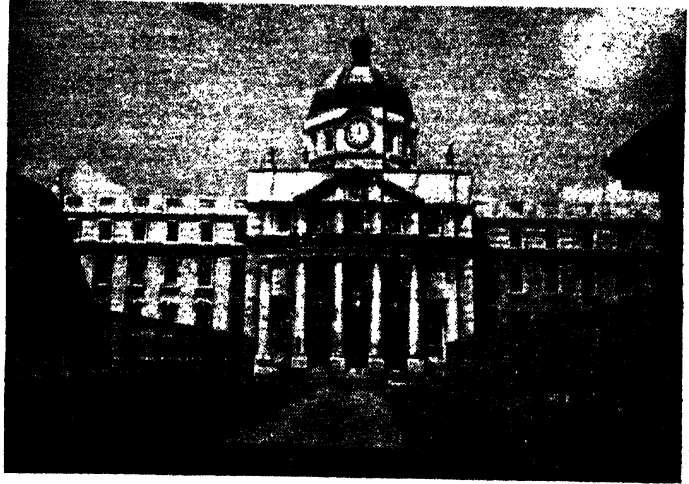
অবশ্য সিনেমা ও ক্রীড়ার স্থলের অভাব নাই। ত্রিনিটি কলেজের মধ্যে ছাত্রদের প্রশস্ত ক্রীড়াভূমি।

ডাবলিন ছোটো হলেও মনোরম। এদেশের মানুষের সৌজন্য চিত্তাকর্ষক। একটা ঘটনা বিবৃত করে বিদায় নেব।

আমি একদিন এক সিন্‌ফেন্‌ প্রতিনিধিকে বলেছিলাম —ওকনেল গান্ধী এয়ারার।

ভদ্রলোক বল্লেন—গান্ধী জগতের, ওকনেল, পারনেল ডেভেলেরা এয়ারার।

এর পর সাঁতার না শিখে জলে নামব না—কথার উল্লেখ ক'রে যে এয়ারার রসহীনতার দৃষ্টান্ত দেয় তাকে প্রশংসা করা অবিধেয়।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভরত সারাদিন ধান কাটিয়া, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া মনিব-বাড়ীর খামারে লইয়াছে। সন্ধ্যার পর আসিয়া অবসন্ন দেহে হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছে—কতকগুলি মুড়ি লঙ্কা ও তেলেভাজা লইয়া খাইতে বসিয়াছিল—তাহার মনে হইল একটু পচুই না খাইলে আর কাল কাজ করা যাইবে না। সে ছেলেকে রাঁধিতে বলিয়া পাড়ায় পচুই সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সেই সময়ে নটবরের বাড়ীতে যাইয়া সে আদুরীকে দেখিয়া আসিয়াছে—সন্ধ্যার সময় তেল দিয়া চুল বাঁধিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিয়া সে বসিয়া আছে—সোহাগী আর তাহার মা রাঁধিতেছে। এই প্রসাধন যে কাহার জন্য তাহা সে বহুদিন সন্দেহ করিয়াছে। নটবরের বাড়ী হইতেই সে পচুই লইয়া আসিয়াছিল। রাত্রে উনুনের নিকটে অপেক্ষাকৃত গরম স্থানটায় কাপড়ের খুট গায়ে দিয়া সে পচুই মদ্য সহ মুড়ি খাইতেছিল।

ভাত নামিলে ছেলেটাকে খাইতে দিয়া সেও খাইয়া লইল। ক্লান্ত দেহে নেশার ঘোরে একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। একটু একটু শীত পড়িয়াছে—কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিবে প্রহরেক রাত্রির পরে—মনে মনে ভাবিতেছিল সে আদুরীর কথা, আদুরী এত আদরেও কেন তাহার ঘরে আসিতে চায় না—

গভীর রাত্রি।

চারিদিকে নিঝুম—দূরের বনশ্রেণী কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদের আলোয় তন্দ্রালস। নিশাচর দুই একটি পাখী ডাকিয়া পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগাইতেছে। নিদ্রাহারা চাঁদ পৃথিবীর ধূসর মৃত্তিকার পানে চাহিয়া আছে পরম বিস্ময়ে—রাত্রের নীরব নির্জ্জন কোলের মাঝে চলিতেছে জীব-জগতের হাসি, কান্না, ক্ষুধা, নিদ্রার ক্রমিক আবর্ত্তন—

ভরত সহসা জাগিয়া গেল—উঠানের অর্দ্ধেক চাঁদের আলোয় সুস্পষ্ট সুন্দর। গরু দুইটি রোমন্থন-রত, পরম আলস্যভরে পুচ্ছ তাড়না করিতেছে। দূরাগত একটা বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসিয়া মনটাকে যেন উদাস করিয়া দিতেছে—বিরহীর বেদনা যেন বাঁশীর সুর তরঙ্গে দূর দিগন্তে ফাটিয়া পড়িতেছে—

ধীরে ধীরে বাঁশী নীরব হইল—পৃথিবী নিঝুম। ভরত বাহিরে আসিল—আকাশে অগণ্য তারা, শুভ্র ছেঁড়া মেঘের টুকরা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সহসা তাহার মনে হইল—এ বাঁশী আদাড়ী ঠাকুরের, সেইত নিশীথ রাত্রে বাঁশী বাজাইয়া পরী সাধন করে। ভরতের মনে হইল—সে আজ দেখিয়াই আসিবে কেমন সে পেত্নী। জীবনে তাহার ত কিছুই নাই—আদুরী যদি ঘরে না আসিল, তবে জীবন তাহার বৃথা—

কতকটা ঈর্ষ্যায়, কতকটা সন্দেহে ও মোহে, কতকটা মদের ক্রিয়ায় সে একখানা লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল! কাঁথাখানা মুড়ি দিয়া, মাঠের কোলে কোলে পথ ধরিয়া আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

ঘরের পিছনে একটা সরু গাছের সঙ্গে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—শুনিল—ঘরের মাঝে গল্প হইতেছে—একটি কণ্ঠ আদাড়ীর, কিন্তু অন্যটি নারীকণ্ঠ—

—কে? পরী? পেত্নী—আদাড়ী কি সত্যই তবে পরী-সাধনে সিদ্ধ হইয়াছে—

সহসা সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—নিশীথ রাত্রি নীরব নিঃশব্দ···একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের মাঝে ঢিপ ঢিপ করিতেছে—

ভরত ভাবিল—সবই ত গিয়াছে তবে আর কেন? সে ধীরে ধীরে জানালায় কাণ পাতিল।

—কার কণ্ঠস্বর! এ যে আদুরী—

সে সুস্পষ্ট শুনিল—আদুরী কহিতেছে, বেশীক্ষণ থাকবো না ঠাকুর। ভরত পিছু লেগেছে কখন কি করে—

—কি বলছে

—সাঙ্গা ক'রবেক—মু ত সাঙ্গা ক'রবেক নাই—

—সাঙ্গা করবি না?

—না, তু ত মোর সাঙ্গা ঠাকুর—জাত জন্ম ত' তু খেয়েছিস্। আর সাঙ্গা মিলবে কেনে ?

—তুই জাত জন্ম জনম্ দিলি কেনে ?

—তু যে বেবাগী হতে চলেছিস্—

ভরত ধৈর্য্য ধরিয়া আর শুনিতে পারিল না! তাহার সন্দেহ ত সত্য! আহুরী এই জন্মই সাঙ্গা করিতে চায় না। সে বনের মাঝে পায়ে-চলা-পথটার ধারে কাঁথা মুড়ি দিয়া বসিয়া রহিল।

আদাড়ী ঠাকুর আবার বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। পরিপূর্ণ একটা প্রফুল্ল স্বর আপনমনে খেলিয়া বেড়াইতেছে, কিছুক্ষণ পরেই আহুরী ভরতের গায়ের অতি সন্নিকট দিয়া ধীরে ধীরে মাঠে আসিয়া থামিল। ভরতও নিঃশব্দ চরণে পিছু পিছু আসিতে লাগিল—আশ্চর্য্য, আহুরী স্ত্রীলোক—সে এত দ্রুত যাইতে পারে! মাঠের পর শালবন, তাহার ভিতর দিয়াই বাগ্দী পাড়ায় যাইবার পথ—আহুরী সেই পথেই চলিতেছিল। ভরত নিঃশব্দে তাহার পিছনে যাইতে যাইতে, বনের সন্নিকটে আহুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পিছু হইতে ডাকিল—আহুরী—

আহুরী চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল—তু কে ? ভরত।

—হ্যাঁ—ভরত। তু দাঁড়া—

আহুরী কহিল—কেনে ? সাঙ্গা করবি ?

ভরত আহুরীর প্রশ্নে অবাক হইয়া গেল—এমনভাবে ধরা পড়িয়া সে যে এমন স্বচ্ছন্দে ও সরল চিত্তে ব্যঙ্গ করিতে পারে তাহা ভরত ভাবে নাই। ভরত শুধু কহিল—তু দাঁড়া, কটা কথা বল্‌বেক।

—ঠাকুরের হোথা, অনেক দেরী হ'ল। কি বলবি তু বল—বাবা মা জেগে যাবেক—

ভরত কি বলিবে ঠিক বুঝিতে পারিল না, আহুরী বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা ভীত না হওয়ায় ভরতই লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে থামিয়া থামিয়া কহিল—তু পেত্নী হ'য়ে ভয় দেখাতে লারবেক আর—

—ভয় তু পাবি কেনে ? তু মরদ—

—ঠাকুর তোর কে ? তু হোথা যাবি কেনে!

—ঠাকুর ত মোর সাঙ্গা, যাবেক না কেনে ?

—মু, জমিদারকে বলে দেবেক—

—দে, মোরা দেশান্তরী হ'য়ে যাবেক—

ভরত সবিস্ময়ে কহিল—দেশান্তরী হবেক, মোকে সাঙ্গা করবেক নাই—

—ক'রবেক নাই কেনে ? ঠাকুরের হোথা মু যাবেকই, তু যদি সাঙ্গা করবি কর না কেনে—

ভরত না ভাবিয়াই কহিল—বেশ, মু সাঙ্গা করবেক—রোজ যাবি না ত ?

আহুরী কহিল—না, কাল কাঠ কাটতে যাবি হোথা সব বল্‌বেক—সাঁজে যাবি—

দ্বিতীয় কিছু না বলিয়া আহুরী মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভরত অবাক বিস্ময়ে বনশ্রেণীর কোলে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—আশ্চর্য্য এই আহুরী, ভয় লজ্জা সংকোচ কিছুই তাহার নাই, যেন একটা নেশার ঘোরে জীবনটাকে চালাইয়া লইতেছে—

এক পায়ে দুই পায়ে ভরত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু একটা অজ্ঞাত প্রদাহ মনটাকে উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আহুরী তাহাকে সাঙ্গা করিতে পারে; কিন্তু আদাড়ীকে সে ছাড়িতে পারিবে না, এই সর্ত্তে সে যদি সাঙ্গা করে তবে সে সাঙ্গা করিতে পারে। কিন্তু সে সাঙ্গা করিয়া লাভ কি ? সে আপনার হইল না, গৃহে থাকিল মাত্র!

পরদিন ধান কাটিতে কাটিতে ভরত বার বার বেলার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাঠ সংগ্রহ করিতে বনে যাইতে হইবে—আহুরী তাহার কথা জানাইবে। ভরত ধান বোঝাই গাড়ীখানা খামারবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া মনিবকে কহিল, সে বাড়ী যাইবে, কাঠ না সংগ্রহ করিলে রাঁধিবার উপায় নাই।

বাড়ীতে আসিয়া দেখে ছেলেটা গরু আনিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ভরত তাহাদিগকে দুই আঁটি খড় দিয়া কাটারী হাতে বনের দিকে রওনা দিল। তখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। বনের কোলে স্বর্ণবর্ণ ধানের ক্ষেতে শীতের অপরাহ্ণ রৌদ্র চিক্‌মিক করিতেছে। ভরত বার বার পথের পানে চাহিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিল—কাটিতে কাটিতে প্রায় দুই বোঝা কাঠ সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। সে সময়ের অপচয় না করিয়া এক বোঝা বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। দ্বিতীয় বার বোঝা বাঁধিয়া সে যখন যাইবার জন্ম প্রস্তুত

হইয়াছে তখন প্রায় সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব লাল হইয়া পশ্চিমের উচ্চ ভূমির পলাশ গাছগুলির আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—ভরত দেখিল চুপড়ী মাথায় করিয়া আদুরী তাহার দিকেই আসিতেছে।

ভরত অপেক্ষা করিতেছিল—আদুরী আসিয়া কহিল—তু দাঁড়া ভরত, কাঠ কেটে লি—

—আমি দেব—তুলে—

দুইজনের চেষ্টায় মুহূর্ত্তে একবোঝা কাঠ হইয়া গেল। বনের লতা কাটিয়া তাহাকে বোঝাটা বাঁধিয়া দিয়া ভরত কহিল—তু কাঠ কেটে ক'বে মোর ঘরকে যাবি?

আদুরী অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে কহিল—তোর ঘরকে যাবেক, কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়বেক নাই। বল—তু কিছু বলবেক নাই—

ভরত এই প্রশ্নটা ভাবিয়াছে বহুবার—কিন্তু অন্তরে সাড়া দেয় নাই। তাহার পর ভাবিয়াছে—দু'চার দিন একসঙ্গে ঘর করিলে তাহার পর আপনিই তাহার মোহ কাটিয়া যাইবে। ছেলে-পুলে হইলে নিশ্চয়ই আর কোথাও যাইবে না। ভরত কহিল—তু পারবি, মোর ঘরকে যেয়ে ঠাকুরের ঘর যেতে—

আদুরী আকস্মিক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে জানিত ভরত বোকা, তাহাকে যেমন করিয়া হয় বুঝাইয়া দেওয়া যায়—কিন্তু যেখানে সত্যকার আন্তরিক আবেদন সেখানে শঠতা চলে না। আদুরী থমকিয়া গেল,—একটুক্ষণ ভরতের মুখের পানে চাহিয়া কহিল—তু ত সাঙ্গা করবি, মোর তরে তু ত কাঁদছিস্—মুই রাড়ী বাগ্দী, মোর তরে বামুন ঠাকুর কাঁদবেক, বাঁশী বাজিয়ে বাউরী হ'য়ে যাবেক—আমি কি ক'রবেক বল্—

—ঠাকুর তোকে ভালবাসে—

আদুরী অবাক হইয়া ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কহিল—ভালবাসে—একদিন না গেলে কত ব্যথা পায়, মু তাই ত সাঙ্গা করতে নারি।

আদুরী হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল—ভরত তু ছাড় মোর আশা—মু ম'রবেক, ঘর মোর আর হবেক নাই—

ভরত আদুরীর চোখে জল দেখিয়া বিহ্বলের মত সান্ত্বনা দিয়া কহিল—তু চল্ আদুরী, বাড়ী চল্, উঠ্—

ভরত আদুরীর বোঝাটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া, নিজের বোঝা লইয়া পুনরায় কহিল—চল্ আদুরী চল্—কাঁদিস্ না।

আদুরী চলিতে লাগিল—পিছন পিছন ভরত আসিতেছে। ভরত কহিল—কাঁদিস্ না। মোর ঘরকে চল্, দুজনে সোনার ধান ফলাবেক, ঘর করবেক—ঠাকুর ভুলে যাবেক তোর কথা—তু ভুলবি—আশনাই চিরদিন ত থাকবেক নাই—

আদুরী কহিল—নারে—ভরত। ভুলব নাই, ঠাকুর মোর সব নিয়েছে রে। আদুরী চোখের জল মুছিয়া কহিল—তু ত মোকে সাঙ্গা করবি, মোর প্রাণ ত পাবেক নাই—

ভরত পরম উৎসাহে কহিল—তোর প্রাণ মু আপনার করে লেবেক।

আদুরী আর কথা কহিল না। আগে আগে চলিতে চলিতে কহিল—তু যা—একসঙ্গে যাবেক নাই—

আদুরীর ইচ্ছা নয় সে ভরতের সঙ্গে একসঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করে, লোকে হয়ত নানা কথা বলিতে পারে। ভরত তাই কাষ্ঠ ভার মাথায় লইয়া দ্রুত গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পৌছিল।

তাহাদের আলোচনা আজকার মত স্থগিত থাকিল। আদুরীর আকস্মিক কান্নায় কিছুই স্থির হইল না।

মতিঠাকুর মহাশয় গোপালের বিবাহ স্থির করিতে যাইবেন, সঙ্গে যাইবেন সারদা মল্লিক, তাহারই শ্যালী-কন্যার সহিত সম্বন্ধ। ক'নে দেখিয়া সেটা পাকা করিয়া আসিতে হইবে। রাস্তা বেশী নয়—ক্রোশ আষ্টেক। ভোরে রওনা দিলে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পৌছান যাইবে। এবং বৈকালে ক'নে দেখা প্রভৃতি শেষ করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে আসা যাইবে। এই দুইদিন গোপালই দেবসেবা করিবে। গৃহ, দেবসেবা ও পূজা-পার্ব্বণের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। ভগবতীকে মতিঠাকুর তাহাই জানাইতে আসিয়াছিলেন—

ভগবতী বলিলেন—বেশ বেশ, গোপালের বিয়ে। মেয়ে-বাড়ীর অবস্থা কি রকম।

—সাধারণ, আমাদেরই মত, তা ছাড়া আর কি হবে—সারদার শ্যালীকন্যা—

—কিন্তু সে যাই হোক্, বরযাত্রী দুই তিনশ যাবে এটা বলে আস্‌বেন—

—অত বরযাত্রী কোথায়? আর নিয়ে যাবই বা কি ক'রে?

—সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে ঠাকুর মশায়, ভগবতী চাটুয্যের পুরুতের বাড়ীর বিয়ে, সেটাত শাঁক বাজিয়ে সারা যাবে না—

মতি ঠাকুর স্মিত হাস্যে কহিলেন—সে না হয় দেখা যাবে, আগে মেয়েটাকে দেখে আসি—

—হ্যাঁ সেই ভাল—কালই যাবেন তা হলে।

—হ্যাঁ, দিনটা ভাল আছে, আর এ সব কাজে দেরী ক'রতে নেই, এই হচ্ছে বিধি।

যাহা হউক পরের দিন প্রত্যুষে মতি ঠাকুর ও সারদা মল্লিক গোপালের বিবাহ ঠিক করিতে রওনা দিলেন। দ্বিপ্রহরে পাশার আড্ডা বসিল কিন্তু আড্ডা আজ ম্রিয়মাণ, সারদা না থাকায় পাশা জমিল না—অপরাহ্নের রৌদ্র যখন পশ্চিমের পলাশ গাছের উপর দিয়া নাটমন্দিরের পশ্চিমের অর্দ্ধেকে পড়িয়াছে এবং বিচরণান্তে আশ্রিত পাখীগুলি গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে তখন পাশা ছাড়িয়া দিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন—থাক্, আজ আর নয়।

ধীরে ধীরে গল্প আরম্ভ হইল—গল্পের শেষ পরিণতি ভূতের গল্প—পরিশেষে ভূত প্রেত ও তান্ত্রিক সাধনা প্রভৃতির কথা আরম্ভ হইল। প্রিয়নাথ কহিলেন—আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছি—তন্ত্র ছাড়া মন্ত্র নাই। তিনি একবার কাশীধামে যাচ্ছিলেন, পায়ে হাঁটিয়া, তখনও কোম্পানীর গাড়ী হয় নাই। পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক ভৈরবীর সঙ্গে দেখা—ভৈরবী তার সঙ্গ ধরল। একদিন চল্‌তে চল্‌তে আর পথ ফুরায় না, সন্ধ্যা হ'য়েছে, কোন গ্রামের চিহ্নও নাই, গুরুদেব একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন, তার পরে পশ্চিমে মেঘ ক'রে ঝড় উঠ্‌লো, তিনি ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ব'ল্‌লেন—কি হবে মা আজ? আজ ত রক্ষা নেই—

ভৈরবী হেসে ব'ললেন—ভয় কি বাবা! এই বটতলায় দু'জন থাক্‌বো। ভিজবে না—

—ভিজলে ত না হয় চলে, কিন্তু সারাদিন হেঁটে না খেলে ত চলে না—

—সে হবে, তার জন্যে কি? জগদম্বা সব ব্যবস্থা করবেন। এদিকে মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লো, ঝড় উঠ্‌লো। ভৈরবী বললেন, এই বটতলাতেই থাক্‌তে হবে বাছা। ভৈরবী বটগাছটার চারিপাশে ঘুরে আস্‌লেন—ঝড় সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি, কিন্তু আশ্চর্য্য ভৈরবীর দেওয়া গণ্ডীর মাঝে একফোঁটা বৃষ্টি পড়লো না, গাছের পাতাটি পড়ল না, অথচ আশে পাশের গাছ ভেঙ্গে উপ্‌ড়ে একাকার হ'য়ে গেল।

পথশ্রমে আমার ঠাকুর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন, জেগে দেখেন—গভীর রাত্রি ভৈরবী ডাক্‌ছেন—খেয়ে নে বাবা!

দেখেন ভাত, তরকারী, ডাল গরম রয়েছে। এ সবত কিছুই ছিল না। মাঠের মাঝে ভৈরবী কোথায় এসব পেলে, ভেবে ঠাকুর বললেন—এসব কি বিভূতি মা! পেলে কোথায়? তুমিইত সাক্ষাৎ জগদম্বা, তুমিই চরণে স্থান দাও, কাশীতে আর কেন যাবো?

ভৈরবী হেসে ব'ললেন—খেয়ে নে—খেয়ে নে—.

ঠাকুর খেয়ে নিলেন—প্রদীপ জ্বলছিল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন—ভৈরবী আর ভৈরবী নেই—পরমাসুন্দরী যুবতী হ'য়ে, অপূর্ব বেশভূষায় অনিন্দ্যসুন্দর রূপে সম্মুখে বসে আছেন। ঠাকুর ব'ললেন—মা, তুমি কে মা? আমায় ছলনা কর না, বল মা—

ভৈরবী ব'ললেন—কাল ব'ল্‌বো। খেয়ে ঘুমো—বুঝলি। ঠাকুর খেয়ে ঘুমুলেন; পরের দিন ভোরে উঠে দেখেন ভৈরবী নেই। কোথাও তার চিহ্ন নেই।

পার্ব্বতী কহিলেন—অমন হয়, তন্ত্রের শক্তি অসাধারণ, যারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন তারা সবই ক'রতে পারেন। ঐ ত মদনপুরের জয়রাম পাঠক নাকি ভূতের পাল্কী চড়ে শিষ্য বাড়ী যেতেন—আজ আছেন এখানে, কাল ভোরে বিশক্রোশ দূরে দেখা যেত। রাত্রে ভূতের পাল্কী চ'ড়ে মুহূর্ত্তে চলে যেতেন।

হরিপদ কহিল—ও রকম শোনা যায় দাদা, কিন্তু স্বচোক্ষে না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না। এত ঘুরি ফিরি, রাত বেরাতে চলি, কিছুত দেখতে পাইনি—কোনদিন—

হ্যাঁ তবে একবার হ'য়েছিল। একবার আস্‌ছি গোবিন্দ

তিনি আর আমি সুজনপুরের হাট থেকে, রাত অনেক হ'য়ে গেল পথে। জোছনা রাত, ভেবেছিলাম তাহলে মাসিবাড়ী থাক্‌বো—পথে দেখি একটা ষাড় ফোঁস্ ফোঁস্ করছে—হৈ হৈ করে তাড়া দিলাম—কিন্তু নড়ে না মুখ তুলে তাকালো—দেখি মুখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। গোবিন্দ ব'ললে—দাদা নাম জপ করো গোদান। বললুম—না, ষাঁড় তাড়া দাও—আবার হৈ হৈ করলুম—এবার সেটা তেড়ে এলো। দু'জনে দৌড়, যতই দৌড় দি সে পেছনেই আছে। গোবিন্দ প্রাণপণে ঠাকুরের নাম ক'রছে—

আদাড়ী ঠাকুর অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী কহিলেন—ব'সো আদাড়ী। গোদানের গল্প হচ্ছে—

গল্প চলিল—আমিও গায়ত্রী জপ ক'রতে লাগ্‌লাম। একটা জোল ছিল—জলভরা। সেটাকে লাফ দিয়ে পার হ'য়ে এসে দাঁড়ালুম এক গাছের তলায়, আর ছুটতে পারি না। গোদানটা জলের পাড়ে দাঁড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস ক'রলে, তার পর ব'ললে, না ছেড়ে দিলুম—তার পরেই দেখি কিছু নেই—

ভগবতী কহিলেন—স্বচোক্ষে দেখ্‌লে

—দেখলাম মানে? ছুটতে ছুটতে প্রাণ যায়—গোবিন্দর কাছে শুনবেন।

ভগবতী কহিলেন—কি বল আদাড়ী, গোদান কি আছে?

আদাড়ী সোৎসাহে কহিল—আছে বৈকি? অপঘাত মৃত্যু হ'লেই সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়—

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—তোমার সেই পেত্নীর ব্যাপারটা কি বলত আদাড়ী।

—ঐ রকমই, মন্ত্র তন্ত্র কিছু শিখেছিলাম গুরুর কাছে, তাই ওসব ভয় নেই। মন্ত্রবলে ওদের আনা যায়—

—সাক্ষাৎ দেখাতে পারো?

—হাঁ৷ পারি বৈকি? তবে বেশী লোক থাক্‌লে কাছেত আসবে না—দূরে দেখান যায়।

—আজ পারবে—

—আজ? হাঁ মঙ্গলবার আছে, বোধহয় কৃষ্ণা চতুর্থী ভরণী নক্ষত্র। আজ হবে—

—বেশ কখন যাবো—

—এই জোছনা উঠলেই, নইলে ত দেখা যাবে না—

আলোচনায় কথাটা গুরুত্ব লাভ করিল এবং স্থির হইল, সকলে জোছনা উঠিলে আদাড়ীর বাড়ীতে যাইবেন এবং সাক্ষাৎ পেত্নীর আগমন প্রত্যক্ষ করিবেন।

আদাড়ী একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—কিন্তু একটী কথা আমি যেখানে বসিয়ে দেব সে আসন ত্যাগ করে উঠ্‌তে পারবেন না—যখন বল্‌বো তখন উঠ্‌বেন। নইলে আমি আপনাদের প্রাণের জন্য দায়ী নয়—আসন ছেড়ে উঠ্‌লেই ঘাড় মটকে দেবে—আর যাই দেখুন কিছু বল্‌বেন না—চীৎকার করা, কথা বলা, কিছু না। তবে ভয় নেই, আমি থাকতে ক্ষতি হবে না—

প্রিয়নাথ কহিলেন—কতদূরে থাক্‌বে?

—মাঠের মাঝেই সাধারণতঃ থাকে, তবে চেষ্টা করবো বাড়ীর উঠানের নীচে ওই জামরুল গাছতলা পর্য্যন্ত আন্‌তে—পাশে ঝোপঝাড় আছে হয়ত আসতেও পারে—কারণ আশ্রয় নাপেলে ওরা আসে না—

ভগবতী কহিলেন—বেশ তাই। জোছনা উঠ্‌লে যাবো সব—যাবে ত খুড়ো—

—যাব বই কি?

আদাড়ী কহিল—সাত জনের বেশী নয় এবং অশৌচ অবস্থায় যেন কেউ না থাকেন—কাপড় চোপড় ধোয়া থাকা চাই—

সমস্ত কথা পাকা হইয়া গেল—

ক্রমশঃ

সত্তাবাদ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

লুই লাভেল

লুই লাভেল কলেজ দে ফ্রান্সের অধ্যাপক—বার্গস' এবং লি রয়ের পরবর্তী। তিনি সার-বাদের (Essentialism) সহিত সত্তাবাদের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। প্লেটোর মতে মানুষ সামান্য-জগতের অংশভাক্। লাভেল এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই অংশ-ভজন মত তাঁহার দর্শনের বিশেষত্ব। যাবতীয় সত্তাবান বস্তু উদ্ভূত হয় এক পরিপূর্ণ সত্তা হইতে। এই সত্তা অনন্ত ও অসতের সহিত সংস্পর্শহীন। তিনি বিশুদ্ধ ক্রিয়া (Pure Act)। তিনি চিৎ—অর্থাৎ সংবিদ। সংবিদ ক্রিয়া, বস্তু নহে। মানুষও চিৎ পদার্থ, কিন্তু তাহার সংবিদ সান্ত। বিশুদ্ধ সংবিদ তাহা নহে। উৎপত্তিকালে মানুষ সংবিদ-হীন। ক্রমে ক্রমে সংবিদের আবির্ভাব হয়। উৎপত্তিকালে যে সকল সম্ভাবনা তাহাতে নিহিত থাকে, তাহাদের বিকাশের সহিত সংবিদেরও বিকাশ হয়। মানুষ চিরকালই দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। বিশুদ্ধ ক্রিয়া আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত—তাঁহার কোনও কারণ নাই। তাঁহার ক্রিয়া সনাতন—তিনি অবিশ্রাম আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। যাহাদিগের অস্তিত্ব আছে, তাহারা সকলেই এই ক্রিয়ারই অংশ। এই বিশুদ্ধ-ক্রিয়াদ্বারা যাবতীয় সত্তাবান বস্তুর সত্তা রচিত হইতেছে। তাঁহা ব্যতীত কিছুই সত্তাবান হইতে পারে না। তিনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। জগতের প্রত্যেক অংশের সত্তা তাঁহারই সত্তা। যাহারা তাঁহার বিষয় অবগত আছেন, কেবল তাহাদের নিকট যাহা কিছু সৎ, তাহার সার-আছে। অন্য সকলের নিকট সৎ কেবল প্রতিভাসের সমষ্টি। সার-দিগের ঈশ্বর-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অথবা অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই সম্ভাবনারও অস্তিত্ব আছে। যাবতীয় বস্তু বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপী ঈশ্বরের সত্তার অংশভাক্ বলিয়া, তাঁহার ক্রিয়ারও অংশভাক্। তিনি স্বাধীন ক্রিয়া; তাঁহার স্বাধীনতা তিনি তাঁহার সৃষ্টপদার্থে সংক্রামিত করেন। সুতরাং তাঁহার ক্রিয়া হইতে যে সকল সত্তার উৎপত্তি হয়, তাহারা আপনা-দিগকে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। লাভেলের মতে সংবিদ দেহের সহিত সংযুক্ত কোনও বস্তু নহে। জীবাত্মা একটি শূন্য রূপ মাত্র, যাহা অনাত্মাকর্তৃক পুষ্ট হয়। অনাত্মার নিকট আপনাকে উপস্থিত করিবার যে বৃত্তি, (অর্থাৎ অনাত্মা-সম্বন্ধী জ্ঞানের বৃত্তি) তাহাই আত্মা। সুতরাং দেহ-বিমুক্ত এবং সমগ্র বিশ্বের অনুভববর্জিত আত্মার কোনও বাস্তবতা নাই। ইহার কারণ ইহা নহে যে—দেহ হইতে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে আত্মা উদ্ভূত হয়; ইহার কারণ এই, যে জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া আমাদিগকে বুঝিতে পারাই সংবিদ, এবং দেহ ব্যতীত তাহা সম্ভবপর হয় না। এই জন্য মানুষ জড়ের মধ্যে Engaged। জড়ই মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিধান করে। জড়ের বাধা অতিক্রম করিয়া একমেবাদ্বিতীয়মের (One) বিশুদ্ধি-প্রাপ্তির চেষ্টাই মানুষের কাজ ইচ্ছার ক্রিয়াদ্বারা সে আপনাকে আত্মা (spirit) রূপে ঘোষণা করে এবং তাহাদ্বারা বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপী ঈশ্বরের ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। বুদ্ধির সাহায্যে সে ব্যক্তিত্বের বন্ধন অতিক্রম করিয়া সার্ব্বিকের (Universal) ধারণা করিতে এবং ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া সেই সার্ব্বিকের অংশভাক্ হইতে সক্ষম হয়।

এই মতের উপর লাভেলের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। মানুষ স্বাধীন, মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে একটি বাছিয়া লয়, ইহা অন্যান্য Existentialist দিগের মতো লাভেলেরও মত। কিন্তু তাঁহার মতে মানুষের এই সৃষ্টি স্রষ্টার বিশুদ্ধ ক্রিয়ারই অংশ। "যে স্বাধীনতা হইতে স্বাধীনতা নিজে উদ্ভূত হয়" (a liberty which gives rise to itself) তাহাকেই তিনি সংবিদ বলিয়াছেন। সার্ত্রের মতো তিনি এই সৃষ্টির মূলে, আমাদের আয়ত্তের বহির্ভূত, সংবিদের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্তী কোনও অজ্ঞাত রহস্যমূলক ঐচ্ছিক নির্দ্ধারণের (Option) সংঘটন স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—চিন্তা করা এবং নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একই কথা। যে ক্রিয়ার ফলে আমি আমাকে জানি এবং যে ক্রিয়াদ্বারা আমি আমাকে সৃষ্টি করি—উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ঈশ্বরের ক্রিয়া যেমন জগতে অবিরাম নূতন সত্তার সৃষ্টি করিতেছে, আমিও তেমনি আমার মনোযোগ (attention) দ্বারা নিজের মধ্যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। ঈশ্বর যেমন জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, তেমনি আমার সংবিদের ক্রিয়াদ্বারা আমিও আমাকে সৃষ্টি করিতেছি। আপনাকে জানার অর্থ কোনও একটি বস্তুর আবিষ্কার ও বর্ণনা নহে; আপনার অন্তঃস্থিত অব্যক্ত জীবনকে উদ্বুদ্ধ করা। আমার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে, সংবিদ তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া সক্রিয় করে। ইহা যেমন আমার অন্তরের বিশ্লেষণ, তেমনি প্রকাশনও বটে। আত্মা কোনও বস্তু নহে। ভবনের ক্ষমতা, অর্থাৎ নূতন কিছু হওয়ার সামর্থ্য ব্যতীত আত্মার মধ্যে কি[illegible] নাই। আত্মা যখন এই শক্তির ব্যবহার করিয়া আপনাকে প্রকাশি[illegible] করে, তখন ভিন্ন আপনাকে জানিতে পারে না। আপনার প্রকাশ দ্বারাই আত্মা বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকাশদ্বারাই আত্মা অন্যে[illegible] নিকট প্রকাশিত হয়। আত্মার এই প্রকাশই স্মৃতির বিষয়। কি[illegible] মানুষের এই স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। জগতের কেন্দ্রস্থিত বিশুদ্ধ অ-সত্তে[illegible] স্বাধীনতা অসীম—কিছু দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা

প্রতিষ্ঠিত—যে সত্তা সে অঙ্গের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যে সত্তা তাহার বস্তুতঃ আছে—তাহার উপর।। ঈশ্বর যেভাবে জগতের সৃষ্টি করেন, সেই ভাবে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করি; কিন্তু তাহার জন্য স্বাধীন ইচ্ছাদ্বারা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে সত্তাবান্ জগৎ হইতে কাজ সুরু করিতে হয়। জগতের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তায় পৌছিতে পারি। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। বিশুদ্ধ সত্তার অংশভজন হইতে যাহা উদ্ভূত হয়, তাহা কোনও বস্তু নহে; তাহা সৃজনকারী শক্তি। আত্মা কোনও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত সৎবস্তু নহে, আত্মা পূর্ণতাভিমুখী শক্তি; শেষ দিন পর্য্যন্ত পূর্ণতার অনুসরণ চলিতে থাকিবে; পদে পদে আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

লাভেল প্লেটোপন্থী। মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে, ইহা স্বীকার করিলেও, তিনি মানুষের সারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। তিনি মানুষের সারকে অস্তিত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করেন। মানুষের সম্মুখে বহু সম্ভাবনা বর্ত্তমান; তাহার একটিকে রূপায়িত করাই মানুষের কাজ। সম্ভাবনার রাজ্য হইতে একটিকে টানিয়া আনিয়া নিজের জীবনে বাস্তবে পরিণত করাই তাহার সৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শের অস্তিত্ব আছে। তাহার মধ্যে প্রজ্ঞাবান্ মানুষের অধিগম্য যাবতীয় গুণই আছে। তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও শাশ্বত। আমরা আমাদিগকে কোন্ রূপে রূপায়িত করিব, তাহা জানিবার জন্য এই আদর্শের দিকে চাহিতে হয়। সে আদর্শ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সার প্রত্যেকে বাছিয়া লয় সত্য। কিন্তু এই নির্দ্ধারণ প্রত্যেকের পিতা-মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বোপার্জ্জিত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সকলের পক্ষে সকল প্রকার বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত নহে। সুতরাং বলিতে হয়, প্রত্যেকেই তাহার স্বাধীনতার ব্যবহারের পূর্ব্বে এক প্রকার 'সার' লইয়া জন্মগ্রহণ করে। স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার দ্বারা এই সারের সম্ভাব্য নানাবিধ বিকাশের মধ্যে একটি মাত্র আমরা বাছিয়া লই। প্রত্যেকের পক্ষে যে সার সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা বাছিয়া লওয়াই তাহার প্রধান কাজ।

লাভেল প্লেটোর মতো এক চিন্তারাজ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে প্রত্যয়গণ সেই রাজ্যের উপাদান। প্রত্যয়দিগকে আমরা সৃষ্টি করি না। তাহারা সনাতন। তাহারা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সেই প্রত্যয়-জগতে যাবতীয় সম্ভাবনা অবস্থিত। এই সকল সম্ভাব্য রূপের মধ্য হইতেই আমরা প্রত্যেকে এক একটি গ্রহণ করিয়া আমাদের সৃষ্টি করি। লাভেলের দর্শনে এই ভাবে সত্তাবাদ ও সারবাদের সমন্বয় হইয়াছে।

উপরে যাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত, জাস্পার্স, ক্যামুস্ প্রভৃতি আরও অনেক সত্তাবাদী আছেন। সকলের মতের বর্ণনা করিবার স্থান নাই।

সমালোচনা

সত্তাবাদ বিষয়ীগত দর্শন—Subjective Philosophly। স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব (Things in itself) লইয়া বহুদিন দার্শনিকদিগের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা চলিয়াছিল। কিন্তু কোনও সর্ব্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বাদ-বিতণ্ডার ফলে তথ্যের (Facts) পর্য্যবেক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মান দার্শনিক হুসার্ল (Edmond Husserl) এই জন্য স্বগতবস্তুর আলোচনা স্থগিত রাখিয়া তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যাহার অব্যবহিত জ্ঞান আছে, তাহারই অনুসন্ধানে তিনি বিশুদ্ধ সংবিদ (Consciousness) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি চিন্তা করি"—ইহাই মাত্র মৌলিক তথ্য নহে। সংবিদের সহিত সর্বদাই তাহার বিষয় জড়িত থাকে। বিষয়-বর্জিত কোন চিন্তাই কখনো হয় না। কিন্তু সংবিদের বিষয় সংবিদের মধ্যগত নহে, তাহার বাহিরে অবস্থিত। সংবিদ্ শূন্যগর্ভ, তাহার আধেয় কিছু নাই। সংবিদের তলদেশে কোনও স্থায়ী বস্তু আছে কি না, সে সম্বন্ধে হুসার্ল কিছু বলেন নাই। হেইডেগার ও সারত্রো হুসার্লের প্রতিভাস-বিজ্ঞান (Phonomenology) গ্রহণ করিয়া, তাঁহা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন. সংবিদ অবস্তু, সংবিদ কিছুই নহে, তাহা শূন্যমাত্র (Nothing)। কিন্তু সংবিদের তলদেশে কোনও স্থায়ী বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, ইহাই মাত্র বলিলে সঙ্গত হইত। সংবিদ কিছুই নহে, ইহা বলিবার কোনও যুক্তি নাই।

হেইডেগার ও সারত্রোর দর্শন তাঁহাদের সংবিদের পর্য্যবেক্ষণ হইতে উদ্ভূত; মনের ক্রিয়া ও তাহার মধ্যে যাহা অনবরত উদিত হইতেছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণের ফল। কিন্তু অনুভব ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের মানসিক প্রকৃতিদ্বারা তাহার অনুভব নিয়ন্ত্রিত। অনেকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি-বেগ (impulse) দ্বারা ইতস্তত চালিত হয়; অনেকের অনেক প্রবৃত্তি দমিত, অবচেতন স্তরে অবস্থিত। সুতরাং সকলের মনের পর্য্যবেক্ষণের ফল এক হইতে পারে না। প্রত্যেকের অনুভব ব্যক্তিগত (Private); তাহার পক্ষে তাহা সত্য হইলেও সকলের পক্ষে তাহা সত্য বলা যায় না। সারত্রোর মতে সংবিদের বহির্গত বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত সংবিদ কিছু নহে। কিন্তু জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধই জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়েরই প্রয়োজন। সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ের অপর দিকে জ্ঞাতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহাদিগকে আমরা অনুভব করি; কিন্তু তাহাদিগকে জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ণনা করা যায় না। যে স্বাধীনতার কথা সত্তাবাদিগণ বলেন, তাহার অনুভূতি এবং ভালবাসার অনুভূতির স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে ভক্ত যখন তাহার ভগবানের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তখন তাহার যে অনুভূতি হয়, শত বিশেষণ-প্রয়োগেও কি তাহার বর্ণনা করা যায়? এই অনুভূতি সকলের নাই। যাহার নাই, তিনি যদি কেবল তাহার নিজের অনুভূতির উপর কোনও সার্বিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে সে দর্শনকে সত্য বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "তত্ত্ববিদ্যায় আমার অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ—অদ্বৈতবাদের তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি

প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে। সেই আনন্দ, সেই প্রেম, আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, এই প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি, অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে।" হেইডেগার ও সারত্রোর এই অনুভব না হইলেও, কবির এই অনুভবকে ভ্রান্ত বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে কি ?

সারত্রো En soiকে—জ্ঞানের পূর্ব্ববর্তী সত্তাকে—অর্থ-হীন ও যুক্তিহীন chaos বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যখন ইহা Pour-soi এ পরিণত হয়, যখন সংবিদের উদ্ভব হয়, তখন ইহা অর্থবৎ হয় এবং পরস্পর সম্বন্ধঅংশ সমন্বিত প্রতিভাসিক জগতে পরিণত হয়। কিন্তু অর্থ-হীন বস্তুর মধ্যে অর্থের আবির্ভাব একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার। সারত্রো এবং হেইডেগার ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই। ব্যক্তি-মনের সমীক্ষা হইতে তাত্ত্বিক সত্যের (metaphysical truth) আবিষ্কার সম্ভবপর নহে। ব্যক্তি-মনের সমীক্ষার ফলের উপর মনো-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। সারত্রো যাহাকে En-soi বলিয়াছেন, জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন তাহার অন্যরূপ আমাদের অজ্ঞাত। তাহার অস্তিত্ব আছে কি না, যুক্তির সাহায্যে অনুমান ভিন্ন তাহা জানিবার উপায়ও নাই। সুতরাং En-soi অনুমানের বিষয়মাত্র, Kantএর Ding-in-Sich এর মতই। ক্যাণ্ট কিন্তু Ding-in-Sichকে অজ্ঞেয় বলিয়াছিলেন। সারত্রো En-soiএর বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা নিরেট, যুক্তিহীন প্রভৃতি বলিয়াছেন। এই জ্ঞান তিনি কোথায় পাইলেন ? En-soi যখন জ্ঞানের বিষয় হয়, যখন Pour-soi উদ্ভূত হয়, তখন En-soi বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ কি এই নয়, যে জগতের যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা হইতে En-soi স্বরূপে ভিন্ন ? সংবিদ্ যদি কিছুই না হয়, তাহার মধ্যে কিছুই যদি না থাকে, তাহা হইলে En-soiর রূপান্তর-প্রাপ্তি কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা দুর্বোধ্য। যেরূপে Pour-soiর নিকট En-soi আবির্ভূত হয়, যেরূপে নীরেট, অবকাশবিহীন, "এক", বিচ্ছিন্ন অথচ পরস্পর সম্বন্ধ-সমন্বিত বহুর রূপ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ আসে কোথা হইতে ? জ্ঞানের যে "প্রকার"গুলি (Categories) ক্যাণ্ট সংবিদের মধ্যগত বলিয়াছেন, সংবিদের মধ্যে যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে তাহারা En soi এর মধ্যেই আছে। সুতরাং জ্ঞান-কালে En-soi বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বলা যায় না। তাহা যে যুক্তিবর্জিত Chaos মাত্র, তাহাও বলা চলে না।

হেগেল জগৎকে প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জগতের আবির্ভাব যে যুক্তি-অনুযায়ী এবং অপরিহার্য্য, যুক্তির সাহায্যে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সত্তাবাদিগণ জগতের ও মনুষ্য-জীবনের কোনও উদ্দেশ্য এবং তাহার মধ্যে কোনও যুক্তি দেখিতে পান নাই। এই অসামর্থ্য তাহাদের মানসিক প্রকৃতির ফল। মানুষ নিঃসম্বল অবস্থায় জগতে নিক্ষিপ্ত হয় নাই। অন্তরের যে সম্পদ লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাই তাহাকে জীবনের লক্ষ্য-প্রদর্শনে এবং তদভিমুখে চালিত করিতে সমর্থ। যদি তাহাতে সে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা তাহার সম্পদের ব্যবহার না করার ফল। পৃথিবীতে মানুষ অসহায় ও পরিত্যক্ত নহে। মৃত্যু আছে সত্য। মৃত্যুতে যদি ব্যক্তি-জীবনের ঐকান্তিক বিনাশও হয়, তাহা হইলেও তাহাদ্বারা জগতের যুক্তিহীনতা প্রমাণিত হয় না। অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখে তাহার যে গতিপ্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, মানবসমাজের ইতিহাসেও তাহার স্পষ্ট পরিচয় আছে। তাহাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা। কিন্তু মৃত্যুতেই যে ব্যক্তি-জীবনের পরিসমাপ্তি হয়, তাহা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ নাই এবং জ্ঞানীর নিকট মৃত্যুর বিভীষিকাও নাই।

যে Engagementএর কথা সত্তাবাদিগণ বলেন, তাহার ফল অনিশ্চিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জন্য ভয় পাইবার কারণ নাই। জীবন সম্বন্ধে সত্তাবাদিগণ যে মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইতেই তাহাদের ভয়ের উৎপত্তি। সারত্রো প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের শত্রু বলিয়াছেন। প্রেমকে তিনি অন্যকে অধিকার করিবার ইচ্ছা বলিয়াছেন। শরীর-সম্বন্ধী প্রেম-সম্বন্ধে একথা সত্য হইতে পারে ; কিন্তু যে প্রেম আপনাকে বঞ্চিত করে, জগতে তাহাও অজ্ঞাত নহে। ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণ যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহার বীজ যে মানুষের অন্তরে নাই, তাহাও নহে। সত্তাবাদিগণ তাহাদের অন্তরে তাহা না পাইলেও, এমন লোক বিরল নহে, যাহাদের প্রাণের প্রেরণা এই দিকে। ইতর জীবের মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ে যে প্রেরণা অনুস্যুত, মানব-মাতার হৃদয়ে যে আত্মবিসর্জন-প্রবৃত্তি সহজাত—সে প্রেরণা পরিপূর্ণরূপে সর্ব্ব-মানবহৃদয়-সাধারণ না হইলেও, তাহার স্পন্দন ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই অনুভব করে, তাহার মূল্য অন্তরের মধ্যে সকলেই স্বীকার করে। কর্ম্মের আদর্শ যদি অন্য কোথাও লিখিত না থাকে, এই স্বীকৃতির মধ্যে তাহা লিখিত আছে। স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার-কালে এই নির্দেশ অনুসারে চলিলে, ইহাকে অগ্রাহ্য না করিলে অনৈশ্চিত্যের বেদনা ভোগ করিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "আশ্চর্য্য এই, যে আমি হইয়া উঠিতেছি। আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কি অনন্ত মাধুর্য্য আছে, যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্য্যতারকার সমস্ত শক্তিদ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছি—আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন ওঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপর যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না ?" এই প্রেম, এই আনন্দ—অনুভবের বস্তু। যাহার সে অনুভব হয় নাই, সে তাহার অস্তিত্ব কি করিয়া বিশ্বাস করিবে ?

১৯১৮ সালের জার্ম্মানির যে অবস্থা হইয়াছিল এবং ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই হেইডেগার এবং সারত্রোর আবির্ভাব সম্ভবপর। মর্ম্মপীড়িত জার্ম্মান জাতি এবং ফরাসী জাতি জগতের মধ্যে কোনও যুক্তি অথবা উদ্দেশ্য দেখিতে পায় নাই। তাই জীবন-সম্বন্ধে অনেকের যে ধারণা হইয়াছিল, তাহাই হেইডেগার ও সারত্রোর দর্শনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ঋষি বায়ু, সিন্ধু, ওষধি এবং বনস্পতি হইতে মধু ক্ষরিত হইতে দেখিয়াছেন। বাংলার কবি সমগ্র বিশ্বে, নীল আকাশে, অন্তহীন সমুদ্রে, পুষ্পিত বৃক্ষে সর্ব্বত্র মানুষকে আনন্দদান করিবার চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন। জীবনকে তিনি সংকট বলিয়া মনে করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে জন্য সোপেনহরের দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, সত্তাবাদী হেইডেগার এবং সারত্রোর দর্শনের মূলেও সেই কারণই বর্ত্তমান।

দ্বিজেন্দ্রলালের নুরজাহান নাটক

শ্রীবিমলকান্তি সমাদ্দার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বঙ্গদেশে ও বিহারে প্রাপ্ত হস্তীসমূহ ও জায়গীরদারদের বরখাস্ত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে লব্ধ বিপুল অর্থসম্পদ্‌ভারের হিসাব ও তৎসমুদয় রাজদরবারে হাজির করিবার জন্য মহাবৎখাঁর কাছে পরওয়ানা পাঠানো হইল। মহাবৎ ইহার পশ্চাতে নুরজাহানের বিদ্বেষ ও আপন অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করিলেন এবং চার-পাঁচ হাজার রাজপুত সৈন্যের পুরোভাগে কেমন করিয়া সম্রাট বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া সম্রাটকে জামিন স্বরূপ গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। মৃগয়ার অজুহাতে সম্রাটকে বহির্গত হইতে স্বীকৃত করা, মহাবতের অশ্বে আরোহণে সম্রাটের অসম্মতি প্রভৃতি কোন কোন ক্ষুদ্র ঘটনায় তিনি ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করিয়াছেন।

সম্রাট দরবারে জামাতা বরখরদারের প্রতি অসম্মানের যে কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে একটু অন্যবিধ। রাজকর্মচারীদের পরিবারে বিবাহ-বর্জ্জনব্যাপারে সম্রাটের অনুমতি নিবার প্রথা ছিল। বিশেষ কারণ না থাকিলে সম্মতি লাভই সর্বদা ঘটিত। মহাবৎ কন্যার বিবাহে এই সম্মতি পূর্বাহ্নে গ্রহণ না করায় এই ক্ষুদ্র ত্রুটির এইরূপ গুরু শাস্তির ব্যবস্থা নুরজাহান করেন।

নাটকে মহাবৎ খাঁর পরিচয় রাণা প্রতাপের ভ্রাতা মোগলের বশংবদ সগরসিংহের পুত্র। টড্‌ তাঁহার রাজস্থানের ইতিবৃত্তে এই পরিচয়ই দিয়াছেন। মহাবৎ খাঁর প্রকৃত নাম জমানা বেগ। তাঁহার বাসস্থান কাবুল। তাঁহার বীরত্ব, নির্ভীকতা, সংগঠনপ্রতিভা, স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করিতেছে। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে সম্মান করিতেন ও তাঁহাকে প্রভূত বাক্‌-স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

প্রতাপ সিংহ নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলাল মহাবৎখাঁ বা শক্ত সিংহের বীরত্বের ও ঔদার্যের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রশংসার মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। মনে হয় হিন্দু শক্তির সেই শোচনীয় দুর্দিনের ক্ষণে এই প্রকার একটি চরিত্র পাইয়া কবিচিত্ত আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিল। দেশাত্মবোধের মন্ত্রে যখন বাংলাদেশ উদ্বুদ্ধ তখনকার রচিত নাটকে নাট্যকার ইহাকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন এবং দর্শকগণ ইহাকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। জাহাঙ্গীর ও নুরজাহানের মহাবৎখাঁর কবল হইতে মুক্তিলাভের দৃশ্যের প্রতি অবহিত হইলে ইহার প্রমাণ মিলিবে, কর্ণ সিংহের (করণ সিংহ) নিকট ভারতের সিংহাসনে তাঁহার স্পৃহা আছে কিনা এই হাস্যকর প্রশ্নে ইহার উত্তর মিলিবে।

নুরজাহান ও জাহাঙ্গীরের মুক্তির কাহিনী মোতাদাদ খান বর্ণনা করিয়াছেন। মহাবৎখাঁ যতবড় বীর ছিলেন, ততখানি সাধারণ বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। জাহাঙ্গীর যখন তাঁহার নিকট দীর্ঘদিনে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসভাজন হইতেছিলেন নুরজাহান তখন মহাবতের কর্মচারীদের মধ্যে কৌশলে ভেদের সৃষ্টি করিয়া আপন খোজা হুসিয়ার খাঁকে লাহোর হইতে দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করেন। তারপরে একদিন সৈন্যপরিদর্শনের ছলনায় সম্রাট-দম্পতী মুক্তিলাভ করেন। নির্বোধ মহাবৎ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন; সঙ্গে আসফ খাঁ ও তাঁহার পুত্র আবু তালিব, কুমার দানিয়েলের পুত্রদ্বয় ও হোসং প্রভৃতি কয়েকজনকে জামিনস্বরূপ সঙ্গে নেন এবং যে পর্যন্ত নিজেকে সাম্রাজ্ঞীর বাহুর দূরত্বের বাহিরে না মনে করেন সে পর্যন্ত ইহাদের সকলকে মুক্তি দেন নাই। ঔদার্যবশে সম্রাট-দম্পতীর মুক্তি-বিধান একেবারেই কাল্পনিক ব্যাপার।

রেবা বা মানবাইকে প্রতাপসিংহ নাটকে আমরা প্রথম দেখিয়াছি। ইতিহাসে এই চরিত্রের যে মাধুর্য স্বীকৃত হইয়াছে নাট্যকার তাহার পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু রেবা ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যা করেন এবং আকবর শাহ দেহত্যাগ কারন ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে। অতএব আলোচ্য নাটকে রেবার প্রবেশ সমর্থনযোগ্য নয়। খসরুর বিদ্রোহের সময় মানবাই জীবিত ছিলেন না। আকবরের জীবৎকালে সেলিমের বিদ্রোহের সময় সপ্তদশবর্ষীয় কিশোর খসরুর সিংহাসনপ্রাপ্তির উদ্দেশে সেলিমের প্রতিপক্ষরূপে মাতুলদ্বয় মানসিংহ ও মধোসিং, শ্বশুর আজিজে কোকা প্রভৃতি যে ষড়যন্ত্র করেন খসরু তাহাতে সর্বতোভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিকে স্বামী ও অপরদিকে পুত্র— এই আত্মঘাতী সংঘাত হইতে খসরুকে বিরত করার জন্য মানবাই যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হইয়া বংশগত বিষাদবায়ুপীড়ায় ক্লিষ্টা এই কোমলহৃদয়া রমণী অহিফেনদ্বারা স্বীয় জীবননাশ করেন (১৬০৪ খৃঃ)। আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়-ও কৌশলে খসরুপক্ষীয়দিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া সিংহাসন সেলিমকে অর্পণ করেন। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে খসরুর বিদ্রোহ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। অতএব নাট্যকার এখানে ঘটনার ঐতিহাসিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই।

সাজাহান চরিত্রে নাট্যকারের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও মৌলিকতা লক্ষণীয়। ক্ষমতাবলে যিনি দুর্ধর্ষ প্রতিকূল শক্তিকে পরাভূত করিয়া ভারতের সিংহাসন লাভ করিবেন তাঁহার চরিত্রই নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উত্তর জীবনে যিনি তাজমহল-নির্মাতা তাঁহার প্রথম যৌবন এই নাটকে চিত্রিত হইয়াছে। তিনি সাংসারিকবুদ্ধিসম্পন্ন, ধীর, সাহসী, বাস্তবপন্থী মানুষ। ইতিহাসের সাজাহান জীবনের প্রথম ২৩ বৎসর সুরাপ্লাবিত মোগল সম্রাটবংশের মানুষ হইয়াও একবিন্দু সুরা পান করেন নাই। নাটকের সাজাহানেরও নৈতিক কোন দুর্বলতা নাই। ভারতের ভাবী সম্রাটকে, যিনি অনতিকালের ব্যবধানে অপরাজি

টকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইবেন তাঁহাকে, স্বেচ্ছাক্রমে ও সযত্নে নাট্যকার ালিমা-স্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়াছেন। সেকস্‌পীয়রের Henry IV টকের Prince Henry পরবর্তী নাটক Henry V-এর নাম-রিত্র। ইংলণ্ডের এই বিশিষ্ট রাজচরিত্রের যৌবনের দৃশ্যগুলিতে াহার কিংবদন্তীসিদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বর্ণনা করিলেও সেকস্‌পীয়র ালিমাস্পর্শকে কোথাও গাঢ় করেন নাই। নুরজাহান নাটকে কোন কান স্থলে ঘটনার সত্যতা কবি-কল্পনার স্নিগ্ধ স্পর্শলাভ করিয়াছে। হাবৎ খাঁ কর্তৃক খসরুর চোখ সূচিবিদ্ধ করা (জাহাঙ্গীরের নির্দেশে চকিৎসায় একটি চোখের দৃষ্টি ফিরিয়াছিল) নাটকে বর্জিত হইয়াছে এবং ন্দররাজ যে সাজাহানের নির্দেশেই খসরুকে হত্যা করে—নাটকে তাহার ীকৃতি নাই। খসরুর পুত্র দওয়ারবক্স্‌ ও গহরস্প, শারিয়ার, এবং ানিয়েলের পুত্র তমুরস ও হোসং সাজাহানের ফরমান অনুসারেই প্রকৃত-ক্ষে আসফ খাঁ কর্তৃক নিহত হয়।

নাটকের শেষ দৃশ্যে শারিয়ারের অন্ধত্বে চমকিত ও দুঃখিত আসফ খাঁ হানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আসফ খাঁর বাহিনীর হাতেই ারিয়ারের এই দুর্দশা ঘটে। শারিয়ারের অর্থলোলুপ অসামরিক বাহিনী াসফ খাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সহিত প্রথম সংঘর্ষেই যখন পলায়মান ইল, বেচারি তখন অন্তঃপুরে নারীগণের ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল।

আয়াস চরিত্রের পুনর্গঠনেও নাট্যকারের মৌলিকতা প্রকাশমান। তিহাসের ইতমদউদ্দৌলা চরিত্রে নানাগুণের সমাবেশ রহিয়াছে। তিনি ার, বিচক্ষণ, দয়ার্দ্রহৃদয় উদ্‌যোগী পুরুষ। কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারে াহার চরিত্রে কিছু দুর্বলতা ছিল—তিনি ঘুষ নিতেন। নাটকের দ্বিতীয় ঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দেখিতেছি—আয়াসের কাছে অর্থ ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা াত্মসম্মান বড়।

শারিয়ার ও লাডিলি বেগমের (লয়লার) বিবাহ (১৬২১ খৃঃ) মাগল সম্রাট্‌বংশের বহু রাজনৈতিক বিবাহের অন্যতম। খসরুর ন্দি-দশায় তাহার সহিত লাডিলির বিবাহের চেষ্টা নুরজাহান করিয়া-ছলেন, কিন্তু দুর্দশামোচনের সর্ববিধ সম্ভাবনা সত্ত্বেও একনিষ্ঠ খসরু াহাতে সম্মত হন নাই। শারিয়ার ও লয়লার পূর্বরাগ কল্পনা, শারিয়ারের বি-মনোভাব এবং যে-লাডিলির সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিরুদ্ধ সাক্ষ্য নে করেন তাহার নীতিবোধ ও ব্যক্তিত্ব কল্পনায় নাট্যকার মৌলিকতার রিচয় দিয়াছেন।

সাজাহানের পিতৃদ্রোহ-ও কবি কল্পনার স্পর্শে সত্য ও ন্যায়ের মর্যাদা াইয়াছে। তাঁহার যুদ্ধ "পিতার সঙ্গে নয়......নুরজাহানের সঙ্গে।" াগল সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়া পারিবারিক আকাশে যে বিষ বাষ্প ঞ্চয় ও শোণিতবর্ষণ ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে যুযুধান াতা-পুত্র-ভ্রাতার হিংস্রতা অপেক্ষাকৃত কম মনে হইতে পারে। জ্যেষ্ঠ-ত্রের সিংহাসনে উত্তরাধিকার মুসলিম আইনে নির্দিষ্ট নাই। আরবদেশে াষ্ট্রপতিত্ব নির্বাচন পদ্ধতির উপর নির্ভর করিত। ভারতবর্ষে এই য়ম বলবৎ থাকিলেও সম্রাট্‌ কর্তৃক ভবিষ্যৎ-সম্রাট্‌-মনোনয়নই রীতি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মনোনয়ন প্রথায় সর্বাপেক্ষা কৃতী ব্যক্তির প্রসাদ-লাভের সম্ভাবনা অধিক হইলেও ইহাতে প্রতিযোগিতা ও রক্তপাতের সম্ভাবনা মোটেই দূরীকৃত হইল না। পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা পরস্পরের সহিত যে জীবন-মরণ সংঘাতে রত হয়, উত্তরাধিকারের এই অনিশ্চয়তাই তাহার মুখ্য কারণ।

লয়লা চরিত্র ও রেবা চরিত্রের মধ্যে এক হিসাবে কিছু সামঞ্জস্য আছে। রেবা-চরিত্র কোন কোন স্থলে যেন জাহাঙ্গীরের অন্তরের শুভ বুদ্ধির প্রতীক, লয়লা নুরজাহানের। অবশ্য রেবা ও লয়লা উভয়েরই দীপ্ত স্বকীয়তা বর্তমান। নুরজাহানের প্রতি লয়লার ভর্ৎসনার মধ্যে Hamlet কর্তৃক তাহার মাতার প্রতি উক্তির নিকট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে নুরজাহান তাঁহার জনৈক মহিলা-বন্ধুর সহিত কথোপকথনে জাহাঙ্গীরের ও তাঁহার অনুরাগ-কাহিনীর কথা ব্যক্ত করিতেছেন। নুরজাহানের কাব্যোচিত ভাষায় ও আবেগময়তায় বিশেষ দুর্বলতার পরিচয় রহিয়াছে। নাটকের কাহিনীর সহিত নিগূঢ় সংযোগ যাহার নাই, নাটকে তেমন চরিত্র বর্জনীয়। নুরজাহানের এই মহিলা-বন্ধুর চরিত্র নাটকে অবান্তর, তাহাকে সামনে রাখিয়া নুরজাহানের দর্শন-সমীপে এই কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন মাত্র। রঙ্গমঞ্চ জনশূন্য করিয়া একক-চরিত্রের মুখে স্বগতোক্তি আলোচ্য নাটকে বহুস্থলে নাট্যকার প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে করিলেন না কেন? স্বগতোক্তি সম্পর্কে বহু বিস্তার আলোচনা না করিয়া এখানে এই কথা বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে ঘটনার অগ্রগতির বা জটিলতার মুক্তি স্বগতোক্তির বহু ত্রুটির অন্যতম। স্বগতোক্তির স্থূলতা যদি অপরিহার্যই হইয়া ওঠে তবে মানসিক সুস্থতা-সম্পন্ন চরিত্রে আত্মবিশ্লেষণ ও অন্তর্দ্বন্দ্বই ইহার উপজীব্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সুসহ। আলোচ্য দৃশ্যে স্বগতোক্তির সাহায্যে দর্শকের অজ্ঞাত কোন তথ্যের পরিবেশন সমীচীন বোধ না করায় নাট্যকার এই চরিত্রটির উপস্থাপন করিয়াছেন।

জীবনের গভীরতর অনুভূতি, সমস্যা ও চিন্তার রাজ্যে দীর্ঘ পরি-ক্রমণের পরে প্রয়োজন-বহির্ভূত বলিয়া সংসারের কাজের লোকদের দ্বারা আখ্যায়িত হাল্কা-রসিকতা বাজে-কথা খেয়ালখুসির দ্বারা নাটকে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। অফিস ঘরের গুমোটধরা গম্ভীর পরিবেশে নীরস কাজের যে দুর্বহ সঞ্চয়, ঘরোয়া আবহাওয়ায় প্রিয় জনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ভাললাগা-মন্দলাগা, জীবনের লঘুচপল ব্যঙ্গ হাসির দক্ষিণা বাতাস তাহার সকল খেদ ও ক্লান্তির অপোনোদন করিয়া পুনরায় সেই জীবনযুদ্ধের মল্লভূমিতে প্রবেশের উপযোগী জীবনী-শক্তি দান করে। যেমন জীবনে তেমনি নাটকে হাস্যরস একটী শক্তিময়ী প্রেরণা। প্রাচীন নাটকে হাস্য-রস সৃষ্টির জন্য একটী স্বতন্ত্র চরিত্র বিদূষক বা ভাঁড়রূপে কল্পিত হইত, নাটকের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিত একান্ত গৌণ। জীবনে হাস্যরস যে মানসিক বহু বৃত্তির মতই একটা এবং ইহার অস্তিত্বের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণের প্রয়োজন নাই; জগতে যাহারা অকেজো মানুষে নয়, এমন কি যাহারা দৃশ্যতঃ গাম্ভীর্যের বর্মে ঘেরা, তাহাদের মধ্যে-ও যে পরিহাসপ্রিয় একটী কাঁচা মন থাকিতে পারে তাহা একান্তভাবে আধুনিক

সাহিত্যের আবিষ্কার। দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরস সৃষ্টির এই লক্ষণটীর দিকে কোন কোন স্থলে দৃষ্টিপাত করেন নাই। নাগরিকগণ বা সভাসদগণের মিলিত আলোচনায় বাক্‌বিন্যাসের দ্বারা স্বতন্ত্র দৃশ্য সংস্থানপূর্বক হাসির যে হালকা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা তাহা নিষ্প্রাণ হইয়াছে।

কোন আধুনিক সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "হাসিতে হইলে একটু অবসর, একটু বিশ্রাম, দু'-একটা আজে-বাজে কথা বলা দরকার; কিন্তু যেখানে অবিরত যুদ্ধের রণদামামা বাজিতেছে, অস্ত্রের ঝনৎকার, যোদ্ধার বিজয় উল্লাস, আহতের আর্তনাদ চলিতেছে সেখানে হাসিবার অবসর কোথায়? একটু আধটু হাসির সুযোগ আসিলে মনে হয় হাসাটা অন্যায়, কর্ত্তব্যের একটু ত্রুটি হইয়া যাইতেছে।" দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে "যুদ্ধের রণদামামা" যেখানে বাজিতেছে সে ঐতিহাসিক নাটক, যাহার ফলশ্রুতি সাফল্য'ও অসাফল্য। আজিকার সংসারের মোটা টাকার দেওয়ানী মামলা অপেক্ষা ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণিত যুদ্ধ ব্যাপারটা সর্বত্রই গুরুতর ব্যাপার নয়। আদর্শ ঘটিত অন্তর্দ্বন্দ্বে মানুষের হৃৎপিণ্ড যেখানে শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে এমন কোন tragic চরিত্র কল্পনা হইতে আহরণ করিয়া রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান নাই। যে নাটকের পাঠে বা অভিনয় দর্শনে মানুষের অনুভূতি তরঙ্গাকুল হইয়া উঠিতে পারে, কদাপি উদ্বেল হয় না—ঐতিহাসিক নাটক সেই শ্রেণীর। "যুদ্ধের রণদামামা" ও "অস্ত্রের ঝনৎকারের" মধ্যে-ও হাসির প্রস্রবণ যে উৎসারিত হইতে পারে Hency IV নাটকে Hotspur-কে পিঠে করিয়া Falstaff-এর প্রবেশ তাহার চরম উদাহরণ। ম্যাকবেথ নাটকের যুদ্ধের দৃশ্যে ইহার প্রত্যাশা করিব না, সে-নাটক স্বতন্ত্র শ্রেণীর।

বন্দররাজ অর্থগৃধ্নু এবং অর্থের জন্য নরহত্যায় তাহার কোন গ্লানি বোধ নাই। এই মনুষ্যদেহধারী পিশাচকে ঘিরিয়া হাস্য পরিবেশনের প্রচেষ্টা হইয়াছে। পুরস্কার লোভে হত্যা ও মর্মন্তুদ ব্যঙ্গ-পরিহাসে নিপুণতায় Duchess of Malfi-র Bosola করিৎকর্মা পুরুষ। কিন্তু তাহার মধ্যের মনুষ্যত্বকে মেঘান্তরিত চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ Webster আবিষ্কার করিয়াছেন।

নুরজাহান নাটকে সত্যকার জীবনের হাস্যরস দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের দু'-তিনটি মাত্র পংক্তিতে চকমকির আলোর মত অতর্কিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরভেজ মেবার যুদ্ধে তাঁহার অকর্মণ্যতা সপ্রমাণ করিয়া পিতার কাছে তিরস্কৃত হইয়াছেন। সাজাহান তাঁহাকে পরিহাস-মিশ্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিতেছেন।

সাজাহান। সত্য কথা ভাই, তুমি মেবার যুদ্ধটা কি তলোয়ারের উল্‌টো দিক দিয়ে করেছিলে?

পরভেজ। যুদ্ধ যেমন ক'রে করে সেই রকমই ক'রেছিলাম। তবে অপরিচিত দেশ, আর মেবার যুদ্ধ যেদিন হয়, সেদিন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

এ-পর্যন্ত দর্শকের হাসির অনুকূল অবস্থাটি—প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র। ইহার পরেই সাজাহানের উক্তি—

সাজাহান। তুমি তামাক খাচ্ছিলে বুঝি?

পরভেজ। সত্য খুরম, তামাকই খাচ্ছিলাম। আগ্রা থেকে এক সিন্দুক মৃগনাভি তামাক নিয়ে গিয়েছিলাম।

এ হাসি অধরপ্রান্তে স্মিতরেখা মাত্র নয়, প্রেক্ষাগার-কাঁপানো হাসি। সঙ্গে সঙ্গে পরভেজের মূঢ়তার উপর সাজাহানের ভাষ্য এবং তারপরেই শারিয়ারের স্নিগ্ধ প্রশান্ত কাব্যময় চোখে—জগৎ ও জীবন দর্শন এবং সাজাহানের মত কর্মী মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, শারিয়ারের দৃষ্টিকে রুগ্‌ন মানুষের কুৎসিত দর্শন বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা—সব মিলিয়া একটি সুস্থ, সবল, বিচিত্র লঘু-গম্ভীর পরিণত দিগ্‌-দর্শনের বিস্তার আমাদের সম্মুখে অবারিত হইয়া গিয়াছে। হাসিকে নানামুখী বিশ্লেষণী প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে বিধৃত না দেখিলে তাহার পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। কবিপ্রাণ এই চরিত্রটির উপস্থাপনায় নাট্যকারের মৌলিকতা প্রশংসনীয়। আবার সাজাহানের চোখ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, রুগ্‌ন, দুর্বল, সংসারের যুদ্ধে নিশানটির ভার-ও যাহার দুর্বহ, তাহার কাব্যোচ্ছ্বাসে যে ক্লৈব্যের প্রকাশ অন্তর্গূঢ় রহিয়াছে নাট্যকার সেদিকে অবহিত আছেন।

নুরজাহান নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় কি? শুধু সিংহাসনের উত্তরাধিকার নয়, যুদ্ধবিগ্রহ নয়—যে চরিত্রটি এই যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তিকে আপন প্রভুত্বের স্থায়িত্ব কামনায় ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল তাহার মানসকুসুমের দলগুলির উন্মীলন নাট্যকারের লক্ষ্য। নাটকখানি নুরজাহানের বিপুল ব্যক্তিত্ব ও উচ্চাশার ইতিহাস। শেরখাঁর হত্যা, খসরু ও সাজাহানের বিদ্রোহ, খসরুর হত্যা, মহাবৎখাঁর সম্রাট্-বিজয়—ইহাদের প্রত্যেকটিই গুরুতর ব্যাপার সন্দেহ নাই এবং ইহাদের প্রত্যেকটি ঘটনার নাটকীয়তা-ও অবিসংবাদিত, কিন্তু ইহাদের সংঘটনের পশ্চাতে যে নারীচরিত্রটি আপন প্রচণ্ড শক্তি ও পৈশাচী প্রতিভা নিয়া অদৃষ্টের জাল রচনা করিয়া চলিয়াছে এবং অনিবার্যভাবে শেষপর্যন্ত সে-জালে ধরা পড়িয়াছে তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ নাট্যকার আপন দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নাটকখানি এই বহিঃসংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে বিদ্যুদ্‌গর্ভ হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকের ৪১টি দৃশ্যের ১৮টি দৃশ্যে নুরজাহানের প্রবেশ, চারটিতে নুরজাহানকে অবলম্বন করিয়া সংলাপ চলিয়াছে, অবশিষ্ট দৃশ্যগুলির কোন-কোনটিতে নুরজাহানের প্রত্যক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। সমগ্র ঘটনাবলির প্রবাহ-শক্তি নুরজাহান, কিন্তু তাহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট সীমার পরে তাহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে। এক অন্ধ নিয়তি তাহাকেও তৃণ খণ্ডের মত অবলীলাক্রমে তীব্রগতিভরে ভাসাইয়া নিয়াছে। ট্র্যাজেডি এখানে, যে নুরজাহান তৃণখণ্ডমাত্র ছিলেন না।

নুরজাহান নাটকের প্রধানপ্রশ্ন নুরজাহানের জীবনের এই ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয়। শুধু অন্তিম সাফল্য—অসাফল্য যদি বিচারের মানদণ্ড হয় তবে নুরজাহানের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্ণয় হইতে পারে। সাধারণতঃ পাপের পরাজয় ও পুণ্যের উদ্বর্তন-প্রদর্শন যেখানে একমাত্র লক্ষ্য হয় সেখানে ট্র্যাজি-কমেডির বিবিধ গলিঘুঁজি ঘুরিয়াও নাট্যকার কোনমতে বিক্ষুব্ধ দর্শকচিত্তে তথাকথিত

প্রশান্তি সঞ্চার করিতে প্রারেন। নুরজাহানের জীবনের শেষভাগে তাহার প্রথম অংশের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং ঘটনারাশি স্বখাত পথে অনিবার্যবেগে নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। অত্যাচার অবিচার ষড়যন্ত্র হত্যার মিলিত দৃঢ় পেষণে রুদ্ধকণ্ঠ মনুষ্যত্বের আর্তরবে আমরা যখন পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলাম তখন নাট্যকার সাজাহানের বিজয় ঘোষণা দ্বারা স্যায়, সত্য ও পুরুষকারের জয়পতাকা আর একবার উন্নত করিয়া ধরিয়াছেন।

নুরজাহানের জীবনকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নাট্যারম্ভ হইতে জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহ প্রথমাংশ। দ্বিতীয়াংশের বিস্তার খসরুর হত্যা পর্যন্ত। এই ঘটনার পরেই শাসক চক্রে ভাঙন ধরে এবং ক্রমে প্রতিকূল অবস্থা শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। তৃতীয় ভাগ নাটকের শেষ অংশ পর্যন্ত চলিয়াছে। নুরজাহানের জীবন একটি ভগ্নশীর্ষ বনস্পতির সহিত উপমিত হইতে পারে, যে বনস্পতির মাথায় জাহাঙ্গীরের মৃত্যু বজ্রপাতের কাজ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে খসরুর মৃত্যুর পরেই তাহার রসসঞ্চয়-শক্তি কমিয়া আসিয়াছে, এবং সাজাহানের বিদ্রোহ, পরভেজ ও মহাবৎখাঁর মিলন ও মহাবৎখাঁর হস্তে বন্দিত্ব জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকল্প জড়ত্ব বজ্রবহ্নিকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

স্থূল সাফল্য-অসাফল্য দ্বারা বিচার করিলে নুরজাহানকে বোঝা যাইবে না। যে প্রতিহিংসা-সাধনের মন্ত্র নিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন তাহাতে তিনি যে পরাজিত হইয়াছেন সে সংবাদ আর কেহ না জানুক তিনি জানেন। বাহিরের মানুষ তাহার পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপী অখণ্ড প্রভুত্বের কথা জানে। কিন্তু স্বামি-হত্যার যে প্রতিহিংসাকে তিনি ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে স্খলনে যে শোচনীয় পরাজয় তাহাকে ধিক্কৃত করিতেছে তাহা কাহাকেও বলিবার নয়। অথচ প্রতিহিংসা-ব্রতই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, নাট্যকার এমন কথা কোথাও বলেন নাই। যে ভোগস্পৃহা ও উচ্চাশার সূচনা নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা পাইতেছি তাহা বিশেষ অর্থপূর্ণ। প্রথম দৃশ্যে একটী পরিপূর্ণ সুখের সংসারের দৃশ্য আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। "বর্দ্ধমানে দামোদর তটে শেরখাঁর বাটীর প্রাঙ্গণস্থ উদ্যান। উদ্যানটী অতি যত্নে লালিত। কেতকীকদম্বাদি পুষ্প চারিদিকে ফুটিয়া আছে।" এই উদ্যানের উপরে যে গূঢ় বজ্রগর্ভ মেঘসঞ্চয় ছিল তাহার ছায়াপাত নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের tragic irony-র মধ্যে প্রকাশমান!

শের। ঈশ্বর এর অধিবাসীদের এমন দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তা রক্ষা করবার শক্তি দেন নাই। নুরজাহান—না, প্রিয়তম, আমার বোধহয়, এতসুখ এদের সৈল না। এত সুখ বুঝি কারো সয় না।

ইহার পর সেলিমের প্রতি আসক্তির বীজ নুরজাহানের হৃদয়ে নূতন অঙ্কুরে উদ্গত না হইলেও অন্ততঃ অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগী সজীবতা যে সেখানে বর্তমান ছিল নুরজাহানের উক্তিতে এই দৃশ্যেই নাট্যকার তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই ইঙ্গিতে ঘটনা সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ যে হ্রাস পাইতে পারে এমন অভিযোগ করা চলে না। এই ইঙ্গিতের কারণ এই—দ্বিজেন্দ্রলাল ট্র্যাজেডি রচনায় পারিপার্শ্বিকতা ও মানুষের অনায়ত্ত ঘটনাকে যতটা প্রাধান্য দিতে চাহেন চরিত্রের মৌলিক-প্রবণতাকে তাহা অপেক্ষা গৌণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। বরং চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজেডির বিষয়ভূত কারণ যে অন্তর্লীন থাকে তিনি তাহারই প্রতি এখানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছেন।

নুরজাহান জীবনে কাহাকেও আপন করেন নাই। চরিত্রটী ঝড়ের রাত্রির বিদ্যুৎ শিখা। গৃহকোণে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টায় শেরখাঁর ঘর ভস্মশেষ হইয়াছে! সম্রাট-প্রাসাদে তাহার জ্বালা ও দাহ সাম্রাজ্যকে স্পর্শ করিয়াছে। জাহাঙ্গীরকে তিনি ভালবাসেন নাই, তাঁহার ঔরসে নুরজাহানের কোন সন্তান জন্মে নাই এবং জাহাঙ্গীরের অতিমাত্র আসক্তি নুরজাহানের কাছে প্রথম হইতেই নিজের কামনাকে মন্দীভূত করিয়াছিল (দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নুরজাহানের স্বগতোক্তির শেষভাগ দ্রষ্টব্য)। রেবার মত নারীর একমাত্র পুত্রকে আপনস্বার্থের প্রয়োজনে হত্যায় তাঁহার বাধে নাই, লয়লা তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র, শারিয়ার তাঁহার ক্ষমতালুব্ধতার বলি। সাজাহানকে বিপুল মর্য্যাদা তিনিই দিয়াছিলেন, আবার খসরুর জীবনান্তে তাঁহারই বিরুদ্ধে তিনি সম্রাট্-বাহিনী নিয়োগ করিয়াছেন; মহাবৎ খাঁ তাঁহার কণ্টকোৎপাদনের সহায় অপর একটী কণ্টক মাত্র। "আমার জীবন একটা গভীর শূন্যগহ্বর। জল নাই, তাই রক্ত দিয়ে তাকে পূর্ণ করে রেখেছি। শূন্য গহ্বরের চেয়ে সেও ভালো। আমার বর্ত্তমান একটা নৈরাশ্য। তাই একটা বিরাট হাহাকারে তাকে ব্যাপ্ত করে রেখেছি। নৈলে এ নৈরাশ্যের নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে ওঠে। আমি ছুটেছি যেন নিজে থেকে নিজে পালাবার জন্য; ভাবছি—বিকারের উত্তাপে; কার্য কচ্ছি—অঙ্কুশ-তাড়নার উন্মাদনায়।" নুরজাহানের এই ভয়াবহ একাকিত্ব মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রিতে দুঃস্বপ্নে সুপ্তিভঙ্গের পরে Richard III-এর উক্তির সহিত তুলনীয়।

"What, do I fear myself? There's none else by! Richard loves Richard; that is I am I. Is there a murderer here? No;—yes; I am; Then fly. What, from myself? Great reason why, Lest I revenge…

There is no creature loves me, And if I die no soul shall pity me; Nay, wherefore should they,— Since that I myself find in myself no pity to myself?"

নুরজাহানের জীবনের এই বিপুল শূন্যতার হাহাকার কারুণ্য বিবর্জিত নয়। শেরখাঁর হত্যায় নুরজাহানের প্রতি যে বীভৎস অন্যায় আচরিত হইয়াছে—তাহা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ তাহার বিপুল ব্যক্তিত্ব, শাণিত ধীশক্তি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়—সর্ব্বোপরি সম্রাজ্ঞীর মহিমা আমাদের সম্ভ্রম ও সহানুভূতির উদ্রেক করে।

নুরজাহানের জীবনে কোন উদগ্র যৌন-লালসার পরিচয় নাই। কাহিনীকারদের কেহ তাঁহার জীবনের অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনায় পঞ্চমুখ—আধুনিক ঐতিহাসিকের বস্তুসন্ধ দৃষ্টিতে সে কাহিনী অবশ্য

ইতিহাস বলিয়া স্বীকৃত নয়! কিন্তু নাটকে জাহাঙ্গীরকে তিনি ডুবাইলেও নিজে ডুবেন নাই। তাঁহার অন্তরের ভোগ-বৃত্তি মাত্র প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্যের মাদকতার মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজিয়াছে। এই যে নির্লিপ্ত আত্মসম্পূর্ণভাব, ইহার নিজস্ব একটা মূল্য আছে। অথচ এতখানি শক্তি ও সাহসের মধ্যেও খাদ ছিল। সেই খাদ এই জাতীয় নারী-চরিত্রের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক এবং নাট্যকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছে। নুরজাহান কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী নয়। উদ্যত-পিস্তল গোবিন্দলালের সম্মুখে মৃত্যুভয়-বিহ্বলা রোহিণীর আর্তনাদ ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তা নুরজাহানের কম্পিত-কণ্ঠে 'আমার এখনও বেঁচে আশ মিটেনি, ভোগ করে আশ মিটেনি, ভালোবেসে আশ মিটেনি!" উভয় চরিত্রের মধ্যে যে সাধারণধর্ম রহিয়াছে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে মাত্র। চতুর্থ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে নুরজাহানের হাব-ভাব ছলা কলা, "অমানুষী মনীষা, অসাধারণ রূপ, বিশ্ববিজয়িনী শক্তি" অপূর্ব বাগ্মিতা ও তাহার সঙ্গে নারীর ব্রহ্মাস্ত্র অশ্রু মিশিয়া যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছে তাহাতে জাহাঙ্গীর মহাবৎখাঁর নিকট নতিস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং মহাবৎখাঁ পরাভব মানিয়াছেন। কুশাগ্রীয়ধী, সৌন্দর্যশালিনী এই "যাদুকরী" "কালভুজঙ্গী" মত আর একটি চরিত্রে শারীরিক সাহসের ব্যাপারে দুর্বলতা দেখিতেছি। সেটি সেক্সপীয়রের "Serpent of the old Nile" Cleopatra চরিত্র। কিন্তু এই দৃশ্যে নুরজাহান-চরিত্রের আর একটি দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে; সে তাঁহার বাস্তববুদ্ধি, কল্পনার অজস্রতা, বাক্-চাতুর্য, অভিনয়দক্ষতা। জাহাঙ্গীরের দণ্ডাজ্ঞাস্বাক্ষরকারী হাতখানি চুম্বন করিয়া, মহাবৎকে বিজয়ীর গৌরব অর্পণ করিয়া, স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন জীবন ভিক্ষার আবেদনে সম্রাজ্ঞী যখন সাশ্রুনেত্রে পৌছিয়াছেন তখন বিমুগ্ধ জাহাঙ্গীর বিহ্বল, প্রতিপক্ষ মহাবৎ মন্ত্রমুগ্ধ ও দর্শক স্তম্ভিত। সাজাহান নাটকে জাহানারার ঔরংজীবের দরবারে প্রবেশের দৃশ্য অপেক্ষাকৃত বর্ণাঢ্য ও পরিণত শিল্পিহস্তের রচনা, কিন্তু একবর্ণ চিত্রে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টির বৈচিত্র্য কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে আলোচ্য দৃশ্য তাহার প্রমাণ। নাটকীয়তাগুণে এই দৃশ্যের এবং তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যের মঞ্চ-সাফল্য সুনির্দিষ্ট, শেষোক্ত দৃশ্যে, লয়লার নুরজাহানের বিরুদ্ধে কুমার খসরুর হত্যার অভিযোগ লক্ষণীয়। বাস্তবতার দিক হইতে দেখিলে প্রকাশ্য দরবার এমন অভিযোগের পরেই যবনিকাপাতের অতিনাটকীয়তা বড়ই প্রকট। লয়লার মুখে একাধিক স্থানে এমন উক্তির প্রয়োগ হইয়াছে।

নাটকের অন্তিম দৃশ্যে যে নুরজাহানকে আমরা দেখিতেছি তিনি এক বিকৃতমস্তিষ্কা নারী। তিনি আর ভারত-সম্রাজ্ঞী নহেন, যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান,সেই সাজাহান করুণাবশে তাঁহাকে বন্দিদশা হইতে মুক্তি দিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আজ তিনি সকলের করুণার পাত্র। সে বুদ্ধি, শক্তি, সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। জীবনের যে ঝড় প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের প্রশান্ত পরিবেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সম্রাজ্ঞীকে ধূলায় লুটাইয়া দিল, বাহিরের পৃথিবীর এই ঝড় তাহারই রূপক। সাজাহানের শেষ দৃশ্যেও নাট্যকার এই আঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছেন। দৃশ্য-কল্পনায় King Lear নাটকের এবং চরিত্র-উপস্থাপনায় স্বপ্নচারিণী Lady Macbeth এর প্রভাব এখানে রহিয়াছে মনে হইতে পারে। কিন্তু এই দৃশ্যটি বড়ই দুর্বল। Lady Macbeth চরিত্রের সঙ্গে নুরজাহানের বৈসাদৃশ্য অপরিসীম। নুরজাহানের মস্তিষ্ক-বিকৃতি—না ইতিহাস-সম্মত, না নাটকের ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে চরিত্র-নিহিত কোন দুর্বলতার স্বাভাবিক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এই মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোন পূর্ব প্রস্তুতি নাই। অতএব নুরজাহান চরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্তন পাঠকচিত্তে কোন সাড়া তুলিতে পারে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার তেজস্বিতা ও কাব্যময়তা আমাদের পূর্বগামী নাট্যকারদের অনায়ত্ত ছিল। আলোচ্য নাটকের প্রথম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে নুরজাহানের সৌন্দর্য ও চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে সঙ্গীত সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের উচ্ছ্বাস, প্রথম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে শের খাঁর বিদায়-ভাষণ, চতুর্থ অঙ্ক অষ্টম দৃশ্যে নুরজাহানের জীবন-ভিক্ষা, শারিয়ারের কবিত্ব—সকলই অপূর্ব মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এই কাব্যময়তা সংলাপের পক্ষে কোথাও কৃত্রিম বোধ হইতে পারে কিন্তু ইহার কাব্যত্ব অবিসংবাদিত। শের খাঁ ও জাহাঙ্গীরের উচ্ছ্বাসের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেরণার একটা অভাব, শুধু কথার জন্য কথার একটা চেষ্টা, নাটকীয় ধর্মের অনম্বুগ একটা প্রয়াস রহিয়াছে।

স্বগতোক্তিকে যদি নাটকে মানিয়া নেওয়া যায় তবে নুরজাহানের স্বগতোক্তি দীর্ঘ হইলেও সুন্দর; নাট্যকার সেই সকল অংশে নুরজাহানের চরিত্রকে মহাকাব্যের বিরাট পরিধির মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পারম্পরিক সংলাপের মধ্যে চকিত দিক্-পরিবর্তনের বৈচিত্র্য অভিনবত্বের সঞ্চার করে। স্বগতোক্তির কাব্যময় ভাষার মধ্যে প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যবহারিক জগতের আয়ত্তের বাহিরে, মানুষের অন্তর্লোকের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে নাট্যকার স্বেচ্ছা-পরিক্রমণের সনদ পাইয়াছেন এবং প্রাচীনেরা নাটককে যে কাব্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন তাহার অলিখিত স্বীকৃতি আমরা এখানে পাইতেছি।

"এ জীবন একটা জীবন্ত মৃত্যু; হাস্য হাহাকারের বিকার! আলোক অন্ধকারের আর্তনাদ!" "সঙ্গীত—যার পান একটা পিপাসা; উল্লাস যেন একটা আক্ষেপ; হাস্য যেন একটা হাহাকার; আলিঙ্গনে যেন একখানা ছোরা; অমৃত যেন সে গরল; স্বর্গ যেন সে নরক!"—ইহাতে যে Oxymoron-এর এবং "আপনার শাসন দাঁড়িয়েছে এক মাতালের মাতলামি, এক উন্মাদের প্রলাপ, এক উচ্ছৃঙ্খলের স্বেচ্ছাচার।"—ইহার আরোহ অলঙ্কার, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার বৈশিষ্ট্য।

কোথাও বা ইংরেজি রীতিতে গুণবাচক বিশেষ্যের বস্তুবাচক ভঙ্গীতে প্রয়োগের উদাহরণ রহিয়াছে:—"লোল বার্ধক্য তোমার উচ্চ ললাটে এসে বসবে" অথবা "ধ্বংসের ওষ্ঠে একটা হিমকঠিন শাণিত হাসি দেখছি।"

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে "নুরজাহান বহির্গচ্ছন্ জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।"—এই বাক্যটিতে সংস্কৃত শতৃপ্রত্যয়ের যে প্রয়োগ রহিয়াছে বাংলা ভাষায় তাহা অভিনব। দ্বিজেন্দ্রলালের সৎসাহসের ইহা একটি প্রমাণক্ষেত্র।

নাটকে "অস্থিকুণ্ড" শব্দটি লয়লা, নুরজাহান ও সাজাহান—তিনজনের মুখে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কথাটির প্রতি নাট্যকারের এতদূর আকর্ষণ বিস্ময়কর।

মহাবৎ খাঁর "এই বিংশ বৎসর ধরে আমি তোমাদের সেনাপতি"স্থলে বিংশতি বৎসর হওয়া উচিত ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের গঠনরীতি সম্পর্কে একটি অভিযোগ শিথিল-বদ্ধতা। সামগ্রিক হিসাবে দেখিতে গেলে যাহার প্রয়োজন নাটকে গৌণ বা অবান্তর, অথচ অসম্পৃক্ত ভাবে বিচারে অভিনয়োপযোগিতা অথবা, অন্যবিধ সার্থকতা অনস্বীকার্য—এমন দৃশ্যের সংস্থান তাঁহার নাটকে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। প্রাণিদেহের কোন একটি অঙ্গ সৌন্দর্য-বিচারে যতই সার্থক হউক—নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের ন্যূনাধিক হইলে অথবা সমগ্র দেহের সহিত সুসমঞ্জস না হইলে প্রাণিদেহে তাহার সংস্থান সামগ্রিক সৌন্দর্য-বিধানের অন্তরায়। এই দুর্বলতা নাগরিকদিগের, সভাসদ্দিগের সাজাহান খাদিজার এবং কর্ণসিংহ—আসফ খাঁর কয়েকটি দৃশ্যে প্রকট। রেবা ও মহাবৎ খাঁর হিন্দুর পারলৌকিক আদর্শ বিষয়ে কিছু কিছু মন্তব্য অবাঞ্ছিত বক্তৃতার মত শোনায়।

মদ্যপান ও কুণ্ডলধারণ সম্পর্কে যে ফরমানের কথা সভাসদগণের দৃশ্যে রহিয়াছে সে-সব খুঁটিনাটির ঐতিহাসিকতা,থাকিলেও এবং উহার অবতারণা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস হইলেও মূল নাটকে এ দৃশ্য অপরিহার্য নয়।

(পূর্বানুবৃত্তি)

কবি পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"শিখর সেন সত্যই শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে আঁকড়ে ছিল। Every thing is fair in war and love—এই বিদেশী প্রবচনের নির্দ্দেশ মানে নি সে। সে মেনেছিল বিবেককে। বিবেকের বাঁধনে সে নিজেকেও বেঁধেছিল, অবন্ধনাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। অবন্ধনা কিন্তু বাঁধা পড়ে নি। শিখর সেনের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার ছিদ্র দিয়ে সেই যে সে পালিয়েছিল আর ধরা দেয় নি। তাকে কাছে পেয়েও আর অধিকার করতে পারে নি শিখর। তার ধারণা হয়েছিল—ভুল ধারণাই হয়েছিল—যে অবন্ধনা যে পাপ-পথে নেবেছে সে পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনতে পারলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয়ে যায় নি, অত সহজে কিছুই ঠিক হয়ে যায় না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবন্ধনাকে শিখর ভালবাসে নি ঠিক অর্থাৎ ভালবেসে অন্ধ হ'য়ে যায় নি। যে ভালবাসা অন্ধ করতে পারে না সে ভালবাসার জোর কতটুকু ? সে যে অন্ধ হয় নি, অবন্ধনা তা বুঝেছিল। আমার মনে হয় সেই জন্যেই সে ধরা দেয় নি, পাপ পথ থেকেও নড়ে নি একচুল। অবন্ধনার বাবা অদ্ভুত লোক ছিলেন শুনেছি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যান, সন্ন্যাসী হয়ে নয়, জাহাজের নাবিক হয়ে। অবন্ধনার তখন জন্মও হয় নি। যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নাকি বলে গিয়েছিলেন, 'যদি মেয়ে হয় নাম রেখ অবন্ধনা, আর যদি ছেলে হয় তাহলে রেখ মহাকাল। মহাকাল মুখোপাধ্যায়, মন্দ শোনাবে না।' তাঁর নিজের নাম ছিল নীলাম্বর। তিনি আর ফেরেনই নি। ফিরলে হয় তো শিখর সেনের জীবন-কাহিনী অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু আমার মনে হয় এতই গতানুগতিক হ'ত তা যে 'কাহিনী' কথাটার পুরো স্বাদ পাওয়া যেত না তাতে। নীলাম্বর মুকুজ্যে ফিরলে শিখর সেনের জীবনের এই সমুজ্জ্বল মর্ম্মান্তিক পরিণতি আমরা দেখতে পেতাম কি না সন্দেহ। বিদ্রোহী নীলাম্বর জাতের গণ্ডী অনায়াসেই ডিঙিয়ে যেতেন, শিখরের সঙ্গে অবন্ধনার বিবাহের কোন বাধাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কাহিনীটা জমবে বলেই অবন্ধনাকে জন্মাতে হল তার দূরসম্পর্কীয় পিসেমশাইয়ের আশ্রয়ে, গোঁড়া গাঙুলী পরিবারে। সে পরিবারের কর্ত্তা কয়াধুনাথ গাঙুলীকে গ্রামের রসিক ছোকরারা বলত কয়েদী গাঙুলী, এত রকম আচার-বিচারের শৃঙ্খলে তিনি নিজেকে বন্দী করে' রাখতেন। আমি দেখেছি ভদ্রলোককে। শীর্ণ-কান্তি লোকটি, শ্যামবর্ণ, বেঁটে, কপিশ বর্ণের গোঁফ-দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, চোখ দুটি ছোট ছোট রক্তবর্ণ। কয়াধুনাথের পিতা ভবতোষ গাঙুলী ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নাস্তিক ছিলেন। পৌরাণিক দেবতাদের চেয়ে দৈত্যদের তিনি নাকি শ্রদ্ধা করতেন বেশী। তাই ছেলের ওই রকম অদ্ভুত নামকরণ করেছিলেন। বিদ্রোহী হিরণ্যকশিপুকে বিশেষ রকম শ্রদ্ধা করতেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল হিরণ্যকশিপু একজন খাঁটি ভারতীয় বীর ছিলেন, বিজয়ী আর্য্য রাজাদের অনুগ্রহলালিত পুরাণকারেরা বিদ্বেষ-বশত তাঁর গায়ে মিথ্যা কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেছে। তিনি বলতেন পরবর্ত্তী যুগেও এ ঘটনা ঘটেছে। হর্ষ-বর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্ট বাঙালী বীর শশাঙ্ককে হেয় করতে কুণ্ঠিত হন নি। কয়াধুনাথ নিজ পুত্রের নাম যদি প্রহ্লাদ রাখতেন বেশ মানানসই হত—কিন্তু তিনি সুর আর একটু চড়িয়ে ছেলের নাম রাখলেন জগন্নাথ। ভবতোষ ছিলেন গোঁড়া নাস্তিক, কয়াধুনাথ হলেন গোঁড়া আস্তিক। জগন্নাথ হয়েছেন গোঁড়া কেরাণী। আস্তিক্য নাস্তিক্য কোন কিছুরই ধার ধারেন না তিনি।

এই কয়াধুনাথের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে' নীলাম্বর-দুহিতা অবন্ধনা যে ইতিহাস সৃষ্টি করল তা চিরন্তন

ইতিহাস। একজন ধনীর ড্রয়িংরুমে আমি একবার এই চিরন্তন ইতিহাসের অপরূপ নজির দেখেছিলাম মনে পড়ছে। সুদৃশ্য টবে একটি বিদেশী ফুল ফুটেছিল। ড্রয়িংরুমের জানলাগুলো বন্ধ ছিল কাচের দরজা দিয়ে। তবু কিন্তু সেই বন্দিনী বিদেশিনীর বর্ণমদির গন্ধ-সুষমা ব্যর্থ হয় নি সেদিন। ওই বন্ধ ঘরের ভিতরও ভ্রমর এসেছিল দু'একটি, গুঞ্জন করছিল ফুলটিকে ঘিরে। যে গোঁড়ামির প্রাচীর দিয়ে কয়াধুনাথ তাঁর পরিবারকে ঘিরে রাখতেন সে প্রাচীর লঙ্ঘন করতে অবন্ধনারও যে বিলম্ব হয় নি—তার জীবন-কাহিনীই তার প্রমাণ। নীলাম্বর মুকুজ্যে আর ফেরে নি, কিন্তু তার দুঃসাহসী কবি-প্রকৃতি ফিরে এসেছিল তার কন্যার চরিত্রে। নীলাম্বরের স্ত্রী মৃন্ময়ী ছিলেন অতিশয় কোমল-হৃদয়া। কন্যাকে শাসন করতে পারতেন না, কয়াধুনাথের প্রখর শাসন থেকেও বাঁচাতে চেষ্টা করতেন তাকে যথাসাধ্য। অবন্ধনার কোনও দুষ্কৃতিই কয়াধুনাথের কর্ণগোচর হত না। দৃষ্টি-গোচর হবারও উপায় ছিল না, কারণ কয়াধুনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত শাস্ত্রসম্মত পরলোকের দিকে। ঠাকুর ঘরেই অধিকাংশ সময় কাটত তাঁর জপ-তপ নিয়ে। কয়াধুনাথের পত্নী ষোড়শী ইচ্ছে করলে হয়তো অবন্ধনাকে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তিনিও সে ইচ্ছে করেন নি, কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথই অবন্ধনার চিত্তকে বহুমুখী করেছিল। জগন্নাথই প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে আমবাগানে ঘুরে বেড়াত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত। স্বামীর কাছে অবন্ধনার দুষ্কৃতি কীর্ত্তন করতে গেলে জগন্নাথেরও করতে হয়। পুত্রবৎসলা ষোড়শী তা করতে ভয় পেতেন, কারণ স্বামীকে চিনতেন তিনি। সুতরাং অবন্ধনা সত্যিই অবন্ধনা হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। শিখর ছিল জগন্নাথের প্রতিবেশী এবং সহপাঠী। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই অবন্ধনার সঙ্গে শিখরের পরিচয় ঘটেছিল। শিখর, জগন্নাথ, চন্দ্রমোহন এবং আমি—আমরা সব এক স্কুলেই পড়তাম। কিন্তু অবন্ধনাকে আমি কখনও দেখি নি, দেখবার সুযোগই হয় নি। কারণ আমি আসতাম ভিন্ন গ্রাম থেকে। অন্য দিকে মন দেবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না আমার, কারণ তখন থেকেই···ওই বোধহয় আলেয়া এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়···নীলাম্বরীখানা পরেছে মনে হচ্ছে···ও কি জানে যে আমিই ওকে রোজ দেখি···"

কবি তদ্গত চিত্তে লিখিয়া চলিয়াছিলেন। সম্মুখের আলোকিত শুভ্র দেওয়ালে দুইটি বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতি আসিয়া পাশাপাশি বসিল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কবি কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, তিনি নূতন একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন।

শিখর সেনের ডায়েরি

১৭-৬-৩৪

ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবল্‌স্' পড়লাম। অদ্ভুত বই। মাঝে মাঝে অনেক জায়গা বুঝতে পারি নি। মনে হচ্ছিল যেন জঙ্গলে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলছি। অচেনা কথার জঙ্গল, ঘটনার জঙ্গল, মানব—মানবীর জঙ্গল। সমস্তই অচেনা, সমস্তই অপরিচিত। এই অচেনা অপরিচিতের ভীড়ে একটুও ভয় করছিল না কিন্তু, আনন্দ হচ্ছিল। এদেরই মধ্যে চেনা এবং পরিচিতের আভাস পাচ্ছিলাম, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এরা আমার চেনা লোকই, অনেকদিনের চেনা, কিন্তু কোথায় কি যেন সব অদল বদল হয়ে গেছে বলে' চিনতে পারছি না। খুব ভাল লাগল জ্যাভার্টকে। মনে হল যেন খাঁটি একটি আর্য্যচরিত্র মহাভারত থেকে উঠে এসেছে। আমাদের দেশে পুলিশের লোককে লোকে ঘৃণা করে কেন? এদেশে কি জ্যাভার্টের মতো পুলিশ অফিসার নেই?···এ দেশে আমাদের ক্লাসের জগুর বোন অবু আজও এসেছিল দক্ষিণ-পাড়ার বাগানে। নিজের সম্বন্ধে মেয়েটির ধারণা খুব উচ্চ বলে' মনে হল। তার ধারণা সে যদি নিজের মুখে কোনও জিনিস চায় তাহলে তাকে তা দিতেই হবে। তার দাবীকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। অনায়াসেই আমাকে বলে বসল ওই উঁচু ডাল থেকে আমাকে পেয়ারাটা পেড়ে দাও না। পেয়ারা অবশ্য আমি পেড়ে দিলাম, কিন্তু ওরকম বলাটা কি ওর উচিত হয়েছে? একটু পরেই দেখি বিশাই বাগদির ছেলে নব্‌নে এক ঝাঁক পদ্মফুল এনে হাজির। অবুর আদেশেই না কি সে-ও সাপে-ভরা পালং-দীঘিতে নেবেছিল পদ্মফুল জোগাড় করতে। একটা আধফোটা পদ্ম নিজের মাথায় গুঁজতে গুঁজতে এমন ভাবে সে চাইলে আমার দিকে, যার অর্থ—দেখলে? তুমি আমাকে সামান্য একটা পেয়ারা পেড়ে দিতে

ইতস্তত করছিলেন—বনে প্রাণ তুচ্ছ করে পদ্মফুল আনতেও দ্বিধা করে নি! বেশ একটু অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে অবু। জগন্নাথকে তো সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না দেখলাম। অথচ জগন্নাথ ওর দাদা। অন্তত চার পাঁচ বছরের বড়। আগে তুমি বলত, এখন তো তুই-তোকারি করে। চাকরের মতো ফরমাস করে, আর জগন্নাথটা ওর ফরমাস খেটে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। যে সামান্য একটা অ্যালজ্যাব্রার অঙ্ক বুঝতে পারে না, তার কি কোন পদার্থ আছে…"

প্রথম প্রজাপতি দ্বিতীয় প্রজাপতিকে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বাণী, ভিক্টর হুগো লোকটি কে? আমিই অবশ্য সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না—"

"ভিক্টর হুগো একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি"

"ও। আচ্ছা, অ্যালজ্যাব্রা জিনিসটা কি বল তো"

"গণিত শাস্ত্রের একটা শাখা"

"ও"

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রথম প্রজাপতি বলিল, "গল্পটা তোমার ভাল লাগছে বাণী?"

আমি শুধু অপ্রকাশকে প্রকাশ করছি। আমার ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগার কথা আমি ভাবছি না, কোন কালেই ভাবি না। ভবিষ্যৎযুগে মানুষের মনীষা যে মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টি করবে সে-ও ভাববে না—"

"হেঁয়ালি ছাড়। এখনি আর একটা মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলুম, বুঝলে—"

"কি"

"কালকূটকে দেখতে পেলুম। দেখলুম পর্ব্বতপ্রমাণ কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ থেকে যে কঙ্কাল মেঘমালতীর রূপ ধারণ করে' কালকূটকে ইঙ্গিতে ডাকছিল সে যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ছে—আর কালকূট ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তার পিছু পিছু।…"

"আপনি ওই সব ভাবছেন তাই কবির লেখাও থেমে গেছে দেখুন। উনিও ভাবছেন বসে' বসে'—"

"ভাবুক একটু। চল আমরা একবার চার্ব্বাকের খবরটা নিয়ে আসি"

প্রজাপতি-যুগল বাতায়নপথে বাহির হইয়া গেল।

১৬

নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা নিগূঢ় মহিমা আছে। সন্ধ্যাকালে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে গভীর রাত্রে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। সেই আত্মপ্রকাশের ছন্দ অত্যন্ত মৃদু, অতিশয় প্রচ্ছন্ন, অতীব নিগূঢ়। তাহাতে কোনও ঝনৎকার নাই, তাড়াহুড়া নাই। নিদ্রিত পৃথিবীর বুকে তাহা স্বপ্নের মতো অতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে। জ্যোৎস্নাকুল নিশীথ রাত্রিতে যাহারা জাগিয়া থাকে তাহারা প্রথমে বুঝিতে পারে না যে তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, বুঝিতে পারে না যে তাহারা রূপ-লোকের ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত হইয়া অরূপলোকের কল্পনায় নিমগ্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রির গহন মর্ম্ম হইতে যে নীরবতা নিখিল বিশ্বকে সমাচ্ছন্ন করে তাহাও যে ভাষাময়, তাহারও যে গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে চিন্তাশীল দ্রষ্টার নিকট তাহা বেশীক্ষণ অজ্ঞাত থাকে না। স্বকীয় বিস্তার শত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহার চিন্তাধারা জ্যোৎস্নাপ্লুত হইয়া যায়। তাহাতে তীক্ষ্ণতা থাকে না, সীমারেখা থাকে না। চার্ব্বাকেরও ছিল না। অজানা গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী এক প্রান্তরে চার্ব্বাকও জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিল। সুরঙ্গমার কথাই ভাবিতে-ছিল। কিন্তু সে চিন্তাধারায় যে নূতন সুর বাজিতেছিল তাহা আর কখনও বাজে নাই। তাহার মনে হইতেছিল যুক্তি দ্বারা কি সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করা সম্ভব? সুরঙ্গমা শুধু রূপসী নয়, সে বুদ্ধিমতীও। চার্ব্বাক যে সব যুক্তি তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, একথা মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তবু সে অনায়াসে চলিয়া আসিল কেন? সে কি কুমার সুন্দরানন্দের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না? সে কি বলিতে পারিত না মৃগয়া-অভিযানে যোগদান করিবার তাহার অভিরুচি নাই? যেরূপ তৎপরতার সহিত সাগ্রহে সে চলিয়া গেল তাহাতে এই কথাই মনে হয় যে চার্ব্বাকের যুক্তিগুলি যতই সুচিন্তিত হউক না কেন তাহা সুরঙ্গমার হৃদয়স্পর্শ করে নাই। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই যে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সেই বিকট দানবের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একদা সে যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা যে অলঙ্ঘনীয় এ ধারণা তো চার্ব্বাক কিছুতেই অপনোদন করিতে পারে নাই। কেন? যুক্তিতো নির্ভুল, চার্ব্বাকের বাক্‌পটুতাও অসাধারণ, সুরঙ্গমাও বুদ্ধিমতী—তবে কেন এ অসাফল্য? আর একটা কথাও চার্ব্বাকের মনে হইল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সে-ই বা সুরঙ্গমার অনুসরণ করিতেছে

কেন! তাহার কুসংস্কার দূর করাই কি উদ্দেশ্য? তাহা তো নয়। তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিজের পৌরুষ চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার নিকট নাস্তিক্য-যুক্তিজাল বিস্তার করার আর কোনই অর্থ নাই বা ছিল না। সে জালে ধারামতী ধরা দিল, তাহাকে শেষে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল, কিন্তু সুরঙ্গমা তো অবলীলাক্রমে তাহা এড়াইয়া গেল! "গেলেই বা"—চার্ব্বাক নিজেকেই প্রশ্ন করিল—"তুমিই বা তাহার জন্য এত উতলা কেন? অঙ্গনা-আলিঙ্গনই যদি পৌরুষ হয় তাহা হইলে যে কোনও অঙ্গনাই তো তাহার জন্য যথেষ্ট? একটি বিশেষ অঙ্গনার জন্য তুমি ব্যস্ত কেন? নিছক দৈহিক মাপকাঠি দিয়া যদি বিচার করিতে হয় তাহ হইলে শবরীকন্যা ধারামতী কি সুরঙ্গমা অপেক্ষা অধিক লোভনীয়া ছিল না? তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুরঙ্গমার ধ্যান করিতেছ কেন? সুরঙ্গমার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য তুমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছ!"

চার্ব্বাক জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের অযৌক্তিক আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শেষ দেখা

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সুপারির বনে সবুজ রঙের ভিড়
আলোর পালকে আঁধারের ঘুম জড়ো,
রূপনারাণের তীরেতে দুজনে দাঁড়াই;
মনে হল যেন জীবন এত কি বড়ো?
উঁচু বাঁধটার পাশ দিয়ে আসা গ্রামে
বাতাসেরা খেলে পাট-চারা-ওঠা ক্ষেতে,
'নেপিয়ার' ঘাস পুকুরের পাড়ে পাড়ে
নিম ফুলগুলি ঝরে পড়ে বাতাসেতে।
নদীতীর ঘিরে খেজুরের সারি শেষে
আকাশ মাটিতে দিগন্ত যেথা লীন
পৃথিবীর এই সীমিত প্রকাশ জানি,
খুব ভালো লাগে, বলেছিলে একদিন!
এ প্রাণ এমনি অসীম কালের পথে
পাড়ি দিয়ে চলে আলো আঁধারের তীরে,
এ জীবন তার সীমিত প্রকাশ শুধু
মহানাটকের যবনিকা ঘিরে ঘিরে।
এখানে অনেক জাহাজের মৃত্যুতে
পলিমাটি ঢাকা মাস্তুল জেগে রয়
বিস্মরণের সাদা কঙ্কাল পরে
স্মৃতির শেওলা তবু কেন জড়ো হয়।
বিচ্ছেদ জেনে যে মিলন পথে চলে
বিদায়ের দিনে চোখ তারো ভরে জলে।

ক্ষান্তি

প্রভাময়ী মিত্র

ওরে ও বাঙালী ক্ষুব্ধ হৃদয়,
ওরে উন্মাদ লুব্ধ,
ফিরিস নে আর মায়া-মদে ভোর
মোহ মরীচিকা মুগ্ধ।

বাসনা-সাগর মন্থন করি,
সব আসক্তি ভুলিয়া—
নীল হলাহল গণ্ডূষে ভরি
নে রে অমৃত তুলিয়া।
প্রেমের তপ্ত ফেনিল মদিরা
প্রাণের পাত্র ভরিয়া,
প্রিয়ার রক্তকমল অধরে
নিঃশেষে দে রে ধরিয়া।

রাঙা গাল তার আরও রাঙা হোক
ও তরল সুধা চুমে,
অনুরাগরাগে ঢলঢল চোখ
মুদিয়া আসুক ঘুমে।
প্রেমের পরশ-পাথর পরশি
লোহা হোয়ে যাবে সোনা,
চির বিরামের আরামে ঘুমাবি
শেষ হবে আনাগোনা॥

শিকারী-জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

চৈত্রমাস! আকাশে টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘ। গুমোট গরম—রুদ্ধশ্বাসে পৃথিবী যেন এক বিরাট প্রলয়ের প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে!

লালগোলায়, বৈঠকখানা ঘরের মধ্যেকার গরমও নেহাৎ কম নয়! কয়েকজন ব'সে গরম গরম বোলচাল দিয়ে চলেছে—বৈদ্যুতিক পাখার শক্তি কি তাদের ঠাণ্ডা করে। মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ।

বহুদিন পূর্ব্বের কথা। বঙ্গীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে, কে কোথায় দাঁড়াবে, কে কি রকমে, একটা নূতনত্বের প্যাঁচ ক'সে, ইস্তাহার ম্যানিফেষ্টো, বুলেটিন্ প্রভৃতি গদ্যে পদ্যে বিদ্যে জাহির ক'রে, মানবজাতির চোখে মায়া কাজল পরিয়ে দেবে, আর কেমন ক'রেই বা আস্তিন গুটিয়ে, বক্তৃতার দাপটে স্বর্গলোক মর্ত্ত্যে নামিয়ে এনে, "বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের" মত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌বে—তারই একটা তুমুল তর্কের ঢেউ ব'য়ে চ'লেছে। বিভিন্ন কণ্ঠের বিভিন্ন সুর গান্ধার হ'তে পঞ্চম পর্য্যন্ত যেন বিভিন্ন পর্দ্দায় খেলা ক'রে চলেছে। কেউ তার মধ্যে ডুবে গিয়েছে, কেউ ডুব দিয়ে ভেসে উঠেছে, আর কেউ বা অথৈ জলে তলিয়ে গিয়ে ভবিষ্যতের রঙীন চিত্রাঙ্কনে মশ্‌গুল—ভাবটা এই, একবার ঢুকে কায়েম মোকাম হ'য়ে ব'স্‌তে পাল্লে যে হয়!

আমি নীরব। তাদের চোখ মুখের ছবি, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব শুধু মনের গভীরে ছাপ দিয়ে চ'লেছি।

জনৈক বন্ধু আমার দিকে চেয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে ব'ল্‌লেন, "তুমিও এবার দাঁড়িয়ে পড় না—Politicsএ তোমার taste নেই কেন, বল' ত'?"

সপ্রতিভের মত উত্তর দিলাম, Politics না Polytricks? তা' ছাড়া তোমরা যখন দাঁড়াও, আমার যে তখন ব'স্‌বার সময়।—ও সব দিল্লীর লাড্ডু তোমরাই খাও ভাই—আমার ধাতে সয় না—বিশেষ এই ইংরেজ আমলে!"

তর্কে বিতর্কে, হাস্যপরিহাসে, বৈঠকখানা বেশ একটু সরগরম! সিগারেটের ধূম্রজালে ঘরটি আচ্ছন্ন। এমন সময় আমার এক আত্মীয় প্রবেশ ক'রে, নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন ক'র্‌লেন, "বলি মাছের দর কত?"

জবাবটাও ready-made কেউ হেসে, কেউ বা কেশে, রুই কাত্‌লা, ইলিশ মাছের বাজার-দরগুলো এক নিঃশ্বাসে আউড়ে গেলেন। আগন্তুক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে, আমার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—পুঁটী মাছের প্রাণ রে ভাই—অত রুই কাত্‌লার ধার ধারি না!

নবাগতের নাম পতিতপাবন। চুল উস্কোখুস্কো, মুখে রিক্ততার ছায়া—চোখে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা!

আমি তখনই তা'র কথার প্রতিবাদ ক'র্লাম, "না ভাই—আমি তা' স্বীকার করি না। পুঁটীমাছের প্রাণ হ'লে কি আর বাঘ শিকারে যাও?—যা'ক্‌গে, এখন খবর কি বল ত'? বাঘ্ টাগ্ কিছু প'ড়্‌ল—না ফস্কে গেল?"

—খবরের কথা ব'ল্‌ছ'?—সে ভাই আর শুনে কাজ নেই—। হ্যাঁ—তবে একটা সর্ত্তে ব'ল্‌তে রাজী আছি—যদি না হেসে ওঠো।

—এতো বড় কঠিন সর্ত্ত।—আমার হাসিটাও কেড়ে নিতে চাও?—তাই না হয় চেষ্টা করা যাবে—এখন ব'লেই ফেল না ব্যাপারটা কী!

—"ব্যাপার গুরুচরণ!" পতিতপাবন অধীর হ'য়ে বলতে সুরু করেই একটু থেমে আবার বলতে লাগ্‌লো—"জানই ত' কাল সন্ধ্যের পর জঙ্গলে গিয়ে মাচানে উঠ্‌লাম। বন্দুকের নলে টর্চ্চটা এঁটে নিয়ে বেশ জুৎসই হয়ে বসেছি। সাম্‌নেই "বেট্"টা পড়ে ছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে আছি—মশা'য়ের আর দেখা নেই—কেমন যেন ঘুমে চোখটা জড়িয়ে এল'। সেখানে সিগারেট টান্‌বার উপায় নেই—তাই একটু হাত পা গুটিয়ে মাচানে দেহটা এলিয়ে দিতেই কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়্‌লাম, জানি না।"

—তারপর জেগে উঠ্‌লে কেমন করে?

—আমি জাগিনি'—আমায় জাগিয়ে দিলে—ধড়মড় ক'রে উঠে দেখি, বেশ রোদ উঠেছে—বাঘটাও কখন যে এসে মনের সুখে "বেট্" খেয়ে সরে পড়্‌লো—সেটাও জান্‌তে পারি নি'।—তারপর—

তারপর পতিতপাবনকে আর ব'ল্‌তে হ'ল না। সমস্ত কক্ষটি যেন দমফাটা হাসিতে ফেটে যাবার উপক্রম!

আমি যথাসম্ভব গম্ভীর—হাসবার উপায় নেই—! পতিতপাবনকে ব'ল্লাম—"বলে যাও, তারপর—"

—তারপর যা'রা আমার বন্দুকের আওয়াজের অপেক্ষায় গোটারাত মশা তাড়িয়েছে—তারা আমাকে এই ধরে ত' সেই মারে—আর কি যে অম্ল মধুর বচন—মাইরি ভাই, কী আর ব'ল্‌ব!

জনৈক বন্ধু সচীৎকারে বলে উঠ্‌লেন—"ব্রেশ্—মচৎকার! বিলেতে জন্মালে মাথাটা যে তোমার ইন্‌সিওর ক'রে রাখ্‌তো হে।"

পতিতপাবন ও সবকথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। সোৎসাহে আমার দিকে চেয়ে ব'লে যেতে লাগ্‌লো—

"ও বাঘটা বেশী দূর যায় নি'—পাশের জঙ্গলেই আছে—এই যা' সুখবর—একটা চাষী—নাকি জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে এসেছে। আমি আর পায়ে হেঁটে সাহস ক'র্‌লাম না—তারপর যে রকম টায়ার্ড!"

একজন পুনরায় টিপ্পনী কেটে উঠ্‌লেন—"ব্রাভো—একটা শিকারী বটে!—গোটা রাত ঘুমিয়ে বেলা ন'টায় বাবু বাড়ী ফিরে এলেন—তার

পরেও কিনা টায়ার্ড—কোন্ মুখে এ কথাটা বল্লে, ভায়া—একবার দেখিতো !

—কেন, ঘোমটা দিয়ে আছি নাকি—? যত ইচ্ছে দেখ না—কে বারণ ক'রে ?

যা হোক্, ইলেকশনের বাগ্ বিতণ্ডা আপাততঃ শিকেয় তোলা রইল। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ব'ল্লাম—

—চল ভাই, এক্ষুণি সব শিকারে যাওয়া যাক্—কে আছো—?—ছুটো মোটর আন্‌তে বল।

একজন ক্ষীণ প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লো—"একি বলছো, বন্ধু ?—না খেয়ে দেয়ে যাওয়াটা কি—"

—হ্যাঁ, খুব ঠিক হ'বে। তা' ছাড়া, তিনি ত' আর নিজের প্রাণটা বলি দেবার অপেক্ষায় বসে থাকবেন না !—আমাদের খাবারটা পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে যাচ্ছি।

সবাই চট্‌পট্ তৈরী হ'য়ে নিলে। আমিও খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট সার্ট পরে আমার রাইফেল টোটা নিয়ে মোটরে চেপে ব'স্‌লাম।

আমাদের বাড়ীর সামনেই বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির—বন্ধুরা যাবার সময় যুক্তকরে প্রণাম জানালে—জয়মা কালী, দয়া কোরো মা, যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি।

সহাস্যে উত্তর দিলাম—"এখন যে বড় ভক্তি দেখি—এই সব সময় আর পরীক্ষা দেবার আগে ভক্তিটা বুঝি খুব বৃদ্ধি পায়—?"

—"সেটা ত' একশ বার—গু'তোর চোটে বাবা বলায়—" ব'লেই পতিতপাবনের চক্ষু মুদ্রিত—মা কালীর উদ্দেশ্যে আর একটি সভক্তি প্রণাম !

মাইল পাঁচেক এগিয়ে আমরা চিরবাঞ্ছিত জঙ্গলে এসে প'ড়্‌তেই পতিতপাবন ব'লে উঠ্‌লেন—"ইউরেকা—এই যে আমরা তপোবনে এসে প'ড়েছি—"

—তপোবন—মানে ?

—অর্থাৎ, যে বনে কা'ল তপস্যা ক'রে গিয়েছি—অনেকটা জড় সমাধির মত—আর তুমিও এসেছো আজ শেষ আহুতি ঢাল্‌তে—

জনৈক বন্ধু মৃদু হাস্যে—"পতিতপাবন আজ যে তুরীয় মার্গে—ভাগ্যে, কাল চিরসমাধি হয় নি।"

পতিতপাবনের বিকৃতকণ্ঠ: "বাবুর রসিকতা হ'চ্ছে !"—সদ্য কুইনিন্ মিক্‌শ্চার সেবন করার মত যেন তার মুখভঙ্গী !

আমরা মোটর থেকে নেমে দেখ্‌লাম, জঙ্গলের ধারে দশ বারোজন দাঁড়িয়ে—তন্মধ্যে একজনকে পতিতপাবন হাতছানি দিয়ে ডাকলে—"কৈ হে তালেবর, তুমিই না ব'লেছিলে বাঘটাকে নিজের চোখে দেখেছো—এ খবরটা জানিয়ে দিতে—এখন দেখিয়ে দাও কোথায় সেটা।"

সেও খুব পালোয়ানের মত এগিয়ে এল—

—ঐ, ঐ যে দূরে একটা মস্ত বড় গাছ—তার পরেই একটা খাড়ি—বাঘটা সেখানে ঘুমিয়ে আছে—এক্ষুণি আবার দেখে এলাম।

বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন হেসে উঠে বললেন—"বাঘটাও বুঝি পতিতপাবনের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছে—এত গোলমালেও জাগবার নামটি নেই"—

—না ভাই, পেটভরে খেয়ে ও'রা একবার ঘুমুলে আর শীগ্‌গীর জাগতে চায় না—এটা আমি আগেও দেখেছি।

—জানোয়ারের বেলায় দোষ নেই, যত দোষ মানুষের। কা'ল রাতে আমাকে এমন পেট ভ'রে খাইয়ে দিলে যে আমারও সেই অবস্থা।

ইলেকশন-ফোবিয়াগ্রস্ত বন্ধুটি যেন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন—"কেয়া বাৎ—জানি, জানোয়ার আর তোমাতে কোনোই তফাৎ নেই।" আমার দিকে চেয়ে সাধুভাষায় বললেন, "তা হ'লে যাও বন্ধু, তুমি একাই যাও—বিজয়গর্ব্বে ফিরে এস—আমরা এখানে দাঁড়িয়ে তোমার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাক্‌ব—তোমার কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরিয়ে দেব—আর তোমায় অভিনন্দন—"

তা'র কথা শেষ না হ'তেই আর একজন ছৈজেন্দ্রিক ষ্টাইলে টিপ্পনী কাটলেন—"তা বটেই তো—তা' বটেই তো—

বাঘের জন্যে প্রাণটাই যদি দি'—

না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?"

এই সব মুখরোচক চাট্‌নী চ'ল্‌ছিল মন্দ নয়, কিন্তু আমার সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই—আমার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ঐ দূরের গাছটার প্রতি নিবদ্ধ।

"তবে তাই হোক্"—বন্ধুদের বল্লাম—"তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো—পতিতপাবন আর তালেবর আমার সঙ্গে আসুক।"

পতিতপাবন কিছুতেই যেতে রাজী নয়—কুণ্ঠার সঙ্গে বলে—পায়ে হেঁটে বাঘ শিকারে যাওয়াটা তার না কি পোষাবে না—

—আরে তুমিই ত' মূল গায়েন—সেটি হবে না—সঙ্গে যেতেই হবে। আর তালেবর, তুমিও চল, ভাই—দেখিয়ে দাও—বাঘটা কোন্ কুঞ্জে সুখনিদ্রায় বিভোর হ'য়ে আছেন।"

খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেই পতিতপাবন একটা বন্দুক নিয়ে আমার সঙ্গে চলতে লাগলো। আমার রাইফেলটা নিয়ে পশ্চাতে তালেবর। খাঁ সাহেবের কি বক্তৃতা !

"আমরা মুসলমান—জানের ডর করি না—উপরে খোদা আছেন—আর নীচে আপনি।"

আমার উচ্চহাস্যে আমি নিজেই চম্‌কে উঠলাম—

বল কি হে তালেবর ?—খোদার নীচেই আমার স্থান দিয়ে ব'স্‌লে ? এত বড় সার্টিফিকেট আমি যে কিছুতেই হজম করতে পারব না।"

ঊর্দ্ধে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যেন আকাশখানাকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছে, আর নীচে রৌদ্রতপ্ত ধরণী।

আমরা তিনজনে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চলেছি আর তালেবরও তার সমগ্র ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে কথা ব'লে চলেছে—আর আমি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে পতিতপাবনের সঙ্গে আমার ব্যবধানের দূরত্ব কমিয়ে নেবার জন্যে তার দেহটা তাড়াতাড়ি চালিয়ে আসতে তাগাদা দিয়ে চলেছি।

সেও বন্দুকটা ঘাড়ে নিয়ে বড় বিরক্তির সঙ্গে মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়ে মন্থরগমনে এগিয়ে আসে, আর বিড় বিড় ক'রে ব'লতে থাকে—পায়ে হেঁটে বাঘ শিকারে গিয়ে বেনাহক্ প্রাণটা খোয়ানোর কি যে মানে—তা' বুঝিনে—এমন খেয়ালী মানুষের পাল্লায় যে পড়েছি—সে কথা আর বলে কাজ নেই! এ জানলে কোন্ ব্যাটা খবর দিত'।

কখনও পাতলা—কখনও বা ঘন জঙ্গল দিয়ে বন হ'তে বনান্তরে এগিয়ে যাবার সময় পতিতপাবন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে পাশের মাচান দেখিয়ে ব'ল্লে, "বুঝলে এইখানে কালকে"—

কথা শেষ হবার আগেই তালেবর পতিতপাবনকে মৌনব্রত গ্রহণ করবার উপদেশ দিলে। আর সেও তখুনি কম্যাণ্ডারের নির্দ্দেশানুযায়ী রুদ্ধবাক্ অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল—তার সঙ্গে আমিও। তালেবর আমার হাতে বন্দুকটা ফিরিয়ে দিয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে—

"ঐ দেখুন, বাঘটা পালিয়ে যায় কি না—দেখবার জন্যে, দুটো গাছে দুজন মানুষকে বসিয়ে রেখেছি—তা' ছাড়া একটা চিহ্নও রেখে এসেছি—যেন পথ ভুলে না যাই—একবার "পুছ্" করে আসি—আছে, না ভেগে পড়েছে। দেখছেন হুজুর, আমি সে রকম বে-আক্কেলে নই"—বলেই সে একবার সগর্ব্বে আমার দিকে চাইলে।

সে চাহনির অর্থ—তোমাদের চেয়ে আমি কোনও অংশে কমবুদ্ধি রাখি না—আর সাহসটাও যথেষ্ট আছে। ভাবার্থ বুঝেই তাকে বাহবা দিয়ে বললাম—"সত্যিই তুমি বাহাদুর।"

সেও আমার তারিফটা বেমালুম হজম করে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, আমি সেটা নিজেও জানি। একটু দাঁড়ান আমি এক্ষুণি ফিরে আস্‌ছি—" বলেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে অপেক্ষাকৃত গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

ইতিমধ্যে পতিতপাবন আমার দিকে ফিরেই আবেগভরা-কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার বিদায় দাও।"

মনে পড়ে গেল গোবিন্দলালের কাছে রোহিণীর সেই কাতরোক্তি ও প্রাণভিক্ষা!

—তুমি কী পতিতপাবন? তুমি নাকি এর আগেও বাঘ মেরেছ? এ কথা উচ্চারণ করতে তোমার লজ্জা হল না?

—লজ্জা আবার কিসের হা? বাঘ আমার চোদ্দপুরুষে কেউ মারে নি। তবে গাঁয়ের জমীদারবাবুর সঙ্গে শিকারে গিয়েছি বটে! বিস্তর লোকজন আর আট দশটা হাতীও সঙ্গে ছিল—তা' সত্ত্বেও আমার ভয় যে হয় নি'—এ কথাটা আমি হলপ করে বলতে পারি না।

—তবে হঠাৎ তোমার এ দুর্ম্মতিটা হ'ল কেন?

—দুর্ম্মতি নয়—দুর্ভোগ বলতে পার। আমার অনেক দিনের সখ যে জীবনে একটা বাঘ মারব, তাই তোমার পাকা-শিকারী হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে মাচানে বসেছিলাম।

—সে কথা আমি আগেই তার কাছে শুনেছি।

—তোমার ঐ লোকটী কম চীজ নয়—বরুণদেবের কৃপা হ'য়েছে বলে কেবল মাচান থেকে নাবতে চায়।

—তার পর?

—আমি কি ছাড়বার পাত্র? কাজেই সেও উস্‌খুস্ করে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বসে রইল। তারপর, আমার একটু চোখ লাগতেই, কখন যে পিঠটান দিলে, জানতেও পারি নি!

—জানলে আর তোমার এমন আরামের ঘুমটা হোত' না। এখন সত্যি ক'রে বল' তো—তোমার কখনও বন্দুক ধরার অভ্যেস আছে কি?

—বিলক্ষণ! কি যে বল তা'র ঠিক নেই—পাখীর বংশ একরকম নির্ব্বংশই করে ফেললাম, এমন কি সেদিন আমার হাতে একটা কুমীরও অক্কা পেয়েছে, বুঝলে?

—বুঝতে আর আমার কিছু বাকী নেই—

—ছাই বুঝেছ, তা'হলে আর পায়ে হেঁটে বাঘ শিকারে যেতে না। এ যে কী ভীষণ বিপদ, তা তুমি নিজেও জানো না।

—জানি বৈ কি ভাই, খুব জানি। আর এমনি করেই ত' বেশীর ভাগ এই চিতে বাঘগুলো আমি পায়ে হেঁটেই শিকার করে থাকি।

—বেশ, ক'রে যাও—একদিন ভাল করেই মজাটা টের পাবে।

এমন সময় তালেবর ছুটে এসেই, হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্লে, "সব ঠিক আছে—একটা গোটা মহিষের বাচ্চা পেটে পুরে ব্যাটা বেশ ঘুম দিচ্ছে। তা দিক্‌গে,—আর কতক্ষণ?—এবার হুজুর চট্‌পট্!

—তা হ'বে না—কাপুরুষের মত ঘুমন্ত বাঘ শিকার ক'রবো না—তাকে জাগিয়ে মারব।

পতিতপাবনের ভয়াবহ আপত্তি। এবার সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই পিছন ফিরে সটান্ চলতে সুরু করে দিলে।—

"যত সব আদিখ্যেতা—" এমন আবদার নাকি সে জীবনে কখনও শোনে নি।

তা'কে কোনো রকমে ফিরিয়ে অভয় দিলাম।—

—জ্বালারে ভাই—আর সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—তুমি ঐ সামনের গাছটায় উঠে পড়—আর আমি ইসারা করলেই, দয়া ক'রে একটা ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে, তোমার বন্দুকটা একবার অন্তত: কাজে লাগিয়ে দিও, এটুকু পারবে, আশা করি।

—হ্যাঁ, সেটা আমি পারব—তোমরা এখন চুলোয় যাও।

আর কথাটি না ব'লে, কাঠ বিড়ালীর মত পতিতপাবন সোজা গাছের ডগায় উঠে গেল, আর বেশ জুৎসই ক'রে একটা মজবুত ডাল ধ'রে ব'সে পড়্‌ল।

এদিকে আমরা খুব সন্তর্পণে, নিঃশব্দে একটুখানি এগিয়ে গেলাম। সামনের অপেক্ষাকৃত পাত্‌লা জঙ্গলে এসেই তালেবর আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রলে। খুব লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম—খাড়ির ধারে একটা ছোট টিপির উপর "তিনি" অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। খুব কাছে এসে পড়েছি—প্রায় গজ পাঁচিশেক হবে—তবুও বাঘটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না—ঘাসে আর লতাপাতায় তার শরীরের খানিকটা ঢাকা পড়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন সুন্দর কারুকার্য্য করা একখানা ভেলভেটের আসন পাতা আছে।

চুপ্ ক'রে তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছি, আমার পৃষ্ঠদেশে চাপ

দিয়ে একটা নূর এগিয়ে এসে, আমার কানের কাছে অতি নিম্নকণ্ঠে বলে গেল—"আর দেরী কেন ?"

খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—সত্যি, সৌন্দর্য্য উপভোগের সময় এটা ত নয়। আমিও তৈরী হ'য়ে অদূরে উপবিষ্ট পতিতপাবনকে ইসারা করতেই—একটা ফাঁকা আওয়াজ !

বাঘটা বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠেই ঘুমন্ত বনানীকে যেন কাঁপিয়ে তুল্‌ল—আর পলকের মধ্যেই আমার গুলীও তা'র বক্ষ বিদ্ধ ক'রে, তার বিক্রমকে ধরণীর কোলে শুইয়ে দিলে !

সে ঘুমিয়েছিল কুম্ভকর্ণের মত—জেগেও উঠ্‌ল বীরের মত—আবার সে ঘুমিয়ে গেল সুচির নিদ্রায় !

একটা কম্পিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল'—আর একটা—আর একটা—

ফিরে দেখি, পতিতপাবন চক্ষু বিস্ফারিত করে, হাতের ইসারায় কি যেন দেখাচ্ছে ! চ'ম্‌কে চারিদিকে চাইতে সুরু ক'রেছি—ভাবছি, বন্দুকের শব্দে আর একটা বাঘও বুঝি বেরিয়ে পড়েছে।

পতিতপাবন সচীৎকারে বল্‌লে—না-না—তুমি যা' ভাব্‌ছো—তা নয়—বাঘকে আর একটা গুলী কর'—নইলে নাম্‌তে পাচ্ছি না—"

—ওঃ তাই নাকি ! নেমে এসো বীরপুঙ্গব—আর প্রয়োজন নেই—চামড়াটা নষ্ট ক'রে লাভ কি ?

সে বিনাবাক্যব্যয়ে আবার কাঠবিড়ালীর মত সোজা নেমে এসেই আমায় গড় হ'য়ে প্রণাম—যাক্‌, চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে আমায় বাঘের সামনে দাঁড়াতে হয় নি' !—বাড়ী ফিরে একবার গঙ্গাস্নান ক'রব'।

—মনটা গঙ্গাজলে ডুবিয়ে নিও, তা' হলেই যথেষ্ট হ'বে।

তালেবর তা'র বুদ্ধি ও সাহস সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন ! সে এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে ব'ল্‌লে—"দেখলেন ত' হুজুর, কেমন শিকার করিয়ে দিলাম। আপনার হাতে বন্দুক—আর আমি কেমন খালি হাতপা' নিয়ে বাঘের সামনে দাঁড়ালাম।" পতিতপাবনের দিকে চেয়ে সে খুব খানিকটা হেসে দিলে।

তা'র পরই তালেবরের মুখে ঋতু পরিবর্তন ! গম্ভীর হ'য়ে উপদেশ দিলে, "এত ডর কি বাবু ? বন্দুক বগলে নিয়ে আপনি কিনা শেষটায় গাছে উঠ্‌লেন ? বড্ডই সরম লাগে !"

তালেবরের এখন খুব ব্যস্তসমস্ত ভাব ! যে দু'জন লোককে সে আগে থেকেই বাঘের পাহারায় গাছে বসিয়ে রেখেছিল, তাদের একজনকে ডেকে, বাঁশঝাড় থেকে একটা শক্ত দেখে বাঁশ কেটে আন্‌তে বল্‌লে—আর একটিকে লোকজন ডেকে আন্‌বার কথা ব'লে দিলে ! কিন্তু তা'র আর প্রয়োজন হ'লো না। বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই অনেক লোক ছুটে এলো। তালেবর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'ল্লে—"দেখ্‌লেন হুজুর, খোদার দোয়ায় কেমন হাতের কাছে সব তৈয়ার ! আমার বাপজান কখনও আমার ফরমাস দিয়ে কাজ করায় নি।—আরে ব'লেই যদি কাজ করাতে হয়, তবে আর বুদ্ধি কা'রে বলে ?"—চোখে তা'র সজাগ দৃষ্টি—মুখে তার সমজদারের হাসি।

তাকে জড়িয়ে ধরে উত্তর দিলাম—"বাপ মা তোমার সার্থক নাম রেখেছিল—সত্যিই তুমি তালেবর খাঁ।"

তালেবর অসঙ্কোচে পুনরাবৃত্তি করলে—

"সেটা আমারও জানা আছে হুজুর।"

বাঘটা দেখ্‌লাম বেশ বড় আর মোটা-সোটা ! পতিতপাবনের দিকে চেয়ে, তার চোখে চোখ রেখে, সহাস্যে ব'ল্লাম,—"তুমি 'বেট্‌' খাইয়ে মাচান বাঁধিয়েছিলে—নইলে এ শিকার হ'ত না !"

—তা' হ'লে স্বীকার কর—বাহাদুরীটা আমার !

—সে কথা হাজারবার—fools give feast, wise men eat them.

ব্যাঘ্র শিকার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন, আমি প্রাণে বেঁচে আছি—লোকমুখে এই খবর পেয়ে আমার বন্ধুবর্গ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো। বাঘটাকে ভাল ক'রে উল্টে পাল্টে দেখে সব স্তম্ভিত—তারপরে আমাকে স্কন্ধে তুলবার উপক্রম—প্রাণ যায় আর কি ! চারিধার হ'তে অভিনন্দন বর্ষণের পালা সুরু। তার মধ্যে একজন টিফিন-কেরিয়ার দেখিয়ে দন্তপংক্তি বিকশিত করে বলে উঠ্‌ল "ভাই, আমাদের পেটে আগুন জ্বল্‌ছিল—তাই আর তোমায় নিয়ে এক সঙ্গে বনভোজন ক'র্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'ল না ! Sorry—নাও, যা' আছে, তোমরা খেয়ে নাও।"—

এদিকে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। বাঘটাকে বেশ ক'রে দড়িতে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আমরা রওনা হ'লাম। পথে তালেবরের যত বুদ্ধি ও সাহসের কাহিনী একটার পর একটা সে তা'র ঝুলি থেকে বে'র করে যেতে লাগ্‌লো। আর মাঝে মাঝে সবাই ফোড়ন দিয়ে উপভোগ ক'রে চ'লে। বেলা প্রায় একটা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে, পথ হেঁটে চলেছি—কোথাও ভীষণ রোদ, কোথাও বা শীতল ছায়া—সমস্ত জঙ্গলটিকে যেন একটা অজানা রহস্যের মত মনে হচ্ছিল। বনদেবী যেন বনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে তা'র কোলে ডাক দিতে চায়—আশ পাশের ঘন সবুজ ঘাস আমার চোখেমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোমল পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল—হঠাৎ দমকা বাতাসে পত্রপুঞ্জে মর্মর ধ্বনি জেগে ওঠে—যুগযুগান্তের কত যে গোপন কাহিনী কানে কানে বল্‌তে চায়—আমার উদাস মনে এ সবের ছোঁয়াটুকুও যেন লাগ্‌তে চায় না !

আমরা জঙ্গলের বাইরে এসে পড়েছি। পিছন ফিরে দেখি, একটা গাছের তলায় আমাদের শ্রীপ্রতিতপাবন দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থায় মন দিয়েছেন। টিফিন কেরিয়ারটা কখন যে হস্তান্তর হ'য়ে গিয়েছে—আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি। তা'কে অনুরোধ করলাম—"আমার খাবারটা দয়া করে রেখে যেন খাওয়া হয় !"

পতিতপাবনের শান্ত, সমাহিত ভাব—মুখে তা'র দার্শনিকের গাম্ভীর্য্য—বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে উত্তর এলো—"চ'লে এসো—কা'র বাঘ কে মারে—কা'র খাবার, কে খায়—এই তো দুনিয়া !"

দুর্গোৎসব—

দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর নিজস্ব উৎসব। তন্ত্রশাসিত শক্তিপূজক বাঙ্গালী তাহার পরিকল্পনা মূর্ত্ত করিয়া যেমন দুর্গাপ্রতিমা রচনা করে, তেমনই দুর্গোৎসবকে শক্তি-সাধনায় পরিণত করে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-মাতৃকা কি হইবেন, তাহার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই দুর্গা-প্রতিমার চিত্র :—

"দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত ; পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা—নানা-প্রহরণ-ধারিণী—শত্রু-বিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী ; দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী ; সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

বাঙ্গালী মা'র এই রূপ ধ্যান করে, তাঁহাকে পূজা করে। বাঙ্গালী যে স্থানে সুযোগ পাইয়াছে, সেই স্থানেই দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এ বারও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারত রাষ্ট্রে নানা স্থানে বাঙ্গালীর উদ্যোগে দুর্গাপূজা হইয়াছে, সুদূর হায়দ্রাবাদেও এ বার দুইখানি দুর্গাপূজা হইয়াছে—নিজ হায়দ্রাবাদে ও হাকিমপেটে (এয়ার ফোর্সে'র)।

কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্তানে অনেক স্থানে পূজা হয় নাই ; কোথাও কোথাও হইয়াছে বটে, কিন্তু উৎসবে উৎসাহ ছিল না, আনন্দের স্থান আশঙ্কা গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গ ইসলাম রাজ্য। বিশেষ পূজার সময়—নানা কারণে আতঙ্কিত হিন্দুরা দলে দলে পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছিলেন ; যাত্রা হয়ত নিরুদ্দেশ যাত্রা হইবে জানিয়াও যে সকল কারণে তাঁহারা সে যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব।

গতবারের তুলনায় এ বার কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে দুর্গাপূজার সংখ্যা ৮।৯ শত কম হইয়াছে। এই সংখ্যাহ্রাসে যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালী দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় বলে—"পুনরাগমনায় চ।" সে সমস্ত বৎসর আবার পূজার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা যত বিপন্ন হইয়াছে, তত তাহার দুঃখদুর্দ্দিনে সে এই পূজায় অন্ধকারে আনন্দের আলোক পাইবে বলিয়া অপেক্ষা করিয়াছে। গৃহস্থের গৃহে পূজার সংখ্যা হ্রাসে তাই বাঙ্গালী সর্ব্বজনীন (অর্থাৎ যাহাকে আমরা পূর্ব্বে বারোয়ারী—সমবেত বলিতাম) পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু এ বার যে অবস্থা, তাহাতে বহু পূজাই করা সম্ভব হয় নাই।

পূজায় এ বার যে কেহ কেহ বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান দরিদ্রদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান বৎসর বৎসর এই কাজ করিয়া থাকেন, সে সকলের সঙ্গে এ বার একটি নূতন নাম যুক্ত হইল—বীরেন্দ্র স্মৃতি সমিতি (বি, কে, পাল এভিনিউ)। পরলোকগত বীরেন্দ্রবাবুর পুত্রগণ সমিতির মারফতে সহস্রাধিক বস্ত্র দুঃস্থদিগকে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করিয়াছেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান দুঃস্থ-দিগকে সাহায্যদান করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর প্রধান পূজা ও উৎসব। ইহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনীন—বহুজনের সহযোগ ইহার জন্য প্রয়োজন!

দুর্গোৎসবের পরে বাঙ্গালী সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছে—সে নিয়ম যেন অক্ষুণ্ণ থাকে ; বাঙ্গালী যেন মনে করে—প্রার্থনা করে—

"বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

পূর্ব্ব-পাকিস্তান ও হিন্দু—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আবার দলে দলে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন। সেই জন্য এ বার বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে দুর্গোৎসবের সময় বেদনাপূর্ণ হইয়াছে। পাকিস্তান—ভারতে যাতায়াতের জন্য ছাড়-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প প্রচার করিয়া ও হিন্দু বিতাড়নের সর্ব্ববিধ উপায় নবোৎসাহে অবলম্বন করিয়া এই অবস্থা ঘটাইয়াছে। ইহার পরে যদি ছাড়-প্রথা প্রবর্ত্তন কিছুদিনের জন্য স্থগিদ হয়, তবে আমরা তাহাতে বিস্ময়ানুভব করিব না। কারণ, উহা প্রবর্ত্তিত হইবে এই ঘোষণায় হিন্দু-বিতাড়ন নীতি বহু পরিমাণে সফল হইয়াছে।

কেন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা পলায়ন করিতেছেন, তাহার কারণ কাহারও অবিদিত নাই। গত ২৭শে ভাদ্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুইটি সংবাদ হইতে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে—

(১) রংপুর সহরের নিকটবর্ত্তী ডিমলা গ্রামের এক প্রভাবশালী

মুসলমান জোদ্দার এক হিন্দু ডাক্তারকে রোগীর চিকিৎসা করাইবার ছলে নিজ গৃহে ডাকিয়া পাঠায়। ডাক্তার উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলে—তাহার সঙ্গে তাঁহার যুবতী কন্যার বিবাহ দিতে হইবে! ওদিকে সে মোটর পাঠাইয়া ডাক্তারবাবুর গৃহে সংবাদ দেয়, তিনি সহসা পীড়িত হইয়া স্ত্রীকন্যাকে দেখিতে চাহিতেছেন। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ও কন্যা ঐ সংবাদ সত্য মনে করিয়া জোদ্দারের গৃহে গমন করিলে অবস্থা বুঝিয়া কন্যাটি বিবাহে সম্মতি দিয়া পিতামাতাকে রক্ষা করে। বিবাহ হইয়া যাইলে ও পিতামাতা স্বগৃহে ফিরিয়া যাইলে যুবতী তরকারী কুটিবার অছিলায় বঁটী লইয়া তাহা দিয়া আত্মহত্যা করে।

(২) বগুড়ায় এক হিন্দু ভদ্রলোক সিনেমায় গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তিনি কন্যাকে রিক্সায় রাখিয়া জিনিষ লইতে দোকানে গমন করিলে হবিবর রহমন নামক মুসলমান কন্যাটিকে সরাইয়া ফেলে। পরে কন্যাটিকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হবিবর ভারতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

ঐ একই দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটি ঘটনা এইরূপ—

"ভগবানগোলা, ৯ই সেপ্টেম্বর—রাজসাহী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, গত ৫।৬ দিন যাবৎ ভারত-পাকিস্তানের মুর্শিদাবাদ-রাজসাহী সীমান্তে কয়েক শত পাকিস্তানী পাঠান সৈন্য মোতায়েন করা হইতেছে। রাজসাহী জেলার সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে সৈন্যদের আনাগোনা চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে এবং মোটর ট্রাকযোগে রাত্রির অন্ধকারে তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। চারদিন পূর্ব্বে উক্ত সৈন্যদের কয়েকজন গোদাগাড়ীর এক হিন্দুর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে চাপিয়া ধরিলে সে চীৎকার করে। উহাতে আকৃষ্ট হইয়া বহু লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কিছু পরে নাকি তাহারা ঐ স্থানেরই জনৈক বিশিষ্ট হিন্দুর গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া গৃহের নারীদের উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানেও বহু লোক সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসায় তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সফল হইতে পারে নাই।"

এক দিনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ঘটনাত্রয়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান চোরা-কারবার বন্ধ করিবার অছিলায় সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ করিতেছে।

১৫ই আশ্বিন ট্রেণে ৬৬৮৯ জন হিন্দু নরনারী পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। এক দিনের এই হিসাবই অবস্থা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। লোক কেবল ট্রেণেই আসিতেছে না। বহু হিন্দু জলপথে নৌকায় আসিতেছেন। পথে নৌকা আটক করিয়া অনুসন্ধানের কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করা হইতেছে। লোক পদব্রজেও আসিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

অন্য কথার আলোচনার পূর্ব্বে আমরা বলিব—সরকারী হিসাবে প্রকাশ ১৫ই আশ্বিন, ট্রেণে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভারতে আগত মুসলমানের সংখ্যা ১৯০১ জন! পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হয়ত মনে করিবেন—পাকিস্তানে আর্থিক দুর্গতির জন্য এই সকল রাষ্ট্রচেতনাসম্পন্ন মুসলমান—"মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান" ধ্বনি সার্থক হইবার পরেও ভারত রাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা তিনিও জানেন—পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরাও জানে। সুতরাং এই সকল মুসলমানের আগমন সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কি প্রয়োজন নহে? ইহা কি—ইংরেজীতে যাহাকে "ইন্‌ফিলট্রেশন" বলে তাহা হইতে পারে না? যদি হয়, তবে ইহা নিবারণের উপায় কি?

এ দিকে ভারত রাষ্ট্রে এই সকল উদ্বাস্তুকে পুনর্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা শোচনীয়রূপে অসাফল্যের পরিচয় দিতেছে। এক এক দিন শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে ৭ হাজার পর্য্যন্ত উদ্বাস্তু থাকিতেছে। তথায় যে সকল শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকল যে কোন দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, এই উদ্বাস্তু-সমাগম অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত। আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের আন্দোলনকাল হইতে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর প্রতি যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতা অবজ্ঞা করা রাজনীতিকদের কার্য্য নহে। সুতরাং দেশ বিভাগে যাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন, এবং বিভাগের পরে ক্ষমতা পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই অবস্থা অনিবার্য্য বুঝিয়া প্রস্তুত থাকাই কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয়, তাহাই হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে যে মনোযোগ দিলে কাশী-পুরের পাটগুদামে উদ্বাস্তুদিগকে রক্ষার ফলে বহু শিশুর মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হইতেন না—সেই মনোযোগ কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ প্রতিষ্ঠা, সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ প্রভৃতি যে সকল পরীক্ষা বিলম্বে করিলে ক্ষতি হইত না—সেই সকলে দিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালী দুর্ভাগ্য বা অযোগ্যতা বা উভয় বলিয়া মনে করিবে।

যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা যে অবস্থা বিবেচনা করিলে যথেষ্ট নহে—স্বীকার করিতেই হইবে। আর এই কার্য্যে যে সরকার দেশবাসীর সহযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম অনিবার্য্য। সে জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য যথাযথরূপে পালিত হওয়া প্রয়োজন। সমগ্র দেশের লোকমত যেন সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সরকারকে সচেতন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া সে কার্য্যে অবহিত হয়। নহিলে অবস্থা আরও জটিল ও ভয়াবহ হইবে।

কলিকাতার বাজারে মৎস্য—

গত ৫ই ভাদ্র 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের কোন সংবাদদাতা কলিকাতার বাজারে মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলিকাতায় বাজারে যে রোহিত প্রভৃতি মাছ ৩ টাকা ১২ আনা সের দরে (গত বৎসরের মূল্যের তুলনায় শতকরা ৩০ টাকা অধিক)

ও ইলিশ ৪ টাকা হইতে সাড়ে ৪ টাকা সের বিক্রয় হইতেছে, গত বৎসরের তুলনায় এ বার মাছের আমদানী হ্রাস তাহার কারণ নহে ; খুচরা বিক্রেতাদিগের অতিলোভই সেজন্য দায়ী—তাহারা পাইকারী দরের দেড়া দরে মাছ বিক্রয় করে।

মনে হয়, সংবাদদাতা পাইকার (অর্থাৎ আড়তদার) সম্প্রদায়ের কথায় নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় মূল কারণ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। সরকারী হিসাব অনুসারে কলিকাতায় প্রতিদিন গড়ে ১,৭৩০ মণ মাছ আমদানী হয়। এই হিসাব অবশ্য আড়তদারদিগের প্রদত্ত। ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য না-ও হইতে পারে। কারণ, আয়কর আড়তদারদিগের দিতে হয় এবং তাঁহাদিগের সকলেই যে যথাযথ হিসাব দেন, এমন না-ও হইতে পারে।

সে যাহাই হউক, আমদানী যদি ১,৭৩০ মণ হয়, তবে তাহা কত জন খুচরা বিক্রেতার মধ্যে বিভক্ত হয়, তাহা বিবেচ্য। কলিকাতায় খুচরা মৎস্য-বিক্রেতার সংখ্যা ৪ হাজার। যদি প্রত্যেকের ভাগে বিক্রয় জন্য ১৭ সের মাছ পড়ে, তবে প্রত্যেকের ব্যবসার পরিমাণ ও লাভ কিরূপ হইতে পারে ? কারণ ঐ ১৭ সের মাছ সবই রোহিত বা কাতলা হয় না—অর্থাৎ ৩ টাকা ১২ আনা সের দরে বিক্রীত হইতে পারে না। জীবিত ও টাটকা স্থানীয় মৎস্যও তাহার মধ্যে থাকে—যাহাকে "চুণা" বলা হয়, তাহাও থাকিবে।

তাহার পরে খরচের কথা—আড়তের "বৃত্তি", বরফের দাম, মুটিয়ার পারিশ্রমিক, বাজারের "দান" (১২ আনা ?)—এসব ধরিলে দাম প্রায় ১১৫ টাকা মণ দাঁড়ায়। এক মণ মাছ কাটিলে মুড়া, তেল ও কাঁটার ওজনে ১১সের বাদ দিলে কাটা মাছ আঁইস সমেত ২৮ সের হইতে পারে। আবার হোটেল, সামরিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহিত যে চুক্তি থাকে, তদনুসারে সে সকলকে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মাছ সরবরাহ করিতে হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী ওজনের মাছ দিতে হয়। কলিকাতায় লোকসংখ্যাবৃদ্ধিও বিবেচ্য।

এই সকল কারণে কলিকাতার বাজারে মাছের দামবৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মৎস্যের সরবরাহবৃদ্ধিই মূল্যহ্রাসের একমাত্র ও সহজ উপায়। তাহার ব্যবস্থা সরকার করিতে পারিতেছেন না। গত কয় বৎসরে, আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, মৎস্যবৃদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় নাই। তাহা না করিয়া সামুদ্রিক মৎস্য আনিবার জন্য বহু ব্যয়ে ট্রলার আনিয়া তাহার জন্য মাসে মাসে অনেক টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতে যে উল্লেখযোগ্য ফললাভ হয় নাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অস্বীকার করা সম্ভব নহে বলিয়াই মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী বিবৃতি দিয়াছেন—এই ব্যবস্থা পরীক্ষার জন্য, লাভের জন্য। পরীক্ষায় যদি ক্ষতি হয়, তবে তাহা কি সঙ্গত হইবে ?

আমরা এই প্রসঙ্গে ইলিশ মাছের কথা বলিব। এ বার কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহার কারণ যাহাই কেন হউক না, অল্প দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ইণ্ডোপ্যাসিফিক কিমারীজ কাউন্সিলের এক অধিবেশনে সেই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ডক্টর সুন্দরলাল হোরা বাঙ্গালার মৎস্য বিভাগের ডাইরেক্টার ছিলেন। তিনি ধান্যক্ষেত্রে মাছের চাষ চালাইবার চেষ্টায় কিছু অর্থেরও অপব্যয় করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অধিবেশনে তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কয় মাস ইলিশমাছ ধরা বন্ধ করা প্রয়োজন। তিনি যে এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কার করেন নাই, তাহার প্রমাণ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মৎস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ভার পাইয়া কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাঁহাতে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইলিশ মাছ সমুদ্রে থাকে কিন্তু নদীতে প্রবেশ করিয়া "মিঠা জলে" ডিম ছাড়ে। তাহারা যে সময় ডিম ছাড়িয়া—পোনা লইয়া—পরবৎসর আসিবার পূর্ব্বে—সমুদ্রে ফিরিয়া যায়, সেই সময়ে মাছ ও পোনা ধরিলে ক্রমেই মাছের সংখ্যা-হ্রাস অনিবার্য্য হয়। এ দেশে প্রচলিত প্রথা ছিল, বিজয়া দশমীর দিন হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত ইলিশ মাছ লোক খাইত না ; মাছ ধরা হইত না। সে প্রথা "কুসংস্কার" বলিয়া ত্যক্ত হইয়াছে এবং এখন ঐ কয় মাসেও (ইলিশ সুস্বাদু না থাকিলেও) মাছ ধরার বিশ্রাম থাকে না। কিন্তু গুপ্ত মহাশয় আমেরিকায় যাইয়া দেখিয়াছিলেন —ঠিক ঐ সময় তথায় ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ। কারণ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকায় ইলিশ মাছের অভাব অনুভূত হইয়াছিল, তখন অনুসন্ধানফলে দেখা যায়, ঐ সময়ে মাছ ডিম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তথায় ঐ কয় মাস ইলিশ ধরা বন্ধ করায় তথায় আবার ইলিশ মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, কিন্তু ত্যক্ত হইয়াছে—এখন আইন করিয়া তাহা পুনঃপ্রবর্তিত করা হউক।

গুপ্ত মহাশয়ের রিপোর্ট ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পেশ করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য বিভাগ কি তাহা—"সেকেলে" বলিয়া পাঠও করেন নাই ? যদি তাহা না হইবে, তবে গত কয় বৎসরেও কেন ঐ সময়ে বাঙ্গালায় ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয় নাই ?

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। সে জন্য আমরা আক্ষেপ করিলে কোন সুফল ফলিবে না। এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব হইয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, প্রতীচীতে তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, সরকার মৎস্য বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন এবং তথায় মানুষের খাদ্য যোগাইয়া যে যে মাছ থাকে, তাহা যেমন কৃষিকার্য্যের জন্য সাররূপে ব্যবহৃত হয়, তেমনই পশু-খাদ্যেও পরিণত করা হয় এবং তাহাতে গবাদি গৃহপালিত পশুর দুগ্ধের পরিমাণ-বৃদ্ধি হয়। তিনি পশ্চিম বঙ্গের মৎস্য বিভাগ—কৃষিবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে বিভাগ—সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের চেষ্টা ব্যতীত—আর কোন উল্লেখযোগ্য কাজ যে আজও করিতে পারিয়াছেন, এমন পরিচয় পশ্চিমবঙ্গের লোক আজও পায় নাই ! ডক্টর বিধানচন্দ্র আবার য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি কি এ বারও তথায় সরকারী মৎস্য বিভাগের

কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসিতেছেন না? আমরা আশা করি, দেশের ও বিদেশের অভিজ্ঞতা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য বিভাগ অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তাহার ফলে প্রদেশে মৎস্যের অভাব দূর হইবে। দেশের অভিজ্ঞতা যেন বিদেশের অভিজ্ঞতার জন্য উপেক্ষিত না হয়। দেশের লোকের পরামর্শ যেন সাদরে গৃহীত হয়।

প্রেস-কমিশন—

ভারতে সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য যে কমিশন নিয়োগের প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়াছিলেন, এতদিনে তাহার কার্য্য ও সদস্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৭ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) ঘোষিত হইয়াছে, কমিশনকে আগামী ১লা মার্চ্চ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। কমিশনের কার্য্য যে ব্যাপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সকলের মধ্যে ভারত সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও দিয়াছেন। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক-গৃহীত আইনে দেখা গিয়াছে, ভারত সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক ব্যবস্থা করিতে দ্বিধানুভব করেন না।

কমিশনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সদস্যদিগের মধ্যে এক জনও বাঙ্গালী নাই। হিকীর 'গেজেট' ও সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র 'সংবাদদর্পণ' বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয় প্রথম উল্লেখযোগ্য হিন্দী সংবাদপত্র—'হিন্দী বঙ্গবাসী'; তাহাতে বাঙ্গালী সম্পাদক অমৃতলাল চক্রবর্ত্তীর নিকট প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি বালমুকুন্দ গুপ্ত শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক বলিয়া অভিহিত। আজও বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলির প্রচার-তুলনায় অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্রসমূহের গুরুত্ব অল্প।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনের সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কয় জন বাঙ্গালী সাংবাদিক ও সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি আস্থার অভাব জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা কি ভাবিয়া সে কাজ করিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু আমরা জানি, বর্ত্তমানে কোন বাঙ্গালীকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বরণ করা ভারত সরকারের কর্ত্তাদিগের কাহারও কাহারও অনভিপ্রেত। সুতরাং, হয়ত ঐ অনাস্থা জ্ঞাপনের সুযোগ লইয়াই, ভারত সরকার কমিশনে একজনও বাঙ্গালীকে সদস্য মনোনীত না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ গণপৎ সখারাম রাজাধ্যক্ষ কমিশনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ইনি ইতঃপূর্ব্বে ভারত সরকার কর্ত্তৃক কয়টি অনুসন্ধান কমিটিতে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিশেষ অনুরাগী এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কমিশনের সদস্য—

(১) মধ্যপ্রদেশের 'হিতবাদ' পত্রের ম্যানেজিং সম্পাদক—এ, ডি, মানি। ইনি নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মিলনের বর্ত্তমান সভাপতি। এই প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের সময় সরকারের সহিত সংবাদপত্রের সদ্ভাব রক্ষা ও সংবাদপত্রের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন লোক যেমন অতিথি হইয়া আসিয়া স্থায়ী হইয়া যায়—যুদ্ধের পরে ইহা সেইরূপ রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা যে-কয়খানি বড় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি মাদ্রাজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

(২) আচার্য্য নরেন্দ্র দেব। ইনি কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। ইনি ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রভাবশালী সদস্য; ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের সহিত ইঁহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ যোগ নাই—সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই!

(৩) পি, এচ, পটবর্দ্ধন। ইনি "সেবাগ্রামে" আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যও ছিলেন। ইনি আমেদনগরে 'সজ্ঞশক্তি' নামক একখানি মারাঠী সাপ্তাহিক প্রচার করিয়া ৪ বৎসর পরিচালিত করিয়াছিলেন; ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বোম্বাই-এ 'সাধনা' পত্রের সহযোগী সম্পাদকের কাজ করিতেছেন।

(৩) জয়পাল সিংহ। আদিবাসী দলের ইনি অন্যতম নেতা। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সম্বন্ধে ইঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

(৫) ডক্টর বিজয়েন্দ্র কস্তুরীরঙ্গ বরদারাজ রাও। ইঁহার নাম দৈর্ঘ্যে এককালে প্রসিদ্ধ মহারাজরাজশ্রী পনপক্কম আনন্দ চার্লু আভার-গলের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। ইতি জাতীয় আয় সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সম্বন্ধে ইঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

(৬) আত্মারাম রাওজী ভাট। ইনি ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র সমিতির সভাপতি। যে প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গে) ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সে প্রদেশের সংবাদপত্রগুলির সহিত এই সমিতির সংযোগ নাই বলিলেই সঙ্গত হয়। আত্মারাম ভাট 'কেশরী' পত্রের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন।

(৭) চলপতি রাও। ইতি 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রের সম্পাদক এবং বার্ত্তাজীবী সাংবাদিক সমিতির সভাপতি।

(৮) ডক্টর জাকির হুসেন। ইনি শিক্ষক; আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার। সংবাদপত্রের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না ও নাই।

(৯) ত্রিভুবন নারাণ সিংহ। ইনি কয়খানি সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদক ও রিপোর্টার প্রভৃতির কাজ করিয়াছেন।

(১০) রামস্বামী আয়ার। ইনি ইংরেজের আমলে ভারত সরকারের আইন সদস্য, বাণিজ্য সদস্য ও সংবাদ সদস্যরূপে চাকরী করিয়াছেন; ইনি সামন্তরাজ্যে প্রভুত্ব করিয়াছেন।

যে ভাবে কমিশন গঠিত হইল, তাহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কতদূর রক্ষিত (বর্দ্ধিত নহে) হইবে, তাহা দেখিবার বিষয়। ইতোমধ্যেই ভারত সরকার সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুর একাধিক বক্তৃতায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বিদেশী শাসনে ভারতে ধুরন্ধর সিভিলিয়ানদিগের মনোভাবের অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না।

সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে এই কমিশনে কিরূপ সহযোগিতা করা হইবে, কমিশনের কার্য্যফল যে তাহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

ইতোমধ্যেই মিষ্টার মার্শি বলিয়াছেন—রিপোর্ট দাখিল করার সময় নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে! অর্থাৎ যদি প্রয়োজন মনে হয়, তবে কমিশন অনির্দ্দিষ্টকাল কাজ করিতে পারিবেন। আমরা এ মত সমর্থন করিতে পারি না।

কতদিনে কমিশন প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

হাসপাতালে অব্যবস্থা—

কলিকাতার একাধিক হাসপাতালে ব্যবস্থার ত্রুটি ও ত্রুটিহেতু লোকের অসুবিধার অভিযোগ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকলের প্রতীকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় না। এই ত্রুটি কিরূপ ভয়াবহ ফল প্রসব করে, তাহার পরিচয় সংপ্রতি কলিকাতার অন্যতম প্রধান হাসপাতাল—আর, জি. কর, হাসপাতালে সংঘটিত একটি দুর্ঘটনায় পাওয়া গিয়াছে। একটি বালক সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসার্থ নীত হয়। যখন "এম্বুলেন্স" তাহাকে লইয়া হাসপাতালের জরুরী বিভাগে উপনীত হয়, তখন সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার তথায় ছিলেন না। তখন একটি মাত্র ছাত্র তথায় ছিল। সে সেই ডাক্তারকে এবং তাঁহাকে না পাইয়া অন্য কোন ডাক্তারকে আনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেহই উপস্থিত হ'ন নাই। অনন্যোপায় হইয়া ছাত্রটি "এম্বুলেন্সের" খাতায় ঐ অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া আহত বালককে অন্য কোন হাসপাতালে চিকিৎসার্থ লইয়া যাইতে বলে। অন্য কোন হাসপাতালে লইয়া যাইবার পথেই বালকের মৃত্যু হয়। এমন দুর্ঘটনা কত ঘটে, তাহা কে বলিবে? এ ক্ষেত্রে ছাত্রটি অবস্থা লিখিয়া দেওয়ায় ঘটনাটি প্রকাশ পায়।

ইহার পরে হাসপাতালের কর্ত্তা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন, ডাক্তারের কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টতা একান্ত পরিতাপের বিষয়; তাঁহার সম্বন্ধে হাসপাতালের কর্ত্তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয় তিনি—

(১) ডাক্তারের নাম ও

(২) [illegible]

প্রকাশ করেন নাই। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। কারণ, যদি তাঁহাকে হাসপাতালের কাজ হইতে বিতাড়িত করা হইয়া থাকে, অথবা তাঁহাকে পদত্যাগের সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে জনসাধারণের তাহা জানা প্রয়োজন। তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে সতর্ক হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, ডাক্তারটি এই হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইয়া অন্য কোন স্থানে, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, চাকরী পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য, এ বিষয়ে—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

(২) মেডিক্যাল কাউন্সিলের

(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কি কোন কর্ত্তব্য নাই? যে ডাক্তারের কর্ত্তব্য-ত্রুটিতে চিকিৎসার্থীর প্রাণবিয়োগ (বিনা চিকিৎসায়) হয়, সে চিকিৎসকের আইনতঃ কোন দায়িত্ব আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি তাঁহার উপাধি বাতিল করিতে পারেন না? আর মেডিক্যাল কাউন্সিল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এইরূপ অবস্থায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে চিকিৎসকের চিকিৎসা-ব্যবসা করার ছাড় বাতিল করিয়া দিতে পারেন না?

আমরা ডাক্তারটির নাম প্রকাশে বিরত রহিলাম বটে, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কি করেন, তাহার সংবাদের প্রতীক্ষা করিব।

দেখা গিয়াছে, অনেক হাসপাতালে ব্যবস্থার ত্রুটির অভিযোগের প্রতীকার হয় না। হাসপাতাল সরকারের সাহায্য লাভ করুক বা না করুক তাহার সম্বন্ধে যে সরকারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য আমরা সরকারকে এ সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলি। আর, জি, কর হাসপাতালের দুর্ঘটনার জন্য আর কোন বা কোন কোন ডাক্তারও দায়ী কি না, সে বিষয়ে আবশ্যক অনুসন্ধান হওয়াও প্রয়োজন।

শিক্ষার ত্রুটি—

কোন পরীক্ষায় কয় জন পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তরে যে বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা হইতেছে। কেহ কেহ ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই দায়ী করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান খর্ব্ব করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও আন্দোলন যে হইতেছে না, তাহা নহে!

পরীক্ষার্থীদিগের প্রশ্নোত্তরে যে লজ্জাজনক অজ্ঞতার পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তাহা সাধারণ জ্ঞানের অভাবদ্যোতক। সে অভাবের কারণ অনুসন্ধান করা ও তাহার প্রতীকার করা যে প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য।

যে ছাত্রদিগের প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহারা কোন্ বা কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহা না জানিতে পারিলে কোন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করা সঙ্গত নহে।

যখন দেশে সংবাদপত্রের প্রচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে তখনও যে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি সঙ্কুচিত হইতেছে, ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়।

যদি অবস্থা এমনই হইয়া থাকে যে, ছাত্ররা অধ্যয়নে অমনোযোগী, শিক্ষকরা কর্ত্তব্যপালনপরাঙ্মুখ, তবে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত অবস্থার পরিবর্ত্তন ও প্রতীকার হইবে না। আমাদিগের বিশ্বাস, যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ভার পাইয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রের মনে আগ্রহ-সৃষ্টি যদি না হয়, তবে স্তূপাকার পুস্তক দিয়া কোন কাজ হইবে না।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি-সংঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক কয়দিন সপরিবারে অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়া শেষে ছাত্রদিগের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় শিক্ষকদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য পালন যে দুঃসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা জানি, সরকার বা বোর্ড বিদ্যালয়সমূহে যে অর্থ সাহায্য দেন, তাহা নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে দেওয়া হয় না—"অবসর মত" দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই মাসের পর মাস তাহা দেওয়া হয় না। কাজেই শিক্ষকরা সর্ব্বদাই অর্থাভাবে বিব্রত থাকেন। যে ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যদি, তাহার সূত্র ধরিয়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, তবে তাঁহারা এই ভয়াবহ ত্রুটি দেখিতে পাইবেন। ইহার প্রতীকার প্রয়োজন।

একান্ত বিস্ময়ের বিষয়, যে প্রধান-সচিব মৎস্য বিভাগকে কৃষি বিভাগের সহিত সংযুক্ত রাখা তাহার কর্ত্তব্যসাধনের অন্তরায় বিবেচনা করিয়াছেন, তিনিই শিক্ষা বিভাগকে রাজস্ব বিভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া শিক্ষা বিভাগের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন! যে সময় দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতিসাধনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সেই সময়ে যে শিক্ষা-সচিবকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইবার অবসর দেওয়া হইতেছে না, ইহা কি সমর্থনযোগ্য?

প্রাথমিক শিক্ষার পরে মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। সে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের পরিচালনাধীন করা হইয়াছে। কিন্তু সে বোর্ডের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে নানা অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বোর্ড গঠন সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। বোর্ডের কাজ সম্বন্ধেও তাহাই। বিশেষ এই বোর্ডের সহিত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত কিনা, সন্দেহ। কারণ, বোর্ড হইতে যে উপকরণ প্রদান করা হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহাই লইয়া উচ্চ শিক্ষাদানের কার্য্য করিতে হইবে। উভয়ে সংযোগ ছিন্ন করিবার সময় আসিয়াছে কি?

শেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির সম্বন্ধে আবশ্যক কর্ত্তৃত্ব যাহাতে করিতে পারেন—তাহাদিগের পরিচালন-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদানের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পরিচালনে বাধ্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আর শিক্ষার আদর্শ খর্ব্ব না করিয়া যাহাতে—

(১) সাধারণ শিক্ষার বিস্তার সাধিত হয় ও

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যোগ্যতার নিদর্শন ও অর্জ্জনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়

এই দুই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য বৃদ্ধিহেতু তাহাতে অনন্যকর্ম্মা ভাইস-চান্সেলার নিয়োগের ব্যবস্থা নূতন আইনে হইয়াছে। এখন যদি ভাইস-চান্সেলার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহযোগিতা লইয়া—স্বাধীনভাবে আবশ্যক সংস্কার সাধিত করেন, তবে যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার আবশ্যক উন্নতি সাধিত হইবে, তাহা আশা করা যায়। লোকমত সে বিষয়ে সমর্থন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না—আগ্রহশীলই আছে।

দেশে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার সাধনে বিলম্ব হইলে তাহা দেশের ও জাতির ও রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্যাণকরই হইবে।

রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা—

কলিকাতায় নিমতলা শ্মশানে যে স্থানে রবীন্দ্রনাথের শবদাহ হইয়াছিল, তথায় গরু চরিতেছে বলিয়া যে আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা তহবিলের সম্বন্ধে আলোচনায় তাহার পরিণতি হইয়াছে। এখন বলা হইয়াছে—

সংগৃহীত "১৪ লক্ষ টাকার প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে; ইহার পর স্মৃতি কি ভাঙ্গা মাঠ মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে?"

অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষার তহবিলের টাকায়—রবীন্দ্রনাথের নহে—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের গৃহ ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সংগৃহীত টাকার ৫ লক্ষ টাকা বিশ্বভারতীকে ও লক্ষ টাকা অবনীন্দ্র ঠাকুরকে দেওয়া হইয়াছে; আর এক জন শিল্পীকেও অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছে—

"কিয়ৎ পরিমাণে ভারতের এবং প্রধানতঃ বাঙ্গলাদেশের একান্ত দরিদ্র এবং দীন মধ্য-বিত্তের টাকা আনা পয়সার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবার পর এখন উদ্যোক্তাদিগের বিবৃতি ও আবেদনপত্র বহুকাল অনুপস্থিত……গগনেন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার কেন্দ্রী অবনীন্দ্রনাথের ষ্টুডিও এবং প্রকৃত পক্ষে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রসূতি-গৃহটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই পরিচালক-সভা যে কীর্ত্তিটি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাও জন-সাধারণ জানিতে পারিল না।……স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারের পরিচালকেরা পাঁচ নম্বর বাড়ীটি ধূলিসাৎ করিয়া বাঙ্গলাদেশের একটি গৌরবের ধন অপহরণ করিয়াছেন।"

এই বাড়ীটি বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। ভাণ্ডারের আবেদনে সরকার উহা ভাণ্ডারের জন্য কিনিয়া দেন। তখন বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছিল—

"দ্বারকানাথ ঠাকুরের যে বৈঠকখানা বাড়ীতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিয়াছেন এবং যেখানে তাঁহাদের ষ্টুডিও ছিল, তাহা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ ঐতিহাসিক গৃহটি নষ্ট-

়ীদের হাত হইতে রক্ষা করা গিয়াছে। এখন ঐ বাড়ীটি রক্ষা করিয়া র্ব্বোল্লিখিত (সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যাদুঘর ও গবেষণাগার) উদ্দেশ্য সার্থক ়রিয়া তোলার জন্য কলিকাতার নাগরিকদের উদ্যোগী হইয়া ়ঠা কর্ত্তব্য।"

অভিযোগ—

"নাগরিকরা উদ্যোগী হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বাড়ীটি ়বসায়ীর হাত হইতে উদ্ধারও করা হইয়াছিল; কিন্তু আজ স্মৃতি-রক্ষা ়াণ্ডারের হাতে আসিয়া উহা আর রক্ষা পাইল না। নিখিল ভারত ়বীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার দায়িত্ব এইভাবেই পালন ়রিলেন।"

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অভিযোগ সম্বন্ধে স্মৃতি-রক্ষা সমিতির পক্ষ ়ইতে কোন কথাই বলা হয় নাই। সমিতি এই বিতর্ক এড়াইয়া কেবল ়োষণা করিয়াছেন—শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের শবদাহের স্থানে স্মৃতি-মন্দির ়চনা করিতে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন।

বাড়ীর উপকরণ বিক্রয় সম্বন্ধেও কতকগুলি অভিযোগ উপস্থাপিত করা ়ইয়াছে। বাড়ীটি কেন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, সে বিষয়ে লোকের কারণ ়ানিতে কৌতূহল যেমন স্বাভাবিক—আগ্রহও তেমনই সঙ্গত।

ভারত সরকারের পরিকল্পনা—

ভারত সরকার লোকের পর্য্যাপ্ত অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও ়রিকল্পনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অবশ্য সে সকল পরিকল্পনা ়খন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ এবং কার্য্যে পরিণত ়ইলে সে সকলে লোকের প্রকৃত উপকার হইবে কি না, সে বিষয়ে আরও ়ন্দেহ আছে। কিন্তু মাকড়শা যেমন দ্রুত জাল বুনিয়া চলে, ভারত ়রকার তেমনই দ্রুত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছেন।

অর্থনীতিতে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ডক্টর সাট সংপ্রতি হাম ়র্গে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ়ম্বন্ধে বলিয়াছেন—ইহা—

(১) ভ্রান্তিদুষ্ট

(২) আর্থিক হিসাবে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব।

তিনি ইহার অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্যের জন্য ইহা বলিয়াছেন, কি ইহা ়ার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন বলিয়া এই মন্তব্য ়রিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই।

তবে দেখা গিয়াছে, যে সকল দেশ শিল্পে সমৃদ্ধ নহে সে সকল দেশ যদি ়াহাদিগের প্রয়োজনানুসারে বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন ়রে, তবে শিল্পে সমৃদ্ধ দেশসমূহ তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ়াকে। তাহাদিগের সে জন্য বিরক্তি প্রকাশের মূল তাহাদিগের স্বার্থহানির ়য়। এমন কি জার্ম্মানী যখন শিল্পে প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ ়রিয়াছিল, তখন ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে আতঙ্ক প্রকাশ ়রিতে ত্রুটি করে নাই। সে আতঙ্ক ইংলণ্ডে "ওয়েক আপ জন বুল" —আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ডক্টর সাটের মন্তব্য য়ুরোপের—বিশেষ জার্ম্মানীর স্বার্থহানিভয়ের উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার মত অভিজ্ঞ অর্থনীতিক যখন সে কথা বলিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে সতর্কতাবলম্বন যে ভারত সরকারের কর্ত্তব্য তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। কথায় বলে "সাবধানের বিনাশ নাই।" ভারত সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা যে ভারতের মত দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে বিস্ময়কর তাহাতে যখন সন্দেহ নাই, তখন সে পরিকল্পনা যাহাতে ব্যর্থ হইয়া দেশবাসীর অশেষ ক্ষতির কারণ না হয়—সে বিষয়ে সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন। বিশেষ দেখা গিয়াছে—দামোদরের জলনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, সিঁদরী সারের কারখানা, হীরাকুণ্ড বাঁধ—এ সকল কাজেই ব্যয়বাহুল্যে আনুমানিক হিসাব অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সুতরাং বুঝা যায়, পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে যে অর্থের প্রয়োজন ভারত সরকারের সে বিষয়ে হিসাবে মূলে ভুল থাকিতে পারে। সে ভুল ইচ্ছাকৃত কি অভিজ্ঞতার অভাবসঞ্জাত তাহা কে বলিবে?

আমরা ভারত সরকারকে বলি, ডক্টর সাটের মন্তব্য বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইলে ভাল হয়। কারণ, ব্যর্থতায় কেবল অবসাদ উৎপন্ন হয় না—আর্থিক ক্ষতিও অল্প হয় না।

সামাজিক বিপ্লব—

মিষ্টার লুই ফিশার আমেরিকান লেখক ও সাংবাদিক। তিনি মধ্যে মধ্যে ভারত সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি সে দিন এ দেশে বলিয়াছেন—তিনি আশা করিয়াছিলেন, ভারতরাষ্ট্র স্বাধীন হইলে তাহাতে সামাজিক বিপ্লব হইবে—তাহা না হওয়ায় তিনি হতাশ হইয়াছেন। সামাজিক বিপ্লব বলিতে তিনি বুঝেন—

(১) লোকের অধিকারসাম্য

(২) শ্রমের সম্ভ্রম

(৩) শিক্ষার পরিবর্ত্তন

তিনি বলিয়াছেন:—

"সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া লোককে গ্রাম্য-জীবনের ও কলকারখানার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। যে শিক্ষায় লোককে নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, তাহা কখন বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। ভারতে লোককে গ্রামের প্রতি মনোযোগী হইবার ও গ্রাম্য নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য আবশ্যক শিক্ষা দিতে হইবে। আমেরিকায় লোকে কায়িক শ্রমসাধ্য কাজ ঘৃণাযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে না।"

তিনি বলিয়াছেন, যখন ভারতের ভবিষ্যতের বিষয় আলোচনা করা হয়, তখন অগণিত জনগণকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কথাই আলোচিত হয়। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং সে জন্য লোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

মিষ্টার লুই ফিশারের মন্তব্য মৌলিক নহে। বহুকালের বিদেশী বৈর শাসন যে ভারতের অর্থনীতিক অবনতির মতই মনোভাবের

অবনতি ঘটাইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। যে শিক্ষা সে জন্য প্রধানতঃ দায়ী সে শিক্ষা ভারতীয় নহে—বিদেশীর স্বার্থসঙ্গত বলিয়া বিদেশী শাসকদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত। সেই শিক্ষাপদ্ধতি দীর্ঘকালে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালক তাঁহারাও সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হওয়ায় সহসা তাহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারিতেছেন না —আবার তাঁহাদিগের কার্য্যভারও অল্প নহে। এই সকল কারণেই হয়ত শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করে এবং সে বিষয়ে সকলেই সচেতন, সন্দেহ নাই।

গ্রাম ও নগর—ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ইংলণ্ডেও অল্প দিনে হয় নাই। বৃহৎ শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র শিল্পের ও কৃষির স্থান নির্ণয় করিতে হয়। ভারতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

ভারতে লোক যদি কায়িক শ্রম ঘৃণা করে তবে সে মনোভাব বিদেশী শিক্ষার ফল—এ দেশের ধাতুগত নহে। যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা ও ব্যবস্থা মিষ্টার ফিশার লক্ষ্য করিয়াছেন, সে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। তাহাদিগের ব্যবহারে সমগ্র দেশবাসীকে বিচার করিলে রোগের নিদান নির্ণীত হইবে না।

সর্ব্বশেষ কথা—দেশের আবশ্যক পরিবর্ত্তন দেশবাসীকেই—হয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতায়—করিতে হইবে।

কাশ্মীর-সমস্যা—

জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হয় নাই; হইবে এমন সম্ভাবনাও আমরা সুদূরপরাহত বলিয়াই বিবেচনা করি। অনুসন্ধান ও রিপোর্ট পেশ—ইহাতে যে সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, পাকিস্তানের মনোভাবই তাহার কারণ। ভারত সরকার যে বিদেশীয়-দিগের প্রভাবে প্রভাবিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতা লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

মিশর—

মিশরের অবস্থা তখনও শান্ত হয় নাই। রাজা ফারুক দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশে আনিয়া তাঁহার বিচারের কথাও উঠিয়াছে। এ দিকে মিশরের বর্ত্তমান কর্ত্তা কঠোরতা সহকারে বিরোধী-দিগকে দমন করিতেছেন। তাহাতে যে দেশে অসন্তোষের উদ্ভব হইবে না, এমন মনে করা যায় না। কিন্তু তিনি হয়ত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন।

পারস্য—

পারস্যের সহিত পেট্রল সম্পর্কে বৃটেনের বিরোধের সুমীমাংসা এখনও হয় নাই। পারস্যের দাবী বৃটেন মানিয়া লইতে অসম্মত।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯

প্রণতি

শ্রীমতী ইলা সেনগুপ্তা

চির অস্ত-পথের পথিক কভু উদয়-রথে ফিরবে না আর জানি,
ঝরা কুসুম, সে তো ফুটবে না আর, বাজবে না আর ভগ্ন-বীণা খানি,
চলে জীবন-নদীর দুইটী তীরে এমনি ক'রেই আসা যাওয়ার খেলা,
ভাঙে মরণ-ঝড়ে, বালুচরে—বাধা ঘরের উৎসবেরই মেলা!

জানি তাহা জানি—

তবু হয় নি তো ম্লান স্মরণ-তীরে আঁকা তোমার চরণ-চিহ্ন খানি,
আজও যায় নি মুছে লিখন তোমার যা লিখেছ সেদিন অশ্রুজলে!
ওগো, তাই তো আজও স্মৃতি তোমার জাগে সবার হৃদয়-বেদীতলে!
তুমি রুদ্ধকারার ভাঙতে দুয়ার—আসন ছেড়ে ধুলায় নেমে এলে,
যখন সময় হলো যাবার, শুধু ব্যথার কাঁটা কুড়িয়ে নিয়ে গেলে।
হে দেব, দৃষ্টিহীনের ব্যথাহারী, লালবিহারী, তোমার ভালবাসা,
তোমার সরল-প্রেমের অমর-বাণী স্মরণ পথে—করে যাওয়া-আসা!

যেন কোন অজানা ব্যর্থ লাজে আজ সবারে—করুণ স্বরে ডাকি
বলে, "স্বপ্ন যে তাঁর আধেক সফল, আরও যে তার আধেক আছে বাকি!"

লক্ষ আলোর মাঝে

ঐ নিভু নিভু একটি মলিন শিখার ব্যথা কেহই বোঝে না যে!
তুমি বলে গেছ—"নিভে-আসা প্রদীপও যে পূজার উপচার,
শুধু আলো তো নয়, তারি সাথে আঁধারও যে সৃষ্টি দেবতার।"
যেন, আজকে আবার তেমনি ক'রে বোলতে পারি বিশ্ব-সভার কাছে,
"যারা দৃষ্টিহারা, মানুষ তারা, আছে ওগো, হৃদয় তাদের আছে!"

হে দেব, নিজে নিয়ে ব্যথার বোঝা, যাদের দিলে সকল অধিকার
আজ নিও তাদের রিক্ত প্রাণের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি নমস্কার।*

---

* এই কবিতার লেখিকা অন্ধ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সোভিয়েট-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মধ্য-এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ বহুবিচিত্র প্রাকৃতিক-সম্পদেও সমৃদ্ধ এ -অঞ্চলের মরুময় বুকে তুলার ফসল ফলে সুপ্রচুর এবং প্রতি বছর এ-সব আবাদি জমি থেকে খুব-সেরা তুলা উৎপন্ন হয়—১,০০০,০০০ গাঁটেরও বেশী। তাই ব্যাপকভাবে তুলার চাষ-আবাদ চলে এ-সব অঞ্চলে এবং এই তুলাকে কেন্দ্র করেই সোভিয়েট-রাষ্ট্রের বহু-বিচিত্র বিরাট কল-কারখানা এবং যান্ত্রিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—তুলা-উৎপাদনের সহায়তা এবং উন্নতিকল্পে। তুলার ফসল ছাড়া মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ মেলে, তার মধ্যে প্রধান হলো—কয়লা, সোনা, রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম, জিঙ্ক্, সীসা, গন্ধক, জ্বালানি-তেল, ধান-চাল, কমলা লেবু, আঙুর, নাশপাতি, আপেল এবং তরমুজজাতীয় ফল—'আরবুজ্'!

মধ্য-এশিয়ার সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চারটি প্রজাতান্ত্রিক প্রদেশের মধ্যে উজ্‌বেকিস্তানই হলো আকারে, লোক-সংখ্যায় এবং অর্থ-নৈতিক বৈশিষ্ট্যে সব চেয়ে প্রধান। উজ্‌বেকিস্তানের পরিধি প্রায় ৪৬,০০০ বর্গ মাইল এবং এখানকার লোক-সংখ্যা—৬৬,০০০০৯ লক্ষের উপর। এ-রাজ্যের কৃষি এবং খনিজাত সম্পদ থেকে সারা বছরের আয়ের পরিমাণ—৪,৪৪০,০০০,০০০ টাকারও অধিক। সুজলা-সুফলা উজ্‌বেকিস্তানের আবাদি জমির মোট-পরিমাণ—১৮৭,৫০০,০০০ কাঠার উপর এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুব্যবস্থায় এ-অঞ্চলের আবাদি-জমিকে সুজলা-সুফলা-উর্বরা করে তোলার উদ্দেশ্যে [illegible] সোভিয়েট-আমলে বহু পরিশ্রমে এবং অর্থব্যয়ে খনিত হয়েছে সুদীর্ঘ [illegible]। [illegible] মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—দিজ্‌কেৎ-কেন্-কেনাল এবং ফের্‌গানা খাল। দিজক্কেৎকেন্-কেনালটি শুধু যে সুবিস্তীর্ণ ১৩,৩২৫,০০০ কাঠা কৃষি-জমিকে জলদানে শস্য-শ্যামল করে তুলেছে তা নয়—সোভিয়েট-রাজ্যের অন্তর্বর্তী সুবিশাল অঞ্চলে জাহাজ এবং নৌকা-চলাচলের অন্যতম প্রধান জল-পথ হিসাবেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। উজ্‌বেকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ জল-প্রণালী ফের্‌গানা খালটিও ১৭০ মাইল দীর্ঘ।—ওদেশের বহু সরকারী এবং ১৬০,০০৯ বেসরকারী সাধারণ নর-নারীর সম্মিলিত-পরিশ্রমে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে খনিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ জল-পথ। দেশের জলকষ্ট-মোচনের উদ্দেশ্যে জন-কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এ-অঞ্চলের বিভিন্ন যৌথ-কৃষি (Collective Farms) কার্ম এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (Collective Industrial Centres) উৎসাহী সোভিয়েট নরনারীকর্মীরা—রাষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক এবং স্থপতিবিদ্-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খেটে দীর্ঘকালের ঐকান্তিক পরিশ্রমে রাজ্যের, যত মরা-হাজা, শুষ্ক বালুময় প্রাচীন খাল-বিল-জলাশয়ের সংস্কার-সাধন

উজবেকিস্তানের কৃষি-উন্নয়ন উদ্দেশ্যে খনিত ফেরখানা খাল—এই বিরাট খালটি নির্মিত হ'য়েছে মাত্র ৪৫ দিনে

করে উপেক্ষিত ও বিনষ্ট চাষ-আবাদ-জমিকে বাঁচিয়ে তুলে শুধু যে সে-গুলিকে ফিরে পেয়েছেন, তাই নয়—উজ্‌বেকিস্তানের নানা জায়গায় আরো বহু নতুন-নতুন বিরাট জলাশয়, বাঁধ প্রভৃতি ইতিমধ্যে তৈরী করেছেন। এঁদের এই অপরূপ দেশ-উন্নয়নের প্রতীক-হিসাবে উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি হলো—সুর্‌খান্‌-দরিয়া নদীর উপকূলে রচিত সুবিরাট কুর্‌গান্‌-ড্যাম্‌ (Dum-Kurgan System) এবং কাট্টা-কুর্‌গান্‌ উপত্যকাস্থিত বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। এই কাট্টা-কুর্‌বান্‌ জলাধার নির্ম্মাণের ফলে উজ্‌বেকিস্তানের ৪,১৮৫,০০০,০০০ কাঠা উপত্যকা-ভূমিতে জল-সেচনের সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। ও দেশের বাসিন্দারা এই বিরাট কৃত্রিম হ্রদটির নাম রেখেছেন—'উজ্‌বেক-সাগর'! এছাড়া তাশ্‌কান্দের অনতিদূরে ৯,০০০,০০০ কাঠা উপেক্ষিত পতিত-জমিতে চাষ-আবাদ করে ফসল ফলনের সহায়তাকল্পে জল-সেচনের উদ্দেশ্যে খোঁড়া হয়েছে উত্তর তাশ্‌কান্দ খাল।

সোভিয়েট-আমলের আধুনিক এবং উন্নত-বৈজ্ঞানিক সুব্যবস্থায় সারা উজ্‌বেকিস্তানের নয়, মধ্য-এশিয়ার রূপ আজ আগাগোড়া বদলে গেছে। সেকালের নিষ্ঠুর-নির্ম্মম বর্ব্বর-স্বার্থান্ধ লুণ্ঠনলোভী মোঙ্গল, তাতার শাসক-সম্প্রদায় এবং রুশীয় 'জার'দের যুগযুগান্তব্যাপী অত্যাচার-অনাচার, শোষণ-উৎপীড়ন এবং ঔদাস্যের ফলে সুসমৃদ্ধ উজবেকিস্তান্‌ ও এদেশের বাসিন্দাদের যা-কিছু গৌরব-গরিমা-সম্পদ-সংস্কৃতি—সবই লোপ পেয়েছিল। এই উপেক্ষা আর অবহেলার দরুণ কালক্রমে মধ্য-এশিয়ার সব রাজ্যগুলিই তাদের অতীত-গৌরব হারিয়ে হৃতসর্ব্বস্ব, অনুন্নত, মরুময় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল…অশিক্ষার অন্ধকারে, কুসংস্কারের কালিমায়, ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে মানসিক-রিক্ততা, অর্থ নৈতিক-দারিদ্র্য আর হীন আত্মকলহের গ্লানিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এ দেশের অধিবাসীদের সামাজিক জীবন এবং চিন্তাধারাকে। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রসার যে কতখানি উন্নত ধরণের ছিল—তার বহু প্রমাণ ও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, আধুনিক যুগে—মরুময়-মাটির অন্তর্নিহিত সুগভীর গহ্বরদে থেকে! সুদীর্ঘ ফেরগানা খাল খননকালে আশপাশের প্রায় ৯২টি জায়গা অতল-ভূগর্ভ থেকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের বহু বিচিত্র সব ধাতু-পাত্র মুদ্রা এবং অলঙ্কারাদি-কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের ভূমি তল থেকে অনুসন্ধানী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁজে পেয়েছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানবের কঙ্কাল এবং বিচিত্র সব স্মৃতি নিদর্শনাদি। এই সব প্রাচীন ঐতিহাসিক-সংগ্রহগুলি দেশের ঐতিহ্য-গরিমার প্রতীক-হিসাবে অতি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে সোভিয়েট-রাজ্যের বিভিন্ন যাদুঘরে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সহায়তা ছাড়াও অতীতের এই সব অপরূপ লুপ্ত-কীর্ত্তির সন্ধান পেয়ে আধুনিক যুগের সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক এবং স্থপতিদের দেশোন্নতির ব্যাপারেও বিশেষ উপকার হয়েছে। সেকালের পূর্ত্ত-পদ্ধতি, খাল-খনন, জল-সেচন এবং অনুর্ব্বর জমিতে সুপ্রচুর শস্য উৎপাদনের বিচিত্র ব্যবস্থাদির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাঁরা আজ দেশের বুকে ফলিয়ে তুলেছেন সোনার ফসল! সারা সোভিয়েট-রাজ্যের কোথাও তাই আজ নেই খাদ্যের অভাব……বস্ত্র-সঙ্কট; সুখে সম্পদে বিরাট সোভিয়েট-দেশের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ।
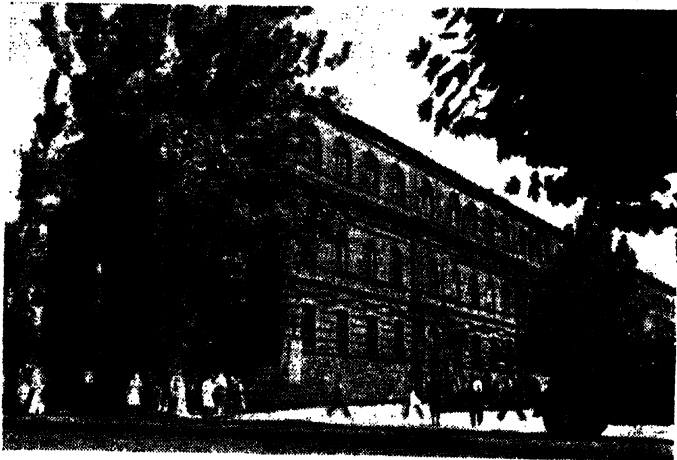
মধ্য এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়—তাশ্‌কান্দ

তুলার চাষের মতই উজবেকিস্তানে বিস্তীর্ণ-ব্যাপকভাবে হয় রেশমের চাষ। ১৯৩৯ সালে এ-অঞ্চলে ১২০০০ টন ওজনের রেশম উৎপন্ন হয়েছিল—এবং তার পর থেকে এই রেশম-উৎপাদনের পরিমাণ প্রত্যেক বছর আরো বেড়ে চলেছে—এতটুকু কমেনি। রেশমের পাঁজ থেকে তৈরী হয় রেশমী কাপড়, প্যারাশ্যুট এবং আরো নানা জিনিষ। উজবেকিস্তানে রেশমী-কাপড় তৈরীর বড়-বড় বহু তাঁত-কারখানা, বয়নশালা আছে—মার্গেলানে, সমরখান্দে এবং প্রাচীন বোখারা সহরে। তাশ্‌কান্দে রয়েছে সুবিরাট 'ষ্টালিন্‌ টেক্সটাইল্‌ কম্বিনাণ্ট'—সোভিয়েট-রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান তন্তু-কারখানা! এটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল সাড়ে সাত কোটি পাউণ্ড। অতি-আধুনিক বিচিত্র এবং উৎকৃষ্ট সব যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত এই কারখানা। এখানে বছরে কাপড় তৈরী হয়—সাড়ে ছ' কোটি গজ। এ কারখানায় কর্ম্মীর সংখ্যা হলো প্রায় ছ-সাত হাজার। সুবিশাল সোভিয়েট-রাজ্যের সর্ব্বত্র এখানকার তৈরী কাপড়ের বিশেষ সুনাম আছে! এ ছাড়া কৃষিযন্ত্রাদি তৈরীর বিরাট কারখানা—'ভোরোশিলভ্‌ এগ্‌রিকালচারাল্‌ মেশিনারী ওয়ার্কস্‌' রয়েছে তাশ্‌কান্দে। এখানে কৃষি-কার্য্যোপযোগী ট্রাক্টর, কলের লাঙল, [illegible] মেশিন্‌ প্রভৃতি ছাড়া তুলা-পেঁজা, তুলা-কুড়ানো, সুতা-বোনার [illegible]

আধুনিক নানান্ যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়—সোভিয়েট দেশের কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা কল্পে !

উজবেকিস্তানে খনিজ-পদার্থও প্রচুর উৎপন্ন হয়। তাশ্কান্দের নিকটে আল্মালিকে রয়েছে তাম্র-শোধনাগার বিরাট কারখানা। সেখানে প্রতি বছর ৭৫০০০ টন তামা শোধিত হয়ে থাকে। তাছাড়া এ-অঞ্চলের শুরাব সহরের খনি থেকেও লক্ষাধিক টনের বেশী সেরা-জাতের তামা সংগৃহীত হচ্ছে প্রতি বছর সোভিয়েট-রাজ্যের আধুনিকতম বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থায়। উজবেকিস্তানের কুগিতাই এবং শোরশু অঞ্চলের কয়লার খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। এ-সব কয়লার ব্যাপক ব্যবহার রেওয়াজ রয়েছে সোভিয়েট-রাজ্যের রেলপথে—এঞ্জিন চালানোর কাজে। তাছাড়া বিগত মহাযুদ্ধের সময় এখানকার ভূমি-গর্ভে আবিষ্কৃত হয়েছে লৌহ এবং Non-ferrous ধাতুর স্তর। এই নবাবিষ্কৃত ধাতু থেকে সোভিয়েট-বাসিন্দাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য বিভিন্ন সব প্রয়োজনীয় ধাতু-উপকরণাদি নির্ম্মাণকল্পে গড়ে উঠেছে এক বিরাট আধুনিক কারখানা ! সারা মধ্য-এশিয়া প্রদেশ—এইটিই সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান লৌহ-শিল্পের কারখানা ! এছাড়া উজবেকিস্তানের খাউদাক্ তৈল-খনি থেকে বছরে ৭০০,০০০ টনের অধিক যে তৈল উৎপাদন করা হয়—তার বেশীর ভাগই ব্যয়িত হয় মধ্য-এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন কল-কারখানা এবং যন্ত্রপাতি চালানোর কাজে। সোভিয়েট-রাষ্ট্রের বিজ্ঞান-বিশারদদের সুবিজ্ঞ ব্যবস্থায় এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতির কল্যাণে দিনের পর দিন এ-সব খনিজ পদার্থের উৎপাদনী-ক্ষমতার প্রসার সাধিত হচ্ছে উত্তরোত্তর এবং ভূবিদ্যা-বিশেষজ্ঞদের অপরিসীম অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার ফলে উজবেকিস্তানের জার্-কুরগান্, উচ্-কাজিল্, সাইদাভাল্ অঞ্চলে সম্প্রতি আরো কয়েকটি নতুন উন্নত-ধরণের তৈল-উৎপাদন কারখানা এবং তৈল-শোধনাগার গড়ে উঠেছে।

সোভিয়েট-ব্যবস্থায় গরীয়ান উজবেকিস্তানের যন্ত্র-শিল্পোন্নতির মূলে রয়েছে এ-অঞ্চলে বৈদ্যুতিক-শক্তি বিতরণের ব্যাপক-প্রসার। প্রাচীন আমলে সন্ধ্যা-সমাগমে এবং সারা রাত অনুন্নত উজবেকিস্তানের পর্ণকুটিরে, চামড়ার তাঁবুতে জ্বলতো মোমের বাতি কিম্বা জান্তব চর্বির স্তিমিত আলোক—সোভিয়েট-রাষ্ট্রের উন্নত-ব্যবস্থায় সেখানে আজ প্রত্যেকটি গ্রামে-সহরে ঘরে-ঘরে জ্বলে বিজলী-বাতি···দেশের বড়-বড় কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার, এবং সুবিস্তীর্ণ তুলা-রেশম-চাষের ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক-উপকরণাদি ব্যবহারের ফলে মানুষের কায়িক-পরিশ্রম ঘুচিয়ে কাজ-কর্ম্মে এবং স্বচ্ছন্দ বসবাসে বিশেষ সহায়তা সাধিত হয়েছে এই আধুনিক বৈদ্যুতিক-শক্তির প্রসারে। সোভিয়েট-আমলে উজবেকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় আশীটির অধিক তড়িৎ-শক্তি-উৎপাদন ও বিতরণী-কেন্দ্র ! এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো চির্‌চিক্ নদীর উপকূলস্থ বিদ্যুত-সরবরাহ কেন্দ্র ! শুধু মাত্র এইখানেই উৎপন্ন হয়—২৭০,০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুত-শক্তি ! এই তড়িৎ-কেন্দ্রটির কাছেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাইট্রোজেন-নির্মাণের বিরাট কারখানা। এখানে তৈরী হয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন সার···কৃষি-বিদ্দের মতে, তুলা-চাষের জমিতে উন্নত ধরণের ফসল ফলানো এবং উৎপাদনী-উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিকল্পে এ সারের প্রয়োজন একেবারে অপরিহার্য্য !

আধুনিক সোভিয়েট-ব্যবস্থায় উজবেকিস্তানে শুধু যে কৃষি এবং যান্ত্রিক-শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তাই নয়—সাধারণ জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। রুষীয় 'জার' আমলে অভিজাত-বংশীয় ছাড়া মধ্যবিত্ত বা গরীবের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ছিল না। তারা মানুষ—তাদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন, তা কেউ মনেও করতো না কখনো। কিন্তু সোভিয়েট-রাষ্ট্রের কল্যাণে উজবেকিস্তানে আজ স্কুল-কলেজের সংখ্যা নেই—প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন ১৫ লক্ষের বেশী। তাছাড়া হাইস্কুলের সংখ্যা ১৩৪ এবং কলেজ আছে ৩৫টি। এ-সব বিদ্যায়তনগুলি উজবেকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ আলিশের-নাভৈ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে ; তার মধ্যে—চিকিৎসা-বিজ্ঞান, পদার্থ-

উজবেকিস্তানের জাতীয় মহাকবি আলিশের নাভৈ—একটি প্রাচীন প্রতিলিপি

বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, শিল্প-বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব এবং কৃষি-তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উজবেকিস্তানে আছে,—৯৪টি বিজ্ঞান-বিদ্যালয়, নাট্য-শিক্ষার কলেজ—১টি ; সঙ্গীত-বিদ্যালয় ১টী, ২টি যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষালয় প্রভৃতি। থিয়েটার, সিনেমা, সঙ্গীত-ভবন, নৃত্য-শিক্ষালয়, লাইব্রেরী, এবং-কৃষ্টিকলা-কেন্দ্রের সংখ্যাও অল্প নয়—থিয়েটার আছে ২৬টি, সিনেমা-গৃহ ১০০০, কৃষ্টিকলা-কেন্দ্র ৬০০০ এবং লাইব্রেরী ১৩০০টি ! অশিক্ষা ও মূঢ়তার আবহাওয়া বিদূরিত হয়ে সংস্কৃতির স্পর্শে এ-অঞ্চলের অধিবাসীর মন আজ বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছে।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ক্রীষ্টান, আর্ম্মাণী, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী থাকলেও, মুস্‌লিম-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। ধর্ম্মের গোঁড়ামি বা মিথ্যা-কুসংস্কারে নয় এঁদের আচ্ছন্ন মন···মোল্লার কঠিন বাধা-নিষেধ বহুলাংশে মুছে গেছে।—শিক্ষার গুণে উজবেক্-সমাজে নারী আজ পুরুষের কাছে দাসীর সামিল বলে গণ্য নয়···সর্ব্বক্ষেত্রেই তারা আজ পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ

করেছেন। এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পূর্ব্বে উজবেক্-নারী অন্দরের গুমট-অন্ধকারে বন্ধ থেকে পুরুষের দাসবৃত্তি করেই জীবন-যাপন করতেন,—পথে বেরুতে হলে 'পাঞ্জারা' বা ও-দেশী প্রাচীন প্রথামত এক ধরণের মোটা কালো পর্দ্দায় আপাদ-মস্তক-আবৃত করে বেরুতেন। উজবেক-রমণীর সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ চলিত ছিল—

গভীর কূপের মধ্যে পাথর ফেলিলে,
টুপ্ করে ডুবে যাবে অতল-সলিলে।
মেয়ের তেমনি যেই বিবাহটি দিলে
জেনো তার মৃত্যু স্থির নয়ন সলিলে!

এখন সোভিয়েট-শিক্ষার ফলে উজ্‌বেকিস্তানে মেয়েদের এই অসীম দুর্গতির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও! মেয়েকে পুরুষ আজ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দুজনেরই সমান অধিকার—কেউ কারো চেয়ে হীন বা ছোট নয়। সংস্কৃতির হাওয়ায় উজবেকি-সমাজে বহু-বিবাহ ও পর্দ্দাপ্রথা আজ একান্ত নিন্দনীয়-গর্হিত বলে বিবেচিত হচ্ছে! সেকালের অবহেলিত অনুন্নত উজবেকিস্তান সোভিয়েট-আমলে নব-জীবনের প্রাণ-স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, সম্পদ, কৃষ্টি-কলা, স্বাধীন-চিন্তার প্রসারতা, কুসংস্কারমুক্ত সামাজিক-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক-উন্নতি এবং সুখ-শান্তি-রাজনৈতিক-নিরাপত্তার দিক দিয়ে—সকল বিষয়েই এ-দেশ আজ বিশিষ্ট গৌরব-গরিমায় গরীয়ান!

হোটেলের কামরায় বসে নব-লব্ধ চৈনিক বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে-সল্পে মশ্‌গুল—এমন সময় আমাদের মস্কো-যাবার ব্যবস্থাদি সব পাকা করে ফিরে এসে শ্রীযুত আব্রাহামফ্ জানালেন, উজ্‌বেকিস্তানের চলচ্চিত্র-বিভাগের কর্ম্মীরা এসেছেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সকলকে সাদর-আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের প্রধান কর্ম্ম-কেন্দ্র—তাশ্‌কান্দের চলচ্চিত্র-মন্ত্রীসভা-ভবনে যাবার জন্য। সুতরাং চৈনিক বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে তখনকার মত বিদায় নিয়ে বাইরে এসে দেখি, আমাদের দলের সকলে যাবার জন্য প্রস্তুত। কাজেই আর দেরী না করে ওখানকার উজবেক-প্রতিনিধি এবং আব্রাহামফের সঙ্গে মোটরে চড়ে সোজা গিয়ে হাজির হলুম আমরা উজবেকিস্তানের চলচ্চিত্র-মন্ত্রীসভার সুবিরাট ভবনে।

তরু-বীথিকার সারি দিয়ে সাজানো তাশ্‌কান্দের সুন্দর-সুপ্রশস্ত রাজপথের একান্তে উজবেকিস্তানের চলচ্চিত্র-বিভাগের এই কার্য্যালয়টি... পুরোনো-ছাঁদের বিরাট চারতলা ভবন! সদলে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই ওখানকার অন্যতম প্রধান-কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত তাশ্-হোদ্‌গায়েভ্ এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা সাদর-সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। শুধু ফিলম্-তোলার ষ্টুডিও ছাড়া চলচ্চিত্র-বিভাগের যা কিছু কাজ-কারবার সবই চলে এই ভবনে। স্থানাভাব-বশত ফিলম্-ষ্টুডিওটির ব্যবস্থা হয়েছে অন্যত্র। তবে শুনলুম—অদূর-ভবিষ্যতেই এ-অসুবিধা এঁরা ঘোচাবেন—নব-নির্ম্মিত এবং আরো সু-বিস্তৃত ভবন-অঙ্গনে চলচ্চিত্র-বিভাগের সব কার্য্যালয়গুলিকে একত্র স্থানান্তরিত ও প্রসারিত করে!

তাশ্‌কান্দের চলচ্চিত্র মন্ত্রীসভা-ভবনের নাতিবৃহৎ সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহে আমরা উজবেকিস্তানের চলচ্চিত্র-কর্ম্মীদের তোলা কয়েকটি সেরা ছবি দর্শন করলুম! প্রথমেই দেখলুম ছোট একটি News reel বা সংবাদ-চিত্র। এ সবাক-সঙ্গীতমুখর ছবিটি সাদা-কালো ফিলমে গৃহীত—রুশীয় ভাষায় কালো-সাদা ফিল্‌মকে বলে 'চোর্নি (Black)-বেলি (White) প্লোংখা (Film)'! এ ছবিটিতে ওদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানান্ উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি-কলাপে দেশোন্নয়নের পরিচয় পাওয়া গেল। তার পর দেখলুম বহুবর্ণে রঙিন অপরূপ Documentary Film বা প্রামাণ্য-চিত্র! এ-ছবিখানির নাম—'The Master of Uzbek Dances'—এটিতে দেখানো হয়েছে উজ্‌বেকিস্তানের বিভিন্ন ধরণের লোক-নৃত্যাদি! রূপে-রসে, বর্ণ-সৌষ্ঠবে এবং অভিনবত্বে
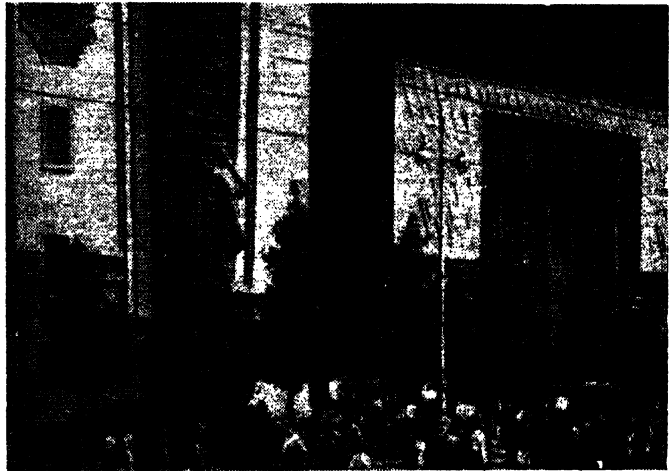
তাশকান্দের আলিশের নাভৈ রাজপথ

এ ছবিখানি সত্যই অপরূপ! ছবিখানি সবাক্—কাজেই লোক-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হদিশ পেলুম উজবেকিস্তানের অপরূপ লোক-সঙ্গীতের সুর-লালিত্যের। এ-দেশী সুরের অনেকখানি মিল রয়েছে দেখলুম—আমাদের দেশের পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি পার্ব্বত্য-অঞ্চলের দেশী সুর এবং তাল লয় ছন্দ-মাত্রার সঙ্গে। অতঃপর আমরা দেখলুম উজবেকিস্তানের তথা সোভিয়েট-চলচ্চিত্র-জগতের সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালক ইয়ারমাটভের তোলা ওদেশের সুবিখ্যাত জাতীয় কবি মহাত্মা আলি শের নাভৈয়ের জীবনী-অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাট্য-চিত্রখানি। ছবিখানির নাম—'আলি শের নাভৈ'। এটি প্রযোজিত হয়েছে উজ্‌বেকিস্তানের ফিলম্ ষ্টুডিওতে। ছবিটি রঙীন নয়—কালো-সাদা ফিলমে তোলা অপরূপ এক প্রাচীন-গাথা...কুশলী-শিল্পীদের গুণে নিবিড়ভাবে দর্শকের মনকে অভিভূত করে! ছবিটি দেখবার পর শ্রীযুত তাশ্-হোদ্‌গায়েভকে জানালুম—এই অপরূপ চিত্রের পরিচালক শ্রীযুত ইয়ারমাটভ্ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপের অভিলাষ। কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় শ্রীযুত ইয়ারমাটভের সঙ্গে তখনই সাক্ষাৎকার ঘটলো না! তবে শ্রীযুত তাশ্-হোদ্‌গায়েভ আশ্বাস দিলেন, অচিরেই এ 'আলি শের নাভৈ' চিত্রের পরিচালকদের সঙ্গে আমাদের আলাপের ব্যবস্থা করে দেবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অনুপ্রাণনায় আবাল্য তপস্বিনী সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতা নারীর আদর্শের মূর্ত-প্রতীক শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর পবিত্র নামে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উহা এখন কলিকাতা শ্যামবাজার ২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে অবস্থিত। আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া গৌরীমা নিম্নলিখিত ৪ বিভাগে কাজ করিতেন—(১) হিন্দুধর্ম ও সমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার (২) এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষাব্রতধারিণীদিগের একটি সংঘ গঠন (৩) সবংশজাতা দুঃস্থা বালিকা ও বিধবাদিগকে আশ্রয় দান ও (৪) আদর্শ-জীবনযাত্রার পথে নারী জাতিকে সহায়তা দান। বর্তমানে আশ্রমে একশত মহিলা বাস করেন ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ৪ শত ছাত্রীকে শিক্ষা দান করা হয়। বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সহিত সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষার ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। ১৩৪৮ সাল হইতে নবদ্বীপে একটি শাখা আশ্রম ও বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। হাজারীবাগ জেলার গিরিডির বারগণ্ডা পল্লীতেও ক্ষুদ্রাকারে আশ্রম ও বিদ্যালয় চলিতেছে। আশ্রমের যাবতীয় ব্যয় সহৃদয় দেশবাসী নরনারীর দান হইতে নির্বাহ হয়। কোন বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণ করা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার লেখায় এই আদর্শের কথা প্রচার করিয়াছিলেন—তিনি লিখিয়াছিলেন—"স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে জগতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী-গুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাবে সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।" স্বামীজির ভক্তগণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ স্ত্রী মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে এক সুবৃহৎ জমির উপর এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম গত ৫২ বৎসর ধরিয়া সেই আদর্শ প্রচার করিতেছেন। হিন্দুর আদর্শ প্রচারের জন্য ২৫ বৎসর পূর্বে আশ্রম হইতে 'সাধনা' নামক এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—মূল্য তিন টাকা মাত্র। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে আশ্রম পরিচালিত হয়। ঐ গ্রন্থে হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ও প্রয়োজনীয় বৈদিক মন্ত্র, উপনিষদ, পুরাণ, স্তোত্রাবলী এবং জাতীয় ও ধর্মমূলক সঙ্গীতমালা প্রদত্ত হইয়াছে। উহার প্রচারের ফলে শুধু আশ্রম উপকৃত হয় না—দেশবাসী মাত্রই উপকৃত হইয়া থাকেন।

কীর্তনীয়া শ্রীনন্দকিশোর দাস—

বর্তমান বাংলার অন্যতম খ্যাতনামা কর্তন শ্রীনন্দকিশোর দাস ১৩১৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার দুপুকুরিয়া বাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ

কীর্তনিয়া শ্রীনন্দকিশোর দাস

দাস খ্যাতনামা মৃদঙ্গবাদক—বর্তমানে বয়স ৮৮ বৎসর। নন্দকিশোর বাল্যে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন ও পরে পিতার নিকট কীর্তন ও মৃদঙ্গবাদক শিক্ষা করেন। শক্তিপুরে কীর্তন রসসাগর স্বর্গত অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চতুষ্পাঠীতে তিনি তাঁহার শিক্ষা শেষ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নন্দকিশোরকে কীর্তন শিক্ষা দানের সহিত সর্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নিকটও নন্দকিশোর কিছুকাল বৈষ্ণব সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বহু গৃহে কীর্তন গান করিয়া নন্দকিশোর খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

দেবানন্দপুরে শরৎ-জন্মতিথি উৎসব—

গত ৩১শে ভাদ্র তারিখে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসব পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ। সভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায়। সভায় শ্রীবনলতা বেরা এম-এ, বি-এল "শরৎসাহিত্যে বাস্তবতা" এবং শ্রীকনিকা ঘোষ এম-এ, বি-টি "নারী-দরদী শরৎচন্দ্র" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া "গ্রামের ডাক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ফণিভূষণ বিশ্বাস, অধ্যাপক মৃণাল চক্রবর্ত্তী, ডাঃ আবদুস সোভান প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ—

পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও খড়দহ থানা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন, তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া নানা অসুবিধা ও কষ্টের মধ্য দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে কলিকাতার খ্যাতনামা হিসাব পরীক্ষক জর্জ রীড কোম্পানীর বড়বাবু হইয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্বত্র জনপ্রিয় করিয়াছিল। বারাকপুর মহকুমা সমিতি, ২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েসন, বারাকপুর রাইফেল ক্লাব প্রভৃতির সহিত এবং পানিহাটী গ্রামের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তিনি বিধবা পত্নী এবং ৭টি নাবালক পুত্রকন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই—আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রীগোকুলানন্দ দাশ—

কলিকাতার বিখ্যাত রাণী রাসমণি এস্টেটের অন্যতম মালিক এবং ন্যাশনাল সিট্ এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস লিমিটেডের
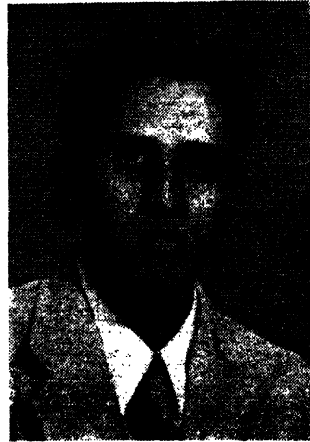
গোকুলানন্দ দাশ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীগোপীনাথ দাশের পুত্র শ্রীগোকুলানন্দ দাশ গ্ল্যাসগো ইউনিভারসিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ইনি গত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে সসম্মানে বি-এস-সি পাস করেন। আমরা শ্রীমানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন—

১৫ই অক্টোবর হইতে ভারতরাষ্ট্র ও পূর্ব-পাকিস্তানে গমনাগমনের জন্য পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তনের সংবাদে ভীত হইয়া গত ১লা অক্টোবর হইতে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর

দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। প্রতিদিন ৫।৭ সহস্র লোক আগমন করায় পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এক ভীষণ সমস্যা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সে সমস্যার সমাধান সহজে সম্ভব নহে। কলিকাতা সহরে, বনগাঁ ও রাণাঘাটের মত সীমান্তপথবর্তী এলাকায় এবং বারাকপুর প্রভৃতি কয়েকটি মহকুমায় এত অধিক উদ্বাস্তুর সমাগম হইয়াছে যে বহু লোককে স্থানাভাবে দারুণ বর্ষার মধ্যে পথে, ঘাটে, মাঠে অবস্থান করিতে হইতেছে। উদ্বাস্তু আগমন যাহাতে বন্ধ হয়, সে জন্য পূর্ব-পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। হয়ত পূর্ববঙ্গ হইতে সকল হিন্দুকে তাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের অভিপ্রায়। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতরাষ্ট্র সরকারকে কঠোরতার সহিত পাকিস্তানের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। এ সমস্যার সমাধান না হইলে—বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসব—১৩৫২

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন জজ—

২৪শে নভেম্বর হইতে কলিকাতার এডভোকেট খ্যাতনামা জনসেবক শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও ব্যারিষ্টার শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের জীবনে সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই আশ্বিন শুক্রবার রাত্রিতে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বেলগাছিয়াস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী আছেন। ১৮৯১ সালে হুগলী সহরের বালী কাঠগড়া লেনে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়—১ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার ও ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা উমেশচন্দ্র বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন; ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পালিত হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ও ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুকাল কেরাণীগিরির পর ১৯২৯ সালে তিনি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রে সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন ও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যবসায়, একান্ত ইচ্ছা ও প্রসার জ্ঞানপিপাসা লইয়া তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন ও সে ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন

ভাবে গবেষণা করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, বাংলা সাময়িকপত্র, সাহিত্যসাধক চরিতমালা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু, রাজা রামমোহন প্রভৃতির গ্রন্থাবলীও তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। গত ৩ বৎসরকাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—

কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূরে গুজরাট প্রদেশের কেণ্টে সহরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে

সনাতন ধর্ম সংঘে পূজিত দেবী প্রতিমা

সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সুদূর প্রবাসে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর স্বীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও মাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া সহরের সমস্ত অবাঙ্গালী জনতা সোৎসাহে পূজা-সমারোহে যোগদান করিয়াছিল। প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত হাজার হাজার দর্শনার্থী নর-নারীর ভীড় লাগিয়া থাকিত। কেণ্টেতে ইতিপূর্ব্বে দুর্গাপূজা হয় নাই এবং অন্য কোন পূজা উৎসবে এত সমারোহ হয় নাই বলিয়া জনতার অভিমত।

শ্রীমনোজকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়—

দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান মনোজকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যায় এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অধীনে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

গান্ধী জন্মদিনে উন্নয়ন পরিকল্পনা—

গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে ভারতরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট ভারতের সর্বত্র নূতন সার্বজনীন উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার, নলহাটি ও আমোদপুর, বর্দ্ধমান জেলার শক্তিগড় ও গুসকরা, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম, ২৪পরগণা জেলার বারুইপুর ও নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় ঐ দিন কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এক হাজারেরও অধিকসংখ্যক গ্রামের মোট ৪ লক্ষ ৩২ হাজার অধিবাসী এই কার্য্যে উপকৃত হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা সত্বর যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

জনসেবা দ্বারা শক্তি সংগ্রহ—

গত ১০ই অক্টোবর মাদ্রাজে আইন সভার সদস্যগণ ও রাজ্যের কংগ্রেসকর্মীদিগের এক সভায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু বলেন—কোন প্রকার বাধার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কংগ্রেসসেবীদিগকে নিজ নিজ স্থানে কংগ্রেসের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যদি সেখানে জনমত তাঁহাদের বিরোধী হয়, তথাপি জনসেবা দ্বারা ধীরে ধীরে জনগণকে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন করিতে হইবে। তাহা হইলেই কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সেবকগণ শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। সমগ্র ভারতে আজ নূতন ভাবে সমাজ-সেবা আরম্ভ করার সময় আসিয়াছে। সে জন্য শ্রীনেহরু 'ভারত সেবক সমাজ' গঠন করিয়া সর্বত্র কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

ঐতিহ্যের দিক থেকে আই এফ এ শীল্ড খেলার গুরুত্ব এত বেশী যে, এই প্রতিযোগিতাকে বাদ দিয়ে ক'লকাতার ফুটবল মরসুমের কথা ভাবাই যায় না। এই প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়েছে ১৮৯৩ সালে। খেলার এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে মাত্র একবার, ১৯৪৬ সালে শীল্ড খেলা স্থগিত ছিল, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে। আর একবার ১৯৩৪ সালের ফাইনালে কে আর আর এবং ডারহামসদলের প্রথম খেলা অমীমাংসিত দাঁড়ায় দুইপক্ষে ২টো ক'রে গোল হওয়াতে। এ খেলা আর হয় নি; কারণ রেফারিং সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে দুই পক্ষই খেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিত হিসাবে পরিত্যক্ত হয়।

কল্‌কাতার মাঠে ১৯৫২ সালের ফুটবল মরসুম শেষ হলেও মোহনবাগান—রাজস্থানের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি, খেলাটি দু'দিন অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলাটি পুনরায় কোন্ দিন হবে তারও কোন সঠিক খবর নেই। রাজস্থান দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। অপর দিকে মোহনবাগান দলের নবম ফাইনাল খেলা। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান ফাইনাল খেলেছে ১৯১১, ১৯২৩, ১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯, এবং ১৯৫১ সালে। এই ৮ বারের মধ্যে মোহনবাগান শীল্ড পেয়েছে ৩ বার—১৯১১, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে।

১৮৯৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ভারতীয় দল (১৯১১ সালে মোহনবাগান এবং ১৯৩৬ সালে মহমেডান স্পোর্টিং) মাত্র দু'বার আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যে শীল্ড ফাইনালে খেলেছে তিনটি ভারতীয় দল —১৯১১ এবং ১৯২৩ সালে মোহনবাগান, ১৯২০ সালে কুমারটুলি, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে মহমেডান স্পোর্টিং। খেলার সূচনা থেকে সুদীর্ঘকাল ইউরোপীয় এবং গোরাদলই খেলায় আধিপত্য বজায় রেখেছিল। শেষ গোরাদল শীল্ড পেয়েছে ইস্ট ইয়র্কস, ১৯৩৮ সালে এবং বে-সামরিক ইউরোপীয় দল পুলিস, ১৯৩৯ সালে। ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স শীল্ড নিয়ে ভারতীয়দলের একাধিপত্য লাভের যে পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয় সেই পথ দিয়ে ভারতীয় ক্লাব ভিন্ন অন্য কোন দল বিজয় স্তম্ভে পৌঁছতে পারে নি। এই ভাবে ইউরোপীয় প্রাধান্য লোপের কারণ হ'ল, শক্তিশালী দল

এইচ ডিলার্ড (আমেরিকা)
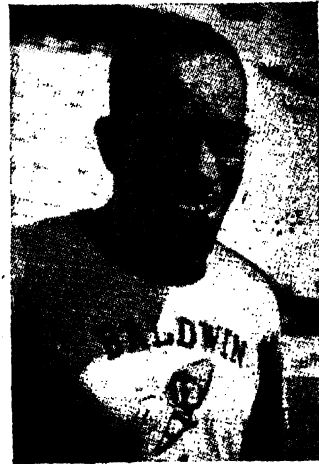
পঞ্চদশ [illegible] অলিম্পিকের ১১০ মিটার হার্ডলসে নতুন রেকর্ড স্রষ্টা

গঠনে ইউরোপীয় দলগুলির আগ্রহের অভাব; এ নয় যে, ভারতীয় দলের খেলার মান আগের তুলনায় [illegible] ইউরোপীয় শক্তিকে দাবিয়ে রেখেছে। বরং বর্ত্তমান সময়ে খেলার মান আগের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে দাঁড়িয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্রতিক আই এফ এ শীল্ড খেলার ইতিহাসে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে শেষ ইউরোপীয় পুলিশ দলের শীল্ড জয়লাভের পর বিগত ১১ বছরের

শীল্ড খেলায় ইষ্টবেঙ্গল শীল্ড পেয়েছে ৫ বার (১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯-৫১), মোহনবাগান ২ বার (১৯৪৮-৪৯), মহমেডান স্পোর্টিং ২ বার (১৯৪১-৪২), এরিয়ান্স এবং বি এ্যাণ্ড এ রেলওয়ে একবার হিসাবে। ১৯৪৯-৫১ সাল পর্য্যন্ত শীল্ড পেয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপর্যুপরি তিনবার শীল্ড জয়লাভের রেকর্ড করেছে। ক্যালকাটা ক্লাব ১৯২৪ সালে সর্ব্বপ্রথম এ রেকর্ড করে। এই দুই ক্লাব ভিন্ন অপর কোন দলের এ রেকর্ড নেই।

আলোচ্য বছরের শীল্ড প্রতিযোগিতায় ৪৮টি দল নাম পাঠিয়ে প্রকৃতপক্ষে ৪৬টি দল যোগদান করে। এদের মধ্যে বাংলার বাইর থেকে এসেছিল ১৮টি। বাঙ্গালোর ব্লুজ ভিন্ন অন্য কোন বাইরের দল সেমি-ফাইনালে উঠতে পারে নি। তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে ৪র্থ রাউণ্ডে ইস্টবেঙ্গল দলকে হারিয়ে দেওয়াতে আই এফ এ শীল্ড খেলার এক অংশের আকর্ষণ কমে যায়। গত ৭ বছরে ৬টা শীল্ড ফাইনাল খেলা হয়েছে। ১৯৪৫-৫১ সালের মধ্যে এই ৬টা খেলায় মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল এই দুই দলের মধ্যে চারবার শীল্ড খেলা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে এই জুটি ভেঙ্গে মোহনবাগান—ভবানীপুর এবং ১৯৫০ সালে ইস্টবেঙ্গল—সার্ভিসদলের ফাইনাল খেলা হয়। এ বছরের ফাইনালেও এই দুই জনপ্রিয় দলের জুটি হওয়ার যেসম্ভাবনা ছিল তা ভেঙ্গে যাওয়াতে ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালের শীল্ড ফাইনালের মত উত্তেজনা কমে যায়। তবে টিকিটের চাহিদা কোন অংশেই কম ছিল না।

প্রথম দিনের শীল্ড ফাইনাল খেলাটি ২-২ গোলে ড্র যায়। প্রথমার্দ্ধের পনের মিনিটের মধ্যে রাজস্থান দুটো গোল দিয়ে ২-০ গোলে খেলা শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে পর্য্যন্ত এগিয়ে থাকে। এ অবস্থায় মোহনবাগান দলের অনেক সমর্থকই হতাশ হয়ে বাড়ীমুখো হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ আট মিনিটের খেলায় মোহনবাগান দল অকস্মাৎ খেলার গতি একেবারে ঘুরিয়ে দেয়। দুটো গোল শোধ দিয়ে তারা রাজস্থানকে জোর চেপে ধরে। খেলার শেষ দিকে মোহনবাগান জয়লাভের শেষ সুযোগ হারায়। রাজস্থান গোলে সুতীব্র সট ক্রশবারে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই দিনের খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মোহনবাগান দলের মান্নার ফ্রি-কিক্ সট। রাজস্থান গোল থেকে চল্লিশগজ দূরে মোহনবাগান একটা ফ্রি-কিক্ পায়। ঝিমিয়ে পড়া মোহনবাগান দলের সমর্থকেরা শেষ চেষ্টা হিসাবে সমস্বরে মান্নার নাম উচ্চারণ করলো—অর্থাৎ মান্নাকে এই ফ্রি-কিক্ করার জন্য আহ্বান। বহুবারের মত মান্না এবারও বহু দূর থেকে সুতীব্র সট ক'রে গোল করলেন। মান্নার এই গোল শোধ দেওয়ার পরই মোহনবাগান দল দর্শনীয় বোঝাপড়া এবং জয়লাভের অদম্য জিদ নিয়ে খেলতে থাকে। ২টি গোল শোধ করা ছাড়াও খেলার প্রথমার্দ্ধের বার মিনিটে এবং শেষ দিকে মোহনবাগান অল্পের জন্যে গোলকরা থেকে বঞ্চিত হয়। রাজস্থানও একবার গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করে।

অষ্টমীর দিন রিপ্লে-ফাইনাল খেলাটিও টিকিটের মূল্য কমিয়ে চ্যারিটি হিসাবে খেলানো হয়। এই নিয়ে আলোচ্য বছরে মোহনবাগান ক্লাব লীগ-শীল্ডে ৮টি চ্যারিটি ম্যাচ খেলেছে। এক মরসুমে এত বেশী চ্যারিটি ম্যাচ কোন দল ইতিপূর্ব্বে বোধহয় খেলেনি। কোন দলকে এত বেশী চ্যারিটি ম্যাচ খেলানো উচিত নয়, দলের সমর্থক এবং সভ্যদের উপর অবিচার করা হয়। আগের তুলনায় নামকরা ক্লাবগুলির চাঁদার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, এরপর তাদের ভাল ভাল খেলাগুলিকে চ্যারিটি করলে সভ্যদের ক্লাবের সভ্য হওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? ফুটবল মরসুম আরম্ভের পূর্ব্বে চ্যারিটি ম্যাচ সম্পর্কে নামকরা ক্লাবগুলির সভ্যদের সম্মতি নিয়ে আই এফ এ-র একটি নির্দ্দিষ্ট নীতি ঘোষণা করা উচিত। চ্যারিটি ম্যাচ ব্যাপারে সাধারণ দর্শকদের স্বার্থও কম নয়। ক্লাবের সভ্যদের তুলনায় সাধারণ দর্শক সংখ্যা অনেক বেশী। সুস্থ সবল জীবন ধারণের প্রয়োজনে মানুষের চিত্ত-বিনোদন অনস্বীকার্য্য। সুতরাং এই চিত্ত-বিনোদনের মূল্য কখনও বেশী হওয়া উচিত নয়, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের বর্ত্তমান আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনে। আমাদের দেশে ফুটবল খেলার উপর জনসাধারণের যে প্রবল আকর্ষণ, কর্ত্তৃপক্ষ মহল যদি অধিক চ্যারিটি ক'রে তার চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করেন তা'হলে তা জাতীয় স্বার্থের উপর কুঠারাঘাত করা হয়—যত মহৎ উদ্দেশ্যেই সে অর্থ ব্যয়িত হ'ক না কেন। জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার একটা সীমা আছে। কোন

ব্যাপারে এই সীমা লঙ্ঘন করতে বাধ্য করা কোন সভ্য এবং দায়িত্বশীল সরকার অনুমোদন করেন না। কারণ এর প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনৈতিক এবং নৈতিক জীবন-যাত্রার পক্ষে শুভ নয়। বৈদেশিক রাজত্বকালেও আমরা লক্ষ্য করেছি, সার্কাস, কার্নিভাল বা লাভজনক ক্রীড়ানুষ্ঠানে জনসাধারণের আর্থিক সঙ্গতি বিচার ক'রে সরকারী কর্তৃপক্ষ মহল অনুষ্ঠানের কাল নির্দ্ধারণ ক'রে দিতেন। কলকাতার ফুটবল মাঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র এবং নাগরিক সংখ্যা বেশী ; এরূপ অবস্থায় অধিক চ্যারিটি ম্যাচ খেলানোর অর্থ দাঁড়ায়, তাঁদের চিত্তবিনোদনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে তাঁদের অমিতব্যয়ীর পথে টেনে আনা। আমরা এ বিষয়ে সরকারী মহলের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করি। চ্যারিটি ম্যাচে দর্শকশ্রেণীর পকেট থেকে কি বিপুল অর্থই না সংগৃহীত হয়! অথচ দর্শকদের সুখ সুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষ মহলের কোন লক্ষ্য আছে কি? চ্যারিটি ম্যাচের সময় প্রকাশ্য দিবালোকে খেলার মাঠের ধারে পাশে চড়াদামে তাড়াতাড়া টিকিট বিক্রী হয়। এই সমস্ত ঘটনা এবং আই এফ এ-র নীতি জন-সাধারণের মনকে যেভাবে বিষাক্ত ক'রে তুলছে তা আমরা জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে শুভ মনে করি না।

প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান দলের নিয়মিত খেলোয়াড় সাত্তার অসুস্থ থাকায় খেলতে পারেন নি। দ্বিতীয় দিনে তিনি খেলতে নামেন। কিন্তু আহত থাকায় সেণ্টার ফরওয়ার্ড বসিদ এবং অসুস্থ হওয়ার ফলে কণু গুহঠাকুরতা নামতে পারেন নি। ফলে দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান দলের আক্রমণ ভাগ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। এর ওপর প্রথমার্দ্ধের খেলার ১১ মিনিটে সাত্তার পায়ের মাংসপেশীর টানে মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ন আর তিনি খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। এ অবস্থায় আক্রমণ-ভাগে ৪জন খেলোয়াড় নিয়েও মোহনবাগান ক্লাব বিপক্ষ দলের তুলনায় গোল করার সুবর্ণ সুযোগ কয়েকবার নষ্ট করেছে। মুখ্যতঃ এইদিন দুই দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গোলমুখে ঠিকমত সট করতে বা বল পাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছে। ফলে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা সব সময়েই আধিপত্য বজায় রেখে খেলেছে। খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত গোল শূন্য ড্র যায়। এদিন আর অতিরিক্ত সময় নিয়ে খেলানো হয় না। খেলার পর রাজস্থান ক্লাব কর্তৃপক্ষ নাকি জানিয়েছেন, তাঁদের ক্লাব অতিরিক্ত সময় খেলতে রাজী ছিল, মোহনবাগান ক্লাব ছিল না। সুতরাং তাঁদের ক্লাবকে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হিসাবে কেন ঘোষণা করা হবে না। রেফারী নাকি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, খেলায় উপযুক্ত আলো হয়ত থাকবে না এই অনুমানে তিনি অতিরিক্ত সময় খেলান নি। টুর্নামেণ্ট কমিটি রাজস্থানের অভিযোগ অগ্রাহ্য করায় বর্ত্তমানে আই এফ এ-র গভর্ণিংবডির কাছে ব্যাপারটি উত্থাপিত হবে। সুতরাং কবে ১৯৫২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাটি পুনরায় হবে তা আজও অনিশ্চিত।

জ্যাটোপেক সম্মানিত ঃ

১৯৫২ সালের হেলস্কিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বিশ্ব অলিম্পিক গেম্‌সে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ ক'রে চেকো-

এমিল জ্যাটোপেক
১৯৫২ সালের বিশ্বঅলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়েছেন

স্লোভাকিয়ার এমিল জ্যাটোপেক যে অপূর্ব্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। পঞ্চদশ বিশ্ব অলিম্পিক গেমসকে 'Zatopek's olympic' এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর এই ক্রীড়ানৈপুণ্যের

দরুণ তাঁকে সম্প্রতি 'The order of the Czecho-slovak Republic' এই খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছে। এ ছাড়া চাকুরি জীবনে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে—Staff captain থেকে তিনি Major হয়েছেন।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল ঃ

১৯৫২ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৪-০ গোলে অষ্টম গুর্খা রাইফলস দলকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার উক্ত টুর্নামেন্টে জয়ী হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম জয়ী হয় ১৯৫০ সালে। আলোচ্য বছরের ফাইনাল খেলার প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধনরাজ হ্যাট-ট্রিক করেন।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সফর ঃ

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আব্দুল হাফেজ কারদারের নেতৃত্বে প্রথম পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফরে এসেছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে সরকারী-ভাবে এই দলটি টেষ্ট ম্যাচ খেলবে। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা হবে ১৬ই অক্টোবর দিল্লীতে টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে অধিনায়কত্ব করবেন লাল অমরনাথ। প্রথম টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে যাঁরা মনোনীত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন বাঙ্গালী খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন—পঙ্কজ রায় এবং পি সেন। গত ১০ই অক্টোবর পাকিস্তান ক্রিকেট দল তাদের সফরের প্রথম ম্যাচ সুরু করেছে উত্তর অঞ্চল একাদশের সঙ্গে।

১১।১০।৫২

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বৈষ্ণব সাহিত্য "পদাবলী-পরিচয়"—৩৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত নাটক "ভিখারিনী রাজকন্যা"—২৷৹
শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "নিশীথ রাতের সূর্য্যোদয়ের পথে"—২৸৹
শ্রীসুশীলকুমার দে-সম্পাদিত "বাংলা প্রবাদ"—২০৲
শারদীয়া সংখ্যা "আনন্দবাজার পত্রিকা"—৩৷৹
শারদীয়া সংখ্যা "দেশ"—২৷৹
শারদীয়া সংখ্যা "জনসেবক"—২৲
দেবসাহিত্য-কুটীর-প্রকাশিত ছোটদের পূজা-বার্ষিকী "পরশমণি"—৪৲
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "তদবধি"—১৲
শ্রীরিক্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বহুদিন পরে"—১৷৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দুর্জ্জয়মণী"—১৸৹, "কালী ডাক্তার"—১৸৹, "সিলভার ড্রাগন"—১৷৹
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "বড়ঘরের মেয়ে"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "দস্যু বনাম মোহন"—২৲, "স্বরূপে মোহন"—২৲, "দীনবন্ধু মোহন"—২৲, "রহস্যভেদী মোহন"—২৲
শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "কার পাপে?"—২/৹
শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মরণ-মহল"—২৲
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র পরিবেশিত গল্প-গ্রন্থ "রোমান্স"—১৸৹
শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত সমালোচনা "আমাদের কবি ও কাব্য"—১৷৹
জগদানন্দ বাজপেয়ী প্রণীত স্মৃতি-কথা "চলার পথে"—৩৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঝড়ো হাওয়া" (৩য় সং)—২৷৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বয়ংসিদ্ধা" (২য় খণ্ড—২য় সং)—৪৷৹
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা-সঙ্কলিত "গোপাল ভাঁড়"—১৷৹
শ্রীআনন্দ প্রণীত কিশোর উপন্যাস "চোর যাদুকর"—১৷৹
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "আলো দিয়ে গেল যারা"—২৲
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর প্রণীত "হর্ষচরিত"—১০৲, "পুষ্পমেঘ"—৫৲
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত "ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প"—২৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তবিশারদ প্রণীত "ধর্ম ও তাহার স্বরূপ"—১৷৹
শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রণীত "নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ"—১৲
শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অবদান"—।৹
স্বপনবুড়ো প্রণীত ছেলেদের কৌতুক নাটক "আত্মহত্যা"—১৲
শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত"—১০৷৹
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শেষের পরিচয়" (৯ম সং)—৪৷৹
শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটক "চাঁদ সদাগর" (৫ম সং)—২৲
শ্রীজ্যোতি, বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থ "লগ্নফল" (৪র্থ সং)—২৲
ডাঃ পাঁচুগোপাল নন্দী প্রণীত "স্মৃতির-ব্যথা"—২৷৹
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "পোষ্যপুত্র" (৬ষ্ঠ সং)—৪৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

প্রথম খণ্ড | চত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সংস্কৃতির বাহন : ভাষা—ধর্ম—শিল্প

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

পশুপক্ষীর মত মানুষও সামাজিক জীব, কিন্তু মানুষের আছে সংস্কৃতি, যা পশুপক্ষীর নেই। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি—culture—শব্দটির উৎপত্তি বেশি দিনের না হলেও সংস্কৃতি বস্তুটি মানুষের দীর্ঘকালের সম্পদ। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-যুগের মানুষেরও সংস্কৃতি ছিল। শিল্প-নীতি-ধর্ম সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিল। তথাপি সেই জাতিগুলিকে 'সভ্য' জাতি বলা চলে না। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছিল তারা, কিন্তু পরিবেশকে পুনর্গঠিত (remaking environment) করতে পারে নি। পরিবেশের পুনর্গঠন মানুষকে নিজের চেষ্টায় করতে হয়েছে। গৃহ-নির্মাণ, নানা প্রকার আবিষ্কার, জলসেচের ব্যবস্থা, লিখনপ্রণালীর উদ্ভাবন, এ-সব তার সক্রিয় চিন্তা ও উদ্যমেরই ফল। শুধু তাই নয়—মানুষের ধী-শক্তির বিকাশ ঘটেছে, মনোজগত ও অধ্যাত্ম-জগতের অন্তর্দৃষ্টিও জন্মেছে, সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা পরিবেশের পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছে বলে'। বিষয়টি একটু চিন্তা করলে মনে হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নিয়ে 'হিম-সিম' খাবার তেমন দরকার নেই। তবু যেন সত্যই একটু 'হিম-সিম' খেতে হয়। সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃতির দানকে বাদ দিয়ে নিজের চেষ্টায় মানুষ ব্যক্তির ও সমষ্টির নৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও পারমার্থিক উন্নতি-বিধান যে সব বিষয়ে করতে সমর্থ হয়েছে, সেগুলিকে সমগ্রভাবেই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এই সংজ্ঞা অনুসারে বস্তু জগতের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, যেমন গৃহ ও পথ নির্মাণ, জলসেচ, যানবাহন—রাষ্ট্র শাসনতন্ত্র, ধর্ম-সংঘ প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থা, চিন্তা ও ভাবরাজ্যে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম-তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, সত্য ও আদর্শ প্রভৃতির সৃষ্টি ও উৎকর্ষ সাধন, এ-সবের মধ্যে মানব প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ জাতীয় সংস্কৃতিরই পরিচায়ক।

—এখানে প্রশ্ন ওঠে—'সভ্যতা'-কথাটা কি মানবের এই

গুণাবলীর বিষয়ই স্মরণ করিয়ে দেয় না? সভ্যতা যদি সংস্কৃতির মত মানবের কর্মক্ষেত্রের অতখানি ব্যাপক অংশ অধিকার না করে' সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ মাত্র হয়ে থাকে, তা হলে এমন কতগুলি জিনিস সংস্কৃতির আছে, যা সভ্যতার নেই। সে জিনিসগুলি কি—তা কি কেউ বলতে পারে? পক্ষান্তরে আদিম জাতিকে সভ্য না বলে 'আদিম সংস্কৃতির (primitive culture) কথা বলা হয় কেমন করে? নৃতাত্ত্বিক মরগ্যান মানব জাতির বিবর্তনের পথ ধরে' ক্রমোন্নতির অবস্থাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, আর প্রত্যেকটি বিভাগের মাথায় লেবেল মেরে দিয়েছেন এই ভাবে—প্রথম পর্যায়, অসভ্য (savage); দ্বিতীয় পর্যায়, বর্বর (barbarous); তৃতীয় পর্যায়, সভ্য (civilized)। তাঁর এই বিভাগ মত, মানুষ সভ্য হয়েছে তখনই—যখন সে ধাতুর ব্যবহার, নগর নির্মাণ ও রাষ্ট্রগঠন শিখেছে, আর লেখন প্রণালীর উদ্ভাবন করতে পেরেছে। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভ্রাম্যমান শিকারীর অসভ্য জীবন ছেড়ে মানুষ যখন কৃষিকার্য্য শিখে বর্বরের পর্যায়ে উঠলো, তার সংস্কৃতিও উঠলো তারই সঙ্গে—আবার প্রগতির আর এক ধাপ যেমন উঠলো মানুষ, সংস্কৃতিও তখন এক লাফে চড়ে বসলো সভ্যতার মঞ্চের উপর। একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন, "Man is one; civilizations are many" মানুষ এক, সভ্যতা অনেক রকমের। মানুষের আছে নানা দশা, শৈশব বাল্য কৈশোর। ব্যক্তির জন্ম থেকে বয়স ধরে' শরীর মন বুদ্ধির বৃদ্ধি বিবেচনা করেই দশাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে। আসলে কিন্তু অবস্থান্তরগুলি জীবনের বিভিন্ন রূপ। মানব প্রগতির ঠিক অমনি একটি বাহ্য অবস্থাকেই লেবেল মেরে দেওয়া হয়েছে সভ্যতা বলে। মর্গ্যান মনুষ্যজাতির নানা অবস্থার স্তর বিভাগ করেছেন ভূতত্ত্বের স্তরের অনুকরণে, জীবনের প্রবাহকে কিন্তু ভূতত্ত্বের স্তরের মধ্যে আটকে রাখা যায় না। সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার যোগ অবিচ্ছিন্ন। এই যোগাযোগটি ছিঁড়ে গেলে সভ্যতাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-সংস্কৃতিরই বাহ্য রূপকে খণ্ডিত করে তার একটি বিশেষ অংশের নাম দেওয়া হয়েছে সভ্যতা। প্রস্তর-যুগ থেকে ধাতু যুগে পদার্পণ যদি সভ্য জগতে প্রবেশ করা হয়, তবে আমরা যে এখন আণবিক যুগে প্রবেশ করছি, ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকেরা এই অবস্থাটির নাম কী যে দেবেন তা ভাববার বিষয়।

এখন বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল যে, মানসিক উৎকর্ষের ফল সংস্কৃতি, যার অভিব্যক্তি ঘটে সমাজ-জীবনের ভিতর। মানব-সমাজের একটি বিশিষ্ট গুণধর্ম সংস্কৃতি। মানুষের চিন্তাশক্তি তত্ত্ববিচার ও আত্মচেতনা থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। চিন্তাশক্তিকে কার্যকরী করতে হলে দরকার হয় কর্মোপযোগী যন্ত্রের, আর চিন্তার সেই যন্ত্রটিই হচ্ছে—ভাষা। পশুপক্ষীর ভাষা নেই। তাদের কণ্ঠনিসৃত ডাক বা কাকুলীকে ভাষা বলা চলে না। হর্ষ বেদনাকে আমরা যেমন 'আঃ—উঃ' প্রভৃতি কতিপয় শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করি, অথবা ইঙ্গিত ইসারার ভঙ্গীতে অস্ফুট স্বরের দ্বারা যেমন অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করি, জীব-জন্তুর ডাকও ঠিক তেমনি। বস্তুত মানুষ আর বন্য-মানুষের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করবার মূল কারণই হচ্ছে ভাষা। গ্রাহাম ওয়ালেস্ বলেছেন, "উপযুক্ত অবস্থার মধ্যে মানুষের মন স্বভাবত চিন্তাপ্রবণ হয়ে ওঠে। মানুষ যে বুদ্ধির বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করতে পেরেছে, তার কারণ হচ্ছে, ভাষার বিন্যাস (disposition of language)"—অর্থাৎ ভাষাকে সে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল।

সকল দেবতারই বাহন আছে, সেই বাহনে চড়ে দেবতার আবির্ভাব হয়। তেমনি সংস্কৃতির একটি বাহন হচ্ছে ভাষা, হয়ত বা সর্বপ্রধান বাহন। আমাদের শাস্ত্রে 'শব্দ'কে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্মকে বোধ করি ভাষারই রথারূঢ় সারথী বলে' কল্পনা করেছিলেন ঋষিরা। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বেঁধে দিয়েছে যে সূত্রটি—'সূত্রে মণিগণা ইব'—সেই সূত্রই হল ভাষা। মনোগত ভাবের আদান-প্রদান করে মানুষ ভাষার ব্যবহার দ্বারা, আর তা যে শুধু খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা প্রভৃতি জীবন ধারণের উপায় ও প্রণালীর উদ্ভাবন করেই ক্ষান্ত হয়েছে, এমন নয়। মানুষের পরস্পর সহযোগিতা, সমাজের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র সংস্থা, এ-সব সম্ভব হয়েছে ভাষার কল্যাণে। অদ্ভুত কৌশল সহকারে মানুষ তার কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভাব প্রকাশের যন্ত্ররূপে ভাষার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সৃজন-শক্তির প্রভাবেই ভাষার উৎপত্তি, তাই ম্যাক্স্-মূলার

ভাষাকে human art বলে অভিহিত করেছেন। ভাষার সৃষ্টি না হলে সংস্কৃতিরও উদ্ভব হত না কোন দিন—আর সংস্কৃতির অভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা স্ফূর্তি, সমাজের পূর্ণতর পরিণতি, কোনটিই ঘটতো না। প্রত্যেক বস্তুকে নামের সঙ্গে জড়িয়ে ভাষা তাকে অন্তরের জিনিস করে' তোলে। চোখের সামনে না থাকলেও নাম করা মাত্র বস্তুটির রূপ মনে পড়ে। ভাষা শুধু বস্তুর নাম দিয়েই তার কর্তব্য শেষ করে নি, ভূত ভবিষ্যত বর্তমানের প্রত্যেকটি অবস্থাকে নামের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে পৃথকভাবে, আর সেই সঙ্গে মানুষের চিন্ময় ভাব ও ধারণা (abstract thoughts and concepts), ভাসমান চিন্তার বিষয়গুলিকে বাক্যের রূপ দিয়ে সর্ব-মানবের বোধগম্য করে তুলেছে। তোতা-পাখী কথা বলে, কিন্তু তা ভাষা নয়—ভাষার অনুকরণ, বোধশূন্য আবৃত্তি মাত্র। কথা বলতে শেখার সময় শিশু ও অন্যের অনুকরণ করে, তবে তার অনুকরণের মধ্যে থাকে বুদ্ধির দীপ্তি—জাজ্বল্যমান। বস্তুত বুদ্ধি থেকেই ভাষার উৎপত্তি। আবার ব্যক্তির ও জাতির বুদ্ধিকেও প্রখর করে তোলে ভাষা। সংস্কৃতির ধারক ভাষা—সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, আচার, অনুষ্ঠানগুলিকে পুরুষানুক্রমে বাঁচিয়ে রাখে। নূতন ভাব, নূতন চিন্তাকে রূপ দান করে' ভাষা সেগুলিকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে' তোলে। সেই সঙ্গে সংস্কৃতির ভাণ্ডারও নব নব ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানব জাতির আদি-ভাষা একই, সৃষ্টির পর সব মানুষ এক ভাষায় কথা বলতো—এমনি একটি ধারণা বহুকাল ধরে ছিল। বাইবেলে আছে,—"And the whole earth was of one language and of one speech (Genesis ch. XI)। বাইবেলের Tower of Babel উপাখ্যানটিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছিল মানব জাতির সংহতি ভেঙে দেবার জন্য। বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল পরবর্তীকালে—তাই যে জাতির ভাষা ছিল সর্ব-মানবের সেই আদি-ভাষা, প্রাচীনতম সংস্কৃতিও ছিল সেই জাতিরই—প্রাচীন মিশরীয়েরা এমনি কোন ধারণা পোষণ করতেন। মিশরীয়েরা নিজেদের সব থেকে প্রাচীন জাতি বলে' মনে করতেন বটে, কিন্তু মনে তাদের সংশয় জেগেছিল, হয়ত বা ফ্রিজিয়ান (Phrygian)-দের সভ্যতা আরও প্রাচীন। এই সন্দেহ দূর করবার জন্য রাজা সামেটিকাস (Psammatichus) একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা করলেন। সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থের দুটি ছেলেকে একটি রাখালের ঘরে রেখে নির্দেশ দিলেন তিনি—তাদের যেন কোন কথা না বলে তাদের সামনে রাখার উদ্দেশ্য: কারু কাছে ভাষা শিক্ষা না করে' শিশুর আবোল-তাবোল বুলির শেষে, যে-ভাষার কথাটি তার মুখ দিয়ে সর্ব-প্রথম আপনা থেকে ফুটে বেরুবে, সেই ভাষা-ভাষী মানুষের জাতিই অন্য সব জাতির চেয়ে পুরাতন। শেষে একদিন দেখা গেল—রাখাল যেমনি ঘরে ঢুকেছে, শিশু দুটি অমনি দু'হাত বাড়িয়ে 'বিকোস' বলে' চেঁচিয়ে ছুটে এলো। শব্দটা প্রথমে রাখাল কানেই নেয় নি, তারপর বার বার যখন শুনতে লাগলো—'বিকোস্' 'বিকোস্'—তখন সে শিশু দুটিকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা শুনে বুঝতে পারলেন, শব্দটি ফ্রিজিয়ান ভাষার অর্থ—রুটি। ফ্রিজিয়ানদের সভ্যতা যে অধিকতর প্রাচীন, তাদের এই দাবীটি মিশরীয়েরা তখন নিঃসঙ্কোচে মেনে নিলে।

এই কৌতুক-প্রদ কাহিনীটি লিখে গেছেন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্। গল্পটি তিনি শুনেছিলেন, মেমফিস্ নগরের পুরোহিতদের কাছে। নিজে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন কি না তার কোন ইঙ্গিত নেই, তবে গ্রীকদের অনেক গল্পকেই আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সে যা-ই হোক, এই কাহিনীতে স্বতঃসিদ্ধ রূপে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ভাষা মানুষের সহজাত—অর্থাৎ, নেহাৎ বোবা না হলে কোন-না-কোন ভাষায় কথা সে বলবেই। সভ্য মানবের আদিম মৌলিক ভাষাটি না শিখলেও তা অবস্থা-বিশেষে আপনি বেরিয়ে আসে। এটা যে একটা ভ্রান্ত ধারণা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ-কথাও বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, অনেক জাতির মধ্যে পূর্বপুরুষের ভাষার প্রচলন নেই, তাদের ওপর নতুন ভাষা আরোপ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফ্রান্সের কথা বলা যেতে পারে। ফ্রান্সের অধিবাসীরা কেল্‌ট্ (Celt)। প্রাচীনকালে তারা কেল্‌টিক্ ভাষায় কথা বলত। রোমানরা ফ্রান্স জয় করবার পর থেকে কেল্‌টিক্ ভাষা অন্তর্ধান করলো। ফরাসীরা বিজেতার ভাষা গ্রহণ করলে।

...মানব-সংস্কৃতিকে বিস্তার করতে সহায়তা করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাকৃতিক পটভূমির প্রভাবও ভাষার ওপর এসে পড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এ-সম্বন্ধে সন্ধান ও গবেষণা করে' 'Linguistic palaeontology'-নামে একটি বিজ্ঞানকে গড়ে তোলা হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই আর্য-ভাষার উৎপত্তিস্থল নিয়ে নানা-রকম আলোচনা চলছিল। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষার শব্দের ধাতুগত মিল দেখে, সেই সব ভাষাকে ইন্দো-জার্মান ভাষা-সমষ্টির অন্তর্গত বলে ধরা হয়। এই ভাষা-সমষ্টির মধ্যে জীব-জন্তু ও প্রাকৃতিক পদার্থ-ব্যঞ্জক যে-সব শব্দের ধাতুগত মিল আছে, ধরে নেওয়া হল সেই সব জীব-জন্তু ও পদার্থ যে দেশে আছে, সেই দেশেই মৌলিক আর্য-ভাষার উৎপত্তি এবং সেখানেই আর্য-ভাষা-ভাষীরা থাকতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-সব যুক্তি টেঁকে নি—ভাষা থেকে তার ভৌগোলিক উৎপত্তি-স্থল নির্ণয় করা সম্ভব হল না। তার কারণ—বিভিন্ন জাতির ভেতর ভাষার লেন-দেন চলেছে, আর বিভিন্ন জাতীয় ভাষার মধ্যেও আশ্চর্য মিল দেখা গেছে। ফল কথা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা মাত্র তিন চার হাজার বছর আগেকার। এমন যে একটি অনতিদীর্ঘকাল-ব্যাপী ভাষা—সেই আর্য-ভাষা নিয়ে ভাষার আদিতত্ত্বের বিচার চলে না। তা ছাড়া আর্য ভাষাকে যদি গোষ্ঠী ভাষা বলা যায়, তা হলে অমন গোষ্ঠী-ভাষার অন্ত নেই—যেহেতু এক উত্তর আমেরিকায়ই পঞ্চাশেরও অধিক গোষ্ঠীভাষা আছে। এ-থেকে বেশ বোঝা গেছে, কোন বিশেষ ভাষার সঙ্গে কোন জাতি-বিশেষের সম্বন্ধ নেই। বিভিন্ন জাতি এক ভাষা-ভাষী হতে পারে, আবার একই জাতির বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করাও বিচিত্র নয়। জাতি বিভিন্ন হলেও এক ভাষাভাষী জাতিগুলির মধ্যে সংস্কৃতির যোগাযোগ দেখা যায়।

আদিম মানবের কাছ থেকে যে-সব বিশ্বাস ও ধারণা আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি, ধর্ম-বিশ্বাস তার মধ্যে অন্যতম। ধর্ম বলতে আমরা মানবাত্মার সঙ্গে পরমেশ্বরের সম্বন্ধই বিশেষ করে বুঝে থাকি—আর সেই আত্মার রূপ আমাদের কাছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয়। গীতায় বলা হয়েছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ,
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।

অস্ত্রাদি এই আত্মাকে ছেদন করে না, অগ্নি দাহ করে না, জল ক্লিষ্ট করে না, বায়ু শুষ্ক করে না। নিয়ানডারথ্যাল প্রভৃতি আদি-মানবও দেহাতিরিক্ত আত্মার সত্তায় বিশ্বাস করতো বটে, যে-আত্মা দেহ-ত্যাগের পরেও বেঁচে থাকতে পারে—কিন্তু তাদের সেই আত্মা অবিনাশী অব্যয়-বস্তু নয়। বেঁচে থাকতে হলে পরলোকেও আত্মার পান-ভোজনের এবং আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়—তাই তাদের কবরে খাদ্য-দ্রব্য ও প্রস্তরাস্ত্র প্রোথিত করা হত। আত্মার বিষয়ে মানুষের দর্শন-চিন্তা বেশী দিনের নয়। আর, দর্শন শুধু আদি-মানবের পরলোকের ধারণাকে বা স্থূল বিশ্বাসকে চুয়িয়ে সূক্ষ্ম করে' আধুনিক মানুষের তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে (rationalisation)। আদি-মানব বিশ্বাস করতো ডবল-সত্তা। একটি সত্তা হচ্ছে দেহ, আর একটি সত্তা দেহের ভিতর ক্ষুদ্র একটি মানুষ, জলে প্রতিবিম্বিত ছায়ামূর্তির মত। অন্তরের এই সত্তাটি মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ ছেড়ে নানাস্থানে বিচরণ করে, মৃত্যুর পর প্রেতরূপে অবস্থান করে। ঘুমের ভেতর ও-রকম নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যে স্বপ্ন—সত্য নয়, এই জ্ঞানই অনেক আদিম মানুষের নেই। স্বপ্ন যে কতখানি সত্য তার কাছে, সে-বিষয় স্যর এভেরার্ড ইম্‌থার্ন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—কয়েকজন গায়েলা-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তিনি এসেকুইবো-নদীর তীরে তাঁবু ফেলে বাস করে-ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সে-স্থান ছেড়ে যাবার দরকার হল। কিন্তু কয়েকজন ইণ্ডিয়ান পীড়িত ছিল, তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—তার দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও গতরাত্রে তাকে কতগুলি খরস্রোত জল-প্রপাতে নৌকো বাইতে জোর করে বাধ্য করা হয়েছে।—তাকে অনেক করে বলা হল, সে স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু সে-কথায় আদৌ কান দিলে না সে। অন্যান্য কয়েকজন ইণ্ডিয়ান বললে—এখানে উপস্থিত নেই এমন একজন মানুষ রাত্রে এসে তাদের মার-ধোর করেছে। এই বলে—তারা তাদের গায়ে হাত বুলতে লাগলো। দেখা গেল, ঘুমের

মধ্যেও মানুষের একটি সত্তা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে অন্যত্র ঘুরে বেড়ায়, এই তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস শুধু আদিম অসভ্য জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপনিষদ গ্রন্থে দেখতে পাই আমরা—উন্নত দার্শনিক পটভূমিকায় এই স্থূল বিশ্বাসকেই তত্ত্বার্থীর সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হতে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, হে সৌম্য! আমার নিকট সুষুপ্তি তত্ত্ব অবগত হও (স্বপ্নান্তং মে বিজানীহি)।···সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চার দিকে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু অন্যত্র আশ্রয় না পেয়ে সেই বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে, মনও তেমনি স্বপ্নকালে নানাস্থানে বিচরণ করে' যখন আশ্রয় পায় না, তখন ফিরে এসে আবার প্রাণকেই আশ্রয় করে। এখানে স্বপ্ন-দর্শনের মধ্যে উন্নত সভ্য সমাজেও যে আত্ম-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি যে, স্বপ্ন-দর্শনই আদি-মানবের মনে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছিল, আর তাই থেকেই হয়েছে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব।

কিন্তু কোন একটি বিষয়-জ্ঞানকে ধর্ম-চেতনার মূল-ভাব বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হয়। অনেক রকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান আদি-মানবের মনে স্থান পেয়েছিল, যা থেকে সে কোন-না-কোন প্রকারের আত্মিক সত্তা (spiritual beings) অনুমান করতে পারতো। Tylor তাঁর Primitive Culture-নামক গ্রন্থে আদিম-জাতির এই আত্মিক সত্তায় বিশ্বাসকে animism নাম দিয়েছেন। আত্মিক সত্তা—'ধরা-ছোঁয়া-যায়-না' এমন এই বস্তুটির স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি 'ছায়া-রূপ' (phantasm)-এর ওপরই জোর দিয়েছেন বেশী। স্বপ্নে বা মনের ভ্রমে মানুষ ছায়ারূপকেই দেখে থাকে। আবার কায়াহীন ছায়াকেও দেখে সে তার নিজের দেহকে অনুসরণ করতে—অথবা জলে প্রতিবিম্বিত হতে। আদি-মানবের কাছে এই ছায়া-রূপই ছিল দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট জগতের মধ্যস্থান। অর্থাৎ, ছায়ারূপের ভেতর দৃশ্যমান কায়া নেই যেমন, আবার তা বায়ুর মত অদৃশ্যভাবেও বিচরণ করে না। এ-সব থেকেই আদিম মানুষের মনে ধারণা জন্মেছিল এক প্রকার সার্বজনীন জীবন-শক্তির (Universal vitality), যা তাকে শুধু কতগুলি ভূত প্রেত বিশ্বাস করতে শিখিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—সর্বভূতে, সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে প্রাণ-শক্তির কল্পনা করতেও তাকে শিখিয়েছিল। বস্তুত সে বিশ্বের দৃশ্যত চলমান বস্তু মাত্রকেই মানুষের অনুরূপ কোন প্রাণবন্ত অনুভূতিশীল শক্তিমান জীব বলেই মনে করতো। মানুষের অনুরূপ করে এই যে সব-কিছুকে দেখা, একেই বলা হয়—anthropomorphism. পক্ষান্তরে এ-কথাও সত্য যে বর্বর জাতির 'দানা' (spirit) শুধু মানুষের প্রেতাত্মাকেই বোঝায় না। বর্বর যখন ঐরূপ কোন আত্মিক সত্তার কথা বলে, তখন তা মানুষ, জন্তু বা কোন বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নদী পাহাড় পর্বতের মধ্যেও এক রকমেরই আত্মিক সত্তা বিরাজমান—তাদের গুণ-ধর্ম অভ্যাস-প্রকৃতি সবই এক, এইরূপই কল্পনা করে সে।

ধর্ম বলতে আজ যা আমরা বুঝি, আদিম জাতির মধ্যে ঠিক সেই ভাবটি পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট না হলেও, তাদের ভাব ও চিন্তাধারা থেকে সভ্য জগত মুক্ত হতে পেরেছে এরূপ মনে করা চলে না। বস্তুত এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে, আদিম জাতি ও সভ্য মানুষের মধ্যে চিন্তাধারার ও ভাবগত পারম্পর্য-ধর্ম যেমন করে বজায় রেখেছে, মানুষের কোন প্রতিষ্ঠানই এমনটি করতে পারে নি। ইংরেজ দার্শনিক হিউম বহুকাল পূর্বে বলে গেছেন—ধর্ম-চিন্তার উৎপত্তি হয়েছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারগুলি থেকে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় ভাবনা থেকে—"from the incessant hopes and fears which actuate the human mind." এই যে 'মহৎ ভয়ং উদ্যতং বজ্রং' যার কথা উপনিষদ্ দার্শনিক ভাষায় বলেছেন—ভয়াদ স্যাৎ অগ্নিঃ তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ—সেই ভয়কেই আদিম বর্বর দেখেছে মৃত্যুর মধ্যে, জীবনের আধি-ব্যাধি অনর্থের মধ্যে। আপদ থেকে আপদ-শান্তির কথাও মনে জাগে। বিঘ্ন আপদ বয়ে আনেন অপদেবতার দল, আর দেবতারা সে-ই আপদের শান্তি করেন। আদিম জাতির এই সব বিশ্বাস আধুনিক ধর্মগুলির মধ্যে অল্প-বিস্তর এখনও প্রচলিত আছে। আসলে সর্ব-যুগের সর্ব-মানবের ধর্ম-চেতনার মূলে রয়েছে—মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রান্ত কোন অমর

শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের পরম আগ্রহ ও ব্যঞ্জনা। একেশ্বরবাদীর কাছে ঈশ্বর এক হলেও শয়তানকে দেখা যায় সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে অপদেবতার মনস্তুষ্টি, আর যাগ-যজ্ঞ করে দেবতার আরাধনা—মূলত আদিম ধর্মেরই অনুরূপ।

ধর্মের ক্রম-বিকাশ সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরই একটি অধ্যায়। জগতের কোন ধর্ম বা সংস্কৃতি আদিকাল ধরে চলে এসেছে, এমন মনে করবার কারণ নেই। আমরা দেখেছি, আদি-ধর্মের ভিত্তি যে সুধু দেব-শক্তির (divinity) উপর প্রতিষ্ঠিত, তা নয়—ওর মূলে আসুরিক শক্তির কল্পনাও ছিল। কিন্তু এইটুকু বললেই আদি-ধর্মের সব কথা বলা হল না। আদি-ধর্ম কতগুলি প্রথার সমষ্টি—ব্যাজহট যাকে বলেন প্রথার চাড়ি (cakes of custom)। প্রথার চাড়িটিকে ভেদ করে ধর্মকে খুঁজে বের করা একটি কঠিন ব্যাপার। দাক্ষিণাত্যের টোডা নামে আদিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ রিভার্স বলেছেন, দেব-দেবী বলতে তাদের কিছু নেই। গোয়াল-ঘরে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ক্রিয়া-কলাপই তাদের ধর্ম। মহিষকে তারা পবিত্র জীব মনে করে বটে, কিন্তু পূজা করে না। মহিষের দুগ্ধ পান তাদের নিষিদ্ধ। দুধ থেকে তারা দই মাখন তৈরি করে। দধি-মাখম প্রস্তুত কালে তাদের কতগুলি বিধি নিষেধ পালন করে চলতে হয়, সেই সব আচার পদ্ধতিই তাদের ধর্ম। দেব-পূজা নেই—তা ধর্ম হল কেমন করে', এ প্রশ্নের জবাব তারা দিতে পারবে না। কিন্তু সভ্যতা-গর্বী মানবের উন্নত ধর্মগুলি কি আজও প্রথার আবরণে চাপা পড়ে নেই? প্রথা-মত ধর্মের অনুষ্ঠান দিনের পর দিন রীতিমত করে যান, এমন অনেক লোক দেখা যায়। কিন্তু তাদের দেখে ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ারের একজন নায়ক বলেছিলেন—সারা-জীবন গদ্যে কথা বলেও গদ্য কি তা তিনি জানেন না। সভ্য জগতের অনেকেই তেমনি সারা-জীবনের ধর্মানুষ্ঠান করেও ধর্ম কি বস্তু, তা হয় ত আজও জানতে পারেন নি। ফল কথা, প্রথাকে ধর্মানুষ্ঠান বলে চালিয়ে দেওয়া সম্পর্কে ফ্রেজারের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "The history of religion is a long attempt to reconcile old custom with new reason to find sound theory for absurd practices.—' অর্থাৎ, পুরাণো প্রথাকে নূতন বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, আর অদ্ভুত আচারসমূহ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা, দীর্ঘকালের এই দুটি প্রচেষ্টাকেই ধর্মের ইতিহাসে প্রতিফলিত দেখা যায়।

ধর্মের সঙ্গে নীতির (moralitiy) কথা আপনা থেকেই ওঠে—কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক বিচার করে থাকে দর্শনশাস্ত্র, আর দর্শনের জন্ম খুব বেশি দিন আগে হয় নি। দর্শন-তত্ত্বের আবির্ভাবের পূর্বে কেউ কখনো নীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখে নি। নীতি শব্দের অর্থ হচ্ছে, ঐতিহ্য ও প্রথার নির্দেশ মত কতগুলি 'পথের নিয়ম' মেনে চলা। অর্থাৎ কি না সমাজের ভেতর সংঘবদ্ধ-ভাবে জীবন-যাপন করতে হলে কতগুলি সামাজিক অনুশাসন বিধিনিষেধ মেনে চলতে আমরা বাধ্য। সমাজ-বিরুদ্ধ অনেক কাজকে আমরা নীতি-বিগর্হিত বলে থাকি। আধুনিক রাষ্ট্রে অনেক ক্ষেত্রেই এই সব দুর্নীতির জন্য আইন করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। দণ্ডের ভয়ে নীতি-পথ অনুসরণ করা নীতি-ধর্মের আচরণ—এমন কথা নীতিশাস্ত্র (ethics) কখনো বলবে না। কিন্তু আমরা এখানে চিন্তা ও কর্ম-জগতে নীতির আধ্যাত্মিক মূল্য বা রূপের কল্পনা করছি না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আইনের শাসন ধর্মের শাসন নয়, রাষ্ট্র বা সমাজের শাসন মাত্র। যে-সব বিধি-নিষেধ আমরা আজ আইনের সাহায্যে প্রবর্তন করে থাকি, আদি-কালের মানুষকে সেই সব সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য করতো, আইন নয়—প্রথা। প্রথামত কাজই ছিল ধর্ম—ধর্ম-কর্মের সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল বাহ্যিক, অন্তরের সঙ্গে যোগ সামান্যই ছিল। প্রথাকে ধর্ম থেকে, আর নীতিকে প্রথা থেকে আলাদা করে দেখতে ও বিচার করতে মানুষের যে কত দীর্ঘকাল নিয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি, এক শ বছর আগেও সভ্য আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে দাস-প্রথা দুর্নীতি বলে গণ্য হয় নি, নিগ্রো দাসদের হাটে-বাজারে পশুর মতোই বেচা-কেনা করা হত। আমাদের দেশের সতী-দাহ ও কৌলিন্য প্রথাকেও আজ আমরা দুর্নীতিমূলক বলে মনে করে থাকি। কিন্তু এ সবই ছিল সমাজ-সম্মত প্রথা, এর ভেতর কোন দুর্নীতিই জনসাধারণের

চোখে ধরা পড়ে নি। এ ত গেল সভ্য মানুষের কথা। সভ্য মানুষের আছে আত্ম-জিজ্ঞাসা, তত্ত্ব-বিচার, ভাল-মন্দর পরিপ্রশ্ন—যাকে বলা হয় বিবেক-ধর্ম। আমরা যে অর্থে 'বিবেক'-শব্দটি ব্যবহার করি, সেইরূপ আত্ম-জিজ্ঞাসার উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি-জ্ঞানের নির্দেশ আদি-যুগের মানুষ কখনো অনুভব করে নি। বিবেক সময় সময় চলিত প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তোলে, আর সে-জন্য বিবেকী-মানুষকে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে সমাজের হাতে—এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক দেখা যায়। অসভ্য আদিম সমাজে আজকের দিনেও তেমনধারা 'বিবেক' কারু মনে জেগে ওঠে না, যা দিয়ে কেউ কোন প্রথাকে বন্ধ করতে চেষ্টা করবে (Insert)। 'প্রথা ও নীতিধর্ম' প্রসঙ্গে আলোচনায় ওয়েষ্টারমার্ক বলেছেন, "আদিম সমাজের কোন লোকেরই ব্যক্তিগত বিবেক থাকবে না, এই হল বিধান (No man must have personal conscience)। ভাল মন্দ সকল কাজেই তারা সমাজকে অনুসরণ করে। চিন্তাও করে তারা যুথবদ্ধভাবে (They think in heards)।" এখনও আমরা আসামে নাগা-পাহাড়ের আদিবাসীদের মাথা-শিকার অভিযানের কথা সংবাদপত্রে পড়ে থাকি। এই সব লোকদের দুর্নীতি-পরায়ণ, অবিবেকী বলে বর্ণনা করলে ঠিক কথাটি বলা হয় না। তাদের যে ভাল-মন্দর জ্ঞান নেই, তা নয়। আসল কথা, তাদের ভাল-মন্দর বিচার সভ্য-মানবের নীতি-সম্মত বিচার থেকে স্বতন্ত্র। তাদের বহির্মুখী অন্তর ভাল-মন্দর বিচার করে প্রথা ধরে'—প্রথা-সম্মত কাজ ভাল, প্রথাবিরুদ্ধ কাজ মন্দ। যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, এমন কাজ কেন করলে ? অমনি তার জবাব হবে—বাঃ, ও যে একটা প্রথা। প্রথা-পালনই তার কাছে সুনীতি, প্রথাকে অবজ্ঞা করা দুর্নীতি। ধর্ম অধর্মও তাই। সভ্য মানবের ধর্ম-শাস্ত্রেও এমন অনেক বিধান আছে যার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই, অথচ সেই বিধান-গুলিকে না মানা শুধু অধর্ম নয়, বিধি-ভঙ্গ-কারীদের অনেক-ক্ষেত্রে দুর্নীতি-পরায়ণ বলা হয়ে থাকে।

ভাষা ও ধর্মের সঙ্গে আর যে একটি বিষয় আদি-সংস্কৃতিকে বিবর্তনের মার্গে ধাপের পর ধাপ তুলে নিয়ে চলেছিল, তা হচ্ছে—শিল্প। অতি-প্রাচীন কালে—হয়ত বা বিশ হাজার বছর আগে—উচ্চ-প্রস্তর যুগের অরিগনেসিয়ান মানবেরা ফ্রান্সের পর্বত-গুহায় যে-সব চিত্র অঙ্কিত করেছে গুহার গাত্রে, সেগুলি এখনও তাদের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দেয়। দু একটি স্ত্রী-মূর্তি ছাড়া বাকি সবই হরিণ, লোমযুক্ত গণ্ডার, অতিকায় হস্তী (mammoth) প্রভৃতি জন্তু—যে সব জন্তু তারা শিকার করতো বা ফাঁদ পেতে বধ করতো ভক্ষণ করবার জন্য। উচ্চ প্রস্তর-যুগের শিল্প-শৈলীর নিপুণতা যথার্থই আশ্চর্য রকমের। এমনই চমৎকার এই যুগের শিল্প যে পরবর্তী নব-প্রস্তর যুগের উন্নত সভ্যতার কালেও চিত্র-শিল্পীরা ঠিক এ রকমের শক্তির বা কলা-চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে নি। উচ্চ প্রস্তর-যুগের ছবিগুলিতে দেখা যায়—জন্তুর সজীব সাবলীল ভঙ্গিগুলিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে' আঁকা হয়েছে সেই সব ছবি, প্রত্যেকটি অঙ্গের রূপকে আলাদা করে' নিখুঁত-ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় নি। উত্তর কালের মানুষ উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল। মৃণ্ময় পাত্র তৈরি করে' তার উপর নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করতো, হাতীর দাঁতে খোদাই করতো কারু-শিল্প—গৃহ নির্মাণ ও ধাতুর ব্যবহারও শিখেছিল তারা। এমন জাতির চিত্র-শিল্প কিরূপে নিম্নস্তরে নেমে এসেছিল, তা সত্যই বিস্ময়েব ব্যাপার। চিত্র-অঙ্কনে দক্ষতা যে ছিল না তাদের, তা নয়। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ছিল বিষয়টির অঙ্গের বা অংশের খণ্ড-রূপের দিকে, তাই তারা সমগ্রের সচল প্রাণবন্ত রূপকে এক রকম হারিয়েই ফেলেছিল।

উত্তর কালে চিত্র-শিল্পের এই যে অবনতি ঘটেছিল, তার একটি গূঢ় কারণও হয়ত আছে। যে-কারণে চিত্র-শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, সেই তত্ত্ব বিচারই এখানে করা যাক, যেহেতু ও-রকম তত্ত্ব-বিচার যে সুধু প্রাচীন কলা-পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করবে তা নয়—ওতে মানব-জীবনের সঙ্গে শিল্পের জীবন-তত্ত্বগত (biological) সম্বন্ধেরও বিচার করা হবে। অনেকেই মনে করে থাকেন শিল্পের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই, সুতরাং জীবন-তত্ত্বের বিচারে শিল্পকে শক্তির অপচয় বলেই ধরতে হয়। কিন্তু কাজটা অকেজো হলেও সেই অকেজো কাজকেই খাটানো চলে জীবন-তত্ত্বের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, আধুনিক জগতে এ-রকম দৃষ্টান্ত উঠতে বসতে পাওয়া যায়। মাঠে

ফুট-বল খেলা দেখা দর্শকের জীবনতাত্ত্বিক প্রয়োজন কতখানি মেটাতে পারে তা বলতে পারি না, কিন্তু এতে যে কনট্রাক্‌টারের ব্যবসা জেঁকে ওঠে তাতে সন্দেহ নেই। নাটক-নভেলের লেখকেরাও যে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবার জন্যই লিখে থাকেন তা বলা যায় না। অর্থাগম ও যশের প্রত্যাশাও তাদের থাকে।

সৃষ্টির আগ্রহ মানুষের শিল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ক্রীড়াচ্ছলে জীব-জন্তু বা মানুষের রেখাচিত্র বা রঙিন ছবি এঁকেছে সে—সেই সব বস্তুর ছবি এঁকেছে, যেগুলির সঙ্গে তার নিজের পরিচয় গভীর ও অন্তরঙ্গ। তার মনের ভিতরকার অনুকরণবৃত্তি চরিতার্থ করেছে, তার মনের উচ্ছ্বাসকে মুক্ত করে বাইরে রূপ দান করেছে। সৌন্দর্য-প্রীতি মানুষের অন্তর্নিহিত, সেই সৌন্দর্য-প্রীতিই তাকে শিল্পী করে তুলেছে। শিল্পের উদ্ভব এই সব ও অন্যান্য কারণ থেকে। এই প্রসঙ্গে আরও কতগুলি বিষয় মনে রাখা উচিত। যতদূর আমরা জানতে পেরেছি তাতে বেশ মনে হয়, আদি-মানব ছিল ঘোর সমাজী মানুষ, সমাজের বাইরে তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না। যে-কাজই সে করেছে, তা করেছে সে সমাজের জন্য। অবশ্য আত্ম-প্রকাশের স্পৃহা কিছুটা জীব-জগতেও দেখা যায়, যেমন ময়ূরের প্যাখোম মেলা—কিন্তু তা হচ্ছে ময়ূরীকে আকর্ষণ করবার জন্য শোভা-প্রদর্শন (display) এবং তার একটা জীবন-তাত্ত্বিক মূল্যও আছে। আদি-শিল্পীর মনেও তেমনই কোন ইচ্ছা—যেমন সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির চেয়ে নিজেকে অধিকতর গুণী বলে' প্রতিপন্ন করা, এরূপ কামনা হয়ত নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয়, শিল্প-চর্চা করেছে সে সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে। চিত্রগুলির মধ্যে শিকারে পশু-হনন কার্যটি এমন করেই দেখানো হয়েছে যা দেখে স্বতই মনে হয়—পশু-বধ কার্যের হুবহু অনুকরণ করে' ছবি আঁকলে শিকারে পশু সহজে মারা পড়বে। শিকার ছিল তখন একটি সামাজিক ব্যাপার। সকলে মিলে শিকার করতো, পশু-বধ করে সকলে মিলে ভক্ষণ করতো। যে-সব পশু তারা বধ করতো, সেগুলিরই ছবি আঁকতো তারা। এই সব বিবেচনা করে মনে হয়, চিত্রাঙ্কন ছিল তখন ধর্মানুষ্ঠানের মতই একটি সামাজিক ব্যাপার। এটা খুবই সম্ভব যে শিকারে বেরুবার পূর্বে শিল্পী ছবি আঁকতো জীবজন্তুর বা শিকারের—যেহেতু প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি শুভ ফলপ্রসূ, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মই এই যে, প্রথমে অনুষ্ঠানগুলি খুবই যত্ন ও দক্ষতা সহকারে সুসম্পন্ন করা হয়, কিন্তু পরে দেখা যায় সে-সব কার্য সুধু কতগুলি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তখন আর অনুষ্ঠানগুলিতে কোন জীবনের লক্ষণ থাকে না, আভাসে ইঙ্গিতে সংক্ষেপেই কর্ম শেষ করা হয়। আদি-শিল্পের বেলাও ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছিল। শিল্পের লক্ষ্য শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, বাইরের জগত তার মনে যে ছাপ অঙ্কিত করেছে তার অভিব্যক্তিও নয়—লক্ষ্য ছিল সুধু জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে সমাজের হিতসাধন। তাই, শিল্পের আদি-যুগে শিল্পী যেমন অন্তরের সূক্ষ্মানুভূতি দিয়ে তার চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতো সমাজ-সেবার জন্য, পরবর্তী কালের শিল্প তেমনি জীবনী-শক্তিকে হারিয়ে বসলো, শিল্প তখন সুধু প্রথামত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল বলে'।

শিল্পের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া গেল তাতে একটি বিষয় বোঝা যায়—শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল ধর্মের সহচররূপে। আর, শিল্প ও ধর্ম উভয়েরই উৎপত্তি হয়েছিল জীবন-তত্ত্বের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ব্যক্তির ও সমাজের জীবন-রক্ষার জন্য। ভারতে শিল্প ধর্মকেই আশ্রয় করে বর্ধিত হয়েছিল। গ্রীসেও অনেকটা তাই। এই জন্য সংস্কৃতির ইতিহাসকে এক হিসাবে ধর্মেরই ইতিহাস বলা চলে। সংস্কৃতির উৎপত্তি একই স্থানে হয়েছিল, আর সেখান থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, এরূপ মনে করবার কারণ নেই। বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে, কিন্তু এই ভিন্ন রূপ সত্ত্বেও দেখা গেছে, বিভিন্ন জাতির চিন্তা একই পথ ধরে' একই লক্ষ্যে গিয়ে পৌচেছে। সভ্য মানব ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেও অনেক সময় স্বতন্ত্র-ভাবে একই পদার্থ আবিষ্কার করে বসেছে। ইউরেনাস নামে গ্রহটি দুই দেশের দুইজন জ্যোতির্বিদ যুগপৎ আবিষ্কার করেছিলেন। মুদ্রাঙ্কন চীনদেশে ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, বলা হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মিশর, গ্রীস ও ইতালির স্থাপত্যে খিলানের কাজ (arch) ও ছত্র (dome) একই পদ্ধতির অনুসরণ করেছে। সেই পদ্ধতিই আবার স্থান পেয়েছে সুদূর মধ্য

আমেরিকায় যুকাটানদের শিল্পচর্চার মধ্যে। এতে বেশ বোঝা যায়, খিলান ও ছত্রের কাজ বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র-ভাবেই দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বেলায়ও সেই একই কথা বলা যেতে পারে। ওই প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সনে Freeman যা বলে গেছেন,তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Political institutions constantly appear very far from one another, simply because the circumstances which called far them have arisen in times and places very far from one another."

প্রাচীনকালে দেশভেদে ভাষা-ধর্ম-শিল্পকে আশ্রয় করে' বিভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এই সব সংস্কৃতি ছিল এক একটি বিশিষ্ট সমাজের (society) অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান—এ-সব সমাজেরই চিন্তা-ধারার অনুসরণ করে রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে জন্য সভ্যতা বা সংস্কৃতির আলোচনা করতে হলে, এই সমাজ-গুলির জীবন-যাত্রা প্রণালীর সন্ধান করতে হয়, চিন্তা ও ভাবের গুপ্ত মণিকোঠায় প্রবেশও করতে হয়। আধুনিক সভ্য জগতের সকল সংস্কৃতিই কোন-না-কোন প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই সব সংস্কৃতির উদ্ভব ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তিনটি কার্যের ফলে। কাজ তিনটি হল—প্রথমত ঐতিহ্যের অনুসরণ, দ্বিতীয়ত অন্যের সংস্কৃতিকে গ্রহণ ও পরিপাক এবং তৃতীয়ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। পূর্বপুরুষের বিষয় সম্পত্তির মত ঐতিহ্যও (tradition) জাতির নিজস্ব সম্পদ। ঐতিহ্য বহন করে আনে জাতির কৃতিত্বের স্মৃতি। ঐতিহ্যই জাতিকে অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু কেবল পূর্বপুরুষের ক্রিয়া-কর্মের অনুসরণ করেই কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। পরিবর্তনশীল জগতে ঐতিহ্যেরও পরিবর্তন আবশ্যক। অনুন্নত জাতির ঐতিহ্যের কোন পরিবর্তন হয়ত দেখা যায় না। তখন তার ঐতিহ্যই হয়ে ওঠে কুসংস্কার। এমন কোন উন্নত জাতি জগতে নেই, যে জাতির সংস্কৃতি ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনের ফলে পুষ্টিলাভ করে নি। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য নৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমাজের রূপান্তর ঘটে থাকে। তখন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে প্রাচীন অব্যবহার্য রীতি-নীতিগুলিকে আঁকড়ে ধরার কোন অর্থই থাকে না। অনেক সময় অন্যের সংস্কৃতিকে গ্রহণ ও পরিপাক করতে হয়—যাকে বলা হয়ে থাকে, acculturation. এ ছাড়া যে তৃতীয় পন্থা—আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কথা বলা হয়েছে, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর তার প্রভাব এত অধিক যে সেগুলির একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গেলে মানব জাতির ইতিহাসেরই বর্ণনা দেওয়া হয়।

অহং

শান্তশীল দাশ

দেবতার পূজা করিনা তো আমি
পূজা করি মোর অহমিকার,
মন্দির মাঝে রচেছি আসন
মোর লাগি, নহে সে দেবতার।
মহা গৌরবে ধূপ দীপ জ্বালি
নানা উপচারে ভরে নিয়ে থালি,
সুর ঝংকারে যে-মন্ত্র রচি
সে নহে দেবতা আরাধনার।

দেবালয় মাঝে কণক প্রদীপে
উজল আলোর শত শিখা,
নহে সে দেবতা আরতির লাগি
ঘোষিছে সে মোর অহমিকা।
আমি আছি এই ধ্বনি বারে বারে
জানাই সরবে দেবতার দ্বারে,
স্রষ্টা সে যদি চির-ভাস্বর,
সৃষ্টি নহে তো তুচ্ছ তার।

এপার-ওপার

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

বহুদিন পরে ডালিমডাঙ্গায় এসেছি। এই গ্রামে আমার মামার বাড়ী। বৃদ্ধ মামাবাবু কতবার দেখতে চেয়েছিলেন। পাড়াগেঁয়ে মানুষ শহরে হলে যা হয়—সৌখিন জীবনের মোহ একেবারে পেয়ে বসে। তাই আসি আসি ক'রেও শেষ পর্যন্ত আসা হয়ে ওঠেনি। মামাবাবু সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর বিষয় সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। আর অজুহাত চলেনা—মামীমার আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে।

ডালিমডাঙ্গা আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র তিন ক্রোশ পথ। ছেলেবেলায় যখন তখন এসে পাঁচ সাত দিন থেকে গিয়েছি। পূজা-পার্বণে সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রণে আসা তো ছিলই। ব্রহ্মাণীতলায় কয়েকবার বন-ভোজনের আয়োজন হয়েছিল। অনেক সময় দলবেঁধে জগা পাগলার আখড়ায় গান শুনতে আসতাম। চমৎকার গান করত সে। চিরঞ্জীব শর্মার চিরপরিচিত বাউলটি আজও আমার কানে বাজছে :—

"প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥"

ডালিমডাঙ্গার সকলকে আমি জানতাম, আমাকেও চিনত সকলে। তখন পাঁচখানা গ্রাম নিয়েই তো ছিল আমাদের জগৎ। বড় বড় শহরের সংগে পরিচয় হ'ত ভূগোলের পাতায়। লোকে তীর্থ করতে যেত কাশী গয়া বৃন্দাবনে। তাছাড়া শহরের দিকে কেউ ঘেঁষতনা, বরং একটু ভয় করত। বিদেশ বিভুঁই—চোর ডাকাত জালিয়াতের আড্ডা—কখন কি হয় বলা যায়না—তফাতে থাকাই ভালো। ঠিক এই রকম ছিল লোকের ধারণা।

ডালিমডাঙ্গার প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে ছিল আমার প্রাণের যোগাযোগ। আমের মুকুলের গন্ধে ভরা ভোরের বনপথ, বিপুলদেহ তেঁতুলগাছে দুপুরবেলায় কাঠবিড়ালীর অক্লান্ত ছুটাছুটি, নিঝুম রাতে থেকে থেকে কাঠঠোকরার ঠক ঠক আওয়াজ, ঈষৎ সবুজ শজনে-ডালে শুভ্র ফুলের শোভা, পদ্মদীঘির জলের ধারে পান-কৌড়ির ভিড়, কোকিল-ডাকা ফাগুন-দিনে মনের মাতামাতি—শৈশবের সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। সে সব ঠিকই রয়েছে, অথচ মনে হয় তেমন যেন নেই। পৃথিবীর রসগ্রহণের ক্ষমতা সব সময়ে সমান থাকেনা। বয়সের সংগে সংগে অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব কমে যায়—মানব জীবনের এইটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ। সুর আছে, ঝংকার নেই; ভাব আছে, আবেগ নেই; 'ঘরের কোণের ভরা পাত্র' আছে, 'ঝরণাতলার উছল পাত্র' নেই।

ডালিমডাঙ্গায় কত অপরিচিত মুখ, কত নতুন বাড়ী! গ্রামের উপকণ্ঠে পাকিস্থানীরা গড়ে তুলেছে একটা নতুন পাড়া। অভাবনীয় অত্যাচার সহ্য করেছে এরা নিজ বাসভূমে, তাই অচিন দেশে এসেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। এখানে তো মৃত্যুর আতঙ্ক নেই। পাকিস্থান-পাড়ার পর্ণকুটিরে ফুটে উঠেছে লক্ষ্মীশ্রী। কেউ বুনেছে পালংশাক, কেউ বুনেছে বিলাতী বেগুন; কারও উঠানে লঙ্কা, কারও চালে কুমড়ো; কোথাও মূলো, কোথাও কপি। এই সব উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে এরা শুধু উপার্জনই করছেনা, নিজেদের উপলব্ধিও করছে। দেখে সত্যিই আনন্দ হয়।

ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়েই বিশ্বদেবতার লীলা চলেছে। পরিবর্তন সৃষ্টির নিয়ম। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু ডালিমডাঙ্গার দুজন পুরোনো অধিবাসীর জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তা দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। আজ তাঁদের কথাই বলব।

জমিদার ললিতমাধব চাটুজ্যে যৌবনে ছিলেন রূপের পূজারী, রসের সহচর। ভোগ-বিলাসই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—অভাব কাকে বলে জানতেন না। দুহাতে টাকা খরচ করতেন খেয়ালের বশে। পরতেন সৌখিন পোষাক, মাখতেন

সুগন্ধী তেল, ক্রিম পাউডার সাবান স্নো কোন কিছুই বাদ যেত না। লোকে বলত, ললিত মাধবের আবির্ভাবে আবহাওয়া আমোদিত হয়। আভিজাত্যের অন্যান্য লক্ষণও ছিল—সংগীতে অনুরাগ, শিকারের শখ এবং দেশ-ভ্রমণের নেশা। গান বাজনার বৈঠক ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। মাঝে মাঝে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতেন কলকাতায়। কি একটা উৎসব উপলক্ষে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে দুদিনের জন্য গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন। চারিদিকের গ্রাম থেকে লোক ভেঙে পড়েছিল তাঁর বাড়ীতে। শিকারে বেরিয়ে সাধারণতঃ হরিয়াল মেরে আনতেন। একবার একটা বাঘের অত্যাচার থেকে দশখানা গ্রামের লোককে রক্ষা ক'রে যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয়। যখন বিদেশ ঘুরে দেশে ফিরতেন তখন সংগে আনতেন নানা রকমের জিনিস। এইভাবে চাটুজ্যে-ভবন হয়ে উঠেছিল দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের যাদুঘর। জেলা কর্তৃপক্ষের সংগে ললিতমাধবের মেলামেশা ছিল। তাঁদের আদর-আপ্যায়নে যত্নের ত্রুটি ছিল না। দরাজ হাত। যেবার রায় সাহেব হলেন সেবার দেশ সুদ্ধ লোককে কলকাতার কড়া-পাকের সন্দেশ খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে ললিতমাধবের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী ক'রে তুলবার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক নেতৃত্ব এসে পড়ল তাঁর হাতে। বিয়াল্লিশের বিদ্রোহে অন্যতম অধিনায়ক হিসাবে তিনি বন্দী হলেন। তারপর ললিতমাধবের আর কোন খবর জানতামনা। ডালিমডাঙ্গায় আসার পর শুনলাম—ললিত মাধব হয়েছেন সংসার বিরাগী—কারামুক্তির পর এসেছে জীবন-মুক্তি।

ললিতমাধবকে দেখবার জন্য ঔৎসুক্য হল। একদিন সকালে মামীমার পাথর বাটিতে তৈরী বিশুদ্ধ চা খেয়ে মাঝের পাড়ায় গেলাম। মাঝের পাড়ায় তাঁর বিরাট বাড়ীটা বিধবার বেশ ধারণ করেছে। ঐশ্বর্যের অহংকার নেই, বিলাসের বন্যা শুকিয়ে গিয়েছে, মত্ততার উল্লাস শোনা যায় না। চাটুজ্যে মশাই অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে এসেছেন পরিবারের সংগে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে। প্রমোদশালা ভেঙে ফেলে তিনি গড়েছেন আশ্রম। সেইখানেই চলে আহার নিদ্রা—ধ্যান ধারণা—ধর্মশাস্ত্র পাঠ। নূতন বাস-গৃহের আশে পাশে দুচারটি ফুলের গাছ। অসংখ্য গাঁদা ফুটে চারিদিক আলো ক'রে রেখেছে। চাটুজ্যে মশাই কারও সেবা গ্রহণ করেন না—সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল। পক্ব কেশ ও গৈরিক বসন তাঁর দিব্য কান্তিকে দান করেছে অপূর্ব গৌরব। চাটুজ্যে মশায়ের পরিবর্তন দেখে সত্যিই অবাক্ লাগল। আমার জন্য একখানা কম্বলের আসন পেতে দিয়ে চাটুজ্যে মশাই বললেন—অনেক দিন বাদে দেখছি, একদম বদলে গিয়েছ, চেনাই শক্ত।

আমি বললাম—আপনাকে চেনা আরও শক্ত। আপনি শেষে—

—এমনিই হয় হে, এমনিই হয়। মানুষের জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন সব ওলট পালট হয়ে যায়, বুদ্ধি বিবেচনা যায় উড়ে, ঘর সংসার যায় ভেসে। ব্যাপারটা বলি শোন। জেল থেকে তো বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম একবার পণ্ডিচেরি ঘুরে আসি। শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিচ্ছেন। সারা ভারতে সাড়া পড়ে গিয়েছে। কত বড় মহাপুরুষ! ছিলেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, হলেন ঘোর তপস্বী। পণ্ডিচেরিতে নতুন আলো দেখতে পেলাম। মনে হল সংসার অনিত্য—সব মায়া, সব মোহ, সব ভ্রান্তি। সেই থেকে পরমার্থের সন্ধানী হয়েছি। ভালো কথা, তুমি শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্য-জীবন' পড়েছ?

—পড়েছি। বড় শক্ত বই। অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতির চর্চা করি, অধ্যাত্ম দর্শন ভালো বুঝিনে।

—তোমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আমার নেই। তবে এককালে অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি নিয়ে একটু নাড়া চাড়া করেছিলাম। ওসব ভুয়ো হে, সব ভুয়ো। চোখের সামনে দুটো দুটো মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। মানুষের শান্তি কোথায়? অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিদ্যার দৌড় বোঝা গিয়েছে। গুচ্ছের ঘোরা চলা পরিকল্পনা আর সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। আজীবন অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করেছি। এ যুগের এত বড় বিজ্ঞান দুটোকে চাটুজ্যে মশাই যে ভাবে উড়িয়ে দিলেন তাতে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হল। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললাম—সে তো ঠিক কথা। তবে কিনা—

—'তবে'র প্রশ্ন নেই। শ্রীঅরবিন্দই পরিত্রাণের একমাত্র পথ দেখিয়েছেন। আচ্ছা, তুমি বিবাহ করেছ?

—আজ্ঞে না।

—বেশ করেছ। সংসার মানেই ঝামেলা। তোমার যখন কোন বন্ধনই নেই তখন তুমি অনায়াসে অতি-মানসের তীর্থ যাত্রায় আমার সঙ্গী হতে পার।

আমি হঠাৎ 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু বললাম—আজ উঠি, আর একদিন আসব।

বেলা অনেকখানি গড়িয়েছে। চাষীরা মাঠে, ছেলে-মেয়েরা পাঠশালায়, গৃহিণীরা ঘরকন্নায় ব্যস্ত। মদনমোহনের মন্দিরের চত্বরে হনুমানের হাট বসেছে। রৌদ্র-ছোঁয়া আকন্দ গাছে ফিকে বেগুনী রঙের আভা ফুটে বেরুচ্ছে। ভাবি, সংসারে সবই সম্ভব। যে ললিতমাধব আবাল্য বিলাসের ললিত ক্রোড়ে বিলীন ছিলেন তিনি হয়েছেন একাহারী ব্রহ্মচারী, বাসনা-বিমুক্ত ত্যাগী পুরুষ।

"এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।"

বনমালী বিশ্বাস বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই বিপত্নীক হন। তখন তাঁর বয়স সাতাশ কি আটাশ। আমি সে সময়ে ডালিমডাঙ্গায় ছিলাম। প্রতিবেশীরা সহানুভূতির সুরে বললে—"আহা, বেচারীর কী দুর্ভাগ্য! অমন সুন্দর বৌটি অকালে মারা গেল। ও কি আর এখন সংসারে টিকতে পারবে!" সত্যিই বনমালী আর ঘরে থাকতে পারলেন না—গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন। তার পর অনেকদিন তাঁর খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। কেউ বলত—বনমালী কাশীবাসী হয়েছেন, কেউ বলত—তিনি হরিদ্বারে এক আশ্রমে আছেন। একজন গ্রামবাসী বললেন, তাঁকে গয়ায় কোন্ মঠে দেখে এসেছেন। এক প্রৌঢ়া মহিলা বৃন্দাবনে গিয়ে ছিলেন—তিনি ফিরে এসে বললেন, বস্ত্রহরণের ঘাটে বনমালীর সংগে দেখা হয়েছিল।

আট বছর পরের কথা। কলকাতার বাসায় আমাদের শ্যামপুকুরের হলধর মিত্তির এসে হাজির। তাঁর শ্বশুর বাড়ী ডালিমডাঙ্গায়। তিনি বললেন—"মজার খবর আছে। ডালিমডাঙ্গার বনমালী বিশ্বাস দেশে ফিরেছে। সংগে দ্বিতীয় পক্ষকে দেখে গ্রামের লোক অবাক্ হয়ে গিয়েছে।" বনমালী বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার কাছে এই ছিল শেষ সংবাদ। ডালিমডাঙ্গায় আসার পর একদিন কথা-প্রসঙ্গে মামীমা বললেন—"বনমালী বিশ্বেস এখন পাকা গেরস্ত। নতুন বাড়ী হয়েছে। পুকুর, বাগান, জমি জমা—কিছুরই অভাব নেই। মস্ত পরিবার। সংসারে কাজকর্ম লেগেই আছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ, আরও বেশী মামলা মকদ্দমা।" মামীমার কথা শুনে কৌতূহল চেপে রাখতে পারলামনা। বনমালীর নতুন রূপ দেখতেই হবে। বিকালে ছুটলাম তাঁর বাড়ীর দিকে হলধর মিত্তিরের সংগে।

দক্ষিণপাড়ার দৈন্যের মাঝে বনমালী বিশ্বাসের একতলা বাড়ীখানা ঝক ঝক করছে। দেখলে পরদেশী পথিকের চোখে প্রীতিকর বিস্ময় জাগে। ভিতরে বৃদ্ধ বনমালী নানা বয়সের পুত্রকন্যা পরিবৃত হয়ে পরমসুখে তামাক টানছেন। হাসি গল্পে জীবনের শেষবেলাটি রঙিন হয়ে উঠেছে। মিত্তির মশাই পরিচয় করিয়ে দিতেই একগাল হেসে বললেন—আর বলতে হবেনা, চিনতে পেরেছি। রায় মশায়ের ভাগনে—ছেলেবেলায় হামেশা মামার বাড়ী আসাযাওয়া করত।

আমার দিকে ফিরে বললেন—এতকাল পরে বাবাজী কি মনে করে? মামার বিষয় আশয়ের ব্যবস্থা করতে এসেছ? করতে হবে বইকি। তা বাবাজী আজকাল এদিক্ মাড়াওনা কেন। আগেতো প্রায়ই আসতে যেতে। শ্যামপুকুর ও ডালিমডাঙ্গার মধ্যে দহরম মহরম তো খুবই ছিল।

বিনীতভাবে বললাম—কাজকর্মের নানা ঝঞ্ঝাট। শ্যাম-পুকুরেই আসা হয়ে ওঠেনা। এখন যাতায়াত করতে হবে। মামীমার দেখাশোনা করবার আর তো কেউ নেই।

—বেশ, বেশ। দেশ কখনও ছাড়তে নেই। বাবাজী বিয়ে করেছ কোথায়? ছেলেমেয়ে কটি?

—আমার ওসব ঝক্কি নেই। আমি বিয়ে করিনি।

—বিয়ে করনি! বল কি! বড় অন্যায় করেছ। তা সময় এখনও যায়নি। পুরুষ মানুষের বিয়ের কি আর বয়স আছে? মত কর তো আসছে ফাল্গুনেই লাগিয়ে

দিই। আমার ছোট শালীর একটি বয়স্থা মেয়ে আছে—দেখতেও ভালো কাজকর্মেও পটু।

আমি নীরবে বসে রইলাম। বিশ্বাস মশাই মিত্তির মশায়ের দিকে চেয়ে আবার বলতে সুরু করলেন—ও পাড়ার চাটুজ্যে মশাই—আমাদের জমিদারবাবু—শ্রীঅরবিন্দের পরম ভক্ত। তিনি বলেন, আমাদের দিব্য জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমরা কি ছাই ও সব বুঝি? উচ্চমার্গের মানুষ তো নই। খাঁটি কথা বলেছেন আমাদের রবি ঠাকুর ঃ—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

সাধারণ মানুষ আমরা। সংসার ধর্ম করব, পাঁচটা সামাজিক কাজে থাকব, দশজনের উপকারে লাগব। সুখদুঃখ, শোকতাপ, রাজনৈতিক দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী তো আছেই। এদের এড়িয়ে চলবার তো উপায় নেই। এরই মধ্যে হেসে খেলে দিন কাটিয়ে যেতে হবে। সবাই সন্ন্যাসী হলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে কি ক'রে? জীবলীলা তো সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছাতেই চলছে।

শেষে আমাকে বললেন—বুড়োর কথাগুলো একটু ভেবে দেখো বাবাজী। পার তো যাবার আগে মতামতটা জানিয়ে যেও।

আমি 'যে আজ্ঞে' ব'লে বিদায় নিলাম। বিশ্বাস মশায়ের পরিবর্তন অদ্ভুতই বটে।

বেলা পড়ো-পড়ো। পুকুর ঘাটে মেয়েদের পার্লামেন্ট ভেঙেছে। আকাশের গায় ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা রঙ। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ঘরে ফিরছে গরুর পাল। পলাশ-ডাঙ্গার পথে ক্লান্ত গাড়ীর করুণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

দেশ কত বদলে গিয়েছে! ডালিমডাঙ্গার মতো নগণ্য গ্রামে 'দিব্য-জীবন-এর পাঠকও রয়েছে আবার রবীন্দ্র-কাব্যের তারিফ করবার লোকও রয়েছে। ভারত অমনি স্বাধীন হয়নি। স্বাধীনতা কি আর আকাশ থেকে পড়ে?

কাঁঠাল বাগানের মাথার উপর চাঁদ দেখা দেয়। ফুর-ফুরে হাওয়া বয়। ঝরা ফুলের সৌরভ ছোটে। কোথায় একটা কোকিল ডেকে ওঠে। প্রাণে লাগে উপন্যাসের রঙ। বিশ্বাস মশায়ের শালীর মেয়ের অজানা মুখ উঁকি মারে মনের নিভৃত-নিকুঞ্জে। ভাবি মেয়েটি নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে! মন্দ কি? বিয়ে ক'রে ফেলা যাক্। একঘেয়ে সংসার আর ভালো লাগেনা। অস্থায়ী জীবন—আজ আছি, কাল নেই। হাতে কাছে যা পাই তাই বেশ। পর্দার আড়ালে কি আছে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

ললিতমাধব ও বনমালীর ইতিহাস পাশাপাশি বিচার করে দেখি। ধীরে ধীরে মনের উপর দার্শনিকতার ছায়া পড়ে। জীবন-নদীর এক পারে আসক্তি, অপর পারে নির্বেদ; উভয়ের মধ্যে খেয়া চলাচল হচ্ছে; সন্ন্যাসী সংসার পাতছেন, আবার গৃহী হয়ে যাচ্ছেন যোগী। জ্যোতির্বিদ হয়তো এই পরিণতির খানিকটা পূর্বাভাষ দিতে পারেন, কিন্তু কেন এমন হয় এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেন না।

আমার ডালিমডাঙ্গায় আসা নিষ্ফল হয়নি। চাটুজ্যে মশায় ও বিশ্বাস মশায়ের সংগে সাক্ষাৎ করে অনেক শিক্ষা পেয়েছি। সেকালের নালন্দা থেকে একালের বিশ্বভারতী পর্যন্ত বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে। তাদের সকলকেই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি। কিন্তু জীবনের মতো এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর আছে কি?

গতি ও গন্তব্য

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

(২)

আধুনিকদের মুখে যে কথাটা শোনা যায়—তার নাম হচ্ছে—প্রগতি বা প্রকৃষ্ট গতি। অতএব নিকৃষ্ট গতির সম্ভাবনার কথা, তারাও স্বীকার করেন। প্রগতির সঙ্গে দুর্গতির আশঙ্কা থাকবেই। সভ্যতার গতি বেড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কোন দিকে?

বৈরাগী ঠাকুর আস্‌ছেন কি যাচ্ছেন, তা ঠিক্ বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, তাঁর কাছাও নেই, কোঁচাও নেই। এ কথা সত্যি যে আমরা সবাই চলেছি। কেউ অচল নই। আমাদের চলার মাদকতা পায়ে থাকে বটে, পথ-নির্দ্দেশ করে চোখ দুটি। কেউ যদি চোখ বুজে চলে—তাহলে তার পা-ভেঙে রাস্তায় পড়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশী। গন্তব্য ঠিক না থাকলে, পথের পরিচয় না-জানলে, চক্ষুষ্মানের পক্ষেও পথ চলার কোনো মানে হয় না। বৈরাগী ঠাকুরের মত সামনে এগোচ্ছি, না পিছনে হট্‌ছি, তাই বা কে জানে?

আর একটা মুস্‌কিলও আছে। সারারাত দাঁড় টেনে ভোরে দেখা গেল—নোঙর তোলা হয়নি। সুতরাং নৌকা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। দাঁড়-টানাটা হ'লো ব্যর্থ-পরিশ্রম। নোঙর না-তোলার ভুলকে মানতে হলো। তার খেসারৎ দিতে হলো—সারারাত বাহুবলের অপব্যবহারে।

জীব-জগতে সবাই গতানুগতিকতা ভালবাসে। শুধু বুদ্ধিজীবী মানুষ সে নীতির ব্যতিক্রম। সে চায়—তার বুদ্ধির লাগামহীন স্ফুর্তি! নিত্য নূতন আবিষ্কার ও উদ্‌ভাবনের অপরিমিত আনন্দ। খাল কাট্‌লে যে শুধু জল আসে না, কুমীরও আসে—সে কথা সে ভুলে যায়। বিপদ যে ছায়ার মতই সম্পদকে অনুসরণ করে—তা' সে দেখেও দেখ্‌তে চায় না। তার কারণ সম্পদের মাদকতা।

বৈ-পাখা চিরদিন একই ধরণের বাসা বেঁধে—শিল্পীমনের পরিচয় দেয়। রেশম-পোকার গুটীকা-নির্ম্মাণের একটানা বয়ন-চাতুর্য্য দেখলে অবাক হ'তে হয়। কিন্তু, তাদের কারুকার্য্যের ওস্তাদি চিরদিনই এক ও অপরিবর্ত্তিত। নিজের খাদ্য-সংগ্রহের চেষ্টায় মাকড়সা যে জাল বুনে বসে থাকে, তার কোনো রকমারি বুনানি কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু মানুষের খেয়ালের ও বুদ্ধি-কৌশলের অন্ত নেই। জলের মাছ ডাঙায় তুলবার জন্যে সে হরেক রকম যন্ত্র উদ্‌ভাবন করেছে। হোঁচ-কোঁচ বড়শী, পলো-দোয়াড় ঘুনসী, খেপ্‌লা-বেড় ভ্যাসাল্—আরো যে কত রকম তৈরি হচ্ছে ও হবে—তাই বা কে জানে?

অসভ্য বন্য-মানুষরা জীব-জানোয়ারের মাংস আহার করতো। স্বজাতি-মাংসও বাদ দিত না। সভ্যতার আলোকে ক্রমে তারা শান্ত ও সংযত হলো। কৃষি-উৎপাদনের উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করলো। হানাহানি ও রেষারেষির প্রবৃত্তিও অনেকটা দমিত থাকলো। দেখা গেল—নানা মতাবলম্বী অবতারদের আবির্ভাব। শৃঙ্খলিত সমাজে নীতি ও সদাচার প্রবর্ত্তিত হলো ভগবদ্-বিশ্বাসের ভিত্তিতে। মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও উদ্‌ভাবনী চেষ্টা এখানেও শান্ত বা ক্ষান্ত হলো না। আরম্ভ হলো যন্ত্রযুগের কসরৎ।

এক-জোড়া বলদকে জবাব দিয়ে, কলের লাঙল এসে হলেন হাজির। তার শক্তি গরু ঘোড়ার চেয়েও ঢের বেশী। ফসল-উৎপাদনের গতি বাড়লো। কিন্তু, বেচারা বলদ এখন যাবে কোথায়? মানুষের শক্তি-বুদ্ধির ওজুহাতে, আবার সে গণ্য হলো প্রগতি-পরায়ণদের খাদ্যরূপে। দ্রব্য-গুণের মাহাত্ম্যে মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ঘটলো পরিবর্ত্তন। সভ্যতাগর্ব্বী মানুষের মধ্যে আবার দেখা গেল বন্য-রুচির প্রভাব। আবার সেই রোখারুখি ও হানাহানি। বেধে গেল—চীন-জাপানের যুদ্ধ, ইটালী-আবিসিনিয়ার যুদ্ধ। জার্ম্মান অভিমন্যুকে বধ করবার জন্যে সাজলেন ইউরোপের সপ্তরথী। নির্ব্বিচার ধ্বংসের হুমকি নিয়ে এলো অ্যাটম্ বোমা! যন্ত্র-শিল্পের গতিবৃদ্ধির আড়ালে—এত বড় একটা ধ্বংসস্তূপ যে লুকিয়ে ছিল—তা' কি প্রগতি-মত্ত যন্ত্র-শিল্পীরা জানতেন? বোঝা গেল—যান্ত্রিক সভ্যতা সারারাত দাঁড় টেনেছে, কিন্তু নোঙর তোলে নি। তাই, ফিরে এলো—মার্জ্জিত রুচির বন্যযুগ!

কলিশনের ভয়ে রেল-লাইনের বাঁকে বাঁকে সিগন্যাল্ থাকে। পাখা না পড়লে গাড়ীকে থামতে হয়। সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ আছে। জাহাজগুলো চড়ায় বেধে বান্‌চাল হয় না। একাধিক রাস্তার সঙ্গমে, যথেচ্ছ চলমান গাড়ীগুলির গতি-নিয়ন্ত্রণ করে—লাল ও সবুজ আলো। গার্ডের সবুজ ফ্লাগ না দেখলে বা হুইসেল না শুনলে প্লাটফরম থেকে গাড়ী ছাড়ে না। ঠোকাঠুকির ভয়ে—যার যার বাঁয়ে—'কিপ্-টু-দি-লেফ্‌ট্'! একটা নীতি। এসব ব্যবস্থার মানেই হচ্ছে—গতিবৃদ্ধির সঙ্গে যে ধ্বংসের আশঙ্কা আছে, তাকে স্বীকার করা। তবু দুর্ঘটনার অন্ত নেই।

বস্তু-জগতে আমাদের গতিও যেমন বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে গতি-নিয়ন্ত্রণের বহুবিধ ব্যবস্থাও উদ্‌ভাবিত হচ্ছে। কিন্তু, মানুষের মনের গতি আজ কোন্ দিকে? এ যুগে সে পথে কি কোনো সিগ্‌ন্যাল আছে? আলোক-স্তম্ভ আছে? সে যুগে ছিল। মন্দির, মসজিদ্ ও গীর্জ্জাগুলি মানুষকে পথ দেখাতো। ধর্ম্মগুরুরা ভয় দেখাতেন। এখন তারা থাক্‌লেও নির্বীর্য্য ও নিষ্ক্রিয়। ভয় পাবার মত বোকা মানুষও সমাজে নেই। এখন মানুষের মনকে চাওয়া-পাওয়ার আনন্দে দোলাচ্ছে—সিনেমা আর রেঁস্তোরাঁ। কল্পনার ডানা মেলে মানব মনের যথেচ্ছ বিচরণ আজ অবাধ ও অসংযত। মনের পথে গার্ডও নেই, লাল সবুজ ফ্লাগও নেই। গন্তব্যও নেই ঠিক। যেখানে গিয়ে সে পড়ে—পড়ুক। মরে—মরুক।

এই তো হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের উচ্ছৃঙ্খল মনের গতি? আজ সে অসঙ্গত ভাবেই বেড়ে উঠেছে। তাদের ভাবরাজ্যে একটা বিরাট ধ্বংসের ইঙ্গিত পরিস্ফুটভাবে দেখা দিয়েছে।

জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে মানুষ অনেক কিছু পেয়েছে। আরও অনেক কিছু পাবার আশা করছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পৌঁছানোর চেষ্টাও হচ্ছে! শোনা যাচ্ছে—শীগ্‌গীরই মঙ্গল-গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনের চেষ্টাটা নাকি সফল হবে। তা হোক্। ইন্দ্রের ছিল বজ্র, আর বশিষ্ঠের ছিল মন্ত্রশক্তি। যেখানে সেখানে বজ্রাঘাতের ক্ষমতা ইন্দ্রের ছিল না। মনের শক্তিই তো মন্ত্রশক্তি। বর্ত্তমানযুগের সাফল্য নির্ভর করছে—কতিপয় অ্যাটম্ বোমা মালিকের মাথা খারাপ হওয়া, না হওয়ার উপর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এ দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ কোথায়? মানুষ কি চায়? কূপের ব্যাঙ যতই ফুলতে চেষ্টা করুক, হাতী হবার সম্ভাবনা কি তার আছে?

(৩)

মানুষের মনের গতি আজ কোন্ দিকে? সে চায় সুখী হতে। দুঃখকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা তার জন্মগত প্রবৃত্তি। সদ্যজাত শিশুও শীতাতপ সইতে নারাজ। হাতের 'চোষণ-কাঠি' কেড়ে নিলেই সে কাঁদে। সুখ ব'লে সে যাকে আঁকড়ে ধরলো—সে যদি দুঃখ দিয়ে সরে পড়ে—তা'হলে মানুষের ধরার ভুলকে তো অস্বীকার করা চলে না? অনেক দুষ্টু ছেলে মৌচাকে ঢিল মেরে তলায় ব'সে হাঁ ক'রে মধু খায়। শেষে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফেরে, হুলের খোঁচা খেয়ে। পরের মধু কেড়ে খাবো—হুলের জ্বালা সইব না। তা' কি হয়?

ফুটবল-খেলোয়াড় উৎকণ্ঠিতভাবে ওৎ পেতে আছেন—বলটিকে পাবার জন্যে। তবে, পাওয়া মাত্রই লাথি মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? অভাব পূরণ হলেও তো তিনি সুখী হ'তে পারছেন না? বলকে তিনি পেতেও চান্—হারাতেও চান্। বস্তু-জগৎ মানুষকে যা' কিছু দিয়েছে, আর যা কিছু দিতে পারে—তা সব পেলেও কি মানুষের চাহিদা মিটবে? নিশ্চয়ই না। ঘী দিয়ে কি আগুন নেবানো যায়? সে আরো দাউ দাউ ক'রে জ্বলে।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন সর্ব্বদাই চেষ্টা করছে—মানুষকে পশুর সমগোত্রীয় করে রাখ্‌তে। ওদের যত বাড়াবে, ততই বাড়বে। আহারের তাগিদ, নিদ্রার অলসতা, ভয়ের সঙ্কোচ, আর মৈথুনের লিপ্‌সা—মানুষকে বন-জঙ্গলের দিকেই টানে। ভুলিয়ে দেয় সমাজ-শৃঙ্খলা আর সুন্দরের উপাসনা প্রবৃত্তি।

"জুৎ না-জানে ঝুটা-ভাত—প্রীৎ না-মানে ছোটা জাত।
নিদ্ না-মানে মোরত্তা-খাট্—ভূখ্ না মানে বোধী-ঘাট্।"

এ উক্তির তাৎপর্য্য, মানব-চরিত্রে পশ্বাচারিতা কত প্রবল! পশুর মত উত্তেজনা বাড়লে মানুষেরও আর সামাল্ নেই। এই তো? কিন্তু, বন্য-জীবনের উচ্ছৃঙ্খল সুখ যদি মানুষের কাম্য হ'তো তা'হলে সে এমন শৃঙ্খলিত সমাজ গড়বে কেন? কি আবশ্যকতা ছিল—সুতানটি ও গোবিন্দপুরের জঙ্গল কেটে, রাস্তা ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা সুব্যবস্থিত ও রং-বেরংয়ের সৌধ-সমন্বিত এমন একটি সুন্দর সহর নির্ম্মাণের? ট্রাম-বাস ও টেলিফোনের প্রয়োজন কি? মানব মনে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আছে। তাকে ছাপিয়ে মানুষ যদি হ'তে পারে অসুন্দর ও পশ্বাচারী, তা'হলে জীবনধারণের এত সুখ-সুবিধা কি নিরর্থক নয়?

আহার্য্য-গ্রহণের উদ্দেশ্য—দ্বিবিধ। রসনা তৃপ্তি ও দৈহিক পুষ্টি। দৈহিক পুষ্টির একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। মানুষ কতটুকু বাড়তে পারে? তার গোঁফ্-দাঁড়ির কথাই ধরা যাক্। আঠারো-উনিশ থেকেই অনেকে কামাতে সুরু করেন। প্রতি তৃতীয়-দিনে যতটুকু কামিয়ে ফেলেন—তা' যদি না-কামান—তাহলে দাঁড়ির দৈর্ঘ্য হয় কতটুকু? আনুমাণিক, মাসে এক ইঞ্চি। বছরে এক ফুট। তারপর? ষাট বছর—বয়সে চল্লিশ ফুট লম্বা-দাড়ি-ওয়ালা মানুষ কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়? দাড়ি যে কতটুকু লম্বা হ'তে পারে—তা' দেখিয়ে গেছেন প্রাতঃস্মরণীয় সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীরা। এক ফুট বা দেড় ফুটের বেশী দাড়ি বাড়ে না। চেষ্টা করেও বাড়ানো চলে না।

চর্ব্ব্য-চোষ্যের সাহায্যে দেহটাকে বাড়ানো যায়—স্বীকার করি। কিন্তু, কতটুকু? কুড়ি-পঁচিশ পর্য্যন্ত মানুষের উচ্চতা বৃদ্ধির নির্দ্দিষ্ট কাল। তারপর কিছু পরিসর বাড়ানো ছাড়া, উচ্চতা কি আর বাড়ানো চলে? মাতৃস্তন্য-চোষণ থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বারিক-চর্ব্বণ পর্য্যন্ত যে রসনা-তৃপ্ত হ'লো না—পঞ্চাশোর্দ্ধে সেই লালায়মান রসনাকে আর আস্‌কারা দিয়ে লাভ কি? কিশোর-কিশোরীদের রসনা তৃপ্তি ও দৈহিক পুষ্টির আগ্রহটা স্বাভাবিক ও সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সমাজে যে সব হাঙর-কুমীর শুধু গলাধঃকরণ-প্রবৃত্তি নিয়েই বিচরণ করছেন, তাঁদের কৈফিয়ৎ কি? বহু অসহায় ও অনশন-ক্লিষ্ট মানবের অকাল-মৃত্যুর কারণ যে তাঁরাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সমাজের শীর্ষস্থানীয়েরা সাধারণত ভোজন-বিলাসী। তেতলার 'মেনু'র সুঘ্রাণ ফুটপাতের বুভুক্ষুদের নাকেও পৌঁছায়। হাঁড়ের উপর চামড়া-ঢাকা অসংখ্য কঙ্কালমূর্ত্তি অনাহারী-প্রসাদপ্রার্থীরা ওই সব প্রাসাদের চারিদিকে ধুকছে। শুধু কি ওরাই মরবে থাইসিসে? নধরকান্তি ভোজন-বিলাসীরাও মরবেন—মেদবৃদ্ধিজনিত ব্লাড্-প্রেসারে ও ডায়বেটিসে। নিস্তার কারো নেই। এই বিদ্যুৎ-গতি ও চমকপ্রদ সভ্যতার আড়ালে যে বস্তুনীতির পাপচক্র ঘুরছে—তার প্রভাবমুক্ত হওয়া, কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। বেঁচে-থাকার তাগিদে মেদ-সমৃদ্ধ 'আলাইপুরী-জালা' আর অস্থিচর্ম্মসার 'খ্যাংরা-কাঠিরা' যদি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'তে না পারেন—তা'হলে এ সভ্যতার রোশ্‌নাই আর বেশী দিন নেই। সুতানুটিং গোবিন্দপুর আবার ফিরে আসবে।

চিন্তানায়ক রাসেল বলেছেন—যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা' এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয় সর্ব্বাঙ্গিক উত্থান—আর না হয় সামগ্রিক পতন। বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানীরা আজ মানুষকে দোলাচ্ছেন ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত—সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝখানে। দু'এক পুরুষের মধ্যেই মানুষ যে-কোন এক-দিকে ঝুলে পড়তে বাধ্য হবে

উত্থানের দিক-নির্দ্দেশ ক'রে—রাসেল বলেছেন—মানুষ যদি ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেতে চায়, তাহলে তাকে তিনটি কাজ করতেই হবে। (১) যুদ্ধ-বর্জ্জন (২) রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম অধিকার সুষ্ঠুভাবে খণ্ডন ও (৩) জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

এ তিনটি সমস্যাই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও মন্ত্র-সাপেক্ষ। টেলিস্কোপের মত কোন যন্ত্র-সাহায্যে এদের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদের মূলে রয়েছে—মানুষের মন বা মতিগতি। সেই মনের গতি আজ কোন্ দিকে?

অনেকের ধারণা—যুদ্ধের জন্যে দায়ী রাষ্ট্রনেতারা। তা' কি সত্যি? একটু অনুসন্ধান করলেই বোঝা যায়, যুদ্ধের বীজ নিহিত আছে জন-মনের দুষ্ট মন্ত্রণার মধ্যে। কেন তারা সাড়া দেয় যুদ্ধের ডাকে? যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে কে না সচেতন? তবু কেন নেচে ওঠে রণ-দামামা বাজলেই? যুদ্ধ একটা আদি ও অকৃত্রিম বন্য-প্রবৃত্তি। তা' যদি না হতো—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলার মত, এগারো জন ট্রুম্যান ও এগারো জন স্তালীনের লড়াই দেখ্‌বার জন্যে যে-কোন একটা খেলার মাঠ নির্ব্বাচন করলেই লেঠা চুকে যেত। কোরিয়ায় এত বড় একটা সার্ব্বজনীন মলাই-ডলাইয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি হতো না। যুদ্ধের মাদকতা আছে মানুষের রক্তে। তার নাম হিংসাবৃদ্ধি।

'সারভাইব্যাল্ অব্ দি ফিটেষ্ট্'—মার্জ্জিত ভাষায় পশ্চিমী বন্যনীতি। প্রাচ্য সমাজনীতি নয়। মানুষের প্রতি মানুষের দরদ সমাজ-গঠনের মূলভিত্তি। কুরুক্ষেত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতা, প্রাচ্য সমাজ-বিজ্ঞানীরা ভোলেন নি। তাই তারা প্রচার করেছেন—প্রেম ও ত্যাগের শিক্ষা—সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। মানুষের গন্তব্য কেন আবার হবে—বৃহত্তর কুরুক্ষেত্রে? এই যন্ত্রযুগে, সেই অহিংস-আদর্শকেই রূপদান করতে এসেছিলেন—চরকা-বাহন মহাত্মা-গান্ধী।

গান্ধীজী বুঝেছিলেন—মানব-সভ্যতার লক্ষ্য হওয়া উচিত—ধনবণ্টনের অসমতা দূর করা। প্রাচ্যের বংশ-কৌলিন্য ও প্রতীচ্যের অর্থ-কৌলিন্য—দুটোকেই তিনি সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন—গুণ-কৌলিন্য প্রতিষ্ঠার জন্যে। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়নি।

ভারতীয় কংগ্রেস—গান্ধীজীর নামাবলী নিলেন, ফোঁটা-তিলক নিলেন। নিলেন না—তার কটি বাস, আর ছাগলের দুধ। রাষ্ট্রনেতাদের বিধি-ব্যবস্থায়, দুধের বাছাদের মাতৃস্তনও আজ খাদ্যাভাবে শুষ্ক। গো-দুগ্ধ তো দূরের কথা, তৃণভোজীদের শাক-পাতাও দিন দিন অমিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। পশ্চিমী ধরণের বহু বিরাট পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে—কিন্তু সে যান্ত্রিক কেরামতির ফলভোগী যে কারা হবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাষ্ট্র-নেতাদের রাজকীয় ঠাট্-বাট্ সবই বজায় আছে। চারিদিকে বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদের মধ্যেও—চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ভোজসভায় কাটা-চামচের মধুর ঠোকাঠুকি-শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ দোষ তাঁদের নয়—যে গদীতে তাঁরা বসেছেন—এ সেই গদীর দোষ!

মহাত্মা চেয়েছিলেন—ওই পশ্চিমী গদীটাকেই সরিয়ে ভূমিশয্যায় কুশাসন পাত্‌তে। তা' তো হলো না। গদীর উপর গদী পাতা হলো। সেদিন একজন দুষ্টলোক বল্‌ছিলেন—কারাগারে যাঁরা দুঃখ-বরণ করেছিলেন—তাদের অনেকেই আজ সুখ আদায় ক'রে নিচ্ছেন সুদে-আসলে। কথাটা একেবারে উপেক্ষার নয়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যিনি আসমুদ্র-হিমাচল ভ্রমণ করলেন—নোয়াখালীর উপদ্রুত অঞ্চলে ডিঙ্গি ভাসালেন লগি ঠেলে—তাঁর দোহাই দিতে হ'লে, তার আদর্শকে কি ফাঁকি দেওয়া চলে?

যান্ত্রিক সভ্যতায় বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত জগৎবাসী আজ চেয়ে আছে ভারতের দিকে। গান্ধীবাদের পরিণতি দেখ্‌বার জন্যে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। আশা করি—গান্ধীজীর মন্ত্র-শিষ্যরা সে কথাটা স্মরণ রাখ্‌বেন। গতি বাড়লেও ক্ষতি নেই, যদি গন্তব্য ঠিক থাকে।

এসো

হাসিরাশি দেবী

আমাদের পদতলে কাঁপিতেছে পুরানো পৃথিবী
ধূসর ধূলায় ওড়ে কার কোন ক্লান্তির নিঃশ্বাস,
অসংখ্য-তারার দীপ আকাশ দেউলে আসে নিভি,—
ধীরে ধীরে নুয়ে আসে অন্ধকার রাত্রির আকাশ।
দিক্‌হারা রাত্রিচর তৃপ্তিহীন ক্ষুধাবেগে ফেরে,—
বার বার ডানা নাড়ে, বার বার এসে বসে কাছে,
শ্মশান বন্ধুর-দল জাগে' তবু আমাদেরই ঘেরে,—
বার বার নেড়ে দেখে "প্রাণ আছে! আজও প্রাণ আছে!!"

তবুও জীবন্ত মোরা। জঠরের অগ্নি জ্বলে চোখে,
ঘুণধরা অস্থি-মাঝে তবু কাঁপে প্রাণের স্পন্দন,
তারই আমন্ত্রণ আজও পাঠাইতে চাহি লোকে লোকে,
কঙ্কাল তবুও কাঁপে, বুকে ব'য়ে মাটির বন্ধন।

এরই মাঝে তুমি এসো; হে নূতন! হে চিরনবীন!
দীর্ঘ রাত্রি কেটে যায়;—উদ্ভাসি উঠুক নবদিন॥

জাপানের কথা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

এবার পূজাবকাশে বিশ্ব-বৌদ্ধ-সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। সম্মেলন হয়েছিল জাপানে। পথে অন্যান্য দেশেও গিয়েছিলাম। আজ জাপানের কথাই কিছু বলব।

জাপান সম্বন্ধে কতকগুলা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। অবশ্য নাগাসাকি বা হিরোসিমার দুর্দশা সহজে মোচন করা কোনো জাতির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ তাদের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত। কিন্তু অন্য সহরগুলি যে এত শীঘ্র ধ্বংসলীলার বিপদ কাটিয়ে উঠেছে সে ধারণা আমার ছিল না। আনন্দ হল টোকিও পৌছে—যখন দেখলাম জীবনের স্রোত স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত। জাপানের ধৈর্য্য, উৎসাহ এবং কর্ম-প্রধান চরিত্রকে অভিবাদন করলাম। তারপর নরনারী, ছাত্রছাত্রী, সকল পক্ষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—প্রতিষ্ঠার জন্য। সেথায় দল নাই একথা আমি বলছিনা। কিন্তু তাদের দলাদলির তীব্রতা নাই, দীনতা নাই।

টোকিওতে ছিলাম। সেথা হতে অন্যত্র যেতাম অর্থাৎ ওরা নিয়ে যেতো নিজেদের মোটরে। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকতো দুএকজন কলেজের ছেলেমেয়ে—স্বেচ্ছাসেবক দ্বিভাষী। এদের নিঃস্বার্থ সেবা মনোরম। এদের পরিশ্রম, সদাচার, বিনয় এবং জানবার ও জানাবার ইচ্ছা প্রত্যেক প্রতিনিধিকে মুগ্ধ ক'রছে।

টোকিও প্রকাণ্ড সহর। এর লোকসংখ্যা (৭০,০০,০০০) সত্তর লক্ষ। কলিকাতা হতে বহুগুণ বড়। এর স্ট্রীট

জাপানী নৃত্য

চিত্রাঙ্কনরত জাপানী শিল্পী
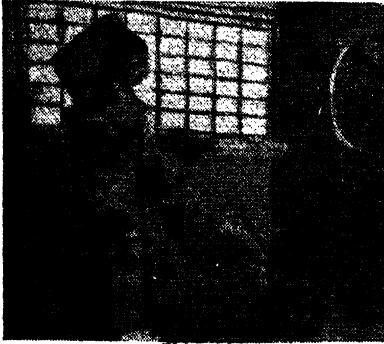
মন্ত্রী ও রাজপুরুষদের সঙ্গে আলোচনার ফলে বুঝলাম—বিগত দিনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনায় কালাতিপাত না ক'রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াসে জাপান আত্মনিয়োগ করতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধে দ্বন্দ্বে এদের আর অভিরুচি নাই। বিপ্লবের প্রতি আস্থা নাই। চাই গড়া। তাই সাধারণ নির্বাচনে একটিও কম্যুনিষ্ট কৃতকার্য্য হয়নি। এখন পরীক্ষার প্রবৃত্তি নাই নিপ্পোর। সে কোমর বেঁধেছে জালজঞ্জাল, আবর্জনা অপসরণের চেষ্টায়। তর্ক-দ্বন্দ্ব গৃহ-বিবাদ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখতে না পারলে সমাজের পুষ্টি অসম্ভব। জাপান একথা বুঝেছে।

ওয়ান(I) থেকে স্ট্রীট ফিফটি ফাইভ(55) অবধি দেখেছি—আরও আছে কিনা জানিনা। এছাড়া এভিনিউ এ(A) হতে এভিনিউ জেড(Z) অবধি আছে। সংখ্যা বা বর্ণমালার নাম ব্যতীত কতকগুলি পথের বিশেষ নাম আছে—যেমন মেতা (মৈত্রী) এভিনিউ, গিন্‌জা এভিনিউ। এগুলি হ'ল বড় রাস্তা—প্রত্যেকটি অন্ততঃ চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মত প্রশস্ত—অনেকগুলি এর দ্বিগুণ চওড়া। অপ্রশস্ত পথ বহু—তাদের কোনোটিতে মাত্র দু'খানি মোটর যেতে পারে। কোনো গলিতে মোটর যায় না। সাধারণতঃ এই সব গলির মধ্যেই লোকের বসতি। বাস-ভবন অধিকাংশ কাঠের

—দ্বিতল বাড়ি। কিন্তু ব্যবসা-কেন্দ্র গগনচুম্বী অট্টালিকায় পূর্ণ। বাগ-বাগিচা আছে সর্ব্বাংশে।

আমাদের কলিকাতার মত বৃহৎ ময়দান সহরের মাঝে কোথাও নাই। বিলাতের হাইড পার্ক এবং কেন্সিংটন পার্ক জোড়া দিলেও কলিকাতার ময়দানের বৃহত্বের গৌরব ম্লান হয়না। টোকিও উচু নীচু স্থান পেয়েছে। তাই তার বাগ-বাগিচার বাহার। আমি যে হোটেলে ছিলাম—গাজোয়েন—সেটি উচ্চভূমির শিরে। তার এক পাশ দিয়ে জমি গড়িয়ে পড়েছে। একটু ঝরণার সঙ্কেত আছে—কাজেই গড়ানে বাগান মনোরম। হোটেলের উপর থেকে নিম্নে সহরের আলো দেখা যায়। তা থেকে নির্ণয় করা যায় সহরের একাংশের আকৃতির বিশালতা।

কোটো বাদ্য

সহরের ভিতর দিয়ে বহু নদীর মত প্রণালী বহে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা সাগরের পিছনের জল। মাদ্রাজে এমন প্রণালী আছে। প্যারিসের সেন নদী বা ডাবলিনের লিফী ভিন্ন প্রকারের। তারা নদী। কিন্তু এই জল থাকায় সহরের শোভা খুব বেড়েছে। তাতে নৌকা চলে—কোন স্থলে মোটর বোট চলে। সুগঠিত সেতুগুলি দুদিকের পথকে সংযুক্ত করে রেখেছে।

সহরের বিস্তৃতি এবং লোকসংখ্যা অনুপাতে সচল যান-বাহনের আয়োজন আবশ্যক, নগরের বিভিন্ন পল্লীকে সংযুক্ত রাখবার জন্য। আমাদের কলিকাতার দুর্দশা শস্তা যানবাহনের স্বল্পতার জন্য। টোকিওর গাড়ির ব্যবস্থা অতি চমৎকার। ট্রাম ও বাস প্রচুর এবং সব পল্লীর সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের চলনপথের ব্যবস্থা। সর্বদা তারা ভর্তি থাকে—কিন্তু তাদের আরোহী সংখ্যা নির্দিষ্ট। সব গাড়ির ফটক আছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক একটি যাত্রী প্রবেশ লাভ করতে পারেনা ট্রামে বা বাসে। রেলিং ধরে ঝোলা কোনো সভ্য-সমাজ কল্পনা করতে পারেনা। বিধি-নিয়মের উপর শ্রদ্ধা মানুষের প্রচুর। হেথায় জনতার শান্তিশৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ সহরের জীবন স্রোতকে স্বচ্ছলভাবে বহিতে সহায়তা করে।

রেল বাস ব্যতীত সহরকে ভেদ ক'রে দ্রুত বিজলী ট্রেণ সদাই ছুটছে টোকিওতে। মাত্র টোকিও কেন, এরা বহু দূর দেশকে অবধি সংযোগ করছে প্রধান সহরের সাথে। টোকিও সেণ্ট্রল স্টেসন হ'তে সিনাগাওয়ার ভিতর দিয়ে ইয়োকোহামা পৌছান যায় আধ ঘণ্টায়। ইয়োকোহামা প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। কামাকুরায় প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। সেখানে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌছান যায়। দূরে

বিদ্যায়তন

ঘণ্টায় চারবার ট্রেণ যায়। সহরের ট্রেণ প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর পাওয়া যায় প্রত্যেক স্টেসনে। ঠিক লণ্ডনের টিউব রেলের মত ট্রেণ। কিন্তু তার পথ সুড়ঙ্গে নয় উপরে। দ্রুত আসে। আপনি দরজা খুলে যায়। যাত্রী নামে। তারপর যাত্রী ওঠে। দরজা কলে বন্ধ হয়। ট্রেণ ছোটে। যাত্রী নিয়ম মানে। যতক্ষণ দরজা দিয়ে লোক নামে, ততক্ষণ কেহ ওঠে না। বসবার স্থান ব্যতীত দাঁড়াবার স্থান আছে। কড়া ধরে লোকে মাঝে দাঁড়ায়। এ গাড়িগুলি সদাই পূর্ণ থাকে। এ হ'তে বোঝা যায় লোকের ভিড়। সবাই ব্যস্ত।

আমার পুস্তক-পড়া বিদ্যা প্রথম চোট খেলে টোকিওর লোক দেখে। পুরুষগুলা সবাই পাশ্চাত্য পোষাকে ভূষিত। নারীরা স্কার্ট-ভূষিতা মেম। বব-করা কালো চুল—মুখে

পাউডার মাখা. ঠোঁটে লিপস্টিক, গতি দ্রুত। ভ্রম হয় যেন কোনো য়ুরোপের সহরের উপর দিয়ে যাচ্ছি। দুদিকে সুসজ্জিত দোকানের সারি। দোকানে স্কার্ট-পরিহিতা নারী পণ্য বিক্রয় করছে। পথে ব্যাগ-হাতে দলে দলে মেয়েরা কর্মস্থলে যাচ্ছে, দোকানে মাল দেখছে। কিমোনো কোথা? ঝোল্লা পোষাক গেল কোথা? বৃদ্ধারাও স্কার্ট ভূষিতা। পথের ধারে জুতা-পালিস করছে যে নারী—তারও পরিধানে বিলাতী ঘাঘরা—মুখে-মাখা পাউডার হরিদ্রা বরণকে ঢেকে ফেলেছে। আমি সমালোচনা করছি না। তাদের ব্যবস্থা তারা করেছে নিশ্চয়—সুবিধা অসুবিধা বিচার করে। আমি বর্ণনা করছি মাত্র।

অলিতে গলিতে এক-একটা কিমোনো দেখা যায়—আর কাঠের জুতা। কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি অল্প। আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য টোকিওর গবর্ণর এবং অন্যান্য রাজ-পুরুষ ভোজ ও উদ্যান-মিলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেথায় নাচ হ'ল জাপানী মহিলা নর্ত্তকীর। এরা জাপানী কিমোনো ভূষিতা।

এদের নৃত্য কেবল অতি মৃদু তালে পা ফেলা এবং হাত নেড়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখানো। আমাদের নাচের মত দ্রুত ও মৃদুতালে দেহ সঞ্চালন বা পায়ের তাল দেওয়া নয়। সেতারের অনুরূপ কোটো নামক এক কাঠের যন্ত্রে সুর বাজে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সঙ্গে পিয়ানো এবং বাঁশী চলে। তাদের সুরে ও ছন্দে মেয়েরা দেহ সঙ্কুচিত করে, নত করে, প্রসার করে। হাতে মুদ্রা দেখায় এবং ছন্দে তালে পায়ে হেঁটে স্থানান্তরিত হয়। অনেকজন থাকলে সবাই মিলে পৃথক পৃথক স্থানে দাঁড়িয়ে প্রজাপতি, বজ্র বা ফুলের রূপ পরিগ্রহ করে। মোট কথা নাচে পদ সঞ্চালনের বাহুল্য নাই—ঘুমুরের শব্দ নাই। পায়ের নাচ অপেক্ষা নাচটা যেন দেহের ও হাতের। মূক অভিনয়ের অনুরূপ।

বাহুল্যের অভাব, সংযম এবং সঙ্কোচ এদের আর্টের মূলে। ছবিতে থাকে হয়তো একটা গাছ আর একটি পাখি। কিন্তু এ আর্টের সুখ্যাতি যথেষ্ট শিল্পী মহলে।

যুদ্ধের পূর্বে জাপানে ছেলেমেয়ের একত্র পাঠের ব্যবস্থা ছিলনা। আজ সকল প্রকার বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সহ-পাঠের আয়োজন। কিন্তু সকল শিক্ষার মাধ্যম জাপানী ভাষা। নিজ ভাষার প্রতি ওদের অনুরাগ প্রচুর। শুনলাম সকল প্রকার বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থ-নীতি, ধর্ম-শাস্ত্র, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক জাপানী ভাষায় অনূদিত এবং সঙ্কলিত হ'য়েছে।

এ-বিষয়েও আমার ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হ'ল। শুনেছিলাম পূর্বে ইংরাজ এবং যুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকার প্রভাবে জাপানে ইংরাজি ভাষার খুব প্রচলন। কিন্তু দেখলাম, অতি অল্প কৃতবিদ্য লোক ভিন্ন কেহ ইংরাজি জানেনা এবং যারা জানে তাদেরও ভাষাজ্ঞান খুব অধিক নয়। আমাদের সুবিধার জন্য কয়টি কলেজের যুবক যুবতী দ্বিভাষী নিযুক্ত করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারাও আমার কথা বুঝতে পারতনা এবং সহজে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতনা ইংরাজিতে।

সভায় মন্ত্রী, গবর্ণর, ডাক্তার উপাধিধারী অধ্যাপকেরা নিজ ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। একজন ইংরাজিতে তার অনুবাদ করলেন। আমি একদিন এক প্রকাণ্ড ছাত্র-সভায় বক্তৃতা দিলাম। যখন মাইকের সম্মুখে দাঁড়ালাম এক ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ছত্র ছত্র অনুবাদ করব, না এক একটা বিষয় শেষ হ'লে? আমি
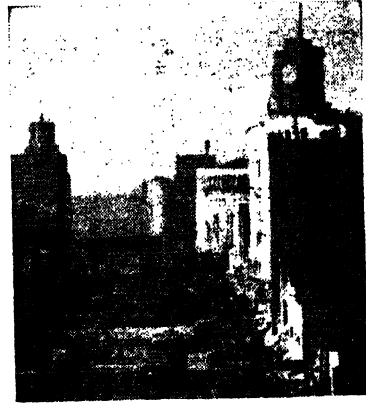
শহরের দৃশ্য

অবশ্য ছত্র ছত্র অনুবাদ করতে বল্লাম। কিন্তু কলেজের যুবক যুবতীর সভাতেও তারা নিজেদের ভাষাকে প্রাধান্য দিল। আমার ইংরাজি গ্রহণ করলেনা, তর্জমার পূর্বে। অনুমোদিত ছত্রে হাত-তালি পড়লো অনুবাদের পর।

সম্মেলনের সভাতেও সেই কার্য্য হ'ল। আমাদের ইংরাজি বাণী অনূদিত হ'ল জাপানীতে। ওদের নিপ্পো অনূদিত হ'ল ইংরাজিতে। চীনা ভাষার বক্তৃতা প্রথমে ইংরাজিতে, পরে জাপানীতে শোনানো হল। থাইলাণ্ডের বক্তারও ঐ অবস্থা। অথচ যেসব কৃতবিদ্য পদস্থ জাপানী ভদ্রলোক জাপানী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, তাঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে গল্প করবার সময় ইংরাজী ভাষায় কথা বলিলেন—শুদ্ধ ইংরাজিতে।

(ক্রমশঃ)

আটাশ

সমস্যা নিজের পথ নিজেই কেটে সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মৃন্ময় ঠিক করে ফেলেছিল। বলে, অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে হোল না, বাকি থাকে ছল-কৌশল, ও তারই আশ্রয় নেবে, সরমাকে বলবে সে স্ত্রী ব'লেই গ্রহণ করবে তাকে, যেমন চেয়েছে সে। কিন্তু সে তো এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে হবে না; তার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে বাইরে কোথাও। ঐ ওজুহাতেই টেনে নিয়ে যাবে দিনগুলো।

সরমা কিন্তু দেখা করছে না। আসল কথা, সুকুমারের কাছ থেকে কথা পেয়ে যাবার পর ওর সর্ত অনুযায়ী দেখা করবার আর কোন তাগিদ নেই। শুধু তাই নয়, একটা বড় জীবনের দিক-চক্র পরিষ্কার হয়ে গিয়ে যা ক্ষুদ্র, যা প্রচ্ছন্ন, মুক্ত আলোয় দাঁড়িয়ে যা করা যায় না—এমন সব কিছুরই ওপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে ওর। দেখাশোনা সবই হচ্ছে পূর্বের মতোই, প্রসন্ন মুখে কথাবার্তা হচ্ছে, তবে, একদিন গেল, দুদিন গেল, একটা সপ্তাহই কেটে গেল, কিন্তু চেষ্টা করে দেখা করা অর্থে যা হয় সেটা বাদ দিয়েই চলল সরমা। চিঠিও দিলে না, মৃন্ময়ও আর ও-সাহসটা করলে না।

সে কিন্তু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। নব নব পন্থা আবিষ্কারে ওর অকুলান হয় না, এদিকে একেবারেই হতাশ হয়ে ও ঠিক করলে—রুস্মাকে নিজের সহায়িকা করবে আগে। কৃষ্ণসর্পী রুস্মার নিজেরও একটা মাদকতা আছে—রুস্মা আসুক, তারপর সরমা আসবেই।

সরমা, যেখানে পাঁচটা লোক নেই, সেখানে আজকাল মৃন্ময়ের সঙ্গে একত্র হয় না, চোখে দুটো মুহূর্ত চোখ তুলে রাখে না—যাতে মৃন্ময় একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেরও অবসর পায়, তা ভিন্ন, এমন দক্ষতার সঙ্গে আজকাল কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করে, যাতে সবার সঙ্গেই সবার দৃষ্টিবিনিময় হতে থাকে···দক্ষ, চতুর অভিনেত্রী সরমা। রুস্মার সে সব বালাই-ই নেই। এতদিন সরমার দিকে মন থাকাতেই রুস্মার কথা অতটা ভাবেনি, এবার তাকে দরকার।

মনে পড়ল স্টেজ-রিহার্সেলের দিন যখন একবার বাসায় এসে আবার মোটরে করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রুস্মা ছুটে এসে পিছু ডেকেছিল।

রুস্মার সঙ্গে দেখা করতে বেশি বেগ পেতে হোল না, কেননা রুস্মাও ওকে খুঁজছিল, সরমা মিথ্যা বলেনি। একদিন বিকালে খোঁজ নিয়ে যখন জানলে সুকুমার সরমা কেউই বাড়ি নেই, বেড়ানোর পোষাকে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এসে উপস্থিত হোল, প্রশ্ন করলে—"এঁরা কেউ নেই।"

রুস্মা উত্তর করলে—"না। কেন?···আপনার ছোঁড়া চাকরটা তো এখুনি জেনে গেল।"

মৃন্ময় একটু হেসে বললে—"সেইটে জেনেই তো আমার আসা রুস্মা।···একদিন মোটরে ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম—কি বলবে ব'লে তুমি আমায় ডাকলে—ব্যস্ত ছিলাম, দাঁড়াতে পারি নি।···তাই আজ এঁরা নেই খোঁজ নিয়েই এলাম···বুঝতেই তো পারছ।"

"বুঝতে পারছি বৈকি। আসবার জন্যেই খোঁজ নিয়েছিলেন জেনে আমি চলে যাই নি।···কিন্তু কথাটা এত অল্প সময়ে হবার নয়। আমি সুবিধে করে আসব। এখন যান তাড়াতাড়ি। আমার স্বামী বাগানে, নিশ্চয় দেখেও থাকবে আপনাকে। আমায় যদি জিগ্যেস করে বসে, একটা কথা জেনে নিতে এত দেরি হয় বিশ্বাস করাতে পারব না ওকে। যান।"

তিনদিন পরে রুস্মার সুযোগ হোল। দূরের সাঁওতাল পল্লীতে একটা পূজা-উৎসব ছিল। সর্দার-সর্দারিণী হিসাবে দুজনের যাওয়ার কথা, রুস্মা অসুস্থতার ভান করে কাটিয়ে দিলে, ঝংড়ু গেল একা।

রাত্রি যখন প্রায় একটা, সমস্ত পল্লীটা একেবারে নিষুপ্ত, মৃন্ময়ের শোবার ঘরের জানালায় বার দুই তিন খট খট ক'রে শব্দ হোল।

প্রশ্ন হোল—"কে?"

"আমি।"—চাপা গলায় উত্তর হোল।

রুম্মার গলা যেন; তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে উঠে মৃন্ময় দরজা খুলে বাইরে এল। রুম্মাই; কৃষ্ণসর্পী অন্ধকারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মৃন্ময়ের পেছনে পেছনে তার শোবার ঘরে গিয়ে উঠল, তারপর পিঠ দিয়ে দরজাটা চেপে দাঁড়াল। বললে—"আপনি বসুন···ঐ কুশন চেয়ারটায়।"

"তুমি বসবে না?"

"দাঁড়িয়েই থাকি না।"

অদ্ভুত দেখাচ্ছে রুম্মাকে। ঘরের অল্প-শক্তির নীল আলোটা জ্বালা, ওর পরণে খাটো সাঁওতালী শাড়ি, এলো খোঁপায় প্রস্ফুট জবা—সমস্তটুকুর ওপর সেই আলোর দীপ্তি গিয়ে পড়েছে, ওকে যেন একই সঙ্গে করে তুলেছে বাসনাময়ী আর রহস্যময়ী।

রুম্মা কিন্তু গম্ভীর। চোখ দুটো স্থির, তার ওপর নীল আলোর দীপ্তি পড়ে এমন অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছে যে অনেক কথা বলবার থাকলেও মুখ দিয়ে যেন বেরুচ্ছে না মৃন্ময়ের। তবু চেষ্টা ক'রে বললে—"এলে—অথচ বসবে না···?"

"আমি এসেছি আপনাকে সাবধান করতে, আপনি ভুল পথ ধরেছেন।"

"পথটা তো ভুলই···কিন্তু···সাবধান···সে কার সম্বন্ধে?"

"আমার স্বামীর সম্বন্ধে; সে টের পেয়েছে আপনার মনে কি আছে, অন্তত সন্দেহ হয়েছে তার।"

"থাকব সাবধান···সাবধান ক'রে দেবার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ।"

"তাহলে আমি যাই এখন।"

ফিরে দোরটা একটু খুলতেই মৃন্ময় উঠে দাঁড়াল, এক পা এগুলোও। রুম্মা ঘুরে দাঁড়াল, চোখের মধ্যে থেকে নীল আলোটা ঠিকরে বেরুচ্ছে, বললে—"আপনি এগুবেন না—গায়ে হাত তো দেবেনই না···"

এতটা শাসন সহ্য করা শক্ত, তবু মৃন্ময় নরম গলাতেই বললে—"অথচ তুমি এলে সেজেই।"

"সেজে তো আমি নি।···বোধ হয় খোঁপার ফুলটার কথা বলছেন, ওটা পুজো-করা জবা ফুল।···ওটা যে কী আপনাকে একটু মনে করিয়ে দিই—আমার স্বামী যেদিন বাঁধের অবস্থা দেখবার জন্যে জলে নেমেছিল, সেদিন তার সঙ্গে যাবার জন্যে তোয়ের হয়ে এই রকমই একটা জবা পরেছিলাম আমি।"

মৃন্ময়ের মুখে একটা ব্যঙ্গ ফুটে উঠল, বললে—"এই সব তত্ত্বকথা শোনাবার জন্যে এত কষ্ট করে এসেছ রুম্মা?—না এলেই তো পারতে···সাবধানই বা কি এত করবার ছিল? তোমরা এক চোখে দাও উৎসাহ, এক চোখে কর সাবধান।"

"ভুল বুঝেছেন, সাবধান করতে এসেছি আমার স্বামীর কথা ভেবে। আমাদের জাতকে আপনি চেনেন না, তারও ওপর আমার স্বামী সর্দার। মান ইজ্জতের এক চুল এদিক-ওদিক হচ্ছে সন্দেহ হলে ও না করতে পারে এমন কাজ নেই। তার ফলে তো আমায় হারাতেই হতে পারে ওকে; তার জন্যেই আপনাকে সাবধান করতে এসেছি।"

"সুকুমারবাবুর ওখানে তার মানের এদিক-ওদিক হচ্ছে না?"

"আপনার কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না; তবে আমার সেখানে সাজগোজের কথা ধরে নিশ্চয় বললেন কথাটা, এর যা অর্থ দাঁড়ায় সেই ধ'রে?"

"মিথ্যে বলছি?"

"তাহলে আর একটু তত্ত্বকথা বলি আপনাকে; আমাদের জাত নিয়ে—আমরা বনের মুক্ত জীব, আনন্দ যাতে খোলাখুলিভাবে পেতে পারি তাতে আমাদের বাধে না। দিদিমণির বাড়িতে আমার সাজগোজ ঐ রকম একটা জিনিস। শুধু ঐটুকুই নয়—আমাদের জাতেরই যেমন ধর্ম, কোন পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়েরই খোলাখুলি কথাবার্তায় যেমন বাধে না, দাদাবাবুর সঙ্গেও তেমনি বাধে না আমার···আর আমার স্বামীও জানে এটা।"

"দাদাবাবু তোমার ভাগ্যবান বলতে হবে।"

"ও-ধরণের ভাগ্যবান আপনিও হতে পারতেন;

ওঁদের বাড়ির বন্ধু হিসেবে আমি জাতের স্বভাবেই আপনার সঙ্গেও সেইরকম কোন সঙ্কোচ না রেখে কথাবার্তা আরম্ভ করি। তার ফল কিন্তু এই দাঁড়িয়েছে, যার জন্যে আমায় আজ এইভাবে হোল আসতে।"

নৈরাশ্যে গায়ে রাগটাই ধীরে ধীরে জেগে উঠছে মৃন্ময়ের; একজন বন্য নারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়া, তারপর এই উদ্ধত তিরস্কার, বললে—"রুম্মা, তুমি বড় বড় কথা বলছ, তুমি যে-স্তরের মানুষ তাতে তোমার মুখে ও শোভা পায় না; তবুও বোধ হয় বিশ্বাসই করতাম যদি তোমার দাদাবাবু আর দিদিমণি—দুজনকেই আমি ভালো ভাবে না জানতাম।"

"কী জানেন আপনি?···আমায় যা ভাবেন ভাবুন, তাঁদের সম্বন্ধে আপনি একটু বুঝে-সুঝে কথা কইবেন।"—রীতিমতো রুখে দাঁড়াল। একটা কলহেরই ব্যাপার, রাগের ঝোঁকে কথাটা এসেও গিয়েছিল মৃন্ময়ের মুখে; কিন্তু এখনও সরমার উত্তরটা পায় নি, আশার মতো একটা লেগে আছে মনের এক কোণে, নিজেকে সংযত করে নিলে।

"বলুন কী ব্যাপার···একটা বানিয়ে। আপনাকে আর একটু চিনে নিয়ে যাই।"

মৃন্ময় ঠোঁটের একটা দিক কুঁচকে মুখের পানে চেয়ে রইল; সংযতও করবার চেষ্টা করেছে নিজেকে—সরমার দিকে চেয়ে আবার একটা লোভও হচ্ছে—চরম বিপদের কথাটা জানিয়ে দিয়ে রুম্মাকে একরকম ভয় দেখিয়েই আকর্ষণ করা যায় কিনা।

"বলুন···দেরি হচ্ছে বানিয়ে নিতে?"

"শীগগির বোধ হয় একদিন শুনবে। এখন শুধু এইটুকু জেনে যাও, তোমার দাদাবাবু-দিদিমণি দুজনেই আমার মুঠোর মধ্যে।"

রুম্মা একটু নিষ্প্রভ হয়েই গেল, মুখের পানে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলে—"মানে?···তাঁদের অনিষ্ট করতে পারেন আপনি?"

ফল হয়েছে—রুম্মা ভয় পেয়ে গেছে দেখে মৃন্ময় বাড়িয়েই দিলে—

"একেবারে ধ্বংস ক'রে দিতে পারি। তার সঙ্গে এইটুকুও জানিয়ে রাখি, এক বাঁচাতে পার তুমি; এর মানেটা নিশ্চয় বোঝ।"

রুম্মা আবার স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তবে সেই যে একটু আতঙ্কের ভাব সেটা একেবারে গেছে কেটে, তার জায়গায় প্রতিহিংসা ঠিকরে বেরুচ্ছে ওর নীল দৃষ্টি দিয়ে। বললে—"ভেতরকার কথা যাই হোক, আপনি কিন্তু বলে ভালো করলেন না। দাদাবাবু দিদিমণি আমাদের ছেলেকে বাঁচিয়েছেন—আমাদের ছেলে, যে বিশখানা গ্রামের সর্দার হয়ে জন্মেছে। ভুল করলেন···আপনি যা মানুষ তাতে দুজন নিরীহ লোককে ধ্বংস আপনি স্বচ্ছন্দেই করতে পারেন—আমি এই ভয়ই বুকে নিয়ে যাচ্ছি এখন।"

ওর কোমরের কাপড়ে একটা ছোরা গোঁজা ছিল, রাগের চোটেই অন্যমনস্ক হয়ে বের করে ফেলেছে, তার খাপ দিয়েই দরজাটা খুলে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

রুম্মা ওর স্বামীর সন্দেহের কথাটা বানিয়েই বলেছিল মৃন্ময়কে। ভয় দেখিয়ে তাকে তার লোভ থেকে নিরস্ত করতে, নয়তো সাঁওতাল সর্দার ঝংড়ুর একটু সন্দেহ হলে মৃন্ময় এতদিন বাঁচত না, রুম্মাও নয়। এবার কিন্তু, রুম্মা সেই সন্দেহকেই তুললে জাগিয়ে। শুধু তাই নয়, সন্দেহ জাগালে যে পরিণামে ঝংড়ুকেও হারাতে হ'তে পারে সে-কথাও গেল ভুলে, মাত্র একটি কথা রইল মনে—এই মৃন্ময় সুকুমার আর সরমার ধ্বংস এনে ফেলতে পারে।

পরদিন বৃদ্ধের এই তরুণী ভার্যা সামান্য একটা ছুতা করে স্বামীর সঙ্গে কলহ বাধিয়ে দিলে—অবশ্য দাম্পত্য কলহই, হয়ও মাঝে মাঝে—আজ কিন্তু তার মধ্যে এক কণা উগ্র বিষ দিল ঢেলে—এক সময় তীব্র শ্লেষ ভরে ঘাড় বেকিয়ে বললে—"ইস্ ভারী সর্দার! ঘরে নিজের মাইয়ার মান রাখতে জানে না, সে করে বাইরে সর্দারি!"

"মান রাখতে জানি না!!"—ঝংড়ু দড়ির খাটিয়াটাতে শুয়ে শুয়ে চালাচ্ছিল এতক্ষণ, একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসল—"কে তুর মানে হাত দিয়েছে?"

"চোখ নাই, আমি চোখ ধার দিই···চিনে নে; মিছে বাহানা করে কে বিকেলে বাসায় এসেছিল—হেঁসে দুটো কথা কইবার লেগে?"

তার পরদিন মৃন্ময়ের আফিস থেকে ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। নতুন ঝিল আর বাজারের

মাঝামাঝি নির্জন জায়গায় মোটরটা আসতেই পেছনে একটা আর্ত চীৎকার শুনে শোফার ফিরে দেখলে—পাশ দিয়ে একটা তীর এসে মৃন্ময়ের ডান পাঁজরের মাঝামাঝি সমস্ত ফলাটা পর্যন্ত বিঁধে রয়েছে; মৃন্ময় পড়েছে গদির ওপর লুটিয়ে।

উনত্রিশ

সমস্ত রাত সুকুমার আর সরমা হাসপাতালে মৃন্ময়ের পাশে বসে কাটিয়েছে। আঘাতটা খুবই গুরুতর; মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল, যাতে মনে হয় তীরের ফলা ফুসফুসটাও আহত করেছে; সুতরাং পরিণাম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। চিকিৎসার দিক দিয়ে সুকুমারের যতটা সাধ্য করেছে, কলকাতাতেও লোক গেছে একজন বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে।

শেষ রাত্রে মৃন্ময়ের একটু সংজ্ঞা হয়। সুকুমার সামনে বসেছিল। একটু চেয়ে চেয়ে চিনলে। হাতটা বাড়াবার চেষ্টা করছে দেখে সুকুমার নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে; দুর্বলতার মধ্যে যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে মুঠো করে ধরলে মৃন্ময়, তারপর তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সুকুমার কানের কাছে মুখটা একটু নামিয়ে বললে—"ঠিক আছে…বুঝেছি।"

মৃন্ময় আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ল। সুকুমার সরমাকে বললে—"তুমি এবার যাও, বরং তোমায় দেখলে আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠবে ব্রেণটা।…একটু ঘুমোবার চেষ্টাও করগে।"

সরমা উঠে বললে—"যদি সুবিধে হয় তো বলে দিও আমিও কিছু পুষে রাখিনি মনে।"

বাইরে বেরুতেই দেখে দোরের পাশে রুম্মা। আড়াল হয়ে বসেছিল, দাঁড়িয়ে উঠে চাপা খসখসে গলায় জিগ্যেস করলে—"কেমন আছে?"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠায় একটু চমকেই উঠেছিল সরমা, তারপর চেহারা দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারলে না। চুল উস্কখুস্ক, বেশভূষা একটু অসংযত, চোখ দুটো প্রদোষের আবছা আলোয় যেন জলছে, একটু রাঙাও। সরমা বললে—"তুইও এখানে চুপ ক'রে সমস্ত রাত বসে আছিস?"

একটু বিরক্তিই প্রকাশ পেয়ে গেল তার কথায়—সরমা নিজে এত আগ্রহের যে কারণটা আন্দাজ করেছে তাইতে। এগুতে এগুতে বললে—"আয় বলছি।"

বারান্দা থেকে নেমেছে, রুম্মা হঠাৎ ঘুরে এসে সামনে দাঁড়াল, বললে—"যেও না, দাঁড়াও।"

"কী?…কী ব্যাপার!"—নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, বাড়াবাড়ি দেখে বিরক্তিটাও হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। রুম্মা নিচে বসে পড়ে ওর পা দুটো ধরলে জড়িয়ে, বললে—"না, ফেরো তুমি, দাদাবাবুকেও গিয়ে বলো—তোমরা ওকে বাঁচাতে পারবে না।"

"পারবই যে তার আশা এখনও দেখছি না, তবে তোর এই ভবিষ্যৎ বাণী…মুড়ুলি ক'রে…"

"তা নয়…কথা বুঝছ না কেন?…পারবে না—তার মানে ওকে বাঁচিও না তোমরা…না, বাঁচিও না—কোন-মতেই নয়—বলো গিয়ে দাদাবাবুকে—এক্ষুনি…"

"বাঁচাব না! কেন?…তুই ওঠ আগে।" হাত ধ'রে তুলে দাঁড় করালে সামনে।

"না, বাঁচিও না, কোন মতেই বাঁচিও না—আবার যদি বাঁচবেই তো আমি এত ক'রে কেন…"

"আমি এত ক'রে!!…তুই কি করেছিস?…চল, এখানে দাঁড়িয়ে নয়, বাসায় আয়।"

বাসায় এসে ওরা বাইরের বারান্দায় বসল। এইটুকু পথ কোনও কথাই হয় নি। সরমা জিগ্যেস করলে—"তুই…?"

"ঠিক নিজের হাতে আমি না হলেও, একরকম তাই। দরকার হ'লে তাই বলব—অবিশ্যি, দুলীর বাবা যদি না বলে দেয় তো…কিন্তু ওসব কথা এখন থাক না—যদি ওঠেই তো সে তখনকার কথা তখন।…তোমরা ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলছ!"

সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল খুবই, শেষের কথায় সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"কেন বাঁচাব না?…বল্।"

"না, বাঁচাবে না। বাঁচালে ও তোমাদের সর্বনাশ করবে—দুজনেরই—ধ্বংস করবে—ওর মুখের কথাটাই বলি।"

"কোথায় শুনলি ওর মুখের কথা—কবে?"

"কাল রাত্তিরে, ওর বাসায়।"

"তুই গিয়েছিলি?"

"ওকে সাবধান করতে গিয়েছিলাম…ওর দৃষ্টি বড় খারাপ হয়ে উঠছিল, ব'লে।"

সরমা একটু চুপ করে রইল; আবার প্রশ্ন করলে—"বেশ, তারপর ?"

"আমায় ঐ কথা বলে শাসালে—যখন আর কিছুতে পারলে না।"

"কি ক'রে ধ্বংস করবে—কেন—সে সব কিছু জিগ্যেস করেছিলি ?"

"দিদিমণি! এরকম একটা কথা শুনেও তোমরা কথার জের টেনে যেতে পার, আমরা বুনোরা পারি না। আমি তারপরেই ওর দোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, তারপর চব্বিশ ঘণ্টাও যায় নি।"—বেশ অসহিষ্ণুভাবে কথাগুলো বলে সেই রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল রুম্মা।

দুজনেই সিঁড়ির ওপর বসে আছে, রুম্মা একটা নিচের ধাপে একটু ঘুরে। এবার যে চুপ করলে সরমা, আর অনেকক্ষণই কথা নেই। রুম্মা মাঝে মাঝে আড়চোখে দৃষ্টি তুলে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে মুখের ভাবটা, যে আলোছায়াগুলো খেলে যাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে। ভয়ে ভয়েই লক্ষ্য করতে লাগল—নরমই হয়ে আসছে বেশি ক'রে। এক সময় রুম্মার মাথায় হাত দিয়েই তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বললে সরমা—"কাজটা অন্যায়ই করেছিস তোরা রুম্মা, কিন্তু এও যেন মনে হচ্ছে অন্য রকম হবার উপায় ছিল না। কিন্তু এই পর্যন্তই থাক্—এইবার ভুলে যা সব, ভগবানের ওপর সব ছেড়ে দে, তিনি যা করবার করবেন।"

"তাঁর যা করবার আমাদের হাত দিয়েই করান্ দিদিমণি, সেইজন্যেই তো তুলে দিয়েছেন ওকে আমাদের হাতে।"

মাথায় হাত দিতে একটু নরম হয়েছে রুম্মা, কিন্তু সুর বদলায় নি। সরমা হাতটা কাঁধের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে টানতে টানতে বললে—"না, তুই ঠাণ্ডা হ'।… তুই তাঁর কাছে আমাদের হয়ে এই দয়া চা রুম্মা যে, কেন যে আমাদেরই হাতে আমাদের শত্রু এমন ক'রে তুলে দিয়েছেন তা যেন পরিষ্কার ক'রে নিঃসন্দেহভাবেই বুঝতে পারি আমরা দুজনে—তোর দাদাবাবু আর আমি। রুম্মা, ও যে আমাদের কী ভাবে ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে তুই আন্দাজ করতেও পারবি নি। কিন্তু এও ঠিক যে—এক ভগবান নিজে নেন মানুষের চেষ্টা সত্ত্বেও, সে আলাদা—কিন্তু আমাদের দু'জনের একটু অবহেলার জন্যেও, মনের এতটুকু গলদের জন্যেও যদি মৃন্ময়বাবুকে যেতে হয় তো আমাদের ধ্বংস তিনি নিজের হাতেই নেবেন তুলে। …আমরা দুজনে একটা নতুন ব্রত নিয়েছি জীবনে, তুই এই দয়াই চা তাঁর কাছে—যে তার গোড়াতেই যে তাঁর এই অগ্নি-পরীক্ষা, এতে যেন উৎরে যেতে পারি আমরা ভালো করেই।"

সমাপ্ত

পশ্চিম বাংলার গ্রাম

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গ্রামের বিভিন্ন সমস্যাগুলি একটির সাথে আর একটি এমন ভাবে জড়ান যে সবগুলিরই সমাধান করতে হবে এক যোগে; তা না করে এর কোন একটিতে হাত দিলে চল্‌বে না। সাধারণ গ্রামের বিশেষত্ব তিনটি—অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য। ধরুন এ রকম একটি গ্রাম নেওয়া হল উন্নয়ন উদ্দেশ্যে। অনেকেই বল্‌লেন সবার আগে প্রয়োজন গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা; তা না হলে কি স্বাস্থ্যের উন্নতি কি আর্থিক উন্নতি কোন কিছুই হবে না। নৈশ বিদ্যালয় খোলা হল প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য। বিদ্যালয় খোলা হল বর্ষার প্রারম্ভে; বর্ষা শেষে দেখা গেল অর্দ্ধেকই অনুপস্থিত। কারণ খোঁজা হল; অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত। যাঁরা ভেবেছিলেন অশিক্ষা দূর করাই সবার আগে দরকার, তাঁরা ভুল বুঝতে পারলেন। আর এক দল এগিয়ে এলেন; তাঁরা বল্‌লেন—সবার আগে চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে। ডাক্তার নিযুক্ত হল; তিনি ওষুধ দিলেন। জ্বর ছেড়ে গেল কিন্তু রুগীর বল আর সহজে ফিরে আস্‌ছে না। কেন আস্‌ছে না এ বিষয়ে গবেষণা চল্‌লো। দেখা গেল রুগী ওষুধ খাচ্ছে সত্য, কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ মত পথ্যি তার জুটছে না পয়সার অভাবে। সুতরাং ঠিক হল পয়লা নম্বরের সমস্যা আর্থিক উন্নতি—শিক্ষাও নয়, স্বাস্থ্যও নয়। কিন্তু আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টায়ও আবার দেখা গেল সব চেয়ে বড় অন্তরায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অভাব। সব শেষে ঠিক হ'ল কোন একটা সমস্যাকেই বেছে নেওয়া চল্‌বে না; সব কিছুরই সমাধান করতে হবে এক যোগে।

সব রকমের সরকারী ও বে-সরকারী জনহিতকর প্রচেষ্টা একত্রীভূত করে উন্নয়ন কল্পে নিয়োজিত করতে হবে, যেন কোন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ না হয়। কিন্তু তা কখনও সম্ভব হবে না যে পর্যন্ত গ্রামে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে—যার ভেতর দিয়ে এই বিভিন্ন প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে পারে। গ্রামে এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান না থাকলে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রামবাসীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে; সেটা সম্ভব হবে না, সম্ভব হলেও বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকবে না এবং অনেক ক্ষেত্রেই একের প্রচেষ্টা অন্যের প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। সেটা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। তা ছাড়া এ ব্যবস্থায় অসুবিধা আছে আরও অনেক। রুগী তার নিজের অবস্থা ডাক্তারের কাছে ভাল করে বলতে না পারলে ডাক্তারকে নিজেই অনুমান করে নিতে হয় রুগীর অবস্থাটা এবং সেই অনুমানের ওপর নির্ভর করেই করতে হয় ব্যবস্থা; বলা বাহুল্য এ সব ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা বড় হয় না। তেম্‌নি ওপর থেকে কেউ যদি সরাসরি গ্রামে এসে গ্রামের অভাব অভিযোগ নিজেই সাব্যস্ত করে তার বিধি ব্যবস্থা আরম্ভ করে দেন, তবে সে ব্যবস্থা কতটা সুব্যবস্থা হবে এবং তাতে গ্রামবাসীর কতটা আন্তরিক সহযোগিতা থাকবে তা অনুমান করা খুব বেশী কঠিন নয়।

গ্রামের অবস্থা কি, কি দরকার, কি করে কাজ সম্ভব হবে তা গ্রামবাসীরাই বলে দেবেন পঞ্চায়েতের মারফতে। এমন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে যেন গ্রামবাসীরা অনুভব করতে পারেন এটা সত্যি তাঁদেরই পরিকল্পনা এবং এ পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য তাঁরাই দায়ী। তা হলেই উন্নয়ন সম্ভব হবে। ওপর থেকে কোন কিছু ঝুলিয়ে দিলে তা শূন্যেই ঝুল্‌তে থাক্‌বে, মাটিতে আর শিকড় গজাবে না। পল্লী উন্নয়নের প্রথম সোপান গ্রামে পঞ্চায়েত গঠন। উৎপাদন প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীদের অনেক ক্ষেত্রে পুরাতনকে ছেড়ে দিয়ে নূতন রীতি অবলম্বন করতে হবে; উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা গ্রামে যাবেন তাঁদেরও পুরাতন দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেল্‌তে হবে। গ্রামে গিয়েই তাঁরা যদি বক্তৃতা করতে সুরু করেন—গ্রামবাসী এতদিন যে পথে চলে এসেছেন সেটা ভুল পথ, তা হলে বিশেষ কোন ফল হবে না। গ্রামবাসী এত দিন যে পথে চলে এসেছেন, কেন এসেছেন—কি অবস্থায় এসেছেন—তা প্রথমত গ্রামবাসীর কাছ থেকে, তাঁদেরই এক জন হয়ে, ভাল করে জেনে নিতে হবে। তার পরে নিজ হাতে দেখিয়ে দিতে হবে নূতন পথ ও পুরান পথ অবলম্বনের মাঝে কতটা পার্থক্য। সব চেয়ে বড় কথা যাঁরা গ্রামে যাবেন তাঁদের সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে তাঁরা সহর থেকে গ্রামে এসেছেন গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিতে। তাঁরা যদি মনেপ্রাণে গ্রামবাসীদের একজন বলে নিজেদের মেনে নিতে না পারেন, আর গ্রামবাসীরাও যদি তাঁদের আপনজন বলে গ্রহণ করতে না পারেন, তবে উন্নয়ন পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকবে। এমন একদিন ছিল—গ্রামবাসীদের উন্নতি প্রচেষ্টায় প্রেরণা দিতে সহর থেকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দলবলসহ গাড়ি করে গ্রামে গিয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্য—ক্যামেরা পরিবেষ্টিত হয়ে কোদালি চালিয়েছেন এক আধ-বার—গ্রামবাসীরা কৃতার্থ বোধ করেছেন। কিন্তু সে দিন চলে গেছে।

অগাষ্ট কোম্‌ৎ

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ফরাসী মন বাস্তবমুখী। গূঢ় দার্শনিক সমস্যা অপেক্ষা অর্থনৈতিক সমস্যা তাহার নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের পুনর্গঠনদ্বারা কিরূপে দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে পারা যায় এবং শাসনপ্রণালীর কিরূপ সংস্কার-দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা দৃঢ় করা যায়, এই সমস্ত প্রশ্নের প্রতি তাহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেইজন্য যে দেশে রুসোর আবির্ভাব হইয়াছিল, তথায় ফুরিয়ার, সেণ্ট সাইমন ও কোম্‌ৎও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ফুরিয়ার ও সেণ্ট সাইমন একপ্রকার সাম্যবাদদ্বারা দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেণ্ট সাইমন উত্তরাধিকার-প্রথা রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং এক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মসংঘ ও সার্ব্বভৌম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠারও কল্পনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সংসারকে একসূত্রে গাঁথিবার ইচ্ছায় তিনি ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও অর্থ-বিজ্ঞানকে এক বিজ্ঞানে পরিণত করিবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহারই শিষ্য অগাষ্ট কোম্‌ৎ প্রচার করিলেন ধর্ম্মবিজ্ঞানের যুগ বহুদিন পূর্ব্বে গত হইয়াছে; তাহার পরে আসিয়াছিল দর্শনের যুগ, তাহাও গত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, নিশ্চিত জ্ঞানের যুগ। এ যুগ প্রকৃতির নিয়ম ও জাগতিক ব্যাপারের গবেষণার যুগ।

কুজ়্যাঁ যখন অসীম ও সসীম এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, যখন অগণিত লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহে বক্তৃতা-গৃহে সমাগত হইতেছিল, তখন অগাষ্ট কোম্‌ৎ লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁহার গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন। ১৭৯৮ সালে মণ্ট্ পেলিয়ারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন প্রধান রাজকর-সংগ্রাহক (Receiver General of Taxes) ছিলেন। ১৮১৪ সালে কোম্‌ৎ Ecole Polytechnique নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। লেখা-পড়ায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। দুই বৎসর পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অবাধ্যতার ফলে বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া যায়, একা কোম্‌ৎ গৃহে ফিরিয়া আসেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ কোমতের আদর্শ ছিলেন। তিনি

এক বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিলেন, "আধুনিক কালের সক্রেটিসকে আমি অনুকরণ করিতে চাই—বুদ্ধিবৃত্তিতে নহে, জীবনযাপন প্রণালীতে। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। আমার বয়স এখনও ২০ হয় নাই, কিন্তু আমিও সেই সংকল্প করিয়াছি।" সহস্র বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইয়াও কোম্‌ৎ তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি কিছুদিন এক পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাজ ভাল না লাগায়, তাহা ছাড়িয়া দেন। ১৮১৭ সালের কার্ণিভালের উচ্ছল আমোদের মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে এই সকল আমোদে মগ্ন থাকিয়া কিরূপে যে ভুলিয়া যায়, যে তাহাদের চারিধারে ত্রিশ সহস্র নরনারী একগ্রাস খাদ্যও পাইতেছে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।" ১৮১৮ সালে সেণ্ট সাইমনের সহিত কোম্‌তের পরিচয় হয়। সেণ্ট সাইমনের কাউণ্ট হেনরি ছিলেন বিখ্যাত ডিউক অব সেণ্ট সাইমনের জ্ঞাতিভ্রাতা। এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল ৬০ বৎসর। তাঁহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত এবং নানা অস্বাভাবিক কার্য্যের জন্য তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সমাজের পুনর্গঠনের জন্য তাঁহার নানাবিধ কল্পনা ছিল। তাঁহার সহিত পরিচয়ে কোম্‌ৎ মুগ্ধ হন। উত্তরকালে তিনি গভীর অবজ্ঞার সহিত তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যতদিন তাঁহার সহিত তাহার সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন ছিল, ততদিন তিনি তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার পরও কোম্‌ৎ তাহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "সেণ্ট সাইমনের নিকট আমার ব্যক্তিগত ঋণ খুব বেশী। দর্শনের যে দিকে আমি এখন অগ্রসর হইতেছি এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমি যে পথ পশ্চাতের দিকে না চাহিয়া অনুসরণ করিব, তিনিই আমাকে সে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন।" সেণ্ট সাইমনের গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার চিন্তার সহিত কোম্‌তের দর্শনের সম্বন্ধের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারা যায় এবং কোম্‌তের কতকগুলি মত যে সেণ্ট সাইমনের উর্ব্বর মস্তিষ্কেই প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। রাজনৈতিক ব্যাপার সমূহ অন্য ব্যাপারের মতই যে নিয়মের অধীন এবং দর্শনের প্রকৃত লক্ষ্য যে সামাজিক মঙ্গল, এবং নৈতিক, ধর্ম্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসকলের পুনর্গঠনই যে দার্শনিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত—এই দুই মত কোম্‌ৎ সেণ্ট সাইমনের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেণ্ট সাইমনের অসম্পূর্ণ কতকগুলি ধারণাও কোম্‌তের হস্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে বিরাট কার্য্য কোম্‌ৎ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রেরণা তিনি সেণ্ট সাইমনের নিকট হইতে যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অনস্বীকার্য্য। পরে কোম্‌ৎ সেণ্ট সাইমন-সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক ভাষা ব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু প্লেটোর সম্বন্ধেও তাঁহার মত অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল—যদিও যে আরিষ্টটলকে তিনি দার্শনিকদিগের শিরোমণি বলিয়া গণ্য করিতেন, সেই আরিষ্টটল প্লেটোর সহিত মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহাকে গুরু বলিয়া গিয়াছেন। ছয় বৎসর সেণ্ট সাইমনের সহিত কোম্‌তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পরে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়।

১৮২৫ সালে কোম্‌ৎ বিবাহ করেন। এই বিবাহ সুখের হয় নাই। দাম্পত্যসুখ কোম্‌ৎ লাভ করিতে পারেন নাই। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি গৃহে ছাত্র রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু একজনের অধিক ছাত্র প্রাপ্ত হন নাই। কোনও এক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮২৬ সালে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। হামবোল্ড প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। কিন্তু তিনটি বক্তৃতার পরেই গুরুতর মানসিক শ্রমের ফলে তিনি মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হন। এক বৎসরের অধিক কাল ভুগিয়া তিনি যখন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তাঁহার দুর্ভাগ্যের চিন্তায় এতই বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন, যে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে একদিন সীন নদীর গর্ভে লম্ফ দিয়া পতিত হন। সৌভাগ্যক্রমে লোকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে। ১৮২৮ সালে তিনি বক্তৃতা পুনরায় আরম্ভ করেন এবং ১৮৩০ সালে তাঁহার Positive Philosophyর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৪২ সালে। এই বারো বৎসর কোম্‌তের অবিরাম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই সময় তাহার আর্থিক অবস্থারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালে তিনি Ecole Polytechiniqueএ প্রবেশার্থী ছাত্রদিগের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং গণিতেরও শিক্ষক নিযুক্ত হন। ফলে তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় ৪০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছিল। গীজো যখন লুই ফিলিপের মন্ত্রী, তখন তিনি "বিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপনার জন্য একটি অধ্যাপকের পদসৃষ্টির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, দর্শনের ইতিহাসের জন্য—অর্থাৎ যুগ যুগান্তরের যাবতীয় স্বপ্ন এবং বিপথগামী চিন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনের জন্য—যদি চারিটি অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রগতির ব্যাখ্যার জন্য অন্ততঃ একটি অধ্যাপকের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।" গীজো প্রথম এই প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেও, পরিশেষে ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

কোম্‌তের নীরস কঠোর বাহ্য আচরণের নিম্নে যে উদার সহানুভূতি ও মানবপ্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল, এই সময়ে লিখিত তাঁহার এক পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "যখন কোনও যুবকের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পরীক্ষাপত্র পাই, তখন আমার মনে যে মধুর কোমল ভাবের উদয় হয়, তোমার নিকটও তাহা প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় না। তোমার হয়তো শুনিয়া হাসি পাইবে, কিন্তু প্রবল ভাবরসে আমার নয়ন তখন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে।" ১৮৩১ হইতে ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিনা পারিশ্রমিকে সাধারণের শিক্ষার জন্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন।

১৮৪২ সালে Positive Philosophyর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই তাঁহার স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ হয়। মাসিক বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি স্ত্রীর নিকট হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল কোম্‌তের গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার System of Logre গ্রন্থ-প্রণয়নে তিনি কোম্‌তের অনেক মতের অনুসরণ করিয়াছেন। মিল ও কোম্‌তের মধ্যে পত্র ব্যবহার ১৮৪২ সালের পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছিল। মিল কোম্‌তের অর্থকষ্টের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট হইতে ২৪০ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়া কোম্‌ৎকে পাঠাইয়া দেন এবং যতদিন তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয়, ততদিন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এক বৎসর পরেও যখন দেখা গেল কোম্‌ৎ তাঁহার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টাই করেন নাই, তখন মিলের বন্ধুগণ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। মিল প্রস্তাব করেন, যে কোম্‌ৎ ইংরেজি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন এবং মিল সেই প্রবন্ধ ফরাসী ভাষা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া দিবেন। কোম্‌ৎ প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ; কিন্তু পরে মিলের বন্ধুদিগকে তাঁহার সাহায্যে অস্বীকৃতির জন্য তিরস্কার করিয়া মিলের নিকট এক পত্র লেখেন। পত্র পাইয়া মিল বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কোম্‌তের অর্থকৃচ্ছ্রতা ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। স্ত্রীকে বৎসরে দুইশত পাউণ্ড দিতে হইত, তাহার উপর ১৮৪৮ সালে তাঁহার বেতনও বিনা দোষে মাত্র ৮০ পাউণ্ডে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অবস্থায় কোম্‌তের কয়েকজন বন্ধু তাঁহার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। জানিতে পারিয়া মিল ইংলণ্ড হইতে কিছু অর্থ প্রেরণ করেন। ১৮৪৫ সালে Madame Clotilda de Vaux নামক এক মহিলার সহিত কোম্‌ৎ পরিচিত হন। এই মহিলার স্বামী কোনও অপরাধে চিরজীবনের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। Madame Vaux সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। কোম্‌ৎ তাহার রচনার অপরিসীম প্রশংসা করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এক বৎসর মধ্যেই madameএর মৃত্যু হয়। কোম্‌তের মনে তাঁহার প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। প্রতি বুধবারে তিনি তাঁহার সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় তাঁহার প্রতি স্বীয় শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। কোম্‌তের শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন যে বিয়াত্রিসের প্রতি দান্তের প্রীতির প্রতি জগৎ যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কালে Madame Vaux এর প্রতি কোম্‌তের প্রীতিও তেমনি জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

Positive Philosophy সম্পূর্ণ হইবামাত্রই কোম্‌ৎ System of Positive Polity রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথমোক্ত গ্রন্থ শেষোক্ত গ্রন্থের ভিত্তি ; তাহাতে ব্যাখ্যাত তত্ত্বের উপর শেষোক্ত গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫২ সালে Positive Polityএর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ; শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়, ১৮৫৪ সালে। ১৮৪৮ সালে যখন ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নূতন আশা ও উৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়াছিল, তখন কোম্‌ৎ Positive সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব যেরূপ Jocobin Club কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সেইরূপ এই নূতন সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন। কোম্‌তের আশা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া, এক নূতন প্রকার ধর্ম্মীয় সংঘের, (church) সৃষ্ট করিয়াছিলেন। ১৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫১ সালে কোম্‌ৎ যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি তাঁহার সমগ্র দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেরও বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। শেষ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন "অতীত ও ভবিষ্যতের নামে মানবজাতির দার্শনিক এবং উৎসাহী ভৃত্যগণ জগতের পরিচালনা ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদের প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নীতি, বিদ্যা ও সাংসারিক জীবন—প্রত্যেক বিভাগেরই সুব্যবস্থিত মঙ্গল সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই জন্য ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এবং ডি-ইষ্ট (Deist) সকল ধর্ম্মের ঈশ্বর-ভৃত্যদিগকে তাঁহারা রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিতে ইচ্ছুক।" ইহার অনতিকাল পরেই লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত

আগষ্ট কোম্‌ৎ

হইয়াছিলেন এবং সাংসারিক, নৈতিক ও বিদ্যা সংক্রান্ত সর্ব্বব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৫২ সালে কোম্‌তের Catechism of Positivism (Positive ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর মালা) প্রকাশিত হয়। ইহার উপক্রমণিকায় তিনি লুই নেপোলিয়নের সম্রাটপদবী এবং পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন সমর্থন করেন। ইহার পরে তিনি রুসিয়ার সম্রাট নিকোলাসকে খৃষ্টীয় জগতে একমাত্র রাজনীতিবেত্তা বলিয়া অভিনন্দিত করেন।

১৮৫৭ সালে কোম্‌ৎ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং ঐ বৎসর ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ফরাসী এবং ইংরেজ-

শিষ্যগণ প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু দিবসে সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

কোম্‌তের দর্শনের প্রধান কথা তিনটি :—(১) প্রথমতঃ মানব-জ্ঞানের তিনটি ক্রমের ব্যাখ্যা ; ধর্মতাত্ত্বিক (Theological) ক্রম, দার্শনিক (metaphysical) ক্রম এবং যান্ত্রিক অথবা বৈজ্ঞানিক ক্রম। এই শেষোক্ত ক্রমকে কোম্‌ৎ নিশ্চিত (positive) ক্রম বলিয়াছেন। (২) দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান সকলের শ্রেণী-বিভাগ এবং তাহাদের সংহতিকরণ (৩) তৃতীয়তঃ এই সংহত বিজ্ঞানের উপর ঈশ্বর-বর্জিত এক নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞানের ক্রমাবলী : ধর্মতাত্ত্বিক ক্রমে মানুষ প্রত্যেক ঘটনার কারণের অনুসন্ধান করে এবং প্রত্যেক ব্যাপারকে প্রকৃতির বহিস্থ কোনও কর্ত্তার কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই যুগে মানুষের অনুভূতি থাকে প্রবল, এবং মানুষ প্রথমে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অবস্থিত এক একটি চেতন শক্তির কল্পনা করে ; (Fetichism)। এই কল্পনা পরে বহু দেববাদে এবং সর্ব্বশেষে একেশ্বরবাদে পরিণত হয়। এই একেশ্বরবাদদ্বারা জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়। দার্শনিক যুক্তি ক্রমে প্রাধান্যলাভ করে ; পূর্ব্ব যুগে কল্পিত দেবতাগণের স্থান অধিকার করে শক্তি-নামক সূক্ষ্ম বস্তু। এই সকল শক্তি নিয়মানুসারে প্রকাশিত হয় দেখিয়া, তাহারা যে বস্তুর বহিস্থ কোনও দেবতার ক্রিয়া নহে, পরন্তু বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত, এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এবং এক ঈশ্বর এই সকল শক্তির আধাররূপে কল্পিত হন। (৩) নিশ্চিত যুগে বস্তুর কারণও স্বরূপের অনুসন্ধান বৃথা বলিয়া গণ্য হয় ; এবং ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য এবং সাদৃশ্যের সম্বন্ধানুসারে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ এবং শ্রেণীবন্ধনের মধ্যেই অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ হয়। কোম্‌তের মতে সমস্ত জ্ঞানই আপেক্ষিক ; প্রতিভাস ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। প্রথম কারণ এবং চরম উদ্দেশ্যের কোনও অর্থ নাই। যে সমস্ত তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা লইয়াই মনের কারবার এবং পর্য্যবেক্ষণ এবং আরাধ্য প্রণালার সাহায্যে প্রকৃতির নিয়মাবলীর আবিষ্কার এবং শৃঙ্খলা বন্ধনই মানুষের খাঁটি লক্ষ্য হইবার উপযুক্ত।

কোম্‌তের পূর্ব্বে টার্গো (Turgo) মানবীয় ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে পূর্ব্বোক্ত তিন ক্রমের উল্লেখ করিয়াছিলেন। হিউম্‌ ঘটনাসকলের মধ্যে নিয়মানুসারী অনুবর্ত্তন এবং সাদৃশ্যকেই সত্য জ্ঞানের সারভূত অংশ বলিয়াছিলেন। ইহাতে কোম্‌তের মৌলিকতা না থাকিলেও, তিনি টারগো এবং হিউমের মতের সহিত অন্যান্য বহু মতের সমবায়ে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে এক বিরাট মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কোম্‌ৎ প্লেটোকে অবজ্ঞা করিতেন এবং আরিস্টটলকে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দার্শনিক বলিয়া সম্মান করিতেন। কিন্তু আদর্শ জীবনের অনুকূল করিয়া সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য তিনি জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য BENN তাঁহাকে মূলতঃ প্লেটোপন্থী বলিয়াছেন। সমাজের পুনর্গঠন তাঁহার দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—, এই অর্থে—ধ্বংসবাদী প্রাক্‌-বিপ্লবী দর্শন হইতে তাহা ভিন্ন। কোম্‌ৎ তাঁহার দর্শনকে যে Positive নাম দিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ—তাহার দর্শনের কারবার প্রকৃত তথ্যের (facts) সহিত, কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিজ্ঞানের সম্বন্ধ কল্পনা এবং বস্তুবর্জিত গুণের (abstraction) সহিত।

Positive Philosophy রচনায় কোম্‌তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—সমাজ বিজ্ঞানকে পূর্ব্বোক্ত তিন ক্রমের শেষোক্ত ক্রমে উন্নীত করা—ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কুহেলিকা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা, যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইতে আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন এবং শারীর-বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রবর্ত্তন করা।

বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ : স্থূল ও সূক্ষ্ম (concrete and abstract) ভেদে কোম্‌ৎ বিজ্ঞানদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল বিজ্ঞান দেশ ও কালে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা সকলের আলোচনা করে, তাহারা স্থূল। এই সকল ঘটনা যে সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত, তাহারা যে সকল বিজ্ঞানের বিষয়, তাহারা সূক্ষ্ম। শেষোক্ত শ্রেণীর বিজ্ঞানের সহিতই দর্শনের সম্বন্ধ। সূক্ষ্ম বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে কোম্‌ৎ নিজের সৃষ্ট বলিয়া দাবি করিয়াছেন। সমাজ বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য প্রাণ-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানও আবশ্যক বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু কোম্‌ৎ মনোবিজ্ঞানকে ভ্রান্তি-বিচ্ছুরিত বলিয়াছেন এবং তাহার স্থানে করোটি-বিজ্ঞানকে (Phrenology) স্থাপন করিয়াছেন। প্রাণ-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য রসায়নের জ্ঞান আবশ্যক, এবং রসায়নের জন্য আবশ্যক ভৌতিক-বিজ্ঞান। ভৌতিক-বিজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্যা এবং সকল বিজ্ঞানের মূলে গণিত। গণিতকে কোম্‌ৎ গণনামূলক (calculus) এবং জ্যামিতি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে কোম্‌ৎ নীতিশাস্ত্রকে (morality) একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়া সমগ্র বিজ্ঞানতন্ত্রের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিজ্ঞান সকলের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা স্থূল বিজ্ঞান। সুতরাং সূক্ষ্মবিজ্ঞানের মধ্যে তাহাকে গণ্য করা উচিত হয় নাই। অন্তরীক্ষে সংঘটিত ব্যাপার সকলের অনুশীলন হইতে ভৌতিক বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই জন্যই জ্যোতিবিজ্ঞান সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত যুক্তিতে ভূ-বিজ্ঞানও (Geology) উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কেননা প্রাণের অভিব্যক্তি ভূ-বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূ-গর্ভস্থ জীবকঙ্কাল প্রভৃতি হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(১) গণিত, (২) জ্যোতির্বিজ্ঞান, (৩) ভৌতিক বিজ্ঞান, (৪) রসায়ন, (৫) প্রাণীবিজ্ঞান ও (৬) সমাজবিজ্ঞান—এই পর্য্যায়ে কোম্‌তের বিজ্ঞানতন্ত্র গঠিত। এই শ্রেণীর প্রত্যেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান হইতে অধিকতর বিশিষ্ট (Special), এবং প্রত্যেকেই পূর্ব্ববর্ত্তী সকল বিজ্ঞানের তথ্যের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান সকলের জ্ঞান ব্যতীত কোনটিই বুঝিতে পারা যায় না। মানব-সমাজের ব্যাপারই উপরোক্ত শ্রেণীর শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞানের বিষয়। অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা এই বিজ্ঞান দীর্ঘতর কাল ধর্ম্মীয় ও দার্শনিক মতের প্রভাবের অধীন থাকিবে এবং সকলের শেষে Positive ক্রমে উপনীত হইবে। (ক্রমশঃ)

আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলন ও বিশ্ব-বাণিজ্য

শ্রীব্রজবল্লভ রায়

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর উন্নত মানব-সমাজ ও উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে শিল্প উন্নয়ন করণে বৈদেশিক বাণিজ্য একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে। দেশের শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কৃষি এবং যানবাহন ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বৃটেন শিল্প বাণিজ্যে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। তার এই শিল্প বাণিজ্য বিস্তারের মূলে রয়েছে তার বৈদেশিক বাণিজ্য।

১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্ব অর্থ নৈতিক সঙ্কটের পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ উৎপাদন অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটল। পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করতে বিভিন্ন দেশসমূহ নিষেধাত্মক শুল্ক, মুদ্রানীতি, অবরোধ, ক্ষতিস্বীকার করে বিদেশের বাজারে মাল বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করল।

১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং পরবর্ত্তী দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের পথে মস্তবড় বাধা হয়ে দাঁড়ালো—আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রম-অবনতি ঘটতে লাগল; বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে অন্যান্য অর্থ নৈতিক সম্বন্ধের মত বিশ্ব-বাণিজ্যও মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সাধারণ মানুষের জীবনে এনেছে চরম অভিশাপ; শত সহস্র মানুষকে হত্যা করেছে, সমস্ত দেশের মানুষের জীবনে এনেছে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দ্দশা, ধ্বংস করেছে বহু যুগ ধরে মানুষের মেহনত দিয়ে গড়া অসংখ্য দ্রব্য সম্ভার; বিধ্বস্ত করেছে হাজার হাজার সহর এবং পল্লী-সমাজ, কলকারখানা ও কৃষি কেন্দ্র।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি পৃথক এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের বিশ্ব বাজার। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ইউরোপীয় জনগণের গণতন্ত্র জার্ম্মান জনগণের রিপাব্লিক ইত্যাদি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি বিশ্ব বাজার। এই বিশ্ব বাজারের মধ্যে প্রাণবন্ত বাণিজ্য এগিয়ে চলেছে ও সর্ব্বসাধারণের উন্নতির ভিত্তিতে সাধারণ বাণিজ্যব্যবস্থা চালু হচ্ছে, আর এই সমস্ত দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক জগতে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমতে আরম্ভ করেছে, আর লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে প্রথম-উক্ত বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ক্রম-অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে আটলান্টিকঅনুগত দেশসমূহের প্রভেদাত্মক বাণিজ্য নীতি—ও অর্থ-নৈতিক অবরোধ নীতি।

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন ও ইউরোপীয় জনগণের গণতন্ত্র সমূহকে আটলান্টিক অনুগত দেশসমূহ থেকে পৃথক করে রাখার চেষ্টার ফলে সাধারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাধারণ বাণিজ্য ব্যবস্থা বাধা পাওয়াই কাঁচা মালের অভাব। পণ্য বিক্রয় বাজারের অভাবে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমাতে হচ্ছে; দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে; আর সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আরম্ভ করেছিল। এতে করে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, শীঘ্রই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পূর্ব্বের মত আবার উন্নতি লাভ করবে; কিন্তু এই আশা আর পূর্ণ হয়ে উঠল না।

অধুনা কয়েক বৎসরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রম-অবনতি ঘটেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কমে গেছে, নিষেধাত্মক এবং প্রভেদাত্মক বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার মান দ্রুত অবনতির পথে চলেছে। বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে এতদিনের যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল আজ তা ভেঙ্গে পড়তে বসেছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে লেনদেন সম্পর্ক দারুণভাবে ব্যাহত হতে বসেছে!

১৯৫০ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হতেই ইউরোপ এবং আমেরিকার বাণিজ্য এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

রণসজ্জা এবং রণসজ্জার প্রয়োজনে যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন সেইগুলি (যথা মাংস, মাখন, কপি, চা ইত্যাদি) যাহা শান্তির সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাজারে আমদানি হতে পারত, সেগুলি মজুত হতে থাকে।

কাঁচা মাল মজুত করবার মানসে কতিপয় বড় বড় দেশ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এবং দুর্মূল্য কাঁচামাল ও ধাতুদ্রব্য রপ্তানি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে। এর ফলে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সৃষ্টি হয় "কাঁচা মালের দুর্ভিক্ষ।" বিশ্ব বাণিজ্য বাজারে জিনিষপত্রের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল। সমরজনিত অর্থনীতি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মুদ্রাস্ফীতি চরম পর্য্যায়ে পৌছিল এবং করের পরিমাণ বাড়ল, আর বেকারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল। ইহা শুধুমাত্র শ্রমিক, কৃষক এবং অফিস-কেরাণীদের জীবনেই দুঃখ দুর্দ্দশা আনল না, উপরন্তু শত সহস্র ক্ষুদ্র এবং মাঝারী ধরণের শিল্পপতিদের কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

সবার মনে আজ ঐ এক জিজ্ঞাসা—বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ কি? যুদ্ধপূর্ব্বের অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল না?

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শঙ্কা দূর করতে ১৯৫২ সালের ৩রা এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মস্কো নগরীতে এক আন্তর্জাতিক অর্থ-

নৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—যাতে করে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্থিক সংযোগ স্থাপন করে বিশ্ব মানবের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, ট্রেডইউনিয়ন নেতা, আর সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীবৃন্দ।

অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা গ্রেট-বৃটেন অধিক বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। এমনকি আজ পর্য্যন্ত যখন খাদ্য সামগ্রী নিয়ন্ত্রিত এবং খাদ্যের জোগান কম তখনও গ্রেটবৃটেন তার মোট প্রয়োজনের শতকরা ৬০ ভাগ খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে। এছাড়া গ্রেটবৃটেন প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। এই সমস্ত আমদানি-কৃত পণ্যের দাম দিতে গ্রেট বৃটেনকে তার উৎপাদন মাত্রা চরম পর্য্যায়ে বাড়াতে হয়েছে। ১৯৫১ সালে গ্রেটবৃটেন তার মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করেছে, এর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ হল শিল্প-উৎপন্ন পণ্য।

বিশ্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রম-অবনতি দূর করতে এরূপ একটি অর্থ-নৈতিক সম্মেলনের প্রয়োজন অনেকদিন থেকে অনুভূত হচ্ছিল। মস্কো সম্মেলন নির্জলা অর্থ-নৈতিক সম্মেলন। এখানে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা রাজ্যসরকারসমূহের প্রতিনিধি ছিলেন না—আর এই কারণেই তাঁরা অধিক স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে মতামত প্রকাশ করতে পেরেছেন। এরা সবাই বিশেষজ্ঞ, আর সমস্যা সমাধান করতে এরা সবাই সচেষ্ট। সাধারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা রক্ষা করতে প্রয়োজন হয় জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ জনসাধারণের যুগ্ম প্রচেষ্টা।

এই সম্মেলনে সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে, বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। এই পরিবর্দ্ধিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বৃহত্তর জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে সমস্ত দেশের আর্থিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা দিবে, এবং কর্ম্ম নিয়োগের ব্যবস্থা করবে ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। এই সম্মেলনে জমায়েত প্রতিনিধিগণ দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন যে, অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্য আন্তর্জাতিক অর্থ-নৈতিক বাণিজ্য সম্বন্ধ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, কেননা ইহা সমানাধিকার এবং পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন ব্যবসায়ী—এখানে তারা স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা চালাতে সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন—আর এই সঙ্গে বাণিজ্য লেনদেন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বৃটিশ যোগদানকারিগণ ১২ই এপ্রিল প্রচার করেছেন যে তারা চীন পিপলস্ রিপাব্লিক, রোমানিয়া, জার্ম্মান ডিমোক্রাটিক রিপাব্লিকের প্রতিনিধিদের সহিত উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, আর সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া ও অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাবার জন্য আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। ফরাসী প্রতিনিধিগণ চীনের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এছাড়া ফরাসী প্রতিনিধিগণ পূর্ব্ব জার্ম্মান দেশসমূহের সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এর ফলে ফ্রান্স চিনি, কাঠ, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা ইত্যাদি পাবে। ফ্রান্স জার্ম্মানীকে জোগান দিবে ফল, কপি, কোকো, মদ, টিনের মাছ, উল এবং অন্যান্য দ্রব্য সম্ভার।

সোবিয়েৎ বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষ, ইন্দোনেসিয়া, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পোলাণ্ড, মালয় এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়ার দেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে ও সেই সম্বন্ধ উন্নত করতে প্রস্তুত আছে। ভারতের কয়েকটি শিল্প যেমন পাট, চা ইত্যাদি চরম দুরবস্থার মধ্যে পতিত। ডলার এবং ষ্টার্লিং এলাকায় এই সমস্ত শিল্পের চাহিদা কমে গেছে। সোবিয়েৎ রাসিয়া, চীন ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাতে পারলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের দুরবস্থা বহুল অংশে দূর হবে। ভারতবর্ষ চা, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, হাড়, লঙ্কা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহকে জোগান দিতে পারে। দেনা পাওনা সম্বন্ধেও চিন্তার কোন কারণ নাই। কারণ সোবিয়েৎ রাশিয়া, চীন ইত্যাদি রাষ্ট্র সব সময়ই পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাতে প্রস্তুত।

শিল্প উন্নয়নের জন্য ভারতে আজ প্রচুর কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এই সমস্ত কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতিও ভারত—রাশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশ থেকে অধিকতর সস্তা দামে আমদানি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার এবং পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে সমস্ত অন্তরায় আছে সেগুলি দূর করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমেরিকা—চীন জনগণের রিপাব্লিককে আজও স্বীকার করে নেয় নি! বৃটেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন করবার নির্দেশ দিয়েছে। ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিস্তারের পথে একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি রাজ্য সরকার যুদ্ধ পুণঃসজ্জা এবং প্রভেদাত্মক বাণিজ্য নীতি অবলম্বন করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে এবং অনেক দেশের জীবনযাত্রার মান নিচু হয়ে পড়েছে। অর্থ নৈতিক অনুন্নত দেশসমূহের উপর ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এই সমস্ত অসুবিধা দূর করতে হলে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা—যাহা অধুনা সীমাবদ্ধ করে আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বক্ষে ফিরে আসবে সুখ শান্তি, সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে—মুদ্রা-স্ফীতির বিভীষিকা দূর হবে—আর দূর হবে এই সঙ্গে বেকার সমস্যা। সাধারণ জনগণের মুখে ফুটে উঠবে প্রশান্তির হাসি। আমরা সেই সুদিনের মুখ চেয়ে বসে আছি।

কলম

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত এম্-আর-এ-এস

প্রায় যাবতীয় উদ্ভিদেরই বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়, আবার কোন কোন উদ্ভিদের বীজ দ্বারা চারা উৎপন্ন হওয়া সত্বেও গোড়া হইতে ধাবক-শাখা (Runners) নির্গত হইয়া মাটীর উপর দিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থি হইতে শিকড় বিস্তার করে এবং তথা হইতে একটী নূতন চারার উদ্ভব হয়। কচু গাছ ও ষ্ট্রবেরীর ধাবক-শাখা ইহার উদাহরণ স্থল। উল্লিখিত দুই প্রণালীতে উদ্ভিদ স্বাভাবিকভাবে বংশ বিস্তার করে, ইহা ছাড়া কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়াও উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করা যাইতে পারে; যে উপায় দ্বারা উদ্ভিদের ঐরূপ কৃত্রিমভাবে বংশ বিস্তার করা হয়, চল্‌তি কথায় তাহাকে গাছের কলম করা বলে।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে বীজ হইতেই যখন চারা উৎপন্ন হয় তখন কৃত্রিম উপায়ে কলমের চারা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন কি? বীজের গাছ এবং কলমের গাছের তফাৎ এই যে—বীজের গছের ফল অনেক সময়ে তাহার বৃক্ষের ফলের সমগুণ বিশিষ্ট হয় না, বিশেষতঃ স্থানের পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ একদেশের ফলের বীজ অন্যদেশে লইয়া যাইয়া চারা উৎপাদন করিলে তাহাতে ফল অনেক স্থলেই নিকৃষ্টতর হইয়া থাকে; কিন্তু কলমের গাছে ঐরূপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব অল্প। পক্ষান্তরে বীজের গাছ ফলবান হওয়ার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু কলমের গাছ আশু ফল-প্রসূ হইয়া থাকে; এই সকল সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণ ফলকর গাছের জন্য বীজের গাছ অপেক্ষা কলমের গাছই পছন্দ করিয়া থাকে!

সাধারণতঃ কলমের চারা প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রণালী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(১) শাখা কলম (Cuttings)
(২) গুটী কলম (Gootee)
(৩) দাবা কলম (Layering)
(৪) জোড় কলম (Inarch grafting)
(৫) জিব কলম (Tongue grafting)
(৬) গোঁজ কলম (Wedge grafting)
(৭) গদি কলম (Saddle grafting)
(৮) টেরচা কাটা জোড় কলম (Whip grafting)
(৯) চোক কলম (Budding)
(১০) পার্শ্ব কলম (Side grafting)
(১১) চোঙ্গ কলম (Tube grafting)
(১২) গুঁড়ি কলম (Crown grafting)

(১) শাখা কলম (Cutting)

গাছের শাখার কাটিং দ্বারা গোলাপ, জবা, জুঁই, বেলা প্রভৃতি ফুলের গাছের কলম হইতে পারে; মাদার, সজিনা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ জাতীয় বড় গাছেরও বংশ বিস্তার হইতে পারে; কিন্তু আম, লিচু প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের কলম ঐ প্রণালীতে সম্পাদিত হইতে দেখা যায় না এবং যে সকল স্থানে ঐ প্রণালী অবলম্বনে ফলবান বৃক্ষের কলম প্রস্তুত করিবার জন্য অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, উহার কোন স্থানেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শাখা কলম করিতে হইলে গাছের অর্দ্ধ-পরিপক্ব শাখা বাছিয়া লইয়া ঐ গুলি হইতে ৮।১০ অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা এক একটী গুলি কাটিয়া লইতে হইবে, প্রত্যেক খণ্ডের গায়ে একাধিক গ্রন্থি-সংলগ্ন চোক থাকা প্রয়োজন, ছায়াযুক্ত স্থানে হাপর প্রস্তুত করিয়া ঐ হাপরের মধ্যে ৪ হইতে ৬ আঙ্গুল শাখার পণ্য (cutting) গুলি দক্ষিণ দিকে একটুকু হেলানো ভাবে রোপণ করিতে হইবে, ঐ শাখা খণ্ডগুলি রোপণের পূর্ব্বেই পত্রহীন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, স্থানান্তরিত করা উচিত নহে, হাপর হইতে কলম কিছু মাটী সহ অতি সন্তর্পণে তুলিয়া মাটী সহ লইয়া উদ্যানে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়।

(২) গুটী কলম (Gootee)

গুটি কলমের জন্য গাছের এক ইঞ্চি কিংবা দেড় ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট সতেজ ফলবান শাখা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, ঐরূপ শাখার কোন একটী গ্রন্থির নিম্নভাগের ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমাণ বল্কল এমন ভাবে জড়াইয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে যেন ঐ ছালের নিম্নে কাষ্ঠে কোন প্রকার আঘাত না লাগে; এই কার্য্য করিতে হইলে প্রথমতঃ শাখা গ্রন্থির নিম্নে একখানি ধারাল চাকু দ্বারা শাখা বেষ্টন করিয়া একটি দাগ কাটিতে হইবে এবং ঐ দাগের ২।৩ অঙ্গুলি নিম্নে ঐরূপ শাখা বেষ্টন করিয়া দ্বিতীয় আর একটী দাগ কাটিয়া লইবে; তৎপর ঐ দুই দাগের মধ্যস্থলে সোজাসুজি আর একটি দাগ কাটিয়া ঐ দাগের ফাঁকে ছুরীর সূক্ষ্ম মাথা চালাইয়া দিয়া কলা-গাছের পেটো তুলিবার ন্যায় কৌশলে ছালটি তুলিয়া ফেলিবে।

ইহার পর সম-পরিমাণ কর্দ্দম ও গোবর মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রিত মৃত্তিকা উল্লিখিত কর্ত্তিত স্থানে দুই ইঞ্চি পুরুভাবে গুটির আকারে সংযোজিত করিয়া দিবে এবং ঐ মাটী এক খণ্ড চট দ্বারা বেষ্টন করিয়া, পাট কিংবা শনের সূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। তৎপর ঐ গুটির ভিতরের মাটি সর্ব্বদা রসযুক্ত রাখিবার জন্য উহার উপর জল ঝরার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। ভাণ্ডের তলদেশে একটী মাত্র ছিদ্র করিয়া ঐ পথের মধ্য হইতে ৫।৬ অঙ্গুলি লম্বা এক গুচ্ছ পাটের আঁশ ঐ ছিদ্র-পথে এমন ভাবে বাহির করিয়া দিতে হইবে যেন ঐ গুচ্ছটী বাহির হইতে টানিলেও খুলিয়া না আসে, গুচ্ছটি পত্রের ভিতর দিকের মাথায় একটী গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিলেই ঐ কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে।

এখন ঐ পাত্রটি গুটির উপরিভাগে এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে যেন পাত্রটি জলপূর্ণ করিয়া দিলে উহার তলস্থ ছিদ্রপথে উল্লিখিত পাটের গুচ্ছটি বাহিয়া গুচ্ছটির উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতে পারে। পাত্রটি ঠিক গুটির উপরিভাগে ঝুলাইবার বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে উহার নিকটবর্ত্তী কোন উচ্চ শাখাতে ঝুলাইয়াও গুটিতে জল সঞ্চালিত হওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়; এই ক্ষেত্রে পাত্রটি ছিদ্রসংলগ্ন উল্লিখিত পাটের গুচ্ছটি দীর্ঘ রাখিয়া উহার অগ্রভাগ দ্বারা গুটিকাটী বেষ্টন করিয়া রাখিলেই ঐ গুচ্ছ বাহিয়া জল গুটিতে চলিয়া আসিবে, গুচ্ছটি পাত্রের তলদেশ হইতে গুটি পর্য্যন্ত ঠিক এক সরল রেখাতে থাকা দরকার; কোন প্রকার নীচের দিকে লোলিত হইয়া পড়িলে জল গুটিতে পৌঁছাইতে পারিবে না, তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে—গুটী ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হইয়া থাকে, শিকড় গুলি একটু পোক্ত হইলে গুটির নিম্নভাগে শাখাটি ৫।৭ দিন অন্তর ক্রমে অল্প অল্প কাটিয়া কলমটি গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে।

(৩) দাবা কলম (Layering)

সাধারণতঃ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ অর্থাৎ যাহাদের শাখা প্রশাখা স্বভাবতই মৃত্তিকার নিকটবর্ত্তী থাকে এবং চেষ্টা করিলে মৃত্তিকাতে দাবিয়া দেওয়া যায় ঐ সকল উদ্ভিদের পক্ষে দাবা কলম করা সহজসাধ্য। বৃহৎজাতীয় বৃক্ষ সকলের শাখা, কারণাধীনে মৃত্তিকা সন্নিধানে থাকিলে তদ্দ্বারা দাবা-কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে. ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে আম্র বৃক্ষের কয়েকটী দাবা-কলম প্রস্তুত করা বিষয়ে সাফল্য লাভের সংবাদ পাওয়া যায়—বৃহৎ জাতীয় ফলকর বৃক্ষের পক্ষে দাবা-কলম অপেক্ষা জোড় ও গুটি কলম করাই নানা কারণে সুবিধাজনক।

কলম প্রস্তুত পদ্ধতি—একখানা পরিপক্ক অথচ সহজে নমনীয় শাখা নির্ব্বাচন করিয়া উহার মাথার দিকের কোন একটি কুঁড়ির উপরিভাগ হইতে গুটি কলমের ন্যায়, দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ ত্বক্ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, তৎপর শাখাটি বাঁকাইয়া আনিয়া উল্লিখিত ক্ষত স্থানটি মৃত্তিকার ৩।৪ অঙ্গুলী নিম্নে দাবিয়া দিতে হইবে, শাখাটি মৃত্তিকা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত উহার উপরিভাগ কোন প্রকার ভারি বস্তুর দ্বারা চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মাটী চাপা দেওয়া স্থলে মাঝে মাঝে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিলেই ৩।৪ মাসের মধ্যে শিকড় বাহির হইবে, তৎপর ঐ কলম অন্যান্য কলমের ন্যায় অন্ততঃ দুই সপ্তাহ ব্যাপী ক্রমে ক্রমে কাটিয়া গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হইবে, কলম স্থানান্তরিত করিবার সময় উহা অধিক মাটীসহ এমন ভাবে তুলিয়া লইতে হইবে যেন শিকড়গুলি মাটী হইতে আলগা হইয়া না যায়।

(৪) জোড় কলম (Inarch Grafting)

এদেশে আম গাছের জন্য সাধারণতঃ জোড় কলম করা হইয়া থাকে; জোড় কলম করিতে হইলে যে জাতীয় গাছের কলম করিতে হইবে তাহার সমজাতীয় একটি বীজ-জাত চারা টবে উৎপাদন করিয়া চারাটি ২।৩ বৎসর বয়স্ক হইলে যে গাছের কলম করিতে হইবে তাহার একটী নির্ব্বাচিত শাখার নিকটে টব সহ স্থাপন করিতে হইবে। এই কার্য্য একখণ্ড বাঁশ দ্বারা সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, একখণ্ড বাঁশের একদিকের মাথায় ১ ফুট পরিমাণ স্থান কতকগুলি সমান অংশে চিরিয়া লইবে এবং ঐ স্থানের মধ্যে টবটি দৃঢ়ভাবে বসাইয়া বাঁশের গোড়ার দিক এমন ভাবে মাটিতে পুঁতিয়া দিবে যেন টব শুদ্ধ চারাটি গাছের নির্ব্বাচিত শাখার সম্মুখীনভাবে সংলগ্ন হইয়া স্থাপিত হয়; এখন ঐ পরস্পর সম্মুখীন শাখার ও চারার কাণ্ডস্থিত ছাল ৩ ইঞ্চি পরিমাণে লম্বা সিকি ইঞ্চি পরিমাণে চওড়া আয়তনে কিছু কাঠ সহ চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত শাখা ও চারার চাঁচা স্থান পরস্পর সংযোগ করিয়া শন অথবা পাট দ্বারা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিবে, বায়ু পথ রুদ্ধ করিবার জন্য ঐ বন্ধনীর উপরে এক টুক্‌রা মোম মাখান কাপড় * জড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, চারার গোড়ায় ৬ ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চির উপর বেশী উপরে জোড় বাঁধা উচিত নহে, এইরূপ বাঁধিয়া রাখিলে ২।৩ মাসে চারা ও শাখাতে জোড়া লাগিয়া যাইবে, তখন ঐ জোড়ার নিম্নভাগে শাখাটি প্রথমে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ কাটিয়া রাখিবে। পরবর্ত্তী সপ্তাহে আরও এক চতুর্থাংশ এবং এইরূপে চারিধারে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া গাছ হইতে কলমটি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে, ইহার পর জোড়ার উপরিস্থিত চারার মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেই জোড়-কলম প্রস্তুত হইল।

এই প্রণালীতে প্রস্তুত-করা কলম কয়দিন টবে রাখিয়া জল সিঞ্চনের পর টব ভাঙ্গিয়া অথবা সম্ভব হইলে না ভাঙ্গিয়া মাটী সহ খুলিয়া লইবে এবং রোপণ করিবে, রোপণ করিবার সময় জোড়ার অংশটি পর্য্যন্ত মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। কলম স্থায়ীভাবে মাটীতে বসাইবার পরে বৃষ্টি না থাকিলে আবশ্যক অনুযায়ী ২।১ মাস পর্য্যন্ত জল সিঞ্চনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৫) জিব-কলম (Tongue grafting)

জিব-কলম জোড়-কলমেরই রূপান্তর মাত্র, জোড় কলমের চারা চাঁচিয়া ফেলিতে হয় কিন্তু জীব কলমের এইরূপ চাঁচিয়া ফেলার পরিবর্ত্তে চারা ও শাখার গায়ে পরস্পর বিপরীতমুখী বাংলা বর্ণমালার মাত্রাহীন দ অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট খাঁজ কাটিয়া লইতে হয় এবং ঐ খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া জোড়-কলমের অনুরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়। জিব-কলমের জোড়া বেশ শক্ত হইয়া থাকে কিন্তু ঐ কলম প্রস্তুত করা কিছু আয়াসসাধ্য।

(৬) গোঁজ কলম (Wedge grafting)

গোঁজ-কলম জোড়-কলমের রূপান্তর মাত্র. গোঁজ-কলম করিতে হইলে টবে সৃজিত চারা গাছটীর মাথার দিক একবারে কাটিয়া ফেলিয়া দিবে এবং গোড়ার অংশের মাথাটি দুই পাশ হইতে চাপিয়া ফেলিয়া উহা কুঠারীর ফলার আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া লইবে। তৎপরে যে গাছের কলম করিবে সেই গাছ হইতে ঐ চারার সমান ব্যাসবিশিষ্ট একটি শাখা কাটিয়া

* এক ভাগ মোম, দুই ভাগ রজন চূর্ণ এবং অর্দ্ধভাগ তিসির তৈল অথবা চর্ব্বি এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া আগুনের উত্তাপে গলাইয়া লইবে; পরে উহা গরম থাকিতেই টুকরা কাপড়ে মাখাইয়া লইতে হইবে।

লইবে এবং ঐ শাখার গোড়াতে পূর্ব্বলিখিত চারার কুঠারীর আকৃতি-বিশিষ্ট কাটা স্থানের সমান মাপে উহার বিপরীতভাবাপন্ন অর্থাৎ ইংরাজী বর্ণমালার V অক্ষরের অনুরূপ একটী খাঁজ কাটিয়া লইবে; তৎপরে ঐ খাঁজের ভিতর চারার কাটা স্থান সংযোগ করিয়া দিবে এবং সংযুক্ত স্থানে মোম-মাখান ন্যাকড়া জড়াইয়া উত্তমরূপে সুতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে, আবশ্যক হইলে বিপরীত ভাবেও জোড়া দেওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ চারাতে V আকৃতিবিশিষ্ট খাঁজ এবং শাখাতে কুঠারীর ফলকাকৃতি গোঁজ কাটিয়া লওয়া যায়। সাধারণ জোড় কলমে মাত্র একপাশে জোড়া লাগে; কিন্তু গোঁজ কলমে দুই পাশ এবং তলা এই তিন স্থলে জোড়া লাগিয়া থাকে, সুতরাং এই কলম দ্বারা বিশেষ সাফল্য লাভ করা যায়।

(৭) গদী কলম (Saddle grafting)

গদী কলম অনেকটা গোঁজ-কলমেরই অনুরূপ; গোঁজ-কলমে শাখা মাতৃবৃক্ষ হইতে পৃথক করিয়া লইতে হয়, কিন্তু গদী-কলমে শাখা বৃক্ষচ্যুত করিতে হয় না। শাখার এক পার্শ্বে ইংরাজী V অক্ষরের আকৃতি অনুযায়ী খাঁজ কাটিয়া লইয়া চারার কুঠারীর ধালার আকৃতি কাটা-অংশ ঐ খাঁজের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হয়। বন্ধন প্রণালী গোঁজ কলমের অনুরূপ। চারা ও শাখাতে জোড়া লাগিয়া গেলে জোড় কলমের নিয়মানুযায়ী শাখা কাটিয়া কলম বৃক্ষচ্যুত করিয়া লওয়া হয়।

(৮) টেরচা কাটা জোড় কলম (Whip grafting)

টেরচা-কাটা জোড়-কলম গোঁজ-কলমের অনুরূপ। গোঁজ কলমে যেমন মাতৃবৃক্ষ হইতে শাখা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয় ইহাতেও সেইরূপ মাতৃবৃক্ষ হইতে শাখা বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয়। গোঁজ কলমে V অক্ষরের আকৃতির খাঁজ ও গোঁজ কাটিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই কলমে ঐরূপ খাঁজ ও গোঁজ না কাটিয়া চারার মাথার দিক লিখিবার কলমের ন্যায় টেরচা ভাবে কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং বিচ্ছিন্ন শাখার গোড়ার দিকও ঐ ভাবে কাটিয়া লইয়া উভয়ের কাটা স্থানে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে জোড় বাঁধিয়া দিতে হয়।

(৯) চোক কলম (Budding)

কোন একটী গাছের শাখা হইতে বল্কল সহ চোক অর্থাৎ কুঁড়ি তুলিয়া লইয়া তজ্জাতীয় কোন চারা গাছের কাণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া চোক কলম প্রস্তুত করিতে হয়। মার্কিন দেশের কুইনল্যাণ্ড, ফ্লোরিডা প্রভৃতি স্থানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ সফলতার সহিত আম্র বৃক্ষের কলম করা হইয়া থাকে।

একটী ৩।৪ বৎসর বয়স্ক চারাগাছের গোড়া হইতে ৫।৬ ইঞ্চি উপরে কাণ্ডের গায়ে সূক্ষ্মাগ্র ধারাল ছুরি দ্বারা ১॥" হইতে ২" ইঞ্চি লম্বা ইংরাজী T অক্ষরের আকৃতি অনুযায়ী একটী চিহ্ন কাটিয়া লইবে এবং ঐ T অক্ষরের খাড়া এবং পড়া লাইনের সংযোগে ছুরির অগ্রভাগ বসাইয়া দিয়া অতি সন্তর্পণে দুই পাশের বল্কল ফাঁক করিয়া লইবে। তৎপর গাছের শাখা হইতে ছুরি দ্বারা অল্প পরিমাণ বল্কল সহ একটী চোক বা কুঁড়ি তুলিয়া লইয়া, উহার গোড়ার দিক ঐ ফাঁকের মধ্যে বসাইয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ কুঁড়ির মাথা বাহিরে রাখিয়া ঐ স্থানটি মোম-মাখান ন্যাকড়া দ্বারা জড়াইয়া দিবে, এই সকল কার্য্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যক। কারণ চোক তুলিয়া আনা বল্কল ফাঁক করিয়া চোক বসান, এবং মোম মাখান ন্যাকড়া জড়ান—এই কয়টী কার্য্য একটীর পর একটী অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদিত না হইলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

কুঁড়িটি চারার গুঁড়িতে বসিয়া গিয়া ৩" ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইলেই উহাকে সোজা করিবার জন্য কোন প্রকার সূত্র দ্বারা চারার কাণ্ডের সঙ্গে
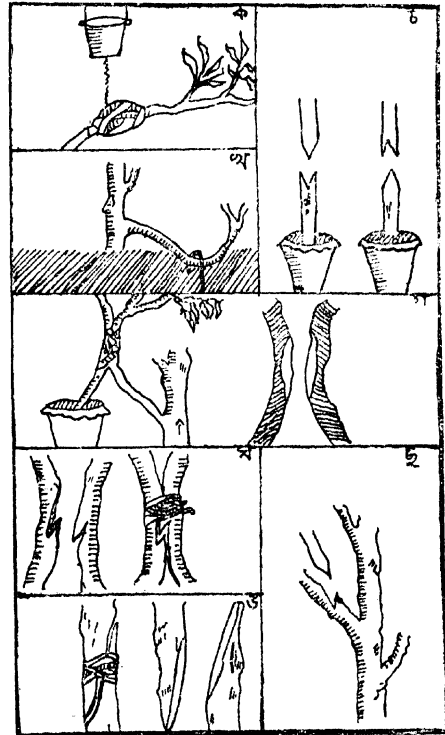
বিভিন্ন রকমের কলম

বাঁধিয়া রাখিবে এবং চোক হইতে ৪।৫ ইঞ্চি উপরে চারার মাথাটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

(১০) পার্শ্ব কলম (Side grafting)

সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে পার্শ্ব কলমের প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ সকল স্থানে পার্শ্বকলম দ্বারা আম্র বৃক্ষের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরবর্ত্তী গোয়া প্রভৃতি স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও পার্শ্ব কলমের প্রচলন নাই, কারণ অন্যান্য স্থানের আবহাওয়া সম্ভবতঃ ঐ প্রণালীতে কলম উৎপাদনের উপযোগী নহে।

এক বৃক্ষের কাণ্ডে এক জাতীয় বিভিন্ন বৃক্ষের প্রশাখা সংযোগ করিয়া ঐ কলম প্রস্তুত করা হয়, সুতরাং এই হিসাবে এই প্রকার কলম বিশেষ সুবিধাজনক।

কলম প্রস্তুত প্রণালী :—কোন পরিণতবয়স্ক বৃক্ষের গোড়া হইতে এক ফুট উপরে বন্ধলের গায়ে প্রথমতঃ বন্ধল বিদ্ধ করিয়া আড়াআড়ি-ভাবে একটী দাগ কাটিতে হইবে। তৎপর ঐ দাগের মধ্য স্থান হইতে উপরের দিকে ৩'' ইঞ্চি লম্বা ত্রিভুজাকৃতি একটি খাঁজ (Notch) কাটিয়া লইবে। ঐ ত্রিভুজাকৃতি খাঁজের ভূমি রেখা (base) উপরের দিকে থাকিবে। উহা কেবল বন্ধল কাটিয়াই প্রস্তুত করিতে হইবে। বন্ধলের সহিত তাহার নিম্নস্থ কাঠ কাটিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ইহার পর অন্য গাছের যে শাখাটি কলমের জন্য তুলিয়া আনিতে হইবে, ঐ শাখার কাণ্ডসংলগ্ন গোড়ার উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে একটি দাগ কাটিয়া লইবে এবং পূর্ব্বলিখিত গাছের কাণ্ডের বন্ধলে কাটা ত্রিভুজাকৃতি খাঁজের মাপে ঐ শাখা সহ ত্রিভুজাকৃতি বন্ধল কাটিয়া তুলিয়া লইবে, ঐ শাখাসংলগ্ন বন্ধল কোন প্রকারে কাটিয়া না যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎপরে এই ত্রিভুজাকৃতি বন্ধল সহ শাখাটি পূর্ব্বলিখিত কাণ্ডের বন্ধলে কাটা খাঁজের মধ্যে—বসাইয়া দিয়া প্রথমতঃ কর্ত্তিত স্থানগুলি মোম-মাখান ন্যাকড়া দ্বারা ঢাকিয়া দিবে—তৎপরে উহার উপরিভাগ পাট অথবা অন্য কোন প্রকার সূত্রদ্বারা কাণ্ডের সহিত উত্তমরূপে চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এই প্রকারে একই গাছের কাণ্ডে ঐ জাতীয় বিভিন্ন প্রকার গাছের শাখা সংযোগ করা যাইতে পারে।

(১১) চোঙ্গ-কলম (Tube grafting)

চোঙ্গ-কলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য চোক-কলমেরই অনুরূপ, কারণ এই প্রণালীতেও কোন বৃক্ষের শাখার চোখ অথবা কুঁড়ি ঐ জাতীয় অন্য একটী চারার কাণ্ডে সংযোগ করা হয়। কুল গাছের পক্ষে চোঙ্গ কলম বিশেষ উপযোগী। কলম প্রস্তুত প্রণালী—একটী চারার গোড়া হইতে আধ হাত উপরে উঠার মাথা কাটিয়া ঐ কর্ত্তিত স্থানের নীচের ২'' ইঞ্চি পরিমাণ বন্ধল এমন ভাবে তুলিয়া ফেলিতে হইবে যেন কাঠের গায়ে কোন প্রকার আঁচড় বা আঘাত না লাগে। এইরূপ বন্ধল তুলিতে হইলে প্রথমতঃ চারার কর্ত্তিত স্থান হইতে ২ ইঞ্চি নীচে একখানা ধারালো ছুরি দ্বারা কাণ্ডটী বেষ্টন করিয়া দাগ কাটিয়া লইবে এবং কাণ্ডের কাটা স্থান হইতে এই দাগ পর্য্যন্ত ছুরির মাথার দ্বারা আর একটী খাড়া (vertical) দাগ কাটিয়া লইবে। তৎপরে এই খাড়া দাগের দুই পাশে ছুরির মাথা দ্বারা আর একটী দাগ কাটিয়া লইবে, তৎপরে খাড়া দাগের দুই পাশে ছুরির মাথা অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কলাগাছের পেটো খুলিবার ন্যায় সমস্ত বন্ধলটি একেবারে খুলিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। ইহার পর ঐ চারার ঠিক সমপরিমাণ ব্যাসবিশিষ্ট একখানা বৃক্ষশাখা হইতে চোক যুক্ত ২ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা বন্ধল পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে এমন ভাবে আস্ত খুলিয়া লইতে হইবে যেন বন্ধলের তলাতে কোন প্রকার আঁচড় বা আঘাত না লাগে, এই ভাবে বন্ধলটী আস্ত খুলিলে উহা ঠিক একটী চোঙ্গের আকৃতি বিশিষ্ট হইবে, এই চোঙ্গটী উল্লিখিত চারার বন্ধলহীন অংশে পরাইয়া দিয়া মোম মাখানো ন্যাকড়া দ্বারা চোক ভিন্ন অন্য স্থান জড়াইয়া দিবে, চারাটাকে পূর্ব্ব হইতেই মস্তকহীন না করিয়া চোক বসিয়া যাওয়ার পরেও মস্তক হীন করা যাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া এক বৃক্ষের শাখার চোক অন্য বৃক্ষের শাখাতে সংযোগ করা যায় এবং তদ্দ্বারা একবৃক্ষে একই জাতীয় বিভিন্ন প্রকার ফুল এবং ফল লাভের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

(১২) গুঁড়ি-কলম (Crown grafting)

কোন নিকৃষ্ট জাতীয় অথবা অকর্ম্মণ্য গাছ বাগান হইতে কাটিয়া ফেলার আবশ্যক হইলে ঐ গাছ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার গুঁড়িতে ঐ জাতীয় অন্যান্য উৎকৃষ্টতর গাছের শাখা সংযোগ করিয়া দেওয়াকে গুঁড়ি কলম (Crown grafting) বলে।

কলম প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমত গাছের গোড়া হইতে দুই হাত পরিমাণ উপরে আড়াআড়িভাবে করাত দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়া লইতে হইবে, তৎপরে ঐ কাটা স্থান হইতে নীচের দিকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ বন্ধল খাড়াভাবে চিরিয়া লইয়া ঐ চেরা স্থানের গোড়াতে একটা কাঠের কীলক প্রবেশ করাইয়া রাখিবে। ঐরূপ করিলে চেরা স্থানের উপরের দিক ফাঁক হইয়া থাকিবে, এইরূপে গাছের গুঁড়ির আয়তন অনুসারে ৪।৫টী শাখা বসাইবার জন্য গুঁড়ির চারিদিক ঘুরাইয়া ৪।৫টি ফাঁক করিয়া লইতে হইবে, তৎপর নির্ব্বাচিত শাখাগুলির ফাঁকের মাপ অনুযায়ী গোঁজ প্রস্তুত করিয়া লইয়া ফাঁকের মধ্যে আঁটিয়া বসাইয়া দিবে। নির্ব্বাচিত শাখাগুলিতে অন্ততঃ ৪।৫টি হিসাবে চোখ থাকা আবশ্যক, শাখা গুঁড়িতে বসানো হইয়া গেলেই ঐ স্থানগুলি মোম মাখানো ন্যাকড়া দ্বারা পুরু ভাবে ঢাকিয়া দিবে এবং গুঁড়িটি বেষ্টন করিয়া দৃঢ় ভাবে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে।

মজলিসী-মানুষ শরৎচন্দ্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উদ্যোগে প্রেসিডেন্সী কলেজে শরৎচন্দ্রের যে ৫৩তম জন্ম-জয়ন্তী হয়েছিল, তাতে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিভাষণে বলেছিলেন—আপনারা অভিযোগ করেছেন, আমি আসি না ; তার কারণ বক্তৃতা দিতে হবে মনে হ'লেই আমার হৃৎকম্প হয়। আমি কিছুই বলতে পারি না।

শরৎচন্দ্রের এই কথাটা কিন্তু আদৌ পরিহাস নয়। এ তাঁর অন্তরেরই কথা। বাস্তবিকই তিনি এত সভা-ভীরু মানুষ ছিলেন যে, সভায় যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে শুনলেই তিনি সর্বদাই পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেন। শরৎচন্দ্রের এই সভা-ভীরুতা বরাবরই ছিল। তিনি যখন রেঙ্গুনে থাকতেন,তাঁর সেই সময়কার এক সভা-পালানোর গল্পের উল্লেখ ক'রে নরেন্দ্র দেব তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—"রেঙ্গুনে 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের' সাহিত্য-বিভাগে মধ্যে মধ্যে সভ্যগণের রচিত এক একটি প্রবন্ধ পড়া হ'ত এবং তাই নিয়ে চলতো আলোচনা। শরৎচন্দ্রকে তাঁরা বার বার ধরেছেন, তোমাকে কিছু লিখে এনে পড়তে হবে আমাদের সভায়—শরৎচন্দ্র প্রতিবারই নিজের সামান্য জ্ঞান, স্বল্প বিদ্যা ও অল্প শিক্ষার দোহাই দিয়ে এবং রচনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা জানিয়ে এড়াবার চেষ্টা করেছেন।...একবার কিন্তু নারী-চরিত্র নিয়ে ক্লাবে তুমুল তর্ক ওঠায় শরৎচন্দ্র সেদিন এ বিষয়ে য়ুরোপের প্রসিদ্ধ মনীষীরা কে কি লিখে গেছেন, তার উল্লেখ ক'রে তর্কের জটিল সমস্যাটি অতি সহজেই সমাধান করে দেন। এ থেকে সকলেই সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারেন যে, এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের অনেক জানা ও অনেক পড়াশুনা আছে। তখন সকলে মিলে তাঁকে চেপে ধরলেন—'এ বিষয়ে ক্লাবের সাহিত্য শাখার আগামী অধিবেশনে তোমাকে অতি অবশ্য কিছু এনে পড়তেই হবে। অগত্যা বাধ্য হয়ে শরৎচন্দ্রকে সম্মতি দিতে হ'ল।......

নির্দিষ্ট দিনে সভার বিজ্ঞাপিত সময় হয়ে গেল, তথাপি শরৎচন্দ্রের দেখা নেই ; ক্লাবের হলটি সমাগত শ্রোতার ভিড়ে পরিপূর্ণ। সভারম্ভে দেরী হচ্ছে দেখে শ্রোতার দলের ক্রমেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো, সভাপতি মহাশয় উঠতে লাগলেন ব্যস্ত ও অস্থির হয়ে। শেষে উদ্বোধন সংগীত গাইতে ব'লে সভার কার্য শুরু ক'রে দিয়ে তিনি দু'জন সভ্যকে গাড়ি নিয়ে শরৎচন্দ্রকে ধ'রে আনবার জন্য পাঠালেন। তারা গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র বাসায় নেই, কোথায় গেছেন কেউ জানে না। স্নানাহারের পর দুপুরে বেরিয়েছেন, কখন যে ফিরবেন ঠিক নেই কিছুই। সর্বনাশ! শুনে তাঁরা তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ক্লাবের মান-ইজ্জৎ আজ বুঝি গেল।

গাড়ি নিয়ে ক্লাব থেকে শরৎচন্দ্রকে নিতে এসেছেন বলায় বাড়ির ভিতর হ'তে সংবাদ পেলেন—'তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে গেছেন, সভায় যেতে পারবেন না। কিন্তু প্রবন্ধটি লিখে রেখে গেছেন, আপনারা কেউ এটি নিয়ে গিয়ে তাঁর হয়ে পড়বেন।' শুনে তাঁদের ধাতে যেন প্রাণ এল। প্রবন্ধ নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে তাঁরা সভায় এসে উপস্থিত হলেন।"

এই সভার দিনে বাইরে শরৎচন্দ্রের কোনও প্রয়োজন ছিল না। শুধু সভায় যেতে হবে এই ভয়েই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই সভা-ভীরুতা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই থেকে গিয়েছিল। তবে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে চ'লে আসার পর, বাধ্য হয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে কোন না কোন সভায় যোগদান করতে হ'ত। কারণ এই সময় একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে দেশময় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ায়, লোকে তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখের বাণী শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। তাই তারা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁকে ডাকাডাকি করত। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি পালন-উৎসবও হ'তে লাগাল। এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকেই ঐদিন শরৎচন্দ্রকে নিজেদের মধ্যে পেতে চাইত। শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ কোনও সভাতেই যেতে না চাইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি লোকের অনুরোধ এড়াতে পারতেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে সেই সব সভায় যোগ দিতে হ'ত। তবে তিনি সভায় দাঁড়িয়ে মুখে বক্তৃতা দিতে পারতেন না ব'লে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়টা লিখে নিয়ে যেতেন এবং সভায় দাঁড়িয়ে কোনও রূপে তা' প'ড়ে দিতেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সভায় বক্তৃতা দিতে হবে মনে হ'লেই যে লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত, সেই লোকই আবার যখন কোন বৈঠকী আসরে বা মজলিসে যেতেন, তখন তিনি একেবারে বক্তৃতায় মেতে উঠতেন। গল্পে-গুজবে ও হাস্য-পরিহাসে এমনিভাবে তিনি আসর জমিয়ে রাখতেন যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং বেলার পর বেলা তিনি কাটিয়ে দিতেন, আর তাঁর শ্রোতারাও তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইতেন না। এই হাস্য-পরিহাস-প্রিয়তা ও মজলিসী-স্বভাব শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। ভাগলপুরে অবস্থানকালে ছেলেবেলায় তিনি নিজেদের এক সাহিত্য-সভায় সভাপতি ছিলেন এবং এই সাহিত্য সভার বৈঠকে তিনিই প্রাধান্য করতেন। এছাড়া পাড়ার সমবয়সীদের দলেও তিনিই ছিলেন নেতা—এই সমবয়সী বন্ধুদের সব সময়ই তিনি গল্পগুজবে মশগুল করে রাখতেন। পরে রেঙ্গুনে অবস্থান-কালেও একজন মজলিসী মানুষ ব'লে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়কার কথা উল্লেখ ক'রে নরেন্দ্র দেব তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সুরসিক এবং পরিহাস-রহস্য-প্রিয় ছিলেন। সেজন্য রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এমন কি, তাঁর মাদ্রাজী, খৃষ্টান, তামিল ও বর্মী বন্ধুরাও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতো। গীত-বাদ্য, ক্রীড়াকৌতুক, হাস্য-পরিহাস ও রসালাপে

সুদক্ষ হওয়ায় শরৎচন্দ্রের মজলিসী-মানুষ ব'লে রেঙ্গুনে খ্যাতি রটে গিয়েছিল। কাজের অবসরে সহকর্মীরা উৎসুক হয়ে থাকতো তাঁর মুখের কথা ও গল্প শুনবার জন্য, শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে আফিসে প্রত্যহ রীতিমত একটি আড্ডা বসে যেতো।"

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে চ'লে এসে যখন হাওড়ায় বাস করছিলেন, তখন একবার সরস্বতী পূজার সময় তিনি কাশীতে উত্তরা-সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে বেড়াতে যান। শরৎচন্দ্র কাশীতে গিয়ে দেখেন যে, রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাশী বেড়াতে এসে সুরেশবাবুর বাড়ীতেই উঠেছেন। বিদেশে সুরেশবাবুর বাড়ীতে বাঙ্গলার দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের একত্র সমাবেশ, এই শুনে কাশীর শিক্ষিত বাঙ্গালী অধিবাসীরা সুরেশবাবুর বাড়ীতে দলে দলে আসতে লাগলেন। তাঁরা এই দুই সাহিত্যরথীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের সঙ্গে গল্প ক'রে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময় কেদারবাবু মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিলেন। শরৎচন্দ্রের হাসি ঠাট্টা ও গল্প গুজবের পাল্লায় পড়ে তাঁর জ্বরও যেন তখন তাঁকে আক্রমণ করতে ভুলে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই সময় সকল কাজ-কর্ম ভুলে তাঁর দর্শনার্থী ও কেদারবাবুকে নিয়েই শুধু দিনের পর দিন গল্প গুজব করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথার প্রসঙ্গে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "শরৎ কথা" প্রবন্ধে লিখেছেন—

"পূর্ণিয়া থেকে, এখানকার যা নামী ও দামী জিনিস—ম্যালেরিয়া, সেটি সংগ্রহ করি।......পুরো পাঁচ মাস তার উৎপাত স'য়ে পূজার পর কাশী চলে গেলুম। দেখি তিনিও সঙ্গে এসেছেন—কাশীবাস করতে চান —আমাকেই অবলম্বন করে।......উত্তরা-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্তীর বাসায় উঠেছি। জ্বরভোগ করি, ছুটি পেলেই 'কোষ্ঠীর ফলাফল' লিখি।... শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিন—বাইরের ঘরে বসে লিখছি। সহসা শুনলুম—এইটি কি সুরেশবাবুর বাসা? বাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।......

...(শরৎচন্দ্র) ঘরে এসে ঢুকলেন।...তারপর কত কথা। অসুখের উল্লেখমাত্র নয়।—অসুখ আবার কি? ও সেরে গেছে। কথাটি ব্রহ্ম-বাক্যের মতই কাজ করলে, আমার যে অসুখ ছিল বা আছে, সে কথাটা শরীরে বা মনে অনুভবই করিনি।......

তারপর দিন যায়, রাত আসে। স্নানাহার স্মরণ থাকে না। আনন্দ-মুখর তরুণেরা আসে যায়—সুরেশের লাইব্রেরীতে সরস্বতী পূজা—সভাপতি শরৎবাবু,......আজ আমাকে নিয়ে বেরুতেই হবে। টাঙাওলাকে ব'লে দেওয়া হ'ল—'কাল ঠিক আটটায়...আনা চাই, দেখিস্—খবরদার বিলম্ব না হয়,—বুঝতা? 'হ্যাঁ হুজুর' বলে সে চলে গেল।—পরদিন সেলাম করে জানিয়ে দিলে—ঠিক আটটায় হাজির হয়েছে।

বেলা ৯টার সময় দ্বিতীয় সেলাম। তখন চা খাওয়া চলছে, ভোলা তাওয়া চড়াচ্ছে। গাড়োয়ানকে বললেন—'এই ছাথ্ না, চট্ করে নিচ্ছি—সত্বরই যাতা হায়।'

ক্রমে তরুণ দলের আগমন। তাওয়াও ফিকে মেরেছে।—'ভোলা করছিস্ কি, বাবুরা এসেছেন—কোন আক্কেল নেই।...... .

বেলা ১১টায় তৃতীয় সেলাম।—তাই তো কেদারবাবু, এ বেটা যে ছাড়ে না দেখছি। এ বেলা কি যেতে পারবেন?

বললুম—'এঁরা সব দূর থেকে এসেছেন, এঁদের ফেলে'......

'তাই তো—তা ও-বেটা বোঝে না কেনো।—ওহে এগোরাটা তো বাজ গিয়া—, এখন খাও-দাও গিয়ে। তোমাদের আবার 'পাকাতে' হয়। কাশীতে তো কষ্ট দিতে আসতে নেই। যাও—ঠিক চারটে বাজলেই আও কিন্তু।'......

সে কি বলতে যাচ্ছিল।—'হাঁ হাঁ বুঝা হায়, তোমরা ক্ষতি নেই করে গা—ভাড়া ঠিক পাবে গো।' সে চলে গেল।

বললেন,—আজ কিন্তু বিকেলে দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু।

......টাঙ্গাওলা দু'বেলাই ঠিক আসে। রাত ১১টার পর সাত টাকা নিয়ে যায়। দু'দিন এইভাবেই কাটল।

বললুম—'কাশীতে কাজটা ভালো হচ্ছে কি? আপনি ধর্মভীরু মানুষ—ঘোড়াটার যে ইহকাল পরকাল গেল—খাতে ধরে মরবে যে।'

'না—কাল আর কারো কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি কাল সকাল সকাল উঠবেন, পারবেন ত?'

তৃতীয় দিনও সকালে বেরুনো হয়ে উঠল না। (ভারতবর্ষ—ফাল্গুন ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র কি রকম যে মজলিসী-মানুষ ছিলেন এবং কিভাবে যে তিনি গল্প গুজবে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্ধৃতিটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাতে সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র, আর ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সম্মেলনের শেষে রমেশবাবু তাঁর ঢাকার বাড়ীতে যাওয়ায় জন্য শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করলে, শরৎচন্দ্র ঢাকা যান। ঢাকায় রমেশবাবুর বাড়ীতে তিনি দু'একদিন ছিলেন। সেই সময় সেখানকার লোকদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কি ভাবে গল্প-গুজবে কাটিয়েছিলেন, সে কথার প্রসঙ্গে—রমেশবাবু তাঁর "শরৎ-স্মৃতি" প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন—"আমার বাটির মধ্যে একটি পুকুর ছিল। তাহার বাঁধান ঘাটের উপর দুই রোয়াকে বসিয়া আমাদের মজলিস জমিত।......ঘাটের মজলিসে তিনি আসর জমাইয়া বসিতেন আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত এবং ঘন ঘন হুকার কলিকা বদলি হইত।" শরৎ স্মরণিকা—পৃঃ ২৩।

শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের (মুখোপাধ্যায়ের) পুত্র পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক সময় শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। পাঁচুগোপালবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে বহু গল্প করতেন। এ কথার উল্লেখ করে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর "স্মৃতি পূজা" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে এক স্থানে তিনি লেখেন—"প্রত্যহ বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়েছি। তিনি কেবল গল্প লিখতেন না, গল্প করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর

ছিল। সভায় তাঁকে মানাতো না, কিন্তু গল্পের বৈঠকে তিনি ছিলেন যাদুকর গল্পী।"

শরৎচন্দ্র এমনি মজলিসী মানুষ ছিলেন যে, একবার তাঁর কাছে গেলে তাঁর হাস্য-পরিহাস ও গল্প ছেড়ে তাড়াতাড়ি ওঠা কঠিন হয়ে পড়ত, একমনে তাঁর কথা শুনতেই হ'ত। তাঁর কথা বলার মধ্যে এমনি একটা যাদু ছিল। শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময়ই কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন, আবার কখন কখন তিনি এমনি গম্ভীর হয়ে মিথ্যা করে কারও কারও বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলতেন যে, যে শুনত সে বিশ্বাস না করে থাকতে পারত না। তারপর শরৎচন্দ্রের এই কথাকে সে আবার যখন মিথ্যা বলে জানতে পারত, তখন সে হেসে উঠত। শরৎচন্দ্র এই ভাবে মিছামিছি অনেককে সামনা-সামনি ক্ষেপিয়ে দিয়েও মজা উপভোগ করতেন। শরৎচন্দ্রের এই মিছামিছি মানুষকে ক্ষেপানোর কথা উল্লেখ করে দিলীপকুমার রায় এক জায়গায় লিখেছেন—"শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এ সময়ে তিনি ভারি ফাজ্লামি করতেন। চিঠিপত্রেও। এ ভঙ্গি হল ফরাসি—প্রকৃতিতেঃ এর নাম blagueঃ অর্থাৎ কিনা নিপুণ ভঙ্গিতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনে না, তারা স্বতই ওঠে চ'টে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এই জন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমার বাজত—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুসি হতেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।"

শরৎচন্দ্র এমন নিপুণভাবে মিথ্যাগুলো রটাতেন যে, তাঁর কথা অবিশ্বাস করবার উপায় ছিল না। শরৎচন্দ্রের এই রকমের একটি গল্প এখানে দেওয়া গেল—

কলকাতায় থাকার সময় শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই কবি নরেন্দ্র দেবের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। একবার তিনি নরেন্দ্র দেব ও তাঁর স্ত্রী কবি রাধারাণী দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কানাই গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন অধ্যাপককে নিয়ে যান। এই কানাইবাবু শরৎচন্দ্রের পাড়াতেই বাস করতেন।

শরৎচন্দ্র কবি-দম্পতীর সঙ্গে কানাইবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসঙ্গ উঠলে কবি-দম্পতী ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এত উচ্চ প্রশংসা শুনে কানাইবাবু কিন্তু বাধা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন—রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ভাববিলাসী কবি, শুধু ভাবের বিলাস নিয়েই প্রকৃত কাব্য হয় না। তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শোষিত জনগণের চিত্র তেমন কই?

এই সময় শরৎচন্দ্র কানাইবাবুকে সমর্থন করতে থাকায় তিনি আরও উত্তেজিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিন্দা করতে লাগলেন।

এদিকে কবি-দম্পতীও কানাইবাবুর যুক্তির অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যাই হোক্—সেদিন এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা তর্কাতর্কির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নরেন্দ্র দেবের বাড়ী থেকে ফেরার পথে শরৎচন্দ্র কানাইবাবুকে বললেন—দেখ কানাই, তুমি একটা কাজ বড় ভুল ক'রে ফেললে। আর আমারও তখন অত খেয়াল ছিল না।

—কি ভুল করেছি দাদা?

—আরে নরেন আর রাধু—ওরা যে রবিঠাকুরের গোঁড়া ভক্ত। ওদের গুরুদেবের নিন্দা করে এলে, ওরা কি আজ আর ঘুমুতে পারবে, না আজ আর কিছু খাবে। না খেয়ে হয়ত সারা রাতই বসে বসে কাঁদবে।

—তা ত জানতাম না! তা হ'লে কি হবে দাদা!

—এখন আর কি করবে? এখনি ফিরে যাওয়াটাও তোমার পক্ষে কেমন দেখাবে। তার চেয়ে কাল সকালেই গিয়ে আবার রবিঠাকুরের খানিকটা প্রশংসা করে বরং ওদের খুশি করে এসো। আর তেমন যদি বোঝ ত একটু ক্ষমাটমা চেয়ো।

পরের দিন সকালেই কানাইবাবু নরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং গত রাত্রির আলোচনার কথা উল্লেখ করে নরেনবাবু ও রাধারাণী দেবীর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তিনি বললেন—আমার কথায় আপনারা যে এতখানি আঘাত পাবেন, তা আমি জানতাম না।

—আঘাত আর কি? আপনি যেমন বুঝেছেন, তেমন বলেছেন, তাতে ত মনে করার কিছু নেই।

—শরৎদা বলছিলেন, সারা রাত হয়ত আপনারা...

—ও! এবার বুঝেছি, শরৎদাই বুঝি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ, কাল ফেরার পথে তিনি বললেন, তুমি রবিঠাকুরের নিন্দা করে এলে, আজ আর ওরা খাবে না, সারারাত ঘুমাতেও পারবে না...

—ঐ জন্যেই বুঝি আপনি ছুটে এসেছেন? শরৎদা আপনাকে নিয়ে একটু মজা করেছেন। তাই আমাদের কাছে আপনাকে আবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সব শুনে কানাইবাবু বললেন—তাই নাকি! শরৎদার যে এ রকম মজা করার স্বভাব আছে, তা ত জানতাম না।

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত হাস্য-পরিহাস-প্রিয় মানুষ ছিলেন। লোককে ক্ষেপিয়ে বা কারও বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা রটিয়ে তিনি যে মজা করতেন, একেও তাঁর এক প্রকারের হাস্যপরিবেশনেরই নামান্তর বলা যেতে পারে। এই প্রকারের রসিকতায় এর আসল মিথ্যা রূপটা যখন ধরা পড়ে, তখন সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ে। শরৎচন্দ্রের এই মিথ্যা রটানোগুলো এমনি নির্দোষ থাকত যে, যার বিরুদ্ধে রটানো হ'ত, সেও প্রকৃত কথাটা জানতে পারলে বিমর্ষ না হয়ে হেসেই উঠ্‌ত।

শরৎচন্দ্র কথায় কথায় লোককে প্রায়ই হাসাতেন। তাঁর এই হাসির কথাগুলি যেমনি সূক্ষ্ম, তেমনি মার্জিত-রুচিসম্পন্নও ছিল। তাঁর হাসির গল্পের মধ্যে কোথাও স্থূলতা বা ভাঁড়ামির স্থান ছিল না। তিনি কথায়

কথায় লোককে কি ভাবে হাসাতেন, এখানে তাঁর সেরূপ দুএকটা হাসির গল্প উল্লেখ করা গেল—

শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কানন-বিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে বেড়াতে যান। সেদিন কাননবাবু কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য কি রকম? এখানে ম্যালেরিয়া আছে নাকি?

এর উত্তরে মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—উপীন, তুমি সে গল্পটা কাননকে বুঝি বলনি? তবে শোন, এখানে পাশের গাঁয়ে পাণিত্রাসে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। তাঁকে পাণিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি জবাব দেন—আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়সেও খোলা জায়গায় বসে একটু নিশ্চিন্তে যে তামাক খাব, তারও উপায় নেই।

শরৎচন্দ্রের এই কথাটির কোথায় যে সূক্ষ্মভাবে হাসির ইঙ্গিত রয়েছে, কাননবাবু ধরতে পারছেন না দেখে উপেনবাবু কথাটির ব্যাখ্যা করে দিলেন। উপেনবাবু বললেন—পাড়াগাঁয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে তামাক খেতে নেই, শরতের ভগ্নীপতির বয়স যদিও পঁচাত্তর, তাহলেও এ অঞ্চলে তাঁর চেয়েও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁরা সর্বদাই আশপাশে ঘোরাঘুরি করেন বলে শরতের ভগ্নীপতির ফাঁকায় বসে তামাক খাওয়ার ব্যাঘাত হয়। এ থেকেই বুঝতে পারছ এখানকার স্বাস্থ্য কেমন?

কথাটা শুনে কাননবাবু এবার খুব হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের আর একটি গল্প :—

ভারতবর্ষ কার্যালয়ে শরৎচন্দ্র এসেছেন। ভারতবর্ষের সম্পাদকীয় বিভাগের লোকজন ছাড়া আরও কয়েকজন সাহিত্যিক সেদিন উপস্থিত আছেন। সেই সময় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের "পরিচয়" পত্রিকায় দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র "সাহিত্যের মাত্রা" প্রকাশিত হয়েছে। সেদিন সকলে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি নিয়েই আলোচনা সুরু করলেন। একজন শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন—কবি যাঁদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মনে হচ্ছে আপনিও আছেন। এ প্রবন্ধে কবি যে সব অভিযোগ করেছেন, দেখেছেন ত? তিনি বলেছেন—ওরা "মত্ত হস্তী", "ওরা বুলি আওড়ালে" "পালোয়ানি করলে" "কসরত কেরামত দেখালে" "প্রেম সন্ত করলে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র এই কথাগুলো শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন—কবি এই বয়সে আমার কি ক্ষতি করবেন শুনি? আমি তাঁর যে ক্ষতি করে দিয়েছি তার তুলনায় এ কিছুই না।

অনেকেই অমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি আবার রবীন্দ্রনাথের কি ক্ষতি করলেন?

—সে যা করে দিয়েছি, সে রবীন্দ্রনাথই টের পাবেন।

—তবু শুনি না, কি ক্ষতি করেছেন।

—গিরিজা বোসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—তাতে আর ক্ষতি কি হয়েছে?

—সে তোমরা তার কি বুঝবে? যাঁর ক্ষতি হবে, তিনিই জানতে পারবেন। জান ত গিরিজা কি রকম গল্পে লোক! তার উপর কবিতা লেখার রোগ আছে। এখন দু'বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, আর গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ত জানই, নিজের অসুবিধা হ'লেও লোককে মুখের উপর কথা বলে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না। গিরিজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ায় এই ফল হ'ল যে, গিরিজা অনবরত রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না। কেমন! কবি আমার যা ক্ষতি করেছেন, সে তুলনায় আমি তাঁর বেশি ক্ষতি করতে পারিনি?

শরৎচন্দ্র এমনভাবে কথাগুলো বলে গেলেন যে, সকলেই শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র এইভাবেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও রুচিপূর্ণ গল্প বলেই লোককে হাসাতেন। এই কারণেই তাঁর রচনার মধ্যে যে হাস্যরসের চিত্রগুলি রয়েছে, সেগুলিও এমনি সুন্দর ও মার্জিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর পাঠকদের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি মুখে মুখে সরস কথা বলেও তেমনি তাঁর শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিতেন। বড় বড় সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি কিছু বলতে পারতেন না বটে, কিন্তু বৈঠকী আসরে বা মজলিসে তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড় বক্তা ও একজন সত্যিকারের উঁচুদরের মজলিশী মানুষ।

উর্বশীকে

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিপ্রা আর বেত্রবতী স্থির হল একাল-সকালে :
মরা জলে তবু ভুলে উর্বশীর ছায়া পড়ে, দেখি—
অকস্মাৎ আকাশ-আঁচলে দেহ যার ক্ষণিক বিদ্যুৎ
বুকভাঙ্গা স্বপ্নহারা কুশায়ার অস্বচ্ছ দিনে
যখন কাজের ভিড়ে প্রত্যহের একাকার রূপ
সেখানে তোমায় বলো কে সে নেবে চিনে!

এসো তাই পৃথিবীতে নেমে, নামো হে উর্বশী ;
পংকিল জলার ধারে বালি-বাড়ি নিত্যদিন গড়ি—
এখানে ত প্রেম নেই—ক্ষুধাতুর রিক্ত এক মন,
হিসাবের গরমিল! লোনা ঘাম পড়ে ঝরি ঝরি!
হে ক্ষণিকা, চোখে দাও সরু ভীরু কজ্জলের টীকা,
মন দাও, প্রেম দাও, সুন্দরের হে মন-মণিকা।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

রাত্রি আট দণ্ড হইয়াছে, কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ উঠিল। নির্মেঘ আকাশ, কিন্তু শীতের ধূসর পৃথিবীর উপর একটু কুয়াশার আমেজ জোছনাকে ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছে। প্রিয়নাথ আসিয়া সকলকে ডাকিলেন—দর্শক অনেক। ভগবতী সাতজন সাহসী পুরুষ বাছাই করিয়া লইলেন। তন্মধ্যে গোবিন্দ তিলি ও ছিদাম ময়রা স্থান পাইল—তাহারা সাহসী বলিয়া খ্যাত।

সকলে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া রওনা দিলেন। কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চণ্ডীতলার বটগাছ পর্য্যন্ত যাইতেই সহসা একটা হাসির শব্দ শোনা গেল—চণ্ডীতলার নিকটে বসিয়া তাহারা যেন গল্প করিতেছে—

নিকটবর্ত্তী হইতেই কয়েকজন লোক আসিয়া প্রণাম করিল—প্রণাম, এতরাত্রে কোথায় যাওয়া হ'চ্ছেন কর্ত্তা—

—আদাড়ী ঠাকুরের বাড়ীতে ভূত দেখ্‌তে যাচ্ছি—

ভরত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল—কর্ত্তা, আমরা ঝোপে-ঝাড়ে থেকে একটু দেখবেন কর্ত্তা। আর পারিত পেত্নীটা ধরে ফেল্‌বো—ভরতের মুখ হইতে পচুই মদের বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতেছে।

ভগবতী কহিলেন—হারামজাদা—কতখানি পচুই মেরেছিস্‌ পাজি—নেশার ঘোরে কেলেঙ্কারী করবি শেষে—

—না হুজুর, আদাড়ী ঠাকুরের সব বুজরুকি কর্ত্তা। লেলো নীলমণি আর আমি যাবেক হুজুর।

পার্ব্বতী কহিলেন—বেশ ত যাক না ওরা ভগবতী-খুড়ো। জামরুলতলার ঝোপে থাকবে—দেখবে কেমন পেত্নী। দেখিস্‌ ভূতে ঘাড় না মট্‌কে দেয়—

নীলমণি কহিল—মরবেক ত লড়াই করে মরবেক।

ভগবতী আদেশ দিলেন—তবে চল্‌।

প্রিয়নাথ কহিলেন—এমন তেমন হ'লে আমাদের দোষ নেই কিন্তু, তখন কাঁদতে পারবি নে—

ভরত কহিল—না ঠাকুর মশাই—কাঁদবেক কেনে—ভূত পেত্নি কত দেখা করলেক—

ভগবতী সপারিষদ আদাড়ীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আদাড়ী সাদরে নানাবিধ আসনে তাহাদিগকে বারান্দায় বসিতে দিল। কহিল—বসুন, আমি আসন শুদ্ধিটা করে দি—

আদাড়ী ঘর হইতে কুশিতে করিয়া একটু একটু জল আসনের নীচে দিয়া, মাথায় একটু জল দিয়া কহিল—ভয় নেই—এ ছাড়াও গাঠরী করে দিচ্ছি—

আদাড়ী ঘর হইতে একটা নর কপাল আনিয়া তাহাতে কি পূজাদি করিল এবং তাহা হইতে একটা একটা ফুল সকলের হাতে দিয়া কহিল—কানে ফুলটা রাখুন, কোন ভয় নেই, তবে আসন ছাড়বেন না। আপনাদের সাম্‌নে আস্‌লেও না। আমি যতদূর কাছে পারি আন্‌বো। আর ভয় হলে ৺কালীর বীজমন্ত্র জপ্‌ করবেন, তা হ'লে ভূত হোক, পেত্নী হোক, ব্রহ্মদৈত্য হোক, পরী বা জেন হোক্‌, কিছু করতে পারবে না।

সকলে যথারীতি আসনে বসিয়া আদাড়ীর আদেশ পালন করিল। আকাশে স্তিমিত চাঁদ—স্বল্প কুয়াশার মাঝে প্রতিফলিত হইয়া যেন একটু অস্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—প্রহরেক রাত্রি হইয়াছে, গ্রামের রাত্রি। চারিদিকে নিঃশব্দ নিঝুম। দূরাগত বিনিদ্র পাখীর দুই একটা শব্দ হইতেছে—শিবাকুল এক প্রহরের সঙ্কেত জানাইয়া চুপ করিল। আকাশের কোণে কয়েকটা তারকা নিষ্প্রভভাবে পৃথিবীর পানে তাকাইয়া আছে—গাছের পাতাও নড়িতেছে না—বৃহৎ বনস্পতি যেন নিশ্বাস বায়ু সম্বরণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—

ঘরের মাঝে আদাড়ী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে একটা বিকট স্বরে মা মা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। অশরীরী একটা মূর্ত্তিকে দেখিবার জন্য অনেকগুলি চোখ চারিদিকে খরদৃষ্টি দিতেছে—

আদাড়ী ঘর হইতে আসিয়া অতিমৃদু কণ্ঠে কহিল—একটু যেন মন্দ গতিক দেখ্‌ছি', রেগে আছে। তা হোক্—এই শিকড়টা হাতে নিন সব—দেখবেন পায়ে পড়ে না যেন—

সকলের হাতে একটু একটু শিকড় দিয়া আদাড়ী বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাঝে একবার কহিল—ঐ পূবের মাঠের দিকে দেখবেন লক্ষ্য করে—

বাঁশী বাজিতেছে—

সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন—শ্বেতবসনা একটী ক্ষীণাঙ্গী বিধবা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মাঠ অতিক্রম করিতেছে। ক্রমশঃ সুস্পষ্ট বাড়ীর পূবের ঝোপঝাড়গুলির নিকটে আসিয়া মূর্ত্তিটি যেন থামিল।

সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতেছিলেন—মূর্ত্তি আরও নিকটে—আরও নিকটে জামরুল গাছের নিকটে সুস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণা তন্বী স্ত্রী, সুঠাম সুন্দর দেহ—কেবল অবগুণ্ঠিত মুখখানি অদৃশ্য। জামরুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সে এদিক ওদিক একটু ঘুরিল—একবার ঝোপের আড়ালে গেল, আবার আসিল—হাত তুলিয়া কি যেন দেখিল—তাহার পর জামরুল গাছের একটা ডালে উঠিয়া অদৃশ্য হইল—

ভগবতী প্রিয়নাথ প্রভৃতির লোমগুলি খাড়া হইয়া শরীরে ঘনঘন শিহরণ হইতেছে—বারবার চোখ কচলাইয়া দেখিতেছেন ঘটনা সত্য—প্রত্যক্ষ নারীমূর্ত্তি—

আদাড়ী কহিল—যদি এসেছ তবে কেন আরও সাম্‌নে উঠানে এসো—

জামরুল গাছ হইতে নাকি সুরে উত্তর আসিল—তোরা আটজন যে!

—তা হোক্—তুমি এসো—কি খেতে চাও—

—শোলমাছ পোড়া—আজ মঙ্গলবার—

মূর্ত্তি গাছ হইতে নামিয়া উঠানের দিকে আসিতেছিল—অকস্মাৎ বিপুল শব্দ করিয়া দুই তিনজন লোক মূর্ত্তিটিকে আসিয়া ধরিল। কে যেন কহিল—তু কে বল? বল্—

মূর্ত্তি চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ মারিস্ না তু—

—বল তু শালী কে?

একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইল ভগবতী সদলে উঠিয়া গেলেন। প্রশ্ন করিলেন—কি কি? কে ও?

ভরত কহিল—হুজুর, মেয়েমানুষ বটে?

—কে? কে তু?

মূর্ত্তি কথা বলে না। ভরত তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া একটা ধাক্কা দিয়া কহিল—বল্‌না শালী—তু কে!

করুণকণ্ঠে উত্তর হইল—আদুরী!

ভগবতী কহিলেন—আদুরী!

ভরত কহিল—হ্যাঁ কর্ত্তা। নটবরের মেয়ে ছাড় হ'য়ে ঘরে রয়েছেন—

আদুরী ভগবতীর পা জড়াইয়া ধরিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—মু নাচার কর্ত্তা—আমি মরবেক—

ভগবতী একটু বিপন্ন হইয়া কহিলেন—ব্যাপার কি?

আদুরী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—বামুন মানুষ—দেবতা, মোর লেগে বেবাগী হ'য়ে যায়, মু কি করবেক? ছোটলোক রাঁঢ়ী—মোর আর ধরম কি কর্ত্তা?

ভগবতী হাঁকিলেন—আদাড়ী—আদাড়ী—

এতক্ষণে সমবেত জনতা আদাড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইল বারান্দায় কেহ নাই, ঘরে ঢুকিতে যাইয়া দেখা গেল, ঘরের দরজায় কুলুপ ঝুলিতেছে। আদাড়ী হট্টগোলের মাঝে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ভগবতী কহিলেন—আদুরী আয়, তু কাল কাছারী যাবি। সব শুনে যা হয় ব্যবস্থা করবো—নীলমণি, যা ওকে ঘরে দিয়ে আয়—

—ওরা মারবেক হুজুর—

—না, মারবে না। তুই যা—

ভগবতীর এই আদেশই যথেষ্ট—আদুরী নির্বিঘ্নে ঘরে গেল। ভরত কেবল নেশার ঘোরে কহিল—কাছারীতে দেখবি তু, আশনাই বড্ড খাল বটেক।

পরদিন সকাল হইতেই কাছারীতে লোক সমাগম হইয়াছে—আদুরীর এই ভৌতিক ক্রিয়ার বিচার হইবে। রাত্রেই সংবাদটা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে। ভগবতীর আজ আর গ্রাম পরিক্রমায় যাওয়া হয় নাই। ভগবতী বাড়ীর ভিতর হইতে প্রস্তুত হইয়া কাছারীতে যাইতেছিলেন—আদুরী বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়া আসিয়া পায়ের কাছে পড়িল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে

নিবেদন করিল যে কাছারীতে অত লোকের সাম্নে সে কিছু বলিতে পারিবে না।

ভগবতী বুঝাইয়া বলিলেন যে তাহা হয় না। বিচার যখন হইবে কথা হইয়াছে তখন কাছারীতে যাইতে হইবে, তবে ঘরের মাঝে তিনি লোক থাকিতে দিবেন না। সকলে বাহিরের বারান্দায় থাকিবে।

তাহাই হইল। ঘরের মাঝে ভগবতী ও দুই একজন গ্রামের প্রাচীন লোক রহিলেন, বাহিরে জনতা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ভগবতী কহিলেন—কতদিন তোরা এমনি করছিস্?

আদুরী চোখে আঁচল দিয়াই ছিল, সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—দেড় বছর—

—আদাড়ী ঠাকুরের সঙ্গে আশনাই কেন হ'ল?

—কর্ত্তা, উ বেবাগী হ'য়ে যায়, বামুন ঠাকুর মোর তরে কাঁদে, মু কি করবেক বল না। দেহ ত ছাই হবেকই, তার তরে বামুনকে কাঁদাবেক কেনে, তাই—

ভগবতী বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ-তনয়কে কাঁদাইতে পারে না বলিয়াই আদুরী আপনার দেহের পবিত্রতা রক্ষা করে নাই—সে দেহ ত একদিন ভস্মীভূত হইয়া যাইবেই।

—তা না হয় হ'ল। পেত্নি সেজে ওরকম করিস্ কেন?

আদুরী মুখ তুলিয়া কহিল—পেত্নির ভয় হলে ওদিক পানে লোক যাবেক নাই, তাই ঠাকুর বললে। যেমনটি বললেক—মু তেমনটি করলেক—

—ও আদাড়ী শিখিয়ে, তোকে দিয়ে এসব করেছে। বাঁশী বাজালে যেতে হবে না?

—হ্যাঁ কর্ত্তা, এক এক গানের এক এক বার্ত্তা কর্ত্তা।

অর্থাৎ বিশেষ কোন গানের কলি বাজাইলে বিশেষ কোন কাজ করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

—কতদিন তোর ছাড় হ'য়েছে?

—দু' বছর—

—তু সাঙ্গা করবিনে—

—আপনি হুকুম দিলে করবেক—

—তোকে কেউ সাঙ্গা করতে চায় নি?

—হ্যাঁ কর্ত্তা, ভরত ত কতদিন বল্‌ছে—

—তাকে সাঙ্গা করবি?

—করবেক।

—আর কাউকে তোর পছন্দ হয়ত বল—

—না ভরতকেই মু সাঙ্গা করবেক—

ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত কথা বলা হইল। ভরত কহিল—উ বলে, ঠাকুরের ওখানে যাবেকই, মু কিছু ব'লবেক না—

আদুরী করুণ আঁখি মেলিয়া একবার ভরতের দিকে চাহিল—যেন বলিল—লাঞ্ছনা ত যথেষ্টই হইয়াছে আর কেন?

ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—ভরতকে সাঙ্গা করেও কি তুই ঠাকুরকে ছাড়বি না—

আদুরী চোখে আঁচল দিয়া চুপ করিল। কোন জবাব দিল না—

—কি করবি বল—

আদুরী একবার ভরতের পানে আকুলভাবে তাকাইয়া কহিল—ঠাকুর যদি ডাকে মু কি করবেক—

ভরত কিছু বলিল না এবং ভগবতীও যেন কেন একথাটার মীমাংসা করিতে চাহিলেন না। ভগবতী শুধু কহিলেন—ঠাকুরত নিরুদ্দেশ হ'য়েছে—ফিরবে কি ফিরবে না কে জানে! তা আদুরী সাঙ্গা করতে কি চাস্?

আদুরী সগর্ব্বে কহিল—মু ত টাকা সাঙ্গা করবেক না কর্ত্তা, মানুষ সাঙ্গা করবেক।

আদুরীর কথাবার্ত্তায় ভগবতী কেমন যেন একটু সমবেদনা বোধ করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন—সেই ভাল। যা সাম্নের সোমবার দিন আছে, সাঙ্গা হবে।

ভগবতীর আজ্ঞা জনতার মাঝে প্রচারিত হইল। তাহারা সকলে ব্যবস্থা অনুমোদন করিল। নটবর ও বাগ্দী-পাড়ার মোড়ল সাঙ্গা দিবার ভার গ্রহণ করিল। ভগবতী সংক্ষেপে জনতাকে বলিলেন—সাঙ্গা অভাবে চায আবাদ করিতে পারিতেছে না। দুজনে মনের মিলও আছে, অতএব এই ব্যবস্থাই সমীচীন।

অতএব তাহাই স্থির হইল।

মতি ঠাকুর মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছেন। গোপালের বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের প্রথমেই দিন হইয়াছে।

ভগবতী কহিলেন—বেশ বেশ, এখন জোগাড় করুন। ধরুন একশ' খানা গাড়ী যাবে, আড়াইশ বরযাত্রী। আর দুখানা গাড়ীতে থাকবে চিঁড়ে গুড় মুড়ি, আর বাজনাদার দুখানা গাড়ী, আর একখানা বরের—তা হ'লে একশ পাঁচ খানা। গাড়োয়ান একশ' পাঁচ আর বাজনাদার দশ, আর বরযাত্রী দু'শো—তিনশ' দশ—তাই হবে—

মতিঠাকুর হাসিয়া কহিলেন—এ যে রাজসিক ব্যাপার।

ভগবতী হাসিয়া কহিলেন—বটেই ত, বিবাহ জিনিষটাই ত রাজসিক। সব হ'য়ে যাবে কোন চিন্তা নাই—

মতি ঠাকুর উৎসাহিত না হইয়া চিন্তিত হইয়াই ফিরিলেন। কন্যা উচ্চ সমাজে দিতেছে বলিয়া কন্যাপক্ষ পণ চায় নাই, কিন্তু আট ভরি গহনা দিতে হইবে এবং বেনারসী সাড়ী।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি চিন্তিত হইয়াই বসিয়াছিলেন। গৃহিণী কহিলেন—ঠাকুরপোর বিয়ে ঠিক ত করলে। ঘরে ত মা নেই, আমিই ত বৌ বরণ করে ঘরে তুল্‌বো, কিন্তু মুখ দেখ্‌বো কি দিয়ে!

ঠাকুর মশায়ের মনে এ প্রশ্ন ছিল, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। গৃহিণী কহিলেন—ওর মা নেই, মার কাজ আমাকেই ক'রতে হবে ত? বাজু আর অনন্ত ভেঙ্গে একটা কড়ি-হার করে দাও।

—তোমার বাজু আর অনন্ত—

—তবে আর কার? আমিই ত মানুষ করলাম গোপালকে, কে আর আজ দেবে?

মতি ঠাকুর মশায় কহিলেন—তা দেবে বৈ কি? খেয়ে ত আনন্দ নেই, খাইয়ে আনন্দ—নিয়ে আনন্দ নেই, দিয়েই ত আনন্দ—রামচন্দ্র বড় ভাই বলেই ত এত লাঞ্ছনা।

—যাহোক্, জনার্দ্দনকে ডেকে দিয়ে যাও।

—আচ্ছা দেব—

গৃহিণী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

মাঘের ১৮ই বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। মতিঠাকুর একটু চিন্তান্বিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে ভগবান যেমন করিয়াই হোক চালাইয়া দিবেন, কতবার এমনি বিপদ আসিয়াছে ভগবানই বিপদমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আজ সকাল সকাল খাইয়া বিশ্রাম করিতে হইবে। চার ক্রোশ দূরে রাজনগরে কালরাত্রে একটা বিবাহ আছে। মতিঠাকুর স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, গোপাল আসিয়া কহিল—দাদা, রাজনগরে আমি গেলে হয় না—

—তুই যাবি কেন্?

—আপনি এত রাস্তা হেঁটে এলেন তাই ব'লছিলাম।

—তুই ছেলে মানুষ, তোকে পুরুত বলে মান্‌বে কেন?

গোপাল তবুও প্রতিবাদ করিল—না গেলে কাজ শিখ্‌বো কি করে? দশজায়গা না গেলে পরিচয়ই বা হবে কি করে?

মতি ঠাকুর কহিলেন—আচ্ছা ভেবে দেখি—

গোপালের যুক্তি নেহাৎ উপেক্ষার নয়, তাহারও বয়স হইয়াছে। পরিশ্রম করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেটা আর সহজসাধ্য নাই। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া গোপালকেই অপরাহ্নে যথাযথ উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সারদা ডাকিয়া গেল—চণ্ডীমণ্ডপে যাইবেন এমন সময় পলাশপুরের মথুর চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত। বিবাহের জোটক বিচার করিতে। জোটক বিচারান্তে মথুর কহিল —গোপালের বিবাহ ঠিক করেছেন শুনলাম—

—হ্যা ঠিক ত করেছি।

—দেনা পাওনা?

ঠাকুর মহাশয় সমস্ত বিবৃত করিলে মথুর কহিলেন—এতে চিন্তিত হবেন কেন? আমরা রয়েছি। আপনার কাজ ত আমাদেরই। আর ব্রাহ্মণের বিবাহে দান, এত পরম সৌভাগ্য।

মথুর অবস্থাপন্ন মৌজাদার, তাহার কথায় ঠাকুর মশায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এমনি করিয়া যজমান, শিষ্য সকলেই তাঁহাকে জানাইল —তাঁহার কোনও চিন্তার কারণ নাই।

রাজনগরের বিবাহান্তে মতি ঠাকুর শুনিলেন, গোপালের খুব নাম হইয়াছে। বরপক্ষের পুরোহিত গোপালকে ছেলেমানুষ ভাবিয়া নানারূপে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু গোপালের নিকটে বিচারে সর্ব্বদা পরাস্ত হইয়াছে। গোপাল সেজন্য উভয় পক্ষ হইতেই দক্ষিণা পাইয়াছে। শুনিয়া মতিঠাকুর সুখী হইলেন—ভ্রাতা ও

শিশু হিসাবে গোপাল যে তাহার নাম রাখিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের পূর্ব্বদিন মতিঠাকুর সংবাদ পাইলেন, ভগবতী একশত দশখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং দুইদল বাজনাদার ঠিক করিয়াছেন। মতিঠাকুর ব্যস্ত হইয়া ভগবতীর নিকট যাইয়া একটু বিরক্তির সঙ্গে কহিলেন—এ সব কি করছ ভগবতী, একশ গাড়ী, দু'শ বরযাত্রী—এ কি আমি নিতে পারি। তোমরা দশজনে যা দেবে, তাই নিয়ে ত সব করা—

ভগবতী হাসিয়া কহিলেন—তা ত' হ'ল, কিন্তু যখন লোকে বল্‌বে ভগবতী চাটুয্যের পুরুত-বাড়ীর বিয়ে—যাচ্ছে তিনখানা গাড়ী টঙ্গস্ টঙ্গস্ করে তখন আমার মুখ ত ছোট হবে। সেটাই বা কেমন করে হতে পারে বলুন—আমার সব প্রজারা গাড়ী নিয়ে যাবে—যাতায়াতের খাই-খরচ আমার—সেখানে ত ওরাই খাওয়াবে, কাজেই আপনার ভাবনা নেই—আপনি এখন বরযাত্রী নিমন্ত্রণ করুন।

মতিঠাকুর কহিলেন—তুমি যাবে ত?

—তা না হলে এদিকে কে দেখ্‌বে বলুন? আপনার গয়না, দান-পত্র, কাপড় সব ঠিক আছে ত?

—হ্যাঁ—

—তবে আর ভাবনা কি? বৌভাত? সে পরে দেখা যাবে।

রাত্রি দণ্ড কয়েক থাকিতে গাড়ী রওনা দিবে, তাহা হইলে ঠিক সন্ধ্যায় কন্যার বাড়ীতে পৌছান যাইবে। গ্রামের সমস্ত বাগদী, বাউরী, ধাঙড়, কুর্ম্মী প্রজারা গাড়ী ও গরুর খাদ্য লইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে গ্রামের সড়কে দাঁড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে রেড়ির তেলের মশাল জলিতেছে। ভগবতী হাঁক দিলেন—নীলমণি গাড়ী গুণ্‌তি কর্—

নীলমণি গাড়ী গুণ্‌তি করিয়া আসিয়া কহিল—ছয় কুড়ি বার খানা—

—এত গাড়ী কি হবে রে? বরযাত্রী হল মাত্র একশ—

ভগবতী কহিলেন—যারা যেতে চাস্ না তারা বল—

কেহই কথার জবাব দিল না। ভগবতী সাম্‌নে রতন বাগদীকে পাইয়া কহিলেন—রতন, তোরা আর যাস্ না—

রতন হাতজোড় করিয়া কহিল—তা কি হয় কর্ত্তা, ঠাকুরমশার বাড়ীর বিয়ে আমি যাবো না—পলাশডাঙ্গায় দশখানা গাড়ী অন্ততঃ যাবে না! তা কি হয় কর্ত্তা—

ভগবতী চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ফিরিয়া যাইতে সম্মত নয়। তাহারা কিছু পারিশ্রমিক পাইবে না তাহা তাহারা জানে, কিন্তু কর্ত্তব্য হিসাবে এটা না করিলে লোকনিন্দা হইবে। অতএব শেষ পর্য্যন্ত সকলেই যাইবে স্থির হইল।

রতন কহিল—ঠাকুরমশার বাড়ীর বিয়েতে যাবেক নেমন্তন্ন খাবেক—এতে বঞ্চিত ক'রবেক কে?

কে যেন কহিল—হ্যাঁ বটেক—গোপালদাদার বিয়ে—

শীতের প্রত্যুষে একশত বত্রিশখানি গাড়ি শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইল। পিছনে তিনখানা গাড়ীতে চিড়ামুড়ি, চাউল, গুড়, ডেগ ডেগচি চলিতেছে। সকালে মুড়ি চিড়া, দ্বিপ্রহরে রাজনগরের ডাঙ্গায় খিচুড়ী ও সন্ধ্যায় পুনরায় মুড়িগুড়—ইহাই বরযাত্রীর খাদ্য—ভদ্র ইতর নির্ব্বিশেষে। মাঝে মাঝে একটা হৈ চৈ শব্দ তুলিয়া তাহারা চলিয়াছে—দুইখানা গাড়ীতে বসিয়া বাজনদারগণ শানাইসহ ঢোলের কসরত করিতেছে। গ্রাম্য বধূগণ সলজ্জ দৃষ্টিতে এই দীর্ঘ গোশকটের শোভাযাত্রা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে—বর দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বরের গাড়ী খুঁজিতেছে।

বিবাহান্তে সকলে ফিরিল—লোকের মুখে মুখে সারদার কীর্ত্তি, কি করিয়া বরের টোপর পরিয়া গ্রাম্যবধূগণকে ডাকিয়া নিজেকে বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, মুড়ি খাইবার জন্য নূন লঙ্কা সংগ্রহ করিয়াছে, খিচুড়ী রাঁধিবার কাঠ ভাঙ্গিতে যাইয়া সকলকে ভালুকের ভয় দেখাইয়াছে, কন্যার বাড়ীতে স্ত্রীলোক সাজিয়া বাসর ঘরে ঢুকিয়া মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। লোকে সারদার কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। কন্যাপক্ষ খুব খাওয়াইয়াছে—লোকও খাইয়াছে সহস্রাধিক।

(ক্রমশঃ)

শান্তি রক্ষার উপায়

শ্রীনয়নগোপাল চৌধুরী

বিচার-বিবেচনা থাকা সত্ত্বেও জৈব প্রবৃত্তির প্রেরণায় অনেকে অনেক সময় নানারূপ অমানুষোচিত কাজ করিয়া ফেলে। ফলে, সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু অশান্তি কাহারও কাম্য বস্তু নহে। শান্তি সকলেই চায়। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শান্তিরক্ষা সহজ ও সম্ভব হয়, তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

শান্তি বজায় রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে মানুষের সহিত ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। মানুষের ব্যবহার বড় কঠিন কাজ। এই ব্যবহারে যদি কোথাও কোনরূপ ভুল বা ত্রুটি হইয়া যায় তাহা হইলে মানুষের বিপদ আসে। ব্যবহারের দোষে পরম আত্মীয়কেও শত্রুতে পরিণত করা হয়।

শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্ম-মর্যাদার বিশেষ একটি অনুভূতি আছে। সেই অনুভূতিতে যখন আঘাত লাগে, তখন সে হয় বিরূপ। যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, কেহ আপন অক্ষমতাটি ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। ধনী অথবা দরিদ্র, বিদ্বান অথবা মূর্খ, সবল অথবা দুর্বল—কেহই নিজেকে অন্যের অপেক্ষা হীন বা ছোট বলিয়া মানিয়া লইতে চাহে না। প্রধানতঃ এই জন্যই অশান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং কাহারও আত্ম-মর্যাদায় কদাপি আঘাত দেওয়া উচিত নহে। আঘাত দুই প্রকারে দেওয়া হইতে পারে—এক কাজের দ্বারা, আর এক কথার দ্বারা। কাজের দ্বারা আঘাত দিতে গিয়া মানুষ কিছুটা সময় পায় এবং সেই সময়ের মধ্যে যদি তাহার মনের পরিবর্তন ঘটে তবে সে আঘাত দেওয়া হইতে বিরত হইতে পারে। কথা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়। এই নিমিত্ত কথার দ্বারা আঘাত দেওয়া সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার নহে, তাহা অতি সহজেই সংঘটিত হয়। এই হেতু বাক্-সংযম একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে অনবধানতাবশতঃ ও কাহাকে আঘাত দেওয়া বা ব্যথা দেওয়া না হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। রক্ত-মাংসের শরীর সকল সময় সকল জিনিষ সহ্য করিতে পারে না। এজন্য কিছু সান্ত্বনার প্রয়োজন। সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা সর্বত্রই স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। এই শৃঙ্খলার মূলে অস্বাভাবিক আঘাত দেওয়া মোটেই সমীচীন নহে। আমাদের পৃথিবীতে আসাটা যেন কোন মেলাতলায় বা কুটুম্ব-বাড়ীতে আসার সামিল। মেলাতলায় বহু প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কেহ সেখানে খাবার তৈয়ারী করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে, কেহ ক্রয় করিতেছে। কাহার স্বচ্ছন্দে জিনিষপত্র বিক্রয় হইতেছে, আবার কেহ বা ক্রেতার অভাবে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে। কেহ জুয়া খেলিতেছে, কেহ মদ্যপান করিতেছে, কেহ হরিনাম করিতেছে। কেহ বা ভিক্ষা করিতেছে, আবার কেহ বা দান করিতেছে। যে বুদ্ধিমান, সে ঠাণ্ডা মাথায় আপন কাজগুলি গুছাইয়া লইয়া মনের আনন্দে বাড়ী ফেরে। আর যাহাদের বুদ্ধি বিবেচনার অভাব, তাহারা নানারূপ গণ্ডগোল বাধাইয়া বিশৃঙ্খলা করিয়া সে স্থান ত্যাগ করে। কুটুম্ব-বাড়ীতে গেলেও দেখ, কত সাবধানে চলিতে হয়। যিনি শ্রদ্ধার পাত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে হয়; যে ভালবাসা পাইবার পাত্র, তাহাকে স্নেহ ভালবাসা দিতে হয়। নতুবা কুটুম্ব-বাড়ীর লোকেরা ও সে অঞ্চলের লোকেরা নিন্দা করে। প্রতিটি কাজ যে সেখানে সাবধানে সারিতে পারে লোকে তাহারই প্রশংসা করে—তাহাকেই বাহবা দেয়। সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চলিতে পারিলে শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটে না ও শান্তি রক্ষিত হয়। সংযম, গাম্ভীর্যের সহিত অমায়িকতা, নিরলসতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণগুলির সমন্বয় শান্তি বজায় রাখার অনুকূল।

ব্যবহার করার দিকে সতর্কতার কথা যেমন বলিতেছি—ব্যবহার পাওয়ার সময়ও অনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। ভাল-মন্দ সকল লোক লইয়া সমাজবদ্ধভাবে আমাদের বাস করিতে হয়। সুতরাং মন্দ ব্যবহার পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তথাপি কাহারও মন্দ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইতে নাই। ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে বিবেক-বিভ্রম ঘটে ও তজ্জন্য নানারূপ অসংলগ্ন কথা বাহির হইয়া যায়। কাহারও বিপক্ষে কোন কিছু মন্তব্য করার পূর্বে বা কাহারও বিরুদ্ধে কোন কিছু করিবার আগে বেশ করিয়া তলাইয়া ভাবিয়া দেখিবে, যে কথা বলিতে যাইতেছ বা যে কাজ তুমি করিতে যাইতেছ তাহা বলিয়া ফেলিলে অথবা তাহা করিয়া ফেলিলে শেষ পর্যন্ত তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইতে পারে। ভাবপ্রবণ মোটেই হইতে নাই। মনের ভিতরে যখন যন্ত্রণার বেগ আসে তখন তাহা বাক্যাকারে নিঃসৃত হয়। এ সময় নিজেকে সংযত রাখা অবশ্য কর্তব্য। যন্ত্রণা অসহ্য হইলে গম্ভীর হইয়া থাকিতে হয়। তাহাতে অপারগ হইলে মনকে অন্যদিকে নিযুক্ত করিতে হয়। তাহাতেও অপারগ হইলে তৎ-ক্ষণাৎ স্থান পরিবর্তন করাই বিধেয়। 'ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু'—এ কথা মনীষীরা বলিয়া গিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রমাণও পদে পদে পাওয়া যায়। যদি তুমি কাহারও ব্যবহারে ব্যথা পাও এবং সেজন্য তাহার প্রতি ক্রোধ দেখাইতে থাক ও প্রতিশোধের চেষ্টা কর, তবে তাহা অর্থহীন—ক্ষেত্রানুসারে ভ্রান্তিপূর্ণ। এরূপ করিলে ত্রুটী ছাড়া কিছুই সাব্যস্ত হওয়া যায় না। হাতের ঢিল আর মুখের কথা—এ দুটি একবার বাহির হইয়া যাইলে কোনমতে আর ফিরিয়া আসে না। বেগ তোমাকে ধারণ করিতেই হইবে—তাহা ক্রোধেরই হউক, বা অন্য কোন রিপুরই হউক। হয়ত বলিবে, ক্রোধই যদি প্রকাশ না করিলাম তবে কি পড়িয়া মার খাইব! দেখ, মার খাইবার প্রয়োজন হইবে না। একটা কথা আছে—"কামড়াবে না, তবে ফোঁস করবে।" সাধারণ কথায় ফোঁস করিবার অর্থ বাহিক রাগ প্রকাশ করা। কিন্তু তাই বলিয়া, প্রতি ক্ষেত্রেই যদি 'ফোঁস' 'ফোঁস' করিতে হয়, তবে সে-ও একটা শ্রুতিকটু ব্যাপার হইয়া

উঠে। ইহা অপেক্ষা প্রতিরোধ করিবার শক্তি অর্জ্জন করা ও তাহা যত্ন-সহকারে সংরক্ষণ করাই মঙ্গলজনক। কারণ তোমার মধ্যে এরূপ শক্তির অস্তিত্ব জানিতে পারিলে তোমার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আসিবার সাহস পর্য্যন্ত থাকিবে না। বলা বাহুল্য—বিদ্যা, বিত্ত এবং সামর্থ্য (দৈহিক, নৈতিক ইত্যাদি) এই শক্তির অন্তর্ভুক্ত। নিজেকে এরূপ শক্তিতে শক্তিমান না করিতে পারিলে কিছুটা অবশ্য গলাবাজি বা ফোঁসের প্রয়োজন হয়। মহামতি Carlyle বলিয়াছেন—"No man can live without jostling and being jostled." যাহা হউক, সংঘর্ষকে যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলাই বাঞ্ছনীয়। সংসার বড় কঠিন ক্ষেত্র। এখানে প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। পরস্পর নির্ভর না করিলে জগত অচল হইয়া যাইত। কোন লোক তাহার সকল প্রয়োজন একাকী মিটাইতে পারে না। পণ্ডিতের মূর্খ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, আবার সেরূপ শ্রমিকেরও পণ্ডিতের আবশ্যক হয়। এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদান প্রতিক্ষেত্রেই চলিতেছে। আজ অর্থের বলে, শক্তির অবলতায় অথবা যে কোন কারণেই হউক—যাহার প্রতি অবহেলা আসিতেছে, যাহাকে মন্দ ও অন্যায় বলিয়া মনে হইয়া দু কথা শুনাইতে ইচ্ছা যাইতেছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিও—এমন একটা সময় আসিতে পারে যখন ঠিক ঐ লোকটিকেই তোমার প্রয়োজন হইবে—যেন সে নহিলে কোন একটা বিশেষ কাজের জন্য তোমাকে বিরত হইতে হইবে। কি বিচিত্র সামাজিক জীবন, কি বিচিত্র জগতের লীলা! এই জন্যই কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই। ন্যায় অন্যায়ের বিচার করা অত্যন্ত কঠিন। একজন, অন্য একজনের কাছে মন্দ হইতে পারে; কিন্তু সে-ই আবার আর একজনের কাছে অতিশয় সজ্জন বলিয়া গণ্য হয়। এজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে ভাল-মন্দের নির্ব্বাচন করা যায়। মন যাহাকে মন্দ বলিয়া পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করে তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সাবধানে তাহাকে পরিহার করিয়া চলাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। "Silence is deep as eternity, speech is shallow as time." এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা মনে আসিতেছে—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা;……
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে।"

কবিগুরু যথার্থই বলিয়াছেন। ব্যবহারিক জগতে এরূপ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চলিতে পারিলে অত্যাচারকে নিবারণ করা, অন্যায়কে দমন করা সহজ হয় সত্য; কিন্তু নিজে ন্যায়নিষ্ঠ হইতে না পারিলে, নিজে কোন অংশে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল হইতে না পারিলে, দেবর্ষির এই বাণীকে সত্যে পরিণত করা অসম্ভব ছাড়া সম্ভব হইবে না। ইহার অপপ্রয়োগ শুধু অশান্তিকেই বৃদ্ধি করিবে।

গান্ধীজী ও হিন্দু সংস্কৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু

সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ গান্ধীজীর গভীর কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় না পেয়ে, যদি তাঁর দার্শনিক ও সত্যানুসন্ধানকারী ঋষি সত্তারই আলোচনা করি আমরা, তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করার ও তাঁর কাজকে বিকৃত করে দেখার একটা সম্ভাবনা সব সময়েই রয়ে যায়। কিন্তু যা বৃহৎ, তার প্রকৃতিগত গুণই হোলো এই, যে তার আংশিক আলোচনাই চলে, আপাতঃদৃষ্টিতে অসংগত বোধ হলেও তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হোলো এই যে—তাঁর কাজের চেয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের আবেদন গভীরতরভাবে সার্ব্বজনীন। তাঁর জীবনের সমস্ত কাজের ধারাবাহিকতা যদি আলোচনা করি আমরা, তাহলেই তাঁর ঋষি-সত্তার স্পষ্ট সুষ্ঠু পরিচয় পাব আমরা। সভ্যজগতে তাদের অতি-পরিচিতির জন্য তাদের উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করিনা।

হিন্দু ধর্ম্মের আলোকপাতে গান্ধীজীর চিন্তাধারা কতখানি পুষ্ট হয়েছে, ভারতীয় দর্শন তাঁর মতবাদকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছে, তা' নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। ৬ই অক্টোবর ১৯২১ সালে হিন্দুধর্ম্মের উপর যে প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন—তার মাঝে ঐ আলোচনার যথেষ্ট উপাদান আছে—মীমাংসাও পাওয়া যেতে পারে। "হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের উপর আমার বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে আমায় স্বীকার করে নিতে হবে যে তার প্রতিটি শ্লোক প্রতিটি কথা স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থগুলি সবকটির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দাবীও আমি রাখিনা। কিন্তু আমি মনে করি যে এই শাস্ত্রগুলির মূলগত সত্য আমি জানি ও অন্তরে অনুভব করি। কিন্তু এই সব গ্রন্থের কোন ব্যাখ্যার মাঝেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাই না আমি, যদি তা' যুক্তি ও নীতি-বিরোধী হয়।"

হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। ভারতীয় দর্শনের চরম ও পরম কথা আধ্যাত্মিকতা; ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিবৃত্ত মূলগতভাবে এই কথা বলে—প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণের

ভাষায় তাঁকে এই ভাবে বলি—হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন "অসত্যের বিরুদ্ধে মানব মনের সত্যের অন্তহীন অনুসন্ধান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভিযান এবং অন্ধতামস-ভেদী আলোকের নব-জাগরণ।" শাস্ত্রের শব্দগত অর্থকে উপেক্ষা করে অন্তর্নিহিত ভাবধারার পরেই জ্ঞানীজনোচিতভাবেই তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন বেশী। তথাকথিত পণ্ডিতেরা শব্দার্থগত ব্যাখ্যানকেই গ্রহণ করে ভুল করেন। তাঁদের এই বিকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন—"ঘড়িতে যে রকম দম দেওয়ার প্রয়োজন হয়, মানুষের অন্তরকেও সততায় ও যুক্তিতে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়, নতুবা অন্তরের প্রকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়।" "like the watch the heart needs the winding of purity and the head of reason or the dweller ceases to speak." এই দৃষ্টিভংগী থেকেই, হিন্দুধর্ম্মের চরম কথা—অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যানুসন্ধানের মহান উদ্দেশ্য, গান্ধীজীর মধ্যে প্রণোদিত হয়েছে। সময়ে সময়ে তিনি ভুল করেছেন এবং সবার আগে একথা নিজেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর শক্তি ও সাধ্য মতো যা তিনি পেয়েছেন তা করতে কখনো বিরত হননি। তাঁর সমগ্রজীবনকে তিনি সত্যের অনুসন্ধান বলে অভিহিত করেছেন; তাঁর জীবনময় যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা কাজ করেছে তা' হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্যে তাঁকে করে তুলেছে গৌরবান্বিত।

গীতার সশ্রদ্ধ পাঠক তিনি; এর উপরে তাঁর কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধও রয়েছে। একথা তিনি অনুভব করেছিলেন যে—মানব জীবনে গীতার প্রভাব ক্রমশই কমে চলেছে; আধ্যাত্মিক পরিণতির বিভিন্ন স্তরে গীতার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন তাঁর চিন্তার মধ্যে তাকে উপলব্ধি করতে। ঐ সংগে ঐ কথাও মনে রাখতে হবে যে —প্রাচীন ভারতের সেই ঋষিদের ঐতিহ্যগত পন্থাই তিনি অনুসরণ করেছেন যাঁরা গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন নিজেদের বিশিষ্ট জীবন-দর্শনকে সমর্থন করার জন্যই। চিরাচরিত স্বীকৃত বিশ্বাস যখন যুগের অনুপযোগী হয়ে যায়, কালের পরিবর্ত্তনের সংগে যখন তা' মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তখনই নতুনদিনের নতুন যুগগুরুর অন্তর্দৃষ্টি জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি করে। এই নতুনের অনুসন্ধানকে উপলক্ষ করেই প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—হিন্দু চিন্তাধারার অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্বিচারের মহান ক্ষণে, অজ্ঞাত উৎস-শক্তির আহ্বানে মানুষের আত্মা নতুন যাত্রা সুরু করে নতুনতর সত্যের অনুসন্ধানে।" অহিংসার আলোচনাকে প্রধান রেখে গান্ধীজী গীতার যে ভাষ্য রচনা করেছেন তাতে উভয়কেই সমান প্রাধান্য দিয়ে তিনি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও দার্শনিক সত্যের সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছেন।

গীতার যে অংশ নিয়ে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা নেই, সেই অংশের সত্যতা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম পরীক্ষা করেছেন। গীতার অর্থ আলোচনা করে যে প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন—তাতে তিনি বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ১৯টি শ্লোক আমার মনে গাঁথা রয়েছে। ঐ শ্লোকগুলি থেকেই আমার সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছি আমি—এই অংশে রয়েছে অন্তহীন বৈচিত্র্য। এর মধ্যে যুক্তি আছে, কিন্তু তারা উপলব্ধ জ্ঞানেরই প্রতিমূর্ত্তি।"

তাঁর প্রধান বক্তব্য অহিংসা সম্বন্ধে সব সময়ে সততা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তিনি! সূক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার পর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অহংবোধের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি মাঝে, যে সত্য অনুভব করেছেন তিনি—তাকেই গীতার সত্যকার অর্থ বলে প্রচার করেছেন। "আত্ম-উপলব্ধি ও তারই পথনির্দ্দেশ গীতার মূলকথা। দুই সৈন্যদলের যুদ্ধ এই পথ নির্দ্দেশেরই উপলক্ষ মাত্র। যদি মনে কর, একথাও বলতে পার—কবি ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ ও হিংসার বিরোধী ছিলেন না; সেবার প্রচারে যুদ্ধকে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন নি তিনি। কিন্তু মহাভারতের বক্তব্য আমার মনে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে।" কালের প্রগতির সাথে সাথে যে সব ধারণা পুরাণো হয়ে চলেছে তাদেরই মধ্যে যুক্তি সংগত সামঞ্জস্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন তিনি।

অহিংসবাদে তাঁর দান জৈন মতবাদের পুনরুক্তি মাত্র নয়। অহিংসার ব্যাপকতম অর্থে প্রশস্ত জীবনযাপনের পথ নির্দ্দেশ দিয়েছেন তিনি। ১৯২২ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ও ১৯২০ সালের ২৫শে আগষ্টে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে তিনি অহিংসার যে অর্থ করেছেন, তাতে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে অহিংসা শুধু ক্ষতিহীনতার নেতিবাচক পদ্ধতিই নয়, প্রেম ও কল্যাণের একটা বিশিষ্ট অবস্থা—যে প্রেম, যে কল্যাণ শত্রুর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমে পরিণত হয় না। কিন্তু একথাও তিনি বলেছেন "অহিংসার অর্থ এই নয় যে অন্যায়কারীর অন্যায় নিক্রিয়ভাবে সহ্য করে তাকে অন্যায় করতে সাহায্য করা হয়। বরং অহিংসার সক্রিয় অবস্থার প্রেমে এই প্রয়োজনই ঘটে যে দুষ্কৃতকারীর থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে; যদিও তাতে—দুষ্কৃতকারী কিছু মনে করে বা তার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।" সকল যুগের সাধুদের মত তিনি অনুভব করেছেন যে আত্মার সত্যই পরম সত্য। তাই শুধু নিজের দেশবাসীকে নয়, যে কেউ তার সুরুচিসম্পন্ন জীবনে সত্যানুসন্ধান করেছে, তারই জন্য এই পরম সত্যের আলোকরশ্মি বহন করে এনেছেন তিনি।

সবচেয়ে বড়ো কথা হোলো এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র মানুষের আত্মাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে; হিন্দু ঋষিরা বহির্বিশ্বের প্রবহমান ঘটনাস্রোত থেকে তাঁদের দৃষ্টি করে তোলেন অন্তর্মুখী—আত্মাকে জানার জন্য ও উপলব্ধি করার জন্য। সেই ভবিষ্যৎদর্শী পুরুষেরা সবচেয়ে বড় কথা বলে গেছেন "আত্মানম বিদ্ধি"—পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মের এই মূল চিন্তাটি গান্ধীজীর মধ্যেও আপনার সগৌরবের আসন করে নিয়েছে। "আমার উদ্দেশ্য" (৩, ৪, ২৪) প্রবন্ধে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভংগীতেই একথা বলেছেন "আমি সত্যের সন্ধান করি। আমার আত্ম-উপলব্ধির কাজে, এই জীবনেই মোক্ষলাভের প্রচেষ্টায় আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠেছি। আমার জাতীয়তাবাদী কার্য্যকলাপ আমার দেহবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তিদানের প্রচেষ্টারই অংশ। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমাকে

স্বার্থপর বলা চলে—পৃথিবীতে যে রাজত্ব একদিন ধ্বংস হবেই তার প্রতি আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি স্বর্গরাজ্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী অর্থাৎ আমি মোক্ষলাভ করতে চাই।" যাঁর কর্ম্মবোধ তাঁর জীবনে আর সকল সুরকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে—মানব জগতের এই নিঃস্বার্থতম মানুষটি তখনই স্বার্থপর হয়েছেন—যখন সংসারে আর সব কিছুর চেয়ে নিজের মুক্তিকেই বড় করে দেখেছেন।

তাঁর বৃহত্তর সত্তা নিঃস্বার্থতারই প্রতিমূর্ত্তি ; তাই তাঁর মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের মৃত আত্মা থেকে আমরা এই বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হতে পারি। তাঁর কথাতেই বলি "যখন আমি একথা বলি যে আমার নিজের মুক্তিকে আমি সব কিছুর উপর মূল্য দিই, তার থেকে এ অর্থ হয় না যে—আমার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য তার কাছে ভারতের রাজনৈতিক অথবা অন্য মুক্তির স্বার্থ বলি দেওয়ার সার্থকতা আছে ; কিন্তু একথা স্বভাবতঃই বোঝায় যে আমার ব্যক্তিগত মুক্তি ও ভারতের মুক্তি একই সূত্রে বাঁধা। একই অর্থে যখন বলি যে অহিংসার মূল্য ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা গ্রহণ করতে আমি অস্বীকার করি—তখন এই কথাই বলি যে অহিংসা ব্যতীত বা হিংসাত্মক পথে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবেনা কোনদিন। হতে পারে আমার এ মত সম্পূর্ণ ভুল, সে আলাদা কথা ; কিন্তু এই আমার কথা, এই আমার মত, দিনে দিনে এতে আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে।"

মাদ্রাজে রোটারি ক্লাবের বক্তৃতায় প্রফেসর রাধাকৃষণ গান্ধীজীর অহিংসায় দৃঢ়বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বল্লেন যে—জাতির কুসংস্কার ও সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। এ কথার সত্য হোলো এইটুকু যে —সত্যানুসন্ধানী কোন লোকই কুসংস্কার ও প্রতিকূলতায় নিজের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হতে দেন না। কিন্তু এই নিয়ে আরও অনেক কথাই বলা চলে, গান্ধীজী নিজেই এর সম্বন্ধে বহু কথা বলেছেন। তাঁর কর্ম্ম দৃষ্টি ও চিন্তা ধারার আলোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের কৃষ্টিগত পট-ভূমিকাতেই তা গড়ে উঠেছে। তাঁর ধীশক্তির অনন্যসাধারণত্ব সর্ব্বজন-স্বীকৃত। তবু যখন তাঁর এই ধীশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা হয়, কারুর মনেই ধর্ম্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকেনা। প্রফেসর রাধাকৃষণ নিজেই বলেছেন "ধর্ম্মচিন্তা ভারতে দার্শনিক চিন্তা প্রণোদিত করে।" গান্ধীজীর জীবনে শুধু যে তাঁর দার্শনিক চিন্তাই পরিপুষ্ট হয়েছিল তা নয়, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনৈতিক জ্ঞান, জীবনে প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, তাঁর ধর্ম্মজ্ঞানে নূতনতর প্রেরণায় রূপায়িত হয়েছে। আলোচ্য অংশের আলোচনাকে পূর্ণ করে তোলার জন্যই তাঁর উদ্ধৃতির প্রয়োজন—"আমার অন্তরে যে রাজনৈতিক সত্তা তা আমার কোন কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। রাজনীতি আমার জীবনকে সাপের মতন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে বলেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছি আমি —আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই সাপের পাক থেকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি না। সংগ্রাম চালানোর জন্যই আমি ও আমার বন্ধুরা রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন ঘটিয়েছি। ধর্ম্ম বলতে কি বুঝি এ প্রসংগে তা ও বলতে চাই আমি। হিন্দু ধর্ম্মকেই আমি অন্য সব ধর্ম্মের উপর স্থান দিই না, কিন্তু যে ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরও উপরে, যা মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটায়, যা অন্তরের গভীরতম সত্যের সাথে একসূত্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে মানুষকে বেঁধে দেয়, যা মানুষকে সর্ব্বদাই পবিত্র করে, সেই ধর্ম্মকেই সব ধর্ম্মের উপরে স্থান দিই আমি। মানুষের অন্তরে একটা চিরন্তন উপাদান আছে যা কোন মূল্যকেই আত্মবিকাশের পথে বেশী মনে করে না, যার ফলে বিশ্বস্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার ও তার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষের আত্মা কখনো শান্ত হতে পারে না।"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে হিন্দুধর্ম্মের উপরে যে ধর্ম্মের উল্লেখ গান্ধীজী করেছেন তা হিন্দুধর্ম্মেরই মূলগত সত্য। ভগবানের যে চিরন্তন রূপ হিন্দুধর্ম্মের আগাগোড়া ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তারই কথা গান্ধীজী বলেছেন। রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মের প্রযোজনা করে যে নতুন পথের অনুসন্ধানে তিনি চলেছেন, তার সত্য অনুভব করতে না পারলে উপরোক্ত অংশের সার্থকতা অনুভব করা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, প্রাচীন যুগের ঋষিদের সাথে গান্ধীজীর সংস্কৃতিগত যোগ ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তত্ত্বগত-যোগ-রচনা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম যুগে জীবন তথ্য ও নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। ভারতীয় জীবনযাপনে দর্শন পথ নির্দ্দেশ দিয়েছে, জীবনকে একটা বিশেষ রূপদান করেছে, আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির একটা বিশেষ ভংগী আদৃত হয়েছে। গান্ধীজীর জীবনে তত্ত্ব ও স্বভাব, নীতি ও বাস্তব, আদর্শ ও তার উপলব্ধির সামঞ্জস্য ঘটানোয় যীশু খৃষ্ট, মহম্মদ ও টলষ্টয়ের প্রভৃত প্রভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। এই সব মহাপুরুষদের কাছে তাঁর ঋণ নিজের ভাষাতেই স্বীকার করেছেন তিনি। যখন তাঁকে বলা হয়েছিল—যে যীশু খৃষ্ট কখনো রাজনীতির চর্চা করেন নি, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—যীশু খৃষ্ট ছিলেন শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ। তাঁর সময়ে রাজনীতি ছিল—জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে—পুরোহিত ও যাজকদের দ্বারা তারা যেন ভুল পথে চালিত না হয়। যার যা পাওয়া উচিত তাকে তাই দিতে অস্বীকার করেন নি তিনি কোনদিন। কিন্তু আজকের দিনে শাসনকার্য্য এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে আমাদের জীবনের প্রতিটি অংশ স্পর্শ করে। তাই আজ যদি জাতির সত্যকার উন্নতি আমরা চাই, শাসকদের কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে হবে আমাদের এবং তাদের ওপর আমাদের প্রভাব বিস্তার করে তাদের নৈতিকনীতি মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে।" সাধুজনের রাজনীতিতে নিজেকে লিপ্ত করার এর চেয়ে সুন্দর যুক্তি দেওয়া অসম্ভব—তাঁর এই আদর্শের সংগে মহম্মদের মিল আছে। মহম্মদ ও যীশু খৃষ্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি এবং যদি ও তাঁর জীবনদর্শন মহম্মদ ও যীশু খৃষ্টের জীবনদর্শন থেকে খুব বেশী পৃথক নয়—তবু হিন্দু সংস্কৃতির সাথে তাঁর যোগ ছিন্ন হয়নি কোথাও। সকলেই জানেন হিন্দু সাধুরা—সাধারণ জীবন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতেন। সর্ব্ব-ত্যাগের ব্রতগ্রহণে কোন সন্দেহ ছিল না বলেই তাঁর দর্শনের প্রথম কথা

ত্যাগ। তিনি বলেছিলেন "ধর্মের চরমতম উপলব্ধির জন্য সর্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রয়োজন আছে।"

সর্বস্ব ত্যাগ করার পিছনে যে শক্তি করছে কাজ, তার স্বরূপ বুঝতে ভুল করেন নি তিনি। গভীর সুক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে 'আমার উদ্দেশ্য' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"মোক্ষ অনুসন্ধানের জন্য পর্বতগুহার প্রয়োজন নেই আমার; গুহাবাসী আকাশকুসুম রচনা করে, কিন্তু জনকরাজার মত প্রাসাদবাসীর কোন স্বপ্নেরই প্রয়োজন নেই। আমার মুক্তির পথ আমার দেশবাসী ও মানুষের অন্তবিহীন সেবার মধ্যে। যা কিছুর মধ্যে আছে জীবনের প্রবাহ—তাকেই আমি আপনার মধ্যে গ্রহণ করতে চাই।"

যদি ও শেষ পংক্তিটির মধ্যে রয়েছে নব জীবনের অনুপ্রেরণা, রয়েছে মানুষটির ব্যক্তিগত পরিচয়, তবু এর মধ্যে উপনিষদের শ্লোকের অপূর্ব্ব জ্যোতির মহিমা ক্ষরিত হচ্ছে। তারই সাথে সাথে এই কথা ও বলেন "যে আমার কাছে ধর্ম্ম ব্যতীত কোন রাজনীতি নেই। রাজনীতি ধর্ম্মের অধীন।"

জনসাধারণের সাথে গান্ধীজীর যোগের অতুলনীয় সাফল্যের মূলে তাঁর এই ধর্ম্মপ্রবণতা। সাধারণ ভারতবাসী মাত্রেই কি হিন্দু, কি মুসলমান—ধর্ম্ম ও সত্যের আহ্বান অস্বীকার করতে পারেন না। সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে—এই আধ্যাত্মিকতার ফলেই ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ তাঁকে তাঁদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাঁর মন্ত্রদীক্ষিত অন্তরংগতম বন্ধুও তাঁর উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করে—পরিচিতের ক্ষেত্রে তিনি একাকীত্বের বীজের মতো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা অংশ তাঁর আহ্বানকে স্বীকার করে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই রাজনীতিকে ধর্ম্ম থেকে আলাদা করে দেখতে চান। তাঁদের অসতর্ক অগভীর মতামত তাঁদের নেতার মহত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। ব্যক্তিগতভাবে যদিও মহাত্মাজী আদর্শেও বাস্তবে, জ্ঞান ও কর্ম্মে কোন পার্থক্য করেন না—সমালোচকেরা এই ভারসাম্যে বিচলিত হওয়ার কারণ দেখাতে গিয়ে বলেন—"নীতি স্বীকার করে নেওয়া ও সেই নীতিকে কাজে পরিণত করা যে একই জিনিষ, এইটা গোড়া থেকে মেনে নিয়েই ভুল করেন গান্ধীজী।" তাঁর সমগ্র জীবনে তিনি নীতি ও নীতি অনুযায়ী কর্ম্মকে এক সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। দৈনন্দিন জীবনের এই প্রচেষ্টায়, আত্মোপলব্ধির এমন একটা স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে পারলেন যেখানে এই জড়দেহ, সাংসারিক জীবন, আত্মা ও মনের পরে অমৃতলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে যায়—গান্ধীজী সত্যানুসন্ধানের এই বৈশিষ্ট্য—এতেই প্রমাণিত হয় যে সংস্কৃতিগত হিন্দু-কর্ম্মযোগের তিনি একজন মহান প্রচারক। দৈনন্দিন সংসারে স্বর্গীয় ভাবধারার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, সাংসারিক জীবনের নবতম পরিণতি, আত্ম-উপলব্ধির জন্য পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন, যা গীতার কর্ম্মযোগের চরম কথা—গান্ধীজী তারই একনিষ্ঠ সাধক। তিনি নিজেই লিখেছিলেন "কোন মতবাদকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ তাকে পালন করা ও।" গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে সূত্রগুলিকে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র বলে মেনে নিয়েছেন তাঁর সারাজীবন সেই মন্ত্রগুলিরই জীবন্ত প্রকাশ।

শরীরের উপর আত্মার প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যে উপবাসের নীতি তিনি গ্রহণ করেছেন, তা' হিন্দু আত্মশুদ্ধির প্রধানতম নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম। এতে প্রমাণ হয় যে সমাজসংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক সত্তার চেয়ে তাঁর সাধক তাঁর ভক্ত তাঁর তাপসী সত্তার মূল্য কোন অংশে কম নয়। বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁর একাগ্রভক্তির ফলেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন তিনি। ২৪ এপ্রিল ১৯২৪ সালের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে তিনি লিখেছিলেন "অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দু ধর্ম্মের অংশ হোতো আমি নিজেকে হিন্দু বলতে অস্বীকার করতাম এবং যে ধর্ম্ম আমার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষার সমাধান ঘটাতে পারবে সুনিশ্চিত ভাবে তাকেই গ্রহণ করতাম।'

সারা জীবন ধরে সত্যানুসন্ধানের এই প্রচেষ্টা করেছেন তিনি, যেখানে তাকে জানার সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই জানতে চেষ্টা করেছেন তাকে। খৃষ্টীয়ান ও মুসলিম শাস্ত্র তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেছেন তার মধ্য দিয়েই একথা প্রমাণিত হয়। ব্যক্তিগত ও অন্যান্য প্রচেষ্টায় জ্ঞানলাভের চেষ্টা করার পর হিন্দুধর্ম্মকে স্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম্মের অর্থ "অহিংসাত্মক উপায়ে অবিশ্রাম সত্যানুসন্ধান।" ১৯২৫ সালের ৬ই আগষ্ট মিশনারীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন "আজ আমি এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেচি যে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রচুর জিনিষকে শ্রদ্ধা করলেও গোঁড়া খৃষ্টান ধর্ম্মের সাথে আপনাকে এক মনে করতে পারি না। অত্যন্ত বিনীতভাবে তোমাদের কাছে বলতে চাই যে হিন্দুধর্ম্মকে যে ভাবে আমি জেনেছি তাতেই আমার আত্মা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছে।" হিন্দু ধর্ম্মের সাথে যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে তিনি আবদ্ধ, সে বন্ধনকে মুহূর্ত্তের জন্য অস্বীকার করেন নি। "হিন্দু ধর্ম্মের সহিত আমার স্ত্রীর সম্পর্ক, পৃথিবীর কোন নারীর আবেদন আমার কাছে তার চেয়ে বেশী নয়।" যীশু, মহম্মদ ও টলষ্টয়ের দান কখনো অস্বীকার করেন নি তিনি এবং তাঁর সারাজীবনে এইটেই প্রমাণ করেছেন তিনি যে—তিনি তাঁদেরই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু তবু তাঁর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে যাকে একান্তভাবে হিন্দুবৈশিষ্ট্যই বলা চলে।

খৃষ্টান ধার্ম্মিকদের মতই নম্র ও বিনয়ী তিনি। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম পাপের কাহিনী স্বীকার করেন নি তিনি। যে গান্ধীজীর সবচেয়ে বড় আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য, বৈষ্ণবদের মতই নিজেকে পাপী বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। আত্মদমনের এইব্রত প্রাচীন হিন্দু সন্ন্যাসীদের সাথে তাঁর আর একটি যোগ স্থাপন করেছে।

ভারতের বুকে সাধু সন্ন্যাসী জন্মেছেন অসংখ্য। তাঁদের প্রভাব শুধু ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রেই নয়—ন্যায়, ব্যাকরণ, সাহিত্য জীবনে যা কিছু প্রয়োজনীয়, মানব মনে যা কিছু জাগায় কৌতূহল—তারই অনুসন্ধান করেছেন তিনি।

গান্ধীজীর বুদ্ধিময় সত্তার প্রচার এত ব্যাপক যে জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে সুরু করে রিক্সা ও সেলাইয়ের কলের ব্যবহারও আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর বুদ্ধিময় সত্তা যা কিছু স্পর্শ করে—প্রদীপ্ত শিখার মতো তাকে করে তোলে উজ্জ্বল।

বস্তুতঃ তাঁর ধীশক্তি ও বিচার শক্তির ক্ষমতা এত বেশী যে তাঁর সংরচনশীল মনের দৃষ্টি প্রায়ই চোখে পড়ে না আমাদের। যুক্তি ও ধীশক্তির সমন্বয় তাঁর সমালোচনার প্রথম কথা। এই সমন্বয়ের ফলেই তার মতামতের প্রকাশে এসেছে একটা দৃপ্ত ভংগী। আমাদের গভীরতর সত্তার সকল আবরণ উন্মোচিত করে তিনি আমাদের সহজ স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি দান করেছেন, উচ্চতর আত্মোপলব্ধির সত্তায় আমাদের উন্নীত করেছেন।............বন্দেমাতরম্............

মজঃফরপুর অভিমুখে

শ্রীমতী আভাময়ী মজুমদার

গত বছর শারদীয় পূজার সপ্তমীর দিন আমি বৌমাকে নিয়ে মজঃফরপুর রওনা হলুম। আমার ঠাকুরপো ছিলেন আমাদের সঙ্গী। আমি বিহারের মেয়ে হলেও উত্তর-বিহার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নি। কাজেই আমার বড় ছেলে যখন পুজার আগেই মজঃফরপুরে বদলী হ'ল, তখন সে সুযোগ ছাড়ি কেন! সপ্তমীর শারদীয় সন্ধ্যায় মোকামা এক্সপ্রেসে রওনা হলুম। পরদিন ভোরে মোকামা ঘাটে আমাদের গাড়ী এসে থাম্‌ল। গাড়ী থেকে নেমে 'মজঃফরপুর' নামে একটা ষ্টীমারে গঙ্গা পার হওয়া গেল। এ পারে মন্থরগামী ও, টি, রেলওয়ে। ট্রেণ ধরে প্রায় পৌনে দু'টোর সময় মজঃফরপুরে পৌঁছানো গেল। ট্রেণ থেকে নেমে ষ্টীমারে আশ্রয় গ্রহণ, তারপর আবার ট্রেণে আরোহণ এই

মীরার বাড়ী

অদল বদলে আমাদের ভারি বিরক্ত লেগেছিল। যাই হোক্ বিরক্তির এই বোঝা নিয়ে মজঃফরপুরে পৌঁছানোর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল।

মজঃফরপুর জায়গাটার দর্শন-বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই। যাও বা সৌন্দর্য্য ছিল, ভূমিকম্পের ফলে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। ১৯৩৪ সালের সেই ভূমিকম্পে প্রায় সমগ্র বিহারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রমাণ পাওয়া গেল। নতুন তৈরী বাড়ীর মাঝে মাঝে পুরানো জঙ্গলপ্রায় অর্দ্ধভগ্ন বাড়ীগুলো ভূমিকম্পের ভয়াবহতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মজঃফরপুর বিহারের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সহর। এটা বাঙালী-প্রধান জায়গা। এখানকার হরিসভা একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। প্রতিবৎসর এখানে দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সভাসমিতি হয় এবং গানবাজনার আসর জমে। মজঃফরপুরে 'চক্র' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এটা একটা চক্রাকৃতি বিশিষ্ট ময়দান। চারিদিকে সুদৃশ্য ও সুশোভিত অট্টালিকা। এই 'চক্র' উড়োজাহাজের অবতরণের স্থান। কাঠমুণ্ডী-কলিকাতা পথে উড়োজাহাজের অবতরণ এখানে প্রায়ই দেখা যায়। মজঃফরপুরে দুটি সুন্দর মন্দির আছে। সাহু-মন্দির আর তারা-দেবীর মন্দির। কলামবাগ রোডে অনেক বাঙালী অধ্যাপক স্থায়ীভাবে বাস করছেন। মজঃফরপুর কলেজটির পরিবেশ মনোরম—বিদ্যায়তনের উপযুক্ত স্থান। এর মত সরকারী কলেজগৃহ পশ্চিমবঙ্গে খুব কম দেখা যায়। উত্তর বিহারের সঙ্গে বাংলার একটু সাদৃশ্য আছে। মজঃফরপুর অঞ্চলে

গণ্ডক নদী ধারে—বোটে

গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ চরে অফুরন্ত শস্য জন্মায়। তাই একে উত্তর বিহারের 'শস্য ভাণ্ডার' বলা হয়।

আমাদের সঙ্গে অনেক বাঙালী পরিবারের আলাপ হয়েছিল। তাঁদের অমায়িক ব্যবহারের মাধুর্য্যে ও আত্মীয়তার নিগূঢ়তায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম, যদিও এ চারিত্রিক উৎকর্ষ বাংলার বাহিরে বাঙালী চরিত্রের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের বাড়ী থেকে আট মাইল দূরে আমার বৌমার এক দিদি থাকেন। তাঁর শ্বশুর সেখানে নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে জমি ও বাড়ী কিনেছিলেন। জায়গাটা অজ-পাড়াগাঁ হলেও পরিবেশটা স্নিগ্ধ—ছায়াগহন উপবনের মত। বৌমার

দিদি পাশ্চাত্য আদব কায়দার মধ্যে বাস করেন। তাঁর স্বামী কলকাতার বনেদী ও শিক্ষিত বংশের ছেলে। তিনি সেখানে আখের চাষ করেছেন। মতিহারীতে সেই আখ চালান যায়। আগেকার নীলকুঠির সাহেবদের মত তিনিও একজন বিখ্যাত 'প্লান্টার'। তাঁরা আমাদের খুব যত্ন করলেন। আমরা তাঁদের নিমন্ত্রণে তাঁদের বাড়ী গেলাম। বাড়ীর নীচেই কলস্বনা স্রোতস্বিনী গণ্ডক নদী। চারিধারে অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী। বাড়ীর চারিধারে হাঁস, মুরগী, খরগোস অবাধে বিচরণ করছে। বৌমার দিদি সুন্দর বাগান করেছেন। বৌমার একজন দাদাও আমার ছেলের সঙ্গে মজঃফরপুরে এসে কাটিতে ছিলেন। ছেলেটি ভারি অমায়িক। তার মার্জ্জিত রুচি ও রবীন্দ্র সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি আমাদের প্রচুর আনন্দ দিত।

নিছক দেশভ্রমণের জন্য না হলেও মানুষ কর্ম্মের জন্য ও প্রয়োজনের খাতিরে বিভিন্ন দেশে যায়। না-দেখা জায়গায় ক্ষণিক অবস্থানই মানুষকে দেয় আনন্দ আর জ্ঞান। মজঃফরপুরের কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

তারকা নিভিয়া যায় তথাপি অসীম ব্যোমে,
অযুত বরষব্যাপী তাহারই কিরণ চুমে।

গণ্ডক নদীতে মীরাদের বোটে

ঔষধপত্রের জাল কারবার এবং তার প্রতিকারের উপায়

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

আজকাল ঔষধপত্রের যেরূপ জাল কারবার সুরু হয়েছে, তাতে করে অতি বড় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেও খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করা দায়। যে ঔষধের ওপর মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করে তা যদি খাঁটি না পাওয়া যায়—স্বার্থান্ধ দুষ্টবুদ্ধি লোকে যদি ঔষধের নামে জল বা আর কিছু চালায়—তবে তা সমগ্র জাতির পক্ষেই কতদূর কলঙ্ক ও শোচনীয় অধোগতির পরিচায়ক, তা ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই বুঝে শিউরে উঠবেন। আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কথায় কথায় দোষ চাপাই আমাদের দীর্ঘকালের পরাধীনতার ও ব্রিটিশ শাসকদের ওপর। কিন্তু একথা কারো হয় তো অজানা নেই যে ইংরেজ জাতি খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্রে কদাচ ভেজাল মেশায় না—তাদের দেশে কালোবাজার বলে বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সম্প্রতি জনৈক জার্মান বন্ধু ওদের দেশের কলেজ-পাঠ্য কয়েকখানি বই পাঠিয়েছেন। তাতে ইংরেজ জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এই কথাটি অতিশয় জোর দিয়ে বলা হয়েছে, দেখতে পেলাম। আমরা ইংরেজের বাহ্য অনুকরণ অনেক করেছি—বর্তমানে ইংরেজ ভারত ছাড়ার পরে ঐ গুলি আরও বেশী ক'রে এবং ব্যাপকভাবে আঁকড়ে ধরছি—কিন্তু উঁহাদের সদ্‌গুণাবলীর অনুসরণ ও জীবনে তা প্রতিপালনের প্রতি আমাদের প্রয়াস কই?

ঔষধপত্রের ভেজালে জাতির নৈতিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে অবর্ণনীয়। এখন কিরূপে এই পাপ বন্ধ করা যেতে পারে দেখা যাক। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় বাজারে ভেজাল মাল রয়েছে—কাজেই তার কাটতিও হচ্ছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কি অত সোজা? যারা এই কারবারে লিপ্ত তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং চতুর। বাজারের খবর তাদের নখদর্পণে—কোন্ জিনিসটি বাজারে বেশী কাটছে অথচ কম মিলছে তার সঠিক খবর তাদের রাখতে হয় এবং তাদের ভেজাল মাল যাতে চটপট দোকান থেকে বেরিয়ে ক্রেতা সাধারণের হাতে গিয়ে পড়ে সেদিকেও তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার দরকার হয়। আসল কারখানার মতই তাদের মাল তৈরি, মাল গুদামজাত করা এবং মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা রীতিমত নিপুণতার সঙ্গে চালাতে হয়।

মাল প্রস্তুতি—বাজারে কোন্ মালের কাটতি খুব বেশী তার সঠিক সন্ধান নেবার পরই—সেই মালের খালি শিশি-বোতল তাদের যোগাড় করতে হয়। নাম-করা কোম্পানীর মালের পুরাতন শিশি-বোতলের প্রতিই তাদের ঝোঁক বেশী এবং একটু চড়া দাম পড়লেও ওরা সেগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। অকেজো শিশি-বোতল বেচে কিছু পয়সা পাওয়া গেল, গৃহস্থের এতেই আনন্দ—এর পেছনে যে মস্ত

বড় বদ মতলব কাজ করছে সরল-বিশ্বাসী সাধারণ লোকে তা অনেক সময় ভাবতেও পারে না।

এইখানেই জনসাধারণের মস্ত বড় দায়িত্ব রয়েছে। ঔষধ বা টয়েলেট সামগ্রী ফুরিয়ে যাওয়া মাত্রই সেই সব আধার বা শিশি নষ্ট করে ফেলাই তাঁদের সর্বাগ্রে কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সকলেই ভাবি আমার একটি মাত্র খালি শিশি বেচলে লোকের এমন কি ক্ষতি হবে? জমিদারের দুধ পুকুরের গল্পের মতই ব্যাপার দাঁড়ায়। প্রজারা কেউ ত কারো চেয়ে কম চালাক নয়। একজন ভাবে আমার এক ঘটি জলে রাজার দুধপুকুরের কি ক্ষতি হবে? কাজেই আমি দুধের বদলে জলই না হয় একঘটি দিয়ে এলাম পুকুরে। প্রত্যেক প্রজাই এই মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করায় রাজা সকালে উঠে দেখেন—কোথায় দুধ-পুকুর? পুকুর যে জলে থৈ থৈ করছে! আমাদের পুরাতন খালি শিশি বিক্রয়ের মধ্যেও এই মনোভাবই সক্রিয়। কাজেই দুষ্ট লোকদের ইচ্ছামত শিশি বোতল সংগ্রহ করার কোনও অসুবিধাই হয় নাই। হয়ত আমার বাড়ির খালি শিশিতেই জাল ঔষধ ভর্তি হয়ে আমারই বাড়িতে এল—পয়সা দিয়ে ঔষধ কিনে রোগও সারল না—কঠিন রোগ হলে হয়ত চিরকালের মত আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় জ্বলতে হল! পুলিশ এ বিষয়ে তৎপর হলে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। প্রায়শঃ দেখা যায় দিনে দুপুরে সদর রাস্তা বেয়ে পুলিশের চোখের উপর দিয়েই ব্যবহৃত খালি শিশি বোতল নিয়ে লোকেরা চলেছে। পুলিশ তাদের থামিয়ে বাধা দিলে বা তাদের অনুসরণ করলে নিশ্চয়ই দুষ্কৃতকারীদের আড্ডা আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারে।

পুরাতন খালি শিশি বোতল উপযুক্ত সংখ্যায় না পাওয়া গেলে জাল-ব্যবসায়ীরা জাল শিশি বোতল প্রস্তুত করে তাদের কাছে গিয়ে কোনও নাম-করা কোম্পানীর জন্য প্রস্তুত বিশেষ ধরণের শিশি বোতল কিনতে চায়। চলতি দামের চেয়ে বেশী দাম পাওয়ায় এবং গুদামের পুরাতন মাল খালাস করবার জন্যও তারা সহজেই এই প্রস্তাবে রাজী হয়। কাচের কারখানার মালিকদের অর্থগৃধ্নুতা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাবেই যে এরূপ কাণ্ড ঘটে তা সহজেই বুঝা যায়। তাঁরা একটু সজাগ এবং নির্লোভ হলে জাল কারবারীদের হীন কার্য্যকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হতে পারে।

এর পরে লেবেল এবং প্যাকিংএর কথা। ছাপাখানা চালানোর দায়িত্ব যে কত বেশী, তা টের পাওয়া যায় এইরূপ ব্যাপারে। ছাপাখানার মালিকেরা নির্লোভ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হলে তাঁরা এই জাল ব্যবসায়ের গতি ও প্রসার যথেষ্ট পরিমাণে রোধ করতে পারেন।

জালমালের আড়ত।—দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে জালমাল গুদামজাত করা সব চেয়ে বড় সমস্যা। কারণ যেখানে সেখানে তারা ঐ মাল রাখতে পারে না। তাদের খুব অন্তরঙ্গ লোক না হলে তারা মাল জমা দিতে পারে না। এমন লোকের হাতে জাল মাল রাখতে হবে যে সকল প্রকার সতর্কতা এবং চতুরতা অবলম্বন করে নিজেদের এবং তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ। আড়তদারকে সর্বদাই যারপর নাই উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হবে এবং মাল ধরবার জন্য উপরওয়ালাদের গতিবিধির সামান্য মাত্র সঙ্কেত পেলেই তারা গচ্ছিত মাল বেমালুম মাটির নীচে বা অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কাজেই বহু সতর্ক ঘাঁটি পেরিয়ে জাল মাল বাজারে আসে। এখন কারো কোনও সন্দেহের উদ্রেক না ক'রে দোকান থেকে যত শীঘ্র ঐ মাল ক্রেতার হাতে গিয়ে পড়ে তার জন্য দোকানীরা সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এই দুষ্কৃতকারীরা সাধারণের চেয়ে আইনকানুনের অনেক বেশী খবর রাখে এবং কি ক'রে আইনের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সে উপায়ও তারা জানে দস্তুরমত। পুলিশ যদি বা কখনও এরূপ মাল ধরে, তবে তাদের প্রাথমিক তদন্তের বিবৃতির মধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এমন অনেক ফাঁক রেখে দেয় যাতে করে আসামী অনায়াসে আইনের ফাঁক দিয়ে বেকসুর বেরিয়ে আসতে পারে। হাতেনাতে ধরা পড়লেও এই জালব্যবসায়ীদের এত লঘুদণ্ডের বিধান হয় যে তাতে এই ব্যবসায়ের পক্ষান্তরে উস্কানি দেওয়াই হয়ে থাকে। ফোকটসে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে দু'এক বৎসর শ্রীঘর বাস এরা ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করে না। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে—তেজস্কর ঔষধও যদি উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ না করা হয় তবে তাতে করে মৃত্যুদূত ব্যাধি-বীজাণু নাকি হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়েই ওঠে—আমাদের বিচার বিভাগ চিকিৎসাশাস্ত্রের এই তথ্য গ্রহণ ও প্রয়োগ করলে সমাজের বেশী কল্যাণ সাধিত হ'ত বলে মনে করি। সম্প্রতি কলুটোলায় জাল-ঔষধ ব্যবসায়ীর এক বৎসর মাত্র কারাদণ্ড হয়েছে বলে কাগজে বের হয়েছে। যারা হাজার হাজার লোকের প্রাণ নিয়ে নিয়ত ছিনিমিনি খেলছে, খুনী আসামীদের চেয়ে তাদের অপরাধ কতগুণ বেশী তা বোঝবার জন্য বেশী বুদ্ধি খরচের দরকার করে না—অথচ তাদের এইরূপ লঘুদণ্ড কি নিতান্তই ছেলেখেলা নয়?

আমাদের দেশে আইনের প্রয়োগবিধিও প্রশস্ত নয়। কোর্ট থেকে ওয়ারেণ্ট বের করবার এবং যেখানে চোরাই মাল আছে বলে পুলিশকে জানানো হয় সেখানে গিয়ে সরজমিনে তদন্ত করবার মধ্যে এত বেশী সময় চলে যায়—যে সেই ফাঁকে দুষ্কৃতকারীরা সতর্ক হয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় জালব্যবসায়ীরা দু'রকম মাল রাখে—বিপদের সঙ্কেত পাওয়ামাত্রই জাল মাল সরিয়ে ফেলে তারা ভাল মাল সে স্থানে রেখে দেয়। কাজেই তদন্তকালে সৎব্যবসায়ীদেরই পুলিশের এবং জনসাধারণের কাছে মুখ ছোট হয়ে যায়। এরূপ ব্যাপার কাল্পনিক নয়—অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরেই এর ভিত্তি।

গরীব এবং অনুন্নত দেশেই জালমালের কাটতি বেশী দেখা যায়—বিশেষতঃ যে দেশে মাল তৈরির জায়গা থেকে মালের কাটতি হয় বহু দূরবর্তী স্থানে। আমাদের মত গরীব দেশে লোকে সব সময় যে কোনও বস্তু—এমন কি ঔষধপত্রও কিনবার সময় দু' পয়সা সস্তা খোঁজে। দুষ্কৃত-কারীরা আমাদের মনের খবর ভাল করেই রাখে, কাজেই তারা তাদের মালের দর অনেকটা কম রাখে, ফলে ক্রেতাসাধারণ সহজেই এই মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

দেখা গেছে পূর্বাঞ্চলের কাটিহার থেকে গোরক্ষপুর পর্যন্ত এবং কলকাতার আশপাশে চল্লিশ মাইলের মধ্যেই মালপত্র চলাচল তাড়াতাড়ি

না হওয়ায় চোরাই কারবার বেশী চলে। কলকাতা কেন্দ্র থেকেই এই মাল এই সব অঞ্চলে গিয়ে থাকে। ওদিকে দিল্লী এ বিষয়ে কুখ্যাত। সেখান থেকে পাঞ্জাব এবং গোপসুতে জালমাল বেশী সরবরাহ হয়ে থাকে। রেলওয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তন হলে কলকাতা থেকে দিল্লীতে মাল পৌঁছাতে অসুবিধা ঘটবে এবং তার ফলে দিল্লীতে জালমালের কাটতি আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কৃত্রিম উপায়ে কোনও স্থানে কোনও বিশিষ্ট দরকারী ঔষধের ঘাটতি দেখা দিলে এই অবস্থা আরও চরমে ওঠে। এই জাল ব্যবসায়ে কি পরিমাণ টাকা খাটছে তা ঠিক করা খুবই শক্ত ব্যাপার—তবে এতে জনসাধারণ যে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হচ্ছে—তা কারও অবিদিত নেই।

এখন ফার্মেসী আইন প্রবর্তিত এবং ফার্মেসী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তারপর যোগ্যতর ফার্মাসিষ্টগণ দিন দিন অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ পদলাভ করবেন। এঁদের সততা এবং সৎসাহস প্রভাবে দেশের ঔষধ-পত্রের চোরাকারবার, জাল ঔষধ তৈরি এবং বাজারে নিম্নমানের ঔষধ-পত্রাদির প্রচলন হ্রাস পাবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এখন সবচেয়ে দরকারী বিষয় হচ্ছে—যাতে অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা ঔষধ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। স্বার্থের চেয়ে সেবার মনোবৃত্তি ফার্মাসিষ্টরা গ্রহণ করলে দেশের অনেক কল্যাণ আশা করা যায়। গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ নিয়ম করেন যে সুযোগ্য ফার্মাসিষ্ট ভিন্ন কেউ ঔষধের দোকান চালাতে পারবে না, তা হলে জাল ঔষধ ব্যবসা অনেকটা প্রশমিত করা যাবে। এই সব ফার্মাসিষ্টদের কর্তব্য হবে দোকানে নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত মানের মাল খরিদ করা এবং ফেরিওয়ালা বা সন্দেহজনক কারো নিকট থেকে সস্তা পেলেও মাল খরিদ না করা।

জাল ঔষধপত্রের প্রচলন যে কতদূর দোষণীয় ব্যাপার তা কথায় বলে শেষ করা যায় না। আইনের চোখে ট্রেডমার্কের নিয়ম লঙ্ঘন মস্ত বড় অপরাধ। তা ছাড়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের তরফ থেকেও—জনস্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। সব চেয়ে বিপদের কথা এই—যারা এই মাল কেনে তারা সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই ইহা করে—অর্থনাশ ত ঘটেই অনেক সময় জীবন নাশও এর সঙ্গে জড়িত। ব্যবসায়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এর জন্য ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়—জালব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় তাঁদের খাঁটি মালের কাটতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। কাজেই সমাজের সর্বস্তরের লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজদেহ হতে এই দুষ্ট ক্ষত বিতাড়িত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিল্পনায়কগণ, ব্যবসায়ীবর্গ, জাতীয় সরকার এবং জনসাধারণ সকলেরই ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগতভাবে সক্রিয় হতে হবে। এছাড়া আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে তদন্ত পরিচালনা করা এবং যথোচিত তৎপরতার সঙ্গে অপরাধকারীর উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্য সুপারিশ করাও কর্তব্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তি এবং সংস্থা এই কমিটির মধ্যে থাকা উচিত বলে মনে হয়।—

(১) কলিকাতা পুলিশের (এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের) ডেপুটি কমিশনার—চেয়ারম্যান

(২) ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি ২ জন

(৩) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের " ১ "

(৪) কেমিষ্ট অ্যাণ্ড ড্রাগিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন " ১ "

(৫) ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল " " ১ "

(৬) ষ্টেট ড্রাগ লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ১ জন

(৭) বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের " ১ "

এঁরা জনসাধারণকে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের লোকদের মধ্যে পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি বিতরণ করে এবং সিনেমার সাহায্যে জাল কারবারের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাবেন। ফলতঃ জনসাধারণ, ঔষধ প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এরা একযোগে কাজ করতে পারেন। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ কমিটিকে নানাভাবে সাহায্য করে শক্তিশালী করে তুলতে পারেন।

ঔষধপত্রের চোরাকারবার বন্ধ ব্যাপারে ঔষধপ্রস্তুতকারীদের উপরেই সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব নির্ভর করছে। তাঁরা বাজারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনও দোকান থেকে মাল কিনে বিশ্লেষণ করে যদি ভেজাল বলে বুঝতে পারেন, তবে তৎক্ষণাৎ দোষীকে আইনতঃ দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করে বাজারের দুর্নীতি দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। তারপর যে মালের কাটতি খুব বেশী, হঠাৎ কোনও কারণে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঐ মালের প্রস্তুতি বন্ধ না হয়—সে বিষয়ে তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। অবশ্য সময় সময় রেলে স্থানাভাববশতঃ মাল কোনও অঞ্চলে পাঠাবার অযথা দেরী হলে তার উপর ঔষধ-প্রস্তুতকারীদের তেমন কোনও হাত নেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আইন আরও কড়া হলে এবং তদন্তাদি যথাযথ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংঘটিত হলে চোরাকারবার দমন অনেকটা সহজসাধ্য হবে। ফলতঃ বর্তমানে যে-ভাবে জাল ঔষধপত্রের কারবার চলছে এই ভাবে যদি তাকে চলতে দেওয়া হয় তবে সমাজে নীতিজ্ঞান বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না—ফলে উহা দেশের প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

সকলেই বুঝতে পারেন জাল ঔষধের ব্যবসা চালানো বড় সহজ কথা নয়; সৎভাবে সত্যিকারের ব্যবসা চালানোর মতই এতে মাথা, উদ্যম, পরিশ্রম এবং মূলধনের যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু তা ছাড়াও আছে এতে মানসিক দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং সমস্ত প্রকারের বিপদের ঝুঁকি। এত অসুবিধা সত্ত্বেও তবে লোক এ পথে পা দেয় কেন? তার প্রধান কারণ, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সদুপায়ে অর্জিত মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। খাওয়া পরার চিন্তা না থাকলেও বিলাসব্যসনের আকর্ষণ আছে—আর সেই কাজে কোনও দিন কোনও পরিমিত অর্থই ত পর্য্যাপ্ত নয়। কাজেই সেই শ্রেণীর লোক বিপদ নিশ্চিত জেনেও জাল-কারবারে নেমে রাতারাতি মোটা টাকা কামাতে চায়। দু'চারজন এ ব্যবসায়ে ফেঁপে উঠলে দেখাদেখি আরও অনেকে এ ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। বস্তুতঃ এখনই যদি এই কুপ্রথা বন্ধ করা না যায়, তবে শীঘ্রই মোটা মূলধন এই অসাধু প্রচেষ্টায় এসে পড়বে এবং তদ্দরুণ ইহা এত বিরাট আকার ধারণ করবে যে তা দমন করতে প্রাণান্ত বেগ পেতে হবে। একে ত দেশ-বিভাগের ফলে জনসাধারণের দারিদ্র্য চরমে উঠেছে—দারিদ্র্যের সহজাত হীন প্রবৃত্তিগুলিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—সুতরাং অসাধু ব্যবসায়ীদের সাঙ্গোপাঙ্গের আদৌ অভাব নেই। তাই এই অসাধু ব্যবসায়ের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এই সব সবিশেষ তলিয়ে বুঝেই জাতীয় সরকারকে অগোণে অতি কঠোর হস্তে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দুষ্কৃতকারীদের কঠোরতম এবং আদর্শ শাস্তিদান ব্যতিরেকে এই পাপ সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর নয় বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

---

* গত ২৮শে জুন কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার ছায়া অবলম্বনে রচিত।

(পূর্বানুবৃত্তি)

চার্ব্বাকের চিন্তাধারা কিন্তু বিঘ্নিত হইল।

"জেগে আছেন দেখছি। ঘুম হচ্ছে না—নাকি। বিদেশে বিভুঁয়ে ঘুম হওয়া কঠিন। আমি এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিলাম, ঘুমের দেখা নেই"

"শ্রৌণী গ্রামে কতক্ষণে পৌছিব আমরা কাল?"

"সন্ধ্যা নাগাদ"

"সেখান থেকে যজ্ঞস্থল কতদূর"

"শুনেচি বেশী দূর নয়। হেঁটে যদি যান প্রহর দুই লাগবে। তবে আমার বিশ্বাস হাঁটতে হবে না আপনাকে। হাতী, ঘোড়া, নিদেন গরুর গাড়িও পেয়ে যাবেন একটা। ঘোড়ায় চড়তে পারেন তো?"

"পারি"

"তবে আর ভাবনা কি, ঘোড়া অনেক থাকবে। আর আপনাকে দেখতে পেলে ওঁরা সাদরে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন। আপনি তো আর যে-সে লোক নন আমাদের মতো। আমি তো আশা করেছিলাম যে আপনি হোতা বা উদ্গাতা বা ওই রকম কিছু একটা হোমরা-চোমরা গোছের হয়ে যাচ্ছেন, দেশে থাকলে যেতেনও, কুমার সুন্দরানন্দ আপনাকে যেরকম খাতির করেন শুনেছি তাতে মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গে একই রথে আপনাকে নিয়ে যেতেন তিনি"

চার্ব্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। দেখিতে পাইলেন গুণপতির চক্ষুযুগল হইতে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতেছে।

বলিলেন, "মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গে একরথে আমার স্থান নেই, হতে পারে না। ওঁরা ব্রাহ্মণ নন, মহর্ষি তো ননই—ওঁরা ক্রীতদাস। আমি স্বাধীন মানুষ, নিজের মতে নিজের পথে চলি। ওঁদের সঙ্গে একাসনে আমার স্থান নেই। ওঁরাও আমাকে সহ্য করতে পারবেন না, আমিও ওঁদের সহ্য করতে পারব না"

গুণপতির আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "তাই নাকি! আমরা মূর্খ মানুষ। কিছুই বুঝি না তো। আমরা জানি, আপনিও মহর্ষি—উনিও মহর্ষি। উনি ক্রীতদাস? একথা তো জানতাম না! শবরী ভল্লুকীকে নিয়ে একটা কানা-ঘুসো শুনতাম বটে, কিন্তু উনি ক্রীতদাস? সুন্দরানন্দের পিতার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কেনার ঝোঁক ছিল শুনেছি। আমার পিতামহ ধনপতি তাঁর জন্যে বাহ্লীক থেকে, শ্যাম থেকে, সিংহল থেকে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কিনে আনতেন—বাবার মুখে শুনেছি এসব গল্প। আপনি তাহলে অনেক খবরই জানেন। ক্রীতদাস উনি!"

"হ্যাঁ। শুধু সুন্দরানন্দেরই নয় কুসংস্কারেরও। উনি মনে করেন বেদবাক্য স্বতঃপ্রমাণ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সমস্ত বিধিনিষেধ উনি অভ্রান্ত বলে' মনে করেন, ওঁর ধারণা সুর করে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে আগুনে ঘি ঢাললেই অন্তরীক্ষবাসী দেবতারা কাম্য ফল দেবেন। উনি অন্ধ, আমি চক্ষুষ্মান। আমি বিচার করি, উনি বিশ্বাস করেন"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চার্ব্বাকের কথা শুনিতেছিলেন, চার্ব্বাক থামিতেই বলিলেন, "বটে! আমি মূর্খ মানুষ কিছুই বুঝি না। আচ্ছা, মহর্ষি বেদই বা কি, আর ব্রাহ্মণই বা কি। যখন সুযোগ পেয়েছি তখন জেনেই নি কথাটা"

"বেদে শুধু মন্ত্র আছে, আর ব্রাহ্মণে আছে সেই মন্ত্রের প্রয়োগবিধি। এসব বাজে কথা জেনে কিছু লাভ নেই। বেদ এবং ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জ্ঞানই যথেষ্ট"

"সেটি কি"

"মোটি হচ্ছে এই যে, ওসব ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওসব সরল-বিশ্বাসী গৃহস্থদের ঠকিয়ে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় মাত্র। যজ্ঞের নামে সারা দেশ জুড়ে যে অপচয় হচ্ছে, যে ভণ্ডামি চলছে, সহজ বুদ্ধিবৃত্তির সুস্থ-বিকাশের পথে যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তা ভাবলে কষ্ট হয়। কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ নেই। সমস্ত দেশকেই অন্ধ করে' দিয়েছে ওরা"

গুণপতি হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিলেন। মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন। তাহার পর বলিলেন, "নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই, কিন্তু এটুকু আমি বলব যে আমি অন্তত অন্ধ হই নি। আমার গৃহিণীর অবশ্য দেব-দ্বিজে প্রবল ভক্তি, কিন্তু আমি যাকে তাকে ভক্তি করতে পারি না—কি রকম যেন পারিই না"

"তা না পারুন, কিন্তু যজ্ঞের বিরোধিতা করতে আপনি পারবেন কি? পারবেন না। এর সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘি বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গুণপতি নীরবে দন্তগুলি বিকশিত করিয়া চার্ব্বাকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা যাবে! উফ, মাথা বটে আপনার। ঠিক বলেছেন। যজ্ঞ বন্ধ হলে ঘিয়ের ব্যবসা তুলেই দিতে হবে আমাকে। তবে একটা কথা আছে মহর্ষি, এরকম ফলাও ব্যবসা আছে বলেই আমরা আপনাদের মতো সজ্জনকে ধারে ঘি খাওয়াতে পারি। তা না হলে কি পারতুম? আপনাদের কাছে দাম দু'চার ছ'মাস পড়ে' থাকলেও গায়ে লাগে না আমাদের"

চার্ব্বক মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি প্রসঙ্গান্তরে এসে হাজির হলেন। আমাকে ধারে ঘি খাওয়ান—এটা কি যজ্ঞের স্বপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি হল?"

গুণপতি জিভ কাটিয়া বলিলেন, "ছি ছি, তা কি হয় কখনও! সে কথা আমি বলছি না। মন্দ জিনিসেরও যে একটা ভাল দিক থাকতে পারে সেই কথাটাই আমি বলছি শুধু। সুমন্ত্রও উঠেছে দেখছি—ওহে সুমন্ত্র, এদিকে শোন—মহর্ষি যজ্ঞের খবর জানতে চাইছেন, বল দিকি ওঁকে—সব যা জান"—তাহার পর চার্ব্বাকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সুমন্ত্র অনেক খবর রাখে—"

চার্ব্বাক বুঝিল, চতুর গুণপতি কৌশলে আলোচনাটার মোড় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যজ্ঞ-বিরোধী বিপজ্জনক আলোচনায় তিনি আর নিজেকে সম্ভবত লিপ্ত রাখিতে চান না, অথচ সে কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। যজ্ঞের সংবাদ জানিবার কিছুমাত্র আগ্রহ চার্ব্বাকেরও ছিল না, কিন্তু সে কথা সে-ও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। প্রধান শকট-চালক দীর্ঘকায় সুমন্ত্র নিকটবর্ত্তী হইতেই গুণপতি বলিলেন—"চাঁদের আলোর ধমকে তোমারও ঘুম ভাঙল বুঝি"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি ভাবছি—বেরিয়ে পড়ি চলুন, মাঠে আর সময় নষ্ট করে' কি হবে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এগিয়ে যাওয়াই ভাল"

"তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমার আর আপত্তি কি। আমারও ও-কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি চুপটি করে' আছি। আমি বললেই তোমরা ভাববে—লোকটা কি চণ্ডাল, রাত্রে ঘুমোতে পর্য্যন্ত দেয় না। ঠিক কি না আপনিই বলুন মহর্ষি। ও হে সুমন্ত্র, মহর্ষিকে যজ্ঞের খবর বল তো—যা জান"

সুমন্ত্রের দেহের আয়তন যে অনুপাতে বিশাল, কণ্ঠস্বর সেই অনুপাতেই উচ্চ। কথা কহিলে মনে হয় ধমক দিতেছে। চার্ব্বাকের দিকে একনজর চাহিয়া বলিল, "আপনি কি নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন?"

"না"

"তাহলে আপনাকে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে কি না সন্দেহ"

"কেন"

"লোকচক্ষুর আড়ালেই নাকি এ যজ্ঞ হবে। সেই জন্যেই কুমার গভীর অরণ্যের মাঝখানে যজ্ঞ-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়েছেন—"

"এ রকম করার উদ্দেশ্য?"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে শুনছি!"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে!"

"দিকপাল তো তাই বললে"

"দিকপাল কে"

গুণপতি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "দিকপাল হচ্ছে গুপ্তচর। সুমন্ত্রর আপন ভগ্নীপতি। তার কাছ থেকেই সুমন্ত্র খবর জোগাড় করে"

চার্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "কুমার সুন্দরানন্দকে এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কে প্ররোচিত করলে! এ যে অবিশ্বাস্য, এ যে নরহত্যা—"

"ম্লেচ্ছ পণ্ডিত নীল-চক্ষু মির্মির কুমারকে এই যজ্ঞে উৎসাহিত করেছেন শুনেছি। তিনি শুধু পণ্ডিতই নন, শুনেছি তিনি একজন বড় শিকারীও। নদীপথে সমুদ্রপথে তিনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। নর্ম্মদা তীরে কুমারের সঙ্গে না কি তাঁর প্রথম আলাপ হয়। সেই আলাপ এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে এবং তার ফলেই এই যজ্ঞ হচ্ছে। অবশ্য আমি সুমন্ত্রর মুখে যেমন শুনেছি তেমনি বলছি। এর কতটা ঠিক কতটা বেঠিক—তা সুমন্ত্রই জানে। সুমন্ত্রকে সামনে ডেকে এনে তাই সব কথা আপনাকে ভেঙে বললাম এখন, আগে বলিনি, বলতে সাহস হয়নি"

গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা হৃষ্ট চতুরতা ঝলমল করিতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গুণপতি পুনরায় বলিলেন, "সুমন্ত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন এ খবর ঠিক কিনা"

সুমন্ত্র যেন ধমকাইয়া উঠিল, "ঠিক"

চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল, "অনিমন্ত্রিত কোনও লোককে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে না এ সংবাদও কি ঠিক?"

"ঠিক"

"যজ্ঞটা হচ্ছে কোথায়"

গুণপতি বলিলেন, "শ্রোণী গ্রামের নিকট কোনও গভীর অরণ্যে, এইটুকু শুধু জানি। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না। জান না কি হে সুমন্ত্র। জান তো মহর্ষিকে বল না খবরটা"

"জানি না"

গুণপতি বলিলেন, "আমরা কেউ কিছু জানি না; আমাদের উপর কেবল আদেশ হয়েছে ঘিয়ের কলসীগুলি নিরাপদে শ্রোণী গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে কুমার সুন্দরানন্দের সেনাপতি সসৈন্যে উপস্থিত থাকবেন। তাঁরই হাতে এই পাঁচ শত কলস ঘি আমাকে দিয়ে আসতে হবে।"

"সেনাপতি মানে কুলিশপানি?"

"সম্ভবত। তিনিই তো এখন কুমারের দক্ষিণ হস্ত"

"মন্ত্রী জিমূত্রকও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকবেন নিশ্চয়"

"থাকা ত উচিত—"

"এ যজ্ঞে কারা ঋত্বিক হয়ে যাচ্ছেন জান?"

সুমন্ত্র উত্তর দিল, "জানি। হোতা হয়েছেন মহর্ষি পর্ব্বত, উদ্গাতা মহর্ষি ডম্বরু, অধ্বর্যু মহর্ষি চন্দ্রচূড়, আর ব্রহ্মা হচ্ছেন স্বয়ং মির্মির"

"যে নরটিকে বলি দেওয়া হবে সেটি কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে?"

"সে খবর কেউ জানে না। এমন কি দিকপালও না"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্ব্বাক বলিল, "আমাকে তাহলে শ্রোণী থেকেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, শ্রোণী পর্য্যন্ত তো যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে"

"কুলিশপানি তো আপনাকে খুব খাতির করেন শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি হয়তো কোন ব্যবস্থা করে' দিতে পারবেন"

কুলিশপানির আদেশেই যে চার্ব্বাককে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেকথা তাহার মনে পড়িল। নির্ব্বাক হইয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল—যাহার আশায় আমি এই দুরূহ বিপদ-সঙ্কুল পথে পা বাড়াইয়াছি তাহার দেখা মিলিবার কোন সম্ভাবনাই তো নাই। সৈন্য-পরিবৃত যজ্ঞস্থলের নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগই পাওয়া যাইবে না। তবে যাইতেছি কেন? এখান হইতেই ফিরিয়া যাওয়া উচিত। সহসা এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। তিনি মনে মনে যেন পাখী হইয়া উড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—পুরাণের গরুড় পক্ষীর মতো বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া তিনি যেন সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বহু ঊর্দ্ধে উড়িয়া চলিয়াছেন ...সুরঙ্গমা যেন অলিন্দে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে এই বিরাট পক্ষীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে। বাজ বা চিল যেমন ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্রতর পশুপক্ষীকে তুলিয়া লয়, তিনিও যেন তেমনিভাবে সুরঙ্গমাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইলেন। সুরঙ্গমা চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠিক ইহার পরই চার্ব্বাকের কল্পনা-বিলাস ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সুরঙ্গমার আর্ত্ত চীৎকার যেন একটা হুঙ্কারের শব্দে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। চার্ব্বাক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—কিছুদূরে গুণপতি মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন। দুইটি অঙ্গুলি মুখ-বিবরে ঢুকাইয়া সম্ভবত তিনি জিহ্বা পরিষ্কার করিতেছেন,

তাহাদেরই হুঙ্কারের শব্দ হইতেছে। সুমন্ত্র বা অন্যান্য শকট-চালক কেহই কাছে নাই। ইহারা কখন যে চলিয়া গিয়াছে, চার্ব্বাক জানিতেও পারে নাই! চার্ব্বাক রীতিমত বিস্মিত হইল। সজ্ঞানে বসিয়া বসিয়া সে নিজের আজগুবি কল্পনায় এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে ইহারা কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা টেরও পায় নাই! নীলোৎপলার কথা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ যে সুরা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন, সে সুরা-প্রভাবে দুরাকাঙ্খাও তৃপ্ত হয়। যে যাহা হইবার কামনা করে কিছুক্ষণের জন্য তাহা সে হইতে পারে। তাহার মনে হইল এখনই সে তো পাখী হইয়া উড়িতে চাহিতেছিল। ওই সকল অসম্ভব হাস্যকর কল্পনাও তাহা হইলে তাহার মনের কোনও স্তরে নিহিত আছে না কি। সুরাপ্রভাবে সে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা কল্পনায় পুনরায় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। তাহার মানসপটে ছায়াছবির ন্যায় সেই সুন্দরী মোহিনী, বিরাটকায় কৌতূহল, বিচিত্র সন্ধানলোক, মায়াবিনী নদী, পাতালনিবাসী কালকূট, বর্ণমালিনীর ক্ষুরধার জিহ্বানির্ম্মিত সাঁকো একে একে মূর্ত্ত হইয়া আবার একে একে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল সে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাহার মন আর সচেতন রহিল না। অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে তাহার দিশাহারা বুদ্ধি উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। একথাও সে অনুভব করিল যে তাহার মন সম্ভব-অসম্ভবের সূক্ষ্ম বিচার করিতে আর প্রস্তুত নহে। দুই আর দুই যোগ করিয়া পাঁচ হয় একথাও সে মানিতে প্রস্তুত আছে—যদি তাহা মানিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি কেহ কোনও মন্ত্রবলে সত্যই তাহাকে তীক্ষ্ণ নখচঞ্চু-সমন্বিত বিরাট পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারে সে মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করিতে হয়তো সে আর দ্বিধা করিবে না। সহসা তাহার সমস্ত অন্তর ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন সে নিজেকে এত অবনত করিতেছে? কেন? ধীরে ধীরে সুরঙ্গমার মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাস্য প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি যেন নীরব ভাষায় বলিল, 'আমার জন্য'। অন্তরীক্ষ হইতে যেন এক তরঙ্গিণীর কল্লোল-ধ্বনি কলস্বরে হাসিয়া উঠিল। সেই মায়া নদী যেন পুনরায় বলিল, "তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নি চার্ব্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণজালে জড়িত হচ্ছ—!"

চার্ব্বাকের সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল যে ঋণজাল যতই জটিল হোক না কেন, নিত্য নব নব ঘৃত পান করিবার বাসনা সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, করিতে পারিবে না, কারণ উহাই তাহার ধর্ম্ম। যত বিপদই হোক, সুরঙ্গমার সহিত দেখা করিতেই হইবে।

(ক্রমশঃ)

হে কবি বৈতালিক

শ্রীঅনিলেন্দু চৌধুরী

এখনও বাহিরে জমাট্ অন্ধকার,
পূবের আকাশে এখনো লাগেনি রঙ্,
এখনও কোথাও খোলেনি রুদ্ধ-দ্বার
স্তিমিত প্রদীপ জপিছে মৃত্যুক্ষণ।

ভীরু ফুল-কলি এখনো মেলেনি দল,
ওঠেনি কাননে পাখীদের কলতান,
অতন্দ্র তারা নভে করে ঝলমল্,
এখনি কি কবি সুরু হবে তব গান?

তিমির-তোরণে কী সুর গাহিয়া গুণি!
ছিঁড়ে দেবে আজ রাত্রির মায়াজাল,—
নব-জীবনের কী ছন্দ বুনি' বুনি',
রাঙায়ে তুলিবে প্রভাতের দিক্‌বাল?

গাও, গাও কবি, ভাঙো বন্ধন-ডোর,
হোক্ সে ছন্দে দীপ্ত মাঙ্গলিক,
যুগান্তরের নাশো তামসিক ঘোর,
জাগুক্ বিশ্ব, হে কবি, বৈতালিক!

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বিদ্যালয়

শ্রীআশা দেবী

নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নারীজাতির শিক্ষা এবং পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দান গভীর ও ব্যাপক। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য লইয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমগ্রভাবে নারীজাতির সমস্যার সমাধানপূর্ব্বক এবং সমাজের অবস্থা উন্নত করিবার প্রচেষ্টা এই বিদ্যালয়কে সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের সমাজ-জীবন কতদূর কুসংস্কারপূর্ণ এবং পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দু নারীর অবস্থা তখন সত্যই ছিল অতি শোচনীয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থা ছিলনা। অতি অল্প বয়সে পরিণীতা এবং বহু সন্তানের জননী হইয়া নারীকে পর্দার আড়ালে কোনরূপে দিন কাটাইতে হইত। যে নারী শক্তিদাত্রী, অনন্ত বীর্যশালিনী, সেই নারী কোন কোন পরিবারের ভারস্বরূপ হইয়া শিক্ষাহীন সহায়হীন অবস্থায় জীবনযাত্রা বহন করিত। বলা বাহুল্য তাহার প্রতিক্রিয়া সমাজের উপর তীব্রভাবে আঘাত করিয়াছে। নারীজাতির আত্মবিলোপের সেই চরম দুর্দিনে এই বিদ্যালয় তাহাদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগাইয়া তুলিবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল।

যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণকালে দেশের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করেন। পরে পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ঐ সকল জাতি বিজ্ঞান-সহায়ে ব্যবহারিক-জগতে কতদূর উন্নতি করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ তাঁহার হয়। তবে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া ঐ উন্নতি মানুষের প্রকৃত এবং স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আধ্যাত্মিকতার জন্মদাত্রী ভারতমাতার পুনরুদ্ধারের দ্বারাই সমগ্র জগতে শান্তি এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। বহু বর্ষ ধরিয়া যাহারা সমাজে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়াছে সেই অজ্ঞ জনসাধারণ এবং জাতির অর্দ্ধাঙ্গ নারীগণের জাগরণের দ্বারাই ভারতের পুনরুদ্ধার ঘটিবে। আর এই জাগরণের জন্য প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষার—যে শিক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিক কৃষ্টির বিস্তার করিয়া সকলকে যথার্থ মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। তাই স্বামিজী চাহিয়াছিলেন—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণ। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের, কল্পনার সহিত বাস্তবের, ভাবপ্রবণতার সহিত বিচারবুদ্ধির এবং আদর্শবাদের সহিত কর্মতৎপরতার মিলন হইলে তবেই জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। দেশের সর্ব্বত্র এই মহান শিক্ষা প্রচার করিবে কাহারা ? স্বামীজি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, এই কার্য্যের জন্য চাই শত শত ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী—যাহারা পবিত্র, অকপট, সর্ববিধ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সর্বোপরি উত্তরাধিকারীসূত্রেপ্রাপ্ত স্বদেশের সংস্কৃতির উপর পূর্ণ আস্থাসম্পন্ন। এইরূপ শত শত নরনারী যদি 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে এই মহান কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করে তবেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে স্বামীজি ভারতের সর্ব্বত্র 'প্রচারক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' বা মঠ স্থাপন করিতে সংকল্প করেন। সর্ব্বপ্রথম ১৮৯৮ সালে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল। নারীজাতির উন্নতির জন্য অনুরূপ একটি 'প্রচারিকা শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন করিতে স্বামীজি বিশেষ অধীর হইয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। নারীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিতে তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। তাহাদের সমস্যার সমাধান তাহারাই করিবে, প্রয়োজন কেবল যথার্থ শিক্ষার, যে শিক্ষা দ্বারা সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক অবস্থা স্বামীজির অভিপ্রেত 'প্রচারিকা শিক্ষা কেন্দ্র' স্থাপনের একান্ত প্রতিকূল ছিল। পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক বাধা উপেক্ষা করিয়া কোন নারী তাঁহার আহ্বানে অগ্রসর হইয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে ইহা তখন ছিল কল্পনার অতীত। অথচ স্বামীজি এই কার্য্যে বিলম্ব সহিতে পারিতেছিলেন না। মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য নারীর জাগরণ সর্ব্বাগ্রে এবং অবিলম্বে প্রয়োজন। কাজেই তিনি বিদেশ হইতে উচ্চ আধারসম্পন্না মিস্ মার্গারেট নোবলকে আনিয়া তাঁহাকে নিজ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে এক যাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডে তিনি শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি একটী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছিলেন এমন সময়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামীজির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই শুদ্ধচরিত্রা বিদুষী মহিলার সহিত পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজি বুঝিতে পারেন যে ইনি কোন মহৎ কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য অধীর। তাই একদিন বক্তৃতান্তে তিনি মিস্ নোবেলকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমার কলিকাতায় নারীজাতির কার্য্যের জন্য চাই।" ১৮৯৮ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী মার্গারেট নোবেল ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছান। স্বামীজির মহান দেশসেবাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। ২৫শে মার্চ্চ স্বামীজি তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত করিয়া নিবেদিতা (dedicated) নাম রাখেন এবং উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কার্য্যে নিয়োজিত করেন। নিবেদিতার চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতির

মহৎ গুণসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, দৃঢ় অধ্যবসায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রবল আত্মবিশ্বাস, অপূর্ব কর্মতৎপরতা প্রভৃতির সমাবেশ প্রকৃতই তাঁহাতে আনিয়াছিল এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ঐ সকল গুণ সত্ত্বেও তাঁহার ভারতীয় আদর্শ এবং ভাবধারার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন একথা স্বামীজি জানিতেন। সুতরাং তিনি নিবেদিতাকে সর্বপ্রকারে হিন্দু জীবন যাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বামীজি স্বয়ং তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে পাশ্চাত্য শিষ্যগণসহ স্বামীজি উত্তর ভারত ভ্রমণে বাহির হইলে নিবেদিতাও তাঁহার সহিত গমন করেন। এই ভ্রমণ কালে তিনি স্বামীজির নিকট ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রতিদিন নানাবিধ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া স্বামীজি তেজঃপূর্ণ ভাষায় ভারতের আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। গুরুর অপূর্ব্ব শিক্ষাগুণে ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে নিবেদিতা অচিরেই ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া একান্তভাবে তাঁহারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ নিবেদিতা সংকল্প করিলেন—দ্বারে গিয়া তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতের কন্যাগণকে উদ্বোধন মন্ত্র শুনাইবেন। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আদর্শের সংমিশ্রণে নিবেদিতারূপ অপূর্ব্ব চরিত্রের বাস্তব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন ভবিষ্যতে শত শত নারীকে অনুপ্রাণিতা করিয়া মহান্ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য। এইরূপে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তাঁহার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাগুলির অন্যতমটীর নিবেদিতাকে দিয়া উদ্বোধন হইল।

উত্তর ভারতে ভ্রমণ কালেই স্বামীজি নিবেদিতার সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং স্থির হয় প্রথমে একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া বালিকাগণের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। অক্টোবর মাসে নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১৭নং বোসপাড়া লেনে অবস্থান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর কালীপূজার দিন সকালে শ্রীশ্রীসারদা দেবী বেলুড় মঠের নবক্রীত জমি দেখিতে আসেন এবং তাঁহার উপস্থিতিতে স্বামীজি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরাহ্নে স্বামীজি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও অপর গুরুভ্রাতাগণের সহিত শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে লইয়া ১৭নং বোসপাড়া লেনে আসেন। শ্রীশ্রীমা সংকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু স্বরে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে—তিনি প্রার্থনা করিতেছেন এই বিদ্যালয়ের উপর যেন জগজ্জননীর আশীর্ব্বাদ থাকে এবং যে সকল বালিকা এখানে শিক্ষালাভ করিবে তাহারা যেন দেশের আদর্শ কন্যা হয়।

নিবেদিতা নিজেও বলিয়াছেন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আশীর্ব্বাদের কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। নিবেদিতার স্থির বিশ্বাস ছিল এই বিদ্যালয় হইতেই একদিন মৈত্রেয়ী ও গার্গীর পুনরভ্যুদয় হইবে। স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভারতবর্ষকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন এবং সে ভালবাসা সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধরহিত ছিল বলিয়া প্রতিদানের অপেক্ষা রাখিত না এবং অপ্রতিদানেও ম্লান না হইয়া সমভাবেই উজ্জ্বল থাকিত।

"নিরাশ" শব্দটী নিবেদিতার অভিধানে ছিল না। তিনি কার্য্যমাত্রই ঈশ্বরের কাজ জানিয়া তাহাতে হাত দিতেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে যে শুধু আশা করিতেন তাহা নহে, একেবারে দৃঢ়নিশ্চয় হইতেন। তিনি বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে একটী গান শিখাইয়াছিলেন—তাহার ভাব এইরূপ—"আগে চল, আগে চল। এস ভাই, আমরা অতীতের সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া দলে দলে সম্মুখের দিকে চলি। আনন্দই জীবন…… দুঃখের কথা মুখেও আনিও না।—দেখ, এই জগত পরিপূর্ণ করিয়া কেবল ভগবানের জয় ঘোষণার স্তোত্রধ্বনি উঠিতেছে, এস আমরা প্রাণ দিয়া সাধনা করিয়া তাঁহারই জয় ঘোষণা করি। আগে চল ভাই, সব দলে দলে আগে চল। পথে চলিতে যদি কেহ পড়িয়া যায়, আমরা তাহাকে তুলিয়া লইব, পথ প্রান্তে তাহাকে মরিতে দিব না।"

বার বার নানা অসুবিধা ও অর্থাভাবে তাঁহার বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের আশা নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। তিনি বলিতেন—"বিদ্যালয়ের উপর স্বামীজীর নিঃশ্বাস রহিয়াছে, ইহা ভারতের নব-জাগরণের উদ্বোধন মন্ত্র-স্বরূপ হইবে।"—কাহাকেও বাধা বিপত্তি বা নিষ্ফলতায় ব্যথিত হইয়া নিরাশভাবে কিছু বলিতে শুনিলে এই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনী তেজের সহিত বলিয়া উঠিতেন—আমরা আশা করিব না এবং নিরাশ হইব না, আমরা দৃঢ় নিষ্ঠ—আমরা অগ্রগামীর দল (Band of despair)—নিজের শরীর দিয়া সেতু প্রস্তুত করিব—পরবর্ত্তী সৈন্যদল সেই সেতুর উপর দিয়া পার হইয়া যাইবে।

আজ ভগিনী আমাদের সম্মুখে নাই। কিন্তু তপস্বিনীর আজীবন সাধনার জীবন্ত জ্বলন্ত মূর্ত্তি তাঁহার বিদ্যালয় এখনও রহিয়াছে। তাঁহার প্রাণপাতী তপস্যাই ইহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিল।—যেন মনে হয় আজও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মত আকুলকণ্ঠে ভারতের নারীগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"যদি কেহ কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পার—ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের কল্যাণ কামনায় জীবন দান করিতে পার—তবে এস—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপন হৃদয়-শোণিত দিয়া এই তীর্থকে পবিত্র কর—আপন জীবন ধন্য কর।"

হাউস-ফর সেল

(আলফোঁস দোঁদে)

অনুবাদক—শ্রীতন্ময় বাগচী

দরজার মাথায় একটা পিজ্ বোর্ডের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—'বাড়ী বিক্রয়'। অনেকদিন ধরে ঝুলছে ঐ বোর্ডটা। প্রখর সূর্য-তাপে কখনও বা ঝলসে গেছে; বর্ষার প্রথম বর্ষণে কখনও বা ভিজে চুপষে গেছে; বসন্তের মৃদু মন্দ বাতাসে আবার কখনও অল্প অল্প দুলেছে! কিন্তু সে-সব অত্যাচার সহ্য করেও আজো আছে ঠিক তেমনি শক্ত—তেমনি অক্ষত!

মাঠের মাঝে ভাঙ্গা বাড়ী সেটি! মেটে রাস্তার ধূলো বাগানের লাল সুরকির গুঁড়োর সাথে এক হয়ে মিশে যায়। সেই নির্জন বাড়ীটা দেখে মনে হয়, দুষ্ট অঙ্গের মত এটিকেও বাড়ীর মালিক পরিত্যাগ করে গেছে। দেওয়াল ধারের ছোট্ট চিমনী থেকে নীল রঙের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুটে গিয়ে জানিয়ে দেয়—এই বাড়ীতে তার মত আনন্দহীন একজনের বাসের খবর। প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার মধ্যে থেকেও তার মনে এতটুকু সুখ নেই।

পথ চলতে গিয়ে পথিকের দল হঠাৎ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে তাদের চোখে পড়ে গেছে বাগানের মাঝখানের পুকুরের ধারে জল দেবার ঝাঁজরি, মাটি কোপাবার কোদাল প্রভৃতি সাজানো আছে। লাল সুরকির পথ সোজা চলে গেছে বারান্দা পর্যন্ত! রাস্তার ধারের একটুখানি নীচু জমির ওপর ঘরখানা! দূর থেকে দেখায় যেন লতা-পাতা ঢাকা এক উদ্ভিদ-গৃহ! গাছ পোঁতবার টবগুলো ওল্টানো। বাগানের মাঝে দু' একটা শাখাবহুল প্ল্যাটান, আর তার চারপাশে ষ্ট্রবেরী, মটর প্রভৃতি ফলের গাছ!

প্রকৃতির এই সৌন্দর্যলীলার মাঝে খড়ের টুপী মাথায় দিয়ে বুড়ো একা একাই ঘুরে বেড়ায়। কখনও গাছে জল দেয়, কখনও আবার আগাছা পরিষ্কার করে।

একমাত্র রুটিওয়ালা ছাড়া আর কারো সাথে বুড়োর আলাপ নেই। ফলের ভারে নুয়ে-পড়া গাছ দেখে রাস্তার কোন পথিক হয়ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে! তারপর দরজার ওপর 'বাড়ী বিক্রয়'-এর বোর্ড দেখতে পেয়ে খোঁজ করতে ঢোকে। প্রথমবারের কড়া নাড়াতে কেউ আসে না, কিন্তু দ্বিতীয়বার বাজতেই বাগানের ভেতর মস্ মস্ পায়ের শব্দ হয়। তারপরেই দরজার খিল খুলে ফেলে বুড়ো জিগ্ গেস করে—'কি প্রয়োজন!'

'এ বাড়ী কি বিক্রী হবে?'

'হ্যাঁ! কিন্তু দাম খুব বেশী।'—বুড়োর দু'চোখ হঠাৎ জলে ভরে আসে। তাই উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা বন্ধ করে দেয়।

তারপরই দেখা যায় বাগানের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে বুড়ো, আর মাঝে মাঝে মণিহারা ফণীর মত দরজার দিকে তাকাচ্ছে। পথিকেরা বুড়োর এই অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক হয়ে বলে—'লোকটা পাগল নাকি? বাড়ী বিক্রীর বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে, অথচ…'

কিন্তু বুড়োর এই ব্যবহারের আসল কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম অনেকদিন পরে। একদিন সেই বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছি—এমন সময় বাড়ীর ভেতরের চীৎকার কানে যেতেই আমার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল!

'এ বাড়ী তোমায় বিক্রী করতেই হবে বাবা। তুমিই তো আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে!'

বুড়োর কম্পিত স্বর শোনা গেল—'তোদের অমতে কিছুই তো করিনি! বাড়ী বিক্রী করব বলেই তো দরজায়……'

ধীরে ধীরে জানলাম—বুড়োর ছেলেদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল! প্যারীতে চালু কারবার তাদের। তারাই এ বাড়ী বিক্রীর জন্য বুড়োকে পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু বাড়ী বিক্রীর অযথা বিলম্ব দেখে প্রতি রবিবার এসে বুড়োকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। রবিবারের ছুটী পর্যন্ত উপভোগ করতে দেয় না!

রবিবার ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই শুনতে পেতাম, বুড়োর ছেলেদের বাড়ী বিক্রীর আলোচনা! টাকা কড়ির কথা উঠলেই সমস্ত বাগান যেন উচ্চহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা হলেই ছেলেরা প্যারীতে ফিরে যায়। বুড়ো তাদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন বুড়োর চোখে মুখে হাসি যেন উপচে পড়ে! আবার সেই আগামী রবিবার—পূরো সাতটা দিন! এ কটা দিন তো শান্তিতে থাকা যাবে!

রবিবার ছাড়া বাকী কটা দিন বাড়ীটা যেন মৃতের মত শুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কেবল মাঝে মাঝে বুড়োর জুতোর মস্ মস্ শব্দ শোনা যায়!

বাড়ী বিক্রীর দেরী দেখে ছেলেরা বুড়োকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে আরম্ভ করল। নাতি নাত্নীরা তাদের

দাদুকে নিয়ে যাবার বায়না ধরল! বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'আমাদের সঙ্গে চল না দাদু! কেমন আনন্দে থাকব সবাই।' ছেলেরাও যোগ দেয়, আর তাদের বৌরা বাড়ী বিক্রীর টাকার হিসাব করতে থাকে! বুড়োর মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হয় না। শুধু নাতি নাতনীদের আদর করে কাছে টেনে আনে!

একদিন শুনলাম, বুড়োর এক পুত্রবধূ বলছে—'এটার দাম একশ' ফ্রাঙ্ক হবে না! সুতরাং একে ভেঙ্গে ফেলাই উচিত!' আর একজন এমন ভাব দেখাল—যেন বুড়ো অনেককাল আগে মারা গেছে, আর বাড়ীটাও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

বুড়োর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে! নিশ্চলের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে সব কথা শোনে শুধু। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে বাগানে গিয়ে হাজির হয়।

* * * *

বিরাট বট গাছের মত এখানেও বুড়ো আপন আধিপত্যে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে রইল। কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারলো না! ছেলেদের নানা রকম স্তোক-বাক্যে ভোলাতে লাগলো। বসন্তের শেষে যখন ফল পাকতে সুরু হয়, তখন বুড়ো তার ছেলেদের বোঝালো এই সব ফল শেষ হলেই বাড়ী বিক্রী করে দেবে!

চেরী, আঙ্গুর, পীচ একে একে পেকে যেতে লাগলো; মেড্লার ফুলও ফুটে ঝরে পড়ল, কিন্তু বাড়ী বিক্রী আর হোল না।

শীত এলো। সে পথে লোকজন হাঁটাও কমে গেল; ছেলেরা আসা বন্ধ করলো। এই তিনটে মাস বুড়োর নিরুপদ্রবে কাটে। এই সময় নতুন বীজ পোঁতে, গাছের বাড়তি ডালগুলো ছেঁটে ঠিক করে রাখে। জীর্ণ কাগজে 'বাড়ী বিক্রয়' লেখা বোর্ডটা শীতের বাতাসে অল্প অল্প দুলতে থাকে!

বুড়োর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ছেলেরা বাড়ী বিক্রী করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হোল! বুড়োর এক পুত্রবধূ সেখানে এসে রইল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাজগোজ করে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে পথিকদের বলে—'এ বাড়ী বিক্রী আছে একবার দেখে যান না!'

পুত্রবধূর আগমনে বুড়োর মনে স্বস্তি নেই! মরণ-ভীত লোকেরা মনের ভয় দূর করবার জন্য যেমন নিত্য নূতন কল্পনা করে, তেমনি পুত্রবধূর অস্তিত্ব ভুলে থাকবার জন্য বাগানে নতুন নতুন বীজ লাগাতে সুরু করল!

পুত্রবধূ প্রতিবাদ করে বলে—'আর বীজ পুঁতে লাভ কি বাবা? দু'দিন পরেই যখন বাড়ী বিক্রী হয়ে যাবে তখন এত পরিশ্রম কেন?'

মুখে কোন উত্তর না দিয়ে বুড়ো একমনে কাজ করে যায়। বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে কোথাও যেন এক টুক্রো ময়লা না লেগে থাকে! বাগানটা সব সময়েই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে!

তখন যুদ্ধ চলেছে। পুত্রবধূর সাজ-সজ্জা আর মুখের হাসিতেও কোন খরিদ্দার জুটলো না। দিনের পর দিন এই এক ঘেঁয়ে একটানা কাজে বিরক্তি আসে তার। কোন অবলম্বন না পেয়ে বুড়োকেই বিরক্ত করতে থাকে। অযথা তিরস্কার করতেও ছাড়ে না। বুড়ো নীরবে মুখ বুঁজে সব সহ্য করে যায়! তার নব-রোপিত বীজ থেকে অঙ্কুর আর দরজার মাথায় বাড়ী বিক্রীর ঝুলন্ত বিজ্ঞাপন দেখে মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে!

* * * *

অনেক দিন পরে এই পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে এসে আবার দেখলাম বুড়োর বাড়ীটা! কিন্তু দরজার মাথায় 'বাড়ী বিক্রয়'-এর বোর্ড আর ঝুলছে না! সেই আধভাঙ্গা দরজাও আর নেই!—তার যায়গা নিয়েছে একটা সুন্দর খোদাই করা দরজা! বাগানের সেই সুন্দর সুন্দর ফলের গাছও কোথায় যেন অন্তর্ধান করেছে। ফোয়ারা, বেঞ্চি আর চেয়ার তার যায়গা দখল করে বসেছে। বাগানে দেখলাম এক পুরুষ আর এক রমণীকে। পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে দু'জন বসে আছে! পুরুষটি বেজায় মোটা। সঙ্গিনীও সেই রকমই। বিকট হাসির সঙ্গে শুনলাম স্ত্রীলোকটির কথা—'পনের ফ্রাঙ্ক খরচ করে এই চেয়ার কিনেছি!'

কুটীরের সে সহজ সৌন্দর্য আর নেই। একটা নতুন বাড়ী গড়ে উঠেছে। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে এক যুবতীর পিয়ানোর সাথে কণ্ঠ-যুদ্ধের আওয়াজ!

এতদিনে তাহলে বাড়ী বিক্রী করেছে…!

কেন জানি না আমার মনের মধ্যে সেই বুড়োর কথাই তোলপাড় করতে লাগল! এ যায়গায় সেও একদিন বাস করে গেছে। কিন্তু আজ…?

হঠাৎ আমার মন চলে গেল—সেই প্যারীর রাজপথের ধারে বুড়োর ছেলেদের দোকানে। স্পষ্ট দেখতে লাগলাম দোকানের এক কোণে হতাশ মনে চেয়ারে বসে আছে বুড়ো। চোখমুখ অশ্রুভারাক্রান্ত—সুখ নেই, শান্তি নেই, স্ফূর্তি নেই—যেন নির্জীব নিস্পন্দ; স্থবির বৃদ্ধত্বে ভরা প্রাণহীন! আর তার পুত্রবধূরা এক বড় খরিদ্দারকে ঠকিয়ে ঠন্ ঠন্ করে টাকাগুলো গুণে চলেছে।

উদ্বাস্তু-সমস্যা—

পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে বাস্তুত্যাগী হিন্দুদিগের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের বিরাম নাই। তাহাতে যে সমস্যার সমুদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, তাহার জটিলতা বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারত সরকারের যে মন্ত্রী আইন-বিভাগের ভারের সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ বিভাগের ভারও পাইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালী—চারুচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি আবার পূর্ব্ববঙ্গ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন—ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—ছাড়পত্র প্রবর্ত্তনই বাস্তুত্যাগীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নহে—অন্যতম কারণ মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুরা আর পূর্ব্ববঙ্গে আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেছে না। যখন পাকিস্তান সরকার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না অথবা করিতেছেন না, তখন হিন্দুদিগের পূর্ব্ববঙ্গত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। যদিও ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই সমস্যা ঈপ্সিত সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে, তথাপি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য দান ও পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীমতী রেণুকা রায় তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—যদি তিনি কোন উপায় করেন। পণ্ডিত জওহরলাল আসামে সফরে যাইবার পথে কয় ঘণ্টা কলিকাতায় ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনি গমন করেন নাই; এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টাতেও যে শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন বাস্তুহারাশূন্য করা সম্ভব হয় নাই, তথায়ও গমন করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে কেবল কন্যাকে সে দৃশ্য দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রী হয়ত পরিদর্শনে যাইবেন, ভাবিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বহু উদ্বাস্তুকে অপসারিত করিয়াছিলেন এবং একজন উপসচিবের নেতৃত্বে স্থানটি পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ইহা যে প্রকৃত অবস্থা গোপন অর্থাৎ প্রকারান্তরে সত্য গোপন, তাহা, বোধ হয়, বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ-কংগ্রেস এই সমস্যা সম্বন্ধে এখন, বোধ হয়, কেন্দ্রী সরকারের নির্দ্দেশাপেক্ষা হইয়া নির্ব্বাক আছেন। প্রদেশে কংগ্রেসদল ও কমুনিষ্টদল ব্যতীত আর সকল দল একযোগে ভারত সরকারের বর্ত্তমান নীতিকে দুর্ব্বল বলিয়া পাকিস্তানের সম্বন্ধে অর্থনীতিক অবরোধাদি সক্রিয় নীতি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে। কিন্তু ভারত সরকার যদি বলেন, পাকিস্তান যখন মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতেছে না, তখন তাঁহারা পাকিস্তানকে কয়লা, কাপড়, লৌহ, তৈল ও লবণ দিবেন না এবং পাকিস্তান হইতে পাটও লইবেন না, তবে তাহা কি যুদ্ধ-ঘোষণা হয়? পারস্য যে পেট্রলের ব্যাপার লইয়া বৃটেনের সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন, তাহা কি যুদ্ধ-ঘোষণা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে? সুতরাং ভারত সরকার কোন কার্য্যকরী সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন এবং তাহা না করায় দেশে অসন্তোষ সৃষ্টি হইতেছে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—যে সময় পাকিস্তান হিন্দুবিতাড়ননীতির অনুসরণ করিতেছে, সেই সময় পাকিস্তানী খেলা-দলকে আমন্ত্রণে আপত্তি করিয়া "পিকেটিং" করিবেন বলায় নাগপুরে হিন্দুমহাসভার সভাপতিকে সরকার প্রতিরোধক আইনে বন্দী করিয়াছিলেন। পাকিস্তান যে হিন্দুবিতাড়ননীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। তিনি এখন বলিয়াছেন, পশ্চিম পাকিস্তান সংখ্যায় গরিষ্ঠতা লাভের জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তান হিন্দুশূন্য করিতেছে। তিনি—কেবল বাস্তুত্যাগীদিগের পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থার জন্য বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের অসমৃদ্ধ অংশ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও পণ্ডিত জওহরলালের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই; তিনি প্রধান-সচিবের প্রস্তাবের নিন্দাই করিয়াছেন।

এই অবস্থায় বাঙ্গালী বাস্তুত্যাগীদিগকে বিহার, উড়িষ্যায় ও আন্দামানে পাঠাইবার যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা মানুষের মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব-দ্যোতক। সে ব্যবস্থা যে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি। সেই জন্য আমরা বলিতে চাহি—এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি উপায় অবলম্বন করুন—

(১) পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে জমী চাষের ও বাসের উপযুক্ত হইলেও অব্যবহৃত রহিয়াছে, সে সকল ব্যবহারযোগ্য করার ব্যবস্থা করুন। এই সকল জমী কোথাও জলবদ্ধ, কোথাও বা জলাভাবে শুষ্ক। জলবদ্ধ জমীর জলনিকাশের ও জলাভাবগ্রস্ত জমীতে জলদানের ব্যবস্থা—এই বৈজ্ঞানিক

যুগে কষ্টসাধ্য নহে। সেজন্য প্রধান অভাব চেষ্টার। সেই চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, লোকের সহযোগ আকৃষ্ট করিয়া, করিতে হইবে।

(২) পশ্চিমবঙ্গে যে সকল গ্রাম এক সময়ে জনবহুল ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রভৃতির উপদ্রবে জনবিরল হইয়াছে, সে সকলের আবশ্যক সংস্কার সাধন করিয়া পুনর্ব্বসতির কার্য্যে ব্যবহার করা হউক। এই বিষয়ে আমরা একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। গ্রামে যে সকল পতিত জমী, ভিটা ও গৃহ অব্যবহৃত, সে সকলের মালিকদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে সকল অধিকার করিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক এবং অধিকারীরা উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে ঐ সকল সম্পত্তি ব্যবহারযোগ্য করিতে বলা হউক। যদি অধিকারীর সন্ধান না পাওয়া যায় বা সন্ধান পাইলে অধিকারী ত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবহার করিতে অসম্মত হ'ন, তবে সরকার উহা অধিকার করিয়া ব্যবহার জন্য বিলি করুন। অধিকারীকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতা হইতে ২০।২৫ মাইলের মধ্যেও ঐরূপ অনেক গ্রাম আছে এবং সে সকলে বহু লোকের বাসের ব্যবস্থা হইতে পারে। বৰ্দ্ধমান সহরের উপকণ্ঠস্থিত যে কাঞ্চননগর এক কালে সমৃদ্ধ থাকিয়া ক্রমে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই আবার উদ্বাস্তু-সমাগমে বাসযোগ্য ও জনবহুল হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। ইহাতে বহু লোকের পুনর্ব্বাসন সম্ভব হইতে পারে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের সীমাসংলগ্ন ভূমি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশদ্বয়কে দিতে স্বীকার করিবার জন্য কেন্দ্রী সরকারকে প্ররোচিত করা।

যুদ্ধ কেহ চাহে না। সুতরাং অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী না হইলে যুদ্ধের পথ গ্রহণ করিতে কেহই বলিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল যদি মনে করেন, সমগ্র ভারত রাষ্ট্রে তিনিই একা শান্তিপ্রিয় এবং শান্তির একমাত্র রক্ষক, তবে তিনি ভুল করিবেন। তিনিও যেন মনে রাখেন, অপ্রয়োজনে নিবার্য্য যুদ্ধ যেমন পাপ, তেমনই প্রয়োজনে অনিবার্য্য যুদ্ধও "ধর্ম্ম-যুদ্ধ"।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—

রুসিয়া জার (সম্রাট)-বংশ নির্ব্বংশ করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে বিশেষজ্ঞদিগকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারত রাষ্ট্র অনুকরণ-পটুত্বের পরিচয় দিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সংপ্রতি প্রকাশ—স্থির হইয়াছে, পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যয় প্রথম হিসাবের ব্যয় অপেক্ষা ২০৭ কোটি টাকা বাড়িয়া ২,০০০ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। অবশ্য ব্যয় আনুমানিক এবং দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ও সিন্ধুরীর সারের কারখানার পরিকল্পনা কোনটিতেই আনুমানিক ব্যয়ে কুলায় নাই।

ব্যয় ২ হাজার কোটি টাকা হইবে বটে, কিন্তু আশা, ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় উৎপাদনের মূল্য এক হাজার কোটি টাকা বৰ্দ্ধিত হইয়া ১০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। জাতির আয় শতকরা ১১ হইতে ১২ ভাগ বাড়িবে।

এখন প্রথম বিবেচ্য, ২ হাজার কোটি টাকা কিরূপে সংগৃহীত হইবে? এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বিদেশ হইতে হয়ত ঋণ-গ্রহণের প্রস্তাব নাই। কিন্তু ঋণ না লইলেও যে দান গৃহীত হইতে পারে, তাহা আমেরিকার অবারিত ও উদার সাহায্যে দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় কথা—এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বিদেশী বিশেষজ্ঞে ও বিদেশী যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে কত কোটি টাকা দিতে হইবে?

বলা হইয়াছে, সেচের ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যয় বৰ্দ্ধিত করা হইবে। নূতন ৫টি পরিকল্পনার জন্য ৪০ কোটি টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই কয়টিতে নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি উপকৃত হইবে—বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত ও রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ। প্রাদেশিকতাদুষ্ট দৃষ্টিতে আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ভাগীরথীর বাঁধ-সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ-সমস্যা হইলেও, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় তাহা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব্ব সেচ সচিব বলিয়াছিলেন, বহু অর্থব্যয়ে ভাগীরথীর জল-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার জন্য সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞদিগের মত—এখনও বিবেচনার জন্য আবশ্যক উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই! তবে কি লক্ষ লক্ষ টাকা এই কয় বৎসর বৃথা গিয়াছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি পরিকল্পনা-কমিশনকে ভাগীরথীর জল-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই? না, কমিশন পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়াছেন?

পরিবর্ত্তিত পরিকল্পনায় গ্রামে তৈলশিল্প ও খদ্দর প্রস্তুত ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহার্থ কলের কাপড়ের উপর সামান্য কর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আছে।

প্রথম কথা—অর্থের। তাহা কিরূপে সংগৃহীত হইবে—তাহাই প্রথমে বিবেচ্য। কারণ, আবশ্যক অর্থের সংস্থান না হইলে পরিকল্পনা কাগজে ছাপার অক্ষরেই থাকিয়া যাইবে—কার্য্যে পরিণত হইবে না।

জাতির আয়বৃদ্ধির কল্পনা নিশ্চয় আনন্দদায়ক। কিন্তু আয়বৃদ্ধির জন্য যে মূলধন-প্রয়োগ প্রয়োজন তাহার সমস্যা কিরূপে সমাধান করা হইবে?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—নূতনই হউক এবং পুরাতনই হউক, পশ্চিম-বঙ্গের ভাগে কি পড়িল?

পশ্চিমবঙ্গে নূতন পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রায় দুই মাস বিদেশে ছিলেন; প্রত্যাবর্ত্তন-পথে লণ্ডনে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি কতকগুলি নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন—কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপন সে সকলের অন্যতম। তাহাতে আনুমানিক ব্যয় ৪৫ কোটি টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, এই রেলে হয়ত আর্থিক লাভ হইবে না ("this scheme might not be

profitable") কিন্তু কলিকাতার রাজপথে যান ও যাত্রী আর ধরে না—তাহাদিগের নির্বিঘ্নতার জন্য ভূগর্ভে রেল চালান ব্যতীত অন্য উপায় নাই। "হয়ত আর্থিক লাভ হইবে না"—বলা হইয়াছে! আর্থিক ক্ষতি হইবে কিনা, তাহা বলা হয় নাই।

ইতঃপূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুইটি ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে এবং কোনটি লাভজনক হয় নাই—সমুদ্রে মৎস সংগ্রহের জন্য ট্রলার ক্রয় ও বিদেশী নাবিকদিগের দ্বারা তাহা ব্যবহার এবং সরকারী বাস-পরিচালনা। প্রথম কার্য্যে আর্থিক ক্ষতি অল্প হয় নাই এবং বিভাগীয় সেক্রেটারী বলিয়াছেন—উহা লাভের জন্য নহে, কেবল পরীক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। ট্রলারগুলি—ইংরেজের আমলের কয়খানি ড্রেজারের (মাটি-কাটা কল) মতই হয়ত ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। সরকারী বাস-পরিচালনেও যে টাকা মূলধন হিসাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্তোষজনক লাভ হয় নাই—লোকসান হইবারই সম্ভাবনা।

এবার প্রথমেই চারিটি নূতন পরিকল্পনার কথা শুনা গিয়াছে—

(১) কলিকাতার ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপন

(২) কলিকাতার আবর্জ্জনা হইতে গ্যাস উৎপাদন

(৩) কলিকাতার ড্রেণ নূতন উপায়ে আবর্জ্জনাশূন্য করা

(৪) পশ্চিমবঙ্গে লবণ প্রস্তুত করা।

প্রকাশ, প্রধান সচিবের পুনরাগমনের সপ্তাহকাল মধ্যেই সরকার এই সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন স্থির হইয়াছে এবং জার্ম্মাণীও আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কলিকাতায়ই যে নূতন পরিকল্পনাসমূহের "সিংহভাগ" পড়িতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। ভূগর্ভে রেলেরই আনুমানিক ব্যয় ৪৫ কোটি টাকা এবং তাহাতে যে লাভ না-ও হইতে পারে, তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। উহার জন্য ইতোমধ্যেই ফরাসী এঞ্জিনিয়ার ও ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার—পারিশ্রমিক লইয়া—মত প্রকাশ করিয়াছেন, এখন আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আনা হইবে।

কলিকাতার কোন সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—যে সময় কেন্দ্রী সরকার সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য বিরাট বিরাট পরিকল্পনায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের আয়োজন করিতেছেন, সেই সময় কোন প্রদেশের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনায় অর্থ-নিয়োগ সঙ্গত কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়। অবশ্য স্বল্পব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর একটি বিবেচনার বিষয়—"আগের কাজ আগে করা কর্ত্তব্য।" আজ যখন পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তরা ও সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারী কলিকাতার রাজপথে রৌদ্রে পুড়িতেছে—বৃষ্টিতে ভিজিতেছে, বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে—তখন উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণ সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য—অন্যান্য কার্য্যের পরিকল্পনা পরে বিবেচিত হইতে পারে!

বিশেষ যে সকল পরিকল্পনা ব্যয়বহুল হইলেও লাভজনক না-ও হইতে পারে, সে সকল বিলাস বলিলেও বলা যায় এবং প্রয়োজন পূর্ণ না করিয়া বিলাসে মনোযোগদান প্রশংসনীয় নহে।

সুন্দরবনের যে বাঁধ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কার করিলে হয়ত দুর্ভিক্ষ হইত না—শস্যহানি নিবারিত হইত—সে বাঁধ সম্বন্ধে যে মনোযোগদান প্রয়োজন, তাহা অন্য কার্য্যে প্রযুক্ত করা সমর্থনযোগ্য নহে।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তুহারাদিগের আগমনে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান যে পশ্চিমবঙ্গসরকার করিতে পারিতেছেন না, তাহার প্রমাণ—শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে, বনগ্রামে, ইটিণ্ডাঘাটে—দিকে দিকে সপ্রকাশ। উদ্বাস্তুদিগের হাহাকারে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাতাস আজ মুখরিত; তাহারা যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহা মনুষ্যের অযোগ্য। এই অবস্থায় এখন প্রদেশের ও রাষ্ট্রের প্রথম কর্ত্তব্য—তাহাদিগের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা। যদি সেই ব্যবস্থাকে সর্ব্বপ্রথম গুরুত্ব প্রদান করা না হয়, তবে দেশে যে অসন্তোষের উদ্ভব হইবে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। কলিকাতার লোক পথ চলিতে যে অসুবিধাভোগ করে, তাহা বাস্তুহারা-দিগের কষ্টের তুলনায় তুচ্ছ; সুতরাং তাহা এখন উপেক্ষা করা যাইতে পারে। কলিকাতার উপকণ্ঠে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা ও কলিকাতায় রেল-যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি করিলে যে আপাততঃ কলিকাতার পথে যানযাত্রীর সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধান হইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। সেদিকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

গোরক্ষা ও গোহত্যা—

গোপাষ্টমী উপলক্ষ করিয়া ভারতরাষ্ট্রে গোরক্ষার জন্য গোহত্যা-নিবারণ-কল্পে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহা সমর্থন করিয়া বেতারে বক্তৃতা দিয়াছেন; আর প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল আন্দোলনের উদ্যোগীদিগকে—অকারণে আক্রমণ করিয়া সুরুচির অভাব দেখাইয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, স্মরণাতীত কাল হইতে গোধনই ভারতের অর্থনীতিক কেন্দ্র। এ দেশে গরু ব্যতীত ভূমি কর্ষিত হয় না; বহু লোক দুগ্ধ পান করে। ভারতরাষ্ট্রে গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় ১৫০০০০০০০। ইহাদিগের মধ্যে রুগ্ন ও বৃদ্ধ পশুগুলিকে স্বতন্ত্র করিয়া গোজাতির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কবে—ভারতরাষ্ট্রে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনফলে—বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্ট হইবে এবং তাহাতে ট্রাক্টর চালাইয়া চাষ হইবে, তাহা বলা যায় না। সে যেন সেই—"হনোজ দিল্লী দুরস্ত।" তত দিন গরুর দ্বারা চালিত লাঙ্গলেই চাষ হইবে। গোদুগ্ধের অভাবে আমরা বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে কত টাকার গুঁড়া দুধ আনিতেছি, তাহাও সরকারী হিসাবে দেখা যায়।

সেই জন্য মনে হয়, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সত্যই বলিয়াছেন—

গরুই ভারতের অর্থনীতিক ভার পৃষ্ঠে বহন করিতেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিয়া ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অনায়াসে বলিয়াছেন—গোহত্যা নিবারণ-আন্দোলন রাজনীতিক আন্দোলন এবং যাঁহারা নির্ব্বাচনে ব্যবস্থাপক

সভায় বা পার্লামেন্টে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই, আপনাদিগকে জাহির করিবার উদ্দেশ্যে, এই আন্দোলন করিতেছেন !

যে কাজ তিনি স্বয়ং করিবেন না—তাহাই যাহারা করে তাহারা নিন্দনীয় ; এইরূপ মত প্রকাশ যে শিষ্টাচারসম্মত নহে, তাহাও যদি ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতে হয়, তবে যে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে দুর্ভাগ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। শুনিয়াছি, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্বন্ধে জওহরলালের মত—তিনি হিন্দু, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট !

কিন্তু গোহত্যা নিবারণের জন্য যে আন্দোলন, তাহা হিন্দুর আন্দোলন নহে। জওহরলাল কি জানেন না ?—

(১) যুদ্ধের সময়ে এক বৎসরেই প্রায় ৩ লক্ষ গবাদি গৃহপালিত পশু সৈনিকদিগের আহারের জন্য বধ করা হইয়াছিল ? (ইহা সরকারী হিসাব)।

(২) কলিকাতাতেই প্রতিবৎসর বহু উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী এক বৎসর দুগ্ধ দিবার পরে বধ করা হয় ?

(৩) মিউনিসিপ্যালিটীর কশাইখানায় প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র গর্ভধারণক্ষম গাভী নিহত হয় ?

এই সকল কারণে যে গবাদির ধ্বংস হইতেছে এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজ খাদ্যোপকরণ দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইতেছে, তাহা আশা করি, পণ্ডিত জওহরলালও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ তিনি যে এই আন্দোলনকারীদিগকে হীন উদ্দেশ্য—স্বার্থপ্রণোদিত বলিতে দ্বিধানুভব করিতেছেন না ইহা কি প্রশংসনীয় ?

নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়ন্ত্রণ—

ভারত সরকার মধ্যে মধ্যে বলেন, তাঁহারা খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে এইবার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদিগের ঘোষণার ফলে বাজারে ফাটকাবাজ-রা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ফাটকার খেলা হয়। কার্য্যকালে দেখা যায়, কিছুই করা হইল না। দেশে খাদ্যোপকরণ যখন আবশ্যক পরিমাণ হয়, তখন নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজনই থাকে না। বরং ফাটকাবাজ-রা যে ক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মে মূল্য কমাইবার পথ বিঘ্নবহুল করে, সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ভারত সরকার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার যে হিসাব দেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়, তাঁহারা এত দিনেও খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ যাহাই কেন হউক না, যতক্ষণ দেশ খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ সরকারের কর্ত্তব্য !—

[১] দেশকে খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য আবশ্যক চেষ্টা করা ;

(২) দেশের লোকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য দেশে উৎপন্ন করা যায় নাই, তাহা বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করা ;

(৩) যাহাতে ব্যবসায়ীরা অসঙ্গত লাভ খাদ্যশস্যাদিতে না করিতে পারে, সে বিষয়ে আবশ্যক আইন ও সতর্কতাবলম্বন করা।

ভারতসরকার চিনি বিনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু বাজারে চিনির দাম পড়িয়াছে। সরকার তাহার প্রতীকার করেন নাই।

ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী মিষ্টার কিদোয়াই বলিতেছেন—সরকার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন। আমাদিগের বিশ্বাস, ইহাতে দুই দিক হইতে আপত্তি উথাপিত হইবার সম্ভাবনা :—

(১) যে সকল প্রাদেশিক সরকার রেশনিং বহাল রাখিয়া দুই প্রকারে লাভবান হইতেছেন—

(ক) অল্পমূল্যে ক্রীত মাল অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ;

(খ) "পার্মিট" প্রভৃতির অসাধুভাবে ব্যবহার করিয়া দল বজায় রাখিয়া।

(২) যে সকল শ্রমিক-নেতা তাহার বিলোপে বহু লোকের চাকরী যাইবে মনে করিবেন। কিন্তু বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করা সমর্থিত হইতে পারে না। তাহাতে কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান—অস্বাভাবিক উপায়ে উচ্চ করিয়া তোলা হয়।

রুশিয়া বিষম বিপ্লবের পরে অল্পদিনের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ নীতি বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল। বৃটেনে সে নীতি ত্যাগ সম্ভব হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রে তাহা স্থায়ী করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

এক দিকে মিষ্টার কিদোয়াই বলিতেছেন—বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গৃহীত হইবে ; আর এক দিকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিতেছেন—সর্ব্বক্ষেত্রে তাহা গৃহীত হইতে পারে না। যদি পশ্চিমবঙ্গে ধান্য, উত্তরপ্রদেশে গম—বিনিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে বিনিয়ন্ত্রণে কি উপকার হইবে, তাহাও বুঝা যায় না।

এ বিষয়ে ভারতসরকার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের সঙ্কল্প ঘোষণা করিবেন। বিনিয়ন্ত্রণই বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু বিনিয়ন্ত্রণে যাহাতে নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য অন্যায়রূপ বর্দ্ধিত না হয় এবং খাদ্য ও পরিধেয় লোকের পক্ষে সুলভ থাকে, সে বিষয়ে অবহিত থাকা সরকারের কর্ত্তব্য। কোন সরকার সে কর্ত্তব্য পালনে শিথিল-প্রযত্ন হইতে পারেন না।

শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন—

ভারত রাষ্ট্রে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। হিন্দী এখনও রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত হয় নাই, ১৫ বৎসর পরে হইবে—ইহাই ভারতসরকারের অভিপ্রেত। অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এক সম্বর্দ্ধনা সম্মিলনে এলাহাবাদের হাইকোর্টের জজ মিষ্টার সপরু বলিয়াছিলেন—আমরা বলি, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবে, কিন্তু হিন্দী সাহিত্যকে রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত করিতে কি চেষ্টা করা হইতেছে ? এক সপ্তাহে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগের যত পুস্তক ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, গত ৫ বৎসরে হিন্দীতে মোট তত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কি ? আইনের নজির পুস্তক সবই ইংরেজীতে—কেহ যদি ইংরেজী না জানেন, তবে সুবিচার হইবে কিরূপে ? তাঁহার কথা—প্রথমে উপযুক্ত হও, পরে আকাঙ্ক্ষা করিও। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

এক সময়ে বলিয়াছিলেন, ইংরেজী আমাদিগের জাতীয় ভাষা নহে—কিন্তু আমাদিগের আন্তর্জ্জাতিক ভাষা। আজ যখন আমরা সমগ্র জগতের সহিত সম্পর্কশূন্যভাবে থাকিতে পারি না, তখন আমাদিগকে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। বিদেশী ভাষাসমূহের মধ্যে আমরা কিন্তু ইংরেজীর সহিতই পরিচিত এবং এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলেই খণ্ডভারত মহাভারতে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনেই' পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সকল ভারতবাসীকে সম্মিলিত করিবার উপায় যে ইংরেজী তাহা বুঝাইয়াছিলেন।

শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় তাহার প্রাথমিক শিক্ষা হওয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দেশীয় ভাষা যতদিন সমৃদ্ধ না হয়—যতদিন তাহা সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম না হয়—যতদিন দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্য মানুষের জ্ঞানের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে না পারে, ততদিন—প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা ব্যবহার ও সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী ভাষা পুষ্ট ও স্বদেশী-সাহিত্য সমৃদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

সেই জন্য সম্প্রতি ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও বহু শিক্ষাবিদ বিবৃতি দিয়াছেন, বর্ত্তমানে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা বর্জ্জন করা ত পরের কথা—ইংরেজী শিক্ষার মান খর্ব্ব করা অসঙ্গত। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এখনও বহুদিন এ দেশের সর্ব্বপ্রদেশে ব্যবহার্য্য থাকিবে এবং হয়ত চিরদিনই আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে।

আমরা শুনিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ভাইস-চান্সেলারের নেতৃত্বে—এই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য লোক উদ্‌গ্রীব হইয়াই থাকিবে।

এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই ছাত্রদিগকে সাহিত্য বা বিজ্ঞান যে কোন বিভাগে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে হইয়াছে—যাহারা সাহিত্য বিভাগে ছাত্র হয়, তাহাদিগের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সাধারণ জ্ঞানও থাকে না এবং যাহারা বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র হয়, তাহাদিগের সাহিত্যের সহিত পরিচয়-দৈন্য অতি শোচনীয় হয়। বিশেষ প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই ছাত্ররা তাহাদিগের কোন দিকে প্রবণতা তাহা বুঝিতে পারে কি না, সন্দেহ। পূর্ব্বে ছাত্ররা মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে কোন্ বিভাগে যাইবে, তাহা স্থির করিয়া লইত। তখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাহিত্য (ইংরেজী ও অন্য একটি ভাষা) ব্যতীত অবাক্ত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস ও ন্যায় পাঠ করিতে হইত। সেই ব্যবস্থার প্রত্যাবর্ত্তন করা সঙ্গত ও প্রয়োজন কি না, তাহাও বিবেচ্য।

যতদিন প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য (স্কুল ফাইনাল) শিক্ষা—সাধারণ জ্ঞানলাভের পক্ষে যথেষ্ট এবং ছাত্রের জ্ঞানলাভের স্পৃহার উদ্দীপক না হইবে, ততদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা, পূর্ব্ববৎ করা প্রয়োজন কি না, শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তাহা বিবেচনা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থাবলম্বন যে সঙ্গত তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

যদি প্রয়োজন হয়, তবে, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী প্রভৃতিতে যেমন তেমনই, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও স্বতন্ত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রের 'যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা যায়। কারণ, এখন অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত না হইয়াও তাহাতে প্রবেশ করায় অনেক সময়, অর্থ ও অধ্যবসায় নষ্ট হইতেছে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হওয়ায় দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন অভিপ্রেত ও দেশের পক্ষে উন্নতিকর, তাহা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সে বিষয়ে অনবহিত থাকা সরকারের পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে।

ভারতে অভারতীয় শাসন—

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন সাধারণতঃ ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত—

ইংরেজাধীন—

রাজোয়াড়া অর্থাৎ সামন্তরাজ্য।

কিন্তু আর এক ভাগও ছিল—যথা ফরাসী পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি, পর্ত্তুগীজ গোয়া প্রভৃতি। সে সকলের মধ্যে চন্দননগর ভারতরাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে—বিশেষ পণ্ডিচেরীতে ও গোয়ায় বিদেশীরা তাহাদিগের শাসন ও অধিকার রক্ষার জন্য কেবল ছল ও কৌশলই প্রযুক্ত করিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে বল ব্যবহারেও বিরত হইতেছে না। এই সকল স্থান, ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদিগের শাসন-পদ্ধতি ও আমদানী-রপ্তানী-নীতি স্বতন্ত্র হওয়ায় এই সকল স্থানে অসাধু ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা ব্যবসায়ে দুর্নীতির সুবিধা হয়।

যাহারা দুর্নীতির পক্ষপাতী তাহারা এই সকল বিদেশী-শাসিত ঘাঁটীর সমর্থন করে। তাহাদিগের পশ্চাতে যদি বিদেশী শাসন-শক্তি থাকে, তবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে, তাহার পরিচয় ও প্রমাণ আমরা বিশেষভাবে পণ্ডিচেরীতে পাইয়াছি ও পাইতেছি।

গণভোট ভাল কথা—কিন্তু গণভোট যে নানা অসাধু উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং গণভোটই এ বিষয়ে প্রকৃত লোকমত অবগত হইবার একমাত্র উপায় বলা যায় না।

এই সকল স্থানের ভারতভুক্তি ভারতের অধিকারেই হওয়া প্রয়োজন এবং তাহাই সঙ্গত।

যখনই এই সকল স্থানের ভারতভুক্তির কথা উঠে, তখনই দেখা যায়—কতকগুলি লোক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায়। তাহারা কাহারা এবং কাহাদিগের দ্বারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে প্রযুক্ত ও প্ররোচিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সংপ্রতি পণ্ডিচেরীতে দেখা গিয়াছে, যাঁহারা ভারতভুক্তির পক্ষপাতী সেইরূপ ব্যক্তিরা লাঞ্ছিত হইয়াছেন। পণ্ডিচেরীর ফরাসী-সরকার অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতে তৎপরতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইহা যে কোন সভ্য সরকারের পক্ষে নিন্দার কথা।

অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—পণ্ডিচেরীর ভারতভুক্তিই স্বাভাবিক।

যতদিন ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন ছিল, ততদিন ফরাসীর ও পর্ত্তুগীজের

কোন কোন অংশ অধিকারে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। পরন্তু দেখা গিয়াছে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে সে সকল স্থান সুবিধাজনক কেন্দ্র হইয়াছে। বাঙ্গালায় চন্দননগর বহু বিপ্লবীকে আশ্রয় ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়াছে। ইংরেজের কোপ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে যাইয়া তথায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিলেন।

কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তনহেতু ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন সঙ্গত ও প্রয়োজন।

আমরা ভারত সরকারকে অবিলম্বে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং এই সকল স্থানে অধিবাসীদিগকে আত্মসম্মানজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরাধীনতার কলঙ্কমুক্ত হইতে আগ্রহশীল হইতে বলিতেছি। পরাধীনতার গ্লানি যেন তাঁহারা অবশ্য-বর্জ্জনীয় মনে করেন।

দেবনাগর অক্ষর—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সকল বিষয়ে "একটা নতুন কিছু কর"—ভাবের ভাবুক। সংপ্রতি তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রের সহিত ভাষাকেও সংযুক্ত করিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় নানা ভাষার সাহিত্য যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হয়, তবে অনেক সুবিধা হয়!

ভারতীয় ভাষাসমূহের জন্য ইংরেজী (রোমান) অক্ষর ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ইংরেজী অক্ষরে মুদ্রিতও হইয়াছিল। এখন ইংরেজ গিয়াছে এবং হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা ভারত সরকার করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল যখন বলিয়াছেন—দেবনাগর অক্ষরের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়, তখন যে তাঁহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিকে দিকে হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

আমরা কিন্তু মনে করি, ইহাতে ক্রমে হিন্দী প্রচলনেরই সুবিধা হইবে এবং ইহার ফলে বালকবালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বাধা পড়িবে। ইংরেজী আমরা এখন বর্জ্জন করিতে পারি না এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষার্দ্ধে যদি ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, তবে হয়ত ভাল হয়। আবার যদি শিক্ষার্থীদিগকে বাঙ্গালা অক্ষর বর্জ্জন করিয়া দেবনাগর অক্ষর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হয়, তবে যে শিক্ষার গতি দ্রুত হইয়া মন্থর হইবে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। আমরা বলি, এখন ছাত্রের মাতৃভাষায়—অভ্যস্ত অক্ষরে লিখিত পুস্তকের মাধ্যমে—প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হউক—অন্য পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার আর কোন প্রয়োজন নাই।

বিক্রয়-কর—

বিক্রয়-করের বেড়াজালে যে ব্যবসার ও ব্যবসায়ীর নানা অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা জানিয়াও সরকার সে কর বর্জ্জন করিতেছেন না, কারণ তাহাতে রাজস্ববৃদ্ধির নূতন পথ রচিত হইয়াছে। এই কর কিরূপে নিত্য ও অবশ্যব্যবহার্য্য খাদ্যোপকরণের মূল্য বাড়াইয়া দিতেছে, তাহার প্রমাণ বাঙ্গালায়—লঙ্কা ও হরিদ্রাও এই কর হইতে মুক্ত নহে। এই দুইটি দ্রব্যের উপর স্থাপিত কর যে লবণের উপর করেরই মত লোকের পক্ষে কষ্টদায়ক তাহা সকলেই অনুভব করেন। বিক্রয়-করের হিসাব রাখিবার যে জটিল নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের ব্যয় যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে—"কর্ম্মভোগ" তেমনই অধিক হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে একবার যখন এই করের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, তখন কয়জন বিশ্বাসঘাতকের হীন প্রচেষ্টায় সে আন্দোলন ধ্বংস হইয়াছিল।

এবার বোম্বাইএ ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রথমেই প্রবল হরতালে সে আন্দোলনের সাফল্য সূচিত হইয়াছে।

বিক্রয়-কর, যদি সরকারের প্রয়োজনে রাখিতেই হয়, তবে যাহাতে সে কর উৎপীড়ক না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা যে সরকারের কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য।

ব্যবসায়ীরা ও জনসাধারণ তাহাই চাহিতেছে। কিন্তু সরকার তবুও সে বিষয়ে অবহিত হইতেছেন না। ইহা পরিতাপের বিষয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশন বহুদিন স্বায়ত্তশাসনাধিকারে বঞ্চিত ছিল। সেই সময়ে সিভিল সার্ভিসের চাকরীয়ারাই কর্পোরেশনের কার্য্য "দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে" পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। সিভিল-সার্ভিসে চাকরীয়ারা ভারতের দাসত্বকালের চিহ্ন। ইঁহারা বিদেশী সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ। অথচ স্বায়ত্তশাসনশীল পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও তাঁহাদিগকে কেবল বহালই রাখেন নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে নানা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন—এমন কি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল শেষ হইলেও কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করিয়া চাকরীতে বহাল রাখিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। তাঁহাদিগের হস্তেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যভার দিয়াছিলেন। নূতন আইনে—স্বায়ত্ত-শাসন খর্ব্ব করিয়া, সরকার এখন কর্পোরেশনের কার্য্যভার কৌন্সিলারদিগকে দিয়াছেন। এই বিষয়ও রাজনীতিক-প্রভাব বর্জ্জিত হয় নাই এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নূতন কৌন্সিলাররা প্রথমে পুরাতন ব্যবস্থার শেষ ৬ মাসের—পরে ২ বৎসরের কার্য্য পরীক্ষা করিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁহারা বলিয়াছেন :—

(১) কয়টি উচ্চপদে লোক নিয়োগ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে হইয়াছে। যে পত্রে বিদায়ী বড়কর্ত্তা ঐ সব নিয়োগের অনুমোদন করিয়া সরকারকে লিখিয়াছিলেন—সে পত্র পাওয়া যাইতেছে না; সরকার নাকি তাহা কর্পোরেশনকে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; কারণ, তাহা গোপনীয়। যাঁহাদিগের পদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধেও নাকি সন্দেহের অবকাশ আছে।

(২) কর্পোরেশনের যে সকল বিদ্যালয় আছে, সে সকলে শিক্ষয়িত্রী-নিয়োগের ব্যাপারে নাকি অনেক অপ্রীতিকর তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রী-ঘটিত ব্যাপারে পূর্ব্বেও অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এ বার কি তাহা চরমে উঠিয়াছে?

(৩) পরীক্ষক ও পরীক্ষার ব্যবস্থা সব থাকিলেও কর্পোরেশনের খাদ্য বিভাগে যে ঘাটতী ধরা পড়িয়াছে, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অথচ পরীক্ষকরা বা কর্ম্মচারীরা চুরি ত ধরেনই নাই—এমন কি বেনামী পত্র না পাইলে চুরি কৌন্সিলাররা জানিতে পারিতেন না।

ইহাই সিভিলিয়ানী শাসনের পরিচায়ক। যাঁহার কার্য্যকালে এই সব ঘটিয়াছে, তিনি কি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইবেন? না—ইংরেজের আমলে যেমন—এখনও তেমনই, সিভিল সার্ভিস—"স্বর্গজাত" চাকরী; তাহার চাকরীয়ারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন?

সিভিলিয়ানী শাসনে যে কয় জন কর্ম্মচারী সিভিলিয়ান কর্ত্তার (যে কারণেই কেন হউক না) প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং অপকার্য্যের সহিত যাঁহাদিগকে জড়িত করা যায়, তাঁহারা কি পূর্ব্ববৎ ষড়যন্ত্র করিতে থাকিবেন?

যিনি কমিশনার অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার যোগ্যতার ও নিরপেক্ষতার খ্যাতি আছে। কিন্তু তিনি কি পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর দক্ষিণহস্ত ছিলেন বা তাঁহার কোন দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট ঈপ্সিত সহযোগ লাভ করিতেছেন? যদি তাহা লাভ না করেন, তবে যে তাঁহাকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তিনি কি করেন—তাহার উপরেই তাঁহার সাফল্য ও করদাতৃগণের স্বার্থ নির্ভর করিবে।

মিশর ও সুদান—

মিশরের রাজা সিংহাসন ও রাজ্য ত্যাগ করিবার পরে তথায় কঠোর হস্তে শাসনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা বলা যায় না। কারণ, মিশরে যে নানা দলের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। য়ুরোপের শক্তিসমূহ যে মিশরের পরিবর্ত্তন প্রীতি-সহকারে দেখিতেছেন না, তাহা তাঁহাদিগের সুদান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার প্ররোচনায় সপ্রকাশ। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ইংরেজ যেমন কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগে সম্মত করিয়া ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল ও বিবদমান করিয়াছিল, মিশরে তেমনই সুদানকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া মিশর ও সুদান উভয় দেশের সম্মিলনের পথ রুদ্ধ ও উভয় দেশকে দুর্ব্বল করিয়াছে। কথায় বলে—

মহিষের সিং বাঁকা
যুঝবার সময় একা।

তেমনই এসিয়ার দেশসমূহকে দুর্ব্বল রাখাই শ্বেতকায়দিগের নীতি। আফ্রিকায়ও সেই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। চীনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—দুর্ব্বল করিবার কত প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শেষে চিয়াংকাইশেককে "হাত করিয়া" যে চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাও যে ব্যর্থ হইয়াছে, সে চীনের সৌভাগ্যবশতঃ। চীনের জনগণ সেই ষড়যন্ত্রের আবরণ ভেদ করিতে পারায় তথায় জনজাগরণ হইয়াছে।

মিশরে কি হইবে, তাহা বলিবার বা বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মিশরে য়ুরোপীয়দিগের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পারস্য—

তৈল লইয়া পারস্যে যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, বৃটেনের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধশেষে সেই বিবাদের পরিণতি হইয়াছে। একদিন পারস্য বৃটেনের—অধীন না হইলেও—প্রভাবশীল ছিল। ইহাই sphere of influence বলে। অর্থাৎ তখন পারস্য স্বাধীন হইলেও বিদেশী বৃটিশরা সে দেশ শোষণের অধিকার হস্তগত করিয়াছিলেন। পারস্যের তৈলের গুরুত্বও অল্প নহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বেই পারস্যে যে তৈল উৎপন্ন হইত, তাহা যুদ্ধ-জাহাজে ব্যবহৃত হইতেছিল এবং আবাদানে তৈল-শোধনের বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ঐ কারখানার অনেক অংশ ক্রয় করিয়া প্রবল হইয়া বসে। কোম্পানীর নাম তখন "অ্যাংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী" করা হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়—প্রথমে ইংলণ্ডের নাম, পরে ইরাণের। কিন্তু পারস্যেরও রাজনীতিক চেতনালাভ হইতেছিল। সে দীর্ঘ কথার আলোচনার স্থান ইহা নহে। তৈল কোম্পানীর ব্যাপারে পারস্য ইংরেজের সম্বন্ধে অসাধুতার অভিযোগ উপস্থাপিত করে ও কারখানা জাতীয়করণে কৃত-সঙ্কল্প হয়। সে বিষয়ে পারস্য আর কাহারও মধ্যস্থতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া জাতীয় আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় দেয়। তৈল কারখানার কার্য্যভার পারস্য সরকার গ্রহণ করিলে—মীমাংসার যে সকল চেষ্টা হইয়াছে সে সকল ব্যর্থ হওয়ায় পারস্য বৃটেনের সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ইংরেজদিগকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছে। অতঃপর সে আর কোন্ দেশের বা কোন্ দেশসমূহের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ হইবে তাহা তাহার বিবেচ্য। এমনও হইতে পারে যে, সে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে।

কাশ্মীর—

যে জাতিসঙ্ঘের নিকট ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করিয়াছেন, সেই সঙ্ঘ যেভাবে সে সমস্যার সমাধানে বিলম্ব করিতেছেন, তাহাতে বড়শীতে মাছ "গাঁথিয়া" তাহাকে জলে "খেলাইবার" কথাই মনে হয়। পুনঃ পুনঃ প্রতিনিধি প্রেরণ, বারবার আলোচনা, রিপোর্ট পেশ—এই সকলে কেবল কালক্ষয় হইতেছে। আর এই সময়ের মধ্যে যে অধিকৃত অংশে সঙ্ঘের প্রতিনিধিই পাকিস্থানকে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়াছেন কাশ্মীরের সেই অংশ পাকিস্তানের অধিকারে রহিয়াছে এবং সেই মুসলমান-প্রধান অংশে পাকিস্তানি লোককে বশীভূত করিবার সুযোগ পাইতেছে—আর অপরাংশের জন্য ভারত সরকারকে বহু অর্থ, নানা কার্য্যে ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারত সরকার এক দিকে জাতিসঙ্ঘের নির্দ্ধারণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর এক দিকে কাশ্মীর ভারতের অংশ বলিয়া তাহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। এতদুভয়ে সামঞ্জস্যসাধন কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝা যায় না। ভারত সরকারের ঘোষণা ও অর্থব্যয়ের পরে যদি জাতিসঙ্ঘের নির্দ্ধারণ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে হয় তবে যে ভারতের অর্থের অপচয় ও সম্মানহানি হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ভারত সরকার যদি প্রথমে কাশ্মীর অধিকার করিয়া পরে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার পথে অগ্রসর হইতেন, তবে যেমন ন্যায়সঙ্গত মীমাংসাও সহজে হইতে পারিত—তেমনই কালক্ষয়ও হইত না। বর্ত্তমান অবস্থা যেমন অনিশ্চিত, তেমনই কষ্টদায়ক। যত শীঘ্র ইহার অবসান হয়, ততই ভাল। কবে তাহা হইবে?

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছবি দেখার পর শ্রীযুত তাশ্-হোদ্গায়েভের সঙ্গে আমরা গেলুম উজ্বেকিস্তানের চলচ্চিত্র-বিভাগের অন্য-আরো সব কীর্ত্তি-কলাপের পরিচয় জানতে। সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-মন্ত্রিসভার রীতি-অনুযায়ী সে-দেশের অন্য সব প্রজাতন্ত্রের মত উজ্বেকিস্তানের চলচ্চিত্র-বিভাগও চারটি বিশিষ্ট শাখায় বিভক্ত। এ চারটি শাখা হলো—Documentary ও News Film Unit, Cartoon Film Unit, Scientific Film Unit এবং Feature বা Art Film Unit! এই চারটি শাখা-বিভাগের প্রযোজনায় প্রতি-বছর উজবেকিস্তানের
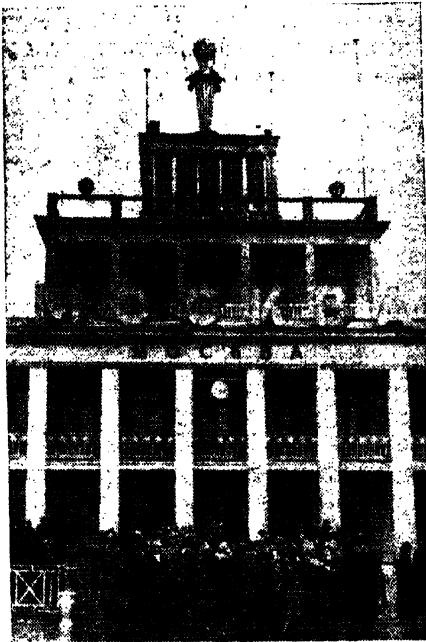
মস্কোর বিমান বন্দরে—ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের দর্শন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষারত জনতা

ফিল্ম্ ষ্টুডিও থেকে অনেকগুলি Documentary বা প্রামাণ্য-চিত্র, News reels বা সংবাদ-চিত্র, কার্টুন বা হাতে-আঁকা ছায়াছবি, Scientific বা বৈজ্ঞানিক-তথ্য-সম্বলিত চিত্র এবং Art-Films বা নাট্য-চিত্র প্রযোজিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষাবিধানকল্পে! এখানকার 'প্রামাণ্য চিত্র' বা Documentary Film-Unitএর কুশলী-কর্ম্মীরা এদেশের সম্বন্ধে নানান্ তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য-চিত্র তোলেন বছরে চার-পাঁচখানি করে। এ-সব প্রামাণ্য-চিত্রগুলি আগে শুধু 'কালো-শাদা' বা Black & White ফিল্মেই তোলা হতো, কিন্তু আজকাল এ-সব ছবি আগাগোড়াই তোলা হচ্ছে বিচিত্র বর্ণে রঙীন Colour-filmএর ফিতেয়। Documentary Films ছাড়াও সংবাদ-চিত্র-বিভাগ বা News Film Unitএর কর্ম্মীরা প্রতিমাসেই একখানি করে সংবাদ চিত্র প্রযোজনা করে থাকেন। তাছাড়া এখানকার Cartoon Studioতে শিশুদের উপযোগী বিচিত্র বর্ণে রঙীন কয়েকখানি কার্টুন-চিত্রেরও প্রয়োজনা করা হয়—দেশী-বিদেশী রূপকথা এবং নানা রকমের কাব্য কাহিনী অবলম্বনে। কলা নৈপুণ্যে অপরূপ এ-সব কার্টুন-ছবিগুলি শুধু যে ছোটদেরই পরম উপভোগ্য তা নয়, বড়রাও এ থেকে যথেষ্ট ,আনন্দ ও শিক্ষা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে এ দেশের Scientific বা বৈজ্ঞানিক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কুশলী-কর্ম্মীরা ফী-বছরই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বিশেষ তথ্যপূর্ণ কখানি করে বিচিত্র ছায়া-ছবি তুলে থাকেন। এ-সব ষ্টুডিওগুলি ছাড়াও উজ্বেকিস্তানে নাট্য-চিত্র তোলবার স্বতন্ত্র একটি বিরাট ও অতি-আধুনিক ব্যবস্থায় সজ্জিত ফিল্ম্ ষ্টুডিও রয়েছে—সেখানে প্রতি বছরেই বহু-বিচিত্র কাহিনীকে রূপে-রসে-বর্ণে রূপায়িত করে তোলা হয়—নৃত্য-গীত-সঙ্গীত-নাট্যাভিনয়ের অপরূপ কলা-বিন্যাসে। ছায়াছবির বিশেষ অনুরাগী উজ্বেকিস্তানের অধিবাসী—শুধু বড় বড় সহরেই নয়—এখানকার গ্রামাঞ্চলেও চলচ্চিত্র-দর্শকের সংখ্যা বড় কম নয়। ১৯৪০ সালে উজ্বেকিস্তানের সহরে-প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিল মোট ২৫০টি এবং গ্রামাঞ্চলে ছিল ৩৮৫টি—অর্থাৎ একুনে মোট ৬২৫টি সিনেমা-গৃহ। ১৯৪৫ সালে বিগত দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় এ-সংখ্যার সামান্য ঘাটতি (সহরের প্রেক্ষাগৃহ—১৭৮টি এবং গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষাগৃহ ২৩২টি...মোট ৪১০টি) হলেও

যুদ্ধ-বিরতির পর থেকে সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বেড়েছে বহুল-পরিমাণে। ১৯৪১ সালে উজ্‌বেকিস্তানের সহরে-ছবিঘরের সংখ্যা ছিল—২৪৭টি; এবং গ্রাম্য-সিনেমা ছিল—৪৭১টি…অর্থাৎ সবশুদ্ধ ৭১৮টি—কিন্তু আজ দেশের যুদ্ধোত্তর শান্তিময়-ব্যবস্থায় সে-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি। সহর এবং গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ ছাড়াও দূর-দূরান্তের নিরালা অধিবাসীদের শিক্ষা এবং আনন্দদান-কল্পে ওখানকার চলচ্চিত্র-বিভাগের কর্ম্মীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'Mobile Cinema Units' বা 'ভ্রাম্যমান প্রেক্ষাগৃহ' নিয়ে ঘুরে ছায়া-চিত্রের পরিবেশন করেন। তাছাড়া ওদেশের চলচ্চিত্র-বিভাগের উন্নত সুব্যবস্থার ফলে, আজ উজ্‌বেকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৩৫০টি স্কুল-কলেজে ছায়া-ছবির মাধ্যমে ছাত্রদের ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। বিত্তায়তনগুলিতে শিক্ষাদান করা ছাড়াও ছায়া-ছবির সাহায্যে দেশের বিভিন্ন যৌথ-কৃষি ও যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং ক্ষেত-খামার, কল-কারখানায় কৃষি এবং যান্ত্রিক-কর্ম্মীদের চাষ-বাস ও আধুনিক যান্ত্রিক-উপকরণাদির সুনিপুণ ব্যবহার ও উন্নতি-সাধনের বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য-তথ্যের সন্ধান-পরিচয় দিয়ে অভিজ্ঞ এবং উন্নত করে গড়ে তোলবার অপরূপ ব্যবস্থার প্রসার-প্রচলনও রয়েছে দেখলুম এখানে। ওদেশে চলচ্চিত্র-শিল্পের ব্যাপক-প্রসার শুধু নিছক আনন্দলাভের জন্যই নয়—বিজ্ঞান ও কলা-কৃষ্টির বহু জ্ঞাতব্য-বিষয়ে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা-সঞ্চয় করে সামাজিক-জীবনকে সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল করে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যেও বটে!

এমনিভাবে সারা দুপুরটা ওখানকার চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কার্য্যালয়ে কাটিয়ে উজ্‌বেকিস্তানের সিনেমা-শিল্পের সম্বন্ধে নানা তথ্য-সংগ্রহ করে বিকেলে আমরা সদলে গেলুম তাশ্‌কান্দের State Art Museum বা রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায়। সহরের বুকের উপর বিরাট সুদৃশ্য ভবন—সোভিয়েট-ব্যবস্থায় এখানে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে উজ্‌বেকিস্তানের লোক-শিল্প এবং চারু-কলার অপরূপ বিচিত্র সব চিত্র-ভাস্কর্য্য—কারু-কার্য্যাবলীর নিদর্শন! প্রাচীন এবং আধুনিক আমলের শিল্প-কলা-কৃষ্টির নানা সেরা কীর্ত্তি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে শিল্পানুরাগী জন-গণের রস-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে। উজ্‌বেকিস্তানের প্রখ্যাত চারুকলা শিল্পীদের হাতের কাজ ছাড়া সোভিয়েট দেশের এবং বিদেশের বহু বিখ্যাত চিত্রকর, ভাস্কর এবং কারু-শিল্পীর রূপ-সৃষ্টির অপরূপ নমুনাও সব পরম-সমাদরে রক্ষিত রয়েছে দেখলুম মধ্য-এশিয়ার অন্যতম-প্রধান এই চিত্র-ভবনের ঘরে-ঘরে। প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সর্ব্বক্ষণই কলা-রসিক দর্শকের ভিড়ে ভরে থাকে এই চিত্র-ভবনের সুসজ্জিত অঙ্গন ও কক্ষগুলি। আমরা যখন গেলুম—চিত্র-ভবন দর্শকের ভিড়ে ভরে আছে—তবু এতটুকু গোলমাল বিশৃঙ্খলা বা ভিড়ের ঠেলাঠেলি নেই…সর্ব্বত্রই বেশ শান্ত, সুন্দর ও সংযত, সুদক্ষ ভাব… সকলেই একাগ্রভাবে শিল্প-সংগ্রহের রস-গ্রহণে মশগুল! আমাদের বিদেশী দেখে এবং ভারতবাসী জানতে পেরে—দর্শকদের মধ্যে অনেকেই সাগ্রহে কাছে এগিয়ে এসে—ভারতের শিল্প-ভাস্কর্য্যের সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। আমরাও যথাসাধ্য তাঁদের সে-সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে সংক্ষেপে ভারতের অপরূপ শিল্প-কলা-কৃষ্টির খবরাখবর জানাবার চেষ্টা করলুম।

চিত্রশালার বিচিত্র সব শিল্প-নিদর্শন দেখতে-দেখতে এমনই তন্ময় হয়েছিলুম আমরা—যে বাইরে বেলা পড়ে এসেছে সে হুঁশ ছিল না কারো। ওদিকে সন্ধ্যায় সেদিন আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নিমন্ত্রণ ছিল তাশকান্দের সুপ্রসিদ্ধ আলিশের মাভৈ থিয়েটারে একটি গীতি-নাট্য দেখবার—শ্রীযুত আব্রাহামফ্ সে-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন! সুতরাং চিত্রশালার মহিলা-অধ্যক্ষের কাছে বিদায় নিয়ে, তাশকান্দের আর্ট-মিউজিয়ামের মায়া কাটিয়ে আমরা পথে বেরুলুম—হোটেলের উদ্দেশ্যে।

মস্কোর বিমান বন্দরে—ভারতীয়-চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের অভ্যর্থনা

চিত্র-ভবনের কাছেই আমাদের হোটেল—কাজেই এবারে এ-পথটুকু আর মোটরে অতিক্রম না করে আমরা পদব্রজেই চললুম। সহরের পথে তখন লোকের ভিড় বেশ…ওদেশী নর-নারীর দল কেউ বেরিয়েছেন বেড়াতে, কেউ বা দোকানে-বাজারে বৈকালিক-সওদার উদ্দেশ্যে, আবার কেউ বা দৈনন্দিন কাজের পরে ফিরে চলেছেন গৃহের আরাম-নীড়ে। আমাদের বিদেশী ভারতবাসী দেখে সকলেই সোৎসুক আগ্রহে চেয়ে থাকে…অনেকে এগিয়ে এলেন ভারতীয় হরফে আমাদের নামের সহি নেবার জন্য এবং ভারতীয় হরফে তাঁদের নিজেদের নাম কি-ধাঁচের হয় দেখতে। তাও লিখিয়ে নিলেন।

আমাদের হোটেলের পথে পড়লো ছোট একটি ফলের দোকান। সেটা ছাড়িয়ে পথে একটু এগিয়েছি এমন সময় ওদেশী এক তরুণী সাগ্রহে আমাদের পানে ছুটে এলেন—হাতে তাঁর সদ্য-কেনা একরাশ

ফলন্ত আঙুরের থোলো ! সলজ্জ-ভঙ্গীতে ওদেশী-ভাষায় কি কথা বলে তিনি অযাচিতভাবে হঠাৎ সেই আঙুরের থোলো ভাগ করে তুলে দিলেন শ্রীমতী দুর্গা খোটে এবং শ্রীমতী মধুরমের হাতে ! আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলুম, সম্পূর্ণ-অপরিচিতা ওদেশী এই তরুণীর আচমকা-অদ্ভুত ব্যবহারে ! অপরিচিতা বিদেশিনীর এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে হতভম্ব হয়ে, আমরা যে যার মুখের পানে তাকাচ্ছি—এমন সময় আমাদের দোভাবী-সঙ্গী শ্রীযুত আব্রাহামভ্‌ হাসতে হাসতে জানালেন যে, নবাগত-বিদেশী অতিথিকে দেশের কোনো শ্রেষ্ঠ জিনিষ উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানানো—এ দেশের রীতি। তাই উজবেকিস্তানের গাছের এই ফলন্ত আঙুর উপহার দিয়ে অপরিচিতা-বান্ধবী ভারতবর্ষের মহিলাদের সাদর-অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন !

ভারী মধুর এই রীতি···এক নিমেষেই নিতান্ত অজানা-অপরিচিতকে যাচাই করে দেখার চেয়ে—অপরকে আপন মনে করার আন্তরিকতাই হলো সব চেয়ে বড় ! সুতরাং তুচ্ছ হলেও মন থেকে যে জিনিষ আপনি আন্তরিক আগ্রহে পরকে উপহার দেবেন—তার দাম অমূল্য !

কথাটা শুনে শ্রীমতী খোটে স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলেন। পরক্ষণেই তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রূপোর নক্সা-করা সুন্দর ছোট্ট একটি মশলার কৌটো বার করে নিয়ে সোজা তিনি ছুটে গেলেন সেই অপরিচিতা বিদেশিনীর কাছে। তরুণী তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। আমাদের সাথী দোভাষী-বন্ধু শ্রীযুতআব্রাহামভ্‌ও শ্রীমতী খোটের বাক্যালাপের সুবিধার জন্য সঙ্গে গেলেন। বহু অনুরোধের পর অপরিচিতা-তরুণী সলজ্জ-ভাবে শ্রীমতী খোটের প্রতি-উপহারটি গ্রহণ করলেন। আমরা কাছে গিয়ে দেখলুম—শ্রীমতী খোটে সুদৃশ্য মশলার কৌটোটি খুলে ভারতীয় এলাচ-লবঙ্গ-সুপারীর ব্যবহার ওদেশী তরুণীটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন !

মস্কো এরোড্রোমে আমরা—মাইক্রোফোনের সামনে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহকারী চলচ্চিত্র মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকোলাই সিমোনভ ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রতি সাদর সংবর্ধনা জানাচ্ছেন

পথের সেই অপরিচিতা-বান্ধবীর কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে ডিনারের পালা সেরে সন্ধ্যার পর শ্রীযুত আব্রাহামভের সঙ্গে আমরা গেলুম তাশকান্দের State Opera House—আলিশের নাভৈ থিয়েটারে গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখতে।

নাট্যশালাটি বোথারা-সমরখন্দের প্রাচীন মুসলমানী স্থাপত্য-শিল্পের ছাঁদে ও ধরণে আগাগোড়া শাদা, কালো, আর লাল পাথরে গড়া, সুদৃশ্য বিরাট চারতলা ভবন। ভিতরে ও বাহিরে, সুবিশাল গম্বুজ আর কার্ণিশের গায়ে···নীল মীনার অপরূপ সব নক্সার কাজ—আমাদের দেশের দিল্লী-আগ্রায় মোগল-আমলের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের যে সব নিদর্শন দেখতে পাই, তার অনুরূপ। দেখতে প্রাচীন ছাদের হলেও—নাট্যশালাটি কিন্তু অতি-আধুনিক সব রকম বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত। ভিতরে প্রেক্ষাগৃহটি তিনতলা···স্তরে স্তরে লাল ভেলভেটে-মোড়া সুদৃশ্য আরামপ্রদ আসনের ব্যবস্থা রয়েছে···দু'হাজার দর্শক বসবার আসন রয়েছে এখানে। তা ছাড়া একতলায় সুবৃহৎ অঙ্গন, ভোজনালয়, পানশালা, ধূম-পানের আঙিনা ছাড়া নাট্য-ভবনের তিনতলায় আছে সাতটি বড় বড় হল-ঘর—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র-সজ্জায় ও ওদেশী অপরূপ স্থাপত্য-কারুকার্য্যে শোভিত—উজবেকিস্তানের ও সোভিয়েট-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কারুকার ও স্থপতি-বিশারদরা বহু পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় গড়ে তুলেছেন এই সুবিরাট নাট্য-ভবনটি !

একান্ত আপন জন করে তোলে ! তাছাড়া আমাদের ভারতবর্ষেও এ-রীতি এবং অতিথি-আপ্যায়নের এ রেওয়াজ ছিল একদা ঘরে-ঘরে···তবে আজ দেশব্যাপী বিভেদ-বিচ্ছেদ আর পার্টিশনের বিষ-বাষ্পে সে-সব মুছে যাচ্ছে দিন-দিন···ঘরের সোনা ঘরে না রেখে উপেক্ষাভরে বাইরে ফেলে দিয়ে আমরা রিক্ত আঁচলে গেরো বাঁধছি আজকাল !

ওদেশী তরুণীর হৃদয়ের আন্তরিক-প্রীতি এবং সরস আঙুরের গুচ্ছ পেয়ে শ্রীমতী খোটে ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চুপি চুপি আমাকে শুধোলেন—কি করা যায় বলুন তো মুখুজ্জ্যে-মশাই ? আমার সঙ্গে তো কোনো দামী এমন জিনিষ নেই—যা ওই অপরিচিতা-বিদেশিনীকে আমি প্রীতি-উপহার দিতে পারি !

হেসে বললুম···উপহার দেওয়া-নেওয়া সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার !···যে জিনিষ দিলেন—সেটার বেশী দাম, কি কম-দাম তার দর কষ্টি-পাথরে

বছর কুড়ি আগে এখানে নাট্যশালা বা নাটক, অভিনয়ের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না—কিন্তু সোভিয়েট আমলে সে অভাব আজ বিদূরিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। উজ্‌বেকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধা শিল্পী শ্রীমতী তামারা খানুম, গালিয়া ইস্‌মাইলোভা, মুকারম্‌ তুর্গুনবায়েভার খ্যাতি আজ সারা সোভিয়েট দেশে ছড়িয়ে পড়েছে…এমন কি সোভিয়েট রাষ্ট্রের তরফ থেকেও এঁদের এই গুণ-গরিমার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হয়েছে—সুবিখ্যাত স্তালিন পুরস্কার এবং 'লোক-শিল্পী' উপাধি দান করে। আজকাল এই নাট্যশালায় অভিনয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে আছেন—প্রায় সাড়ে ছ'শো অভিনয় ও নৃত্য-গীত-শিল্পী!

আমরা সদলে হাজির হতেই অপেরা হাউসের অধ্যক্ষ সাদর-সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর সুসজ্জিত কক্ষে! অভিনয় আরম্ভ হতে তখনও বিলম্ব ছিল। কাজেই খানিকটা আলাপ-আলোচনা চললো আমাদের উভয় পক্ষে! এর মাঝে আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীযুত ইয়ারমাটভ উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিচালিত 'আলি শের নাভৈ' ছবিটি দেখবার সময় তিনি আমাদের পাশে উপস্থিত থাকতে পারেন নি বলে বিশেষ দুঃখিত এবং সেই কারণেই হাতের কাজ সেরে সটান্‌ ছুটে এসেছেন—ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করতে! ভারী অমায়িক, মিশুক, সদালাপী এবং নিরহঙ্কার মানুষটি। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ ভাব জমিয়ে ফেললেন। ওদেশের এবং আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-শিল্প, অভিনয়, নৃত্য, গীত—কৃষ্টিকলার সম্বন্ধে নানা আলোচনা চললো! আমাদের দেশের চিত্র-কর্ম্মী এবং চিত্র-শিল্পীদের বিষয়েও অনেক কথা জানতে চাইলেন। সাধ্যমত সে-সবের জবাব দিলুম আমরা। আলাপ বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় বাইরে অভিনয় আরম্ভ হবার সঙ্কেত বেজে উঠলো। কাজেই তখনকার মত আলাপ-আলোচনা মুলতুবী রেখে আমরা সদলে অপেরার কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত ইয়ারমাটভের সঙ্গে গেলুম প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে।

মস্কোর বিমান বন্দরে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের সংবর্ধনা অপেক্ষায় পুষ্প-স্তবক হাতে 'The Great Concert' সোভিয়েট চলচ্চিত্রের পরিচালিকা মাদাম স্ট্রোইভা, সোভিয়েট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাদাম আলিসোভা ও তামারা মাকারোভা

দর্শকের ভিড়ে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি তলা…আমরা হাজির হতেই সকলে সাগ্রহে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বিপুল করতালি-ধ্বনিতে সাদর-অভিনন্দন জানালেন বিদেশী ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রতিনিধি-দলকে। শ্রীযুত ইয়ারমত্‌ এবং সহচর আব্রাহামভ জানালেন যে বিদেশী অতিথিকে নিজের দেশে অভ্যর্থনা জানাবার এই নাকি রীতি এদেশের। আমরাও সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে আমাদের ভারতীয় প্রথায় 'কৃতাঞ্জলি পুটে প্রীতি-নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলুম। তারপর রঙ্গালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ মশাই রঙ্গমঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে ও দেশের দর্শকমণ্ডলীর কাছে আমাদের পরিচয় দেবার পর যবনিকা-সরে গিয়ে সুরু হলো গীতি-নাট্যের পালা।

সে-রাত্রে তাশ্‌কান্দের অপেরা হাউসে যে গীতি-নাট্যের অভিনয় আমরা দেখলুম—সেটি জাপানের গেইশা নারীর করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত সুবিখ্যাত য়ুরোপীয় অপেরা 'মাদাম বাটারফ্লাই' এর রুশীয় অনুবাদ! তাশকান্দের নাট্য-শিল্পীদের সুনিপুণ কলা-কুশলতায় নাটিকাই রূপায়ন হয়েছিল অপরূপ! মঞ্চ-সজ্জা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, সঙ্গীত-সুর-সংযোজনা, নৃত্য-গীত, অভিনয় এবং প্রযোজনা সবই নিখুঁত এবং রূপে-রসে-বর্ণে অনবদ্য, অপরূপ! ভাষা না বুঝলেও—গীতি-নাট্যের সুমধুর অভিনয় শুনে সুদীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেও পারিনি—মন্ত্রমুগ্ধের মত উপভোগ করলুম সোভিয়েট নাট্যকলার সেই অপরূপ বিকাশ! অভিনয়-অন্তে ষ্টেজের অভ্যন্তরে আমাদের সবাইকে সাদরে ডেকে নিয়ে গেলেন রঙ্গালয়ের প্রবীণ অধ্যক্ষ-মশাই। সেখানে ছোট-বড় প্রত্যেকটি অভিনেতা—এমন কি ষ্টেজের মঞ্চ-শিল্পী, কারুকার,আলোকসম্পাতকারী এবং 'সিন্‌-সিফ্‌টাররা' পর্য্যন্ত সকলে সাগ্রহে এগিয়ে এসে নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর মত আন্তরিকভাবে আমাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করলেন। দেখলুম—ভারতের নাট্য-কলার বিষয়ে ওঁদের গভীর অনুসন্ধিৎসা। অনেক প্রশ্ন করলেন ভারতের রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্য-কলার বিষয়ে। যথাসাধ্য তাঁদের সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে—নাট্যশালার অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলুম, ভারতের বিষয় নিয়ে রচিত কোনো নাটকের অভিনয় তাঁরা করছেন এই জাপানী

কাহিনীর মত কিনা? উত্তরে অধ্যক্ষ-মশাই হেসে জবাব দিলেন—ভারতের বিষয়ে কোনো নাটক আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি—তাই—অভিনয় সম্ভব হয় নি। তেমন ভালো নাটক পেলে আমরা অভিনয়ের ব্যবস্থা করি। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সংস্কৃত নাটক—শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি নাটকের নাম জানালুম। তারপর ওখানে নাট্যশালার সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসবার সময় অধ্যক্ষ-মশাই সবিনয়ে জানালেন যদি দেশে ফেরার পথে আমরা আবার তাশকান্দ হয়ে আসি তাহ'লে তখন তিনি আমাদের একখানি ভারতীয় নাটকের অভিনয় দেখাতে পারবেন। প্রবীণ অধ্যক্ষের সেই আমন্ত্রণে মনে-মনে খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলুম—সুদূর তাশকান্দের বিদেশী নাট্য-শালায় ভারতীয় জীবনের নাটকাভিনয় দেখবো বলে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অভিনয় দেখার সুযোগ জোটেনি আমাদের—কেন না নভেম্বর মাসের দারুণ শীতে কাবুলের তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য-পথে পাড়ি জমানো কষ্টকর হবে বলে, আমরা দেশে ফিরেছিলুম ইউরোপের পথে—ওয়ারস, প্রাহা, ক্রুশেলস্, লণ্ডন, রোম এবং কায়রো হয়ে!

অভিনয়-অন্তে তাশ্‌কান্দের নাট্যশালার নবলব্ধ রূপকার-শিল্পীবন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সদলে ফিরে এলুম হোটেলে—রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। নাট্যশালার প্রবীণ অধ্যক্ষ, শ্রীযুত ইয়ারমাটভ্ এবং ওখানকার আরো অনেকেই পথে এগিয়ে এসে আমাদের শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন—আর সেই সঙ্গে বার-বার আন্তরিক-আমন্ত্রণ জানালেন যে, স্বদেশে ফেরার পথে আবার যেন আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করে যাই! সে রাত্রে তাঁদের সেই অপরূপ অন্তরঙ্গতার স্মৃতি ভোলবার নয়!

হোটেলে ফিরে নিজেদের মাল-পত্রাদি গুছিয়ে, সামান্য কিছু জলযোগ করে শ্রীযুত আব্রাহামফ্ ও উজ্‌বেকি চলচ্চিত্র-বিভাগের তরুণ প্রতিনিধি-বন্ধুটির সঙ্গে মোটরে চড়ে এরোড্রোমে রওনা হলুম। হোটেলের দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাতৃসমা সেই মহিলা-অধ্যক্ষা নিতান্ত পরিজনের মতই ছলছল-নেত্রে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন আমাদের যাত্রার প্রারম্ভে! এমন কি দুদিনের-আলাপী হোটেলের বৃদ্ধ পোর্টারটিও পরিচিত অন্তরঙ্গের মতই আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন গাড়ীতে মালপত্র সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইউরোপীয় প্রথানুযায়ী কিঞ্চিৎ 'Tips' বা বকশিস দিতে মনস্থ করেছিলেন হোটেলের এই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীটিকে।—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—বৃদ্ধটি কোনো কিছুই নিতে রাজী নয়। এই অদ্ভুত আচরণে আমাদের অবাক হতে দেখে—শ্রীযুত আব্রাহামফ্ সবিনয়ে জানালেন যে—সোভিয়েট রাজ্যে এবং সমাজে কোথাও কোনো রকম বকশিস্ নেওয়ার প্রচলন নেই—কেন না সোভিয়েটবাসীরা সকলেই এই বকশিস্-দেবার প্রথাটিকে অপছন্দ করেন মনে-প্রাণে। সে দেশে ছোট-বড় যে-যার নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করে চলে—তার বদলে কোনো রকম বকশিস বা ইনাম-গ্রহণের প্রত্যাশা রাখেন না কেউই—বরং এ প্রথাকে তাঁরা বিশেষ নিন্দনীয় এবং আত্ম-সম্মান-হানিকর বলেই মনে করেন। তাই ওদেশের সর্ব্বত্রে ইউরোপের মত নড়তে-চড়তে প্রতি ব্যাপারে 'Tips' বা বকশিস্ দেওয়ার রীতি বা রেওয়াজ নেই একেবারে!

এরোড্রোমে এসে সুসজ্জিত বিশ্রামাগারের আসনে ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে দিয়ে আমরা বসে রইলুম মস্কোগামীর বিমান-অর্ণবের অপেক্ষায়। চারিদিকে জোরালো বিজলী-বাতির আলোয় আলোময় সুবিশাল বিমান-বন্দরের প্রাঙ্গণটি···অত রাত্রেও আশেপাশের কর্ম্মস্রোতের জোয়ারে ভাঁটা পড়েনি এতটুকু।···সুবিস্তৃত অঙ্গনের সর্ব্বত্রই সাজানো রয়েছে সারি-সারি বেতার-যন্ত্রের লাউড-স্পীকার—সেগুলির মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে ওদেশী গীতের সুমধুর সুর-লহরীর তান্···যেন সুর-মূর্চ্ছনায় ভরা কোন এক স্বপ্নময় মায়াদেশে এসে পৌঁচেছি!

মস্কোগামী আমাদের প্লেন ছাড়বার সময় রাত দুটোয়—কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে! শ্রীযুত আব্রাহামফ্ ও ওখানকার কর্ম্মীরা সর্ব্বদাই শশব্যস্ত—আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, যেন? তাঁদের সে যত্ন-পরিচর্য্যার কথা বলে শেষ করা যায় না।

সারাদিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তিতে এবং আরামপ্রদ আশ্রয়ের আবেশে তন্দ্রা এসেছিল আমাদের চোখে—এমন সময় ডাক পড়লো—প্লেনে গিয়ে আসন-গ্রহণ করবার!

সহৃদে শ্রীযুত আব্রাহামফের সঙ্গে মস্কোগামী প্লেনে গিয়ে উঠলুম আমরা সদলে। প্লেনখানিতে যাত্রীদের ব্যবস্থা দেখলুম—কাবুল থেকে পাড়ির সেই সোভিয়েট প্লেনখানির অনুরূপ।

প্লেন ছাড়লো রাত দুটোর সময়। উড়ো-জাহাজ থেকে চোখে পড়লো—নীচে বিমান-বন্দরের জমীতে দাঁড়িয়ে উজবেকিস্তানের সহচর সেই তরুণ বন্ধুটি হাত নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন আমাদের সবাইকে। ক্রমে দূর থেকে দূরান্তরে নৈশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আলোর চুমকী-বসানো তাশকান্দ শহরের চেহারা—অনন্ত আকাশে পক্ষবিস্তার করে প্লেন আমাদের বুকে নিয়ে সগর্জনে উড়ে চললো সোভিয়েট রাজধানী সুদূর মস্কোর অভিমুখে!

সারারাত একটানাভাবে উড়ে চললো আমাদের প্লেন—যাত্রী-পথের মাঝে শুধু বার দুয়েক স্বল্পক্ষণের জন্য থেমেছিল ছোট দু'টি বিমান-বন্দরে—যাত্রী ওঠানো-নামানোর ব্যবস্থানুযায়ী।

পরের দিন সকালে সহাস্য-অভিবাদনে—একরাশ উজবেকিস্তানের বড় বড় সুস্বাদু আপেল আর থলো-থলো সুপুষ্ট আঙুর-গুচ্ছের ডালা সামনে এগিয়ে দিয়ে ঘুম ভাঙালেন পথের সঙ্গী শ্রীযুত আব্রাহামফ্! চেয়ে দেখি—সোনালী রৌদ্রে ভরে গেছে চারিদিক। প্লেনের নীচে চোখে পড়ছিল—সোভিয়েট রাজ্যের সুবিস্তৃত শস্য-শ্যামলা ক্ষেতের জমী··· ঘন অরণ্যানী···নদী, খাল, জনপদ সব কিছুই! আকাশের উপর থেকে দেখলে আমাদের দেশের আল্‌মাটির পাঁচিলে ঘেরা টুকরো টুকরো ছোট-ছোট ক্ষেত-জমীর মত চেহারা চোখে পড়ে না এদেশের আবাদি-শস্য-ক্ষেত্রের কোথাও···চারিদিকে দেখলুম এখানে সুবিশাল, সুবিস্তীর্ণ এবং—সে-সবই আগাগোড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর-সুশৃঙ্খল-ভাবে সাজানো-বিভক্ত! শতভাবে অপরূপ সোভিয়েট যৌথ-কৃষি

সই সুবিন্যস্ত জমীর এবং শ্রীমণ্ডিত শ্যাম-শোভা অপরূপ লাগলো আমাদের চোখে !

তেল এবং যাত্রী নেবার জন্যে আরো দুটি ছোট বিমান-বন্দরে থেমেছিল আমাদের প্লেন—আধ ঘণ্টা, পৌনে একঘণ্টা সময়ের বিরতি সে-সব স্থানে। আমরাও সেই ফাঁকে বিমান-বন্দরের ভোজনশালায় বসে গরম চা, কোকো এবং কেক প্রভৃতির সদ্ব্যবহারে সেরে নিলুম প্রাতরাশের পালা।

বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা···আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলে শীতের সময়ে যেমন হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে রুশীয় শীতের এই নমুনা পেয়ে অনুমান করছিলুম যে ডিসেম্বরের শীত সে-দেশে কি প্রচণ্ড হয় ! তাশ্‌কান্দ্‌ ছেড়ে যতই মস্কোর কাছাকাছি এগিয়ে চলছিলুম—শীতের মাত্রাও যেন ততই বেড়ে চলেছে ! শ্রীযুত আব্রাহামফ্‌ মন্তব্য করলেন—লেনিনগ্রাদের শীত নাকি মস্কোর চেয়েও আরো প্রখর।

মস্কোর অভিমুখে উড়ে চলার পথে—প্লেনের চারিপাশের নীল আকাশ ক্রমে ঘন মেঘ আর কুয়াশার বাষ্পে ভরে উঠলো—নীচের ধরিত্রীর কোনো চিহ্নই চোখে দেখা যায় না এতটুকু। বিমান-অধ্যক্ষের কাছে খপর নিয়ে শ্রীযুত আব্রাহামফ্‌ জানালেন যে,—মস্কোয় আজ বাদলের আমেজ শুরু হয়েছে···কাজেই রাজধানী-উপকণ্ঠের রূপ গরিমা হয় তো ভাল রকম দেখা যাবে না—এই ঘন Fogএর দরুণ !

তাহলেও অধীর-আগ্রহে উদগ্র-দৃষ্টি যথাসাধ্য প্রসারিত করে চেয়েছিলুম আমরা অস্পষ্ট দূর সীমান্ত রেখার পানে···যে প্রসিদ্ধ সোভিয়েট রাজধানীর কথা দেশে এত শুনেছি, কাগজে-কেতাবে পড়েছি—সেই মস্কোর প্রথম দর্শন-প্রত্যাশায় ! এমন সময় প্লেনের গতি মন্থর হয়ে এলো···ক্রমে সে উর্দ্ধগগনের মেঘলোক থেকে নামতে শুরু করলো নীচেকার শ্যাম-ধরিত্রীর বুকে ! অচিরে কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক ভেদ করে দর্শনলাভ হলো—মস্কোর বিশাল এয়ার-ফীল্ড ! আকারে আমাদের দেশের দমদম্‌ এরোড্রোমের চেয়েও বিরাট—চারিদিকে বড় বড় নানান্‌ ধরণের এরোপ্লেনের ভিড়ে ভরে আছে মস্কোর বিমান বন্দরের সুবিস্তৃত প্রান্তর !

প্লেনের 'কক্‌পিটে' বসেই প্রত্যক্ষ করলুম—বিমান-বন্দরের অঙ্গন যেন জনারণ্যে পরিণত···'কনট্রোল-টাওয়ারের' নীচেই বিপুল জনতা··· সকলের হাতে শুধু রাশি রাশি ফুল আর ফুল এবং অসংখ্য সব ক্যামেরা !···তা ছাড়া Arc-lamps, Flood-lights—মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওদেশের লোকজনেরা। মনে হলো—ভারতের বিভিন্ন কোণ থেকে নগণ্য ক'জন ভারতবাসী আসছি মস্কোয়—তাদের অভ্যর্থনায় এঁদের এমন উৎসাহ ! গর্ব্ব বোধ করলুম—সার্থক জন্ম নিয়েছি ভারতবর্ষে—তাই সোভিয়েট-দেশবাসীদের এ-সম্বর্দ্ধনা ! এ-সম্মান মাত্র সোভিয়েট-সফরকারী আমাদের ক'জনকার উদ্দেশ্যে নয়···সারা ভারতের প্রতি,

বিমান-বন্দরের জমীতে নেমে এসে প্লেনখানি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনতরঙ্গ জল-তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হয়ে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে—হৃদয় দিয়ে আমাদের হৃদয় নিতে···সে এক অপরূপ অবিস্মরণীয় গৌরবময় মুহূর্ত্ত !

(ক্রমশঃ)

অশেষ

সন্তোষকুমার অধিকারী

শতাব্দীর শেষ হ'য়ে আসে। ভরি সন্ধ্যার আঁধার
ধূসর আকাশে নামে এক স্তব্ধ মহামৌনতার
ছায়া। অকম্প্র বাতাস থেমে যায় মৌন পৃথিবীর
কাছে এসে। চেতনামুখর প্রাণ, হৃদয় অস্থির
অকস্মাৎ বেদনার স্পর্শ লেগে স্তব্ধ হ'য়ে আসে
পৃথিবী ঘুমায় মগ্ন অনাগত উষার আশ্বাসে।
সেই অনাগত রাতে বেঁধে দেবে পথের সীমানা ?
পৃথিবী কি ফুরাবে একান্ত ; শেষ হবে যত জানা ?

আজ দিগন্তের জ্বলা আরক্ত সূর্য্যের সমারোহে
গোধূলি ঐশ্বর্য্যে বলো, মেনে নিই তবে
কোন মোহে ?
যে রাত্রি আসিবে ক্ষুব্ধ জীবনের স্পন্দিত যৌবনে,
যে মৌন ভরিয়া রবে চঞ্চলের একান্ত গোপনে
যেথা দীপ জ্বলিতে থাকিবে শুধু সীমাহীন
একলক্ষ্যে স্থির,
আজ হ'তে স্পর্শ করি শুধু সেই অনন্ত নিবিড়।

সমাজ শিক্ষা দিবস পালন—

গত ১লা নভেম্বর ভারতের সর্বত্র নিখিলভারত সমাজ শিক্ষা দিবস পালন করা হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সকল রাজ্যের পক্ষ হইতে অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা দূর করিবার জন্য সর্বত্র যে বয়স্ক-শিক্ষা ও সমাজ-শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার কথা ঐ দিন সর্বত্র ঘোষণা করা হয়। গ্রামে গ্রামে সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সমাজের উন্নতি, গ্রামের স্বাস্থ্যবিধি পালন, গাঁয়ের কল্যাণজনক কাজ, যথা— জঙ্গল কাটা, পুষ্করিণী সংস্কার, গর্ত বুজানো, রাস্তা তৈয়ারী, বাঁধ দেওয়া প্রভৃতি হাতের কাজ করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলা-শিল্প সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিলে চলিবে না। সুতা কাটা, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, ঝুড়ি বোনা, মৃৎশিল্প, অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে হইবে। বাগান তৈয়ারীর কাজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, শুশ্রূষা প্রভৃতি কাজেও সকলকে উৎসাহিত করিতে হইবে। সমাজ-শিক্ষা বা বয়স্ক-শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা শিক্ষা দেওয়ার অর্থই সমাজ-শিক্ষা। সে জন্য যাত্রা গান, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়াও সমাজ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিক্ষিত ও ধনবান ব্যক্তি মাত্রেরই এই কার্যে যোগদান করিয়া সরকারী প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করা কর্তব্য।

গোধন—ভারতীয় অর্থনীতির কেন্দ্র—

গত ২৬শে অক্টোবর ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র-প্রসাদ এক বেতার ভাষণে জানাইয়াছেন—ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা ১৫ কোটি। ইহা পৃথিবীর মোট গবাদি পশুর সংখ্যার একচতুর্থাংশ। কাজেই গবাদি পশুর দিক দিয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এই সকল পশু ভারতের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ মুল্যবান। ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ—ইহার শতকরা ৮৬জন লোক ভূমির আয়ের উপর নির্ভরশীল। বলদ হাল চাষ করে, সেচকার্যে সাহায্য করে ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি গাড়ীতে করিয়া বিক্রয় স্থলে পৌছাইয়া দেয়। ভারতের জনগণের এক বৃহৎ অংশ নিরামিষাশী—তাহাদের খাদ্যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য একমাত্র প্রাণীজ প্রোটিন। স্মরণাতীত কাল হইতে গরুকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের অর্থনীতির কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সকল কথা আজ আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সেজন্য গরুকে দেবতারূপে এদেশে সেবা করা হইয়া থাকে। গো-সংবর্দ্ধনাই আমাদের দেশে অর্থনীতির উন্নতির একমাত্র উপায়। সমগ্র ভারতে আজ নূতন করিয়া একথার প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া গত গোপাষ্টমীর দিন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে নূতন করিয়া গো-সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, নূতন করিয়া দেশবাসী ও গো-সেবায় মনোযোগদান করিয়া অর্থনীতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিবে।

দার্জিলিংয়ে দেশবন্ধু-স্মৃতি—

দার্জিলিং সহরের যে 'ষ্টেপ-এসাইড' ভবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি ক্রয় করিয়া তথায় দেশবন্ধুর উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এইরূপ পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের স্মৃতিপূত বাড়ীগুলি জাতির পক্ষে তীর্থস্থান— সে সকল গৃহের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কগণের অন্যতম কর্তব্য। এই ভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাসভবন প্রভৃতিও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন।

১৯৫২ সালের নোবল পুরস্কার—

সুইডিশ একাডেমি—পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও সাহিত্যে বর্তমান বৎসরের নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। দুইজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক যৌথভাবে

রসায়নে পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন লণ্ডনের জাতীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডক্টর আর্চার জন পোর্টার ম্যাটিন এবং অন্যজন একার্ডিনসায়ারের বাক্‌বরন্‌স্থ রাওয়েট গবেষণাগারের ডক্টর রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন সিঙ্গ। দুইজন মার্কিণ আণবিক বৈজ্ঞানিক, যথা—হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এডোয়ার্ড পার্সেল এবং কালিফোর্ণিয়ার স্ট্যাণ্ডফ্রড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফেলিক্স ব্লক যৌথভাবে পদার্থ-বিদ্যায় পুরস্কার পাইয়াছেন। সাহিত্যে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—ফ্রান্সের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্রাঁকোয়া মরিস। শান্তির জন্য এ বৎসর পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

সমবায় উৎসব—

গত ১লা নভেম্বর সকালে ২৪পরগণা দত্তাবাদে বিদ্যাধরী ভীম মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে এক উৎসবের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসব আরম্ভ হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সে উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন—'নিজেদের শক্তির উপর আস্থা ও বিশ্বাস আনয়ন করাই সমবায়। আমরা সকলে সকলের জন্য, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য—সমবায়ের এই মূলমন্ত্র পল্লীর নিভৃততম অঞ্চলে পৌছাইয়া দেওয়াই সকল সমবায়ীর কর্তব্য।" ঐ দিন বিকালে কলিকাতা লালদীঘির ধারে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের কার্য্যালয়ে ও কলিকাতা ৪৮এ বিবেকানন্দ রোডে সমবায় সমিতি সংঘে উৎসব হইয়াছিল। ঐ সকল উৎসবে সমবায় মন্ত্রী ডাক্তার আর, আমেদ, সমবায় কর্ম্মী শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার, শ্রীসরলকুমার ঘোষ, শ্রীতারাপদ চৌধুরী, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীগুরুদাস গোস্বামী প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন—মুনাফাবাদী অর্থ-নীতির শোষণের ফলে দেশে দেশে যে অকল্যাণ ও অশান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

'নই তালিম' নীতি গ্রহণ—

শ্রীজহরলাল নেহরু ২রা নভেম্বর সেবাগ্রামে যাইয়া তথায় নূতন গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারত রাষ্ট্রে 'নই তালিম' শিক্ষা পদ্ধতি প্রচার করা হইবে। গান্ধীজির প্রবর্তিত এই নীতি যে একই সময়ে ভারতের অশিক্ষা ও বেকার সমস্যা দূর করিতে পারিবে শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে সে কথা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভারতে বর্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে, তাহা অত্যধিক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার—সেজন্য বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচলন করা প্রয়োজন। বুনিয়াদি শিক্ষায় ছাত্র শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হয়—সেজন্য বুনিয়াদি বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় না। মহাত্মা গান্ধী সেবাগ্রামে প্রথম ঐ নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা আরম্ভ করেন—সেজন্য ঐ স্থানেই গ্রাম্য-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে সমগ্র ভারতে গ্রাম-সেবার বার্তাও প্রচারিত হইয়াছিল—সেজন্য তাহার নাম সেবা-গ্রাম রাখা সার্থক হইয়াছে। গান্ধীজির হত্যার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদকে যে হত্যা করা হয় নাই, তাহা এই গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেই প্রমাণ। আমাদের বিশ্বাস, গান্ধীবাদ কালে সমগ্র জগতে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে।
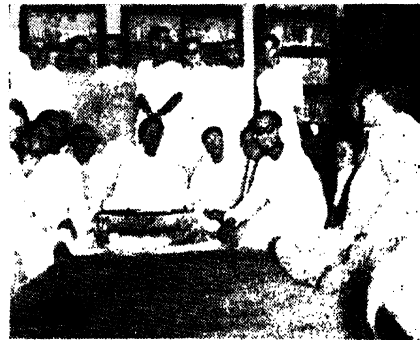
কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থের গৃহে নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের অধিবেশনে উপমন্ত্রী শ্রীগোপিকাবিলাস সেন

পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ-প্রস্তাব—

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর যে অনাচার চলিতেছে ও যাহার ফলে গত কয়েক মাসে কয়েক লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভারত রাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে—সে সম্পর্কে কোন কোন মহলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলা হইয়াছে। গত ৩০শে

অক্টোবর নাগপুরে এক জনসভায় শ্রীজহরলাল নেহরু পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের প্রস্তাবকে শিশুসুলভ দায়িত্বজ্ঞান-হীন উক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জহরলাল বলেন—"ভারতের শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। যাহাদের ঐ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কেবল তাহারাই যুদ্ধের কথা বলে। পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ হায়দারাবাদের পুলিসী অভিযানের ন্যায় হইবে না। উহা দীর্ঘদিনের হইবে এবং উহাতে দেশের সকল সম্পদ নিয়োগ করিতে হইবে। কোন যুদ্ধেরই ফল মঙ্গলজনক হয় না, এমন কি বিজয়ী দলের পক্ষেও তাহা মঙ্গলজনক হয় না। তবে আমাদের সকল অবস্থার জন্য, সকল প্রকার অসুবিধার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা আমাদের দেশের কোন অপমান সহ্য করিব না।" শ্রীনেহরুর এই উক্তি সকলের শান্তভাবে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

এসিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কলেজ—

গত ৫ই নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা নিউ আলিপুর, নলিনীরঞ্জন এভেনিউতে এসিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কলেজের উদ্বোধন উৎসব হইয়াছে। আন্তর্জাতিক স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন মহাসম্মেলনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই আবাসিক কলেজই এসিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচারের সর্বপ্রথম কলেজ। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা যাহাতে অধিকতর কৃতিত্বের সহিত নিজেদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তজ্জন্য এসিয়ার সকল অংশের কর্মীদের একত্র করিয়া সকলকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আধুনিক নীতি ও মূলগত আদর্শ শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করাই উক্ত কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম দলে ৩০জন শিক্ষার্থী মনোনীত হইয়াছে—ভারত রাষ্ট্র ১৩, জাপান ১, হংকং ২, মালয় ২, থাইলাণ্ড ৫জন ছাত্র পাঠাইয়াছে—বাকী ছাত্ররা এখনও আসেন নাই। ঐ কলেজের জন্য প্রতি বৎসর ২০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে। কমুনিষ্টরা প্রচার করিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থে এংলো আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার জন্য এই আন্তর্জাতিক স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন মহা-সম্মেলন গঠিত হইয়াছে—এ সংবাদ সত্য নহে। মহা-সম্মেলন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান—উহা কোন গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ গ্রহণ করে না।

ভূটানের মহারাজার অভিষেক—

হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে ভূটান রাজ্যের পাহরা সহরে ২৭শে অক্টোবর 'জিগমে ডোরজী ওয়াংচু'কে ভূটানের নূতন মহারাজার পদে বরণ করিয়া তাঁহার অভিষেক উৎসব করা হইয়াছে। ১৯০৭ সালে এই বংশ ভূটানে রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন—বর্তমান রাজা সেই বংশের তৃতীয় ব্যক্তি। ঐ উপলক্ষে সিকিমস্থ ভারতের পলিটিকাল অফিসার শ্রীবি-কে-কাপুর উৎসবে যোগদান করিয়া ভারতের সহিত ভূটান রাজ্যের মৈত্রীর কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রীজহরলাল নেহরু হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য জাতিগুলিকে উন্নত করিবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে অন্যান্য স্থানের সহিত ভূটানের পাহাড়ী জনগণও সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

নাটালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে আফ্রিকানদের সহিত ভারতীয়গণ এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেছে। চিত্রে নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সহঃ-সভাপতি মিঃ অশ্বিন চৌধুরীকে দেখা যাইতেছে! তিনি ডারবানের আন্দোলনে তৃতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। ডারবান সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তাঁহার বহু ভারতীয় ও আফ্রিকান বন্ধু তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার পত্নী ডাঃ অনসূয়া, এইচ, সিংহ ও কন্যাকেও দেখা যাইতেছে

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ভারতবর্ষ : ৩৭২ (অধিকারী নট আউট ৮১, হাজারে ৭৬, গুলাম আমেদ ৫০। আমীর ইলাহি ১৩৪ রানে ৪ উইকেট।

পাকিস্তান ঃ ১৫০ (মহম্মদ হানিফ ৫১। মানকড় ৫২ রানে ৮ উইকেট) ও **১৫২** (এ কারদার নট আউট ৪৩, ইমিতাজ আমেদ ৪১। মানকড় ৭৯ রানে ৫ এবং গুলাম আমেদ ৩৫ রানে ৪ উইকেট)

দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৭০ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

১৬ই অক্টোবর, প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ৭ উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করে। হাজারে অসীম ধৈর্য্য এবং সতর্কতার সঙ্গে খেলে ৭৬ রান করেন। বহু বারের মত এবারও তিনি দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। প্রবীণ খেলোয়াড় আমীর ইলাহি ৮৬ রানে ৩টে উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় শেষ উইকেটের জুটিতে অধিকারী এবং গুলাম আমেদ ১০৯ রান ক'রে ভারতবর্ষের পক্ষে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। দশম উইকেটের জুটিতে টেষ্ট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড ১৩০ রান—ফস্টার এবং রোড্‌স (ইংলণ্ড), অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯০৩-৪ সালে এ রেকর্ড স্থাপন করেন। এই প্রথম গুলাম আমেদ টেষ্ট খেলায় অর্দ্ধশত রান করলেন। দ্বিতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে পাকিস্তান ৩ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান ক'রে ভারতবর্ষের থেকে ২৮২ রানে পিছিয়ে থাকে। পাকিস্তানের নামকরা খেলোয়াড় ইমিতাজ আমেদ কোন রান না ক'রেই আউট হয়ে যান।

তৃতীয় দিনের খেলায় পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৫০ রানে শেষ হ'লে তাদের ফলো-অন্ করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংস ঐ দিনেই ১৫২ রানে শেষ হয়—ফলে ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৭০ রানে জয়লাভ করে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই জয়লাভের জন্য মানকড়ই সব থেকে বেশী ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। ১৩১ রান দিয়ে তিনি ১৩টা উইকেট পান—ভারতবর্ষের পক্ষে টেষ্ট খেলায় এরকম কৃতিত্বের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে অপর কোন খেলোয়াড় দিতে পারেন নি। বোলিংয়ে তাঁর এই কৃতিত্ব টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষ : লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), ভিনু মানকড়, পি রায়, বিজয় হাজারে, ভি মঞ্জরেকার, পলি উমরীগড়, গুলমহম্মদ, হিমু অধিকারী, জি রামচাঁদ, পি সেন এবং গুলাম আমেদ।

পাকিস্তান : আব্দুল হাফিজ কারদার (অধিনায়ক), নাজার মহম্মদ, মহম্মদ হানিফ, ইসরার আলী, ইমিতাজ আমেদ, মকসুদ আমেদ, আনওয়ার হোসেন, ওয়াকার হোসেন, ফজল মাহ্‌মুদ, খান মহম্মদ এবং আমীর ইলাহী।

রোভার্স কাপ ঃ

হায়দ্রাবাদ পুলিস ১-০ গোলে রোভার্স কাপ ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই এ্যামেচার দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি তিন বছর রোভার্স কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

জাতীয় টেবল টেনিস ঃ

ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ১৯৫২ সালের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে বাঙ্গলা প্রদেশ দলগত

কল্যাণ জয়ন্ত

চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রে বার্ণা-বেলাক কাপ জয়লাভ করেছে। এই নিয়ে বাঙ্গলা দেশ উপর্যুপরি চার বছর পুরুষ বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেল। এবার নিয়ে মহিলা বিভাগে বোম্বাই প্রদেশ উপর্যুপরি দু'বছর 'জয়লক্ষ্মী' কাপ বিজয়ী হয়েছে।

ব্যক্তিগত বিভাগের খেলায় কল্যাণ জয়ন্ত তিনটির ফাইনালে উঠে পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলসে জয়লাভ করেন।

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (পুরুষ বিভাগ)—বাঙ্গলা
" (মহিলা বিভাগ)—বোম্বাই

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ

পুরুষদের সিঙ্গলসে ঃ বিজয়ী—কল্যাণ জয়ন্ত (বাংলা)
বিজিত—দিলীপ সম্পৎ (বোম্বাই)
" ডবলসে ঃ বিজয়ী—কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর ভাণ্ডারী (বাংলা)
বিজিত—উত্তম চন্দ্রণা ও ডি পি সোমায়া (বোম্বাই)
মহিলাদের সিঙ্গলসে ঃ বিজয়িনী—সৈয়দ সুলতানা (হায়দ্রাবাদ)
বিজিতা—জি নাসিকওয়ালা

মিক্সড ডবলসে—রণবীর ভাণ্ডারী ও সৈয়দ সুলতানা কল্যাণ জয়ন্ত ও জি নাসিকওয়ালাকে পরাজিত করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চরিত্রহীন" (১৩শ সং)—৫৲
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "কাশীনাথ" (২য় সং)—২৲
শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি-এ প্রণীত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" (২য় খণ্ড)—১০৲
হরিহর শেঠ প্রণীত "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" (কথায় ও চিত্রে)—১০৲
শ্রীগৌরহরি ঘোষ প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী "সচিত্র কেদার-বদরিকা ভ্রমণ-রহস্য"—৩৲
শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "মাটির মানুষ"—২৷৹
অন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত গল্প গ্রন্থ "এক ফালি বারান্দা"—২৲

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা না পাওয়া যাইবে, পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষ তাঁহাদের ভিঃ পিঃ যোগে পাঠানো হইবে। ছয় মাসের জন্য গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৪৲ টাকা এবং ভিঃ পিঃতে ৪৷৵০ আনা লাগিবে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে সম্মত না থাকেন, অনুগ্রহপূর্বক ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-এল-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ এম্-এল্-এ

সূচীপত্র

চত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক